

উইলবার স্মিথ

দ্য সানবার্ড

অনুবাদ : অসীম পিয়াস



একটা হারানো সভ্যতা, একটা অভিশাপের পুনর্জন্ম।

ডক্টর বেন কাজিনের হাতে আছে শুধু একটা ঝাপসা ছবি আর মনের ভেতর একটা খুঁতখুঁতানি যে বতসোয়ানার পাহাড়ের নিচে কোথাও একটা হারানো শহর খুঁজে পাওয়া যাবে। কাজ শুরু করার পরেই, একটা অভিশাপের গুজব আর স্থানীয় গোত্রের সাথে গোলাগুলি ওনাকে নিয়ে গেলো শহরটার ভিত্তির বাইরেও আরও অনেক কিছু আবিষ্কারের দিকে। অভিশাপটা আদতে মনে হলো সত্যিই বোধহয়, আর সেটা বেন আর ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু, সেই সাথে যে মেয়েটাকে তারা দুজনেই ভালোবাসে তাদেরকে সংযুক্ত করে দেবে প্রায় দুই হাজার বছরের পুরনো এক ভুলে যাওয়া রাজার সাথে। একটা সম্মানিত আর গৌরবের শহরের সাথে যেটা পরবর্তীতে বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বাতাসে। কিন্তু কী হলো এই প্রাচীন সভ্যতার? আর সেটা কি এমন জিনিস যা এই হারানো সাম্রাজ্যের সাথে বেন আর এই মারাত্মক বিপদটাকে সংযুক্ত করছে যা ওকে বর্তমান দিনে মুখোমুখি হতে হচ্ছে?

ঐতিহাসিক উপন্যাসের কথা উঠলে, স্মিথ এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

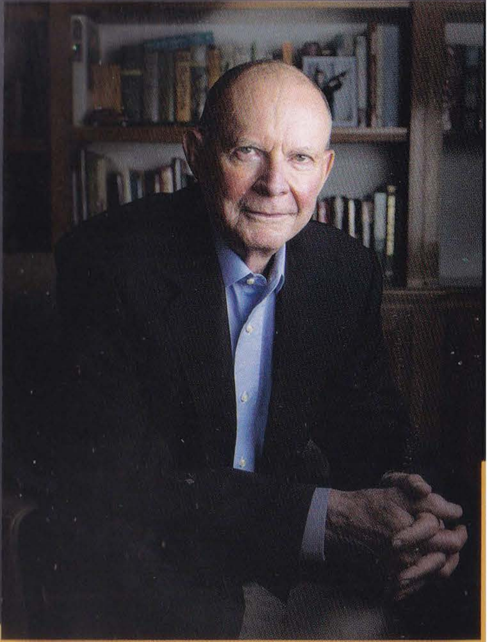
– তুলসা ওয়ার্ল্ড

প্রতিবার আমি উইলবার স্মিথের নতুন একটা উপন্যাস পড়ি আর বলি যে এটাই আমার পড়া সেরা বই...পরের বইটা পড়ার পরেও একই কথা মনে হয়।

– টাইমস রেকর্ড নিউজ (উইচিটা ফলস)







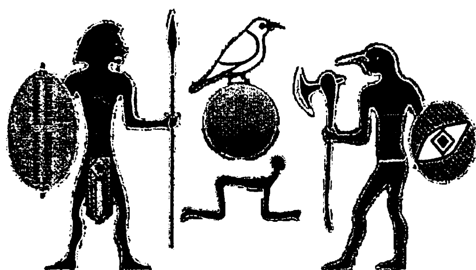
উইলবার স্মিথ বিশ্বজোড়া একজন কিংবদন্তী, প্রায় পঞ্চান্ন বছরের লেখালেখির পর তৈরি হয়েছে তার আলাদা পাঠককূল। তার জন্ম ১৯৩৩ সালে বর্তমান জাম্বিয়ায়, একটা ব্রিটিশ পরিবারে। পড়াশোনা সাউথ আফ্রিকার রোডস বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৪ সালে হোয়েন দ্য লায়ন ফিডস বইটার সাফল্যের পর পুরোদস্তুর লেখালেখি শুরু করেন, আর এরপর থেকে চল্লিশটা বিশ্বব্যাপী বেস্টসেলার বই লিখেছেন। এর মাঝে আছে কোর্টনী সিরিজ, ব্যালান্টাইন সিরিজ, ইজিপশিয়ান সিরিজ, হেক্টর ক্রস সিরিজ আর আরও অনেক সফল একক বই। প্রতিটাই বিশ্বজুড়ে তার অসংখ্য অভিযাত্রার ওপর ভিত্তি করে নির্ভুল গবেষণার মাধ্যমে লেখা।

২০১৫ সালে উইলবার অ্যান্ড নিসো স্মিথ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বোঝা যায় যে লেখদের অধিকার আদায়ে, সাহিত্যের প্রচারে আর রোমাঞ্চ উপন্যাসকে লেখার একটা ধারা হিসেবে উন্নীতকরণে তার প্রচেষ্টা কতোটুকু। ফাউন্ডেশনের অন্যতম বড় উদ্যোগ হচ্ছে- উইলবার স্মিথ অ্যাডভেঞ্চার রাইটিং প্রাইজ।



দ্য সানবার্ড

দ্য সানবার্ড



উইলবার স্মিথ

অনুবাদঃ অসীম পিয়াস



চিরকূট



বইঘর.কম

দ্য সানবার্ড

মূল | অনুবাদ
উইলবার স্মিথ | অসীম পিয়াস

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ২০২০

প্রকাশক
এ. কে. এম. মাফিউল কাদির আদন

অনুবাদ স্বত্ব
চিরকুট প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
সজল চৌধুরী

মূল্য
সাতশত টাকা মাত্র

The Sunbird by Wilbur Smith
Translated by Osim Pious
Published by Chirkut Prokashoni
Price TK. 700.00 only



প্রথম ভাগ



প্রজেকশন রুমের অন্ধকার কেটে চুপচাপ স্ক্রিনের উপর আছড়ে পড়ল আলো–কিন্তু আমি ছবিটার কিছুই চিনতে পারলাম না। পনেরো বছর ধরে অপেক্ষা করছি এই জিনিস দেখার, যখন সামনে এল...চিনতেই পারলাম না! কেমন কাঁপা আর অস্পষ্ট ছবিটা। আগা-মাথা কিছুই ধরা যাচ্ছে না, ভেবেছিলাম–ছোট কোনো জিনিসের ছবি দেখতে পাবো বোধহয়; হয়তো একটা মাথার খুলি, কোনো হাতিয়ার, স্বর্ণালংকার বা পুঁতির মালা–কিন্তু এরকম ধূসর, সাদা আর কালোয় মেশানো বিমূর্ত কোনো ছবি দেখার কথা কখনো কল্পনাও করিনি!

লোরেনের গলা শোনা গেল, উত্তেজনায় খলবল করছে। ওর কথায় ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। "ছত্রিশ হাজার ফুট উপর থেকে তোলা হয়েছে ছবিটি; গত চার সেপ্টেম্বরে, সিক্স ফর্টি সেভেন[1] থেকে।" আটদিন আগের তারিখ সেটা। "পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের লেইকা ক্যামেরা দিয়ে।"

তার মানে আকাশ থেকে তোলা ছবি। শুনে আমার চোখ আর মস্তিষ্কের সমন্বয় হতেই নিজের ভেতরে ভেতরে উত্তেজনার সুড়সুড়ি অনুভব করতে শুরু করলাম। এদিকে লোরেনের খলবলানি চলছেই।

"একটা বিমান চার্টার কোম্পানিকে ভাড়া করেছিলাম, অনুমোদন পাওয়া এলাকায় একটা জরিপ চালানোর জন্য। উদ্দেশ্য ছিল–এলাকাটা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ওখানে কী কী আছে তা জেনে, টাকা খাটানো ঠিক হবে কিনা তা যাচাই করা। এই ছবিটা কয়েকশো হাজারের মধ্যে একটা–যে তুলেছে সে জানে-ও না যে কী তুলেছে! যাই হোক, অ্যানালাইসিসের লোকজন খেয়াল করে ছবিটা আমার কাছে পাঠায়।"

লোরেন আমার দিকে ফিরলো, ওর চেহারা প্রজেক্টরের আভায় মলিন আর কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

"জিনিসটা তুমি দেখতে পাচ্ছো না, বেন? মাঝখান থেকে একটু উপরে, ডানদিকে।"

জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুললাম আমি, কিন্তু স্বর গলাতেই আটকে গেল! ব্যাপারটাকে চাপা দিতে কাশতে শুরু করলাম। অবাক হয়ে খেয়াল করলাম: কাঁপছি আমি! একই সাথে আশা আর শংকায় পেটের ভেতর জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

---

[1] বিমান

"একেবারে মিলে যাচ্ছে! দুইদিক থেকে ঘেরা আক্রোপোলিস[২], শিশ্ন আকৃতির মিনার।" বাড়িয়ে যে বলছে মেয়েটা তাতে সন্দেহ নেই, এখানে খুবই ঝাপসা কিছু দাগ দেখা যাচ্ছে শুধু। অস্পষ্ট, কিছু কিছু জায়গা ওঠেনি ও ছবিতে। তবে একনজরে মোটামুটি ঠিকই মনে হচ্ছে।

"উত্তর দিক," কোনোমতে বললাম আমি। "উত্তর দিকটা কোথায়?"

"ছবির উপরের দিকে–ঠিকই দেখা যাচ্ছে, বেন। উত্তর দিকে মুখ করা। মিনারগুলো কি সূর্যকে ভিত্তি করে বানানো বলে মনে হচ্ছে?"

আমি আর কিছু বললাম না। তবে এখন অবশ্য অনুভূতি আটকে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। জীবনে কোনো কিছুই এত সহজে হয়নি আমার, সেজন্য ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছিল না ঠিক, তাই শুধু ব্যাপারটার খুঁত খোঁজার চেষ্টা করছিলাম।

"পাথর জমেও তো হতে পারে," বললাম আমি। "মনে হচ্ছে মাটির গ্রানাইটের সাথে চুনাপাথর মিশে জমাট বেঁধেছে। সেগুলোই নানান নকশার মত দেখাচ্ছে।"

"ওরে বলদ!" লোরেন মন্তব্য করল, কণ্ঠের উত্তেজনা এখনও যায়নি অবশ্য। ও প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা পা ফেলে স্ক্রিনের কাছে গেল, হাতে তুলে নিল সামনের ডেস্কে থাকা একটা কালো রঙের পয়েন্টার; অস্পষ্ট নকশাটার চারপাশের ছোট ফোঁটাগুলো, যেগুলোকে ও খুশি মনে মূল দেওয়াল বলে মেনে নিয়েছে, দেখিয়ে বলল, "তুমি জীবনে আর কোথায় মাটির উপর এরকম নকশা দেখেছো, বলো দেখি?"

আমি মানতে চাচ্ছিলাম না। আসলে আমি চাচ্ছিলাম না যে আবারও আশার ফাঁদে পড়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলি।

"হতে পারে," বললাম আমি।

"ধূর শালা," হেসে দিল এবার লোরেন। ওর হাসির শব্দ শুনে ভালো লাগল, কারণ ইদানীং ও হাসে না বললেই চলে। "আমার বোঝা উচিত ছিল যে তুমি এরকমই করবে। সন্দেহ নেই–তুমি হচ্ছো আফ্রিকার সবচেয়ে শোচনীয় আর হতাশাবাদী মানুষ।"

"জিনিসটা যে কোনো কিছুই হতে পারে, লো," প্রতিবাদ করলাম আমি। "আলোর খেলা, আকৃতি বা ছায়ার বিভ্রান্তি। আর যদি ধরেও নেই যে ওটা মানুষের বানানো কিছু, তাহলেও তো সম্প্রতি বানানো বাগান বা ফসলের ক্ষেত হবার সম্ভাবনা ফেলে দেয়া যায় না–"

"সবচেয়ে কাছের পানির উৎসও এখান থেকে একশো মাইল দূরে। মাথা খারাপ, বেন? আমি যেমন জানি, তেমনি তুমিও জানো যে এটাই হচ্ছে–"

"বোলো না," প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। আর ওকে থামাতে কখন যে ফোম বসানো চামড়ার চেয়ারটা ছেড়ে, প্রজেকশন রুমের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় গিয়ে ওর হাত চেপে ধরেছি, সেটা টেরও পাইনি।

---

২ প্রাচীন গ্রিসের নগরদুর্গ

"বোলো না," আবার বললাম আমি। "বলে ফেললে আর-আর হবে না।" উত্তেজিত হলেই তোতলামি শুরু হয়ে যায় আমার। তবে শারীরিক অক্ষমতা হিসেবে ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না বলে বহু আগেই এই নিয়ে দুশ্চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি।

লোরেন হাসলো আবার, তবে এবার খানিকটা আড়ষ্ট, আমি যখনই খুব দ্রুত নড়া-চড়া করি বা ওর উপর শারীরিক শক্তি খাটাই, তখনই ও এরকম করে হাসে। আমার দিকে ঝুঁকে, আমার আঙুলগুলো ওর বাহু থেকে ছুটিয়ে নিল। ওগুলো প্রায় গেঁথে গিয়েছিল বেচারার মাংসে।

"স্যরি-ব্যথা পেয়েছো?" আমি মুঠো ছেড়ে দিলাম।

"না।" মুখে বললেও, জায়গাটা ডলতে ডলতেই প্রজেক্টরের কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে এগিয়ে বন্ধ করে দিল যন্ত্রটা। তারপর ঘরের বাতি জ্বালতেই আচমকা আলোতে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলাম।

"শালার পিচ্চি ইড্ডিশ ভূত," বলে হাসলো লোরেন। "আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। উত্তেজনায় তো অবস্থা খারাপ তোমার!"

ওর দিকে তাকালাম আমি, আচমকা এমনতর উচ্ছ্বাসে লজ্জা লাগছে এখন, তবে তাতে উত্তেজনা কমলো না।

"কোথায় এটা লো? কোথায় পেলে এটা?"

"আগে তোমাকে নিজের মুখে বলতে হবে যে জিনিসটা কী। জীবনে একবারের জন্যে হলেও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজটা করে দেখাতে হবে। তুমি আগে মুখ খোলো-একমাত্র তাহলেই আমি সব জানাবো," ক্ষ্যাপাতে লাগল লোরেন।

"ঠিক আছে।" আরেক দিকে তাকিয়ে কী বলবো ভেবে নিলাম আমি। "প্রথম দর্শনে জিনিসটা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক-ই বটে।"

শোনামাত্র লোরেন নিজের সোনালি কেশে ভরা বিশাল মাথাটা পেছনে হেলিয়ে ষাঁড়ের মত হেড়ে গলায় অট্টহাসি দিয়ে উঠলো।

"এসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, আরেকবার চেষ্টা করো।"

ওর হাসি দেখে আমিও সামলাতে পারলাম না নিজেকে, হেসে ফেললাম। তবে ওর হাসির তুলনায় আমার হাসি যে পাখির কিচির-মিচিরের মত, সেটা ভালোই জানা ছিল।

"সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে," বলে লম্বা একটা দম নিলাম আমি, "সম্ভবত তুমি জায়গাটাকে খুঁজে পেয়েছো।"

"চমৎকার!" চেঁচিয়ে উঠলো লোরেন। "খুবই চমৎকার!"

বিগত কয়েক বছরের মাঝে ওকে এত খুশি কবে দেখেছি তা মনে নেই। গোমড়ামুখো ব্যবসায়ীর মুখোশ খসে পড়েছে, অর্জনের আতিশয্যে স্টারভেসান্ট সাম্রাজ্যের গাম্ভীর্য ভুলে গিয়েছে লোরেন।

"এখন বলো আমাকে," অনুনয় করলাম আমি। "কোথায় জায়গাটা?"

"চলো দেখাচ্ছি," বলল লোরেন, মুখভঙ্গি সিরিয়াস হয়ে গিয়েছে আবার। দেওয়ালের সাথে লাগানো লম্বা টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল ও। ওটার সবুজ রঙের পুরু আবরণের উপর একটা চার্ট ছড়িয়ে পিন মেরে রাখা হয়েছে। টেবিলটা যথেষ্ট উঁচু, আমি দ্রুত হাচড়ে পাচড়ে একটা চেয়ারে উঠে ওটার দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। এখন আমার আর পাশে দাঁড়ানো লোরেনের উচ্চতা প্রায় সমান। চার্টের দিকে মন দিলাম আমরা।

"অ্যারোনটিক্যাল সিরিজ A। সাউথার্ন আফ্রিকা। চার্ট ফাইভ। বতসোয়ানা আর পশ্চিম রোডেশিয়া।"

আমি চার্টের উপর চোখ ঘুরাতে লাগলাম, চিহ্ন খুঁজছি–ক্রস বা পেন্সিলের দাগ বা এরকম কিছু।

"তুমি তো জানোই, আমি প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গমাইল এলাকায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের অনুমতি পেয়েছি। সেটা হচ্ছে এই মাউন–"

"ধূর, লো। তুমি কি আমার কাছে স্টারভেসান্ট মিনারেলস-এর শেয়ার বিক্রির ধান্দা করছো? কোথায় পেলে বলো না?"

"আমরা এখানে বিমানের স্ট্রিপ বানিয়েছি, লিয়ার জেটটা ওখানে নামতে পারবে। মাত্রই শেষ হয়েছে কাজ।"

"ওটা গোল্ড বেল্টের[৩] এত দক্ষিণে হতেই পারে না।"

"না," লোরেন আশ্বস্ত করল আমাকে। "পেছনে হেলো। ফুটো করে ফেলবে চার্টটা।" আমার উপর মানসিক অত্যাচার চালিয়ে প্রচুর আমোদ পাচ্ছে ও, বোঝা গেল।

চার্টের উপর ওর আঙুল ঘুরতে লাগল, তারপর থেমে গেল আচমকাই–আমার হৃৎপিণ্ডটাও যেন আঙুলের সাথে সাথে থেমে গেল। জায়গাটা এখন আরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দ্রাঘিমাংশ মিলে গেল হুবহু। বিগত কয়েক বছরে তিলে তিলে আমি যত সূত্র জোগাড় করেছিলাম, সেগুলোও এই জায়গাটাকেই নির্দেশ করছিল।

"এখানে," বলল লোরেন। "মাউন থেকে দুইশো বারো মাইল দক্ষিণ পূর্বে, ওয়াঙ্কির গেম রিজার্ভ-এর[৪] দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বাতিঘর থেকে ছাপ্পান্ন মাইল দূরে। একসারি ছোট ছোট পাহাড়ের পাদদেশে জায়গাটা, পাথর আর শুষ্ক মাটির ঝোপঝাড়ের আড়ালে চাপা পড়ে আছে।"

"কখন যাবো ওখানে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"বাপরে!" লোরেন মাথা নাড়তে লাগল। "তুমি দেখি বিশ্বাস করেই ফেলেছো। অবশেষে!"

---

[৩] যেসব জায়গায় স্বর্ণের খনি আছে

[৪] বন্য প্রাণী শিকার সংরক্ষিত এলাকা

"অন্য কারো চোখে পড়ে যেতে পারে জায়গাটা।"

"প্রায় হাজার বছর ধরে চাপা পড়ে আছে ওটা ওখানে–আরেক সপ্তাহ থাকলে খুব বেশি ক্ষতি–"

"এক সপ্তাহ!" প্রায় কেঁদে দিলাম আমি দুঃখে।

"এর আগে সম্ভব না, বেন। শুক্রবারে আমার অ্যাংলো-স্টারভেসান্ট-এর বার্ষিক সভা, শনিবারে ব্যবসার কাজে জুরিখ যেতে হবে। তবে আমি সর্বোচ্চ দ্রুততার সাথে শেষ করবো সব। শুধু তোমার জন্য।"

"বাদ দিয়ে দাও আর সব," অনুনয় করলাম আমি। "তোমার কোনো চ্যালা-চামুণ্ডাকে পাঠাও।"

"কারো কাছ থেকে পঁচিশ মিলিয়ন ধার পাবার আশা থাকলে, তখন সেই চেকটা নিজে গিয়ে নিয়ে আসাটাই ভদ্রতা; কোনো পিয়নকে পাঠানো উচিত না।"

"ঈশ্বরের দোহাই, লো। এই সামান্য কয়টা টাকার জন্য–এই ব্যাপারটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা কি বুঝছো না?"

এক মুহূর্তের জন্য অপলক তাকিয়ে রইলো আমার দিকে লোরেন, ওর শীতল নীল চোখজোড়া দেখে মনে হলো হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে।

"পঁচিশ মিলিয়ন সামান্য টাকা?" খুব আস্তে আস্তে নিজের মাথা নাড়তে লাগল ও, তারপর এমনভাবে ঝাঁকানো শুরু করল যেন ওর সামনে এক নতুন সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। "আমার মনে হয় ঠিকই বলেছো।" বলে হাসলো একটু। মুচকি হাসি, মানুষ তার খুব কাছের বন্ধুর জন্য যেরকম স্নেহশীল হাসি হাসে, সেরকম। "দুঃখিত বেন। মঙ্গলবারের আগে হবে না। ভোরবেলা রওনা দেব আমরা। প্রমিজ। বিমানে করে আগে জায়গাটা রেকি করবো। তারপর মাউনে গিয়ে নামবো। পিটার লার্কিন–চেনো না ওনাকে?"

"হ্যাঁ, ভালো মতই।" পিটার মাউনের বিশাল একটা সাফারি[৫] ব্যবসা চালান। কালাহারির অভিযাত্রায় দুইবার ওনার কোম্পানির সহযোগিতা নিয়েছিলাম আমি।

"ভালো। আমি ওনাকে জানিয়ে রেখেছি এরমধ্যেই। উনিই আমাদের অভিযানের সব যোগাড়যন্ত্র করে দেবেন। বেশি জিনিসপত্র নেব না সঙ্গে, যাতে দ্রুত চলাচল করা যায়–একটা ল্যান্ড রোভার আর একজোড়া তিন টনি ইউনিমগ[৬]। সর্বোচ্চ পাঁচদিন সময় দিতে পারবো আমি–তাও বহু কষ্টে বের করেছি সময়টা–এরপর একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে চলে আসবো ওখান থেকে, তারপরে তোমার যত ইচ্ছা খোঁড়াখুঁড়ি কোরো–" বলতে বলতেই আমরা প্রজেকশন রুম থেকে বেরিয়ে বাইরের বিশাল গ্যালারিতে চলে এলাম।

---

[৫] আফ্রিকার শিকার অভিযান

[৬] গাড়ির নাম

ঘরটার উঁচু জানালাগুলো থেকে সূর্যের আলো উপচে পড়ছে, ফলে গ্যালারিজুড়ে থাকা চিত্রকর্ম আর ভাস্কর্যগুলো দেখা যাচ্ছে একদম নিখুঁতভাবে। এখানে সাউথ আফ্রিকার শীর্ষ শিল্পীদের কাজ যেমন আছে তেমনি আছে ভীনদেশি জীবিত বা মৃত শিল্পীদের কাজ। লোরেন স্টারভেসান্ট, এর আগে ওর পূর্বসূরিরাও সবসময় খুব ভেবে-চিন্তে টাকা খরচ করেছেন। এমনকি এখন এই জরুরি মুহূর্তেও আমি রেনোয়াঁ[৭]-এর একটা ভাস্কর্যের পেশল সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।

লোরেন হালকা পায়েই আরবদেশীয় পুরু কার্পেটের স্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আমিও তাল মেলাচ্ছি সমান তালে। আমার পাদুটো দৈর্ঘ্যে ওরগুলোর সমানই, সমান শক্তিশালী।

"খুঁড়ে-টুড়ে যদি দেখো যে আমরা যা আশা করছি সেটাই পাওয়া গিয়েছে, তখন দলবল নিয়ে যাওয়া যাবে। স্থায়ী ক্যাম্প, বিমান নামার স্ট্রিপ, তোমার পছন্দমতো সহযোগী, দরকারি কর্মচারী, তোমার কাজে লাগবে এমন যে কোনো যন্ত্রপাতি।"

"ও ঈশ্বর, সত্যি যেন হয়," মৃদুস্বরে বললাম আমি। সিঁড়ির গোঁড়ায় পৌঁছে থমকে গেলাম আমরা। তারপর ষড়যন্ত্রীদের মত দাঁত বের করে হাসি দিলাম দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে।

"কতো খরচ হবে, কোনো আন্দাজ আছে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "পাঁচ-ছয় বছর ধরেও খোঁড়া লাগতে পারে।"

"সেরকমই ধরে রেখেছি," বলল লোরেন।

"আমি কিছু দিতে পারবো, এই কয়েক লাখ।"

"এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন, এত সামান্য কয়টা টাকা।" বলেই ও ওর চিরচারিত ষাঁড়ের গলার হাসিতে ভেঙে পড়ল আর আমি সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। পুরোটা সিঁড়িপথে আমরা গজরাতে গজরাতে আর হাসি চাপতে চাপতে নেমেছি, তবে ওর আওয়াজই যে বেশি শোনা যাচ্ছিল তা বলাই বাহুল্য। নেমে এসে হাঁপাতে লাগলাম দুজনে, তবে তাতেও চেহারা থেকে উল্লাসের ভাব কমলো না।

"সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ফিরবো। এয়ারপোর্টে দেখা করতে পারবে না? আলিটালিয়ার[৮] জুরিখের ফ্লাইট নাম্বার তিনশো দশ। এর মাঝে তোমার যা যা লাগে গুছিয়ে ফেলো।"

"ছবিটার একটা কপি লাগবে।"

"ওটা আরও বড় করে ছাপিয়ে ইনস্টিটিউটে হাতে হাতে দিয়ে আসতে বলেছি। পুরো সপ্তাহ পাচ্ছো ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখার।" বলে ও কবজির

---

[৭] ফ্রেঞ্চ শিল্পী

[৮] এয়ারলাইন্স

স্বর্ণের পিয়াজেঁ কোম্পানির ঘড়িটার দিকে তাকালো। "আয় হায়, দেরি হয়ে গেছে!"

ও বের হওয়ার দরজার দিকে ফিরতেই হিলারি স্টারভেসান্ট বাইরের উঠোন থেকে ভেতরে এসে ঢুকলো। ওর পরনে একটা খাটো সাদা টেনিস খেলার পোশাক, পা'জোড়া লম্বা আর বুকে ব্যথা সৃষ্টি করার মত সুন্দর। লম্বা মেয়েটার মাথার সোনালি-বাদামি মেশানো চুল স্তুপ হয়ে কাঁধের উপর পড়ে ঝলমল করছে।

"ডার্লিং, যাবে না তুমি?" জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

"স্যরি হিল, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। লাঞ্চ করবো না আমি, তবে বেনকে ধরণীতে আটকে রাখতে তোমাকে দরকার হবে!"

"দেখিয়েছো ওকে?" বলতে বলতে হিলারি ঘুরে এগিয়ে এল আমার দিকে, ঝুঁকে পড়ে একেবারে আমার ঠোঁটে চুমু দিল একটা। এককোঁটা দ্বিধা আর সংকোচ ছিল না তাতে। সোজা হয়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো তারপর।

প্রতিবার মেয়েটা যখন এই কাজ করে, আমি আরও এক হাজার বছরের জন্য ওর গোলাম হয়ে যাই!

"কি মনে হয় তোমার, বেন? সম্ভব নাকি?"

আমি জবাব দেওয়ার আগেই লোরেন এগিয়ে এসে হিলারির কোমর জড়িয়ে ধরলো, তারপর দুজনেই তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

"ওর তো মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে লোল পড়ছে, পারলে এখুনি আনন্দে ডিগবাজি দেয়! আমাকে বলছেঃ এখন, এই মুহূর্তে নাকি ওখানে চলে যাবে।" তারপর ও হিলারিকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে চুমু খেলো। দীর্ঘ একটা মিনিট আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আলিঙ্গন করে রইলো ওরা। এরা দুজন আমার কাছে সুন্দরী রমণী আর সুপুরুষ-এর মূর্ত প্রতীক। উভয়েই লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আর প্রিয়দর্শন। হিলারি, লোরেনের চাইতে বারো বছরের ছোট, ওর চতুর্থ স্ত্রী, সাত সন্তানের মাঝে সর্বকনিষ্ঠজনের জননী। বয়স বিশের কোঠায় হলেও মেয়েটার পরিপক্কতা আর দায়িত্বজ্ঞান অনেক বয়স্ক লোকের চাইতে বেশি।

"বেনকে কিছু খেতে দাও, সোনা। আমার ফিরতে দেরি হবে।" লোরেন হিলারির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল।

"মিস করবো তোমাকে," হিলারি বলল।

"তোমাকেও। সোমবার দেখা হবে, বেন। যদি তোমার মনে হয় যে বিশেষ কিছু লাগতে পারে আমাদের, তাহলে লার্কিনকে কেবল করে দিয়ো। দেখা হবে।" বলে বেরিয়ে গেল ও।

হিলারি আমার হাত ধরে টেনে, বাইরের নিরিবিলি প্রাঙ্গণে নিয়ে এল। পাঁচ একরের বিশাল একটা বাগান। ফুলের ঝাড়গুলো ঢালু হয়ে নেমেছে

একটা কৃত্রিম দীঘির পাড়ে। খেলা চলছে দুটো টেনিস কোর্টে, সুইমিং পুলে একদল প্রায় নগ্ন মানুষ রোদ ঝলমলে পানিতে ঝাপাঝাপি আর ব্যাপক হুল্লোড় করছে। দুজন ইউনিফর্ম পরা খানসামা একপাশে বসানো লম্বা একটা টেবিলে বুফে লাঞ্চ সাজাচ্ছে, চারপাশে তাকিয়ে দেখি–প্রায় আধা ডজন কম বয়সী আয়া টেনিস খেলার পোশাক পরে একপাশে বসানো বার-এর সামনের শুয়ে থাকার চেয়ারগুলোয় গাদাগাদি করে বসে আছে। পরিশ্রমে চেহারায় রক্ত জমেছে ওদের, ঝকঝকে সাদা পোশাক ঘেমে ন্যাতন্যাতা লাগছে। লম্বা গ্লাসে করে পিমস নাম্বার ওয়ান-এ চুমুক দিচ্ছে সবাই। সেগুলোর ভেতর আবার ফল ভরা।

"চলো," বলে হিলারি আমাকে ওদের দিকে টেনে নিয়ে গেল। নিজেকে শক্ত করলাম আমি, বুক চিতিয়ে উচ্চতা ইঞ্চিখানেক বাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে গেলাম মানুষগুলোর দিকে।

"মেয়েরা–আমাদেরকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য একজন পুরুষমানুষকে ধরে এনেছি। সবাই ডক্টর বেঞ্জামিন কাজিন-এর সাথে পরিচিত হও। ডক্টর কাজিন হচ্ছেন আফ্রিকান অ্যানথ্রোপলজি অ্যান্ড প্রিহিস্টোরি ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক। বেন, এ হচ্ছে মার্জরি ফেল্পস।"

আমি একেকজনের দিকে ফিরতে লাগলাম আর হিলারি সবার নাম বলে যেতে লাগল। প্রত্যেকের জোর করে দেখানো অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে হাসলাম, সবার চোখের দিকে তাকিয়ে *হ্যালো* বললাম। চোখ আর কণ্ঠ–এই দুটো হচ্ছে আমার আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। পরিচয়-পর্বটা যে শুধু আমার জন্য অস্বস্তিকর ছিল তা না, ছিল ওদের জন্যেও। কেউ নিশ্চয়ই আশা করে না যে, তাদের গৃহকর্ত্রি দুপুরের খাবারের আগের পানীয়ের সাথে সাথে এক কুঁজোকেও ধরে নিয়ে আসবে।

বাচ্চারা উদ্ধার করল এই বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে। ববি আমাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল এদিকে। সাথে চিৎকার করছে, "আঙ্কেল বেন! আঙ্কেল বেন!" কাছে এসেই ঝাঁপিয়ে, ভেজা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো আমার গলা; ওর ভিজে, চপচপে বাথিং কস্টিউম লেগে আমার নতুন স্যুটটাও জবজবে হয়ে গেল। তারপর আমাকে টেনে নিয়ে গেল স্টারভেসান্ট বংশের বাকি সদস্য আর তাদের বন্ধুদেরকে দেখিয়ে অভিভূত করার জন্য। বাচ্চাদের সাথেই আমার বনে ভালো; হয় ওরা পুরো ব্যাপারটাই খেয়াল করে না, নয়তো সোজা-সাপ্টা জিজ্ঞেস করে বসে। "আপনি এভাবে বাঁকা হয়ে হাঁটেন কেন?"

তবে আজ খুব বেশি আসর জমাতে পারলাম না, কারণ আমার মাথায় ঘুরছে অন্য জিনিস; ওদের দিকে ঠিকভাবে মনোযোগই দিতে পারলাম না–কিছুক্ষণ পরেই ওরা আমাকে রেখে নিজেদের মাঝে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তবে ববি গেল না–ও আমার খুবই ন্যাওটা। একটু পর হিলারি এসে অবশ্য

আমাকে ওর সৎ মেয়ের কাছ থেকে ধরে নিয়ে গেল। আমি আবার ফিরে এলাম কমবয়সী মায়েদের ভীড়ে, এখানে অবশ্য বাচ্চাদের চাইতে অনেক ভালো মনোযোগ দিতে পারলাম। প্রাথমিক আড়ষ্টতা কেটে গেলে সুন্দরী মহিলাদের আকর্ষণ আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না! ওখান থেকে ইনস্টিটিউটের উদেশ্যে রওনা দিতে দিতে তিনটা বেজে গেল।

ববি স্টারভেসান্টের তেরো বছর বয়সী হাত যে উদারতায় গ্লাসে কোকাকোলা ঢালে, ঠিক সমান উদারতায় ঢালে গ্লেন গ্রান্ট মল্ট হুইস্কিও। ফলস্বরুপ উড়ু উড়ু একটা ভাব নিয়ে ইনস্টিটিউটে পৌঁছালাম আমি।

খামটা আমার ডেস্কের উপরেই ছিল। উপরে লেখা 'ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়'। এক কোনায় একটা চিরকুট পিন দিয়ে আটকানো। "দুপুর বেলায় এসেছে। ভাবে তো দারুণ জিনিস মনে হচ্ছে!–স্যাল।"

আচমকা ঈর্ষার ছোবলে দ্রুত খামের মুখটা পরীক্ষা করে দেখলাম। অক্ষত আছে। ভেতরে কী আছে, খুলে দেখেনি স্যালি। কিন্তু আমি খুব ভালোই জানি যে কাজটা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে কী পরিমাণ কষ্ট হয়েছে ওর! কারণ এসব ব্যাপারে ওর কৌতূহলকে বাতিকগ্রস্ত লোকের সাথে তুলনা করা যায়। যদিও নিজে ব্যাপারটার নাম দিয়েছে: অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক মানসিকতা।

অভিজ্ঞতা বলে: পাঁচ মিনিটের মাঝে হাজির হবে ও; তাই দ্রুত আমার উপরের ড্রয়ারে থাকা তিনটা এক্স পেপারমিন্ট থেকে একটা নিয়ে মুখে দিলাম, যাতে হুইস্কির ঢেকুরের ঝাঁজ খানিকটা কমে আসে; তারপর খামটা খুলে চকচকে বারো-বাই-বারো ইঞ্চির বড় করা ছবিটা বের করলাম। ডেস্কের লাইট জ্বেলে, সেটার সাথে ম্যাগনিফাইং টেবিল লেন্সটা উপরে বসিয়ে সমন্বয় করে নিলাম। তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলাম তাদেরকে, যারা একসময় আমার এই অফিস কাঁপাতো। আমার রুমের চার দেওয়াল জুড়েই আছে শেলফ, মেঝে থেকে কাঁধ পর্যন্ত–আমার কাঁধ পর্যন্ত– বই দিয়ে ভরা: আমার কর্মকাণ্ডের হাতিয়ার, সবগুলো বাদামি আর সবুজ রঙের গরুর চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা, সোনার পাত দিয়ে নাম লেখা ওগুলোর। রুমটা অনেক বড়, অন্তত এখানে কয়েক হাজার বই তো আছেই। বইয়ের উপরে, তাকের বাকি অংশে আছে মানব প্রজাতির সব পূর্বপুরুষের প্লাস্টারে বানানো আবক্ষ মূর্তি। অস্ট্রালোপিথিয়াস, প্রোকনসাল, রোবুস্টা, রোডেশিয়ান ম্যান, পিকিং মানব থেকে শুরু করে নিয়ান্ড্রাথাল পর্যন্ত আর সব শেষে তার সব মহত্ত্ব আর অখ্যাতি নিয়ে বসে আছে ক্রো-ম্যাগনন–হোমো স্যাপিয়েন্স। আমার ডান দিকের শেলফে আছে আফ্রিকাতে যত প্রকার জাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের আবক্ষ মূর্তি: হ্যামাইট, আরব, পিগমি, নেগ্রোইড, বোস্কপ, বুশম্যান, গ্রিকুয়া, হটেনটটসহ বাকি যা যা আছে। ওদেরকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা শুরু করলাম, ওরা ড্যাবড্যাবে কাঁচের চোখ দিয়ে অপলক তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

"ভদ্র মহোদয়গণ," বললাম আমি, "আমাদের হাতে ভালো কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে আমার।" যখন আমি খুব উত্তেজিত বা মদ্যপ থাকি, তখন সাধারণত এদের সাথে জোরে জোরে কথা বলি।

আজ আমি দুটোই খুব বেশি পরিমাণে হয়ে আছি।

"কার সাথে কথা বলছেন?" দরজা থেকে জিজ্ঞেস করল স্যালি। চমকে চেয়ারে বসেই লাফিয়ে উঠলাম আমি। উত্তরের আশায় প্রশ্নটা করেনি ও, কার সাথে কথা বলছি তা ওর চাইতে ভালো কেউ জানে না। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে আছে মেয়েটা, দুই হাত নোংরা ডাস্টকোটের পকেটে ঠেসে ঢোকানো। ঘন কালো চুল, চওড়া কপাল থেকে পেছনের দিকে টেনে টানটান করে ফিতা দিয়ে বাঁধা, লম্বা নাকের পেছনে বড় বড় সবুজ চোখজোড়া দিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। কণ্ঠার হাড় উঁচু, ঠোঁটে সবসময়েই কেমন কামুক একটা হাসি। মেয়েটা লম্বা, পেশল পা। পরে আছে টাইট ফিটিং নীল জিন্স। এরকম লম্বা পা-অলিদেরকেই আমার সবসময় কেন ভালো লাগে, কে জানে?

"দুপুরের খাওয়া-দাওয়া কেমন হলো?" জিজ্ঞেস করল ও, তারপর হেলেদুলে আমার ডেস্কের দিকে এগোতে লাগল, উদ্দেশ্য আমি কী করছি তা দেখা। কোনো লেখা উল্টো করা থাকলেও পড়তে পারে স্যালি, এর আগেও এজন্য ভালোই ঝামেলায় পড়তে হয়েছে।

"সেই!" জবাব দিলাম আমি। ইচ্ছাকৃতভাবে ছবিটাকে খাম দিয়ে ঢেকে রেখেছি। "কোল্ড টার্কি, লবস্টার সালাদ, স্মোকড ট্রাউট, হাঁসের মাংস আর ট্রাফল দেওয়া মাংসের কিমা।"

"শালা হারামি," বিড়বিড় করে বলল স্যালি। ভালো খেতে পছন্দ করে খুব ও, খাম দিয়ে *যেকাজটা* করেছি সেটাও ধরে ফেলতে পেরেছে। এই শব্দচয়ন আমার সামনে করা হোক, তা চাই না; আবার ওকে নিষেধ করেও থামাতে পারি না!

আমার প্রায় পাঁচ ফুট দূরে থাকতেই নাক টানলো কয়েকবার। "সাথে পেপারমিন্ট ফ্লেভারের মল্ট হুইস্কি। ইয়াম্মি!"

লজ্জায় চেহারা লাল হয়ে গেল আমার, কোনোভাবেই আটকাতে পারলাম না। ব্যাপারটাকে আমার তোতলানোর সঙ্গে তুলনা দেয়া যেতে পারে–দেখে হাসিতে ভেঙে পড়ল স্যালি, তারপর আমার ডেস্কের এক কোনাতেই উঠে বসল।

"এমন করেন কেন, বেন," জুলজুল চোখে খামটার দিকে তাকিয়ে বলল ও। "খামটা আসার পর থেকেই বুকটা ফেটে যাচ্ছে আমার। ভেবেছিলাম ভাপ দিয়ে খুলে ফেলবো, কিন্তু ইলেকট্রিক কেটলিটা নষ্ট।"

ড. স্যালি বেনাটর দুই বছর ধরে আমার সহকারী, কাকতালীয়ভাবে ঠিক দুই বছর ধরেই আমি ওর প্রেমে পড়ে আছি।

একপাশে সরে গেলাম আমি যাতে ও ডেস্কের পেছনে, আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে; তারপর খামটা সরালাম। "ঠিক আছে," বললাম আমি। "দেখা যাক তুমি কিছু ধরতে পারো কিনা।"

আমাকে আরও খানিকটা ঠেলা দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো সে, ওর বাহু ছুঁয়ে দিল আমার কাঁধ–আর সেই স্পর্শে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরণ খেলে গেল আমার সারা শরীরে। গত দুই বছরে স্যালি বাচ্চাদের মতই হয়ে গিয়েছে, আমার পিঠের কুঁজটা খেয়াল করে বলে মনে হয় না। আমার সাথে সবসময়ই সহজ আর স্বচ্ছন্দ। আর আমিও মোটামুটি একটা সময়সূচি হিসেব বের করে রেখেছিঃ আশা করা যায় পরের দুই বছরের মাঝে আমাদের সম্পর্কটা একটা পর্যায়ে পৌঁছাবে। আমাকে ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছে, খুবই ধীরে ধীরে, যাতে ও কোনোভাবেই কিছু টের না পায়। এই দুই বছরের ভেতরে, আমাকে একজন প্রেমিক আর স্বামী হিসেবে ভাবার চিন্তাটা আমি ওর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। গত দুই বছর বহুত কষ্টে কেটেছে–সামনের দুই বছরের কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

ডেস্কের উপর ঝুঁকে ও ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাকালো, দীর্ঘক্ষণ কিছুই বলল না। কাঁচে আলো প্রতিফলিত হয়ে মেয়েটার চেহারায় পড়ছে। যখন মুখ তুললো তখন ওর চেহারা দেখে মনে হলো যেন চেপে রেখেছে প্রচণ্ড উল্লাস, ঝিকমিক করছে সবুজ চোখজোড়া।

"বেন," বলল ও। "ওহ বেন–আমার যে কী খুশি লাগছে!"

কিন্তু কেন যেন ওর এই সহজ স্বীকৃতি আর ব্যাপারটা ধরে ফেলতে পারায় বিরক্ত হলাম। "তুমি দেখি এক লাফেই উপসংহারে চলে যাচ্ছো," রেগে বললাম আমি। "এরকম নকশা হওয়ার কমপক্ষে এক ডজন প্রাকৃতিক কারণ থাকতে পারে।"

"না।" মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ও, হাসছে এখনও। "খামাখা এটাকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করার দরকার নেই। এটাই সেটা, বেন। অবশেষে। আপনি যে কতদিন ধরে কষ্ট করছেন, কতদিন ধরে আশায় আছেন, এখন আর সেটাকে মেনে নিতে ভয় পাবেন না প্লিজ।"

স্যালি ডেস্কের পেছন থেকে বেরিয়ে, দ্রুত পায়ে বুকশেলফের দিকে এগিয়ে গেল। ইংরেজি *কে* অক্ষরের দিকে গিয়ে খুঁজতে লাগল বই। ওখানে 'বেঞ্জামিন কাজিন'–নামক লেখকের বইয়ের বারোটা খণ্ড আছে। সেখান থেকে একটা বের করে নিয়ে প্রথম পাতাটা খুলল।

"*ওফির,*" পড়তে শুরু করল ও। "*লেখক বেঞ্জামিক কাজিন। প্রাগৈতিহাসিক মধ্য আফ্রিকার এক স্বর্ণ নির্ভরশীল সভ্যতার ওপর একটি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, সাথে জিম্বাবুয়ে শহর আর প্রাচীন কিংবদন্তী এবং কালাহারির হারানো শহরের ওপর বিশেষ প্রতিবেদন।*"

ঠোঁটে হাসি ধরে রেখেই আবার এগিয়ে এল ও আমার দিকে। "পড়েছেন নাকি বইটা?" বলল। "দারুণ কিন্তু।"

"ব্যাপারটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে, স্যাল। সেটা ঠিক। কিন্তু তা কেবলই এক সম্ভাবনা–"

"কোথাকার ছবি?" আমাকে থামিয়ে দিল ও। "মিনারেল বেল্টের[৯] ওদিককার? ঠিক যেমনটা আপনি আন্দাজ করেছিলেন?"

মাথা ঝাঁকালাম আমি। "হ্যাঁ, গোল্ড বেল্ট-এর ভেতরেই। তবে সম্ভাবনা আছে যে এখানে...লাঙ্গেবেলি আর রুয়ানে শহরের চাইতে অনেক, অনেক বেশি ধাতু উৎপাদন হতো।"

বিজয়ের হাসিতে ভরে গেল স্যালির চেহারা। ও আবার লেন্সের উপর ঝুঁকে পড়ল। আঙুল দিয়ে ছবিটার কোনায় কালি দিয়ে আঁকা একটা তীর চিহ্নের দিকে দেখালো ও। তীরটা দিয়ে ছবির উত্তর দিক নির্দেশ করা হচ্ছে।

"পুরো শহরটাই–"

"যদি সেটা একটা শহর হয় তবেই," ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম আমি।

"পুরো শহরটাই," আবার বলল মেয়েটা, এবার আরও জোর দিয়ে। "উত্তর দিকে মুখ করা। সূর্যের আলো পড়ে পুরোপুরি। অ্যাক্রোপোলিস ঠিক পেছনেই–সূর্য আর চাঁদ, দুই দেবতা। পুরুষাঙ্গের মত দেখতে মিনার–চার, পাঁচ–ছয়টা। সাতটাও থাকতে পারে।"

"স্যাল, ওগুলো মিনার না। ছত্রিশ হাজার ফুট উঁচু থেকে নেওয়া একটা ছবির কালো কালো ফুটকি।"

"ছত্রিশ হাজার!" বিস্ময়ে স্যালি মাথা সোজা করে ফেলল। "তার মানে তো এগুলো বিশাল বড়! মূল সীমানার ভেতরে পুরো জিম্বাবুয়েকেই কয়েকবার ঢুকিয়ে ফেলা যাবে।"

"আস্তে, আস্তে। ঈশ্বরের দোহাই।"

"দেওয়ালের বাইরের নিচু শহর, মাইলের পর মাইল জুড়ে দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা বিশাল, বেন। কিন্তু জিনিসটা এরকম অর্ধচন্দ্রাকার কেন?" বলে ও সোজা হয়ে দাঁড়ালো, এরপরে জীবনে প্রথমবারের মত–প্রথম স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মত–স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমার গলা। "ওহ, কী যে আনন্দ লাগছে, মরেই যাবো মনে হয়! কখন রওনা হবো আমরা?"

উত্তর দিলাম না আমি, প্রশ্নটা কানেই যায়নি যেন আমার। আমার দেহে চেপে থাকা ওর উষ্ণ স্তনের যে স্বর্গীয় অনুভূতিটা হচ্ছিল, তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম চুপচাপ।

"কখন?" ঠেলে আমাকে সোজা করে, চেহারার দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল ও।

---

[৯] যেসব জায়গায় ধাতুর খনি আছে

"কী?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "কী বলেছো, বুঝিনি।" চেহারা আবারও লাল টমেটো হয়ে গিয়েছে, সেই সাথে শুরু হয়েছে তোতলানো–দেখে আরও একচোট হাসলো স্যালি।

"আমরা কখন যাবো ওখানে? কখন হারানো শহরটা খুঁজে বের করবো?"

"ও আচ্ছা।" তারপর কীভাবে বললে ধাক্কাটা সামলানো সহজ হবে তা ভেবে বললাম, "লোরেন স্টারভেসান্ট আর আমি যাবো প্রথমে। মঙ্গলবার রওনা দেব আমরা। লোরেন কোনো সহকারী নেওয়ার কথা বলেনি–তাই মনে হয় আপাতত রেকি করার কাজে তোমাকে নেওয়া সম্ভব হবে না।"

স্যালি সোজা দাঁড়িয়ে নিজের নিতম্ব চেপে ধরলো দুই হাত দিয়ে। তারপর আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে অস্বাভাবিক ঠান্ডা গলায় বলল: "হয়ে যাক বাজি?"

বাজির দর আমার মতের পক্ষে থাকাটাই বেশি পছন্দ করি, তাই স্যালিকে বললাম ব্যাগ গুছিয়ে রাখতে। অবশ্য স্যালি একজন পেশাদার মহিলা, ভ্রমণে গেলে তেমন কিছুই নেয় না; তাই এক সপ্তাহ ব্যাগ গোছানোর জন্য অনেক দীর্ঘ সময়। একটা চামড়ার ছোট হাতব্যাগ আর একটা কাঁধে ঝোলানো ক্যারি-অল ব্যাগেই ওর ব্যক্তিগত সাজ-সরঞ্জাম এঁটে যায়। স্কেচ-বুক আর রঙের ডিব্বাগুলোই বরং জায়গা নেয় বেশি; তবে আমরা বই ভাগাভাগি করে নেই, যাতে একই বই দুজনেরই নেয়া না লাগে। আমার ছবি তোলার জিনিসপত্র অবশ্য বিশাল জায়গা দখল করে, আছে নমুনা সংগ্রহের ব্যাগ ও বাক্সপত্র। একটা ক্যানভাসের ব্যাগে ভরা আছে সবকিছু। প্রকাণ্ড ব্যাগটা আমার অফিসের এক কোনায় পড়ে আছে এখন।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় রেডি হয়ে গেলাম আমরা; পরের ছয়টা দিন পার করলাম তর্কা-তর্কি, একজন আরেকজনকে বিরক্ত করা, উচ্চকণ্ঠে ঝগড়া, ছবিটার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থেকে; আমাদের ঘষাঘষিতেই ওটা সম্ভবত কেমন যেন মলিন হয়ে গেল! যখন দেখা যেত দুজনের মধ্যে উত্তেজনা চরমে, তখন স্যালি নিজের অফিসে গিয়ে তালা বন্ধ করে বসে থাকত আর ড্রিকোপেন বা উইট্রি বার্গ[১০] থেকে পাওয়া পাথরে আঁকা চিত্রগুলো অনুবাদের চেষ্টা চালাতো। পাথরে খোদাই, আঁকা ছবি আর প্রাচীন লেখালেখির অনুবাদ-কর্ম হচ্ছে স্যালির বিশেষত্ব।

আর আমি রাগে গজগজ করতে করতে প্রদর্শনীর ঘরগুলোয় ঘুরে বেড়াতাম আর খুঁজে দেখতাম: কোনো প্রদর্শনীতে ধুলো জমে আছে কিনা; বা চিন্তা করতাম আমাদের ওয়্যারহাউস আর উপরের স্টোর রুমগুলোতে জমিয়ে রাখা জিনিসপত্রগুলো প্রদর্শনের কোনো অভিনব উপায় বের করা যায় কিনা। দর্শনার্থীদের বইয়ে লিখিত নামগুলো গুনে দেখতাম, স্কুল থেকে ঘুরতে আসা

---

[১০] সাউথ আফ্রিকার জায়গার নাম

বাচ্চাদেরকে গাইড হিসেবে সব ঘুরিয়ে দেখাতাম–মানে কাজের বাইরে যে কোনো কিছু করতাম। এসব করে বিরক্ত হয়ে আবার উপরে গিয়ে স্যালির দরজায় দিতাম টোকা। মাঝে মাঝে মেয়েটা ডাকত ভেতরে, "ভেতরে আসুন, বেন।" আবার মাঝে মাঝে বলত, "ব্যস্ত আছি। কী দরকার?" তখন আমি চলে যেতাম আফ্রিকান ল্যাংগুয়েজ সেকশনে। ওখানে দৈত্যাকৃতি টিমোথি মাগেবার সাথে কাটিয়ে আসতাম ঘণ্টাখানেক।

ইনস্টিটিউটের ঝাড়ুদার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিল টিমোথি, সেই বারো বছর আগে। ছয় মাস লেগেছিল আমার আবিষ্কার করতে যে, নিজের মাতৃভাষা–দক্ষিণাঞ্চলের সোথো ভাষার–পাশাপাশি আরও ষোলোটা স্থানীয় ভাষা বলতে পারে ও। আঠার মাসে আমি ওকে অনর্গল ইংরেজি বলা শিখিয়ে ফেললাম, দুই বছর পরে লেখা-ও শিখে গেল। এর দুই বছর পর মেট্রিক পাশ করল, সেটার তিন বছর পর বি.এ. ডিগ্রিটাও পেয়ে গেল। পরের দুই বছরে শেষ করল মাস্টার্স–আর এখন আফ্রিকান ভাষার ওপর ডক্টরেট করছে।

এখন টিমোথি ইংরেজি সহ উনিশটা ভাষা জানে...আমার চাইতে একটা বেশি। নিজেকে ছাড়া আমি শুধুমাত্র ওকেই চিনি, যে কিনা মাসের পর মাস মরুভূমিতে কাটিয়ে, একদল খর্বাকৃতির হলুদ লোকগুলোর সাথে থেকেছে–কারণ ওরা একইসাথে উত্তরাঞ্চলীয় আর কালাহারি বুশম্যান–দুই গোত্রের ভাষাই জানতো।

একজন ভাষাবিদ হিসেবে সে আশ্চর্যজনকরকম চুপচাপ মানুষ। যখন কথা বলে, তখন বলে হাঁড়ির মত গলায়; যা ওর মস্ত আকৃতির সাথে মানানসই। ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও, পেশাদার কুস্তিগিরের মত দেহের পেশী, অথচ নড়া-চড়া একজন নটরাজের মত!

ওকে যতই দেখি মুগ্ধ হই। অবশ্য ভয়ও লাগে একটু-আধটু। মাথায় চুল নেই একটাও, গোল চাঁদিটা কামিয়ে রাখে সবসময়। তাতে নিয়মিত তেল দেওয়ায় সেটা চকচকে কুচকুচে কামানের গোলার মত দেখায়। থ্যাবড়া নাক, নাকের ফুটো ষাঁড়ের মত দুই দিকে ছড়ানো, পুরু, বেগুনি কালো ঠোঁট, তার পেছনে ঝকঝক করে ধবধবে সাদা, শক্তিশালী দাঁত। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন খাঁচায় আটকানো জন্তুর উন্মত্ততা ঠিকরে বের হচ্ছে, কিন্তু ওর নিরাবেগ চলাফেরা দেখে সেটা কেউ ধারণাও করতে পারবে না। আবার মাঝে মাঝে ওখানে দেখা যায় বিদ্যুতের চমকা, যা কোনো এক গ্রীষ্মের বিকেলে দূর থেকে ভেসে আসছে। ওর চলাফেরায় কেমন অশুভ কিছু একটা আছে। সবসময় সাদা শার্ট আর কালো বিজনেস স্যুট পরে ঘোরে। গত প্রায় বারো বছর ধরে আমার সিংহভাগ সময়ই কাটে ওর সঙ্গেই, কিন্তু এখনও ওই কালো চোখ আর তারচাইতেও কালো চামড়ায় ঢেকে রাখা অন্ধকারের গভীরতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

আমার যৎসামান্য তত্ত্বাবধানে ও ইনস্টিটিউটের আফ্রিকান ল্যাংগুয়েজ ডিপার্টমেন্টটা চালায়। পাঁচজন কম বয়সী আফ্রিকান–চারজন ছেলে আরেকজন মেয়ে, ওর সহকারী হিসেবে কাজ করে। এখন পর্যন্ত ওরা আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের সাতটা প্রধান কথ্য ভাষার নির্ভরযোগ্য অভিধান প্রণয়ন করেছে। সেইসঙ্গে এত সব লিখিত আর রেকর্ড করা জিনিসপত্র জোগাড় করে এনেছে যে আগামী সাত বছর আর নতুন কাজ খুঁজতে হবে না।

টিমোথির নিজের উদ্যোগে, সাথে আমার সামান্য সাহায্য আর উৎসাহে, ও আফ্রিকান ইতিহাসের উপরে দুই খণ্ডের একটা বই প্রকাশ করেছে। শ্বেতাঙ্গ ইতিহাসবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক আর সমালোচকরা অবশ্য সেটা পড়ে ধুয়ে দিচ্ছে বেচারাকে। ছোট বেলায় টিমোথি ওর দাদার শিক্ষানবিস ছিল বলা যায়, তিনি ছিলেন নিজ গোত্রের ওঝা আর ঐতিহ্যের রক্ষক। বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য, দাদা টিমোথিকে সম্মোহন করে ওদের গোত্রের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস ওর মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দেন। সেই ঘটনার তিরিশ বছর পরে, এখনও, টিমোথি ধ্যানমগ্ন হয়ে সেসব কিংবদন্তী, লোকসাহিত্য, অলিখিত ইতিহাস আর জাদুকরি পদ্ধতির পুরোটাই মনে করতে পারে! টিমোথি নিজের প্রশিক্ষণ শেষ করে ওঝাগিরি শুরু করার মাত্র এক বছর আগে, ওর দাদাকে শাস্ত্রীয় আচার পালন করতে গিয়ে খুন করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একজন নির্দয় শ্বেতাঙ্গ বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। যাই হোক, উনি টিমোথিকে যা দিয়ে গিয়েছিলেন, তা ছিল আক্ষরিক অর্থেই পাহাড়সম–এর মাঝে বেশিরভাগই ছিল অবশ্য দৃশ্যতঃ ভুয়া, বিরাট একটা অংশ অপ্রকাশযোগ্য আর বাকিটা হয় উদ্ভট নয়তো খুব বেশি অশোভন; যেটুকু বাকি থাকলো তা ছিল চটুল, হতবুদ্ধিকর বা সোজা কথায় ভয়ানক।

আমার বই *ওফির*-এ আমি টিমোথির প্রচুর অপ্রকাশিত লেখার সাহায্য নিয়েছি–বিশেষ করে ওইসব অবৈজ্ঞানিক কিন্তু ‘জনপ্রিয়’ অংশগুলো, যেখানে বলা হয়েছে প্রাচীন মানুষদের নানান কিংবদন্তী, সাগরের ওপারের একদল সাদা চামড়া আর সোনালি চুলের যোদ্ধাদের গল্প, যারা স্বর্ণের খনি খুঁজে বের করতো, ওখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে দাস বানিয়ে দেওয়ালে ঘেরা একটা শহর তৈরি করেছিল। তারপর তারা কয়েকশো বছর ওখানে প্রবল প্রতাপে বসবাসের পর একসময় ভোজবাজির মত মিলিয়ে যায় বাতাসে।

আমি জানি যে টিমোথি আমাকে পুরো সত্যিটা কখনো বলে না–কারণ এর মাঝে অনেকগুলো আছে এত বেশি গোপন, ওগুলো ঘিরে এত বেশি বাঁধা নিষেধের আড়াল, যে সেসব কথা অন্য কাউকে বলার চাইতে নিজের ভেতর রহস্যাবৃত করে রাখতেই পছন্দ করে ওরা। আমি নিশ্চিত যে, ও যেসব তথ্য আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে, তার বেশিরভাগই এই প্রাচীন মানুষগুলো

সংক্রান্ত। তবে আমি ওকে চেপেচুপে আরও দুয়েকটা তথ্য জেনে নেওয়ার কাজে কখনও ক্ষান্ত দেই না।

সোমবার সকালে, মানে লোরেনের যেদিন ফেরার কথা, সেদিন স্যালি–লোরেন ওকে শুরুতেই সঙ্গে নিতে আপত্তি করবে–এই দুশ্চিন্তায় এতটাই খিটমিট করতে লাগল যে ওর সাথে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। ওর হাত থেকে বাঁচতে, অবশিষ্ট সময়টুকু কাটাতে আমি চলে গেলাম টিমোথির কাছে।

ও একটা ছোট ঘরে কাজ করে–ইনস্টিটিউটে আসলে জায়গা নিয়ে টানাটানি আছে; পুরো ভবনটাই পুস্তিকা, বই আর আলগা কাগজের গাদা দিয়ে ঘিঞ্জি হয়ে আছে। প্রতিটা ঘরের ছাদ পর্যন্ত ভরে আছে এসব দিয়ে–তার মাঝেই আমাদের চেয়ারটা বসানোর জায়গা বের করতে হয়। বার-এর টুলের মতই লম্বা পাতলা চেয়ার সেটা। যদিও আমার হাত আর পায়ের আকার স্বাভাবিক, বা তার চাইতেও ভালো, তবে আমার পিঠ বাঁকা; তাই সাধারণ কোনো চেয়ারে বসলে ডেস্কের উপরে দেখতে সমস্যা হয়।

"ম্যাকেইন! ব্লেসড ওয়ান!" ভেতরে ঢুকতেই, চিরচারিত সম্ভাষণ বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো টিমোথি। বান্টু সম্প্রদায়ের লোককাহিনি অনুযায়ী, যাদের পা বাঁকা, বা শরীর অ্যালবিনো[১১], চোখ ট্যারা আর পিঠ কুঁজো, তারা হচ্ছে আত্মাদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত, এদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থাকে। এই বিশ্বাসটার কারণে আমি খানিকটা চোরা সুখ অনুভব করি...টিমোথির এই সম্ভাষণ সবসময়ই আমাকে পরম আনন্দ এনে দেয়।

আমি নিজের চেয়ারটায় লাফিয়ে উঠে বসে ওর সাথে এলোমেলো আলাপ জুড়ে দিলাম। বিষয়বস্তু একেক বিষয় থেকে উড়ে উড়ে একেক ভাষায় ঘুরতে লাগল। টিমোথি আর আমি দুজনেই নিজেদের মেধা নিয়ে গর্বিত–আর আমার ধারণা দুজনেই সেটা কিঞ্চিত দেখিয়েও বেড়াই। আমি নিশ্চিত, দুনিয়াতে এমন কোনো জীবিত ব্যক্তি নেই, যিনি আমাদের কথোপকথন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারবেন।

"এবারের ভ্রমণে তুমি থাকবে না, আজব লাগছে ব্যাপারটা," বললাম আমি। তবে কোন ভাষায় সেটা মনে নেই এখন। "গত দশ বছরে এই প্রথম এমনটা হবে।"

সাথে সাথেই চুপ করে গেল ও, চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। জানতো টিমোথি যে আমি আবার ওই হারানো শহরটা নিয়ে কাজ শুরু করবো। পাঁচ দিন আগেই আমি তাকে ছবিটা দেখিয়েছি, তারপর থেকে ফুসলিয়ে যাচ্ছি ওটার ব্যাপারে ওর একটা যথাযথ মন্তব্যের আশায়। ইংরেজিতে কথা শুরু করলাম এবার।

---

[১১] চামড়া, চুল, চোখ সব সাদা

"যাই হোক, না গেলেও তোমার কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না বলেই আমার ধারণা। আবারও হয়তো ছায়ার পেছনেই দৌড়ানো হবে। ঈশ্বরই জানেন এরকম কতগুলো আছে! যদি একবার বুঝতে পারতাম যে কোন জিনিসটা খুঁজতে হবে..."

কথা থামিয়ে প্রত্যুত্তরের আশায় চুপ মেরে রইলাম আমি। টিমোথির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। এটা অবশ্য ওর একটা শারীরিক বৈশিষ্ট্য, একটা অস্পষ্ট নীলাভ পর্দা মনে হয় যেন ওর চোখের মণিকে ঢেকে রেখেছে। কাঁধের পুরু পাকানো পেশীগুলোর ভেতর মাথাটা যেন ডেবে গেল লোকটার, ঠোঁট কাঁপছে–তা দেখে আমার বাহুর পেছনের মাংসপেশি শক্ত হয়ে গেল, সটান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের পেছনের লোমগুলো।

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। অনেকবার দেখেছি, অথচ আজও টিমোথিকে ঘোরের মধ্যে যেতে দেখার অতিপ্রাকৃত অনুভূতিটা ঝেরে ফেলতে পারি না। মাঝে মাঝে ব্যাপারটা অনৈচ্ছিকভাবেই ঘটে–একটা শব্দ, একটা চিন্তাই সূচনা করে ব্যাপারটার, তাৎক্ষণিকভাবেই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ওর মাঝে। তবে হ্যাঁ, নিজে নিজে আত্মসম্মোহন করেও করা যায় ব্যাপারটা, তবে সেজন্য অনেক প্রস্তুতি আর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

এবারের ব্যাপারটা ছিল একদমই স্বতঃস্ফূর্ত, আমি আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম; কারণ ব্যাপারটা যদি এমন কিছু হয় যা অন্য কাউকে বলা নিষিদ্ধ, তাহলে কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই টিমোথি ওর ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে ঘোর কাটিয়ে ফেলবে।

"অশুভ–" কম্পিত কণ্ঠে বলল সে, বুড়ো মানুষের মত খনখনে হয়ে গিয়েছে কণ্ঠ...ওর দাদার গলা! পুরু বেগুনি ঠোঁটে অল্প থুথু জমেছে–"এক অশুভকে দুনিয়া আর মানুষের মন, দুটো থেকেই মুছে ফেলতে হবে, চিরতরে।"

ওর মাথা ঝাঁকি দিতে লাগল, চেতন মনটা অবচেতনকে বাঁধা দিতে চাচ্ছে, ঠোঁটজোড়া ঝুলে পড়ল। লড়াইটা স্থায়ী হলো না বেশিক্ষণ–আচমকাই ওর চোখ আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল আমাকে।

"স্যরি," ইংরেজিতেই বিড়বিড় করে বলল ও, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে এখন। অনৈচ্ছিক ব্যাপারটায় লজ্জা পাচ্ছে, সেই সাথে বিদায় করে দিতে চাচ্ছে আমাকে। "কফি খাবেন ডক্টর? অবশেষে ওরা কেটলিটা ঠিক করেছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। টিমোথির কথা বলার সব ইচ্ছাই শেষ, আজকে আর কোনো আলোচনা হবে না; নিজেকে তালা মেরে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে সে। ওর নিজস্ব ভাষায় বললে, এখন সে আমার সাথে 'কালা আদমি' হয়ে আচরণ করবে!

"না থাক, টিমোথি," আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টুল থেকে নেমে পড়লাম। "এখনও শেষ মুহূর্তের কাজ কিছু বাকি আছে।"

"সাবধানে যাবেন, ম্যাকেইন, আত্মারা আপনাকে পথ দেখাক।"

হাত মেলালাম আমরা।

"শান্তিতে থেকো, টিমোথি, যদি দেখি যে আত্মারা ভালো পড়েছে, তাহলে তোমার জন্য পাঠিয়ে দেব কয়েকটা।"



হান স্মাটস এয়ারপোর্টের মূল হলের কফি বারের রেইলে হেলান দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালের প্রবেশপথটা ভালোই দেখা যায়।

"ধ্যাত," বিরক্তি ঝারলাম আমি।

"কী হলো?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো স্যালি।

"বিওয়াইএম! পুরো এক প্লাটুন চলে এসেছে।"

"বিওয়াইএম কারা?"

"ব্রাইট ইয়ং মেন। স্টারভেসান্ট-এর এক্সিকিউটিভ সব। ওই তো, ব্যাংক কাউন্টারের পাশে চারজনকে দেখতে পাচ্ছো না?"

"ওর স্টারভেসান্টের লোক, সেটা জানলেন কীভাবে?"

"চুলের ছাট–পেছনে আর পাশের দিকে ছোট। পোশাক–কালো কাশ্মীরি স্যুট আর প্লেইন টাই। ভাবসাবে সদা-চিন্তামগ্ন, দেখে মনে হয় পেট কামড়াচ্ছে! কিন্তু বস হাজির হলেই দাঁত বের হয়ে যায় সবগুলোর।" তারপরে নিজের অভ্যাসের বিপরীতে একটা সত্য কথা বলে দিলাম, "তাছাড়া, আমি ওদের মধ্যে দুজনকে চিনি। অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমার বন্ধুস্থানীয়–ইনস্টিটিউটের জন্য একটা টয়লেট পেপার কিনতে হলেও এদের কাছ থেকে টাকা আনতে হয়।"

"এটাই উনি নাকি?" সামনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল স্যালি।

"হ্যাঁ," জানালাম আমি। "এটাই *উনি*।"

লোরেন স্টারভেসান্ট ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, জুরিখের ফ্লাইটের ও-ই প্রথম যাত্রী যে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে, এয়ারপোর্টের পাবলিক রিলেশনস অফিসার ওর সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে। লোরেনের দুই পাশেও দুজন বিওয়াইএম দেখা গেল, তবে ওরা ইচ্ছা করেই একটু পেছনে পেছনে হাঁটছে। তৃতীয় আরেকজন সম্ভবত ওর ব্যাগ-বোঁচকা সামলাচ্ছে। অপেক্ষারত চারজন এমন উদ্ভাসিত হাসি দিল যে মনে হলো পুরো হলটাই আলোকিত হয়ে গেছে! এরপর ওরা

জেষ্ঠ্যতার ক্রম ধরে এগিয়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত করমর্দন সেরে লোরেনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এর মাঝে দুজন সামনে এগিয়ে লোরেনের সামনে থেকে লোকজন সরিয়ে দিতে লাগল, বাকি দুজন দুই পাশ আটকে রাখলো...যাতে কেউ কাছে ঘেঁষতে না পারে। পাবলিক রিলেশন অফিসার পিছিয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে রইলো বেকুবের মত, অ্যাংলো-স্টারভেসান্ট জনাকীর্ণ জায়গাটার ভেতর দিয়ে জায়গা করে এগিয়ে যেতে লাগল সাঁজোয়া বহরের মত।

মাঝে কোঁকড়া, স্বর্ণালি মাথা নিয়ে হাঁটছে লোরেন; ওর রোদে পোড়া তামাটে অবয়ব, চারপাশের কৃত্রিম হাসির ভেতরে একদমই বেমানান লাগছে।

"চলো," বলে স্যালির হাত ধরে টান দিয়ে ভীড়ের ভেতর মিশে গেলাম আমরাও। কাজটা আমি ভালোই পারি। উচ্চতায় অন্যদের পা বরাবর বলে ওই অপ্রত্যাশিত জায়গায় চাপ পড়া মাত্র লোহিত সাগরের পানি দুই ভাগ হওয়ার মত করে লোকজন ছিটকে যায় দুই পাশে। সেই ফাঁকা স্থান ধরে ইসরায়েলিদের মত স্যালি আসছে আমার পিছু পিছু।

বাইরে বেরুবার কাঁচের দরজার কাছে গিয়ে আমরা অ্যাংলো-স্টারভেসান্টদের ধরতে পারলাম। আমি স্যালির হাত ছেড়ে দিলাম যাতে লোরেনের চারপাশের মানববর্ম ভেদ করতে পারি। প্রথম প্রচেষ্টাতেই সফল হলাম আর লোরেন আমার উপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বাঁচলো!

"বেন," ডাক দেওয়া মাত্র আমি বুঝতে পারলাম ও আসলে কতটা ক্লান্ত। সোনালি চামড়া কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, চোখের নিচে বেগুনি ছোপ–তবে একটা আন্তরিক হাসি মুহূর্তের জন্য ক্লান্তিটাকে আড়াল করে দিল। "স্যরি, আমার আসলে তোমাকে আসতে মানা করা উচিত ছিল। নতুন একটা ঝামেলা হয়েছে। আমি এখন একটা মিটিঙে যাচ্ছি।"

আমার অভিব্যক্তি দেখে দ্রুত পিঠ চাপড়ে দিল একবার। "আরে আরে ভয় পেয়ো না। যাত্রা বাতিল হয়নি এখনও। কাল ভোর পাঁচটায় চলে এসো এয়ারফিল্ডে। ওখানেই দেখা করবো তোমার সাথে। কিন্তু এখন আমাকে যেতেই হবে। স্যরি।"

দ্রুত করমর্দন শেষ করলাম আমরা।

"অল দ্য ওয়ে, পার্টনার?" জিজ্ঞেস করলেন উনি।

"অল দ্য ওয়ে," বললাম আমি। স্কুলের বাচ্চাদের মত দাঁত বের করে হাসছি। এক মুহূর্ত পরেই ওরা কাঁচের দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

জোহানেসবার্গের পথের অর্ধেক পেরিয়ে আসার পর প্রথম কথা বলল স্যালি।

"আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন? সব ঠিক তো?"

"সময় ছিল না স্যাল। তুমি নিজেও দেখেছো, কতটা ব্যস্ত ছিল ও।"

ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গনে ঢোকার আগে কেউই কোনো কথা বললাম না আর। শূন্য কার পার্কে গাড়িটা ওর ছোট্ট লাল আলফার পাশে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কফি খাবে নাকি?"

"দেরি হয়ে গিয়েছে অনেক।"

"মোটেও না। আর আমি খুব ভালোই জানি যে তুমি ঘুমাবে না–আজ অন্তত না। দাবা খেলা যেতে পারে।"

"আচ্ছা।"

সামনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। গ্লাসের বক্স আর মোমের মূর্তিতে ঠাসা প্রদর্শনীর ঘরগুলো পেরিয়ে আমার অফিস আর ফ্ল্যাটের ব্যক্তিগত সিঁড়িটায় গিয়ে উঠলাম।

ঘরে ঢুকে স্যালি ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বেলে দাবার বোর্ড সাজাতে লাগল, আমি গেলাম কফি বানাতে। যখন ফিরে এলাম তখন দেখি ও এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে একটা গদি বসানো টুলে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে সাদা-কালো দাবার বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে। আগুনের আলো আর এই নতুন পারিপার্শ্বিকতায় ওকে আগে কখনও দেখিনি, আমার দম আটকে এল প্রায়। ওর পরনে খোপখোপ নকশার পঞ্চো[১২], প্রতিটা রঙ অত্যন্ত উজ্জ্বল, ঠিক ওর পায়ের নিচে বিছানো আরব-দেশিয় কার্পেটটার মতই। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে যে কোনো সময়।

বড় বড় নরম চোখগুলো মেলে তাকালো আমার দিকে ও, "আসুন, খেলা শুরু করি।"

যদি আমি স্যালির প্রথম আক্রমণটা কীভাবে আসবে ধরতে পেরে ওর মুহুর্মুহু আক্রমণকে আটকাতে পারি, তাহলেই গুটিবাজির এই খেলায় ওকে পরাস্ত করে সামনে এগোতে সক্ষম হবো। স্যালি এটাকে বলে তাড়িয়ে তাড়িয়ে মারা।

অবশেষে ও রেগেমেগে মৃদু গোঙানির আওয়াজ করে নিজের রাজাকে ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। বিশাল পঞ্চোটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিজেই নিজের কাঁধ চেপে ধরে আছে। আমি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে, একটা গোপন আনন্দ নিয়ে দেখতে লাগলাম ওকে। তবে আচমকাই মেয়েটা আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো; দুই পা ছড়িয়ে আছে দুপাশে, দুই হাত মুঠি করে নিতম্বের উপর চেপে রাখা, ওর কনুইয়ের উপর পরনের পঞ্চোটা তাঁবুর মত উঁচু হয়ে আছে।

"ঘেন্না করি আমি হারামজাদাকে," চাপা, হিসহিসে গলায় বলল ও। "অহংকারে পা পড়ে না শালার। দেখামাত্র বুঝতে পারি আমি এদেরকে।

---

[১২] ঢিলেঢালা পোশাক

কোন দুঃখে ওই লোককে আমাদের সাথে যেতে হবে? আমরা যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো আবিষ্কার করতেও পারি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে সেই কৃতিত্বের পুরোটা কে নেবে?"

ও যে লোরেনকে নিয়ে কথা বলছে, সেটা আমি বুঝতে পারলাম সাথে সাথেই–তবে ওর কণ্ঠে গরলের পরিমাণ দেখে শিউরে উঠলাম বলা যায়। ব্যাপারটা আমার মনে ছিল আর পরবর্তীতে আমি কারণটাও জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু তখন আমি প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গেলাম, এরপর হলো রাগ।

"কী সব আজেবাজে কথা বলছো তুমি?" জানতে চাইলাম আমি।

"চেহারা, হাঁটার ভঙ্গি, সাথের ভক্তকূল, কারো উপকার করার সময় আলগা দরদের ভাব, লোকটার মাত্রাতিরিক্ত অহমিকা–"

"স্যালি!"

"কারণে-অকারণে, মন চাইলেই যা ইচ্ছে করা–"

"চুপ করো, স্যালি," চেয়ার থেমে নেমে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি।

"ওনার সাথের বেচারা লোকগুলোকে দেখেছিলেন একবার? কীভাবে ভয়ে কাঁপছে সারাক্ষণ?"

"স্যালি, ওর সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে পারো না...অন্তত আমার সামনে না।"

"নিজের দিকে তাকিয়েছেন কখনও? আপনি আমার চেনা সবচেয়ে ভদ্র, দয়ালু আর ভালো মনের মানুষ। যাদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তাদের মাঝে সবচেয়ে মেধাবীও বলা যায়। কিন্তু কী করেন আপনি? কুকুরের মত লেজ নাড়তে নাড়তে ওই লোকটার পায়ের চারপাশে ঘোরেন–ঈশ্বর! আপনি তো পারলে তার পায়ের সামনে মাটিতে গড়াগড়ি যেতেন–পেট পেতে দিতেন সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য–" উন্মাদের মত লাগছিল স্যালিকে তখন, কাঁদতে শুরু করেছে...কষ্টে না, রাগে। গাল বেয়ে পড়ছে অশ্রু, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, রাগের চোটে কাঁপছে। "আপনাকেও ঘৃণা করি আমি–ওকেও। দুজনকেই ঘেন্না করি আমি। তিনি আপনাকে অপমান করেছেন, সস্তা মানুষ পেয়েছেন যেন আপনাকে, আর–"

আমি কথার জবাব দিতে পারলাম না। হতভম্ব হয়ে অসাড়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম শুধু–তবে ওর রাগ পড়ে গেল সহসাই, হাত তুলে মুখের উপর চেপে ধরলো। আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে," ফিসফিস করে বলল ও। "কেন যে এসব বলতে গেলাম! বেন, ওহ বেন। আমি স্যরি। সত্যি অনেক স্যরি।"

আমার কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে বসল ও, তারপর দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে চেপে ধরলো ওর সাথে। আমি মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আরও কী কী শুনতে হবে, এই ভয় আর শঙ্কায় সিটিয়ে ছিলাম

আসলে। যদিও এরকম একটা মুহূর্তের অপেক্ষায় অনেক প্রার্থনা করেছি; কিন্তু সেটা এত আচমকা ঘটলো, কোনো আগাম সংকেত ছাড়াই! এখন আমি ধাক্কা খেয়ে এমন একটা জায়গায় চলে এসেছি যেখান থেকে ফেরার উপায় নেই আর কোনো। আর এই জায়গাটা আমার একদমই অচেনা। স্যালি ওর মুখ তুলে সোজা আমার চেহারার দিকে তাকালো, আমাকে ছাড়েনি তখনও।

"আমাকে মাফ করে দিন, প্লিজ।"

ওকে চুমু দিলাম আমি, কান্নার কারণে ওর মুখ উষ্ণ আর নোনতা হয়ে আছে। ওর ঠোঁটও সাড়া দিতেই সব ভয় উবে গেল আমার।

"আমাকে আদর করুন, বেন–প্লিজ।" ও সম্ভবত টের পেয়েছে যে আমাকে না বললে আমি নিজে থেকে কিছু করবো না। ও আমাকে ধরে কাউচের কাছে নিয়ে গেল।

"লাইট," শুকনো গলায় বললাম আমি, "প্লিজ লাইটগুলো বন্ধ করে দাও।"

"আপনি যা চান সেটাই হবে।"

"প্লিজ, স্যালি।"

"আচ্ছা," বলল ও। "আমি জানি, ডার্লিং।" তারপর লাইট বন্ধ করে দিল।

অন্ধকারের ভেতরে দুইবার ও শিউরে উঠলো: "ওহ, প্লিজ বেন–আপনার এত শক্তি। মরেই যাবো আমি। আপনার হাতগুলো–আপনার হাত।"

এর অল্প কিছু পরেই, এবার ককিয়ে উঠলো ও; একটা অসংলগ্ন গোঙানি যার কোনো অর্থ নেই, আমার নিজের খসখসে গোঙানিও মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল সেটার সাথে। এরপর অন্ধকারে থেকে গেল শুধু আমাদের ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের ছাড়া ছাড়া শব্দ।

মনে হচ্ছিল যেন আমার শরীর থেকে মনটা আলাদা হয়ে, অন্ধকার আর উষ্ণতার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবনে প্রথমবারের মত মনে হলো আমি একই সাথে পূর্ণাঙ্গ বিশ্রাম, পরিতৃপ্তি আর নিরাপত্তা অনুভব করছি। এই মেয়েটার সাথে এখনও আরও অনেক 'প্রথম কিছু' ঘটা বাকি। অনেকক্ষণ পর স্যালি যখন মুখ খুলল, ওর কণ্ঠ শুনে হালকা ধাক্কা খেলাম।

"একটা গান শোনান না, বেন?" বলে ও কাউচের পাশের টেবিলের লাইটটা জ্বেলে দিল। আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলাম, ম্লান আলোয় তা পেঁচার চোখের মত লাগতে লাগল। ওর চেহারা গোলাপি হয়ে আছে, মাথার চুল দেখে মনে হচ্ছে কালো রঙের কাকের বাসা একটা।

"হুম," বললাম, "আমারও গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে।" আমি ড্রেসিং রুমে গিয়ে দেরাজ থেকে গিটারটা নিয়ে এলাম, দরজা বন্ধ করতে যেতেই লম্বা আয়নাটায় আমার পূর্ণ প্রতিবিম্ব খেয়াল হলো।

আমি মন দিয়ে তাকালাম সেদিকে, কারণ মনে হচ্ছিল একজন অচেনা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোঁকড়া কালো চুল চৌকো মুখটার উপর লেপ্টে আছে, চোখগুলো কালো আর মেয়েদের মত পাপড়ি তাতে, গরিলার মত ভারি চোয়াল আর লম্বা কপাল। অচেনা লোকটা আমার দিকে চেয়ে হাসলো, খানিকটা লজ্জিত–খানিকটা গর্বিত।

আমি আমার কিম্ভুত, কুঁজো দেহটার দিকে তাকালাম একবার, সেই শৈশব থেকে এটার জন্য আমাকে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। হাত আর পাদুটো অতিরিক্ত বড়, বেশ মোটা আর এখানে সেখানে মাংস দলা পাকিয়ে আছে...অনেকটা দানবের শরীরের মত। অবচেতন মনেই রুমের এক পাশে রাখা শরীরচর্চার ডাম্বেলগুলোর দিকে তাকালাম আমি–তারপর আবার তাকালাম আয়নার দিকে। শরীরের দুই প্রান্তে আমি নিখুঁত–ঝামেলা শুধু মাঝের দিকটায়। হোঁতকা, কুঁজো আর ব্যাঙের মত একটা ধড়; রোমশ, কালো লোমে ভরা। আমি এই অনন্য সাধারণ দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, জীবনে প্রথমবারের মত, দেহটাকে দেখে ঘেন্না হলো না!

স্যালি তখনও শুয়ে ছিল বানরের চামড়া দিয়ে আচ্ছাদিত নরম কাউচটায়। আমিও কাছে গিয়ে চড়ে বসলাম সেটায়, তারপর ওর পাশে পা ভাঁজ করে বসে গিটারটা কোলে তুলে নিলাম।

"দুঃখের গান শোনান–প্লিজ, বেন," ফিসফিসিয়ে বলল স্যালি।

"কিন্তু আমার মনে তো অনেক আনন্দ, স্যাল।"

"দুঃখের গানই গান তবু–আপনার নিজস্ব কোনো দুঃখের গান," জোর করল স্যালি। আমি গিটারে টুংটাং শুরু করতেই চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম, কারণ এর আগে কোনো নারী দেহ এভাবে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি আমার। বাজানোর সুবিধার জন্য একটু ঝুঁকে বসলাম সামনের দিকে। আমার চোখ ওর শরীরের বাঁকগুলো থেকে সরছেই না, কোথাও মসৃণ সমভূমি, কোথাও গোলাকার আবার কোথাও ছায়া ঘেরা। এই মাংসপিণ্ডের সাথে ঘর্ষিত হয়েছে আমার নিজের পেশী–আহ কত ভালোই না লেগেছিল!

গাইতে শুরু করলাম আমিঃ

'In the lonely desert of my soul,
The nights are long,
And no other traveller journeys there.
O'er the lonely oceans of my mind
The winds blow strong!'

খানিক পরেই দেখা গেল, স্যালির বন্ধ দু'চোখের পাতার ফাঁক দিয়েই অশ্রু বের হতে শুরু করেছে; কারণ আমার কণ্ঠে জাদু আছে, হাসি আর কান্না দুটোই তার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য। গলা আর আঙুল ব্যথা হওয়ার আগ

পর্যন্ত গেয়েই গেলাম আমি। তারপর গিটারটা একপাশে নামিয়ে রেখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। চোখ না খুলেই ও নিজের চেহারাটা আমার দিকে খানিকটা হেলিয়ে দিল।

"লোরেন স্টারভেসান্টের সাথে খাতির হলো কীভাবে আপনার?" বলল ও। "ব্যাপারটা আমার বোঝা দরকার।"

প্রশ্নটা শুনে এতটাই অবাক হয়েছিলাম যে, প্রথমে কিছু বলতে পারলাম না। চোখ খুলে ফেলল স্যালি।

"স্যরি, বেন। আপনি না চাইলে–"

"না, না," তাড়াতাড়ি বললাম আমি। "বলতে কোনো সমস্যা নেই। তবে, তুমি আসলে ওনার সম্পর্কে ভুল ভাবছো। আমার মনে হয় সাধারণ মানুষকে তুমি যে পাল্লায় মাপো, তাদেরকে–মানে স্টারভেসান্টদেরকে, সেই পাল্লায় মাপতে পারবে না। লোরেন আর ওনার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন থেকেই তাদের সাথে পরিচয়। আমার বাবাও কাজ করতেন ওদের ওখানে। মা মারা যাওয়ার পর বাবা এতটাই কষ্ট পেয়েছিলেন যে এক বছরের মাথায় উনি নিজেও মারা যান। মিস্টার স্টারভেসান্ট আমার ভালো রেজাল্টের ব্যাপারে জানতেন, তাছাড়া আমার বাবাও ছিলেন একজন কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী। আমাদের মত কয়েকজন আছি, *স্টারভেসান্ট এতিম*। আমরা সবসময় জীবনে সেরা জিনিসটাই পেয়েছি। আমি পড়তাম মাইকেল হাউসে, লোরেন যেখানে পড়ত, সেখানেই। একটা চার্চ স্কুলে একজন ইহুদি, তার সাথে একজন পঙ্গু–কাণ্ডটা ভেবে দেখো। ছোট ছেলেপিলেরা চরম মাত্রার নির্মম মানসিকতার প্রাণী। একবার চার-পাঁচজন মিলে আমাকে চেপে ধরে বাথরুমের পানিতে চোবানোর চেষ্টা করে, লোরেন এসে উদ্ধার করে আমাকে। এরপর ওদেরকে এমন প্যাদানো প্যাদায় যে আর আমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পেতো না ওরা। তারপর থেকেই ও আমার জিম্মাদার। এখনও সেটাই চলছে। ইনস্টিটিউটের সব টাকা পয়সা ও-ই দেয়, প্রতিটা পয়সা। প্রথমে ও কাজটা শুরু করেছিল শুধু আমার জন্য, কিন্তু একটু একটু করে আরও বেশি বেশি জড়িয়ে পড়েছে এর সাথে। এটা ওর শখ, আমার জীবন–তুমি অবাক হয়ে যাবে ওর পড়াশোনার বহর জানলে। ও এই দেশটাকে ভালোবাসে, ঠিক আমি আর তুমি যতটা বাসি। ইতিহাস আর ভবিষ্যৎ নিয়ে লোরেন এতটাই তৎপর, যতটা আমি আর তুমি চাইলেও কখনও হতে পারবো না–" থেমে গেলাম আমি, কারণ স্যালি আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যে, মনে হলো আমার আত্মাও ছিদ্র করে ফেলবে।

"ওকে ভালোবাসেন আপনি, তাই না বেন?"

চেহারায় রক্ত জমলো আমার, চোখ বন্ধ করে ফেললাম। "এই কথা থেকে কীভাবে–"

“ওহ, ঈশ্বরের কসম, বেন,” অধৈর্য হয়ে থামিয়ে দিল আমাকে ও। “আমি উল্টাপাল্টা কিছু বুঝাইনি। আপনি খানিক আগে সেটার উল্টোটাই প্রমাণ করেছেন। ভালোবাসা বলতে আমি বাইবেলের ভালোবাসাকে বুঝিয়েছি।”

“লোরেন আমার কাছে একই সাথে বাবা, রক্ষাকারী, পৃষ্ঠপোষক আর বন্ধু। আমার একমাত্র বন্ধু। হ্যাঁ, তুমি বলতে পারো যে ওকে ভালোবাসি আমি।”

স্যালি হাত বাড়িয়ে আমার গালে হাত দিল।

“আমি ওকে পছন্দ করার চেষ্টা করবো। শুধু আপনার জন্য।”



গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল এয়ারপোর্টের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম যখন, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি পুরোপুরি। নিজের কোটের ভেতর জবুথবু হয়ে আছে স্যালি, চুপচাপ আর আনমনা। আদর আর কথাবার্তায় ভরা ঘুমহীন একটা রাত কাটানোয় আমারও মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছিল। স্টারভেসান্টদের ব্যক্তিগত হ্যাঙ্গারে ফ্লাডলাইট জ্বলছে, রানওয়ের শেষ মাথায় সেটা। সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখলাম লোরেনের ফেরারিটা ওর জন্য সংরক্ষিত জায়গায় পার্ক করা, পাশেই কমপক্ষে আরও হাঁফ ডজন নানান মডেলের গাড়ি সেই আলোয় ঝিলিক মারছে।

“ওহ গড,” গুঙিয়ে উঠলাম আমি। “ও তো দেখি বিশাল এক দল নিয়ে এসেছে!”

ফেরারির পাশেই পার্ক করলাম আমি, তারপর স্যালি আর আমি আমাদের জিনিসপত্র গাড়ির বুট থেকে নামানো শুরু করলাম। স্যালি ওর ইজেলটা বের করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, এক হাতে নিল ছবি আকার কাগজের এক বিশাল বাণ্ডিল, অন্য হাতে রঙ; তারপর হ্যাঙ্গারের সরু দরজাটা দিয়ে চেপেচুপে ঢুকে গেল। আমারও উচিত ছিল ওর সাথে যাওয়া, কিন্তু নিজের জিনিসপত্র বের করা নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে তিন-চার মিনিট দেরি হয়ে গেল সেদিকে যেতে। কিন্তু গিয়ে দেখি দেরি করে ফেলেছি।

খাটো দরজাটা পেরিয়ে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হ্যাঙ্গারের ভেতরে পা রাখামাত্র বিপদাশঙ্কায় পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠলো আমার। চকচক করতে থাকা লিয়ার জেটের হাঙ্গরের মত আবছায়াটা এরকম টানটান পরিস্থিতির জন্য একদম উপযুক্ত একটা পটভূমির কাজ করছে। দুজন

ব্যক্তিকে ঘিরে স্টারভেসান্টদের সাতজন বিওয়াইএম দুটো বৃত্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময়েও ওদের পরনে নির্দিষ্ট পোশাক–দারুণ দেখতে সাফারি স্যুট আর ভেড়ার লোমের ফার কোট।

খুব বিরল ক্ষেত্রেই লোরেন স্টারভেসান্ট মেজাজ হারায়, যদি হারায়, তাহলে সেটা অবশ্যই দীর্ঘ সময় ধরে চরম মাত্রার খোঁচাখুঁচির ফলেই। যাই হোক, মাত্র দুই মিনিটেই স্যালি বেনাটর সেই অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে, যা তার আগের বহু বিশেষজ্ঞ ধারে কাছেও যেতে পারেনি। লোরেনকে দেখা গেল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাগের চোটে কাঁপতে কাঁপতে ঠোঁট চেপে রাগ সামলানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা দেখে ওর সাতজন বিওয়াইএম-ও বিহ্বল হয়ে বুঝতে পারছে না যে কী করবে।

স্যালি নিজের জিনিসপত্র কংক্রিটের মেঝের উপর রেখে ওর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে, মানে নিতম্বে মুষ্টিবদ্ধ হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চেহারাও রাগে গনগন করছে, অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে ঝলসে দেওয়ার চেষ্টা করছে লোরেনকে।

"ডক্টর কাজিনই বলেছেন যে আমি যেতে পারবো।"

"বালছাল কথা যদি ইংল্যান্ডের রাজাও বলে থাকে, তবুও আমার কিছু যায়-আসে না। আমি বলছি যে বিমানে আর জায়গা নেই–বিগত ছয় মাসে প্রথম যে ছুটিটা পেলাম, সেটায় কোনো মহিলাকে টেনে নেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার।"

"আমি বুঝতে পারিনি যে আমরা আসলে কোনো প্রমোদ–"

"কেউ এই বদমাইশ মহিলাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও।" চেঁচিয়ে উঠলো লোরেন। সঙ্গে সঙ্গে বিওয়াইএমরা সেই উদ্দ্যেশেই এগোতে লাগল স্যালির দিকে। মেয়েটা ভারি কাঠের ইজেলটা তুলে নিয়ে দুই হাত দিয়ে ধরে দাঁড়ালো। তা দেখে থেমে দাঁড়ালো সবাই। আমি এই সুযোগে দ্রুত ছুটে গিয়ে লোরেনের হাত টেনে ধরলাম।

"প্লিজ, লো। একটু কথা শোনো আমার।" আমি প্রায় টানতে টানতে ওকে ফ্লাইট অফিসের দিকে নিয়ে গেলাম–তবে আমার মনে হলো যে ওখান থেকে টেনে নেওয়ায় লোরেনও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

"শোনো, আমি খুবই দুঃখিত, লো। আমি আসলে তোমাকে ব্যাপারটা বলার সময় পাইনি–"

পাঁচ মিনিট পর লোরেন লম্বা পা ফেলে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর স্যালি বা ওর হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিওয়াইএমগুলোর দিকে এক পলকও না তাকিয়ে সোজা গিয়ে উঠে গেল বিমানে। এক মুহূর্ত পর ককপিটে পাইলটের পাশের জানালায় ওর চেহারা দেখা গেল, হেডফোন ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।

আমি দেখতে কম বয়সী একজন বিওয়াইএম-এর কাছ গিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। "মিস্টার স্টারভেসান্ট আপনাকে বলেছেন, আপনি

যেন একটা বিমান ভাড়া করে একাই গাবেরোনসে যান।" তারপর বাকিদের দিকে ফিরে বললাম, "কষ্ট করে একটু আমাদের মালপত্রগুলো আগে তুলে দিলে ভালো হয়।"

আফ্রিকার সর্বোচ্চ বেতনধারী একদল এক্সিকিউটিভ যখন স্যালির জিনিসপত্র তুলে দিতে গেল, তখন ও নির্লজ্জ বিজয়ীর মত মুখ বাঁকিয়ে হাসতে লাগল। আমি ফিসফিস করে একটা ধমক দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

"পেছনের সিটে বসবে," রেগে বললাম আমি। "আর তুমি যে আছো সেটা যেন টের না পায় কেউ। একেবারে কানের পাশ দিয়ে গুলিটা গেল, বুঝেছো? শুধু এই ভ্রমণই বাতিল হতো না তোমার, চাকরিটাও হারানোর উপক্রম করেছিলে।"

বিমান আকাশে ওড়ার দশ মিনিট পর পাইলট ককপিট থেকে বেরিয়ে সোজা আমাদের সিটের দিকে এগিয়ে এল। তারপর সিটের পাশে থেমে দাঁড়িয়ে খোলাখুলি প্রশংসার চোখে দেখতে লাগল স্যালিকে।

"জেসাস, ম্যাডাম।" মাথা নাড়তে লাগল সে। "যা দেখালেন, সেটা দেখতে আমি এক মাসের বেতনও ছেড়ে দিতে রাজি ছিলাম! দারুণ!"

স্যালি এতক্ষণ আমার ধমক খেয়ে চুপচাপই ছিল, কিন্তু এ কথা শুনে সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠলো বলা যায়।

"আরে এই সাইজের বাচ্চা পোলাপান তো আমি ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে," ঘোষণা দিল ও। দুয়েকজন বিওয়াইএম-এর কানেও গেল কথাটা। ওরা ওদের সিট থেকে স্যালির দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো।

পাইলট হো হো করে কিছুক্ষণ হেসে আমার দিকে ফিরলো। "স্যার আপনার সাথে কথা বলতে চান, ডক্টর। আমি আপনার জায়গায় বসছি, দেখা করে আসুন।"

লোরেন রেডিয়োতে ফ্লাইট কন্ট্রোলের সাথে কথা বার্তা বলছিল, আমাকে দেখে কো-পাইলটের সিটে বসতে ইশারা করল। আমি চেপেচুপে সিটটায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কথা শেষ করে ফিরলো সে আমার দিকে।

"ব্রেকফাস্ট?"

"খেয়েছি।"

কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে, পাশের বিশাল ঝুড়িটা থেকে আমাকে একটা কোল্ড টার্কির পা এগিয়ে দিল, সাথে মুরগির মাংস আর ডিম দিয়ে বানানো বিশাল একটা পিঠা।

"থার্মোসে কফি আছে। নিয়ে নাও।"

"পঁচিশ মিলিয়ন ডলার ঋণ পেয়েছো?" মুখভর্তি খাবার নিয়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, তবে শেষ মুহূর্তে ঝামেলা বেঁধে গিয়েছিল।"

"হঠাৎ টাকা ধার করতে হলো তোমাকে, লো? অবস্থা কি বেশি খারাপ যাচ্ছে?"

"তেল প্রক্রিয়াজাতকরণে ঝুঁকি অনেক বেশি," আমার কথা শুনে হেসে বলল লোরেন। "জুয়া আমি অন্যের টাকা নিয়ে খেলতে ভালোবাসি, যেখানে নিশ্চয়তা আছে সেখানে খাটাই নিজের টাকা।" তারপর ও প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। "ঘুরপথে যাওয়ার জন্য দুঃখিত। আমি আমার লোকদের গাবেরোনসে নামিয়ে দেব। বতসোয়ানা সরকারের সাথে বেশ কিছু মিটিং আছে ওদের। গৎবাঁধা কাজকর্ম। ওই জমির অনুমোদনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা আরকী। যাই হোক, আমাদের গন্তব্য থেকে বেশি দূর না। এরপর আমরা আমরাই যেতে পারবো বাকিটা।" লোরেন নিজের মুখেও টার্কি ভরে গব গব করতে করতে কথা বলতে লাগল। "আবহাওয়ার খবর বিশেষ ভালো না। পুরো উত্তরাঞ্চলে কালো মেঘের আনাগোনা। প্রতি তিন বছরে মাত্র একবার মরুভূমি এলাকায় এত নিচ দিয়ে মেঘ উড়ে যায়–কিন্তু আমরা সেটার কবলেই পড়তে যাচ্ছি। যাই হোক আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো ওখানকার পাহাড় আর ধ্বংসাবশেষগুলো উপর থেকে যতটা সম্ভব দেখার, না দেখতে পারলেও খুব বেশি ক্ষতি হবে না। এত উপর থেকে খুব বেশি কিছু জানা-ও যাবে না।" লোরেনকে বেশ সহজ আর উৎফুল্ল লাগছে, কিছুক্ষণ আগের রাগের ছিটেফোঁটাও নেই, ও যেন ব্যাপারটা ইচ্ছেমতো সুইচ টিপে চালু আর বন্ধ করতে পারে। গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলাম দুজন মিলে। ওর মেজাজ সম্পর্কে ধারণা আছে আমার: এখন ছুটির দিন, এর মানে হচ্ছে মুক্তি। আর তাই এই দিনটার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে ও। হারানো শহর থাকুক আর না থাকুক, ওর ভালোবাসার বন্য দেশটায় ঘুরে বেড়ানোর এ এক অজুহাত মাত্র।

"পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর! বেন, আমরা দুজনে একসাথে বের হই না কতদিন বলো তো? দশ বছর তো হবেই। অরেঞ্জ নদীতে ক্যানু নিয়ে ঘোরার কথা মনে আছে? কখন গেলাম যেন? উনিশশো ছাপান্ন নাকি সাতান্ন? তারপর বুশম্যান খুঁজে বের করার সেই অভিযানটা মনে পড়ে?"

"আমাদের আরও বেশি বেশি ঘুরতে যাওয়া উচিত, লো।"

"অবশ্যই," বলল ও। মন থেকে যে কথাটা বলছে সেটাও বুঝলাম আমি। তবে চাইলেই ও পারবে না। "কিন্তু হাতে যে সময় খুব কম। আর সেটুকুও ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুতই। আগামী বছর বয়স চল্লিশ হবে আমার।" কণ্ঠ ভরা আক্ষেপ ওর। "ঈশ্বর, যদি টাকা দিয়ে সময় কেনা যেত!"

"পাঁচদিন আছে আমাদের হাতে," বললাম আমি, এসব চোরাবালি আলোচনা থেকে কথার মোড় ঘোরানোটাই উদ্দেশ্য। আর লোরেনও আগ্রহ

সহকারে মেনে নিল সেটা। আরও আধা ঘণ্টা কথা বার্তার পর স্যালির কথা পাড়লো ও।

"তোমার ওই সহকারী, পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা নাকি? নাম কী ওর?"

আমি নাম জানালাম ওকে।

"ইটিশ-পিটিশ করো নাকি ওর সাথে?" জিজ্ঞেস করল লোরেন। এত সহজে, কথার ফাঁকে বলে ফেলল যে আমি প্রথমে ধরতেই পারলাম না আসলে কী বোঝাতে চাইছে। কিন্তু বোঝামাত্র রাগে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, টের পেলাম রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়, গলা আর চেহারা দিয়ে ভাপ বের হতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল খুন করে ফেলি ওকে, কিন্তু তার বদলে খসখসে, কম্পিত গলায় মিথ্যা বললাম।

"না।"

"করলে ক্ষতি নেই," ঘোঁত ঘোঁত করে বলল ও। "একেবারে বাঘিনী একটা। যাই হোক, ভ্রমণটা মাটি না করলেই হয়।" তখন ওকে সব বলে দেওয়াটাই বোধহয় ভালো ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা খুব বেশি ব্যক্তিগত–এতোটা দামি আর নাজুক, যে মুখে বলে সেটার আমেজটা নষ্ট করতে ইচ্ছে করছিল না, বিশেষ করে লোরেনের ভাষা শোনার পর। এরপর প্রসঙ্গ বদলে গেল আবার, আমি বসে রইলাম চুপচাপ কিন্তু কাঁপুনি চলতেই থাকলো। আর পরের পাঁচদিন কী হবে, না হবে তা নিয়ে হালকা আলাপ চালিয়ে গেল লোরেন।

আমরা বিমানে থাকা অবস্থাতেই নিচের মেঘ ঘন হয়ে গেল আরও, দেখে মনে হলো: একটা নোংরা ধূসর কম্বল কেউ টেনে চার দিগন্তে মেলে দিয়েছে। সাউথ আফ্রিকা আর স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্র বতসোয়ানার সীমানা পেরিয়ে এলাম আমরা। গাবেরোনসে যখন নামলাম তখন মেঘ নেমে এসেছে এক হাজার ফুটের কাছাকাছি। যদিও লোরেন আশ্বাস দিয়েছিল যে খুবই দ্রুত আবার আকাশে উড়বো; কিন্তু দেখা গেল সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তারা দেখা করতে এসেছেন, ফলে এয়ারপোর্টের প্রাইভেট ডাইনিং রুমে দাওয়াত কবুল করতে হলো আমাদেরকে। গরম, চটচটে আবহাওয়া, সাথে ধান্দাবাজ শ্বেতাঙ্গ চেহারার লোকজন নরম আর লোভী সুরে কথা বলতে লাগল একদল কৃষ্ণাঙ্গ ধান্দাবাজদের সাথে–প্রত্যেকেই উত্তাপ আর হুইস্কির ঝাঁঝে ঘেমে নেয়ে একাকার, সেই সাথে সিগার আর সিগারেটের পুরু ধোঁয়ায় হাঁসফাঁস করছে।

প্রায় তিন ঘণ্টা বাদে লিয়ার জেটটা শুধু আমাদের তিন জনকে নিয়ে উড়াল দিল আবার। পুরু মেঘের চাদরটা ফুটো করে উপরে উঠতেই উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় ঝলসে গেল চোখ।

"ধূর!" বলে উঠলো লোরেন। "বাটে পড়ে টাকা খসে গেল অনেক। ওই কালা হারামি এনগিলান ওর বখরা আরও বিশ হাজার বাড়িয়ে নিল। টাকাটা

না দিয়েও উপায় নেই। ও চাইলে পুরো অনুমোদনটাই গড়বড় করে দিতে পারবে। তার মন্ত্রণালয়য়ের অধীনে সব।"

লোরেন কোলের উপর ম্যাপ রেখে উত্তর দিকে চালাতে লাগল বিমান। হাতে একটা স্টপওয়াচ। ও একবার কম্পাসের দিকে তাকাচ্ছে, আবার তাকাচ্ছে বিমানের গতির কাঁটার দিকে, আবার ফিরে তাকাচ্ছে ওয়াচের দিকে।

"ঠিক আছে বেন। রজারকে বসতে দাও এখন। দেখি মেঘের নিচে নেমে কিছু দেখা যায় কিনা।"

লোরেন আর পাইলট, রজার ভ্যান ডেভেন্টার, বিমান চালাতে লাগল; আমি আর স্যালি ওদের পেছনে ককপিটের দরজা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনের দিকে হেলে নোংরা মেঘের চাদরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল বিমানটা। একটু পরেই কয়েকবার ঝলকানি মেরেই আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেল সূর্য...ধূসর অন্ধকার কুয়াশা ঘিরে ধরলো আমাদেরকে।

রজার চালাচ্ছিল বিমান, ওর মনযোগ সম্পূর্ণ ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে, অল্টিমিটারের[১৩] কাঁটা ঘুরতে শুরু করতেই দেখলাম শক্ত হাতে হুইলটা চেপে ধরলো। আমরা না কেঁপে সোজা নেমে এলাম ধূসর চাদরটার নিচে। এবার রজার বিমানের পাখা আর এয়ারব্রেক টেনে দিয়ে গতি কমিয়ে আনল। আমরা বাকি তিনজন তাকিয়ে ছিলাম নিচের দিকে, যাতে মাটির এক ঝলক দেখা যায়। আমরা নিচে নামতেই থাকলাম। পাইলটের দুশ্চিন্তা এবার সত্যিকার ভয়ে রূপ নিল। বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলাম আমি, ওটার উৎকট স্যাঁতসেঁতে গন্ধ এসে লাগছিল নাকে। যদি এই অভিজ্ঞ পাইলটই ভয় পেয়ে যায়, তাহলে আমি আতংকিত হলে নিশ্চয়ই দোষ নেই? হঠাৎ মনে এল একটা কথা: লোরেনকে রাগাবার সাহস পাবে না রজার, দরকার হলে আমাদেরকে সোজা মাটিতে নামিয়ে দেবে! ঠিক করলাম কিছু একটা করতে হবে, তাই মুখটা খুললাম কিছু বলার জন্য। তবে কিছু বলার দরকার হলো না।

"বেশি নেমে গিয়েছো," স্টপওয়াচ দেখে বিরক্ত সুরে বলল লোরেন। "আস্তে, রজ।"

"স্যরি, মিস্টার স্টারভেসান্ট, মেঘের তল খুঁজে পাচ্ছিলাম না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত করে বলল রজার, তারপর লিয়ারটার নাক সোজা করে ফেলল। থ্রটল খুলে এয়ারব্রেক বন্ধ করে দিল।

"না। যাও!" স্বস্তির সাথে বিড়বিড় করে বললাম আমি। "দরকার নেই, লো। মাউনে চলো।"

লোরেন আমাকে দেখার জন্য মাথা ঘোরালো, কিন্তু চোখ পড়ল স্যালির দিকে। ও দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক লোরেনের কাঁধের পেছনে। আমি স্যালির

---

[১৩] উচ্চতা মাপার যন্ত্র

অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে ও নরম সুরে যে প্রশ্নটা করল, সেটা কণ্ঠ শুনেই বুঝে ফেললাম: "ভয় পেলেন নাকি?"

লোরেন ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হেসে দিল শেষমেশ। আমি চাইলে স্যালিকে আমার হাঁটুর উপর আছাড় মেরে ওর সুঠাম পিঠটাকে তক্তা বানিয়ে দিতে পারতাম। এক মিনিট আগেও যে নির্জলা ভয় আমি অনুভব করছিলাম, সেটা এখন ঠান্ডা, শরীর অসাড় করা আতংকে রূপ নিল। কারণ আমি এর আগেও লোরেনকে এভাবে হাসতে দেখেছি।

"ঠিক আছে, রজার," সিটের পাশের পকেটে ম্যাপ আর স্টপওয়াচটা ভরতে ভরতে বলল লোরেন। "আমি দেখছি এখন।" তারপর লোরেন বিমানটাকে ওটার একটা পাখাকে কেন্দ্র করে সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁক নিয়ে ঘুরিয়ে ফেলল। এত নিখুঁতভাবে কাজটা করা হলো যে, অভিকর্ষের টানে হাঁটু সামান্য বাঁকা হওয়া ছাড়া, স্যালি আর আমি আর কিছুই টের পেলাম না।

লোরেন বিমানটা সোজা করে আরও মিনিট তিনেক সেভাবেই চালালো। আবার আমাদের যাত্রাপথে ফিরে আসছে। আমি আড়চোখে স্যালির চেহারার দিকে তাকালাম। জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ, লাল হয়ে আছে উত্তেজনায়–সামনের দুর্লংঘনীয় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছে।

আবারও লোরেন গোত্তা মারা বন্ধ করে বিমানটা খাড়া নামিয়ে দিল নিচের দিকে। আগেরবারের মত এবারো বিমানের নাক ধেয়ে গেল নিচ বরাবর, তবে সাবধানতার জন্য পাখা বা থ্রটল টানা হলো না। লোরেন কোনো পরোয়া না করে ভয়ংকর গতিতে নামিয়ে আনতে লাগল আমাদেরকে। স্যালি আমার হাতটা টান দিয়ে চেপে ধরলো। ওদের দুজনের জন্যেই আমার ভয় আর রাগ দুটোই লাগছিল। এসব ছেলেমানুষির বয়স আর নেই আমার, তবে আমিও মেয়েটার হাত চেপে ধরলাম। শুধু ওর জন্য না আমার নিজের স্বস্তির জন্যেও।

"ক্রাইস্ট, লো," কোনোমতে বললাম আমি। "আস্তে, এমন করছো কেন!" কিন্তু সে কথা কারো কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। রজার ওর সিটে বরফ হয়ে বসে আছে, হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে চেয়ারের হাতল, দৃষ্টি সোজা সামনে। লোরেন বেশ শান্ত, তবে চেহারায় ধূর্তামি খেলা করছে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে। আর স্যালি, বদমাইশ মেয়েটার পুরো চেহারা হাসিতে ঝলমল করছে, আমার ঠান্ডা হাতটা এমনভাবে চেপে ধরে আছে যেভাবে বাচ্চারা রোলার কোস্টারে বাবার হাত চেপে ধরে থাকে।

আচমকাই বৃষ্টির ভেতর এসে পড়লাম আমরা, পার্স্পেক্সের তৈরি বাঁকানো উইন্ডস্ক্রিন বেয়ে পানির ধারা সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে যেতে

লাগল। আমি আবারও প্রতিবাদ করতে গেলাম, কিন্তু আমার শুকনো গলা দিয়ে স্বর বের হলো না। বাইরে এখন প্রচণ্ড বাতাস। লিয়ারের মসৃণ চকচকে শরীরটাকে দলাই-মলাই করছে আচ্ছামতো, পাখাগুলো ঝাঁকাচ্ছে। মনে হলো কেঁদেই ফেলবো বোধহয়। এখন অন্তত আমি মরতে চাই না। গতকালকে হলেও মরতে সমস্যা ছিল না, কিন্তু গত রাতে যা হলো, এরপরে এখনই না।

আমার নিজের সম্বিৎ ফেরার আগেই, নিচের মাটি চোখে পড়ল লোরেনের, জেটের নাকটা কতটা নেমে গিয়েছে সেটাও ধরতে পারলো ও। হালকা শিউরে উঠে বিমানকে মাটির সমান্তরালে নিয়ে এল ও, জড়তার কারণে আমি আর স্যালি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম।

শূন্য থেকে অন্ধের মত পতনের চাইতেও বেশি ভয়ংকর হলো অভিজ্ঞতাটা। নিচের ঘন বনের পাতা ও ঝরে যাওয়া গাছের মাথা বিমানের পাখাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে। আমাদের ঠিক সামনেই, বৃষ্টির অন্ধকারের ফুঁড়ে আচমকা একটা বিশাল বাওবাব গাছ উদয় হলো যেন কোত্থেকে! লোরেন সুন্দরমতো ওটার লোভীর মত হাতছানি দিতে থাকা ডালগুলো থেকে বাঁচিয়ে বিমানটা ওটার উপর দিয়ে নিয়ে এল। কয়েকটা সেকেন্ডে মনে হলো মহাকাল পেরিয়ে যাচ্ছে, এরপরেই জাদুমন্ত্রের মত বৃষ্টি আর মেঘ দুটোই গায়েব হয়ে গেল। এই ঝড়বৃষ্টির মাঝের এক খাপছাড়া বৃষ্টিবিহীন জায়গায় হাজির হলাম আমরা।

আমাদের ঠিক সামনেই, পুরো দৃষ্টি জুড়ে, ভেজা রোদে উদ্ভাসিত হয়ে আছে একটা লাল পাথরের খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল। শুধু এক ঝলক দেখা গেল যে লাল রঙের বিশাল একটা পাথর ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে; লোরেন তো পারলে বিমানটা একেবারে লেজের উপর দাঁড় করিয়ে ফেলে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য, একটুর জন্য বিমানের পেট ঘষা খেলো না ওটার সাথে। আমরা পাহাড়টা পেরিয়ে আবার তীরের মত ছুটে যেতে লাগলাম মেঘের দিকে। এদিকে অভিকর্ষের টানে হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে বাধ্য হলাম আমি।

উপরের সূর্যের আলো চোখে পড়ার আগে, কেউ একটা কথাও বলল না। স্যালি আলতো করে আমার মুঠি থেকে ওর হাত ছুটিয়ে নিল, লোরেন ওর সিট থেকে ঘুরে আমাদের দিকে তাকালো। ও আর স্যালি, দুজনকেই এতকিছুর প্রতিক্রিয়ায় খানিকটা বিমর্ষ লাগছে দেখতে পেয়ে বিমলানন্দ লাভ করলাম আমি। ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর লোরেন হেসে উঠলো হো হো করে।

“বেন-এর চেহারাটা দেখো একবার!” গর্জে উঠলো ও, স্যালির কাছেও ব্যাপারটা মজার লাগল বেশ। দুজনের হাসি থামলে স্যালি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল:

"কেউ কি ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছেন? আমার চোখে পড়ল শুধু পাহাড়, কেউ কি ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছেন?"

"আমি শুধু দেখেছি সরষের ক্ষেত," বিড়বিড় করে বলল রজার।

ওর আসলে কেমন লেগেছে তা ভালোই জানি আমি।



আমরা মাউনে পৌঁছতে পৌঁছতে মেঘ কেটে যেতে শুরু করল। রজার একটা সমতল জায়গা খুঁজে বের করে বিমানটা মসৃণভাবে নামিয়ে আনল মাটিতে, পিটার লার্কিন অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য।

পিটারের মত লোক আজকাল বিলুপ্তির পথে। ওকে দেখলে মন হয় ভুল করে এই যুগে এসে পড়েছে। বুশ জ্যাকেটের বুকে গোল করে চর্বির টোটা লাগানো, প্যান্টের প্রান্ত মস্কুইটো বুটের ভেতরে গোঁজা। বিশাল লাল থলথলে একটা চেহারা ওর, সাথে হাত দুটোও বিশাল। ভারি রাইফেলের ধাক্কা খেতে খেতে ডান হাতের তর্জনিতে কড়া পড়ে গিয়েছে। হুইস্কি খাওয়া গমগমে গলায়, না চেঁচিয়ে ও কারো সাথে কথা বলতে পারে না। লোকটার বলতে গেলে কোনো অনুভূতিই নেই, বুদ্ধি আছে কোনোমতে এক ছটাক...ফলশ্রুতিতে ভয় কী জিনিস, সেই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। ও প্রায় সারাটা জীবন ধরেই আফ্রিকায় আছে, কিন্তু কখনোই স্থানীয় ভাষা শেখার কষ্ট করতে যায়নি। সাউথ আফ্রিকার লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা[১৪] তথা পাঁচমিশালী ফানাগালো ভাষা ব্যবহার করে, সেই সাথে কথায় জোর দেওয়ার জন্য হাতের মুঠি আর বুট তো আছেই। যেসব প্রাণী শিকার করে বেড়ায়, সেসব সম্পর্কে ওর জ্ঞান শুধু কোথায় ওগুলো পাওয়া যাবে আর কোথায় গুলি করলে সহজেই মারা যাবে–এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তবুও কেন যেন এই হস্তীসদৃশ আলাভোলা লোকটার প্রতি মায়া জন্মে যায়।

পিটারের শিকারি দলের ছেলেরা আমাদের মালামাল ট্রাকে তুলতে শুরু করতেই ও আমার আর লোরেনের দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে চিৎকার করে নানান অর্থহীন কথা বার্তা বলতে লাগল।

"আপনাদের সাথে যেতে পারলে খুবই ভালো লাগতো। কয়েকজন ইয়াঙ্ক[১৫] আসবে কাল–সাথে আনবে বস্তা বস্তা সবুজ ডলার। আপনি আমাকে

---

[১৪] সবাই ব্যবহার করতে পারে এমন ভাষা

[১৫] অ্যামেরিকান

খুবই শর্ট নোটিশ দিয়েছেন মিস্টার স্টারভেসান্ট। তবে আমার সেরা ছেলেদেরকেই সাথে দিচ্ছি আপনাদের। দক্ষিণে ভালোই বৃষ্টি হয়েছে, এখন তাই শিকার পেতে সমস্যা হবে না। বছরের এই সময়টায় জেমসবক[১৬] পাওয়া যায়। জাম্বো[১৭] তো পাবেনই। দুই একটা সিম্বা[১৮] মারতে পারলেও অবাক হবো না–"

একটু পর শিকার করবো এসব পশু পাখিকে এরকম পোষা নামে ডাকতে শুনে বিরক্ত লাগল আমার, বিশেষ করে আমাদের ইচ্ছা যখন ভারি রাইফেলের গুলি দিয়ে ওগুলোর কল্লা উড়িয়ে দেওয়ার। আমি স্যালির কাছে চলে গেলাম, মেয়েটা আমাদের মালপত্র ওঠানো তদারক করছে।

"একটা বেজে গিয়েছে কিন্তু," অভিযোগ করল ও। "রওনা হবো কখন?"

"রাতের মধ্যে সম্ভবত মাকারিকারি প্যান-এর চূড়াটা পার হতে পারবো। রাস্তা ভালো থাকলে দুইশো মাইলের মত। কাল সকালে ঢুকবো জঙ্গলের গভীরে।"

"আর্নেস্ট হেমিংওয়েও আসবেন নাকি আমাদের সাথে?" দূরে দাঁড়ানো পিটার লার্কিনের দিকে চোখের ইশারা করে জানতে চাইলো সে।

"সেই সৌভাগ্য হবে না," আশ্বস্ত করলাম ওকে। আমাদের সাথে যারা যাচ্ছে, তাদের সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগলাম আমি। দুজন ড্রাইভার, এদেরকে সামনাসামনি না দেখে শুধু গায়ের সাদা শার্ট, লম্বা ধূসর প্যান্ট আর নাল বসানো জুতা দেখলেও দানবাকৃতি সম্পর্কে বোঝা যেত। দুটো তিনটনি ট্রাকের জন্য দুজন। এরপর আছে বাবুর্চি একজন, দলের অন্যদের চাইতে এর ওজন অনেক বেশি, সবসময় ভালো খাবার পাওয়ায় চামড়া চকচক করছে। দুজন গাট্টাগোট্টা, ধূসর চুলের বন্দুকবাজ আছে, ওরা মালপত্রের ভেতর থেকে লোরেনের শিকারের রাইফেলগুলো বের করার সময় জুলজুল করে তাকিয়ে ছিল। এখন সেগুলোকে কেস থেকে বের করে উল্টেপাল্টে দেখছে, পরম মমতায় হাত বুলাচ্ছে সারা গায়ে। এরাই কিন্তু স্থানীয়দের মাঝে সবচাইতে উচ্চপদস্থ। একদিকে ক্যাম্প বয়রা উত্তেজিত হয়ে হট্টগোল করতে করতে আমাদের মালপত্র ওঠা-নামা করছে, সেদিকে বন্দুকবাজদের একদম ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকগুলোর বেশিরভাগই বামাংওয়াটো, আমি ওদের কথাবার্তা শুনলাম কিছুক্ষণ। বন্দুকবাজ দুজন যথারীতি ম্যাটাবেল গোত্রের, ড্রাইভারা শাঙ্গান। এই অভিযাত্রার প্রতিটা লোকের ভাষা বুঝতে পারবো আমি।

---

[১৬] বড় আকৃতির অ্যান্টিলোপ

[১৭] হাতি

[১৮] সিংহ

"ভালো কথা, স্যাল," নিচু স্বরে ডাকলাম আমি, "কাউকে বোলো না যে আমি ওদের ভাষা জানি।"

"কেন?" অবাক হলো ও।

"আমি চাচ্ছি ওদের দিকে নজর রাখতে। যদি জেনে ফেলে যে আমি ওদের ভাষা জানি, তাহলে টুঁ শব্দটাও করবে না।"

"স্ভেংগালি![১৯]" বাংলা পাঁচের মত মুখ করে বলল ও। অন্য কেউ এই নামে ডাকলে হয়তো আমি কথাটা শুনে হাসতাম না। কারণ ব্যাপারটা অশোভনও বলা চলে। আমরা পাইলট রজারকে বিদায় দিতে এগিয়ে গেলাম।

"সিংহগুলোকে ভয় দেখাতে যাবেন না," করমর্দন করতে করতে স্যালিকে বলল রজার্স। দেখাই যাচ্ছে, আরও একজনকে বশ করে ফেলেছে ও। রজার বিমানে উঠে গেলে আমরা দলবেঁধে দেখতে লাগলাম বিমানটাকে। রানওয়ের শেষ মাথা পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে সাঁই করে উপরে উঠে দক্ষিণ দিকে উড়ে চলে গেল সেটা।

"আমরা কেন বসে আছি?" লোরেন জিজ্ঞেস করল।

"আসলেই তো!" আমিও সায় দিলাম।

লোরেন ল্যান্ড রোভারটার ড্রাইভিং সিটে বসতেই আমি চড়ে বসলাম ওর পাশে। স্যালি বসল পেছনের সিটে আর বন্দুকবাজরা বেঞ্চ সিটগুলোয়।

"তোমাদের দুজনের পাগলামির পর আমার মনে হচ্ছে–মাটির উপরের এই জঘন্য জায়গাটাও বেশি নিরাপদ।"



রাস্তাটা চলে গিয়েছে ছোট ছোট ঝোঁপ আর বাওবাব গাছ দিয়ে ভরা একটা এলাকার ভেতর দিয়ে। রোদে পুড়ে ঝলসে আছে সব। ল্যান্ড রোভারের চাকার ঘষায় রাস্তার দুধারে ধুলো উড়তে শুরু হলো, বাকি ট্রাক দুটো তাই একটু দূরত্ব বজায় রেখে আসতে লাগল যাতে ধুলো থিতিয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

মাঝে মাঝে ঢালু জায়গা পড়ছে, ওগুলো আসলে পাথরে ভরা শুকিয়ে যাওয়া নদীবক্ষ। কিছুদূর পরপর চোখে পড়ছে গ্রাম; কাদামাটির দেওয়াল আর ছন দিয়ে ছাওয়া ঘর দিয়ে ভরা। গাড়ির আওয়াজ পেলেই সেগুলো থেকে ন্যাংটো, পেটমোটা কালো বাচ্চাগুলো বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে নেড়ে গান গাইতে লাগল, যেন আমরা রাজকীয় বহর নিয়ে চলেছি। স্যালি ওদের দিকে

---

[১৯] জর্জ দ্যু মরিয়ের উপন্যাসের চরিত্র

কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিতেই সেগুলো কুড়ানোর জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল, তা দেখে বিমলানন্দে হাততালি দিতে লাগল ও, কিন্তু পয়সা ফুরিয়ে গেল কিছুক্ষণ পরেই। এরপর যখন মেয়েটা আমাদের দুপুরের খাবার ছুঁড়ে মারা শুরু করল, তখন ওর মনোযোগ সরানোর জন্য গিটার বের করে হাতে নিলাম।

"আনন্দের গান গান, বেন," স্যালি অনুরোধ করল।

"একটু রগরগে হলে ভালো হয়," যোগ করল লোরেন। আমার ধারণা ও স্যালিকে খোঁচা দিতে কথাটা বলল, আবার পরীক্ষা করতেও হতে পারে।

"হ্যাঁ," সাথে সাথে সম্মতি দিল স্যালি। "আনন্দের আর অশ্লীল, দুটোই একসাথে।"

আমি Wild, Wild Duck-এর কাহিনি দিয়ে শুরু করলাম। স্যালি আর লোরেন প্রতি অন্তরার শেষে চিৎকার করে গলা মেলাতে লাগল।

আমাদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল স্কুলের বাচ্চারা পিকনিক করতে যাচ্ছে যেন প্রথমবারের মত, পুরো সমভূমি জুড়ে ভালোই চালিয়ে গেলাম আমরা। সমভূমি পেরিয়ে এলাম যখন, তখন দিগন্তের মাঝে মাঝে কিছু ছেঁড়া তুলোর মত মেঘের ফাঁকে সূর্য যেন বিশাল আগুনের বল হয়ে উঁকি দিচ্ছিল। লোরেন ল্যান্ড রোভারটা পার্ক করল একপাশে, আমরা বেরিয়ে এসে ট্রাকগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কোনো কথা হলো না, তিনজনই রুদ্ধশ্বাসে চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম সামনের নির্জন, ঝকঝকে লবণের সমভূমির দিকে। যতদুর চোখ যায়, আশপাশে আর কিছুই নেই।

ট্রাকগুলো কাছাকাছি এসে পুরোপুরি থামার আগেই লাফিয়ে নেমে কাজ শুরু করে দিল কৃষ্ণাঙ্গ চাকরের দলটা। ঘড়ি ধরে দেখলাম: সাড়ে সতেরো মিনিটের ভেতরে তাঁবু টাঙ্গিয়ে ভেতরের ক্যাম্প বেডও পাতা হয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পর আমরা তিনজন আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে গ্লেন গ্রান্ট মল্ট পান করতে লাগলাম। ভেতরে ঝকঝকে বরফ দেওয়ায় গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানির ফোঁটা জমে আছে। রান্না হচ্ছে যেখানে, সেখান থেকে ভেসে আসছে হান্টার'স পট-এর[২০] জিভে জল এনে দেওয়া সুবাস। আমাদের বাবুর্চি সেটায় আরও বেশি করে আদা আর অরিগ্যানো দিয়ে জ্বাল দিচ্ছে। লার্কিন আমাদেরকে বেছে বেছে হাসিখুশি আর ভালো একটা দলই দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা আমাদের থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে নিজেরাও আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে শিকারের গান গাইতে শুরু করল। চমৎকার গানে রাতটা মধুর হয়ে উঠলো আরও।

আমি বসে বসে কিছুক্ষণ ওদের গান শুনলাম, আবার কিছুক্ষণ শুনলাম স্যালি আর লোরেনের ঝগড়া। একবার ভেবেছিলাম স্যালিকে সতর্ক করে দেই যে লোরেন আসলে ওকে নিয়ে খেলছে, আবারও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রাগিয়ে

---

২০ স্ট্যু জাতীয় খাবার

দিচ্ছে ওকে; কিন্তু এরকম চমৎকার দুটো মনের বাদানুবাদ ভালোই লাগছিল আমার। যখনই দেখা যেতে লাগল যে আলোচনা ব্যক্তিগত আক্রমণের দিকে চলে যাচ্ছে বা হাতাহাতির উপক্রম হচ্ছে, তখন আমি না চাইতেও ওদের মাঝে হাত ঢুকিয়ে আবার ঠান্ডা করে দিচ্ছিলাম।

স্যালি গোঁয়ারের মত আমার *ওফির* বইতে উল্লেখিত একটা অমুনানভিত্তিক অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে তর্ক করছিল। সেটা হচ্ছে–ফিনিশিয়ান অথবা কার্থেজিনিয়ানরা ২০০ খ্রিস্টপূর্বের দিকে মধ্য আফ্রিকা দখল করে নেয়, প্রায় ৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল সেই সভ্যতা। এরপর আচমকাই গায়েব হয়ে যায়।

"সেই সময় ওদের এখানে আসার জন্য যে সমুদ্রাভিযান দরকার, সেটা সফল ভাবে করার মত যন্ত্রপাতিই ছিল না!" লোরেন পাল্টা জবাব দিল। "বসতি স্থাপনের কথা বাদই দিলাম..."

"সে দেখা যাবে, মিস্টার স্টারভেসান্ট; রাজা নিকোর আমলে আফ্রিকার চতুর্দিকের একটা সমুদ্র অভিযানের কথা হেরোডেটাস লিখেছেন। ছয়জন ফিনিশিয়ান নাবিক ছিলেন এর নেতৃত্বে। ছয়শো খ্রিস্টপূর্ব বা এর আশপাশের কথা এটা। ওরা লোহিত সাগরের মাথা থেকে থেকে যাত্রা শুরু করে, তিন বছর পরে পিলার অভ হারকিউলিস দিয়ে ফিরে যায়।"

"সে বিচ্ছিন্ন এক অভিযান," ধরিয়ে দিল লোরেন।

"মোটেও বিচ্ছিন্ন অভিযান না, মিস্টার স্টারভেসান্ট। হান্নো চারশো ষাট খ্রিষ্টপূর্বে জিব্রাল্টার থেকে অভিযান শুরু করে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণের একটা জায়গায় পৌঁছান, সেখানে পণ্য বিনিময় করে ওনারা এত এত হাতির দাঁত আর স্বর্ণ নিয়ে যান যে তা দেখে বাকি ব্যবসায়ীদের জিহ্বাও লকলক করে উঠতে সময় লাগেনি।"

কিন্তু লোরেন ওর বলা সময়কাল সম্পর্কে প্রশ্ন তুললো। "দুইশো খ্রিস্টপূর্বের কথা আপনি কীভাবে বলেন, যেখানে জিম্বাবুয়ে শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে কার্বন ডেটিং করে পাওয়া সময়কাল হচ্ছে প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ! বাকিগুলো আরও পরের।"

"জিম্বাবুয়ে নিয়ে কথা বলছি না আমরা, বরং বলছি তারও আগে যে সভ্যতাটা ছিল সেটা নিয়ে," স্যালিও দমবার পাত্র না। "হতে পারে যে জিম্বাবুয়ে শহরটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওই সভ্যতার একদম শেষ দিকে, গায়েব হয়ে যাওয়ার আগে হয়তো সামান্য কিছুদিনই রাজত্ব করতে পেরেছিল ওরা; ব্যাপারটা সেরকম হলে কিন্তু আপনার ওই কার্বন ডেটিং-এ পাওয়া চারশো পঞ্চাশ সালের দিকের ব্যাপারটা সত্যি হয়। তাছাড়া শালা আর ইনসেনজুয়ের প্রাচীন খনিগুলোর কার্বন ডেটিঙে কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো খ্রিস্টপূর্বের আলামত পাওয়া যায়।" তারপর ও শেষ করল একটা চরম

মেয়েলি যুক্তি দিয়ে। “যাই হোক, কার্বন ডেটিং *অতোটা* নির্ভুল না। একশো-দুইশো বছরও গড়মিল হতে পারে।”

“খনিগুলোয় কাজ করতো বান্টুরা,” ঘোষণা দিল লোরেন। “এর আগে ক্যাটন থম্পসন–আর অবশ্যই, অতি সম্প্রতি, সামার্স–বলেছেন–”

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রবল বেগে আক্রমণ করে বসল স্যালি। “বান্টুরা যেখানে এই এলাকায় এসেছিলই সম্ভবত তিনশো খ্রিস্টাব্দের দিকে, ওরা আচমকা এমন উজ্জ্বল এক প্রতিভার অধিকারী হয়ে গেল যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো স্বর্ণ বা তামার অস্তিত্ব দেখা না গেলও, খনির ভেতর ওরা ঠিকই ওগুলোর অস্তিত্ব শনাক্ত করতে সক্ষম হয়ে গেল? একই সময়ে ওরা এমন ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে ফেলল যে পাথর ভেঙে প্রায় পঁচিশ কোটি টন আকরিকও বের করে ফেলল! আর তারপর আবার হাজার বছরের জন্য সেই সব বুদ্ধি-শুদ্ধি ভুলে গেল পুরোপুরি? তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এর আগেও কিন্তু ওদের মধ্যে এসব মেধার কোনোটাই দেখা যায়নি।”

“আচ্ছা, আরব বণিকরা আসতো–হয়তো ওরা–” লোরেন বলতে শুরু করল কিন্তু স্যালি আবারও কোনো সংকেত না দিয়েই চড়ে বসল ওর উপর।

“ওরা আবার কবে এত ঝুঁকি আর খরচ করে মাইনিং করেছে? বান্টুদের কাছে স্বর্ণ কখনোই খুব বেশি মূল্যবান কিছু ছিল না–গবাদি পশু ছিল ওদের সম্পদের মানদণ্ড। ওরা কোত্থেকে শিখবে কীভাবে কাপড় পড়তে হয় বা পাথর দিয়ে বাড়ি বানাতে হয়? বান্টুরা এর আগে কখনোই এসব করেনি। আচমকা এ ব্যাপারে ওদের নৈপুণ্য আর দক্ষতা আকাশছোঁয়া হয়ে গেল! তারপর আরও বেশি উন্নত হওয়ার বদলে, সেই নৈপুণ্য আর দক্ষতায় এমন ধ্বস নামলো যে হারিয়েই গেল চিরতরে!”

যথারীতি স্যালির কথা মেনে নিতে সম্মত হলো না লোরেন, স্যালির আক্রমণের ফাঁকে ফাঁকে ঠান্ডাভাবেই জবাব দিয়ে গেল ও। তবে যখন পূর্বের বদলে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ আসার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মতবাদটা নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হলো, তখনই লোরেন ওর চূড়ান্ত চালটা চাললো। এই মতবাদের ব্যাপারে আমার সব নিন্দুক আর সমালোচকদের মতামত প্রায় সম্পূর্ণটাই পড়েছে লোরেন, সুযোগ পেয়ে এখন সেগুলোই আবার পুনরাবৃত্তি করে শোনালো।

সর্বজনগ্রাহ্য মতবাদ হচ্ছে: দখলদারেরা প্রবেশ করেছিল সোফালা উপকূল অথবা জাম্বেজি নদীর মোহনা দিয়ে। আমি এই মতবাদটাকে একটু এগিয়ে দিয়েছি, প্রাচীন পুঁথি-পত্র আর আমার নিজস্ব বিশদ খোঁড়াখুড়ির উপর ভিত্তি করে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে ভূমধ্যসাগরীয় একদল লোক পিলার অভ হারকিউলিস দিয়ে সাগর থেকে বেরিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দিকে যাত্রা করে; উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত গোল্ড কোস্ট, আইভরি কোস্ট আর

নাইজেরিয়ার উপকূলে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন। কিন্তু দক্ষিণ দিকে অভিযাত্রাকালে তারা এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়, যেখানে কোনো মানুষ নেই। আমার ধারণা সেটা ছিল এমন কোনো নদীর মুখ, যেটা হয় এখন শুকিয়ে ভরাট হয়ে গিয়েছে, অথবা নদী বহু আগেই গতিপথ পাল্টে বর্তমানে অন্য পথে বইছে। ওই সময়ে নদীটা থেকেই মাকারিকারি, এনগামিসহ অন্যান্য সমভূমির বিশাল হ্রদগুলোতে পানি আসতো। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ক্রমাগত বিশুষ্কীকরণের কারণে ওগুলো ছোট হতে হতে একসময় হারিয়েই যায়। লোকগুলো নদীটায় প্রবেশ করে, সম্ভবত নদীটা অরেঞ্জ নয়তো কিউনিন নদী। ওটার উৎসমুখ পর্যন্ত চলে যায় ওরা, তারপর ওদের ধাতুবিদদের মাটিতে নামিয়ে দেয় মানিকার[২১] প্রাচীন খনিগুলো খুঁজে বের করার জন্য। আর কে জানে, হয়তো তারা ওসব নদী আর হ্রদগুলোর কাদামাটির ভেতর হীরা খুঁজে পেয়েছিল, এবং অতি অবশ্যই তখনকার সময়ে যে বিশাল বিশাল হস্তীযুথ ঘুরে বেড়াতো, তাদেরকে শিকার করেছে। একটা আস্ত শহরের গোড়াপত্তন করে, একটা বিশাল দুর্গ আর বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যথেষ্ট ছিল ওসব। আর কোথায় ওরা শহরটা প্রতিষ্ঠা করল? অবশ্যই এমন কোথাও যেখান থেকে জলপথের যাত্রা সহজ। মানে সবচেয়ে দূরের হ্রদটার উপকূলে, মাকারিকারিতে হবার সম্ভাবনা বেশি। অথবা বর্তমানের বিশাল লবণ সমভূমির সীমানা ঘেঁষে যে হ্রদ, সেটার পাশে।

স্যালি আর লোরেন চরম বিতৃষ্ণা আর তিক্ততা নিয়ে বিতর্ক করতে লাগল। স্যালি লোরেনকে বলল 'মাথা মোটা লোক', বদলে লোরেন ওকে ডাকলো 'সবজান্তা ম্যাডাম'। তারপর আচমকাই লোরেন হাল ছেড়ে দিল আর খানিক পরেই আমরা তিনজন একসাথে মাকারিকিরির হারানো শহর আবিষ্কারের সম্ভাবনায় উল্লসিত গলায় আলাপ করতে লাগলাম।

"হ্রদটা বর্তমান সমভূমির সীমানার পরে কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল," লোরেন ধরিয়ে দিল। "মাত্র একশো বছর আগেই বার্শেল লিখেছিলেনঃ এনগামি হ্রদটা নাকি আকৃতিতে ছিল সাগরের সমান। আর এখন সেটা একটা ডোবায় পরিণত হয়েছে, পার হওয়ার জন্য মনে হয় পা-ও ছড়ানো লাগে না। সবমিলিয়ে সম্ভাবনা বেশি যে, আমরা যে পাহাড়ে ধ্বংসাবশেষ পাবো বলে আশা করছি, হ্রদটা ওই পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে আসা আর খরাপ্রবণ হয়ে পড়ার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, কর্নওয়ালিস হ্যারিস-এর একটা বই আছে...পড়ে দেখতে পারেন, ওখানে বর্তমানে বিলুপ্ত বন আর নদীগুলো সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে।"

---

[২১]জায়গার নাম

"বেন," উত্তেজিত গলায় স্যালি আমার হাত টেনে ধরলো। "শহরটার অর্ধচন্দ্রাকৃতি নিয়ে ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি, মনে আছে? এটা কিন্তু একটা প্রাচীন বন্দরের আকৃতি হতে পারে, সম্ভবত শহরটা গড়েই উঠেছিল উপকূল বরাবর।"

"ঈশ্বর," লোরেন বিড়বিড় করে বলল। "আর তর সইছে না আমার!"

মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে, হুইস্কির বোতলগুলো নিয়েও ভালোই টানাটানি হয়েছে এতক্ষণ। লোরেন আর স্যালি অবশেষে যার যার তাঁবুতে ফিরে গেল। আমি জানতাম ঘুম আসবে না, তাই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আগুনের পাশে হাঁটতে লাগলাম। ধারেই আমাদের চাকরেরা কম্বল মুড়ি দিয়ে গুঁটি মেরে শুয়ে আছে। ওদেরকে পেরিয়ে নেমে এলাম সমভূমিতে। তারার আলো লবণে পড়ে ভৌতিক ধূসর আভার সৃষ্টি করেছে, প্রতি পদক্ষেপে মচমচ করে উঠতে লাগল পায়ের নিচে। অনেক সময় ধরে হাঁটলাম আমি, বনের ধারে পৌঁছে, একবার থেমে দাঁড়িয়ে শুনলাম দূর থেকে ভেসে আসা সিংহের হুংকার। ক্যাম্পে ফিরে দেখি–তখনও স্যালির তাঁবুতে লণ্ঠন জ্বলছে। ফ্যাঁকাসে ক্যানভাসে ওর বিশাল আবছায়া সৃষ্টি হয়েছে–আমার ভালোবাসার বিশাল, কালো একটা প্রতিকৃতি। বসে বসে পড়ছে ও, ক্যাম্প-বেডের উপর পা ভাঁজ করে বসা। কিন্তু আমার উপস্থিতি টের পেয়েই যেন ও নেমে এসে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলাম, তারপর এগিয়ে গেলাম ওর তাঁবুর দিকে। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল যে মনে হলো এই বাঁকাঁচোরা বুকের খাঁচাটা ভেঙে বেরিয়েই আসবে।

"স্যাল?"

"বেন?" নরম সুরে ফিসফিস করে উত্তর দিল ও।

"ভেতরে আসবো?"

জবাব দেওয়ার আগে একটু ইতস্তত করল ও। "আচ্ছা–তবে মাত্র এক মিনিটের জন্য।"

আমি তাঁবুর ভেতরে ঢুকলাম, অন্ধকারে ওর শোয়ার পোশাকটা বোঝা যাচ্ছিল না। আমি ওর চেহারা ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়ালাম, কিন্তু হাত ঠেকলো ওর থুতনিতে।

"শুধু বলতে এসেছি যে, ভালোবাসি তোমায়," নরম গলায় বললাম কথাটা, অন্ধকারে ওর দম আটকে ফেলার শব্দটা শুনতে পেলাম আমি। যখন ও উত্তর দিল তখন ওর গলায় কোনো উত্তাপ ছিল না।

"বেন," ফিসফিস করে বলল ও। "আমার মিষ্টি বেন।"

"আজ রাতে তোমার সাথে থাকি?"

জবাবে ওর কণ্ঠে শুনে মনে হলো সেখানে আক্ষেপের সুর, "না, বেন। তাহলে সবাই সব জেনে ফেলবে। আমি সেটা চাই না।"



আগের দিন যেভাবে শেষ হয়েছিল, সকালটাও ঠিক সেভাবেই শুরু হলো। সবাই বেশ খোশমেজাজে আছে, নাস্তা করার পাশাপাশি হাসিমুখে গল্প করতে লাগল। চাকরেরা ক্যাম্পের জিনিসপত্র নামিয়ে আবার ট্রাকে তোলার সময় ঠাট্টা-তামাশা করছে–সকাল সাতটা নাগাদ আমরা ক্যাম্প ত্যাগ করে সমভূমির পাড় দিয়ে চলতে শুরু করলাম। ল্যান্ড রোভার আগে আগে যাচ্ছে আর ট্রাকগুলো আসছে ওটাকে অনুসরণ করে। দুপাশে ঝোপ-ঝাড় আর ঘাসের দঙ্গল, এর ফাঁকে ফাঁকে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে শুষ্ক গিরিখাত।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর আমি সামনের গাছপালার ভেতরে হালকা নড়া-চড়ার আভাস পেলাম। একটু পরেই তিনটা রাজকীয় চেহারার জেমসবক ওটার ভেতর থেকে বেরিয়ে, এক সারিতে হেলেদুলে নেমে গেল খোলা সমভূমিতে। ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছিল ওরা, ধুমসী জলঘোটকের মত, পিঠের হালকা-বেগুনি রঙা লোম আর কালো এবং সাদায় মেশানো মুখায়বয়ব ধূসর সমভূমির বিপরীতে পরিষ্কারভাবে চোখে লাগছে।

লোরেন সর্বশক্তি দিয়ে ল্যান্ড রোভারের ব্রেক চেপে ধরলো, ম্যাটাবেলে বন্দুকবাজদের একজন পেশাদারদের নিখুঁত দক্ষতায় বিশাল .৩৭৫ ম্যাগনাম হল্যান্ড রাইফেলটা লোরেনের হাতে ধরিয়ে দিতেই ছুটে গেল ও; মাথা নিচু করে দৌড়ে গিয়ে সমভূমির ধারের ঘাসের আড়ালে গিয়ে বসল।

"উনি কি পশুগুলোকে গুলি করবেন?" মেয়েলি মিহি সুরে জানতে চাইলো স্যালি। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতেই আবার প্রশ্ন করল, "কিন্তু কেন?"

"কাজটা ওর পছন্দের, তাই।"

"কিন্তু হরিণগুলো দেখতে কী সুন্দর," অনুযোগ করল মেয়েটা।

"হ্যাঁ," আমিও সায় দিলাম। সমভূমির ভেতরে, ল্যান্ড রোভার থেকে ছয়শো গজমতো দূরে জেমসবকগুলো থেমে দাঁড়ালো। আমাদের দিকে আড়াআড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। উৎসুকভাবে তাকিয়ে দেখছে আমাদেরকেই। মাথা উঁচু করে রেখেছে, তাই খাড়া হয়ে আছে সরু শিংগুলো।

"করছেনটা কী উনি?" স্যালি লোরেনের দিকে ইঙ্গিত করল। ও তখনও সমভূমির ধার বরাবর দৌড়াচ্ছে।

"আইন মানার চেষ্টা করছে," ব্যাখ্যা করলাম আমি। "যেকোনো যানবাহনের পাঁচশো গজের ভেতরে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা অপরাধ।"

"অথচ মনের খুশিতে জানোয়ার মারা কোনো অপরাধ না," বিড়বিড় করে বলল ও। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একবার লোরেন আর একবার জেমসবকগুলোকে দেখছে। তারপর আচমকাই ল্যান্ড রোভার থেকে লাফিয়ে নেমে হাচড়ে পাচড়ে ইঞ্জিন বনেটের উপর উঠে দাঁড়ালো। তারপর মুখের সামনে দুই হাত গোল করে চিৎকার করতে লাগল।

"পালা, বেকুবের দল, পালা! এখুনি!"

স্যালি নিজের হ্যাট খুলে মাথার উপর নাড়তে নাড়তে বনেটের উপর লাফাতে লাগল, সেই সাথে পাগলের মত চিৎকার তো আছেই। সমভূমির ভেতরে জেমসবকগুলো হতচকিত হয়ে ছুট লাগালো, টগবগ করতে করতে কোনাকুণিভাবে দূরে সরে যেতে লাগল আমাদের থেকে। আমি দূরে লোরেনের অবয়বটার দিকে তাকালাম। ও তড়িঘড়ি করে বসে পড়ল, কনুই হাঁটুতে ঠেকানো, মাথা টেলিস্কোপিক সাইট বরাবর। ঝাঁকি দিয়ে উঠলো রাইফেল, নল দিয়ে বেরিয়ে এল ধোঁয়া–তবে গুলির ফলাফল পেতে আরও এক দুই সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হলো আমাদের। সমভূমিতে দেখা গেল, সবার সামনের জেমসবকটা হুমড়ি খেলো; তারপর কয়েক পাক খেয়ে দলা পড়ে থাকলো সেখানেই। আবার গুলি করল লোরেন, দ্বিতীয় জানোয়ারটাও উল্টে গিয়ে চার ঠ্যাং আকাশের দিকে দিয়ে পড়ে রইলো। শেষ জেমসবকটা একাই দৌড়াচ্ছে তখনও।

আমার ঠিক পেছনেই বুড়ো বন্দুকবাজটা ওর সঙ্গীকে সিন্ডেবেলে ভাষায় বলল, "ওউ! এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি।"

স্যালি বনেট থেকে নেমে এসে চুপচাপ বসে রইলো আমার পাশে, আমি গাড়িটা চালিয়ে লোরেনের কাছে নিয়ে গেলাম। রাইফেলটা আবার আগের লোকের হাতে ফিরিয়ে দিল ও। আর ড্রাইভারের জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে সরে গেলাম আমিও। লোরেন উঠে বসতেই পোড়া বারুদের গন্ধে ভরে গেল ল্যান্ড রোভারটা। স্যালির দিকে তাকালো লোরেন। "ধন্যবাদ আপনাকে। ছুটন্ত শিকার করতেই বরং বেশি ভালো লাগে আমার।"

"তিনটাকেই মারলেন না কেন?" নিরুত্তাপ গলায় বলল ও। কণ্ঠে কোনো বিদ্বেষ নেই।

"একটা লাইসেন্স দিয়ে সর্বোচ্চ দুটোকে মারার অনুমতি আছে।"

"ক্রাইস্ট," বলল স্যালি। এখন ওর কণ্ঠে রাগ আর ঘৃণা দুটোই প্রকাশ পাচ্ছে, "কি সুন্দর কথা! আসলে এরকম ভদ্দরলোকের সাথে দেখা হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।"

লোরেন গাড়িটাকে মৃত প্রাণী দুটোর কাছে নিয়ে গেল। ওগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে মাংস বানানোর কাজে লেগে গেল বন্দুকবাজ আর ড্রাইভাররা; এদিকে স্যালি গিয়ে গাড়ির পেছনের মাথা নিচু করে বসে রইলো, হ্যাট কপালের নিচে নামিয়ে রেখেছে, চোখ আঠার মত লেগে আছে একটা বইতে।

আমি লোরেনের পাশে কড়া রোদের ভেতর দাঁড়িয়ে রইলাম, সাদা লবণের উপরে প্রতিফলিত হয়ে রোদের তেজ বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। বন্দুকবাজ দুজন দক্ষ হাতে চামড়ার জায়গামতো ছুরির পোচ চালিয়ে একেবারে হার্লি স্ট্রিটের সার্জনদের দক্ষতায় জেমসবক দুটোর চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল।

"তোমার আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল যে এই ভ্রমণে আমাদের সাথে *মহিলা সমিতির* একজনও থাকবে," তিক্ত কণ্ঠে আমাকে বলল লোরেন। "বুঝতে পারছি না, তোমার কথায় পটে গিয়ে আমি ওকে সাথে আনতে বলে ভুলই করে বসলাম কিনা।"

আমি কিছুই বললাম না দেখে ও-ই চালিয়ে গেল। "ইচ্ছা করছে একটা ট্রাকে করে আবার মাউনে ফেরত পাঠিয়ে দেই ওকে।" তবে ব্যাপারটা বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব নয় বলে আমার ভেতরে কোনো অনুভূতি হলো না। লোরেনই আবার বলল, "তোমার সহকারী সে-ওকে সামলে রাখার দায়িত্বটাও তোমারই কিন্তু!"

আমি সরে এলাম ওখান থেকে, রাগটা সামলানোর সময় নিক। তারপর গাড়িতে ফিরে স্যালির পাশের সিট থেকে ম্যাপকেসটা নিয়ে নিলাম। বই থেকে মুখ তুলেও তাকালো না ও। আমি গাড়ির অন্য পাশে গিয়ে আকাশ থেকে তোলা বিশাল মাপের মানচিত্রটা ল্যান্ড রোভারের বনেটের উপর পাতলাম। দুই মিনিট পরে লোরেনও এসে যোগ দিল আমার সাথে। দিক নির্ণয়ে খুবই দক্ষ ও। মানুষটা নিজেকে কোন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে, তা নিজেও জানে না।

"এই যে...এখানে আমরা সমভূমি থেকে বের হবো," লোরেন একটা জায়গা দেখালো যেখানে একটা শুকনো নদী বক্ষ এসে সমভূমির পূর্ব কোনার সাথে মিলেছে। "এরপর কম্পাস দেখে চলতে হবে।"

"পরবর্তী যাত্রা যে কেমন হবে, ঈশ্বরই জানেন।"

"বালি দিয়ে ভরা, সচরাচর মাটি যেরকম সেরকম না। আমি কোনোদিন যাইনি ওদিকে।"

"ড্রাইভারগুলোকে জিজ্ঞেস করলেই হয়," প্রস্তাব দিলাম আমি।

"ভালো বুদ্ধি," লোরেন দুই ড্রাইভার আর বন্দুকবাজ দুজনকে ডাক দিল। ওরা ততোক্ষণে নিপুণ হাতে কাজ সেরে ফেলেছে। বাকি যেটুক আছে ক্যাম্প বয়গুলোই সারতে পারবে, মাত্রই এসে পৌঁছেছে ওরা।

“আমরা এখানে যেতে চাই,” লোরেন মানচিত্রে একটা জায়গা দেখালো। “এই পাহাড়গুলোর এখানে। এগুলোর নাম লেখা নেই মানচিত্রে, তবে আছে এই সমভূমির একদম ধার বরাবর।”

মানচিত্রে দেখে ড্রাইভারগুলোর জায়গাটার অবস্থান বুঝতে সময় লাগল না বেশি, তবে এরপরেই দুজনের অভিব্যক্তি আমূল বদলে গেল। চেহারা দেখে মনে হতে লাগল আমাদের কথা বুঝতেই পারছে না ওরা।

“সমভূমি আর পাহাড়ের মাঝের জায়গাটা কেমন?” জিজ্ঞেস করল লোরেন। ও ওদের পরিবর্তনটা খেয়াল করেনি। ড্রাইভার দুজন আড়চোখে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

“কী হলো?” আবার জিজ্ঞেস করল লোরেন।

“আমি ওই এলাকা চিনি না। পাহাড়গুলোর কথাও শুনিনি কখনও,” জোসেফ নামের বয়স্ক ড্রাইভারটা বিড়বিড় করে বলল। তারপর মিথ্যা বলা চালিয়েই গেল, “আর তাছাড়া প্রচুর বালি ওখানে, নদীও আছে যেগুলো পার হওয়া যায় না।”

“খাবার পানি নেই কোথাও,” সায় দিল ডেভিড, দ্বিতীয় ড্রাইভারটা। “আমিও যাইনি ওদিকে কখনও। পাহাড়ের কথাও শুনিনি কোনোদিন।”

“সাদা ব্যাটা কী চায়?” বুড়ো বন্দুকবাজটা সিন্ডেবেলে ভাষায় জানতে চাইলো। এই দুজন মানচিত্রের কিছুই বুঝছে না সেটা পরিষ্কার।

“কাতুবা এনগাজিতে যেতে চান এনারা,” ড্রাইভার দ্রুত ব্যাখ্যা করল। ওরা সবাই ধরেই নিয়েছে যে আমার বা লোরেন, কারো-ই ওদের ভাষার উপর দক্ষতা নেই, তাই আমাদের সামনে মন খুলে কথা বলতে পারবে। জীবনে এই প্রথম আমি জীবনের নামটা শুনলাম। কাতুবা এনগাজি—অর্থ হিলস অভ ব্লাড—রক্তের পাহাড়।

“কী বলেছো তুমি ওদেরকে?” বন্দুকবাজ জানতে চাইলো।

“বলেছি: চিনি না জায়গাটা।”

“ভালো করেছো,” খুশি হলো বন্দুকবাজ। “ওনাদেরকে বলো যে ওখানে কোনো হাতি নেই, সব বন্য প্রাণী সমভূমির দক্ষিণে।” ড্রাইভারেরা বাধ্যগতের মত পালন করল আদেশ। তবে আমাদের মধ্যে কোনো ভয় ধরাতে না পেয়ে হতাশ হলো বেশ।

“বেশ,” খুশি খুশি গলায় ওদেরকে বলল লোরেন। “আজ তাহলে নতুন কিছু জানা হবে তোমাদের। জীবনে প্রথমবারের মত ওই পাহাড় ঘোরা হবে।” বলতে বলতে আবার মানচিত্রটা ভাঁজ করে ফেলল। “এখন মাংস ঝটপট তুলে আবার রওনা করো।”

মাত্র পাঁচ মিনিটেই পুরো অভিযাত্রার সুরটাই পাল্টে গেল যেন। স্যালি আর বাকি কর্মচারীরা চরম মন খারাপ করে বসে রইলো। হাসি-ঠাট্টার

লেশমাত্রও রইলো না আর, সবাই গোমড়া মুখ করে বসে ফিসফাস করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। কর্মস্পৃহা নেমে এল একদম শূন্যের কোঠায়, সামান্য দুটো জেমসবকের মাংস ট্রাকে তুলতেই আধা ঘণ্টা লাগিয়ে দিল ওরা। এক ফাঁকে আমি লোরেনকে গাড়িগুলো থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেলাম, যেখানে কেউ আমাদের কথা শুনতে পাবে না। তারপর আফ্রিকান লোকগুলো কী কী বলেছে সেগুলো জানালাম ওকে।

"হিলস অভ ব্লাড! দারুণ!" লোরেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। "এর মানে হচ্ছে নিশ্চিতভাবে ওরা ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে জানে–তবে সম্ভবত এটা নিয়ে আলাপ করতে ভয় পায়।"

"হ্যাঁ," আমিও একমত হলাম। "কিন্তু এখন থেকে আমাদেরকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, পাহাড়ে যাওয়া বানচাল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ওরা, দেখো শুধু একবার।" আমরা মাথা ঘুরিয়ে ওদের স্থবির কাজকর্ম দেখলাম কিছুক্ষণ, প্রায় প্রত্যেকটা কর্মচারীকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছে। "আর সম্ভবত, হিলস অভ ব্লাডে পৌঁছাতে যতটা সময় লাগবে বলে ধরে রেখেছি, তার চাইতে অনেক বেশি লাগবে।"

আরও একবার সমভূমি থেকে উঠে এলাম, লবণের আবরণের নিচে নরম জায়গা থাকতে পারে। চাপে সেটা ভেঙে পড়ে গাড়ি আটকে যাওয়ার আশংকায় কিনারের বালুতে ভরা...কিন্তু শক্ত মাটি ধরে এগোতে লাগলাম আমরা। রাস্তায় ওঠার জন্য ঢালু কিনারার ফাঁকে মোটামুটি সমতল এরকম জায়গা খুঁজতে খুঁজতে আরও একটা খাড়া গিরিখাত পেরিয়ে চলে এলাম। এভাবে প্রায় মিনিট বিশেক চলার পর টের পেলাম যে পেছনের ট্রাকগুলো আমাদের পেছনে আসছে না! আমি আর লোরেন অধৈর্য হয়ে প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর, আবার শুষ্ক নদী বক্ষের যে পথ ধরে এসেছিলাম সে পথে ফিরে গেলাম।

একটা ট্রাক গিরিখাতের কিনারে অর্ধেক ঝুলছে। সামনের-পেছনের একটা করে চাকা মাটিতে নেই আর, পেট বসে আছে মাটিতে। অন্য ট্রাকটা পার্ক করা পাশেই; চোদ্দজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নানা ভঙ্গিতে নানান ভাব ধরে হয় বসে, নাহয় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কেউই ট্রাকটাকে উদ্ধারের ন্যূনতম প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে না!

"জোসেফ," ড্রাইভারকে ডাক দিল লোরেন। "কীভাবে হলো এসব?"

জোসেফ নিতান্ত অনিচ্ছায় কাঁধ ঝাকালো, চেহারার খুশি ভাবটা লুকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে।

"ঠিক আছে, হাত লাগাও সবাই," জোর গলায় বলল লোরেন। আধা ঘণ্টা ধরে চলল প্রচেষ্টা। চোদ্দজন মেয়েদের মত নরম হাতে ধাক্কা দিল; এদিকে জোসেফ গিয়ার ধরে মুহুর্মুহু টানাটানি করে ইঞ্জিনটাকে বারবার চালু-

বন্ধ করলেও, বাহনটা কিনার ধরেই ঝুলে রইলো! অবশেষে ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে, গিরিখাতের উপরে উঠে একসাথে জড়ো হয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলো আমার আর লোরেনের দিকে।

"হবে নাকি, বেন?" নিজের বুশ জ্যাকেটটা খুলতে খুলতে লোরেন আমার দিকে ফিরে বলল।

"ঠিক আছে লো," সায় দিলাম আমি। লোরেন নিজের কতটা যত্ন নেয়, সেটা দেখতে পেয়ে খুবই খুশি হলাম আমি। ওর শরীরটা দেখে মনে হয়, পাথর কুঁদে বানানো বোধহয়, এক রত্তি মেদ নেই শরীরে। ছয় ফুট দুই ইঞ্চির শরীরটার চামড়ার নিচের প্রতিটা পেশী স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমি অবশ্য শার্ট খুললাম না। আমার শরীরের গঠন যদিও লোরেনের মতই, কিন্তু সেটা দেখতে মোটেও শোভনীয় না।

"সামনের দিকটা আগে," পরামর্শ দিল লোরেন।

ট্রাক থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেলা হয়েছে সব, পেট্রোল ট্যাঙ্কে তেল আছে অর্ধেক; আন্দাজ করলাম যে সামনের দিকটার ওজন হবে দুই হাজার পাউন্ডের মত। আমি ওটার দিকে দেখতে দেখতে হাতটা বনবন করে ঘোরাতে লাগলাম, অনেকদিনের অব্যবহৃত পেশীগুলোতে ঢিল দিচ্ছি। কর্মচারীরা আমাদের দিকে বেকুবের মত তাকিয়ে রইলো, কয়কজন তো হাসতেও লাগল মুখ টিপে। এমনকি স্যালিও ওর বই রেখে ল্যান্ড রোভার থেকে নেমে এল কাণ্ড দেখতে।

লোরেন আর আমি ট্রাকের সামনের দিকে গিয়ে ওটার দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালাম, খুব সাবধানে জায়গামতো রাখলাম হাত, হাঁটু বাঁকা করে রেখেছি, পা দুটোও স্বাভাবিকের তুলনায় প্রসারিত।

"অল দ্য ওয়ে, পার্টনার?"

"অল দ্য ওয়ে, লো।" দাঁত বের করে হাসলাম ওর দিকে চেয়ে, তারপর দুজনেই একসাথে ঠেলা শুরু করলাম। আস্তে আস্তে শুরু করলাম আমি। ওজনটা শুধু আমার পেশীর উপর দিয়ে যেতে দিচ্ছি, চেষ্টা করছি সব জায়গায় যাতে টান সমান থাকে; তারপর সেটাকে কাঁধ, উরু আর পেটে নিয়ে আটকে দিলাম। তবুও একটা জগদ্দল পাথরের মত আটকে রইলো ট্রাকটা, বাধ্য হয়ে আমি সংরক্ষিত শক্তি ব্যবহার শুরু করলাম; টের পেলাম টানটা এখন ব্যথায় রূপ নিচ্ছে, শ্বাস নিতে গিয়ে গলা জ্বলতে শুরু করল আমার।

"এখন," পাশে থেকে ঘোঁত ঘোঁত করে বলল লোরেন, আমি পুরো শক্তি এবার প্রয়োগ করলাম একযোগে, দাঁতে দাঁত চেপে মাটিতে আটকে রাখলাম পা, কিন্তু চোখে চাঁদ-তারা দেখা শুরু হয়ে গেল। সুন্দর মত মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল ট্রাকটা। দর্শকদের আঁতকে ওঠা আর হতভম্ব আলোচনার শব্দ এল আমার কানে।

ট্রাকের সামনের দিকটা তুলে গিরিখাত থেকে সরিয়ে দিলাম প্রথমে, তারপর ঘুরে পেছনে গিয়েও করলাম একই কাজ। শেষ করার পর হাসতে শুরু করলাম আমরা; প্রথমে মুচকি মুচকি হলেও, কিছুক্ষণ পরেই অট্টহাস্যে রূপ নিল সেটা। লোরেন আমার কাঁধে হাত রেখে আমাদের লোক-লস্করদের দিকে এগিয়ে গেল। ওদের সবার চেহারায় পরাজয় আর অস্বস্তি।

"তোরা শালা-" বলল লোরেন, হাসছে তখনও। "-বুড়ি মহিলার চাইতেও কমজোর, পারিস খালি বাচ্চা মেয়েদের মত মুখ টিপে হাসতে। যা বললাম, তা ওদেরকে শুনিয়ে দাও, জোসেফ।"

খেয়াল করলাম জোসেফ এই রসিকতার পুরোটাই হুবহু ওদেরকে অনুবাদ করে শোনালো!

"আর তুমি, জোসেফ, আস্ত একটা গাধা।" লোরেন আমার কাছে থেকে সরে জোসেফের দিকে এগিয়ে গেল, ঠিক একজন দক্ষ নাচিয়ের ভঙ্গিতে। তারপর ঠাস করে ঠাটিয়ে এক চড় বসিয়ে দিল ওর গালে। স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি জোরে শোনালো চড়ের শব্দটা, চড়ের চোটে জোসেফ পুরো এক পাক ঘুরে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসল ও, ঠোঁটের কোনা দিয়ে চিকন ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে, দাঁতে লেগে কেটে গিয়েছে নিচের পুরু ঠোঁট।

"এখনও হাসছি, দেখেছো?" কিংকর্তব্যবিমূঢ় দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলল লোরেন। "আমি এখনও রাগিনি। শুধু ভেবে দেখো কেউ যদি আমাকে রাগিয়ে দেয়, তাহলে তার পরিণতি কী হতে পারে।"

ক্ষিপ্রতার সাথে আবার সব ভরে ফেলা হলো ট্রাকে, আমরা রওনা দিলাম আগের রাস্তায়।

"যাক," বলল স্যালি। "এরপর থেকে অন্তত সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা পাবো বলে আশা করা যায়। তা মহান সাদা প্রভু নিজের হাত নোংরা করার বদলে চাবুক কেন ব্যবহার করেন না?"

"বলো ওকে, বেন।" লোরেন আমাদের কারো দিকেই তাকালো না। আমি স্যালিকে মানচিত্র নিয়ে ঘটনাটা বললাম বিস্তারিত।

"লোরেন, ওই লোকটাকে মেরে কোনো মজা পায়নি, স্যাল। কিন্তু সে ইচ্ছা করে বাঁধিয়ে দিয়েছিল ট্রাকটা। আমাদের হাতে হিলস অভ ব্লাডে যেতে আর মাত্র সাড়ে তিন দিন সময় আছে, কোনো শয়তানি সহ্য করার মত সময় হাতে নেই।"

স্যালি সাথে সাথে জোসেফের ব্যাপারটা ভুলে গেল। "হিলস অভ ব্লাড," আগ্রহ সহকার বলল ও। "মাই গড, শুনলেই তো মনে হয় মানুষ বলি দেওয়া হচ্ছে এমন কোনো জায়গা-"

"নামকরণের কারণ সম্ভবত ওখানকার শৈলশিরাগুলোর লাল রঙ," মত দিলাম আমি।

"আর এই কথা না বলতে চাওয়ার বিষয়টা।" আমাকে পাত্তাই দিল না ও। "নিশ্চয়ই ওখানে ধ্বংসাবশেষ থাকার কারণে! ওহ্ গড, আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি যেন সব-লুকানো সম্পদে ভরা মন্দির, পুরো সভ্যতার ইতিহাস সমৃদ্ধ লিপি আর হাতিয়ার, অস্ত্র, সমাধি–"

"ওখানে গেলেই দেখতে পাবে আমার সহকারীর পক্ষপাতশূন্য, সহজ আর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ের অনুসন্ধান কার্যক্রম," আমি লোরেনকে ধরিয়ে দিতেই ও দাঁত বের করে হাসলো।

"ব্যাপারটা স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে আমার, কিন্তু আমার নিজেরও ওর মতই অনুভূতি হচ্ছে," স্বীকার করল লোরেন।

"আর তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে আপনার ঘটেও বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু আছে, বুঝলেন বুদ্ধু," কড়া গলায় বলল ওকে স্যালি।



সমভূমির পূর্ব কোণে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দুইটা বেজে গেল। এখান থেকে কম্পাসের সাহায্য ছাড়াই এগোতে হবে পাহাড়ের দিকে। মুহূর্তের স্পষ্ট হয়ে গেল যে আজ আর ওখানে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। এমনিতেই গাড়িতে মালামাল অনেক, তার উপর বালির চাপড়া গাড়ির চাকা টেনে ধরতে থাকায় গতি আমাদের একদমই শামুকের মত হয়ে গেল। প্রায় আধা ডজন বার গাড়ির চাকা বালিতে আটকে গেল, ল্যান্ড রোভারে বেঁধে টেনে তুলতে হলো ওগুলোকে। প্রতিবার ব্যাপারটা ঘটা মাত্রই ট্রাকের ড্রাইভার আর কর্মচারীরা ক্ষমা চাইতে চাইতে মুখে ফেনা তুলে ফেলল।

গতদিন হওয়া বৃষ্টির সব আলামত চুষে নিয়েছে বালি, তবে সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল রাস্তার ধারের বাবলা গাছগুলোতে, ওটার কাঁটাময় ডালগুলোতে সবুজের ছোঁয়া লেগেছে–আরও নাটকীয়ভাবে দেখা যাচ্ছে পুরু ধারটায়, যেখানে কার্পেটের মত করে অবারিত বুনো ফুল ফুটে আছে সর্বত্র।

ফুলগুলোর বীজ আর কুড়ি দীর্ঘ তিন বছর খরার কারণে অঙ্কুরিত হতে পারেনি, অপেক্ষায় ছিল এই বর্ষণের–আর এখন নামাকুয়া ডেইজির[২২] ফাঁকে ফাঁকে কিং চাকা[২৩]-র লাল রঙা আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। স্টার লিলি, এরিকা, সোনালি গাজানিয়ানসহ আরও বিশ প্রকারের ফুলের এক রাজকীয় সমাহার দেখা যাচ্ছে সেখানে। দেখে আমাদের শম্বুক গতিজনিত হতাশা কমলো কিছুটা হলেও।

---

[২২] ফুল
[২৩] ফুল

প্রতিবার যখন থামতে বাধ্য হচ্ছিলাম, তখন গালাগালি আর লোকজনকে ধাক্কিয়ে কাজে লাগানোর দায়িত্বটা লোরেনের উপর ছেড়ে দিয়ে, ক্যামেরাটা নিয়ে গাড়ি থেকে দূরে ঘুরে দেখছিলাম।

পাহাড়গুলো থেকে পনেরো মাইল দূরে থাকতে সূর্যাস্ত নেমে এল। একটা বাবলা গাছের নিচে ক্যাম্প করলাম আমরা। গাছ বেয়ে সবার উপরের ডালে উঠে গেলাম আমি। পূর্ব দিগন্তে পাহাড়গুলোর অস্পষ্ট আকৃতি দেখা যাচ্ছিল তখনও। পাথরের গায়ে অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ প্রতিফলিত হয়ে কমলা-লাল আভায় জ্বলজ্বল করছে। গাছের মূল কাণ্ডটা যেখানে দুই ভাগ হয়েছে, সেখানে বসে আমি সূর্য পুরোপুরি ডুবে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম শুধু। আঁধার নামতেই, পাহাড়গুলোও যেন কালো আকাশের সাথে মিলিয়ে গেল।

দূরের পাহাড়গুলো দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত খেয়াল পেয়ে বসল আমাকে। অদৃষ্টের চিন্তা মাথায় এসে মনের মধ্যে কেমন এক হাহাকার সৃষ্টি হলো–কেমন যেন অস্বস্তি আর অস্থিরতা ভর করল আমার ওপরে।

গাছ থেকে নেমে এসে দেখি, লোরেন একা আগুনের পাশে বসে বসে হুইস্কি খাচ্ছে আর তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

"স্যালি কোথায়?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"শুতে গিয়েছে। মেজাজ খারাপ তার। শিকার আর কালো লোকদেরকে ধরে মারা নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছিল আমাদের মধ্যে।" বলতে বলতে লোরেন স্যালির তাঁবুর দিকে তাকালো, সেটা তখনও ভেতরের লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত। আজ আর কর্মচারীদের আগুনের দিকে কোনো গান হচ্ছে না। লোরেন আর আমি গ্রিল করে জেমসবকটার কলিজা আর বেকন খেলাম, গলা ভেজালাম উষ্ণ রেড কেপ ওয়াইন দিয়ে। খাওয়া শেষে চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ, ওয়াইন পান করলাম শুধু।

"ক্লান্ত লাগছে খুব," বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো লোরেন। "লার্কিনকে কল দেব। দুইদিন পর পর সব জানাবো বলেছিলাম। সকালে দেখা হবে, বেন।"

লোরেন ল্যান্ড রোভারটার কাছে গিয়ে টু-ওয়ে রেডিয়ো সেটটা অন করল। ওর মদ্যপ জড়ানো কণ্ঠ আর রেডিয়োর স্ট্যাটিকের আওয়াজ ভেসে এল কানে। কয়েক মিনিট শুনলাম আমি, লোরেন বিস্তারিত বলে গেল সব। তারপর আমিও উঠে দাঁড়িয়ে সরে গেলাম ক্যাম্পফায়ারের কাছ থেকে।

তখনও অস্থিরতা কাটেনি, আবারও আমি অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। জেমসবকের হাড়-গোড় খাওয়ার লোভে এক দঙ্গল হায়েনা এসে জুটেছে ক্যাম্পের পেছনে। ওরা কাটা গাছের ভেতরে বসে হাসির শব্দ করে হট্টগোল করছে। ক্যাম্প থেকে বেশি দূরে গেলাম না তাই। এদিক-সেদিক

করে স্যালির তাঁবুর কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম, ওর কাছাকাছি থেকে মনটা শান্ত করার চেষ্টা চালালাম। তারপর কর্মচারীদের আগুনের দিকে এগিয়ে গেলাম। নরম বালিতে পায়ের কোনো শব্দ হলো না, কাছে পৌঁছাতেই শুনতে পেলাম বুড়ো বন্দুকবাজদের একজন কথা বলছে। চারপাশে গোল হয়ে বসে সবাই মন দিয়ে শুনছে ওর কথা, আগুন প্রায় নিভু নিভু এখন। ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি, সাথে সাথে স্মৃতিতে দোলা দিয়ে গেল। মনে হলো কথাগুলো আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শিহরণ বইয়ে দিচ্ছে। যেন আমার বাহু খামচে ধরলো কেউ, ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

"এই অশুভকে দুনিয়া আর মানুষের মন থেকেও মুছে ফেলতে হবে, চিরতরে।"

টিমোথি মাগেবা এই কথাগুলোই বলেছিল–একদম হুবহু এগুলোই। শুধু ভাষাটা ছিল ভিন্ন। বৃদ্ধ ম্যাটাবেলের কালের আঘাতে বিক্ষত অবয়বটার দিকে মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইলাম আমি। আমার উপস্থিতি টের পেয়েই যেন সে মাথা তুলে তাকালো এদিকে, ছায়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো আমাকে।

আবার কথা বলে উঠলো বৃদ্ধ, সবাইকে সতর্ক করছে। "সাবধান, মাকড়শাটা এসে গিয়েছে," বলল ও। বোঝা গেল, আমার ছোট শরীর আর লম্বা হাত-পায়ের কারণে এরকম নামকরণ করেছে সে। কথাটা শুনে যেন ধ্যানভঙ্গ হলো শ্রোতাদের। সবাই পা ঝাড়া দিতে দিতে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কাশতে লাগল অযথাই। ঘুরে চলে এলাম ওখান থেকে, তবে বৃদ্ধ ম্যাটাবেলের কথাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না মোটেও। খোঁচাতে লাগল ভেতরে, অস্থিরতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেল আরও।

স্যালির তাঁবু অন্ধকার এখন, লোরেনেরটাও। আমি নিজেও শুয়ে পড়লাম কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে হায়েনার ডাক শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম কাল কী হতে পারে। একটা ব্যাপারে অবশ্য নিশ্চিত ছিলাম, দুপুর নাগাদই জানতে পারবো: ছবির দেখা জিনিসটা প্রাকৃতিক, নাকি মানুষের তৈরি। ঘুমানোর আগে এটাই ছিল আমার শেষ ভাবনা।



পরদিন সকাল দশটার দিকে পাহাড়গুলো চোখের সামনে ধরা দিল। ল্যান্ড রোভারের সামনের সিটে থাকার কারণে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ওগুলো, লম্বা লম্বা বাবলা গাছগুলোর মাথার ওপরে কমলা-লাল রঙে রাঙানো; আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত, আমাদের বরাবর সম্মুখ দিগন্তে সোজা উপরে উঠে

গিয়েছে; তারপর দুই দিকে ক্রমশ ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেছে মাটির সাথে।

আজ গাড়ি চালাচ্ছিলাম আমি, লোরেন মানচিত্র আর ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে নির্দেশনা দিচ্ছিল আমাকে; পাহাড়ের গা বেয়ে চূড়ায় কীভাবে যাওয়া যায় সেই রাস্তা বাতলে দিচ্ছিল ও। এখান থেকেই পাহাড়ের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল কিছু ইউফোরবিয়া গাছের ঝাড়–ছবিতেও এই গাছগুলো একদম স্পষ্ট। লোরেন ওগুলোকে ব্যবহার করে আমরা কোনদিকে কোনদিকে যাবো সেটা বের করছিল।

পাহাড়গুলোর উচ্চতা দুইশো থেকে তিনশো ফুটের ভেতর, আমাদের সামনের দিকটা বেশ এবড়ো-থেবড়ো আর আবহাওয়ার আঘাতে ক্ষয়ে যাওয়া, চূড়া পর্যন্ত প্রায় খাড়াভাবে উঠে গিয়েছে বলা যায়। পরবর্তীতে জানতে পারি যে ওগুলো আসলে শক্ত হয়ে আসা বেলে মাটি, ধাতব অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়ায় রঙ পরিবর্তন হওয়ায় আর চেনা যায় না। পাহাড়ের পাদদেশে বড় বড় গাছের ছোট্ট একটা উপবন, তাতে বোঝা গেল যে মাটির নিচে নিশ্চয়ই পানি আটকে আছে, যা থেকে পুষ্টি পায় বিশাল গাছগুলো। ওগুলোর মাটির উপরে উঠে আসা শেকড় প্যাঁচ খেয়ে একটার সাথে আরেকটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে দেখে মনে হচ্ছে মৈথুনরত প্রমত্ত অজগর! গাছগুলোর উজ্জ্বল, ঘন সবুজ পাতা, গত কয়েকদিনের কাটা গাছ আর বাবলার একঘেয়ে বাদামি-সবুজে ক্লান্ত চোখজোড়া আরাম পেল। পাহাড়ের সামনে, প্রায় আধা মাইলটাক এলাকা সম্পূর্ণ খোলা প্রান্তর, এখানে-সেখানে ছোট ছোট ঝোঁপ আর কিছু রঙচটা ঘাসের চাপড়া বাদে কিচ্ছু নেই।

চুপচাপ ঝোপগুলোর ফাঁক দিয়ে ল্যান্ড রোভারটা চালিয়ে নিতে লাগলাম আমি। কেউই কোনো কথা বলছিল না, যতই এগোচ্ছিলাম, স্নায়ুর উপর চাপ বাড়ছিল ততোই। লাল রঙা পাহাড়গুলোর একদমই গোড়ায় পৌঁছে গেলাম একসময়, গাড়ি থেকে বকের মত মাথা বের করে তাকালেই শুধু দেখা যেতে লাগল চূড়াটা।

অবশেষে স্যালি ভাঙলো নীরবতা, আমাদের সম্মিলিত হতাশা আর বিরক্তিই ফুটে বের হলো ওর কথায়। "যদি মূল শহরের বাইরে আসলেই কোনো বিশাল দেওয়াল থাকে, তাহলে তো এতক্ষণে ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ার কথা।"

আমরা পাহাড়ের একদম গোঁড়ায় দাঁড় করালাম গাড়ি, তারপর বহু কষ্টে খানিকটা উঠলাম উপরে, আশপাশের এলাকাটা দেখার জন্য। কেউ কারো চোখের দিকে তাকাচ্ছি না ইচ্ছা করেই। এখানে কোনো কালে কোনো শহর থাকার একটাও আলামত নেই! একটা কাটা পাথর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না

কোথাও, মানুষের বানানো মাটির ঢিবি বা কুয়া বা ঘর থাকারও নিশানা নেই কোথাও। এটা আসলেই ঝোপ-ঝাড়ে ভরা একটা আফ্রিকান পাহাড়, মানুষের পা পড়েনি এখানে আগে কখনও।

"আপনারা নিশ্চিত যে এটাই ঠিক জায়গা?" কোনমতে জিজ্ঞেস করল স্যালি। জবাব দিলাম না আমরা। ট্রাকগুলোও পৌঁছে গিয়েছে ততোক্ষণে। চাকররাও ছোট ছোট দল করে উঠে এল উপরে, পাহাড়ের গায়ের দিকে দেখছে আর ফিসফাস করে আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে।

"ঠিক আছে," বলল লোরেন। "ওরা ক্যাম্প খাটাক, আমরা ঘুরে দেখি। আমি এদিকের ঢাল বেয়ে এগোচ্ছি। আর তোমরা দুজন যাও ওদিকে–আর, বেন, আমার শটগানটাও নিও সাথে।"

আমরা পাহাড়ের গোড়া থেকে ওই উপবনের ভেতর দিয়ে খোঁজা শুরু করলাম। কাছে এগোতেই গাছের মাথায় বসে থাকা ভার্ভেট বানরের একটা ছোট দল আমাদেরকে দেখে চমকে গিয়ে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল। ওদের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখেও আমার বা স্যালির মুখে সামান্য হাসিও ফুটলো না। আমরা একটু পর পর থেমে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম আশপাশ, কিন্তু সেটা শুধু করার জন্যেই করা, আমাদের মাঝে কোনো উদ্দীপনা বা আশা অবশিষ্ট নেই। ক্যাম্প থেকে তিন চার মাইল দূরে এসে বিশ্রামের জন্য থামলাম আমরা। পাহাড়ের মুখ থেকে খুলে আসা, বেলে পাথরের একটা চাঁইয়ের উপর বসলাম দুজনে।

"কান্না পাচ্ছে আমার," বলল স্যালি। "যে কোনো সময় কেঁদে দেব।"

"জানি। আমারও একই রকম লাগছে।"

"কিন্তু ছবিটা। ওখানে তো অবশ্যই দেখা যাচ্ছিল কিছু একটা। আচ্ছা কাজটা লোরেন আপনার সাথে ফাজলামি করার জন্য করেননি তো?"

"না," মাথা নাড়লাম আমি। "লো এসব করতে যাবে না। আমাদের চাইতে ওর আগ্রহ কম ছিল না।"

"তাহলে ছবির ব্যাপারটাকে কী বলবেন?"

"জানি নাহ। ব্যাপারটা অবশ্যই কোনো ধরনের দৃষ্টি বিভ্রমই হবে। পাহাড়ের ছায়া পড়ে এমনটা দেখা যাচ্ছিল, মেঘও হতে পারে।"

"কিন্তু নকশাগুলোর কথা চিন্তা করুন আপনি!" প্রতিবাদ করল ও। "ওগুলো মোটেও এলোমেলো না, জ্যামিতিক আর মাপমতো সবগুলো।"

"আলোর কারণে অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়, স্যালি," বললাম আমি। "ছবিটা সন্ধ্যা ছয়টায় তোলা হয়েছিল, সেটা ভুলে যেয়ো না। তখন কিন্তু সূর্যাস্তের আর বাকি থাকে না। ডুবতে থাকা সূর্যের তৈরি ছায়ায়, মোটামুটি সব ধরনের নকশা-ই তৈরি হয়।"

"সারা জীবনে এতটা হতাশ হইনি কখনও।"

স্যালিকে দেখে আসলেই মনে হচ্ছিল যে, যে কোনো সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়বে। আমি বেশ সংকোঁচের সাথেই ওর কাছে গিয়ে আমার লম্বা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

"আমি স্যরি," বললাম আমি। স্যালিও মাথা তুলে ঠোঁট বাড়িয়ে দিল চুমু খাওয়ার জন্য।

"ওয়াও!" কিছুক্ষণ পরে বলল স্যালি। "ডক্টর কাজিন, আপনি যে কী করেন না।"

"করার তো কিছুই দেখোনি এখনও।"

"যা দেখেছি, সেটাই যথেষ্ট।" আলতো করে আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও। "চলুন, বেন। পাহাড় থেকে দূরে কোথাও চক্কর মেরে তারপর ক্যাম্পে ফিরি। ওইদিকে কিছু থাকতেও পারে।"

রোদের ভেতরেই ধীরপায়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। এখানেও ফুল আছে প্রচুর, খেয়াল করলাম যে মৌমাছির দল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে একটা থেকে আরেকটায় আসা যাওয়া করছে। পরাগরেণু লেগে ওদের পেছনের পা হলুদ হয়ে আছে। দুই দিন আগের বৃষ্টিতে ধুয়ে সাফ হয়ে আছে এরকম একটা ছোট গিরিখাত চোখে পড়ল সামনেই, যদিও এখন আর পানির চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। আমি গিরিখাতটায় নেমে পাথর আর মাটিতে গড়ে ওঠা তলদেশটা পরীক্ষা করে দেখলাম। ভূমি থেকে ওটার গভীরতা তিন ফুট মত, ওখানের পাথরগুলো মসৃণ, পানির ঘষায় এরকমটা হয়েছে নিশ্চিত।

"তোমার ধারণা মিলে যাচ্ছে দেখি, স্যাল," বলতে বলতে মাটি থেকে কয়েকটা নুড়ি তুলে নিলাম। বেলেপাথরের ভেতরে গেঁথে থাকা একটা ঝিনুকও খুঁজে পেলাম পাশে। "তার মানে আমাদের ধারণা সামান্য হলেও সত্যি। একসময় এই জায়গাটা একটা হ্রদের তলদেশ ছিল–দেখে যাও।"

স্যালি আগ্রহ সহকারে নেমে এল আমার পাশে। "কী এটা?"

"এক ধরনের ইউনিয়োনিডা, আফ্রিকান স্বাদু পানির ঝিনুক।"

"ইশ! কাজে লাগানোর মত কিছু যদি পাওয়া যেত!" বলতে বলতে খোলসটা বালিতে ফেলে দিল স্যালি।

"হ্যাঁ," সায় দিলাম আমিও। তারপর গিরিখাতটা থেকে উঠে এলাম উপরে।

আমার একমাত্র অজুহাত হচ্ছে আমার বিচার-বিবেচনা তখন তীব্র হতাশা আর স্যালির সাথে হওয়া আমার সাম্প্রতিক শারীরিক উত্তেজনা দিয়ে আচ্ছন্ন ছিল। নইলে কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্রকে, সে যত ছোটই হোক না কেন, এভাবে অবহেলা করি না। অথচ গত এক ঘণ্টায়, ওখানে থাকা চার-চারটা ইঙ্গিতের একটাও আমার চোখেও পড়ল না! পেছনে একবার ফিরে-ও না তাকিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা।

স্যালি আর আমি ঘামে ভিজে, ধুলো খেয়ে, ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি ক্যাম্প পুরোপুরি পেতে ফেলা হয়েছে। সব কার্যক্রম চলছে ঝামেলা ছাড়াই। আমরাও দেরি না করে দুপুরের খাবার খেতে বসে গেলাম। মেনু হলো টিনজাত হ্যাম আর উইন্ডহোক বিয়ার।

"কিছু চোখে পড়ল?" জিজ্ঞেস করল লোরেন। আমরা দুজনেই সম্মিলিতভাবে মাথা নেড়ে বিয়ারের গ্লাস তুলে ধরলাম ঠোঁটে।

"এ দেখি গরম!" বিয়ারে প্রথম চুমুক দিয়েই বিরক্তি ঝাড়ল স্যালি।

"বাবুর্চি ফ্রিজ চালু করেছে। রাতের বেলা ঠান্ডা পাবেন।"

চুপচাপই খেতে থাকলাম আমরা। লোরেন মুখ খুলল একসময়। "তোমরা আসার আগে লার্কিনকে ফোন করেছিলাম। কালকে একটা হেলিকপ্টার পাঠাবে ও। উপর থেকে শেষ একবার খুঁজে দেখবো। তাহলেই জীবনের মত নিশ্চিত হওয়া যাবে। যদি কিছু না-ই পাওয়া যায়, তাহলে আমি হেলিকপ্টারে করেই চলে যাবো। জোহানেসবার্গে ঝামেলা হচ্ছে আবারও। সমস্যা হচ্ছে, হেলিকপ্টারে প্যাসেঞ্জার সিট মাত্র একটাই। তোমাদের দুজনকে একটু কষ্ট করে ফিরতে হবে।"

ওর কথা শেষ হতেই কয়েকজন কর্মচারী এগিয়ে এল আমাদের দিকে, সবার আগে আছে জোসেফ। ওরা এসে জানালো, কোনো এক বেকুব নাকি ভুল করে আমাদের পানির ট্যাপের মুখ খুলে রেখেছিল, তাতে আমাদের চারটা পানির ট্যাংকের সব পানি গড়িয়ে গিয়েছে। তার মানে বাকি সময়ের জন্য আমাদের সতেরো জন লোকের জন্য বাকি থাকলো মাত্র পঁয়ত্রিশ গ্যালন পানি।

"আশপাশে মাউন বাদে পানি নেই কোথাও। এখন, কালকেই এই জায়গা ছেড়ে ওখানে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় দেখছি না," বলল জোসেফ। এত বড় দুর্ঘটনায় দুশ্চিন্তার বদলে ওর কণ্ঠে খুশির ছোঁয়া।

ব্যাপারটা যে ইচ্ছাকৃত ঘটনা, সেটা একদমই পরিষ্কার বোঝার পরও আমরা বিরক্তি প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই করলাম না। কারো ভেতরেই রাগ এল না কেন যেন।

"ঠিক আছে, জোসেফ," হাল ছেড়ে দেওয়া কণ্ঠে বলল লোরেন। "কাল সকালেই ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলো। দুপুরের ভেতর রওনা দেব আমরা।" সাথে সাথেই মালিক-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়ে গেল কয়েক গুণ। কয়েকজনের মুখে হাসিও দেখলাম, রান্নার আগুনটার ওদিক থেকে অট্টহাসির আওয়াজও পাওয়া গেল একটু পর।

"তোমরা দুজন আজ বিকেলে কী করবে জানি না," একটা সিগার ধরাতে ধরাতে বলল লোরেন। "তবে সকালে আমি হাতির পালের পায়ের ছাপ দেখেছি। ল্যান্ড রোভার আর বন্দুকবাজ দুজনকে নিয়ে যাবো। আজ রাতে না

ফিরলেও চিন্তার কিছু নেই, ধরে নিয়ো আমরা হয়তো হাতির পালটার পেছনে অনেক দূর চলে গিয়েছি।"

স্যালি লোরেনের দিকে তাকালো সাথে সাথে; প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো শিকার বিরোধী লেকচার শুরু করবে আবার, কিন্তু বদলে শুধু ভ্রূ কুঁচকে আবার হ্যাম খাওয়ায় মন দিল।

একটু পরেই ল্যান্ড রোভারটা পাহাড়ের গোড়া ধরে চলে গেল একদিকে। আমি স্যালিকে বললাম, "চূড়ায় ওঠার কোনো রাস্তা আছে কিনা দেখতে যাবো–যাবে নাকি?"

"আমি আর এসবে নেই, বেন," জবাব দিল ও। "আজ বিকেলে ছবি আঁকবো ভাবছি।"

যতোটা সম্ভব হতাশা চেপে, আমিও পাহাড়ের গোড়া ধরে হাঁটা শুরু করলাম। আধা মাইলের মধ্যেই খুঁজে পেলাম কিছু পশুর পায়ের ছাপ। লালচে পাথরের খাঁজের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া, ঝোঁপ ঝাড়ে ভরা একটা সরু নালায় গিয়ে শেষ হয়েছে ওগুলো।

একদম খাড়া ওখানকার ঢাল, পিঠে গনগনে সূর্যের উত্তাপ সহ্য করতে করতে, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, চেহারাসহ সারা গায়ে পাথরের আঘাত সয়ে উঠতে পারলাম উপরে। পাহাড়ের গায়ের ফাটল আর ছিদ্রের ভেতর থেকে এক দঙ্গল ছোট ছোট লোমশ পাহাড়ি খরগোশ চরম কৌতূহলে আমার অধ্যাবসায় অবলোকন করছিল। প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগল আমার উপরে পৌঁছাতে। ঘামে ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছে সারা শরীর, কণ্টকময় মাটিতে লেগে দুই হাতে ছড়ে গিয়েছে অনেক জায়গাতেই।

এখান থেকে, বিশালাকৃতির ইউফোরবিয়ার ছায়া বেষ্টিত পাহাড়ের সামনের দিকটা চমৎকারভাবে দেখা যায়। প্রথমেই আমি বাইনোকুলার দিয়ে চারদিকে দেখে নিলাম: যদি কোনো ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। আমার ঠিক নিচে, পাহাড়ের পাদদেশের কাঁটা গাছের ঝোপটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা, ঘাসও নেই তেমন; দেখেই বুঝলাম যে এখানে কোনোকালে কোনো মানব বসতি বা চাষবাস হয়নি। আমার আসলে এতটা আশা করাই উচিত হয়নি, কিন্তু তার পরেও হতাশায় আমার পেটের ভেতর মোচড়ানো আরম্ভ হলো। সেটাকে দমিয়ে বাইনোকুলার তাক করলাম নিচের ক্যাম্পের দিকে। একজন বান্টু আগুনের কাঠ কাটছে, ওখান থেকে শব্দ এই পর্যন্ত পৌঁছাতে সময় লাগছে কিছুটা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কুড়াল চালানো, তার একটু পরে আঘাতের শব্দ শুনে মজা নিলাম কিছুক্ষণ। এদিক সেদিকে তাকিয়ে উপবনের ঠিক পাশেই স্যালিকে দেখতে পেলাম। গোলাপি ব্লাউজ পরনে। বড় কিছু আবিষ্কার করার সমস্ত আশাই বিসর্জন দিয়েছে ও; বাস্তববাদী মেয়ে, এখন এই অভিযাত্রা থেকে যেটুকু আনন্দ সে নিতে পারে, তা নিয়ে ফেরার চেষ্টা

করছে। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওকে আমি; ওকে আমার নিজের করে নেওয়ার জন্য সামনে আর কী কী করা যায় তা নিয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ। মাত্র একটা রাত কাটিয়েছি ওর সাথে। তাছাড়া আমি এতটা নির্বোধ না যে, ধরে নেব: এতেই ওর মত বাস্তবজ্ঞান আর উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন, সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন আধুনিকা মেয়ে আমার প্রতি প্রচণ্ড পাগল, সেটা প্রমাণিত হয়। ভাবসাবে যতই ভালো মেয়ে হোক না কেন, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত ডক্টর বেন ওর বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগেও আমার স্যালি অনেক পুরুষের সাথে খেলাটা খেলেছে। সম্ভাবনা খুব বেশি যে আমার শরীর না...বরঞ্চ আমার মেধার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আমার প্রতি করুণা আর খুব সম্ভবত কিছুটা বিকৃত কৌতূহল থেকে ও এ ব্যাপারে প্ররোচিত হয়েছে। যাই হোক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে ওর অভিজ্ঞতাটা খারাপ ছিল না মোটেও, এখন আমার কাজ হবে হচ্ছে আমার প্রতি ওর এই শ্রদ্ধা আর করুণাকে আরও গভীর আর স্থায়ী কিছুতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকতে থাকতে অদ্ভুত শান্তিময় অনুভূতিতে ছেয়ে গেল আমার মন; ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারলাম যে এই অভিযাত্রাটা আসলে ব্যর্থ না মোটেও। মনে হতে লাগল এই ভূতুড়ে হিলস অভ ব্লাডের সৌন্দর্য আর রহস্যের মাঝে আরও কয়েক দিন কাটাতে পারলে মন্দ হতো না। স্যালি আর আমি এই বিজন প্রান্তরে থেকে যেতাম, ওকে শিখাতাম কীভাবে ভালোবাসতে হয়।

আচমকাই চোখের কোণে একটা নড়া-চড়ার আভাস ধরা পড়ায়, সন্তর্পণে সেদিকে মাথাটা ঘোরালাম আমি। ছয় ফুট মত দূরে একটা ম্যারিকো সানবার্ড[২৪] একটা বুনো ঘৃতকুমারী গাছের ফুল থেকে মধু খাচ্ছে; ওটার দীর্ঘ, বাঁকানো চঞ্চুটা আগুনরঙা ফুলের পাপড়ির ভেতর বাহির করার সময় ধাতব সবুজ রঙের মাথাটা ঝিকিয়ে উঠছে। তীব্র আনন্দ নিয়ে ওটাকে দেখতে লাগলাম আমি, একটু পর যখন ওটা ওর ছোট্ট পাখাগুলো নেড়ে নাচতে নাচতে চলে গেল, তখন মনে হলো কিছু একটা অসঙ্গতি আছে এখানে, যা কিনা চোখে পড়ছে না। অনুভূতিটা বাড়তে বাড়তে অস্থির হয়ে গেলাম; মনে হচ্ছে কেউ আমাকে কোনো বার্তা দিতে চাচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে ধরতে পারছি না। আমি আমার মস্তিষ্ককে শান্ত হওয়ার সুযোগ দিলাম। মনে হতে লাগল এই তো ঠিক চোখের সামনেই যেন ছিল ব্যাপারটা। ধরবো ধরবো করেও ধরতে পারলাম না শেষমেশ। তবে আর একটু গেলেই ধরে ফেলতে পারবো।

বিকেলের এই হাঁফ ধরানো বাতাস আর নিস্তব্ধতায় আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম, আচমকাই দূর থেকে আসা বন্দুকের গুলির বুম বুম শব্দে কেঁপে

---

[২৪]হামিং বার্ডের মতোই একটা পাখি, তবে পিছনে উড়তে পারে না

উঠলাম। উঠে দাঁড়িয়ে আরও তিরিশ সেকেন্ড মত কান পেতে রইলাম–আবার শোনা গেল, বুম, তারপর আবার। লোরেন হাতির পালটাকে খুঁজে পেয়েছে।

আমি বাইনোকুলার দিয়ে স্যালির দিকে তাকালাম। ও-ও শুনতে পেয়েছে শব্দটা। ইজেল থেকে দূরে সরে গিয়ে বনটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এখন। উঠে দাঁড়ালাম আমিও, যদিও অস্থিরতা কাটেনি তখনও। পাহাড় বেয়ে নামা শুরু করলাম এবার। কোনোভাবেই অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না, উল্টো ওটা বরং বেড়েই চলেছিল। কিছু একটা ব্যাপারতো এখানে আছে নিশ্চিত, ভাবনা এল মাথায়, অদ্ভুত এবং অব্যাখ্যেয় কিছু একটা।

"আপনি আর আমি অনেক ভাগ্যবান," টিমোথি মাগেবা একবার বলেছিল আমাকে। "আত্মারা আমাদেরকে চিনে রেখেছে। তাই অন্তরের চোখ দিয়ে আমরা সাধারণের দৃষ্টির বাইরের জিনিসও দেখতে পাই, কান পাতলে নীরবতার শব্দও শুনতে পাই।"

নিচের ছায়া ঘেরা নালায় নামার পর শরীর ঠান্ডা হলো আমার তবে জামা শুকালো না। হঠাৎ টের পেলাম ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তবে সেটা পুরোপুরি ঠান্ডার জন্য না। আমি দ্রুত পা চালালাম, ক্যাম্পে স্যালির কাছে পৌঁছাতে চাই দ্রুত।

সেদিন রাতের খাবার হিসেবে খাওয়া হলো ভয়ানক ঝালের পেপার সসে ভেজানো, পাতলা করে কাটা হাতির হৃৎপিণ্ডের গ্রিল; রোস্ট করা খোসা শুদ্ধ আলু দিয়ে পরিবেশন করা হলো তা। লোরেনের কথা মত বিয়ার এখন বরফ ঠান্ডা। দেখা গেল লোরেনের মেজাজ বেশ খোশ হয়ে আছে। মন ভরে শিকার করতে পেরেছে আজ, এখানে এসে কিছু না পাওয়ার হতাশা পুষিয়ে গিয়েছে প্রায় পুরোটাই। আগুনের পেছনে লণ্ঠনের বাতির নিচে শোয়ানো আছে চারটা বিশাল বাঁকানো হলুদাভ হাতির দাঁত।

যখন লোরেন ঠিক করে যে কিছু করে দেখাবে, তখন আসলে তাকে আটকানো ভার। যদিও স্যালি চেষ্টা করেছিল যে এসবে মোটেও আগ্রহী না–এরকম একটা ভাব ধরতে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই লোরেনের কারিশমায় নিজেও বুঁদ হয়ে গেল। লোরেন যখন খাওয়া শেষে টোস্ট করতে শুরু করল, তখন ওর হাসির শব্দই সবচেয়ে জোরে শোনা যেতে লাগল। "সেই শহরের প্রতি যার কোনো অস্তিত্ব নেই, সেই গুপ্তধনের প্রতি যা আমরা খুঁজে পাইনি।"

সামান্য মদ্যপ অবস্থায় শুতে গেলাম আমি, খুব আজব স্বপ দেখলাম ঘুমের ঘোরে–তবে সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন মাথা একদমই পরিষ্কার। ভেতরে ভেতরে কোনো এক অজানা কারণে খুব উত্তেজিত অনুভব করছিলাম, কেন যেন মনে হচ্ছিল আজ ভালো কিছু হতে চলেছে।



দুপুরের এক ঘণ্টা আগে দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে এল হেলিকপ্টারটা। ছেঁড়া ন্যাকরা, তেলে চুবিয়ে কালো ধোঁয়া সৃষ্টি করে সংকেত দেওয়া হলো আমাদের দিকে আসার জন্য; প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে ওটা নেমে এল ক্যাম্পের কাছে। রূপালি পাখাটা ঝিলিক মারতে মারতে ধুলো আর ময়লার ঘূর্ণিঝড় তুলে ফেলল ওখানে।

কালো চুলের কম বয়সী পাইলটটার সাথে সংক্ষেপে আলোচনা সেরে নেওয়া হলো, তারপর লোরেন ওর পাশের সিটে চড়ে বসতেই, কিম্ভুত যানটা আবারও উঠে গেল শূন্যে। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চক্কর মারা শুরু করল প্রথমে, প্রতি চক্করে উপরে উঠে যাচ্ছে একটু একটু করে। একসময় নীল আকাশের বুকে ছোট একটা পোকার মত দেখা যেতে লাগল ওটাকে। ভাবেসাবেই বোঝা গেল যে লোরেন কিছুই দেখতে পায়নি, আমি আর স্যালি দ্রুতই আগ্রহ হারিয়ে খাওয়ার তাঁবুর ছায়ায় গিয়ে বসে জিরোতে লাগলাম।

"তাহলে, সব শেষ হয়ে গেল," বলল স্যালি।

আমি ওর কথার কোনো জবাব দিলাম না, তবে ফ্রিজের কাছে গিয়ে দুজনের জন্যেই এক বোতল করে উইন্ডহোক নিয়ে এলাম। বিগত কয়েক দিনের ভেতর এই প্রথম কাজিন-এর ধুঁকতে থাকা মস্তিষ্ক তার সবগুলো ইঞ্জিন চালু করে দৌড়াতে শুরু করেছে। তিরিশ গ্যালন পানি দুজনের মধ্যে ভাগ করে নিলে দুই সপ্তাহ প্রতিদিন এক গ্যালন দিয়ে চালানো যাবে। পানি? আমার অবচেতন মনে পানি নিয়ে আরও কিছু একটা ঘুরছে। স্যালি আর পানি।

ক্যাম্পের বাইরের দিকে আবারও নেমে এল হেলিকপ্টারটা।

"কিছু পেলাম না। ঝটপট লাঞ্চ করে নাও, তারপর বেরিয়ে পড়বো। আশা করি তোমরাও ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছাতে পারবে।"

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম আমি, আমার মাথার ভেতরে কী চলছে সেটা বললাম না, কারণ তাতে লোরেন তর্ক বাঁধিয়ে দিতে পারে।

"আমি স্যরি, বেন। আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না।" লোরেন পাউরুটির উপর সরিষার প্রলেপ দিয়ে, জেমসবকের হাড় ছাড়ানো মাংস তার ভেতরে পুরে স্যান্ডউইচ বানাতে বানাতে বলল আমাকে। "যাই হোক, জীবনে হতাশা এরকম আসবেই।"

বিশ মিনিট পরে লোরেনের জরুরি জিনিসপত্র সব তুলে দেওয়া হলো হেলিকপ্টারে। পাইলট ইঞ্জিন চালু করতেই বিদায় নিলাম আমরা।

"জো'বার্গে দেখা হচ্ছে। হাতির দাঁতগুলো সাবধানে এনো।"
"সাবধানে যেয়ো, লো।"
"অল দ্য ওয়ে, পার্টনার?"
"অল দ্য ওয়ে, লো।"

তারপরে ও মাথা নিচু করে ঘুরন্ত পাখার নিচ দিয়ে প্যাসেঞ্জারের সিটে গিয়ে উঠলো। বিশাল একটা ভোমরের মত করে ওটা আকাশে উঠে গাছগুলোর উপর দিয়ে হারিয়ে গেল পাহাড়ের ওপাশে। ভোমরা নাকি মৌমাছি? মৌমাছি! মৌমাছি! মাই গড! এটাই তো কাল থেকে খুঁচিয়ে চলেছে আমাকে।

মৌমাছি, পাখি আর বানর!

আমি স্যালির হাত ধরে টান দিলাম, আমার উত্তেজনা চমকে দিল ওকে।

"স্যালি, আমরা যাবো না।"

"কী?" চোখ মুখ কুচকে বলল স্যালি।

"এখানে বেশ কিছু জিনিস আমরা ভালো করে না দেখেই উপেক্ষা করে গিয়েছি।"

"কী জিনিস?"

"পাখি আর মৌমাছি," ওকে বললাম আমি।

"আসলেই, নাকি আমাকে একা পেয়ে ফস্টি নস্টির ধান্দা করছেন?" বলল স্যালি।



পানিকে আমরা পনেরো আর বিশ গ্যালনের দুটো ভাগ করলাম। এতে করে কর্মচারীরা প্রত্যেকে আগামী দুই দিনের জন্য প্রতিদিন আধা গ্যালনের সামান্য বেশি পাবে, ওদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট। ল্যান্ড রোভারটা রেখে দিলাম আমি, ট্যাঙ্ক ভরে নিলাম, আরও পঁচিশ গ্যালন রাখলাম ইমার্জেন্সি ক্যান-এ। সাথে রেডিয়ো, একটা তাঁবু, বিছানা; আর বেশ কিছু যন্ত্রপাতি যেমন কোদাল, কুড়াল, বেলচা, গ্যাসের লণ্ঠন আর অতিরিক্ত সিলিন্ডার, টর্চ, ব্যাটারি, টিনজাত খাবার, লোরেনের শটগান আর এক ডজন গুলিও রেখে দিলাম। সেই সাথে স্যালি আর আমার নিজেদের জিনিসপত্র তো আছেই। বাকি যা কিছু ছিল, সেসব ট্রাক দুটোয় তুলে দেওয়া হলো। কর্মচারীরা সব উঠে যাওয়ার পরে আমি বৃদ্ধ ম্যাটাবেলে লোকটাকে একদিকে ডেকে নিয়ে গেলাম।

"সম্মানিত বাবা," সিন্ডেবেলেতে বললাম আমি, "এই এলাকায় কী এক অশুভ রহস্য আছে বলে বলতে শুনেছি আপনাকে। এখন একজন ছেলে

হিসেবে জানতে চাচ্ছি, একজন বন্ধু হিসেবেও, দয়া করে আমাকে সেসব জিনিস সম্পর্কে জানান।"

বিমূঢ়তা কাটাতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার। এরপর টিমোথি মাগেবার কাছ থেকে শোনা একটা কথা বললাম আমি ওকে। এটা একটা গোপন সংকেত, এই রহস্যের প্রবর্তকদের উচ্চস্তরের মধ্যে পরিচিতির একটা সংকেত এটা। বৃদ্ধ লোকের মুখটা আক্ষরিক অর্থেই হাঁ হয়ে গেল। এখন আর উনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না, আমার আবেদনকেও উপেক্ষা করতে পারবেন না।

"বাবা," নরম গলায় বলল লোকটা। "তুমি এই সংকেতটা জানো মানে হচ্ছে, তুমি একটা কিংবদন্তীর কথা-ও জানো। একটা সময় ছিল যখন এই পাথরগুলো ছিল নরম আর বাতাস ছিল কুয়াশায় ভরা," সেই আদিকালের চিরচারিত রূপ, "তখন খুব বাজে একটা ঘটনা ঘটে, আমাদের পূর্বপুরুষদের গড়ে তোলা এই জায়গাটা দখল করে নেয় এক অশুভ শক্তি। তখন তারা এই পাহাড়গুলোর উপরে এক মরণ বাণ মারে আর অভিশাপ দেয় যাতে সেই অশুভ শক্তি পৃথিবীর মাটি আর মানুষের মন থেকে মুছে যায়, চিরতরে।"

আবার সেই দৈব বাণী, হুবহু একই ভাবে।

"কিংবদন্তী এইটুকুই?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "আর কিছু নেই?"

"আর কিছু নেই," বৃদ্ধ লোকটা বলল আমাকে, আমি জানি সে সত্যিই বলছে। আমরা অপেক্ষারত লরিগুলোর কাছে ফিরে গেলাম।

জোসেফকে শাঙ্গান ভাষায় বললাম, "সাবধানে যেয়ো। দেখে-শুনে চালাবে গাড়ি, সঙ্গে যারা আছে তাদের কথা মাথায় রেখে গাড়ি চালাবে–কারণ আমার কাছে ওরা মূল্যবান।" যথারীতি জোসেফও হাঁ হয়ে গেল ভাষা শুনে, ওর মাথা কাজ করছে না বোঝা গেল। আমি ক্যাম্পবয়দের দিকে ফিরে সেচুয়ানা ভাষা শুরু করলাম এবার।

"মাকড়শার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে শুভ কামনা।" ওদের দেওয়া নাম ব্যবহার করায় হতবুদ্ধি হয়ে গেল ওরা, তবে গাড়ি নিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরে যখন সবার বিহ্বলতা কাটলো, তখন কৌতুকটা ধরতে পেরে হাসতে লাগল। কাঁটা গাছের আবডালে হারিয়ে গেল ট্রাকগুলো, একটু পরে ওদের ইঞ্জিনের আওয়াজও ঘন ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গিয়ে নেমে এল নিস্তব্ধতা।

"আমার মনে হয় কী জানেন," চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল স্যালি। "আমাকে বোধহয় ভূতে ধরেছে! নইলে আমি লোকালয় থেকে দুইশো মাইল দূরে এমন এক লোকের সাথে এই বিজন প্রান্তরে থেকে গেলাম যার মতিগতি নিশ্চিতভাবে সন্দেহজনক।" বলে ও হিহি করে হাসতে লাগল। "ব্যাপারটা দারুণ না? কী বলেন?" জানতে চাইলো ও।



পাহাড়ের চূড়ায় আমি একটা জায়গা বের করলাম, যেখান থেকে চারপাশটা সহজে দেখতে পারবো; বেবুন আপেল গাছের একটা মোটসোটা ডাল থাকায় হেলান দিয়ে পাহাড়ের দুই পাশের দৃশ্যই চমৎকারভাবে দেখা যায়। সেই সাথে নিচের খোলা প্রান্তরও দৃষ্টিগোচর হয় স্পষ্ট। স্যালি নিচের নিস্তব্ধ উপবনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, ওকেও দেখতে কষ্ট হচ্ছে না একদম।

"য়্যু হুউউ!" স্যালির চিৎকার দুর্বলভাবে এসে লাগল কানে, দুই হাত সোজা আকাশের দিকে তাক করে ধরে আছে ও। এটা আমাদের বানানো একটা সংকেত, অর্থ হচ্ছে, 'ফিরে আসতে পারো।'

"যাক," নিজেকেই বললাম আমি। ও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে যা দেখার। আমি খুব সতর্কতার সাথে বুঝিয়ে দিয়েছি, কীভাবে কপালে হাত দিয়ে সূর্যের তির্যক রশ্মি থেকে চোখকে বাঁচিয়ে, সূর্যরশ্মির ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোনালি কণাগুলোর তীরবেগে ছুটে যাওয়া দেখতে হয়। মৌচাক খুঁজে বের করার জন্য প্রাচীন আমলের মধু শিকারিরা ব্যবহার করতো এই পন্থা, একজন বুশম্যান শিখিয়েছিল আমাকে।

নেমে এলাম পাহাড় থেকে, তারপর চূড়া জুড়ে পথ আটকে রাখা কাঁটা গাছ আর ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে লাগলাম। কোত্থেকে খোঁজা শুরু করতে হবে সেটা আগেই ভেবে রেখেছি, কারণ এই লাল পাহাড়ের অসংখ্য নালা আর ফাটলের কোনো একটাতেই মৌচাকটা থাকার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। তাছাড়া কোনদিকে যেতে হবে তা স্যালি নিচ থেকে বলে দেওয়ায় কাজটা আরো সহজ হয়ে গেল। মাত্র পনেরো মিনিটের মাথায় ও একটা হাত পাখার মত বনবন করে ঘোরাতে লাগল, আমিও ওর ইঙ্গিত ধরতে পারলাম।

"ওখানেই! ঠিক আপনার নিচে।"

আমি আবারও ধার বেয়ে ঝুঁকে তাকালাম। ঠিক নিচেই, সূর্যের আলোয় দ্রুত বেগে মৌমাছির ঘরে ফেরার দৃশ্য দেখতে পেলাম এবার।

আরও খানিকটা ঝুঁকে, মৌচাকে ঢোকার রাস্তাটাও দেখতে পেলাম; একটা লম্বা আয়তাকার ফাটল, ওটার ধারগুলোয় পুরনো মোম জমে জমে রঙ পাল্টে গিয়েছে। কর্মী মৌমাছির সংখ্যা আর ঢোকার মুখের মোমের প্রলেপের পরিমাণ দেখে নিশ্চিত হলাম যে, বিশাল একটা মৌচাক এটা। এমন অগম্য জায়গায় চাকটার অবস্থান, যেখানে সম্ভবত কয়কশো বছর কোনো মানুষ তো

দূরে থাক, কোনো জানোয়ারও এটাকে বিরক্ত করেনি। ব্যাপারটা খুবই বিরল, কারণ এই এলাকায় মধুর চাহিদা প্রচুর।

ঝুঁকে থাকা একটা ডালে আমার সাদা রুমালটা বেঁধে জায়গাটা চিহ্নিত করে রাখলাম, তারপর নেমে এলাম সমতলে, স্যালির কাছে। দ্রুত নেমে আসছে অন্ধকার। আমাদের এই সামান্য সাফল্যেই ও চরম উত্তেজিত হয়ে আছে। রাতে খাওয়ার সময়, এই আবিষ্কারের তাৎপর্য কী হতে পারে, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম।

"আপনার মাথায় অনেক বুদ্ধি, ডক বেন।"

"কিন্তু আসলে আমি কেয়ামত আসার মতই দেরি করে ফেলেছি। পুরো দুটো দিন চোখের সামনে সব সূত্র ছিল, অথচ হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগে সেগুলো চোখেই পড়েনি আমার," বিরস বদনে ওকে বললাম আমি। "এলাকাটা পাখি, জন্তু জানোয়ার আর মৌমাছি দিয়ে ভরা, এর মানে হচ্ছে এখানে অবশ্যই প্রচুর পানির সরবরাহ আছে কোথাও। অথচ আশপাশে দুইশো মাইলের ভেতরে কোনো স্থায়ী জলাধার থাকার কথা না–কথাটা যে ভুল সেটা নিশ্চিত।"

"কোথায় যে সেটা খুঁজে পাবো, ভেবেই পাচ্ছি না!" আবারও উৎসাহে চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে ওর।

"আমি ভাবতেও চাচ্ছি না, তবে নিশ্চিত থাকতে পারো, যখন খুঁজে পাবো সেটা দারুণ কিছুই হবে।"

রাতে ভদ্রতা মেনে বাইরেই কাপড় পাল্টে, শোয়ার পোশাক পরে যখন তাঁবুতে ঢুকলাম, দেখি স্যালি ততোক্ষণে বিছানায় শুয়ে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিয়েছে। দুই ক্যাম্প বেড-এর মাঝের জায়গাটায় কিছুক্ষণ ইতস্তত করলাম আমি; অবশেষে ও শয়তানির এক হাসি হেসে, আমার উপর করুণা বর্ষণ করে, আহ্বানের ভঙ্গিতে কম্বলের এক কোনা টেনে সরিয়ে দিল।

"কাম টু মামা," বলল ও।

ভোরের ঠিক আগে, ঠান্ডা আর অন্ধকারে আমি আমার চামড়ার জ্যাকেটটা কোনোরকম গায়ে জড়িয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে, সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবারও নিজেকে খুব সুখী মানুষ বলে মনে হচ্ছে, গত রাতে আমার অনেকগুলো সন্দেহই অপসারিত হয়েছে।

নিচের অন্ধকার সমতলে আলোর ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। স্যালি আবারও উপবনের পেছনে নিজের জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে, সম্ভবত এই আফ্রিকান অন্ধকারে, বন থেকে আসা অদ্ভুত সব শব্দে, জীব-জন্তুর চিৎকারে কিছুটা ভয় পাচ্ছে আর একাকী বোধ করছে। আমিও আমার টর্চটা কয়েকবার জ্বালিয়ে-নিভিয়ে ওকে আশ্বস্ত করলাম, ভোর শুরু হলো খুব দ্রুতই।

ভোর বেলাটা শুরু হয় নরম গোলাপি দিয়ে, তারপর সেটা গড়ায় লাল-এর দিকে, কিছুক্ষণ ফ্যাকাসে লাল হয়ে থাকার পরে হয়ে যায় মালবেরি

রঙের–এরপরেই দিগন্ত ফেটে বিস্ফোরিত হয় সূর্য, মৌমাছিরাও দলে দলে বেরিয়ে আসে চাক থেকে। বিশ মিনিট ধরে আমি ওদের দিকে লক্ষ্য করলাম, ওরা উড্ডয়নের নকশা আর উদ্দেশ্য ঠিক করল। একদল কর্মী মৌমাছি উড়ে গেল সমতলের উপর দিয়ে। এরা হচ্ছে পরাগরেণু সংগ্রাহক। আমি এগুলো বের করলাম ঝুঁকে পড়ে, বাইনোকুলার দিয়ে ওগুলোর ফিরে আসা লক্ষ্য করে। ফাটলটার মুখ দিয়ে ঢোকার সময় দেখলাম ওগুলোর সবগুলোর পেছনের পায়ে হলুদ রঙের পরাগ লেগে আছে।

এসব করতে গিয়ে আমি উড্ডয়নের আরও একটা নকশা বের করে ফেললাম, একটুর জন্য মিস হয়ে যাচ্ছিল সেটা। কর্মীদের একটা দল একবারে সোজা লম্বভাবে নেমে যাচ্ছে নিচের সবুজ বনের ভেতরে–ফিরে আসার সময় দেখলাম ওদের পায়ে কোনো পরাগ নেই। তার মানে এরা পানি বাহক! আমি স্যালিকে সংকেত দিলাম পাহাড়ের গোড়ার দিকে আসতে; আজ সকালে সূর্যের কিরণের বক্রতা আর কোণ অনুযায়ী আমাদের ভূমিকা অদল-বদল হয়ে গিয়েছে। একটু পরেই ও ইশারা করে জানালো যে দেখতে পেয়েছে ওগুলোকে, আমি আবারও হাচড়ে পাচড়ে নামা শুরু করলাম নিচের সমভূমির দিকে।

পাহাড়ের নিচে, বনের দিকে মৌমাছির আনাগোনার পথটা আমাকে দেখিয়ে দিল স্যালি, কিন্তু পাহাড়ের ছায়ার কারণে ঠিক কোথায় যাচ্ছে, সেটা বের করার আগেই গায়েব হয়ে গেল ওরা। প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে ওদের দিকে খেয়াল করলাম, কিন্তু তাতেও কিছু ধরতে না পেরে বনের ভেতরে ঢুকেই খুঁজে দেখবো বলে স্থির করলাম।

খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে, দুপুর নাগাদ নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে উপবনের ভেতর অন্তত কোনো পানির উৎস নেই। স্যালি আর আমি একটা মোটকা হোবা-হোবা গাছের গায়ে পিঠ লাগিয়ে বসে থাকলাম পাশাপাশি। কিংবদন্তী অনুসারে ডুমুর জাতীয় এই গাছটা এখানকার আদিম অধিবাসীরা নিজেদের দেশ থেকে সাথে করে নিয়ে এসেছিল। আমরা হতাশ হয়ে, দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"আবারও ধরা খেলাম!" বলল স্যালি। ওর কপাল আর গালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। সেই ঘামে মুখের এক পাশে এক গোছা চুল লেপ্টে আছে। একটা আঙুল দিয়ে ও আলতোভাবে সেটাকে কানের পেছনে গুঁজে দিল।

"এখানেই আছে কোথাও। খুঁজে পাবো দেখো," ওকে বললাম। কিন্তু নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেরই বিশ্বাস হলো না। "আছে এখানে কোথাও। না থেকে যাবে কই!"

স্যালি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাবে এমন সময় আমি ওর ঠোঁটে আঙুল চেপে থামিয়ে দিলাম। উপবনের শেষ গাছের সারির পেছনে নড়া-চড়া

চোখে পড়েছে আমার। এক দঙ্গল ভার্ভেট বানর হুপ হুপ করতে করতে লেজ তুলে খোলা প্রান্তরটা পার হচ্ছে। বনের কাছে পৌঁছাতেই অদ্ভুত ভঙ্গিমায় ওরা সবচেয়ে কাছের গাছটায় লাফ মেরে চড়ে বসল। তারপর পাতার ফাঁক দিয়ে মুখ নামিয়ে দেখতে লাগল ইতি-উতি উঁকি মেরে। ওদের ছোট ছোট কালো মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছিল খুবই চিন্তায় আছে ওরা, তবে হোবা-হোবার নিচে চুপচাপ বসে থাকায় আমাদেরকে দেখতে পেল না।

এরপর দলটা আত্মবিশ্বাসের সাথে গাছের মাথা বেয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হলো, বড় বড় পুরুষ সদস্যরা যাচ্ছে আগে আগে, পেছনে মায়েরা চলেছে বাচ্চাদেরকে পিঠে ঝুলিয়ে। আর কিশোর বানরেরা চলছে মিছিলের শেষ ভাগে।

প্রকাণ্ড একটা বুনো ফিগ গাছের মাথার ডালগুলোয় গিয়ে থামলো ওরা, গাছটার শিকড়সহ, কাণ্ডেরও বেশ খানিকটা পাহাড়ের লাল পাথরের মধ্যে প্রবিষ্ট। মাটি থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট ওপরে ওটার ডালপালা আর পাতা ছড়িয়ে আছে। ওখান থেকে আর দেখা গেল না বানরের দলকে।

তাজ্জব হয়ে গেলাম আমরা। প্রায় ষাটটা বানর গাছে উঠলো, এরপর ওগুলো এত দ্রুত গায়েব হয়ে গেল যে ডাল খালি হয়ে গেল মুহূর্তেই। একটা বানরকেও দেখা গেল না আর।

"কই গেল ওগুলো?" ফিসফিস করে বলল স্যালি। "পাহাড়ের উপরে উঠে গিয়েছে নাকি?"

"না, ওদিকে যায়নি," সবগুলো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললাম আমি। "আমার মনে হয় জায়গাটা আমরা খুঁজে পেয়েছি, স্যাল। আমার ধারণা এটাই সেই জায়গা, তবে আগে বানরগুলোকে ফিরে আসতে দাও।"

মিনিট বিশের পর আবারও বানরগুলো ভোজবাজির মত উদয় হতে থাকলো বুনো ফিগের ডালে। এবার দলটা ঢিমেতালে পাহাড় বেয়ে বেয়ে এগোতে লাগল সামনে। সবগুলো চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত আমরা ওখানেই অপেক্ষা করলাম।

বুনো ফিগটার প্যাঁচানো আর মোটা মোটা শেকড়গুলো মইয়ের মত, তবে অনিয়মিত ধাপ সৃষ্টি করেছে। গাছের কাণ্ড যেখানে পাহাড় থেকে বেরিয়েছে, সেই পর্যন্ত চলে গিয়েছে ধাপগুলো। আমরা উপরে উঠতে উঠতে কাণ্ডটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। পাশে হাত বুলিয়ে দেখলাম, মাথার উপরের ডালগুলোর উপরে উঁকি দিলাম। কাণ্ডটা আক্ষরিক অর্থেই প্রকাণ্ড, তিরিশ ফুট বেড় হবে, পাহাড়ের এবড়ো থেবড়ো গায়ে ঘষা লেগে লেগে কোথাও কোথাও বিকৃত বা চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। এমনকি আমার ধারণা তখনও জিনিসটা আমাদের নজর এড়িয়ে যেত, যদি পাথরের ভেতরে ঢুকে যাওয়া একটা মসৃণ করে কাটা পায়ে হাঁটার পথ নজরে না আসতো। হাজার হাজার বছর ধরে এই

পথটা পা আর থাবার আঘাতে জর্জরিত হয়ে টিকে আছে এখনও। পথটা বুনো ফিগের হলুদাভ বিশাল গুঁড়ি আর পাথরের দেওয়ালের মাঝামাঝি অবস্থিত। ঠিক যেরকম কোন একটা ঝর্ণার আড়ালে গুহা লুকিয়ে থাকে, পানির কারণে গুহার মুখ দেখা যায় না, এখানে ফিগ গাছটা আড়ালের কাজটা করেছে।

স্যালি আর আমি গাছের পেছনের অন্ধকার খোলা মুখটায় উঁকি দিলাম, তারপর আবার একজন আরেকজনের দিকে চাইলাম। ওর চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে আর গাল হালকা গোলাপি রঙে রঙিন।

"অবশেষে!" ফিসফিস করে বলল ও, আমিও সায় দিলাম, কথা বলার ভাষা পাচ্ছি না।

"চলুন!" বলে আমার হাত ধরে টান দিল স্যালি, আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

ঢোকার জায়গাটা আসলে পাহাড়ের গায়ের বিশাল একটা লম্বালম্বি ফাটল, উপর থেকে আলোও প্রবেশ করছে প্রচুর। উপরে তাকিয়ে দেখলাম বানরের পায়ের ঘষায় পাথরের গা মসৃণ হয়ে আছে, ওরা ওদিক দিয়েই প্রবেশ করে গুহায়।

সুড়ঙ্গটা ধরা এগোতে লাগলাম আমরা, দুই পাশের দেওয়াল প্রায় বিশ ফুটের মত উঁচু, উপরে উঠে ইংরেজি *ভি* অক্ষরের মত করে মিলে গিয়েছে। একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমরাই এখানে পা রাখা প্রথম মানুষ না। দুপাশের মসৃণ লাল দেওয়াল ভরা চমৎকার সব বুশম্যান গুহাচিত্র। এত সুন্দর আর এতটা সংরক্ষিত অবস্থায় আর কোথাও গুহাচিত্র দেখিনি আমি।

"বেন! ওহ বেন! দেখেছেন কারবার!" বুশম্যান গুহাচিত্রের ব্যাপারে স্যালি বিশেষজ্ঞ একজন। "এ তো পুরো গুপ্তধনের খনি। ওহ, আপনার যে কত বুদ্ধি!" আবছায়াতেও ওর চোখের ঝিলিক দেখতে পেলাম আমি।

"সামনে চলো!" ওর হাত ধরে টানলাম আমি। "পরে-ও এসব দেখার অনেক সময় পাওয়া যাবে।"

সরু জায়গাটা দিয়ে ধীরে-সুস্থে হাঁটতে লাগলাম আমরা, প্রায় একশো ফুট পর্যন্ত জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেল নিচের দিকে। যতই এগোচ্ছি, উপরে ছাদ আরও উঁচু হচ্ছে, একসময় আবছায়ার কারণে আর দেখাই গেল না। সামনের অন্ধকারের ভেতরের কোনো খুপরি থেকে বাদুড়ের ক্যাঁচকোঁচ ভেসে এল কানে।

"সামনে আলো আছে," বললাম আমি। আর একটু এগোতেই একটা খোলা গুহায় এসে দাঁড়ালাম আমরা। ঘরটা গোলাকার, আড়াআড়ি মোটামুটি ৩০০ ফুট মত হবে, নগ্ন দেওয়াল উপরের দিকে উঠে গিয়েছে ২০০ ফুট-এর মত। একটা শঙ্কুর ভেতরের দিকের মত দেওয়াল ক্রমশ সরু হতে হতে

একদম উপরে ছোট একটা ফোঁকর তৈরি করে শেষ হয়েছে। মেঘহীন নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে ওখান দিয়ে।

দেখেই বুঝতে পারলাম যে এখানে আসলে লাল বেলেপাথরের মাঝে চুনাপাথর ঢুকে গুহাটা তৈরি হয়েছে, প্রাকৃতিক খানা খন্দ সৃষ্টির এটা খুবই সাধারণ একটা পদ্ধতি, রোডেশিয়ার সাইওনিয়াতে[২৫] যে স্লিপিং পুল আছে ঠিক সেটার মত।

এখানে অবশ্য গুহার মেঝেটা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে একটা দীঘিতে। পানি জমে আছে সেখানে। একদম স্ফটিকের মত পরিষ্কার, নিচের দিকের হালকা সবুজ রঙ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক গভীর, সম্ভবত ১৫০ ফুট হবে, উপরে অংশটা আয়নার মতই মসৃণ আর স্থির।

স্যালি আর আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে, এই বিশাল গুহাটার সৌন্দর্য অবশ করে দিয়েছে আমাদেরকে। ২০০ ফুট উপরের ছোট্ট ফোঁকরটা দিয়েই সার্চলাইটের মত করে নিচে এসে পড়ছে সূর্যের কিরণ, ঝকঝকে চুনাপাথরে প্রতিফলনের কারণে পুরো গুহাটাই একটা অতিপ্রাকৃত আলোয় ভরে আছে। বাঁকা ছাদ আর দেওয়াল জুড়ে বিশাল আকৃতির প্রজাপতির পাখা আর চুইঁয়ের দণ্ড ঝুলছে।

এই মূল গুহার দেওয়ালটাও প্রায় পনেরো ফুট উচ্চতা পর্যন্ত দুর্দান্ত বুশম্যান শিল্পকলা দিয়ে সজ্জিত। কোথাও কোথাও অবশ্য পানি চুঁইয়ে পড়ে অসাধারণ চিত্রকর্মগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে খানিকটা, তবে বাকিটা খুব ভালোভাবেই সংরক্ষিত আছে। আন্দাজ করলাম, এই বিস্ময়কর জায়গাটায় আমার আর স্যালির কমপক্ষে দুই বছরের কাজ জমে আছে।

স্যালি আস্তে আমার হাত থেকে ওর হাতটা ছুটিয়ে নিয়ে সবুজাভ দীঘিটার কিনারে এগিয়ে গেল। আমি গুহার প্রবেশপথের যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকেই মোহিত হয়ে দেখতে লাগলাম ওকে। দীঘির কিনারে দাঁড়িয়ে, সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে নিস্তরঙ্গ পানির ভেতরে দেখার চেষ্টা করতে লাগল মেয়েটা।

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ইচ্ছাকৃতভাবে সময় লাগিয়ে এক এক করে পরনের কাপড় খুলতে শুরু করল। একটু পরেই নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দীঘির কিনারে, চুনাপাথরের দেওয়ালের মতই ওর চামড়াও ফ্যাকাসে আর ঈষদচ্ছ লাগছে। পেশীবহুল আর শক্তিধর হওয়ার পরেও ওর দেহের বাঁক আর গঠনের মাঝে এমন এক কমনীয়তা আছে যে আমার পুরনো আমলের হাতির দাঁত দিয়ে বানানো চাইনিজ ভাস্কর্যের কথা মনে পড়ে গেল।

অতি প্রাচীন কোনো পৌত্তলিক ধর্মের সেবিকার মত, ও দীঘির পাশে দাঁড়িয়ে দুই হাত উপরে প্রসারিত করে রাখলো। ওর এই দেহভঙ্গিমা এক

---

[২৫] বর্তমান জিম্বাবুয়ে

অদ্ভুত অলৌকিক অনুভূতির জন্ম দিল আমার ভেতরে, সেই সাথে মনে পড়ল প্রাচীন আমলের ভুলে যাওয়া এক প্রথার কথা। আমার খুব গভীরে কোথাও একটা বোধ সৃষ্টি হলো, মনে হলো কেউ আমাকে মায়ার স্বরে ডাকছে, বা কেউ আমাকে পরম মমতায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছা করল হাউমাউ করে কেঁদে দেই এখনই।

ঝাঁপ দিল স্যালি, ওর লম্বা শুভ্র দেহটা মোহনীয় ভঙ্গিমায় বেঁকে গেল, কালো খোলা চুল উড়তে লাগল পেছনে। পানিতে আঘাত করে ও ডুবে গেল গভীরে, অনেক গভীরে। স্বচ্ছ পানির ভেতর দিয়ে ওর মিষ্টি, নিখুঁত অবয়বটা দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার, তারপর ধীরে-সুস্থে উপরে উঠে এসে পানির উপরে মাথা তুললো। লম্বা চুলগুলো ঘাড় আর কাঁধ বেয়ে এঁকেবেঁকে নেমে গিয়েছে নিচে, সরু একটা হাত তুলে আমাকে কাছে যেতে ইশারা করল।

ইচ্ছে করল ডাক ছেড়ে কেঁদে হালকা হই। তখনই বুঝলাম, আমি আসলে ভেবেছিলাম ও পানির ওই রহস্যময় সবুজ গভীরতা থেকে আর উপরে উঠতে পারবে না। আমি দীঘিটার কিনারে গিয়ে ওকে পানি থেকে উঠতে সাহায্য করলাম।

গুহা আর সুড়ঙ্গের দেওয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেওয়ালে আঁকা গুহাচিত্র আর খোদাইকর্মগুলো দেখলাম আমরা, স্যালি ভেজা চুল নিয়েই ঘুরতে লাগল, ওর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের চাইতেও উজ্জ্বল লাগছিল সেই মুহূর্তে।

"প্রায় দুই হাজার বছর আগে আঁকা ছবিও আছে এখানে, বেন। জায়গাটা নিশ্চয়ই ওই বাট্টু হলুদ মানুষগুলোর কাছে খুব পবিত্র ছিল।" গুহার অর্ধেক দেখা শেষ হওয়ার আগেই আলো কমে আসতে লাগল, ফেরার পথে হাতড়ে হাতড়ে রাস্তা বের করে ফিরতে হলো–ঠান্ডা আর ভয় দুটোই কাবু করে ফেলল আমাদেরকে। ঠিক তখনই আমার মনে পড়ল যে সারাদিন পেটে দানাপানি পড়েনি একটুও।

স্যালি কুচি কুচি করে কাটা ষাঁড়ের মাংস আর পেয়াজ গরম করতে লাগল, আমি রেডিয়োতে পিটার লার্কিনকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম। দুটো ট্রাক নিরাপদেই মাউন পৌঁছেছে, সেই খবর পেয়ে স্বস্তি লাগল। কথা শেষে লার্কিনকে বললাম লোরেনকে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে। "ওকে বলবেন আমরা এখানে দারুণ কিছু গুহাচিত্র খুঁজে পেয়েছি। তাই এখান থেকে ফিরবো কবে তা বলা যাচ্ছে না।"

"পানি কতটা আছে আপনার?" গম গম করে বলল লার্কিন, রেডিয়োর স্ট্যাটিকের কারণে ওর স্কচ হুইস্কি খাওয়া বিকট গলার স্বরটাও ভেঙে ভেঙে শোনাতে লাগল।

"ভালোই আছে। এখানেই যথেষ্ট পানির সন্ধান পেয়েছি আমরা।"

"পানি খুঁজে পেয়েছেন আপনারা?" গর্জে উঠলো লার্কিন। "ওখানে তো কোনো পানি নেই!"

"এখানে পাথরের মধ্যে একটা ছোট ডোবার মত পেয়েছি, গত বৃষ্টির পানি জমে আছে এখনো।"

"ও আচ্ছা। ঠিক আছে তাহলে। খবর দেবেন। ওভার অ্যান্ড আউট।"

"থ্যাংক ইউ পিটার। ওভার অ্যান্ড আউট।"

"আপনি একটা চাপাবাজ।" রেডিয়োটা বন্ধ করতেই দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল স্যালি।

"সেটা ভালোর জন্যেই," সায় দিলাম আমি। তারপর পরের দিনের জন্য লণ্ঠন, ক্যামেরা আর ছবি আঁকার জিনিসপত্র রেডি করা শুরু করলাম আমরা।



বৃদ্ধ, মদ্দা হাতিটা মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। গলা আর ঘাড়ের ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে চটচটে হয়ে আছে। প্রায় পঞ্চাশটার মত তীর বিঁধে আছে ওটার বিশাল ধড়টায়। সামনের হাঁটু ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, ব্যথায় বেঁকে গিয়েছে পিঠ, ওটার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট সাহসী একদল হলুদ শিকারি। সবার ধনুকে তীর ভরে তাক করে রাখা। ওদের প্রায় জনা বারোকে দেখা গেল শিকারের পথটায় চিত হয়ে পড়ে আছে, ওদের নশ্বর দেহ চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে ওই বিশাল আর নিষ্ঠুর হস্তীর প্রকাণ্ড পদলে পিষ্ট হয়ে–কিন্তু তবুও বাকিরা না পালিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ওটাকে মারতে।

আদ্যিকালের শিল্পী তার লাল পাথরের ক্যানভাসে এমন সুনিপুণভাবে পুরো দৃশ্যকল্পটা ফুটিয়ে তুলেছে যে, আমার মনে হলো যেন নিজে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। যাই হোক, এখানে আলো ঠিকমতো আসে না, এর ভেতরেও সবচেয়ে ভালো যে ছবিটা তুলতে পারলাম সেটা সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে F.11 অ্যাপারচারে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফ্ল্যাশ ব্যবহার করবো বলে ঠিক করলাম। আমি সবসময় চেষ্টা করি যথাসম্ভব এটা এড়িয়ে চলতে; কারণ এতে প্রকৃত রঙটা বোঝা যায় না, অদরকারি নানান জিনিস ছবিতে উঠে মূল জিনিস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দেয়।

আমি একটা ট্রাইপডে ক্যামেরাটা বসানো শুরু করতেই স্যালি ডাক দিল।

"বেন! এদিকে একটু আসেন প্লিজ!"

বিশাল গুহাটার ভেতর শব্দের প্রতিধ্বনি আর ভেঙে যাওয়ার পরে-ও ওর কণ্ঠের উত্তেজনা আর জরুরত বুঝতে সমস্যা হলো না আমার, আমিও তাই দেরি না করে দ্রুত ছুটে গেলাম ওর কাছে।

স্যালি দাঁড়িয়ে ছিল মূল গুহার পান্নারঙা দীঘিটার পেছনে, ওদিকের দেওয়ালটায় খাড়া গর্ত হয়ে ছোট একটা খুপরির মত সৃষ্টি হয়েছে। জায়গাটা ছায়াময়, কিন্তু স্যালির টর্চের আলো তীব্রভাবে মসৃণ পাথুরে দেওয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে দেখলাম।

"কী হয়েছে, স্যাল?" ওর পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"দেখুন।" বলে ও ওর টর্চের আলো খুপরির ভেতরে ফেলতেই একটা বিশাল মনুষ্য অবয়বের প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম সেখানে।

"গুড গড!" রুদ্ধশ্বাসে বললাম আমি। "ব্রান্ডবার্গের হোয়াইট লেডি![২৬] এত হুবহু একই।"

স্যালি লাইটের আলো পুরো প্রতিকৃতিটায় ঘুরিয়ে আনল। সব শেষে আলো নিয়ে থামালো ওটার উরুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা উদ্ধত শিশ্নের উপর।

"এর *লেডি* অংশটা কিন্তু দারুণভাবে ঝুলছে," বিড়বিড় করে বলল ও। "কী বলছি, বুঝেছেন তো!"

অবয়বটা ছয় ফুটমতো লম্বা, গায়ে হলুদ রঙের একটা বর্ম আর বিশাল উঁচু নকশাদার শিরস্ত্রাণ। বাম কাঁধে একটা গোলাকার ঢাল, যেটার মাঝ বরাবর হলুদ রঙের কয়েকটা ফুল গোল করে বসানো। অন্য হাতে একটা ধনুক আর একগুচ্ছ তীর, কোমরে ঝুলছে তরবারি আর যুদ্ধ-কুঠার। পায়ের বর্মও একই ধরনের হলুদ ধাতু নির্মিত আর পায়ে খোলা হালকা স্যান্ডেল।

অবয়বটার গায়ের রঙ মৃতদেহের মত ফ্যাকাসে, কিন্তু আগুন লাল রঙের মাথা ভরা চুল নেমে এসেছে বুক বরাবর। ছবিতে লোকটার যৌনাঙ্গ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে তার কর্তৃত্ব আর প্রভাব বোঝানোর জন্য। জিনিসটা কোনো দিক দিয়েই অশ্লীল নয় মোটেও বরং অবয়বটাকে একটা পুরুষালি শৌর্য আর গর্বিত চেহারা এনে দিচ্ছে।

"একজন সাদা মানুষ," ফিসফিস করে বললাম আমি। "বর্ম আর গোল ঢাল, ধনুক আর যুদ্ধ-কুঠার। ইনি কি তাহলে–"

"ফিনিশিয়ান হোয়াইট কিং," স্যালি আমার বাক্যটা শেষ করে দিল।

"কিন্তু ফিনিশিয়ানদের তো চুল কালো হয়, নাক হয় বাঁকা। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এর সাথে এখানকার প্রাচীন লোকদের মিল নেই কোনো। সম্ভবত, উত্তর ভূমধ্যসাগরীয় কোনো পূর্বসূরির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আঁকা। বয়স কত এটার স্যাল?"

"নিশ্চিত করে বলতে পারছি না কিছু, তবে দুই হাজার বছর তো হবেই। গুহার ভেতরে এই ছবিটাই সবচেয়ে পুরনো।"

"দেখো, স্যাল।" আগ্রহ নিয়ে ইঙ্গিত করলাম আমি।

---

[২৬] আফ্রিকায় আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং বিতর্কিত গুহাচিত্র

মাঝখানের অবয়বটার পেছনে একদল কাঠির মত অবয়ব দেখা যাচ্ছে, যারা রাজাকে অনুসরণ করছে। ওদের অবয়বগুলো অতো বিশদভাবে আঁকা হয়নি, তবে তরবারি আর শিরস্ত্রাণ বোঝা যাচ্ছিল পরিষ্কার।

"আর ওখানে দেখুন।" স্যালি একদল সাদা আলখেল্লা পরা লোকের দিকে আলো ফেলল। রাজার পায়ের কাছে দাঁড়ানো তারা। চিকন-চাকন শরীর, নয় ইঞ্চি মত লম্বা।

"পুরোহিত মনে হয়—আর ওহ বেন! দেখুন! দেখুন!"

ও আলোটা পুরো পাথরের ক্যানভাস জুড়ে ঘুরিয়ে আনল, প্রথমে আমি বুঝলাম না কিছুই—এরপরেই আমার হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠলো। বাড়ির ছাদে নকশা করলে যেরকমটা হয়, সেরকমই আর্দ্রতার কারণে কোথাও কোথাও মিশে গিয়েছে আঁকা; কোথাও মস আর লাইকেন জন্মেছে, অথবা কোথাও কোথাও অসংখ্য মানুষ বা পশু পাখির ছবি আঁকা হয়েছে সেটার উপরে। কিন্তু তবুও ওটার বিশালতা এবং প্রভাব কমেনি মোটেও, ক্যানভাসটা একটা পাথরের গুহার দেওয়াল জুড়ে আঁকা চিত্রকর্ম ধারণ করে রেখেছে। পাথরের খণ্ডজোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে বানানো হয়েছে ক্যানভাসরূপী দেওয়ালটা, জোড়াগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ওগুলোর উপরিভাগে ঘরের বর্গার মত নকশা কাটা, জিম্বাবুয়ের ভগ্ন মন্দিরের দেওয়ালে পাওয়া নকশার মতই এগুলো। দেওয়ালের পেছনে প্রত্যাশামতো ঊর্ধ্বমুখী মিনারের নকশা দেখা যাচ্ছে।

"এটাই আমাদের শহর বেন। আমাদের হারানো শহর।"

"আর আমাদের হারানো রাজা, স্যালি। সঙ্গে তার পরিষদবর্গ, যোদ্ধা আর—ওহ মাই গড! স্যালি, এদিকে দেখো!"

"হাতি!" স্যালিকে দেখে মনে হলো বাচ্চা মেয়ে হয়ে গিয়েছে। "পিঠে তীরন্দাজ নিয়ে যুদ্ধের হাতি, ঠিক রোমানদের বিরুদ্ধে হ্যানিবাল যে কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। কার্থেজিনিয়ান—ফিনিশিয়ান!"

চারপাশে এত এত প্রমাণ! ১০০ ফুট লম্বা বাঁকানো দেওয়াল, লম্বায় দশ থেকে পনেরো ফুট। আর এর প্রতি ইঞ্চি বুশম্যান চিত্রকর্ম দিয়ে ভরা। মানুষের অবয়ব আর অন্যান্য নকশা একটার সাথে আরেকটা মিলে-মিশে আছে, কিছু পুরনো ছবির উপর নতুন করে ছবি আঁকা হয়েছে বা ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে; বাকিগুলো আমাদের সাদা রাজার মতই গর্বিতভাবে অক্ষত আর অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। আমাদের হারানো সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত এই ছবিগুলোকে, ঐতিহ্যবাহী গুহাচিত্রের অপরিসীম ভাণ্ডারের সাথে যোগসুত্র স্থাপন করতে পারাটা হবে বিশাল একটা দায়িত্ব পালন। আর সেটা স্যালির বিশেষ কেরামতি, আমার ক্যামেরা শুধু বিশাল এই দৃশ্যপটগুলোকে তুলে নেবে; ও ধৈর্য ধরে, নিষ্ঠা সহকারে এর মাঝ থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সম্পন্ন একটা অবয়ব বা একটা দলকে নির্দিষ্ট করে, ছবির

পুরো নষ্ট হয়ে যাওয়া অংশটা আবার নতুন করে বানিয়ে ওর মোমের কাগজে সংরক্ষণ করবে।

যাই হোক, এখনই অবশ্য কেউ এসব শুরু করতে বলছে না। স্যালি আর আমি বাকি পুরোটা দিন পেছনের দেওয়ালটা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করে কাটালাম, মনের আনন্দে ইচ্ছামতো উঁকি দিলাম, খোঁচাখুঁচি করলাম আর বিস্মিত হতে থাকলাম।

সেই রাতে যখন ক্যাম্পে ফিরলাম, তখন আমরা শারীরিক আর মানসিক, দুই দিক দিয়েই বিধ্বস্ত। পিটার লার্কিন লোরেনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে একটা বার্তা দিল।

"আপনাদেরকে শুভকামনা জানিয়েছেন, হচ্ছে তেলবাহী হেলিকপ্টারের একটা আগামী কয়েকদিনের মাঝে ওখানে যাবে। আপনাদের যদি কিছু লাগে, তাহলে লিস্ট আমাকে দিলেই হবে। ওরা পৌঁছে দেবে আপনাকে।"

পরবর্তী দশ দিন ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দশ দিন। লোরেনের কথা মত হেলিকপ্টার এল। গায়ে বিশাল করে লেখা 'স্টারভেসান্ট অয়েল'। আমাদের যা যা প্রয়োজন হতে পারে, তার সবকিছুই নিয়ে এল সেটা, আরও একট তাঁবু, ভাজ করা চেয়ার, একটা থিয়োডোলাইট[২৭], লণ্ঠনের তেল, খাবার, দুজনের জন্যেই অতিরিক্ত কাপড়, স্যালির জন্য আরও অনেক কাগজ আর রঙ, আমার জন্য ফিল্ম, এমনকি কয়েক বোতল গ্লেন গ্রান্ট মল্ট হুইস্কি–মানব মনের যাবতীয় অসুখ দূর করার মহৌষধ। সাথে লোরেনের একটা চিরকুটও পেলাম। তাতে লেখা, যতদিন আমার কাছে প্রয়োজন মনে হয়, ততোদিনই চাইলে কাজ চালিয়ে যেতে পারি। ওর পক্ষ থেকে পূর্নাঙ্গ সহযোগিতা পাবো আমি। তবে শর্ত একটাই–সেটা হচ্ছে ওকে খুব বেশিদিন অন্ধকারে রাখা যাবে না, কারণ ও নাকি *কৌতুহলে মরেই যাচ্ছে* !

আমি ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা ফিল্মের রোল পাঠিয়ে দিলাম। ওখানে গুহার ছবিগুলো তোলা আছে। তবে সেই ছবিগুলোই দিয়েছি যেগুলোতে কোনো স্পষ্ট মানব অবয়ব নেই। আর গুহার ছবিগুলোতে যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো সংগ্রহ করে পলিথিন ব্যাগে ভরে পাঠিয়ে দিলাম কার্বন-১৪ ডেটিং করার জন্য। হেলিকপ্টারটা আবার আমাদেরকে আমাদের সুখী জীবনে ফেলে চলে গেল।

প্রতিদিন যত সকালে সম্ভব কাজ শুরু করতাম আমরা আর সন্ধ্যা নাগাদ শেষ হতো কাজ। গুহাগুলোর নিখুঁত মানচিত্র বানালাম, কোথায় উঁচু বা কোথায় খানা-খন্দ আছে সবই উল্লেখ ছিল তাতে; তারপর দেওয়ালগুলোর ছবি তুলে তুলে আমাদের মানচিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখতাম। স্যালি কখনও আমাকে সাহায্য করতো আবার কখনও ছবিগুলোর ভেতর থেকে বৈশিষ্ট্য

২৭জরিপ করার যন্ত্র

সম্পন্ন কোনো অবয়ব বা আকৃতি খুঁজে বের করার ওর নিজস্ব কাজটা করতো। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল বেশ, ফলে ঝামেলা হতো না কোনো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এমারেল্ড[২৮] দীঘিটার পাশে বসে খাবার খেয়ে নিতাম, মাঝে মাঝে নগ্ন হয়ে স্নান করতাম দীঘির ঠান্ডা জলে, আবার কখনও কখনও এমনি পাথরের উপর শুয়ে শুয়ে গল্প করতাম।

শুরুতে আমাদের আগমন গুহার ভেতরের প্রাণীদের উপর ভালোই প্রভাব ফেলেছিল, তবে আমাদের প্রত্যাশামতো খুব দ্রুতই মানিয়ে নিল ওরা। কিছুদিনের মাঝেই পাখিরা গুহার ছাদের ফোঁকর দিয়ে নেমে এসে পানি খাওয়া আর গোসল শুরু করল আবার। কাজ থামিয়ে যখন আমরা ওদেরকে দেখতাম, তখনও ওরা আমাদেরকে পাত্তা না দিয়েই কিচিরমিচির আর পানি ছিটানো চালিয়ে যেত, গুহার ভেতরের প্রতিধ্বনির কারণে কান পাতা দায় হয়ে যেত সময়ে সময়ে।

এমনকি বানরগুলোও তৃষ্ণায় আর থাকতে না পেরে, পাথরের ওই প্রবেশপথটা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এসে, কোনো মতে গপ গপ করে কয়েক ঢোক পানি খেয়েই আবার সাঁই করে পালিয়ে যেত। আস্তে আস্তে এই আচমকা আক্রমণ আরও বেশি সাহসী হতে হতে একসময় উপদ্রবে পরিণত হলো। আমাদের খাবার চুরি করে নিয়ে যেত, কোনো যন্ত্রপাতি বেখেয়ালে রাখলেই দেখা যেত যে নেই। ওদেরকে অবশ্য বেশি কিছু বলতাম না, কারণ ওদের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি দেখে হেসেই মরতাম আমরা।

দিনগুলো ছিল চরম আনন্দের, মনের তৃপ্তি মিটিয়ে কাজ করতাম, সঙ্গীর সাথে ছিল চমৎকার ভালোবাসাময় সম্পর্ক, তাছাড়া এই সুন্দর জায়গাটায় ছিল এক গভীর প্রশান্তি। আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখের পৃষ্ঠে একটা দিনেই একটা ঘটনা শুধু সামান্য আঁচড় কাটতে পেরেছিল। আমি আর স্যালি হোয়াইট কিং-এর ওই দুর্দান্ত ছবিটার নিচে বসে ছিলাম। আমি বললাম: "ওরা আর আমার কথাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না, স্যাল। ওই হারামিগুলোকে নিজেদের নীচ মানসিকতা এবার পাল্টাতেই হবে।"

স্যালি জানতো আমি কোন বদমাইশগুলোকে নিয়ে কথা বলছি। ওই পক্ষপাতদুষ্ট, ষড়যন্ত্রকারী প্রত্নতাত্ত্বিকদেরকে নিয়ে, যারা নিজেদের ধারণাকে প্রমাণ করার স্বার্থে যে কোনো প্রামাণিক বিষয়কে উল্টে দিতে পারে। যারা আমার আর আমার বইয়ের কড়া সমালোচক।

"এতো নিশ্চিত হবেন না, বেন," সাবধান করল স্যালি। "ওরা এটা মেনে নেবে না। আমি এখনই যেন ওদের খনখনে গলা শুনতে পাচ্ছি। এগুলো তো বুশম্যানদের দূর থেকে দেখে দেখে আঁকা ছবি–অর্থ যে কোনো

---

২৮ পান্না

কিছুই হতে পারে–আব্বে ব্রেউলি[২৯] ব্রান্ডেনবার্গ-এ পাওয়া ছবিগুলো নতুন করে আঁকার কারণে তাকে কি রকম ধুয়ে দিয়েছিল সেটা মনে নেই?"

"হ্যাঁ। সমস্যা এই একটাই–এগুলো একজন বাইরের পর্যবেক্ষকের আঁকা। যখন ওদেরকে দেওয়ালে আঁকা এই ছবিগুলো দেখাবো, তখন ওরা বলবে, "দেওয়ালের ছবি তো বুঝলাম, কিন্তু ছবির মধ্যে দেওয়াল নেই কেন?""

"আর আমাদের রাজা, আমাদের সুন্দর, পৌরুষপূর্ণ রাজা," বলতে বলতে স্যালি প্রতিকৃতিটার দিকে তাকালো, "ওরা এনাকেও খোজা করে দেবে। তারপর ইনিও পরিণত হবেন আরেকজন 'হোয়াইট লেডিতে'। ওনার যুদ্ধের ঢাল হয়ে যাবে ফুলের তোড়া, রঙ মাখিয়ে ওনার দুধ সাদা রঙ হয়ে যাবে বাদামি, এই আগুনরঙ্গা দাড়ি হয়ে যাবে গলার স্কার্ফ বা কোনো নেকলেস, ওরা যখন আবার ছবিটা আঁকবে, তখন দেখা যাবে সবই এরকম পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে লেখা থাকবে," স্যালি নিজের কণ্ঠ পরিবর্তন করে এক নীতিবাগীশ বাচাল পণ্ডিতের কণ্ঠ নকল করে বলল, "আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতামত হচ্ছে, এই ধ্বংসাবশেষগুলো কোনো বান্টু সম্প্রদায়ের একটা দলের কাজ, সম্ভবত শোনা বা মাকালাং।"

"ইশ! যদি কোনো নিশ্চিত প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যেত," করুণ কণ্ঠে বললাম আমি। আমাদের আবিষ্কার আমার বিজ্ঞ বন্ধুদের সামনে পেশ করার ফলাফল নিয়ে প্রথমবারের মত ভাবতে বসেছিলাম সেদিন আমি। বুঝলাম ব্ল্যাক মাম্বায় ভরা কোনো গর্তে নামতে বললে যেরকম লাগতো, এক্ষেত্রেও সেরকমই লাগছে। উঠে দাঁড়ালাম আমি। "চলো একটু সাঁতার কাটি, স্যাল।"

দুজনে পাশাপাশি সাঁতার কাটলাম আমরা, ব্রেস্ট স্ট্রোক দিয়ে দীঘিটার এপাশ-ওপাশ করলাম। সাঁতার শেষে উঠে এসে, ছাদের ফোঁকর দিয়ে নেমে আসা উজ্জ্বল আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম দুজন। নিজের মন খারাপ ভাব কাটানোর জন্য ভাবলাম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। আলতোভাবে স্যালির হাত ধরে, একটা আহত গণ্ডারের মত কণ্ঠের সমস্ত চাতুর্য ঢেলে, আমি ফস করে বলে বসলাম, "আমাকে বিয়ে করবে, স্যালি?"

হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকালো স্যালি, ওর গাল আর চোখের পাতায় তখনও ফোঁটা ফোঁটা পানি জমে আছে, ঝাড়া দশ সেকেন্ড আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে থেকে কাঁচভাঙ্গা হাসিতে ফেটে পড়ল ও।

"ওহ বেন, বদমাইশ বুইড়া! এটা বিংশ শতাব্দী। আপনি আমার সাথে শুয়েছেন–তার মানে এই না যে আমাকে বিয়ে করতেই হবে!" তারপর আমি প্রতিবাদ বা ব্যাখ্যা করার আগেই আবারও ও এমারেল্ড দীঘিতে ঝাঁপ দিল।

---

[২৯] শিল্পীর নাম

বাকি দিনটা নিজের রঙ তুলিতেই বিভোর হয়ে রইলো স্যালি, আমার সাথে কথা বলা দূরে থাক, এমনকি তাকিয়ে দেখার সময়টাও যেন ছিল না ওর। তাতে করে স্পষ্ট আর পরিষ্কার বার্তা পেয়ে গেলাম আমি—কিছু কিছু প্রসঙ্গ আছে, যেসবের ব্যাপারে আলোচনা করার ক্ষেত্রে স্যালি একেবারে যাকে বলে মরণ বান মেরে আটকে রেখেছে নিজেকে। বিয়ে-শাদি এর ভেতরে একটা।

জঘন্য একটা দিন ছিল সেটা, ভালোই একটা শিক্ষা পেলাম আমি। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, যেটুকু সুখ এখন পেয়েছি সেটুকু নিয়েই খুশি থাকবো, বেশি চাপাচাপি আর করবো না।

সন্ধ্যায় লোরেনের পক্ষ থেকে লার্কিন আরেকটা মেসেজ পাঠালো আমাকে:

"তোমার পাঠানো স্যাম্পল নং ১-১৬র কার্বন-১৪র গড় বয়স হচ্ছে ১৬২০±১০০ বছর। কংগ্রাচুলেশনস। ভালোই মনে হচ্ছে। গোপন ব্যাপারটা জানতে পারবো কখন?—লোরেন।"

খবরটা পেয়ে মন খোশ হয়ে গেল। যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই বুশম্যান চিত্রশিল্পী যেসব দৃশ্যকল্প এঁকেছে, সেসবের প্রত্যক্ষদর্শী সে, তার মানে দাঁড়াচ্ছে ২০০ থেকে ৪০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে, কোনো এক অস্ত্রসজ্জিত ফিনিশিয়ান যোদ্ধা তার সৈন্যদল আর যুদ্ধ হাতি নিয়ে আমার এই প্রিয় জায়গাটার উপর দিয়ে অভিযাত্রা করেছিল। লোরেনকে গুহাটার গোপন ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে না জানানোর কারণে অপরাধবোধ হতে লাগল, তবে এখনও জানানোর সময় আসেনি। ব্যাপারটা আরও কিছুদিন নিজের করে রাখতে চাচ্ছি—আরও কিছুদিন চোখ ভরে দেখি, গুহার প্রশান্তি আর সৌন্দর্য নিজের মত করে উপভোগ করি, অন্য কোনো চোখের নজর না পড়ুক সেদিকে। তবে তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে, আমার প্রেয়সি স্যালির কাছে জায়গাটা এক মন্দিরের মত পরিণত হয়েছে। ঠিক ওই প্রাচীন বুশম্যানের মতই জায়গাটা এখন আমার কাছেও অত্যন্ত পবিত্র।

পরের দিন স্যালির ভাবেসাবে মনে হলো আগের দিন আমার মন খারাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য আজ পুষিয়ে দেবে সব। একই সাথে খুনসুটি, ভালোবাসাবাসি আর দুষ্টুমি চলতে লাগল। দুপুর বেলায়, দীঘির পাশের পাথরের উপরে, পিঠে ছাদের ফোঁকর গলে আসা রোদ মেখে আদর করলাম আমরা। স্যালি-ই দক্ষতা আর দায়িত্বের সাথে আবারও শুরু করল সবকিছু। সেটা ছিল এমন এক অপূর্ব আর বেসামাল অভিজ্ঞতা যে আমার আত্মা থেকে সব দুঃখবোধ চেঁছে তুলে ফেলে দিল, সেই সাথে শান্তি আর সুখে ভরে গেল কানায় কানায়।

আমরা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকলাম, ঘুম ঘুম আবেশে গল্প করলাম কিছুক্ষণ, ঠিক তখনই আচমকা গুহার ভেতরে অন্য কারও উপস্থিতি টের পেলাম আমি। সারা শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল সাথে সাথে, বহু কষ্টে কনুইতে ভর দিয়ে উঠে মাথা তুলে ভেতরে ঢোকার পথটার দিকে তাকালাম।

একটা সোনালি-বাদামি মেশানো মানুষের অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে সুড়ঙ্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশপথে। লোকটার পরনে একটা ছোট চামড়ার নেংটি মত কাপড়, কাঁধের পেছনে একটা তূণীর আর ছোট একটা ধনুক ঝোলানো, গলায় উটপাখির ডিমের খোলসের ভাঙা অংশ আর ব্ল্যাক মাংকি বিন দিয়ে বানানো মালা। লোকটা ছোটখাটো, আকারে দশ বছর বয়সী একটা বাচ্চার মত, তবে একদম পূর্ণবয়স্ক মানুষের মত চেহারা। কুতকুতে চোখ আর উঁচু চ্যাপ্টা গালের কারণে দেখতে এশিয়ান মনে হচ্ছে, তবে নাকটা ধ্যাবড়া, পুরু ঠোঁট দুটো দেখে মনে হবে কেউ কাঠ খোদাই করে বানিয়েছে। ছোট গোলগাল মাথাটায় ঘন কোকড়ানো ঝাঁকড়া চুল।

এক মুহূর্ত আমরা একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপরেই...ঠিক পাখির ডানা ঝাপটানোর মতই...ছোট্ট অবয়বটা গায়েব হয়ে গেল! পেছনের অন্ধকার পাথুরে গলিতে হারিয়ে গিয়েছে।

"কী হলো?" স্যালি আমার গায়ে হেলান দিল।

"বুশম্যান," বললাম আমি। "গুহার ভেতরে, নজর রাখছে আমাদের ওপর।"

চড়াত করে শোয়া থেকে উঠে বসল স্যালি, তারপর ভীত চোখে দেখতে লাগল চারপাশে।

"কই?"

"চলে গিয়েছে। কাপড় পরে নাও–তাড়াতাড়ি!"

"লোকটা কি খুব বিপজ্জনক, বেন?" স্যালির গলার শুকিয়ে গিয়েছে।

"হ্যাঁ। খুবই!" নিজের পোশাক গায়ে গলাতে গলাতে ভাবতে লাগলাম যে আমাদের পরবর্তী করণীয় কী হতে পারে। কী কী বলবো সেটা মনে মনে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। আগের মত সাবলীল না হলেও, দেখলাম যে বুশম্যানের ভাষাটা এখনও ভালোই বলতে পারছি। এর কৃতিত্ব অবশ্য টিমোথি মাগেবার সাথে নিয়মিত অনুশীলন। এরা সম্ভবত নর্দান বুশম্যান, কালাহারি না; ভাষাটা একই হলেও বৈসাদৃশ্য অনেক।

"ওরা নিশ্চয়ই আমাদেরকে আক্রমণ করবে না, তাই না, বেন?" স্যালির কাপড় পরা শেষ।

"যদি উল্টাপাল্টা কিছু করি, তাহলে তো করবেই। এই জায়গাটা ওদের কাছে কতটা পবিত্র সেটা জানা নেই আমাদের। ওদেরকে ভয় দেখানো যাবে না মোটেও, প্রায় দুই হাজারেরও বেশি সময় ধরে এদেরকে তাড়া করে করে ধরে ধরে মারা হচ্ছে।"

"ওহ, বেন।" আমার কাছে সরে এল স্যালি। এমনকি এই দুঃসময়েও, আমার উপর ওর এই নির্ভরতা ভালো লাগল আমার। "ওরা আমাদেরকে–মেরে ফেলবে না তো?"

"এরা হচ্ছে বন্য বুশম্যান, স্যালি। তুমি যদি কোনো বন্য জিনিসকে ভয় দেখাও বা আঘাত করো তাহলে ওরা তোমাকে আক্রমণ করবেই। যে করেই হোক ওদের সাথে কথা বলতে হবে।" বলতে বলতে আমি আশপাশে তাকালাম, ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার মত কিছুর খোঁজে। এমন কিছু যেটা নলখাগড়ার বানানো বিষমাখানো তীর আটকাতে পারবে। এই তীরের বিষে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয় না; কিন্তু শিকার মারা যায় ধীরে ধীরে, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে।

চামড়ার থিয়োডোলাইট কেসটা তুলে নিয়ে, খালি হাতেই টান দিয়ে ওটার সেলাই বরাবর ছিঁড়ে ফেললাম। টেনে সোজা করতেই জিনিসটার আয়তন আগের চাইতে বেড়ে গেল।

"আমার সাথে সাথে চলো, স্যাল। কাছাকাছি থেকো।"

স্যালি আমার কাঁধ ধরে থাকলো, দুজনে পা টিপে টিপে পাথুরে রাস্তা ধরে এগোতে লাগলাম। প্রতি পা এগোনোর আগে, হাতের চার ব্যাটারির টর্চটা দিয়ে প্রতিটা কোনা আর খুপরি খুঁজে দেখতে লাগলাম ভালো করে। আলোয় বাদুড়গুলো জেগে উঠে কিচকিচ করতে করতে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। আমার কাঁধে স্যালির হাতের চাপ বাড়লো আরও, এত বেশি যে ব্যথা করে উঠলো আমার। তবে গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঢাকা গুহার প্রবেশপথ পর্যন্ত নিরাপদেই পৌঁছাতে পারলাম আমরা।

পাথর আর গাছের গুঁড়ির মধ্যবর্তী ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা, উজ্জ্বল সূর্যালোকে চোখ টনটন করে উঠলো সাথে সাথে। সময় নিয়ে উপবনের প্রতিটা গাছের ডাল, প্রতিটা ঝোপ, মাটির প্রতিটা গর্ত বা ঢিবি তীক্ষ্ণ নজরে পরীক্ষা করে দেখলাম আমি–কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু ওরা আছে এখানেই কোথাও, জানি আমি, পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ শিকারির ধৈর্য আর একাগ্রতা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আমরা হচ্ছি শিকার, এই ব্যাপারটা এড়ানোর উপায় নেই একটুও। কালাহারি মরুভূমিতে আচার ব্যবহারের স্বাভাবিক মানবিক নিয়ম-কানুন খাটে না মোটেও। বছর দশেক আগে, মরুভূমিতে সাউথ আফ্রিকান এয়ার ফোর্সের একটা ডকোটা বিমান জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়, ওটার ক্রুদের কী হাল হয়েছিল তা মনে আছে আমার। পরে যে বুশম্যানের পরিবার কাজটা করেছিল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে আসে, বিচার প্রক্রিয়ায় দোভাষীর কাজ করতে গাবেরোনসে যেতে হয়েছিল আমার। কাঠগড়ায় দেখা গেল পরিবারটা প্যারাস্যুটের কাপড় দিয়ে বানানো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে

আছে, চেহারা দেখতে বাচ্চাদের মত–নিষ্পাপ, কোনো ধরনের অপরাধবোধ ছাড়াই বা কিছু না লুকিয়েই ওরা আমার প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল।

"হ্যাঁ, ওদেরকে মেরেছি আমরা," অকপটে স্বীকার করেছিল ওরা। আধুনিকতার শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে, ঠিক খাঁচায় আটকানো বুনো পাখির মতই, মাত্র বারো মাসের ভেতরে মারা পড়ে ওরা–ওদের সবাই। স্মৃতিটা মনে হতেই শিউরে উঠলো গা, জোর করে সরিয়ে দিলাম ভাবনাটা।

"আমার কথা মন দিয়ে শোনো, স্যালি। তুমি এখান থেকে এক পা-ও নড়বে না। যা-ই ঘটুক না কেন। আমি ওদের কাছে যাবো, কথা বলবো ওদের সাথে। যদি–" বলতে গিয়ে গলা জড়িয়ে এল আমার, কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলাম, "–যদি ওরা আমাকে তীর মারে। তাহলে আমার হাতে সময় থাকবে আর আধা ঘণ্টা–" বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে আবার নতুন করে বললাম কথাটা, "–তার মানে ল্যান্ড রোভারটা নিয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসার জন্য প্রচুর সময় পাবো। তুমি চালাতে পারবে। ওটায় করে রাস্তা চিনে চিনে আবার মাকারিকারি সমভূমিতে পৌঁছাতে কোনো সমস্যাই হবে না তোমার।"

"বেন–যাবেন না। ওহ গড, বেন–প্লিজ।"

"ওরা বসেই থাকবে, স্যাল–অন্ধকার নামার আগ পর্যন্ত। গেলে এখুনি যেতে হবে, দিনের আলো থাকতে থাকতে।"

"বেন–"

"এখানে অপেক্ষা করো। যাই হোক না কেন, নড়বে না।" আমি ওর হাত সরিয়ে দিয়ে খোলা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

"শান্তি," ওদের নিজস্ব ভাষায় চেঁচিয়ে বললাম আমি। "আমাদের মধ্যে কোনো ঝামেলা নেই।"

সূর্যের আলোয় এক পা এগোলাম আমি।

"বন্ধু আমি।"

বুনো ফিগ গাছটার বিশাল প্যাঁচানো শিকড় ধরে ছোট একটা ধাপ নামলাম আমি, ছড়ানো চামড়ার ব্যাগটা কোমরের নিচ বরাবর ধরে রেখেছি।

"বন্ধু!" আবার চেঁচালাম আমি। "আমি তোমাদের লোক। আমি তোমাদের গোত্রের মানুষ।"

খুবই সন্তর্পণে আমি বিপদসংকুল নিস্তব্ধ উপবনটায় নেমে এলাম। আমার কথার জবাব দিল না কেউ, কোনো শব্দ না নড়া-চড়াও টের পেলাম না। আমার ঠিক সামনেই একটা গাছ পড়ে আছে। আমি ওটার দিকে এগোনো শুরু করলাম, মনে হচ্ছিল যেন দুশ্চিন্তা আর ভয়ের একটা বল আমার পেটের ভেতরে জট পাকাচ্ছে।

"আমার হাতে কোনো অস্ত্র নেই," বললাম আমি। কিন্তু তবুও এই ঝলমলে বিকেলে উপবনটা আগের মতই নীরব আর অশুভ মনে হতে লাগল।

পড়ে থাকা গাছটার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, ঠিক তখনই তীর ছোঁড়ার *টং* শব্দটা কানে এল আমার। সামনের গাছের গুঁড়ির আড়াল নেওয়ার জন্য ঝাঁপ দিলাম আমি। মাটিতে পড়ার আগেই, কানের প্যাশ দিয়ে সাঁ করে চলে গেল তীরটা, নীরব পরিবেশে শব্দটা ভালোই জোরে মনে হলো। সোজা গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে। ভয়ের চোটে হৃৎপিণ্ডটা যেন জমে গেল আমার, একটুর জন্যে বীভৎস মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম বলা যায়।

পদশব্দ শুনতে পেলাম, পেছন থেকে দৌড়ে আসছে কেউ। গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত করে নিলাম।

বুনো ফিগ গাছটা মাড়িয়ে ছুটে আসছে স্যালি, বেমালুম ভুলে গিয়েছে আমার নির্দেশনা, মৃত্যুভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা, নিঃশব্দ চিৎকারে খুলে রেখেছে মুখ। নিশ্চয়ই আমাকে পড়ে গিয়ে নিশ্চল শুয়ে থাকতে দেখে ভেবেছে–মারা গিয়েছি, তাতেই আতংকিত হয়ে আর থাকতে পারেনি ওখানে। কিন্তু এখন আমি নড়ে উঠতেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে দৌড়ানো থামিয়ে দিল ও, আচমকাই বুঝতে পারলো যে কত্ত বড় ভুল করে বসেছে!

"ফিরে যাও, স্যাল," চিৎকার করলাম আমি। "ফিরে যাও!" ওর ভেতরের অনিশ্চয়তা আবারও আতংকে রূপ নিলে থেমে দাঁড়ালো মেয়েটা, গুহায় ঢোকার মুখ আর আমার পাশের মরা গাছের গুঁড়ির মাঝামাঝি অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না।

চোখের কোনা দিয়ে দেখলাম, হলদে বুশম্যানটা একটা ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া ঘাসের চাপড় থেকে উঠে দাঁড়ালো। ওর ধনুকে একটা তীর গাঁথা। নিশানা করার জন্য তীরের পালক বাঁধা প্রান্তটা নিজের থুতনির কাছে টেনে আনল লোকটা। স্যালি যেখানে খাবি খাচ্ছে সেখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ কদম দূরে দাঁড়ানো, এক সেকেন্ডের মত তীরটা তাক করে ধরে থাকলো সে।

আমি স্যালির দিকে ঝাঁপ দিলাম, একই মুহূর্তে লোকটাও ছুড়লো তীর। আমি আর তীর দুটোই একই লক্ষ্য অভিমুখে উড়ে যাচ্ছি, ঠিক যেন একটা ত্রিভুজের দুটো বাহু, স্যালি রয়েছে যার মাথায়।

তীরটাকে স্যালির পেট বরাবর শোঁ শোঁ করতে করতে ঝাপসাভাবে ছুটে যেতে দেখলাম আমি। বুঝে গেলাম, তীরের আগে কোনোভাবেই স্যালির কাছে পৌঁছানো সম্ভব না। মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে ঝাঁপ দেওয়া অবস্থাতেই হাতে ধরে থাকা চামড়ার ব্যাগটা ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে। কেমন যেন অলস ভঙ্গিতে গাড়ির চাকার মত ঘুরতে ঘুরতে ছুটে গেল ওটা, পাক খাচ্ছে বাতাসে–তীরটা গিয়ে আঘাত করল ওটার গায়ে। তীরের লোহার তৈরি, বিষে চুবানো, কাটা লাগানো, ভয়ংকর ফলা দাঁত বসালো শক্ত চামড়ার ব্যাগটায়। তীর আর ব্যাগ দুটোই স্যালির পায়ের কাছে পড়ে গেল কোনো ক্ষতি না করেই। মুহূর্ত পরে আমি ওকে দুই হাতে তুলে নিয়ে ঝেড়ে দিলাম

দৌড়। ওর ওজনের কারণে অবশ্য হাঁফ ধরে গেল আমার। মরা গাছের গুঁড়িটার আড়ালে ছুটে গেলাম আবার আমি।

বুশম্যানটা তখনও সামনের ঘাসের চাপড়ার উপর হাঁটু মুড়ে বসে আছে। সে কাঁধের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তূণ থেকে আরেকটা তীর তুলে নিল; তারপর বহুবার অনুশীলন করা সাবলীল ভঙ্গিতে নিশানা করে ছুঁড়ে দিল সেটা।

এবার অবশ্য আর তীর আটকানোর আর কোনো উপায়ই ছিল না, তাই আমি দাঁত মুখ খিচে দৌড়াতেই থাকলাম। ধনুকের ছিলা শব্দ করে উঠলো, ছুটে এল তীর, সাথে সাথেই আমার ঘাড় ভয়ানকভাবে ঝাঁকি মেরে উঠলো। তীর লেগেছে–বুঝলাম আমি, স্যালিকে কোলে নিয়েই গাছের গুঁড়ির ওপাশে আছড়ে পড়লাম।

"আমার গায়ে তীর লেগেছে, স্যাল।" স্যালিকে নিজের বন্ধনমুক্ত করতেই টের পেলাম যে তীরটা আমার বুক থেকে ঝুলছে। "তীরের কাঠিটা ভেঙে ফেলো–কাঁটা আছে মাথায়, টেনে বের করতে যেয়ো না।"

মুখোমুখি পড়ে ছিলাম আমরা দুজন, মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে চোখ। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যু নিশ্চিত জানার পর আর মরার ভয় করছিল না আমার। যা হওয়ার হয়েই গিয়েছে। এখন যদি আরও এক ডজন তীরও খাই, আমার ভাগ্যের হেরফের হবে না একচুল-ও। কাজ বাকি তাহলে একটাই, বিষের ক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই স্যালিকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

স্যালি কাঁপা হাতে দুর্বল নলখাগড়ার তীরটা ধরলো, আর্দ্র চোখে সেটাকে খুলে আনতেই ওর চেহারা পরিষ্কার হয়ে গেল।

"আপনার কলার, বেন, আপনার জ্যাকেটের কলারে গিয়ে ঢুকেছে তীরটা। গায়ে লাগেনি!"

আমি হাত বাড়িয়ে তীরটা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতেই স্বস্তি বয়ে গেল শরীরে, মরতে মরতেও মরলাম না তাহলে! স্যালি আমার পাশে শুয়ে সাবধানে তীরের মাথাটা আমার শরীর থেকে দূরে টেনে রাখলো, আমি পরনের খাকি জ্যাকেটটা খুলে ফেললাম। একটা সেকেন্ড কেটে গেল অবাক চোখে তীরটার হাতে বানানো লোহার ফলার দিকে তাকিয়ে। টফি-রঙ্গের আঠালো একটা জিনিস ওটার ভয়ঙ্করদর্শন কাঁটাগুলো থেকে ঝুলছে। তারপর জ্যাকেটসহ সেটাকে ছুঁড়ে ফেললাম দূরে।

"গড, আরেকটু হলেই গিয়েছিলাম," ফিসফিসিয়ে বললাম আমি। "শোনো, স্যাল, সম্ভবত এরা একজনই এসেছে এখানে। বয়স কম, আতংকে আছে, সম্ভবত আমরা যতটা ভয় পেয়েছি, সে-ও পেয়েছে। আরেকবার কথা বলার চেষ্টা করে দেখি।"

আমি মরা গাছটাকে সামনে রেখে বুকে ভর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে সামনে এগোলাম, তারপর আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গলা দিয়ে যতটা সম্ভব জোর দিয়ে চেষ্টা করে গেলাম কথা বলার।

"আমি তোমার বন্ধু...তবুও তুমি আমার দিকে তীর মারলে! আমি তোমার সাথে লড়াই করতে চাই না। তোমাদের সাথে থেকেছি, আমি তোমাদেরই লোক। তা না হলে কীভাবে তোমাদের ভাষা শিখলাম?"

কথা থামাতেই আবারও সুনশান, দুর্ভেদ্য নীরবতা নামলো চারপাশে।

"কীভাবে তোমাদের মানুষের ভাষায় কথা বলছি?" আবারও প্রশ্ন করে কান পেতে রইলাম একটা শব্দ শোনার জন্য।

এবার কথা বলল বুশম্যান, চড়া স্বরে বাঁশির মত শব্দ করছে সে, এর ফাঁকে ফাঁকে টক টক করে শব্দ করছে জিহ্বা দিয়ে।

"বনের অপদেবতারা অনেক ভাষাতেই কথা বলতে পারে। এসব ছলনা করে ভোলাতে পারবে না আমাকে।"

"আমি অপদেবতা নই। তোমাদের সঙ্গে থেকেছি অনেকদিন। সানবার্ড নামের কারো কথা কি শোনোনি তুমি?" আমার বুশম্যান নামটা বললাম আমি। "যেঝাই-এর লোকদের সাথে থেকে থেকে তাদের ভাই হয়ে গিয়েছিল?"

আবারও দীর্ঘ নীরবতা, তবে এবারে বুঝতে পারলাম যে ছোট বুশম্যানটা আসলে অনিশ্চয়তায় ভুগছে, ধাঁধায় আছে; তবে আর ভয় পাচ্ছে না, তার মানে আমাদের জন্যেও আর ক্ষতিকর না।

"ঝাই নামের বৃদ্ধকে চেনো তুমি?"

"চিনি," সায় দিল বুশম্যান। বুকের ভার কিছুটা নামলো আমার।

"ওরা যে একজনকে সানবার্ড নামে ডাকত, তার কথা শুনেছো?"

উত্তর দিতে দেরি হলো এবার, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করল, "শুনেছি তার কথা।"

"আমিই সে।"

এবারে প্রায় দশ মিনিটেরও বেশি থাকলো নীরবতা। বুঝতে পারলাম যে বুশম্যান আমার দাবীকে সবগুলো আঙ্গিক থেকে বিচার করে দেখছে। অবশেষে মুখ খুলল সে।

"ঝাই আর আমি এই মৌসুমে একসাথে শিকার করেছি। উনিও আসবেন এখানে, সন্ধ্যা নামার আগেই এসে পৌঁছাবেন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করবো।"

"ঠিক আছে, করবো," সায় দিলাম আমি।

"কিন্তু যদি নড়া-চড়ার চেষ্টা করো, তো খুন করবো আমি," সাবধান করল বুশম্যান। আর তার কথা যে আক্ষরিক অর্থেই সত্যি, সেটা জানি।



ঝাই নামের বৃদ্ধ লোকটা আমার কাঁধ সমান লম্বা, আমার উচ্চতা কত সেটা সবারই জানা। লোকটার সবকিছুই কেমন যেন চেড়া-চ্যাপ্টা মনে হয়, গালের হাড় উঁচু আর চোখ পূর্বাঞ্চলীয়দের মত; কিন্তু চামড়া শুকিয়ে কুঁচকে গিয়েছে, ঠিক যেন পুরনো হলুদ হয়ে যাওয়া রেজিন। চামড়ার কোঁচকানি সারা শরীরে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে মনে হয় যেন তাকে পুরনো পার্চমেন্টে মুড়ে রাখা হয়েছ। মাথার এখানে-সেখানে খানিক করে চুল, বয়সের কারণে আগুনের ধোঁয়ার মত ধূসর, তবে দাঁতগুলো এখনও মজবুত আর ঝকঝকে সাদা, চোখজোড়া কালো আর জ্বলজ্বলে। আমি প্রায়ই ভাবতাম পিক্সি পরীদের চোখ বুঝি এরকম হয়, দুষ্টুমি আর বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূহলে ভরা।

যখন আমি জানালাম যে কীভাবে তার বন্ধু আমাদেরকে মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল, তখন তিনি ব্যাপারটাকে একটা দুর্দান্ত কৌতুক হিসেবে নিয়ে, পেট চেপে ধরে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে শুরু করলেন। হাসি থামাতে না পেরে সলজ্জভাবে এক হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেও রাখলেন শেষে। তরুণ বুশম্যানের নাম হচ্ছে ঘাল, তার সাথে ঝাইয়ের এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাই ঝাই মন খুলে পচাতে লাগল ওকে।

"সানবার্ড একটা সাদা ভূত!" ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে বললেন উনি। "তীর মারো ওনাকে, ঘাল, তাড়াতাড়ি! নইলে উড়ে যাবে এখুনি।" নিজের রসিকতায় নিজেই অভিভুত হয়ে উনি গা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলেন আর অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন–পালানোর সময় একটা ভূত কেমন ভঙ্গি করে। ঘাল খুবই লজ্জা পেয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো এবং পায়ের আঙুল দিয়ে ধুলো নাড়তে লাগল। আমি দুর্বলভাবে মুখ টিপে হাসলাম, ছুটন্ত তীরগুলোর শোঁ শোঁ শব্দ তখনও আমার মনে তরতাজা।

ঝাই আচমকাই হাসি থামিয়ে চিন্তিত মুখে জানতে চাইলেন, "সানবার্ড, আপনার কাছে তামাক আছে?"

"ও মাই গড!" ইংরেজিতেই বললাম আমি।

"কী হলো?" আমার গলার স্বরে ভয় পেয়ে গেল স্যালি, ভেবেছে নিশ্চয়ই অন্য কোনো ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে।

"তামাক চাচ্ছে," বললাম আমি। "কিন্তু আমাদের কাছে তো নেই।" আমি বা স্যালি কেউই এসব খাই না, কিন্তু একজন বুশম্যানের কাছে এগুলো খুবই দামি।

"লোরেনের সিগারের বক্স ল্যান্ড রোভারে ফেলে গিয়েছেন," মনে করিয়ে দিল স্যালি। "সেটায় কাজ হবে?"

ঘাল আর ঝাই দুজনেই, রোমিয়ো অ্যান্ড জুলিয়েটা সিগারের গায়ের অ্যালুমিনিয়ামের প্যাকেট দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। কীভাবে ওগুলো খুলে ভেতর থেকে তামাক বের করতে হয়, তা দেখাতেই দুজনেই হর্ষধ্বনি করে উঠলো আর আনন্দে কলকল করে কথা বলতে লাগল। ঝাই একেবারে পাকা সমঝদারের মত সিগারের গন্ধ নিলেন, তারপর সম্মতিদানের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বিশাল একটা কামড় বসালেন। কিছুক্ষণ চিবানোর পরে, তামাকের ভেজা পিন্ডটা ওনার উপরের ঠোঁটের নিচে গুঁজে রাখলেন। তামাকের বাকি টুকরোটা ঘালকে দিতেই সে-ও কামড় বসিয়ে ঝাইকে অনুসরণ করল। দুজনেই উবু হয়ে বসে আছে মাটিতে, তৃপ্তিতে ঝলমল করছে চেহারা, আমারও বুকটা ভরে গেল তা দেখে। কত অল্পতেই না খুশি হয়ে যায় এরা।

সেই রাতে ওরা আমাদের সাথেই থাকলো, আমাদের জ্বালানো আগুনে জঙ্গল থেকে ধরে আনা বিশাল দুটো ইঁদুর কাবাবের মত করে গাছের ডালে গেঁথে কয়লার উপরে ঝলসে নিল। চামড়া ছাড়ানো বা নাড়ি-ভুঁড়ি ফেলার কোনো প্রয়োজনবোধ করল না। ইদুরগুলোর লোমে আগুন লাগতেই কুঁকড়ে গেল সেগুলো, পোড়া ন্যাকড়ার মত গন্ধ বের হতে লাগল।

"বমি পাচ্ছে আমার," আমাদের বন্ধুদেরকে নিজেদের খাবার চরমভাবে উপভোগ করতে দেখে ফ্যাঁকাসে মুখে বলল স্যালি, তবে শেষ পর্যন্ত কিছু করল না।

"আচ্ছা ওরা আপনাকে সানবার্ড ডাকে কেন?" একটু পরে স্যালি জিজ্ঞেস করল আমাকে, আমি ওর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম ঝাইয়ের দিকে।

শুনেই উনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সানবার্ডের মত অঙ্গভঙ্গি করা শুরু করলেন, মাথা আগুপিছু করে, দুই হাত ঝাপটাতে লাগলেন ডানার মত। নিখুঁত হলো পুরো ব্যাপারটা, কারণ বুশম্যানেরা খুবই মনোযোগ দিয়ে প্রকৃতির সবকিছু অবলোকন করে।

"আমি নাকি বেশি উত্তেজিত হলে এরকম করতে থাকি," ব্যাখ্যা করলাম আমি।

"আসলেই তো!" স্যালি অবাক হয়ে হাতে তালি দেওয়া শুরু করল, কারণ ও-ও মেলাতে পেরেছে ব্যাপারটা, তারপর আমরা সবাই মিলে হাসতে আরম্ভ করলাম।

সকাল বেলা চারজন একসাথে গেলাম গুহায়, ওটার ভেতরে মনে হলো ছোট্ট লোকদুটো যেন নিজের এলাকাতেই ফিরে এসেছে। আমি ছবি তুললাম ওদের আর স্যালি ওদেরকে দীঘির ধারে পাথরের উপর বসিয়ে স্কেচ করল। ওদের ছোট ছোট নাজুক হাত-পা আর বিশাল নিতম্ব দেখে তো ও মুগ্ধ। এটা

নাকি একটা পরিচিত অ্যানাটমিক্যাল বিচিত্রতা, এটাকে বলা হয় স্টিয়াটোপাইজিয়া[৩০]; এতে করে নাকি এরা খাবার জমিয়ে রাখতে পারে, ঠিক যেরকম করে উট পানি জমিয়ে রাখে। অনিশ্চিত বুনো জীবনযাত্রায় যা কিনা খুবই কার্যকর একটা জিনিস। আগের দিন, ঘাল আমাকে আর স্যালিকে দীঘির ধারে কোন অবস্থায় পেয়েছিল সেটা ঝাইকে জানাতেই শুরু হলো আরও বেশি অশ্লীল কথা বার্তা আর ঠাট্টা। স্যালিও এরকম হাসির কারণ জানতে চাইলো, আমি ওকে জানাতেই ওর গাল অস্তগামী সূর্যের মতই রক্তিম হয়ে গেল, ব্যাপারটা ছিল এক স্বস্তিকর পরিবর্তন, কারণ সাধারণত আমিই লজ্জায় লাল হই সবসময়।

বুশম্যান দুজন স্যালির আঁকা ছবি দেখে খুবই উৎসাহিত হলো, তাতে করে আমিও খুব সহজেই ওদেরকে পাথরের চিত্রকর্মগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারলাম।

"এগুলো আমাদের লোকের আঁকা ছবি," গর্বে ঝাইয়ের বুকের ছাতি ফুলে গেল। "একেবারে শুরু থেকেই এটা আমার জায়গা।"

আমি হোয়াইট কিং-এর ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করতেই ঝাই খোলাখুলিভাবেই সব জানালেন। আমি যেমনটা ধারণা করেছিলাম, সেরকম কিছু লুকাতে বা বলতে সংকোঁচ করলেন না।

"ইনি হচ্ছে সাদা ভূতেদের রাজা।"

"কোথায় থাকতেন ইনি?"

"উনি ওনার ভূত সৈন্যদল নিয়ে চাঁদের উপর থাকতেন," ঝাই ব্যাখ্যা করলেন–আর আমার সমালোচকেরা আমার সমালোচনা করেন যে, *আমি* নাকি বেশি কল্পনাপ্রবণ!

বেশ কিছুক্ষণ আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম আর জানতে পারলাম কীভাবে ভূতেরা চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝে উড়ে বেড়াতো, ওরা বুশম্যানদের সাথে কেমন ভালো আচরণ করতো। তবে তারপরেও সাবধানে থাকা জরুরি, কারণ বনের সাধারণ অপদেবতারা প্রায়ই সাদা ভূতের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। ঘাল-ও আমাকে ওরকম একজনই ভেবেছিল।

"এই ভূতদের মাঝে মানুষ ছিল কোনো?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"আরে নাহ," ঝাই প্রশ্নটা শুনে কিছুটা মর্মাহত হলেন বলে মনে হলো। "এরা সবাই-ই ছিল ভূত, ওরা সবসময়েই থাকত চাঁদের উপর আর এসব পাহাড়ে।"

"কখনও এদেরকে দেখেছেন আপনি, ঝাই?"

"আমার দাদা ভূত রাজাকে দেখেছিলেন।" সুকৌশলে উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন ঝাই।

---

[৩০] steatopygia

"আর এই জায়গাটা, ঝাই," আমি পাথরের দেওয়ালে আঁকা অট্টালিকা আর বিশাল বিশাল মিনারের ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করলাম। "এটা কী?"

"ওটা হচ্ছে চাঁদের শহর," সাথে সাথে জবাব দিলেন ঝাই।

"কোথায় জায়গাটা–চাঁদে?"

"না। এখানেই।"

"এখানে?" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। আমার হৃৎপিণ্ড দৌড়ানো শুরু করল। "মানে এই পাহাড়ে?"

"হ্যাঁ," মাথা নাড়লেন ঝাই, তারপর ওনার পাঁচ ডলার দামের সিগারে কামড় বসালেন আরেকটা।

"কোথায়, ঝাই? কোথায়? আমাকে দেখাতে পারবেন?"

"না," হতাশ হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ঝাই।

"কেন না, ঝাই? আমি আপনার ভাই। আপনার গোত্রের একজন," অনুনয় করলাম আমি। "আপনার গোপন জিনিস আমার কাছেও গোপনই থাকবে।"

"আপনি আমার ভাই," সায় দিলেন ঝাই, "কিন্তু আমি আপনাকে চাঁদের শহর দেখাতে পারবো না। এটা একটা ভূতের শহর। শুধু যখন পূর্ণিমা হয় আর সাদা ভূতেরা নেমে আসে, তখনই শহরটা পাহাড়ের নিচের সমভূমিতে দেখা যায়, তারপর সকালে গায়েব হয়ে যায় আবার।"

আমার বুকের ধুকপুকানি থেমে গেল, রক্তও ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে আবার।

"আপনি চাঁদের শহরটা দেখেছেন, ঝাই?"

"আমার দাদা দেখেছিলেন, অনেক আগে।"

"দাদজান দেখি খালি ঘুরেই বেড়াতেন," ইংরেজিতে বললাম আমি।

"কী হয়েছে?" স্যালি জানতে চাইলো।

"একটু পরে বলছি, স্যাল," বলে আমি বুশম্যানের দিকে ফিরলাম আবার। "ঝাই, আপনার সারা জীবনে কি আপনি এই শহরটার মত আর কোনো শহর কোথাও দেখেছেন? এমন কোনো জায়গা যেখানে উঁচু পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, গোল গোল পাথরের মিনারও আছে? এই পাহাড়েই হতে হবে এমন না, যে কোনো জায়গায়। উত্তর দিকে, বিশাল নদীটার ধারে, বা পশ্চিমের মরুভূমিতে–যে কোনো জায়গায়?"

"না," ঝাই বললেন। "এরকম কোথাও দেখিনি।"

এতে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, বিশাল সমভূমির উত্তরে বা জাম্বেজির দক্ষিণে কোনো হারানো শহর নেই। কারণ যদি থাকত, তাহলে দীর্ঘ সত্তর বছরের বিরতিহীন যাযাবর জীবনে ঝাই একবার হলেও দেখতে পেতেন।

"মনে হয় সেই আমলের কোনো বুশম্যান কোনোভাবে এখান থেকে দুইশো সত্তর মাইল পূর্বে গিয়ে জিম্বাবুয়ে শহরের ওই মন্দিরটা দেখে

এসেছিল,” সেদিন রাতে আগুনের পাশে বসে বসে ঝাইয়ের কথাগুলো নিয়ে স্যালির সাথে আলাপ করতে করতে বললাম আমি। “দেখে হয়তো এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে এখানে এসে এঁকে ফেলেছে সেই দৃশ্য।”

“হোয়াইট কিং-এর ব্যাপারটা তাহলে?”

“জানি না, স্যাল,” সত্যি কথাই বললাম আমি। “হয়তো ওটা আসলেই ফুলের তোড়া হাতে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা!”

সবসময় দেখা যায়, যখনই আমি প্রচণ্ড রকম হতাশ হই তখনই আমার ব্রেইন কিছুক্ষণের জন্য কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আগের দিন আমার প্রস্তাবে স্যালির প্রত্যাখ্যান আর আজকে চাঁদের শহরের কেচ্ছা দুটোই ছিল প্রচণ্ড হতাশাব্যঞ্জক। আর তাতেই সূত্রটা পুরোপুরি চোখ এড়িয়ে গেল আমার, অথচ পুরো ব্যাপারটাই যেন চোখের সামনেই ছিল। বোঝাতে চাচ্ছি সে, আমার আই কিউ হচ্ছে ১৫৬–একজন জিনিয়াস আমি, আমার পক্ষে এটা খেয়াল না করা মানায় না।

সকালে বুশম্যান দুজন চলে গেল, সমভূমির ধারে ওদের পরিবারকে রেখে এসেছে। ওদেরকে কিছু উপহার দিলাম আমরা, গুপ্তধন প্রাপ্তির আনন্দ নিয়ে ওগুলো নিল ওরা। একটা ছোট কুঠার, স্যালির মেকআপ-এর আয়না, দুটো ছুরি আর আধা বক্স রোমিয়ো অ্যান্ড জুলিয়েটা সিগার। সব নিয়ে হেলেদুলে ওরা কালাহারির বিশালতায় এগিয়ে গেল, একবার ফিরেও তাকালো না। ওরা চলে যেতে আমাদের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।



হেলিকপ্টার এল পরের সপ্তাহে, রসদপত্রের পুরো সরবরাহই নিয়ে এল, সাথে যেসব বিশেষ জিনিসপত্রের জন্য লোরেনকে বলে রেখেছিলাম সেগুলোও।

স্যালি আর আমি রাবারের ডিঙ্গিটা গুহার ভেতরের দীঘির ধারে নিয়ে এসে ফোলাতে লাগলাম। একবার ও ফুঁ দেয়, পরেরবার আমি। মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করার আগ পর্যন্ত চালিয়ে গেলাম।

স্যালি ওটাকে পানিতে ভাসিয়ে মনের আনন্দে ঘুরতে লাগল আর আমি বাকি যন্ত্রপাতি সাজাতে লাগলাম। একটা ছোট গ্লাস ফাইবারের বড়শি, জিনিসটা ভারি অনেক, পঁচিশ আউন্স ওজন, একটা আলাদা বক্সে একটা ১২/০ পেন সিনেটর বড়শির সুতো। সাথে লোরেনের একটা চিরকুট: “কিসের পিছনে লেগেছ, বলো দেখি ঝটপট। বালি মাছ, নাকি মরুভূমির ট্রাউট?–এল।”

আমি বড়শিটা জোড়া লাগিয়ে, পাঁচ পাউন্ডের সীসার টুকরোটা সুতোর মাথায় ঝুলিয়ে দিলাম। স্যালি দাঁড় বেয়ে আমাদেরকে দীঘির মাঝামাঝি নিয়ে গেল। আমি সীসার টুকরোটা একপাশ দিয়ে ফেলে দিয়ে, সুতো ছাড়তে লাগলাম, সাঁই সাঁই করে নেমে যেতে লাগল সেটা।

আমার অনুরোধমতো, ডেক্রনের সুতোটায় প্রতি পঞ্চাশ ফুট পর পর দাগ কাটা আছে। প্রতিটা রঙিন দাগ সবুজ পানির নিচে মিলিয়ে যেতেই আমরা উচ্চস্বরে গুনতে লাগলাম।

"পাঁচ, ছয়, সাত–মাই গড, বেন। এর তো তলা নেই!"

"এসব চুনাপাথরের জলাধারগুলোয় বিশাল গর্ত হয়।"

"এগারো, বারো, তেরো।"

"সুতো শেষ না হয়ে গেলেই হয়," স্যালি সুতোর চরকার বাকি অংশের দিকে তাকিয়ে বলল।

"আটশো গজ আছে এখানে," ওকে বললাম আমি। "দরকারের চাইতে বেশিই হবে।"

"ষোলো, সতেরো।" আমার ভ্রূও কপালে উঠে গেল এবার, আমি আন্দাজ করেছিলাম ৪০০ ফুট মত হবে, সিনোইয়ার স্লিপিং পুল-এর মত। কিন্তু এখনও দেখা গেল বিশাল বড়শিটার সুতো বের হওয়া থামছেই না।

অবশেষে ওজনটা মাটিতে গিয়ে ঠেকে সুতো বের হওয়া থামলো। বিস্মিত চোখে আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকালাম।

"আটশো পঞ্চাশ ফুটের একটু বেশি," বললাম আমি।

"আমার তো ভয়ই করছে, এত গভীর একটা গর্তের উপর ভেসে আছি।"

"ওহ," উপসংহার টানার ভঙ্গিতে বললাম আমি, "ভেবেছিলাম স্কুবা দিয়ে নিচটা একটু ঘুরে দেখবো, কিন্তু সেটা আর সম্ভব হবে না। নিচে যা আছে তা চিরজীবন ওখানেই থেকে যাবে। কারো পক্ষে এত গভীরে যাওয়া সম্ভব না।"

স্যালি সবুজ গভীরতার দিকে তাকিয়ে রইলো, ছোট ছোট ঢেউয়ের কারণে নড়তে থাকা পানিতে আলো প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভুত দেখাতে লাগল ওর চেহারা। ওর চোখে খেলা করছে আলো ছায়া, দেখে মনে হচ্ছে হতবুদ্ধি হয়ে আছে। আচমকাই কেমন অদ্ভুতভাবে ঝাঁকি দিয়ে উঠলো ও, যেন সারা শরীরে কাঁপুনি বয়ে গেল একটা, তারপর সবুজ পানির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল জোর করে।

"ওহ! কেমন যেন লাগল। আজব একটা অনুভূতি, মনে হলো যেন কিছু একটা আমার চামড়ার নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে।"

আমি বড়শির সুতো গোটানো শুরু করলাম, স্যালি ডিঙ্গির মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে উপরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। পুরো সুতো গোটাতে ভালোই পরিশ্রম হলো, তবে ধৈর্য ধরেই কাজটা করলাম আমি।

"বেন," আচমকাই বলে উঠলো স্যালি। "এদিকে দেখুন।" আমি সুতো গোটানো থামিয়ে উপরের দিকে তাকালাম। আমরা এই দিক থেকে কখনোই ছাদের ফোঁকরটাকে দেখিনি আগে। এখান থেকে ফোঁকরটার আকৃতি অন্যরকম লাগছে।

"ওখানে, বেন। এক পাশে," স্যালি আঙুল দিয়ে দেখালো। "ওই যে একটা পাথরের টুকরো বেরিয়ে আছে। বর্গাকৃতির। প্রাকৃতিক জিনিস এতটা নিখুঁত হয় কী করে?"

আমি সময় নিয়ে দেখলাম ওটাকে।

"হতে পারে," অনিশ্চিত গলায় বললাম আমি।

"আচ্ছা, গুহাটার এই ফোঁকরটা পাহাড়ের উপরে কোথায় আছে সেটা কিন্তু আমরা একবারও দেখার চেষ্টা করিনি," বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল ও। "সেটা করলে কেমন হয়? চলুন উপরে গিয়ে ওই বর্গ-পাথরটা পরীক্ষা করে দেখি। যাবেন, বেন?"

"অবশ্যই," সাথে সাথে সায় দিলাম আমি।

"আজকেই। এখনই! এখনই চলুন না?"

"মাথা খারাপ, স্যাল! দুপুর দুটো পার হয়ে গিয়েছে। উঠতেই তো অন্ধকার হয়ে যাবে।"

"আরে তাতে কী! সাথে টর্চ নিয়ে যাবো।"



পাহাড় চূড়ার ঝোপঝাড় খুবই ঘন আর কাঁটা দিয়ে ভরা। সাথে ম্যাশেটি[৩১] নিয়ে আসায় মনে মনে খুশিই হলাম। ওটা দিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়েই পথ করে নিতে লাগলাম দুজনের জন্য। পাহাড়ের নিচ থেকেই গর্তটার মোটামুটি একটা অবস্থান চিহ্নিত করে নিয়েছিলাম, কিন্তু তবুও প্রায় ঘণ্টা দুই ঝোপগুলো নেড়েচেড়েও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষে তো ওটাকে ফেলেই চলে যাচ্ছিলাম প্রায়।

আচমকা আমার পায়ের নিচের মাটি *নেই* হয়ে গেল, তাকিয়ে দেখি একটা কালো গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছি! সাথে সাথে সামলে নিয়ে পেছনে ঝাঁপ দিলাম। আমার ধাক্কায় স্যালি পড়েই গিয়েছিল প্রায়।

---

[৩১] তরবারি

"একটু হলেই তো গিয়েছিলাম," ভালোই ভয় পেয়েছিলাম আমি। ওখান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে, আমরা গর্তটা ঘুরে অন্য যেদিকে বর্গাকৃতি পাথরটা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

একপাশে হাঁটু মুড়ে বসে পাথরটা পরীক্ষা করে দেখলাম। অনেক নিচে, এমারেল্ড দীঘিটা আবছায়াতে আভা ছড়াচ্ছে। আমার এরকম খোলা উচ্চতা ভালো লাগে না, ঝুঁকে পড়ে পাথরটার উপরিভাগ দেখতে যেতেই বুক ধড়ফড় করে উঠলো।

"উপরটা তো খুবই মসৃণ, স্যাল," উপরে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম আমি। "কিন্তু কোনো বাটালির দাগ পাচ্ছি না। তবে প্রচুর ঝড়ঝাপটা গিয়েছে এর উপর দিয়ে, সম্ভবত–"

আমি মুখ তুলে তাকাতেই আতংকে জমে গেলাম। স্যালি পাথরের পাটাতনটায় উঠে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন সেটা একটা ডাইভিং-বোর্ড। পায়ের গোড়ালি পাটাতনের কিনারের বাইরে বের করা, ও নিজের দুই হাত মাথার উপর তুলতেই আমার দম বন্ধ হয়ে গেল। হাত দুটো সোজা আকাশ বরাবর তুলে ধরলো ও, সবকটা আঙুল শক্তভাবে ছড়ানো। প্রথমবার এমারেল্ড দীঘিটা দেখার পরে ও ঠিক এই ভঙ্গিতেই লাফ দিয়েছিল।

"স্যালি!" চিৎকার করে উঠলাম আমি, ওর মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠলো। শরীর দুলতে শুরু করতেই হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে গেলাম আমি।

"না, স্যালি, না!" আবার চেঁচালাম আমি, কারণ ভালোই বুঝতে পারছিলাম যে ও হাঁ করে থাকা ক্ষুধার্থ পাহারের মুখটায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ও ফাঁকা গর্তটার উপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। আমি পাটাতনটার উপর দিয়ে দৌড়ে গেলাম। স্যালি আরও সামনে ঝুঁকে গিয়ে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল। একদম শেষ মুহূর্তে ওর বাহুর উপরের অংশ ধরে ফেললাম আমি। একটা ভয়ানক মুহূর্ত পাথরের কিনারে ধ্বস্তাধস্তি করলাম দুজনেই, তারপর আমি শক্তি খাটিয়ে টেনে নিয়ে এলাম ওকে নিরাপদ জায়গায়।

আচমকাই ও হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপতে কাঁপতে অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করল। আমি জড়িয়ে ধরলাম ওকে। নিজেও কম ভয় পাইনি। কিছু একটা হয়েছিল ওর যা আমার বোধগম্যতার বাইরে–রহস্যময় এবং খুবই গোলমেলে কোনো ব্যাপার।

স্যালির ফোঁপানি কিছুটা কমে আসলে নরম সুরে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে, স্যাল? এরকম করতে গেলে কেন?"

"জানি না। আমার কেমন ঝিম ঝিম লাগছিল, মাথার ভেতর কেমন যেন অশুভ একটা গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম, আর–ওহ, আমি জানি না, বেন। আমি কিছু জানি না।"

পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও মিনিট বিশেক লাগল স্যালির। ক্যাম্পের দিকে ফিরতি পথ ধরলাম আমরা, সূর্য পাটে বসেছে ততোক্ষণে। পাহাড় বেয়ে নামার রাস্তাটার কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল।

"কয়েক মিনিটের মাঝেই চাঁদ উঠবে, স্যাল। এই অন্ধকারে ঢাল বেয়ে নামার দরকার নেই। একটু বসো।"

আমরা পাহাড়ের ধারে গায়ে গা লাগিয়ে বসে রইলাম; উষ্ণতার জন্য না, বাতাস তখনও যথেষ্ট গরম ছিল আর পাথরগুলোও রোদের তাপে ঝলসে আছে; বসলাম কারণ একটু আগে ঘটা ঘটনার ধকল দুজনে তখনও কাটাতে পারিনি পুরোপুরি। দিগন্তের নিচে বিশাল একটা রূপালি আভার মত করে উদয় হতে শুরু করল চাঁদটা, একটু পরেই গোলগাল আর হলুদ আকৃতি নিয়ে গাছগুলোর মাথায় চড়ে বসে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা নরম ফ্যাঁকাসে আলোয় ভরে দিল।

স্যালির দিকে তাকালাম আমি। পূর্ণিমার আলোয় ওর চেহারা রূপালি-ধূসর হয়ে আছে। চোখের নিচে কালি পড়ে গিয়েছে এইটুকেই, আনমনা হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন কত অপরিসীম দুঃখ ওর!

"চলো যাই, স্যাল?" ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম আমি।

"একটু পর। কী যে সুন্দর লাগছে!"

আমিও ঘুরে নিচের চাঁদের রূপালি আলোয় ধৌত সমভূমির দিকে তাকালাম। আফ্রিকার এক অঙ্গে অনেক রূপ, অনেক মেজাজ...আমার প্রতিটাকেই ভালো লাগে। আর এখানে, আমাদের চোখের সামনে সে তার আরও একটা মনোমুগ্ধকর রূপ মেলে ধরেছে। দীর্ঘ সময় আমরা চুপচাপ আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলাম।

আচমকা টের পেলাম স্যালি নড়ে উঠছে, বসা থেকে উঠে গেল অর্ধেক।

"যাবে?" আমিও ওর সাথে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম।

"বেন!" প্রচণ্ড জোরে আমার কবজি চেপে ধরলো স্যালি, আমি অবাক হলাম ওর শক্তি দেখে। আমার হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল ও।

"বেন! বেন!"

"কী হয়েছে, স্যাল?" দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম যে আবার আগের ভাবটা হয়তো ফিরে আসছে ওর।

"দেখুন, বেন। দেখুন!" আবেগে গলা বুজে আসছে ওর।

"কী দেখবো, স্যাল? তুমি ঠিক আছো?"

একটা হাত দিয়ে ও আমার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অন্য হাত দিয়ে নিচের সমভূমির দিকে আঙুল তুলে দেখাতে লাগল।

"দেখুন, বেন, ওই তো আমাদের লক্ষ্য!"

"স্যালি!" আমি ওকে শান্ত করতে দুই হাত দিয়ে জোরে জড়িয়ে ধরলাম। "আস্তে সোনা। বসতো একটু আগে।"

"আমাকে ধরতে হবে না, বেন। আমার কিছু হয়নি। আপনি আগে নিচের দিকে দেখুন।"

ওভাবেই ধরে রেখে আমি স্যালির কথামতো কাজ করলাম। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না কিছু।

"দেখতে পাচ্ছেন না, বেন?"

"না।" বলামাত্রই, ঠিক এলোমেলো ছবির ধাঁধার মত, জিনিসটা ধরা পড়ল আমার চোখে। ওই তো...ঠিক প্রথম থেকেই ওটা আছে ওখানে।

"দেখতে পেয়েছেন?" তখনও কাঁপছে স্যালি। "বলছেন না কেন? আমি কল্পনা করছি না তো?"

"হ্যাঁ," ফ্যাঁসফেসে গলায় বললাম আমি, এখনও নিশ্চিত না। "হ্যাঁ, আমার মনে হয়-"

"এটাই মুন সিটি, বেন। বুশম্যানদের কাছে যেটা ভূতের শহর-এটাই আমাদের হারানো শহর, বেন। এটাই...এটাই...আমি নিশ্চিত!"

দৃশ্যটা অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন। আমি চোখটা শক্ত করে বন্ধ করে খুললাম আবার। কিন্তু দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল না।

নীরব উপবনটার চারপাশে দুইস্তরের বেষ্টনী, পুরো রূপালি সমভূমি জুড়ে প্রতিসম নানান নকশা, অন্ধকারময় কালো কালো রেখা। কালো কালো গোল্লা দেখা যাচ্ছে, যেগুলো শিশ্ন আকৃতির মিনারগুলোর অবস্থান নির্দেশ করছে। এগুলোর কয়েকটা চাপা পড়ে গিয়েছে উপবনের গাছের আড়ালে। বিলুপ্ত হ্রদটার চারপাশে ছড়ানো দেওয়ালের পেছনে মৌমাছির চাকের মত করে শহরের ঘরবাড়ি, পুরোটা দেখতে অর্ধচন্দ্রাকার।

"চাঁদের জন্য," ফিসফিস করে বললাম আমি। "চাঁদটা এখন অনেক নিচে থাকায়, শহরের রূপরেখাটা ধরা পড়ছে আলোয়। ওগুলো নিশ্চয়ই এতটা ক্ষয়ে গিয়েছে যে আমরা ওগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে এলাম, প্রায় মাসখানেক ওটার উপরেই আছি...তাও ধরতে পারিনি! শুধু পূর্ণিমার আলোতেই এখনও ধ্বংসাবশেষের যেটুক অবশিষ্ট আছে, সেটুকুর ছায়া পড়ে।"

"ওই ছবিটা!"

"হ্যাঁ। সন্ধ্যার দিকে ছত্রিশ হাজার ফুট উপরে আলো যথেষ্ট কম আর নরম থাকে যাতে একই রকম প্রভাব পড়ে," ব্যাখ্যা করলাম আমি।

"আমরা সম্ভবত বেশি নিচে থাকার কারণে দেখতে পাইনি, হেলিকপ্টারটা খুব বেশি উপরে ওঠেনি," স্যালি বলল।

"আর তখন ছিল দুপুর," আমিও সায় দিলাম। "সূর্য ছিল অনেক উপরে, কোনো ছায়া ছিল না। আর সে কারণেই লোরেন হেলিকপ্টার থেকে দেখতে পায়নি কিছুই।" ব্যাপারটা চোখের সামনেই ছিল, অথচ আমি সেটা ধরতে পারিনি। আর আমি নাকি জিনিয়াস-শালাদের পরীক্ষাটা নিশ্চয়ই ভুয়া।

"কিন্তু কোনো দেয়াল তো নেই বেন, কোনো মিনার বা কিচ্ছু না। শুধু ফাউন্ডেশন। সবকিছুর কী হলো? আমাদের শহরের কী হলো?"

"আমরা খুঁজে বের করবো, স্যাল," কথা দিলাম আমি। "এখন ওটা আবার গায়েব হওয়ার আগেই চিহ্নিত করে ফেলি।"

কাঁধের ছোট ব্যাগটা থেকে ওকে টর্চটা বের করে ধরিয়ে দিলাম, "একবার জ্বলা মানে হচ্ছে 'আমার দিকে আসো', দুইবার জ্বলার মানে হলো 'আমার থেকে দূরে যাও', তিনবার হলে 'বামে সরে যাও', চারবার হলো 'ডানে যাও' আর চরকির মত ঘোরাতে থাকা মানে হচ্ছে, 'জায়গামতো'।" দ্রুত আমরা এই সহজ সংকেতটা ঠিক করে নিলাম। "আমি নিচে নেমে যাচ্ছি। আর তুমি আমাকে উপর থেকে সংকেত দেবে। প্রথমে সবচে' বড় মিনারটার উপরে নিয়ে যাবে আমাকে, তারপর বাইরের দেওয়ালের পাশে। দ্রুত কাজ করতে হবে আমাদেরকে–ঠিক কতক্ষণ যে দেখা যাবে সেটা জানা নেই। যখন আর দেখা যাবে না তখন আমাকে কাটাকাটির সংকেত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ো।"

ঘণ্টাখানেকের একটু বেশি লাগল স্যালির সংকেত ধরে ধরে পুরো সমভূমি ধরে ছুটোছুটি করে সব চিহ্নিত করতে, এরপরেই শহরটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। চাঁদটা মাথার উপরে উঠে আসতেই শহরটাও গায়েব হয়ে গেল পুরোপুরি। আমি আবার পাহাড়ে উঠে এলাম স্যালিকে নামিয়ে আনতে। কোমর পর্যন্ত খালি গা আমি, গায়ের জামা খুলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেটার সাথে ঘাস আর নুড়ি বেঁধে বেঁধে চিহ্ন দিয়েছি জায়গায় জায়গায়।

ক্যাম্পে ফিরে বিশাল একটা আগুন জ্বাললাম আমরা। একটা গ্লেন গ্রান্ট-এর বোতল খুললাম উদযাপন করার জন্য। এতটাই উৎফুল্ল হয়ে ছিলাম, এবং আলাপ করার আর বিস্মিত হওয়ার এত এত বিষয় ছিল যে ঘুমাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়ে গেল।

আমরা আবারও এই আলোর খেলাটা নিয়ে আরও আরও অনেক বিশদ আলোচনা করলাম, এখানে আসার প্রথম দিনেই সূর্য নিচে থাকার প্রভাব কী হতে পারে সেটা নিয়ে যে আলোচনা করেছিলাম ও সেদিনই মূল ঘটনাটা বের করে ফেলার কতটা কাছে চলে গিয়েছিলাম সেটা নিয়েও আফসোস করলাম কিছুক্ষণ। সেদিন পাওয়া ঝিনুকের খোলস আর সেগুলোর নতুন তাৎপর্য কী সেগুলোও আলোচনা করলাম।

"এই এখানে বসে কসম করছি, সমস্ত দেবতা সাক্ষী, আজকের পর থেকে আর জীবনেও কোনোদিন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সূত্র আমি ছুঁড়ে ফেলবো না।" আমি শপথ করলাম।

"চলুন এই কথার উপর পান করি," প্রস্তাব দিল স্যালি।

"দারুণ বুদ্ধি," সায় দিয়ে আবারও গ্লাসগুলো ভরে দিলাম আমি।

তারপর আমরা বুড়ো বুশম্যানের গল্পটা নিয়ে আলোচনা করা শুরু করলাম।

"এতে করে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে প্রতিটা কিংবদন্তী, প্রতিটা লোককথা আসলে একটু না একটু সত্যের উপরই তৈরি হয়, পরে সেটা যতটাই বিকৃত হোক না কেন," এক পেগ গ্লেন গ্রান্ট পেটে পড়ার পরেই স্যালি দার্শনিক মেজাজে চলে গেল।

"সত্যের মুখোমুখি হওয়া যাক, আমার রক্তের ভাই ঝাই বহু আগে থেকেই যে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলতে ওস্তাদ–চাঁদের শহর, তা বটে।"

"নামটা কিন্তু খুব সুন্দর। এটাই থাক," প্রস্তাব দিল স্যালি। "আর ঝাইয়ের দাদার নাকি একজন আসল সাদা ভূতের সাথে দেখা হয়েছিল, সেটার ব্যাপারে কী বলবেন?"

"উনি সম্ভবত কোনো শিকারি বা খনি সন্ধানকারীকে দেখেছিলেন। মনে নেই, আমাদেরকেও কিন্তু অপদেবতা বলে সন্দেহ করা হয়েছিল প্রথমে!"

"আক্ষরিক এবং রূপক–দুই ভাবেই," মনে করিয়ে দিল স্যালি।

আমাদের উপরের আকাশে অসাধারণ পূর্ণিমার চাঁদটার যাত্রা অব্যাহত রইলো অথচ আমরা গল্প করতেই থাকলাম। একটু পরে পরেই দেখা গেল গুরুগম্ভীর আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমরা আবেগতাড়িত হয়ে বলে উঠছি, "ওহ, বেন। কী চমৎকার একটা ব্যাপার, তাই না? আমরা আস্ত একটা ফিনিশিয়ান শহর খুঁড়ে বের করবো। পুরোটাই করব শুধু আমরা" বা "মাই গড, স্যাল। সারাজীবন এরকম কিছু একটা করার স্বপ্ন দেখে এসেছি আমি"।

মাঝরাত পার হওয়ার অনেক পরে আমরা আকাশ-কুসুম চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে বাস্তবতা নিয়ে ভাবতে বসলাম, স্যালি ব্যবহারিক ব্যাপার-স্যাপারের প্রসঙ্গ তুললো।

"কী করবো আমরা বেন? লোরেন স্টারভেসান্টকে কি এখনই জানাবো সব?"

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আরও এক গ্লাস ড্রিঙ্ক ঢেলে নিলাম আমি।

"আমাদের কি আগে ফাউন্ডেশনে ছোট একটা হলেও গর্ত করে দেখা উচিত না? যাতে করে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায় যে আবারও ধোঁকা খেতে যাচ্ছি না।"

"বেন, আপনি ভালোই জানেন যে প্রত্নতত্ত্বের প্রথম নিয়মটা কী। এলোমেলো কোথাও খোঁচাখুঁচি করতে যাবেন না। মূল্যবান কিছু একটা নষ্ট করে ফেলতে পারেন তাতে। একটা পরীক্ষিত আর শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি ছাড়া এগোনো উচিত না আমাদের।"

"আমি জানি, স্যাল। কিন্তু আমার আসলে আর তর সহ্য হচ্ছে না। একটা ছোট্ট ছিদ্র করবো শুধু?"

“আচ্ছা,” দাঁত বের করে হাসলো ও। “একটা ছোট্ট ফুটো শুধু।”

“আমার মনে হয় এখন একটু ঘুমানোর চেষ্টা করা উচিত আমাদের। দুইটার বেশি বাজে।”

উঠে যাওয়ার ঠিক আগে, স্যালি আমার বুকে মাথা রেখে বিড়বিড় করে বলল, “আমি এখনও ভেবে পাচ্ছি না পুরো শহরটার কী হলো। যদি ওই বুশম্যানের আঁকা ছবিগুলো সত্যি হয়, তাহলে তো বিশাল বিশাল দেওয়াল আর মিনারের মত স্থাপনা একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে!”

“হ্যাঁ, জিনিসটা খুঁজে বের করতে দারুণ মজা-ই হবে।”



যে চারিত্রিক শক্তির বলে আমি মন্দিরের দেওয়ালের ভেতরের দিকে একটা পরিখা খোঁড়া থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম, সেই শক্তি আমার ভেতর সচরাচর থাকে না। আমরা বাইরের দেওয়ালের ফাউন্ডেশনের উপরে একটা জায়গা নির্ধারণ করলাম, যেখানে আন্দাজ করলাম যে ছিদ্র করলে সবচেয়ে কম ক্ষতি হবে।

স্যালিও লোভাতুরভাবে তাকিয়ে রইলো, বকবক করে করে নানান উপদেশ দিতেই লাগল পাশে দাঁড়িয়ে। কতটুকু খুঁড়বো সেটা চিহ্নিত করার জন্য আমি একটা চাদর ছিঁড়ে ফিতের মত বানিয়ে নিয়ে এসেছি, সেটা দিয়েই কাজটা করলাম। একটা সরু খাত খুঁড়বো, তিনফুট চওড়া আর বিশফুট মত লম্বা, ফাউন্ডেশনের সাথে সমকোণ করে, যাতে করে ওটার গায়ে একটা প্রস্থচ্ছেদ বের করতে পারি।

ফিতেগুলোয় এক ফুট পর পর চিহ্ন দেওয়া আছে, স্যালি ওর নোটবুকের সাথে মিলিয়ে দেখে নিল বসানো ঠিক হয়েছে কিনা। আমি ল্যান্ড রোভার থেকে ক্যামেরা, যন্ত্রপাতি আর তেরপল নিয়ে এলাম। আমাদের খোঁড়ার জায়গাটা তাঁবু থেকে মাত্র তিরিশগজ মত দূরে। একেবারে প্রাচীন একটা দেওয়ালের উপরেই বলা যায় ক্যাম্প করেছি।

আমি তেরপলটা বিছিয়ে দিলাম খুঁড়ে তোলা মাটি রাখার জন্য, তারপর জামাটা খুলে ছুঁড়ে দিলাম একদিকে। স্যালির সামনে নগ্ন হতে আর লজ্জা করে না এখন। দুই হাতের তালুতে থুথু দিয়ে, ফিতের সামনে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, গাঁইতিটা তুলে ধরলাম উপরে। স্যালির দিকে তাকিয়ে দেখি ও মনোযোগ দিয়ে তেরপলের উপরে বসে আছে, মাথায় বিশাল কিনারঅলা একটা হ্যাট।

"শুরু করবো?" দাঁত বের করে হেসে বললাম আমি।

"অল দ্য ওয়ে, পার্টনার!" বলল স্যালি। শুনে কিছুটা চমকে গেলাম আমি। ওর কাছে কথাটা শুনবো আশা করিনি, এটা আমার আর লোরেনের কথা। অন্যদের সাথে ব্যবহার করি না। পরে আবার ভাবলাম, ধূর কি আর হবে এমন! আমি তো স্যালিকেও ভালোবাসি।

"অল দ্য ওয়ে, গার্ল!" আমিও বলে নামিয়ে আনলাম গাঁইতিটা। ওটাকে বেশ হালকাই লাগছিল, এক আঘাতে মাথাটা বেলে মাটির গভীরে ডেবে গেল। ধীরে-সুস্থে কাজ করতে লাগলাম আমি। গাঁইতি আর শাবল চালাতে গিয়ে জোর দিচ্ছিলাম না মোটেও, কিন্তু তবুও কিছুক্ষণ পর দরদর করে ঘামতে শুরু করলাম, সারা শরীর থেকে অসংখ্য ধারা প্রবাহিত হয়ে আমার প্যান্ট ভিজিয়ে দিল। পরিখা থেকে মাটি তুলে তুলে তেরপলের উপর রাখতে লাগলাম আমি, স্যালি সেগুলো সাবধানে সরিয়ে নিতে লাগল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনের সুখে বকবক করতে লাগল ও, কিন্তু আমি প্রতিবার গাঁইতি চালানোর সময় মুখ দিয়ে শব্দ করা ছাড়া আর কোনো জবাব দিলাম না।

দুপুর নাগাদ আমি পুরো পরিখাটাই তিন ফুট গভীর করে খুঁড়ে ফেললাম। আঠারো ইঞ্চি গভীরতায় বেলে মাটি সরে গিয়ে ঘন লালচে কাদামাটি বেরিয়ে এল, সাম্প্রতিক বৃষ্টির কারণে তখনও সেটা ছিল ভেজা ভেজা। আমরা বিশ্রাম নিলাম আর আমি একগাদা ক্যানের খাবার আর এক বোতল উইন্ডহোয়েক সাবাড় করে খরচ করা শক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালালাম।

"একটা কথা কী জানেন," চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল স্যালি, "একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে, আপনার শরীরটা দেখতে অন্যরকম সুন্দর লাগে।" আমি লজ্জায় লাল তো হলাম-ই, চোখ দিয়েও পানি বেরিয়ে এল।

আরও ঘণ্টাখানেক কাজ করলাম আমি, আচমকাই গাঁইতির আঘাতে কালো কালো মাটি বের হওয়া শুরু করল। আমি আবারও কোপ দিলাম—আবারও কালো। আমি গাঁইতিটা ফেলে পরিখার ভেতর বসে পড়লাম।

"কী জিনিস?" সাথে সাথে চলে এল স্যালিও।

"ছাই!" বললাম আমি। "কয়লা।"

"পুরনো আমলের চুলা মনে হয়," আন্দাজ করল ও।

"হতে পারে," নিশ্চিত করে কিছু বললাম না আমি। তাহলে পরে স্যালির ধারণা ভুল প্রমাণ হলে, ওকে এটা নিয়ে ক্ষেপানো যাবে। "বয়স বের করার জন্য কিছু স্যাম্পল নিয়ে নাও।"

আরও সাবধান হয়ে কাজ করতে লাগলাম আমি। বালির স্তরের কোনো ক্ষতি না করেই ওটাকে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। ওখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করার সময় খেয়াল করলাম যে পরিখার প্রান্ত জুড়ে কোথাও কোথাও ছাইয়ের গভীরতা সোয়া এক থেকে দুই ইঞ্চি পর্যন্ত!

তারপর আমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলাম দুজনের দিকে।

"চুলা তো এত বড় হবে না," স্যালি বলতেই মাথা ঝাঁকালাম আমি। "আর বেশি গভীরে খোঁড়া উচিত হবে না, বেন। মানে এভাবে না, শাবল আর গাঁইতি দিয়ে ভেঙ্গে-চুরে না।"

"জানি," বললাম আমি। "আমরা অর্ধেক পরিখা খুঁড়বো, ছাইয়ের স্তরের কোনো ক্ষতি করবো না–এইটুক নিয়ম ভাঙবো আমি–তবে বাকি জায়গাগুলো একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখবো আমি, যদি পারি তো একেবারে বেডরক[৩২] পর্যন্ত!"

"ভালো বলেছেন," স্যালি আমার সিদ্ধান্তের সমর্থন করল। "আমারও সেরকমই ইচ্ছা করছে।"

"তুমি শেষ মাথা থেকে শুরু করো, আমি এখান থেকে শুরু করছি, আমরা দুজন দুজনের দিকে আসবো," নির্দেশনা দিলাম আমি। আর আমরা অর্ধেক পরিখার ছাই তোলা শুরু করলাম। ওটার ঠিক নিচেই শক্ত কাঁদার আস্তর খুঁজে পেলাম। যদিও মুখে বললাম না, কিন্তু মনে হচ্ছিল যে এগুলো আসলে কোনো স্থাপনার দেওয়ালের ফাঁক বোজানোর জন্য বসানো। এটা প্রাকৃতিক কোনো আস্তর না, অন্য কোথাও থেকে আনা।

"সাবধানে," সতর্ক করলাম স্যালিকে।

"যার হাতে গাঁইতি-শাবল সে কিনা এই কথা বলছে," মাথা না তুলেই খোঁচা মেরে বিড়বিড় করে বলল ও, সাথে সাথেই এই মুন সিটিতে প্রথম আবিষ্কারটা করে বসল!

এই কাহিনি যখন লিখছি তখনও আমার সামনে ওর নোটবুকটা খোলা, স্কুলের বাচ্চাদের মত বড় বড় অক্ষরে লেখা সেখানে। পাতার উপর ওর মাটি লেগে থাকা আঙুলের ছাপ পড়েছে।

Trench 1. Reference AC. 6. II.4. Depth 4'2$^1/_2$".
Item. One glass bead. Oval. Blue. Circum. 2$^1/_2$ mm,
Pierced. Slightly heat-distorted.
Remarks: Found in layer of ash at Level I.
Index No. CM. 1

এখানে অল্প কথায় আসলে আমাদের ওই সময়কার আনন্দকে বোঝানো সম্ভব না, আমরা যে কীভাবে বারবার দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরছিলাম আর ওই রোদের ভেতরেই হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম! এটা ছিল একটা নীলরঙা আদর্শ ফিনিশিয়ান পুঁতি, যা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো; আমি সাবধানে ছোট কাঁচের গুলিটা আমার এক হাতে ধরে রইলাম।

"আমি এটাকে নিয়ে ওই শালাদের পাছা দিয়ে ভরে দেব," হুমকি দিলাম আমি...অবশ্যই আমার সমালোচকদেরকে।

---

[৩২] মাটির যে স্তরের পরে পাথর থাকে

"যদি ওই জায়গাটাও ওদের মনের মত চাপা হয়, তাহলে কিন্তু ঢোকাতে ভালোই কষ্ট হবে আপনার, বেন সোনা।"

আমি এবার একটা ছোট বেলচা দিয়ে খুঁড়তে শুরু করলাম আর পনেরো মিনিট পরে আমিই করলাম পরবর্তী আবিষ্কার–একটা হাড়ের পোড়া অংশ।

"মানুষের?" জিজ্ঞেস করল স্যালি।

"সম্ভবত," বললাম আমি। "ফিমারের[৩৩] মাথা–বাকিটা পুড়ে গিয়েছে।"

"মানুষ পুড়িয়ে খেয়েছে? নাকি দাহ করেছে?" স্যালি ভেবে পেল না।

"তুমি বেশি তাড়াহুড়া করো," বললাম আমি।

"তাহলে আপনার কী ধারণা?" চ্যালেঞ্জ করল স্যালি। আমি দীর্ঘক্ষণ কিছু বললাম না, তারপর মন ঠিক করে বলে দিলাম আমার ধারণা।

"আমার ধারণা পুরো মুন সিটিটা একেবারে মাটি পর্যন্ত ধ্বংস করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখানকার বাসিন্দাদেরকে খুন করা হয়েছে, দেওয়াল ভেঙে ফেলে বাড়িঘর সব মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে মাটির সাথে।"

স্যালি নরম সুরে শিস দিয়ে উঠলো, আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। "একটামাত্র পুঁতি আর এক টুকরো হাড়–এর উপর ভিত্তি করে এত বড় অনুমান। এটাই সম্ভবত ইতিহাসের সেরা আকাশ-কুসুম কল্পনা!"



সেদিন সন্ধ্যায়, লার্কিনের হেঁড়ে গলার প্রশ্নের উত্তরে জানালাম, "থ্যাংকস, পিটার। ভালো আছি আমরা। না, আমাদের আপাতত লাগবে না কিছু। হ্যাঁ। খুব ভালো। মিস্টার স্টারভেসান্টকে বলবেন যে এদিকে আর নতুন কোনো অগ্রগতি হয়নি, কিছু নেই জানানোর।"

আমি কথা বলা বন্ধ করে স্যালির চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

"ঠিকই আছে," কড়া গলায় বলল স্যালি। "এইভাবে মিথ্যা বলার পরে আপনার নিজেকে অপরাধী ভাবা ঠিকই আছে।"

"কী করবো, তুমিই তো বললে যে আমরা পেয়েছি একটামাত্র পুঁতি আর এক টুকরো মাত্র হাড়।"

দুই দিন পরের সন্ধ্যায়, আমার আর এরকম দেওয়ার মত কোনো অজুহাত রইলো না। পরিখার গভীরতা তখন সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি আর ওখানে আমি প্রথমবারের মত দেওয়ালের চারটা টুকরো আবিষ্কার করলাম। পাথরগুলো খুবই দক্ষতার সাথে কাটা আর আকারে বর্গাকৃতির। দুটো

---

৩৩ উরুর হাড়

পাথরের চাঁই-এর মাঝেরজোড়া এতটাই চাপা যে ছুরির ফলা-ও এর ভেতরে ঢোকানো সম্ভব না। এখানকার চাঁইগুলো জিম্বাবুয়ের পাথরগুলোর চাইতে বড়, পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এগুলো বড় কোনো অট্টালিকাকে ধরে রাখার জন্যেই বানানো হয়েছিল; গড় আয়তন হবে মোটামুটি চার ফুট, গুণ দুই, গুণ দুই। এই পাহাড়গুলোর মতই লাল বেলেপাথর থেকে কাটা চাঁইগুলো। যতই এটার কারিগরি সূক্ষ্মতা পরীক্ষা করে দেখলাম, ততোই নিশ্চিত হলাম যে কোনো একটা শক্তিশালী আর সমৃদ্ধ সভ্যতার কারিগরের কাজ দেখছি।

সেদিন রাতে লার্কিনের সাথে কথা হলো আবার।

"আচ্ছা মিস্টার স্টারভেসান্টকে কত তাড়াতাড়ি একটা মেসেজ দিতে পারবেন, পিটার?"

"আজকের মাঝেই ওনার নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার কথা। সন্ধ্যার মাঝে ফোনে পাবো ওনাকে আশা করি।"

"ওকে বলবেন সোজা এখানে চলে আসতে।"

"মানে বলতে চাচ্ছেন, ওনার কাজবাজ সব ফেলে আপনার ওখানে দৌড় দিতে? হাসালেন।"

"যা বললাম বলবেন শুধু।"

পরেরদিন বিকেল তিনটায় হেলিকপ্টার এসে পৌঁছলো। আর আমি শার্ট পরতে পরতে ছুট দিলাম ওটার দিকে।

"আমার জন্য কী সারপ্রাইজ রেখেছো, বেন?" লোরেন ওর বিশাল সোনালি দেহটা হেলিকপ্টারের পেট থেকে বের করতে করতে জিজ্ঞেস করল।

"জিনিসটা পছন্দ হবে তোমার," ওর সাথে করমর্দন করতে করতে জানালাম।

পাঁচ ঘণ্টা পরে আমরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বিশ্রাম নিতে বসলাম আর লোরেন ওর গ্লাসের কানার উপর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসলো।

"তোমার কথাই ঠিক, দোস্ত। আমার বেশ ভালো লেগেছে জিনিসটা!" আসার পরে এই প্রথম ও কোনো মন্তব্য করল। আমার আর স্যালির সাথে পরিখা থেকে শুরু করে গুহা আর পাহাড়ের চূড়া সব জায়গা ঘুরে এসেছে; আমাদের ব্যাখ্যা আর ধারণা মন দিয়ে শুনেছে, যখন আমি ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য নিচু থেকে আলো পড়ার ব্যাপারে আমার অভিমত ব্যাখ্যা করলাম তখন হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে শুনেছে, মাঝে মাঝে ওর অফিসের ডাইরেক্টরদের মিটিং-এ যেমন সুরে প্রশ্ন করে তেমন করে দুই-একটা প্রশ্নও ছুঁড়ে দিয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই প্রশ্নগুলো ছিল প্রাসঙ্গিক, চাঁছাছোলা আর কৌতূহলপূর্ণ, ঠিক যেন ও কোনো ব্যবসায়িক পরিকল্পনা যাচাই করে দেখছে।

যখন স্যালি কথা বলছিল তখন লোরেন কাছেই দাঁড়িয়ে, অকপটে ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো; লোরেনের চোখদুটো ওর ব্যক্তিত্ব আর স্থিরতার এক মূর্ত প্রতীক। একবার স্যালি ওর একটা মতামতের উপর জোর

দেওয়ার জন্য লোরেনের বাহু চেপে ধরলো আর দুজনেই হেসে উঠলো তাতে। ওদের দুজনকে অবশেষে বন্ধুত্বপূর্ণ দেখে খুশি লাগছিল আমার খুব, কারণ পৃথিবীতে শুধু এই দুজনকে ভালোবাসি আমি।

লোরেন আমার সাথে পরিখার খাতে নেমে, হাঁটু মুড়ে বসে পাথরগুলোয় হাত বুলিয়ে দেখলো, পোড়া হাড় আর গলা কাঁচের পুঁতিটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এমনভাবে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলো যে দেখে মনে হলো। মনের শক্তি দিয়ে ওগুলোর ভেতরের রহস্যভেদ করার চেষ্টা করছে!

সূর্যাস্তের ঠিক আগে, লোরেনের চাপাচাপিতে আমরা আবার গুহার ভেতরে ঢুকে পেছনের দেওয়ালটার কাছে চলে গেলাম। আমি একটা লণ্ঠন জ্বেলে এমনভাবে ধরলাম যেন আলো হোয়াইট কিং-এর প্রতিকৃতির উপর পড়ে। তারপর আমরা তিনজন ওটার সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বসে ওটার প্রতিটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম। রাজার মাথাটা এক পাশে ফেরানো; স্যালি তার লম্বা খাড়া নাক, উঁচু কপালসহ প্রতিটা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে লাগল।

"এরকম চেহারার মানুষ কখনোই আফ্রিকায় দেখা যায়নি," বলল স্যালি, তুলনা করার জন্য ও দেওয়ালের আরেকদিকের একটা প্রতিকৃতিকে দেখালো। "ওটা দেখুন। ওটা একটা বান্টু, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই শিল্পী মানুষের ধরনটাও আলাদা করে আঁকার মত দক্ষ ছিলেন।"

যা-ই হোক, লোরেনের মনোযোগ অবশ্য রাজাকে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। আবারও মনে হলো যেন ও জবরদস্তি করে ওটার সব রহস্য টেনে বের করে আনবে, কিন্তু রাজা তার সমস্ত রাজকীয়তা নিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে রইলেন; শেষমেশ লোরেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো। ঘুরে চলে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে ওর চোখ গেল রাজার পায়ের কাছের সাদা আলখাল্লা পরিহিত পুরোহিত দলের দিকে।

"এরা কারা?" জিজ্ঞেস করল ও।

"আমরা ওদেরকে আপাতত পুরোহিত বলে ধরে নিয়েছি," বললাম আমি। "তবে স্যালির ধারণা এরা আরব বণিকও হতে পারে বা–"

"মাঝের এই প্রতিকৃতিটা–" লোরেন ঠিক মাঝের পুরোহিতের দিকে ইঙ্গিত করল; ওর গলার স্বর চড়ে গিয়েছে, খুব সতর্ক যেন। "কী করছে?"

"রাজাকে কুর্ণিশ করছে," মত দিল স্যালি।

"কিন্তু মাথা ঝুঁকিয়ে রাখার পরেও সে অন্যদের চাইতে লম্বা কেন?" লোরেন প্রতিবাদ করল।

"আকৃতি দিয়ে বুশম্যান লোকটা সম্মানের পরিমাপ বুঝিয়েছে এখানে। রাজার আকৃতিটা দেখো–যদিও এরা পিগমি, কিন্তু সবসময় নিজেদেরকে দানবাকৃতির করে আঁকে। মাঝের ওই পুরোহিতটার বড় আকৃতির তাৎপর্য হচ্ছে সে হলো প্রধান পুরোহিত, অথবা আরবদের দলপতি, যদি স্যালির কথা ঠিক হয় আরকি।"

"যদি সে কুর্ণিশই করে থাকে, তাহলে সেটা করছে শুধু নিজের শরীরের উপরের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে শুধু, একমাত্র সে-ই করছে। বাকি সবাই দাঁড়িয়ে আছে সোজা।" লোরেনের আমার ব্যাখ্যা মনঃপুত হলো না। "দেখে মনে হচ্ছে যেন ঠিক-" ওর কণ্ঠ মিলিয়ে গেল, মাথা নাড়তে লাগল। তারপর কেমন যেন কেঁপে উঠলো ও, খেয়াল করলাম ওর বাহুর মসৃণ রোদে পোড়া চামড়ার উপরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল সোজা।

"ঠান্ডা লাগছে এখানে," বুকের উপর আড়াআড়ি হাত বাঁধতে বাঁধতে বলল লোরেন। আমি যদিও তাপমাত্রার কোনো পতন টের পেলাম না, কিন্তু যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। "ক্যাম্পে ফিরে যাই চলো," বলল লোরেন।

কেউ কোনো কথা বললাম না আর। ফিরে গিয়ে আগুন জ্বালালাম। মটমট করে কাঠ ফাটা শুরু হলো, ফুলকি উড়তে লাগল উপর দিয়ে। আবার মুখ খুলল লোরেন।

"তোমার কথাই ঠিক, দোস্ত। আমার বেশ ভালো লেগেছে জিনিসটা!" মল্ট হুইস্কিতে চুমুক বসালো লোরেন। "এখন খরচাপাতির ব্যাপারে আলাপ করা যাক," প্রস্তাব দিল ও।

"তুমিই হিসাব দাও, লোরেন," সায় দিলাম আমিও।

"বতসোয়ানা সরকারের সাথে আলাপ করবো আমি, আশা করছি ওদেরকে রাজি করাতে পারবো। এরপর একটা ফর্মাল চুক্তি সই করতে হবে, সম্ভবত আধাআধি ভাগাভাগি হবে, তবে আমাদেরকে সম্পূর্ণ অনুমোদন আরসর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে।"

"খুব ভালো। সেসব তো তোমার বাঁ হাতের খেল, লো।"

"তোমাকে যদ্দুর চিনি বেঞ্জামিন, তাতে তোমার এর মাঝেই চাহিদার একটা লিস্ট করে ফেলার কথা। তোমার পছন্দের লোকজন, যন্ত্রপাতি-ঠিক না?"

আমি হাসতে হাসতে আমার উপরের পকেটের বোতামটা খুললাম। "আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে-" লোরেনের ধারণা মেনে নিয়ে ওকে ফুলস্কেপ কাগজটা ধরিয়ে দিলাম। ও দ্রুত চোখ বোলালো ওটার উপর।

"অনেক রয়ে-সয়ে লিস্ট করেছো দেখি," আমাকে অভিনন্দন জানালো লোরেন। "তবে মনে হয় আমরা এর চাইতে বড় করেও করতে পারবো সব। সবার আগে আমি এখানে কাজ চালানোর মত একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ চাই, অন্তত একটা ডকোটা নামতে পারবে এমন। গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে প্রায়। এই ক্যানভাসের তাঁবুতে থাকতে হলে বেঁচে ফিরতে পারবে না । শক্তপোক্ত আবাসন করতে হবে, অফিস লাগবে, জিনিসপত্র রাখার জায়গা লাগবে, সেসবে এসি-ও লাগবে। সেজন্য দরকার একটা জেনারেটর। সেটা দিয়ে বাতিও জ্বালানো যাবে আর ওই দীঘি থেকে পানিও তোলা যাবে।"

“তোমাকে কেউ কখনও *আধা-প্রস্তুত* বলে অপবাদ দিতে পারবে না, লো,” বললাম আমি। সবাই হাসলো আমার কথায়। স্যালি আমার গ্লাসটা ভরে দিল আবার। সেই সন্ধ্যায় আমি ছিলাম খুবই উৎফুল্ল আর চরমভাবে নিজের উপর সন্তুষ্ট। গর্ব করার মত অনেক কিছুই ছিল, প্রায় সহস্রাব্দ ধরে লুকিয়ে থাকা একটা গোপন জিনিসকে খুঁজে বের করতো যাচ্ছি, পুরো ব্যাপারটার পৃষ্ঠপোষকতা করবে লোরেন, আমার পার্টনার। পানির মত করে হুইস্কি খেতে লাগলাম আমি।

আগে প্রচুর হুইস্কি গিলতাম। কিছু নির্দিষ্ট জিনিস ভুলে থাকা আর কিছু জিনিসকে সহজে মেনে নেওয়ার এটা ছিল একটা উপায়। তারপর বছর ছয়েক আগে খেয়াল করলাম–প্রায় বছরখানেক হয় আমি কোনো বই লিখি না! আমার স্মৃতি আর বুদ্ধিমত্তা ঝাপসা হয়ে আসছে এবং সেগুলোর উপর আর ভরসা করা যাচ্ছে না, সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার হাত কাঁপাকাপি করছে নিয়মিত। এখনও মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় এক দুই চুমুক খাই, আবার কখনও-সখনও পুরো বোতলও সাবাড় করি। তবে এখন খাই খুশিতে, মন খারাপ থাকার কারণে না।

“আরও নিন, বেন। আজ রাতে হলো সেলিব্রেশনের রাত।” স্যালি হাসতে হাসতে আমাকে আরও এক গ্লাস ভরে দিল।

“ওয়াও! আস্তে ডক্টর,” দুর্বল কণ্ঠে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেই রাতে মদ খেয়ে চুর হলাম আমি, খুশি মনে, সন্তুষ্ট চিত্তে, একেবারে বদ্ধ মাতাল। তারপর আমাকে সাহায্য করার লোরেনের প্রস্তাব সম্মানের সাথে অগ্রাহ্য করে নিজেই তাঁবুর দিকে হেঁটে গেলাম। লোরেন আসার পর থেকে স্যালি আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাপড় না ছেড়েই আমি বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়লাম আর ঘুমিয়েও গেলাম সাথে সাথে। লোরেন যখন এসে তাঁবুর অন্য খাটিয়াটায় শুলো তখন চেতন ফিরেছিল খানিকটা। মনে পড়ে যে আমি তখন একটা চোখ খুলে, তাঁবুর খোলা প্রবেশপথ দিয়ে ডুবন্ত চাঁদের আলো ঢুকতে দেখেছিলাম–নাকি সেটা ছিল ভোরের প্রথম রশ্মি? তখন ব্যাপারটাকে ততো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।



প্রজেক্টের জন্য লোক বাছাই করাটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার কাজ, তবে এই ক্ষেত্রে আমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। কেপ টাউন ইউনিভার্সিটি থেকে বিশ্রামজনিত ছুটি কাটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল পিটার উইলকক্স। আমি দেখা করতে গেলাম ওর সাথে, মাত্র ছয় ঘণ্টায় ওকে ইউরোপের বিলাসী ছুটি

না কাটানোর জন্য পটিয়ে ফেললাম! ওর স্ত্রী হিদারের মন গলাতে অবশ্য বহুত বেগ পেতে হলো। তবে হোয়াইট কিঙের ছবি দেখানোর পরে সেও রাজি হয়ে গেল। স্যালির মত পাথরের চিত্রকর্মের প্রতি ওরও আলাদা টান আছে।

খোঁড়াখুঁড়ির মত কাজে ওদের মত লোক পাওয়া ভালো ব্যাপার। স্লাংকপ গুহায় খোঁড়াখুঁড়ির সময় আমরা একসাথেই কাজ করেছিলাম। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বয়স ত্রিশের কোঠায়; পিটারের ভুঁড়ি দেখা যাচ্ছে কিছুটা আর মাথায় টাকের আভাস। চোখের স্টিল-রিমড চশমা আর পরনের প্যান্ট দুটোই এমনভাবে ঝুলে থাকে যে দেখে মনে হবে যে এই বুঝি খসে পড়ল! খানিক পর পর কোমর ধরে টানাটানি করা তাই অভ্যাস। হিদার একহারা আর মেদহীন, বিশাল মুখটা সবসময়েই হাসছে, তবে নাকটা বোঁচা আর তাতে মেছতার দাগে ভরা। বাচ্চাকাচ্চা নেই ওদের, সবসময় হাসিখুশি, বিদ্বান আর কর্মঠ। পিটার খুব ভালো অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে পারে আর হিদারের গলার সাথে আমার নিজের গলা খুব ভালো মেলে।

পিটার আমাকে ওর দুজন পোস্টগ্রাজুয়েট ছাত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। এদের কথা আমাকে আগে থেকে কিছু বলেনি ও। ওদের সাথে প্রথম কথাবার্তার সময়েই চমকে গেলাম। র‍্যাল ডেভিডসন একুশ বছর বয়সী একজন তরুণ–অবশ্য সে যে পুরুষ তা আমি ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারিনি। যাই হোক, পিটার আমাকে আশ্বস্ত করল যে ওই এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের নিচে লুকিয়ে আছে একজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ প্রত্নতত্ত্ববিদ। তার বাগদত্তা মোটা কাঁচের চশমা পরিহিতা তরুণী, এবছরের শুরুতে গ্রাজুয়েশন শেষ করেছে। মেয়েটার চেহারা একদমই সাদাসিধে, আমি সবসময় আমার আশপাশে সুন্দরি মহিলাদেরকেই প্রত্যাশা করি; কিন্তু লেসলি জোনস আমার মন কেড়ে নিল আমার সাথে দেখা হতেই ফিসফিস করে এক নিঃশ্বাসে একটা কথা বলে, "ডক্টর কাজিন, আপনার লেখা *Ancient Africa* আমার পড়া শ্রেষ্ঠ বই।"

ভালো রুচির পরিচয় পেয়ে ওদের চাকরি পাকা করে দিলাম।

পিটার লার্কিন আমাকে বতসোয়ানার দক্ষিণাঞ্চল থেকে ছেচল্লিশজন আফ্রিকান দিনমজুর জোগাড় করে দিল। এরা হিলস অভ ব্লাড বা সে সংক্রান্ত কোনো অভিশাপের কথা শোনেনি কখনও।

আমার একমাত্র হতাশা ছিল টিমোথি মাগেবা। কেপ টাউনে ফেরার পথে আমি জোহানেসবার্গে ইনস্টিটিউটে প্রায় পাঁচদিন ছিলাম, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল টিমোথিকে এটা বোঝানো যে ওকে আমার হিলস অভ ব্লাডে দরকার।

"ম্যাকেইন," বলেছিল ও। "এখানে যেসব কাজ আছে তা আর কেউ করতে পারবে না।" আমাকে সেদিনের কথোপকথনটা পরে আবার মনে করতে হয়েছিল পুরোটা। "আপনি যে কাজ করতে যাচ্ছেন, সেসব করার মত

যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ অনেক আছে। এরমধ্যেই এরকম লোকজন জোগাড় করে ফেলেছেন, এদের সবাই বিশেষজ্ঞ। আমাকে আপনার দরকার নেই।"

"প্লিজ, টিমোথি। মাত্র ছয় মাসের মামলা। তোমার কাজ একটু দেরি হলে তেমন কিছু হবে না।"

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল ও, কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না।

"আমার আসলেই তোমাকে চাই ওখানে, খুব দরকার তোমাকে। এমন অনেক ব্যাপার যা তুমি ছাড়া আর কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে না। টিমোথি, ওখানে পনেরো হাজার বর্গফুটেরও বেশি গুহাচিত্র আছে। বেশিরভাগই হচ্ছে নানান প্রতীক, বিভিন্ন নকশাদার চিহ্ন যা কেবল তুমি–"

"ডক্টর কাজিন, আপনি চাইলে আমাকে ওগুলোর নমুনা পাঠিয়ে দিলেই হবে। আমি এখানে বসেই মতামত দিতে পারবো।" ইংরেজিতে বলল টিমোথি। ওকে যারা চেনে, তারা জানে–ভাষা পরিবর্তনের এই ব্যাপারটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক লক্ষণ। "দয়া করে আমাকে এখন ইনস্টিটিউট ছেড়ে কোথাও যেতে জোর করবেন না। আমার সহকারীরা আমার নির্দেশনা ছাড়া কাজ করতে পারে না।"

কয়েক সেকেন্ড দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। মাইনকার চিপায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি। চাইলে ওকে আদেশ দিতে পারতাম, কিন্তু একজন অনিচ্ছুক সাহায্যকারীর চাইতে কেউ না থাকাই ভালো। টিমোথির কালো চোখে একটা বিদ্রোহী, স্বাধীন সত্তা টের পাচ্ছিলাম; এটাও জানতাম যে আমার সাথে না আসার পেছনে আসলে আরও গভীর কোনো কারণ আছে।

"আসলে কি–" ইতস্তত করতে লাগলাম আমি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে ওই প্রাচীন অভিশাপটা কি ওর না আসার পেছনের কারণ কিনা। একজন বুদ্ধিমান আর উচ্চ-শিক্ষিত মানুষকে কুসংস্কারে প্রভাবিত হতে দেখলে গা জ্বলে যায়। কিন্তু সরাসরি প্রশ্নটা করতে পারলাম না, কারণ টিমোথির মত একজন আফ্রিকানের জন্যেও এরকম সরাসরি প্রশ্ন করাটা অভদ্রতা আর অশিষ্টাচারের শামিল।

"সবসময়ই কারণের পেছনে আরও কারণ থাকে, ডক্টর। প্লিজ আমাকে বিশ্বাস করুন, যখন আমি নিজে বলছি যে আমি এবার আপনার সাথে না গেলেই ব্যাপারটা ভালো হবে।"

"ঠিক আছে, টিমোথি," হাল ছেড়ে দিলাম আমি। তারপর উঠে দাঁড়াতেই আবার আমাদের চোখাচোখি হলো। তবে এবার মনে হলো ও ভিন্ন একজন মানুষ। মিটিমিটি করে জ্বলতে থাকা আগুনটা এখন আরও উজ্জ্বল, আবারও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি অনুভব করলাম ভেতরে, মনের গভীর থেকে কেমন একটা ভয় জাঁকিয়ে ধরলো আমাকে।

"সত্যি বলছি ডক্টর, এখানে আমার কাজটা আসলেই জরুরি।"

"সব শেষ হলে তোমার কাজ দেখার অপেক্ষায় থাকবো আমি, টিমোথি।"

আমার নতুন চার সহকারী কেপ টাউন থেকে কমার্শিয়াল ফ্লাইটে করে এসে পৌঁছালো পরদিন সকালে। আমরা একসাথে স্টারভেসান্টের হ্যাঙ্গারে চলে গেলাম। আমাদের জন্য একটা ডকোটা অপেক্ষা করছিল সেখানে।

পুরো ফ্লাইট আমরা আনন্দের সাথে বকবক করে পার করলাম। পিটার তার অ্যাকর্ডিয়ন সাথে করে নিয়ে এসেছে, আমিও আমার পুরনো গিটারটা ছাড়া কোথাও যাই না। আমরা সহজ কয়েকটা গান তুললাম যেমন 'Abdul Abulbul Emir'আর'Green grow the rushes, oh!'; খেয়াল করলাম র‍্যাল ডেভিডসন এমন স্পষ্ট আর চমৎকারভাবে সাথে সাথে শিস দিচ্ছে, যা আসলেই মনোমুগ্ধকর আর লেসলির গলাও বেশ মিষ্টি আর চড়া।

"খোঁড়াখুঁড়ি শেষ হলে সবাইকে ঘুরতে নিয়ে যাবো," বললাম আমি। তারপর ওদেরকে আমার নিজের রচিত কয়েকটা গান শেখালাম।

তিন সপ্তাহ হয় আমি হিলস অভ ব্লাড ছেড়ে এসেছি, ওটার উপর দিয়ে বিমান চক্কর দিতেই আমার অনুপস্থিতিতে ওখানে সংঘটিত পরিবর্তনগুলো চোখে ধরা পড়ল। ধুলোয় ধুসরিত সমভূমির মাঝে লম্বা হয়ে আছে একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ, তাতে উইন্ড-সকও বসানো হয়েছে। ওটার কাছেই দাঁড় করানো হয়েছে অন্য জায়গা থেকে বানিয়ে আনা কয়েকটা ঘরের কাঠামো। একটা লম্বা মূল বাংলো, ওটার চারপাশে থোকা-থোকা থাকার ঘর। একটা কঙ্কালসার লোহার বিশাল ভিত্তির উপর ২,০০০ গ্যালন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যালভানাইজড লোহার পানির ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে, তার পেছনে ক্যাম্প বানানো হয়েছে আফ্রিকান মজুরদের থাকার জন্য।

স্যালি ল্যান্ডিং স্ট্রিপেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ল্যান্ড রোভারটায় জিনিসপত্র তুলে নিয়ে আমাদের নতুন বাসায় যাত্রা করলাম আমরা। ভেবেছিলাম লোরেনকেও দেখবো ওখানে, কিন্তু স্যালি জানালো যে ও নাকি কয়েকদিন থেকে এই গতকালকেই ফিরে গিয়েছে।

স্যালি গর্বিত ভঙ্গিতে আমাদেরকে পুরো ক্যাম্প ঘুরিয়ে দেখালো। মাঝের এয়ার-কন্ডিশন্ড বাংলোটার এক পাশে কয়েকটা ছোট ছোট কমন রুম আর বসার ঘর, মাঝখানে একটা বিশাল অফিস আর তার পেছনে জিনিসপত্র রাখার জন্য ওয়্যারহাউস। থাকার জন্য করা হয়েছে চারটা কুটির, সেগুলোও এয়ার-কন্ডিশন্ড, আসবাব অবশ্য খুব বেশি নেই। স্যালি একটা ঘর দিল উইলকক্সদেরকে, একটা লেসলি আর ওর জন্য, একটা র‍্যাল আর আমার জন্য। চার নম্বরটা রইলো লোরেন বা অন্য কোনো পরিদর্শক, পাইলট বা কোনো অতিথির রাতে থাকতে হলে সেজন্য।

"শোয়ার ব্যাপারে আমার কিছু ভালো বুদ্ধি ছিল," তিক্তস্বরে বিড়বিড় করলাম আমি।

"বেচারা বেন।" নিষ্ঠুরভাবে হাসলো স্যালি। "সভ্যতা আপনাকে শেকল পরিয়ে দিয়েছে। ভালো কথা, আশা করি আপনার বাথিং স্যুট সাথে এনেছেন, দীঘিতে কিন্তু আর কাপড় খুলে ঝাঁপাঝাঁপি করা যাবে না।"

লোরেন আমার জন্য কী কী করেছে তা দেখে খুশি হওয়ার বদলে মন খারাপ হয়ে গেল। হিলস অভ ব্লাড আর মোটেও একাকী, বিজনের মাঝে রহস্যময় কোনো জায়গা রূপে নেই; বরং ব্যস্ত একটা ছোট্ট লোকালয়ে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত বিমান ওঠা-নামা করছে, ধুলো ছিটিয়ে ছুটে যাচ্ছে ল্যান্ড রোভার, এমনকি একটা ইলেকট্রিক ওয়াটার পাম্পের ভটভট আওয়াজ গুহার ভেতরের নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতাকে খান খান করে দিয়ে এমারেল্ড দীঘিটার সবুজ পানিরও দফা রফা করছে।

খুব দ্রুতই আমার দলবল তাদের জন্য নির্ধারিত কাজে লেগে গেল। স্যালি ওই গুহায় কাজ করছে, সাথে একজন কম বয়সী আফ্রিকান সহকারী। বাকি চারজনের প্রত্যেককে দশজন করে মজুর সাথে দেওয়া হলো, সেই সঙ্গে জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো কোথায় কোথায় কাজ করবে।

পিটার আর হিদার বুদ্ধি করে মূল দেওয়ালের বাইরে কাজ করবে বলে ঠিক করল, ওখানে হচ্ছে শহরের নিচু অংশের ধ্বংসাবশেষ। এই জায়গাটায় একটা গায়েব হয়ে যাওয়া সভ্যতার লোকেরা তাদের জঞ্জাল, ভাঙা জিনিসপত্র, পুরনো অস্ত্রপাতি, নষ্ট হওয়া পুঁতি আর যত আকর্ষণীয় ভগ্নাবশেষ এনে ফেলেছে।

র‍্যাল আর লেসলি স্বর্ণ আর গুপ্তধন পাওয়ার আশায় বেষ্টনীর ভেতরেই খোঁড়াখুঁড়ির সিদ্ধান্ত নিল, এই জায়গাটা প্রাচীন লোকজন সবসময়ই ঝাড়ু দিয়ে খুবই টিপটপ আর পরিস্কার রাখতো, সেজন্যই এখানে খুব আকর্ষণীয় কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এটাই হচ্ছে অভিজ্ঞতা আর অনভিজ্ঞতার পার্থক্য, তারুণ্যের উদ্দমতা আর বুড়ো মাথার ঠান্ডা হিসাব-নিকাশের ফারাক।

আমি কিছুতে লাগলাম না, বরং সবার কাজ নিরীক্ষণ আর পরামর্শ দানের কাজ নিলাম নিজের ঘাড়ে। যেসব জায়গায় থাকলে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়, সেসব জায়গাতেই থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম সবসময়। র‍্যাল আর লেসলির কর্মকাণ্ডে দুশ্চিন্তা হতে লাগল, কারণ ওরা আমাকে বারবার আশ্বস্ত করতে চাচ্ছিল যে ওদের কর্মপদ্ধতি আর অগ্রগতি দুটোই সন্তোষজনক, তবে পিটার উইলকক্সের সান্ত্বনায় ঠান্ডা হলাম কিছুটা। ওরা বুদ্ধিদীপ্ত, উদ্যমী তরুণ। আর সবচে বড় কথা ওরা জানে কীভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়।

আফ্রিকান মজুরদের ভেতরে বেকুবগুলোকে বেছে বেছে বাদ দেওয়ায় চারটা দল আর আগের মত থাকলো না। কাজিন অ্যান্ড কোম্পানি–আমার কাল্পনিক ফার্মটা ভালোই কাজ দেখানো শুরু করেছিল–কিন্তু আমার প্রত্যাশার চাইতে কম সময় স্থায়ী হলো সেটা।

কাজটা ছিল ধীর, কষ্টসাধ্য কিন্তু পুরোপুরি সন্তোষজনক। প্রতি সন্ধ্যায়, কমন রুমে বসে রাত্রিকালীন গান বাজনার আসর বসানোর আগে, সারাদিনের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হতো, কোনো কিছু আবিষ্কার হলে সেটাকে মূল্যায়ন করে এখানকার একটা সাধারণ চিত্রের সাথে ওটার অবস্থান কোথায় হতে পারতো সেটা বের করার চেষ্টা করা হতো।

আমাদের প্রথম প্রামাণ্য আবিস্কারটা হলো: প্রথম স্তরের ওই ছাইয়ের আস্তর পুরো জায়গাটা জুড়েই আছে, এমনকি নিচের শহরটাতেও। তবে কোথাও এটার পুরুত্ব সমান না, একেক জায়গায় একেক রকম মাপের চাপড়া ধরে আছে। কার্বন ডেটিং করে অবশ্য সব জায়গার ছাইয়েরই একই বয়স পাওয়া গেল; আমরা এগুলো ৪৫০ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ের ছাই বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। সালটা গুহার ভেতরের সবচাইতে পুরনো চিত্রকর্মের সমসাময়িক অথবা কিছুটা আগের হবে।

একটা ব্যাপারে সবাই একমত হলাম যে, এই শহর থেকে বাসিন্দারা চলে যাওয়ার বা গায়েব হওয়ার পর পরই ওই গুহায় বুশম্যানরা এসে আশ্রয় নেয়। সতর্কতার জন্য আমরা এখানকার প্রাথমিক বাসিন্দাদেরকে 'অ্যানসিয়েন্ট' নামে ডাকছিলাম, কারণ এরা যে 'ফিনিশিয়ান' সেটা প্রমাণ হয়নি তখনও। আর তখন মনে মনে শুধু এই একটাই ইচ্ছা ছিল, যেন এই ব্যাপারটাই সবার আগে প্রমাণিত হয়।

ছাইয়ের আস্তরের সাথে মানুষের হাড়গোড়ের খণ্ডাংশ পাওয়া যেতে লাগল। র‍্যাল মূল মিনারের পাদদেশের ছাইয়ের ভেতরে একটা কর্তন দাঁত খুঁজে বের করল। পিটার খুঁজে পেল আস্ত একটা হিউমেরাস আর আরও অনেকগুলো হাড়ের ভাঙা টুকরো, যেগুলো চিহ্নিত করা গেল না। এই অকবরস্থ হাড়ের টুকরোগুলো মুন সিটির নৃশংস পরিণতি সম্পর্কে আমার যে অনুমান সেটাকে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা করে দিল।

ধারণাটা হালে আরও পানি পেল শহরের সব দেওয়াল আর মিনারগুলোর অদ্ভুতভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণে। একসময় ওগুলো এই শক্ত কাদার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই আমাদের ধারণা। এটার উপরে এখনও ওগুলোর পাথরের ফাউন্ডেশনের কিছু অংশ এখানে-সেখানে মন্দিরটার বেষ্টনীর উপর বিদ্যমান।

র‍্যাল ইতস্তত করে মত দিল যে কোনো একদল শত্রু, যারা কোনো কারণে এততাই আক্রোশ পুষে রেখেছিল অ্যানসিয়েন্টদের উপর, যে তাদের

শেষ চিহ্নটুকুও পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে! আমরা কেউই প্রতিবাদ করলাম না ।

"তা নাহয় হলো। কিন্তু হাজার হাজার টন ইট-পাথর গেল কোথায়?" স্যালি আমাদের সবার মনের কথাটা বলল।

"ওগুলোকে সমভূমিতে ছিটিয়ে দিয়েছে," কষ্টেমষ্টে বলল র‍্যাল।

"সে তো বিশাল ঝক্কির ব্যাপার। হারকিউলিসকে লাগবে কাজটা করতে! আর তাছাড়া সমভূমিটা তখন একটা হ্রদ ছিল। ওগুলো ছড়িয়ে দিলে নিশ্চয়ই পাহাড় আর হ্রদের মাঝের জায়গাটায় দিতো। কিন্তু সেটার কোনো চিহ্ন নেই।"

পিটার উইলকক্স বিনয়ের সুরে আমাদেরকে ক্রেডো মুতওয়া-র বই *Indaba My Children*-এর কথা মনে করিয়ে দিল। ওখানে দেখানো হয়েছিল যে কীভাবে গোটা একটা প্রাচীন শহরকে অধিবাসীরা টুকরো করে বয়ে নেয় পশ্চিম ছাড়িয়ে...তারপর কীভাবে আবার জিম্বাবুয়েতে আবার শহরটা পুনঃনির্মাণ করা হয়।

"এখানে তো সব লাল বেলেমাটি!" অভদ্রের মত কথার মাঝেই কথা বলে উঠলো স্যালি। "জিম্বাবুয়ে হচ্ছে গ্রানাইট, যে পাহাড়ের উপর ওটা অবস্থিত, সেখান থেকেই কেটে নেওয়া হয়েছিল ওগুলো। আর জিম্বাবুয়ে এখান থেকে দুইশো পচাত্তর মাইল পূর্বে। এতদূর এত ভারি জিনিস বয়ে নেওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব না। বাড়ি বানানোর কৌশল বা দক্ষতা হয়তো ওরা এখান থেকে শিখেছে, কিন্তু ইট-পাথর এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে বললে মানবো না।"

আর কেউ নতুন করে কোনো যুক্তি দিতে পারলো না দেখে আমরা অনুমান করা বাদ দিয়ে প্রাপ্ত উপাত্তের দিকে নজর দিলাম। ছয় সপ্তাহ শেষ হওয়ার পর, প্রথমবারের মত আমাদেরকে দেখতে এল লোরেন স্টারভেসান্ট। দুই দিনের জন্য সব খোঁড়াখুঁড়ি আর অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হলো। আমরা একটা সেমিনারের আয়োজন করলাম, আমি নিজে হলাম সভাপতি। সেখানে লোরেনের সামনে আমাদের এতদিনকার অর্জন আর কী কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি সেসব তুলে ধরলাম।

সবকিছুই ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক। প্রথমেই ছিল এক গাদা হাতিয়ার, মাটির বাসনকোসনের ভাঙা টুকরো আর অন্যান্য ভাঙা জিনিসের ১২৭ পাতার টাইপ করা তালিকা। পিটার আর হিদারই এসবের বেশিরভাগের আবিস্কারক। তাই ওদেরকে দিয়েই শুরু হলো সেমিনার।

"এখন পর্যন্ত শহরের বেষ্টনী বাদে সব খননকার্যই হয়েছে উত্তর দিকে...আর বাইরের পরিসীমার এক হাজার ফুটের ভেতরে। সব দেখে মনে হচ্ছে, মূলত এটা আসলে রোদে পোড়া ইটের তৈরি ছোট ছোট ঘর আর

দালানের সমন্বয়ে একটা আবাসিক জায়গা। ভেতরে থাম বসিয়ে উপরে পাতার ছাউনি–"

পিটার এলাকাটার বিশদ বর্ণনা দিল, ঘরগুলোর গড় আয়তন আর কোন জিনিসটা ঠিক কোত্থেকে উদ্ধার করা হয়েছে–সব। লোরেন ওর চেয়ারে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল খালি, একটু পর হাতের সিগার নিয়ে খেলতে শুরু করল। নিজের কাজের প্রতি মনোভাবের মতই, বক্তব্য দিতে এসেও একেবারে নির্ভুলভাবে সব বলতে লাগল পিটার, ঠিক বুড়ো দাসীদের ঘ্যান ঘ্যান করার মত। অবশেষে ও বক্তব্যের উপসংহারে পৌঁছালো। "এই কারণে, মনে হয় যে এই জায়গাটা ছিল কোনো বর্ধনশীল বাজার।" এরপর ও আমাদেরকে ওয়্যারহাউসে নিয়ে গেল এই এলাকায় উদ্ধারকৃত জিনিসগুলো দেখানোর জন্য। ওখানে ছিল মরচে পড়া লোহার টুকরো, একটা ব্রোঞ্জের চিরুনি, মহিলার দেহের আকৃতির একটা ছুরির বাট, চোদ্দটা ব্রোঞ্জের ফুল যেগুলো আমাদের ধারণা কোনো চামড়ার ঢালে বসানো ছিল। পঁচিশ পাউন্ড ওজনের ব্রোঞ্জের চাকতি, চাঁদ আর সূর্যের আকৃতির জিনিস যেগুলো স্পষ্টতই অলংকার, ষোলোটা নির্দিষ্ট আকৃতির ব্রোঞ্জের পাত, যেগুলো আমাদের ধারণা যে যোদ্ধাদের শরীরের বর্মের অংশ, একটা দুর্দান্ত সুন্দর ব্রোঞ্জের ডিশ, ওটার ব্যাস চব্বিশ ইঞ্চি আর মাঝে একটা সূর্য আর কিনার বরাবর জটিল নকশা কাটা; চল্লিশ পাউন্ড ওজনের ব্রোঞ্জের ভাঙা অংশ, তবে ওগুলোর অবস্থা এতটাই বাজে যে কোনটা কী তা শনাক্ত করা যায়নি।

"এখন পর্যন্ত যা যা পাওয়া গিয়েছে সবই ব্রোঞ্জের জিনিস," লোরেনকে বলল পিটার। "এগুলোর কাজ অবশ্য অতোটা সুন্দর না, তবে বান্টুদের কাজের ধারা বা নকশার সাথেও মেলে না। এগুলোর বেশি মিল হচ্ছে ফিনিশিয়ান কারিগরদের কাজের সাথে। রোমান বা গ্রিকদের মত ছিল না এরা–শিল্পচর্চার তেমন কোনো দাম দিতো না। ওদের দালান কোঠার মতই, ওদের হাতিয়ারগুলোও ছিল সব বিশাল বিশাল আর বেখাপ্পা। আরেকটা ব্যাপার জানা গেছে, তা হলো সূর্য পূজা। এটা পরিষ্কার যে এরা সাধারণভাবে অনেকগুলো দেবতাকে মানতো, কিন্তু সূর্য হচ্ছে এদের প্রধান দেবতা। এই জনপদে, বাআল নামের ফিনিশিয়ান প্রধান যে দেবতা, তাকে আসলে সূর্যেরই মানব প্রতিরূপ হিসেবে দেখানো হয়েছে।"

আমার মনে হলো পিটার হয়তো নিজের জ্ঞান জাহির করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু আমি বাধা দিলাম না কোনো। প্রতিটা জিনিস আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করার পর, পিটার আমাদেরকে পরের সারি টেবিলের দিকে নিয়ে গেল। ওখানে সব কাঁচ আর মাটির জিনিস রাখা।

"কাঁচের পুঁতিগুলোর মোট ওজন একশো পঁচিশ পাউন্ড–রঙ মূলত নীল আর লাল। ফিনিশিয়ানদের পছন্দের রঙ। কিছু সবুজ, সাদা আর হলুদও

আছে, তবে সেগুলো শুধু প্রথম আর দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া গিয়েছে। অন্য কথায় পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের পরের জিনিস এগুলো। সময়টা রোমানদের কর্তৃক ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ফিনিশিয়ান সভ্যতা গ্রাস আর এটার ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার চূড়ান্ত ধাপের সমসাময়িক।"

আমি কথা বললাম এবার। "রোমানরা ফিনিশিয়া আর তার সবকিছুকে এমনভাবে গ্রাস করে নিয়েছিল যে, আমরা ওদের কাজ সম্পর্কে খুবই কম জানি..."

আমার মনোযোগ ছুটে গেল স্যালির দিকে। বেশ খোশ মেজাজে আছে ও, বিগত ছয় সপ্তাহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই কয়দিন কেমন মনমরা আর খুবই উদাসীন হয়ে ছিল। চুল ধুয়েছে বোঝা যাচ্ছে। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চুলগুলো, ঝলমল করছে নরম আলোতেও। চামড়ার যেখানেই রোদ পড়ছে, সেখান থেকেই যেন স্বর্ণালি আভা বের হচ্ছে। ঠোঁটে রঙ মেখেছে, চোখেও করেছে কিছু একটা। ওর সৌন্দর্য দেখে দম আটকে আসতে চাইলো আমার। জোর করে টেবিলের সারির দিকে মন ফেরালাম।

"...এক্ষেত্রে একটা প্রমাণ হচ্ছে এই উদ্ধার করা মাটির জিনিসগুলো," বলছিল পিটার। সামনে সাজিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণের ভাঙা টুকরো বা খণ্ড আর সামান্য কিছু আস্ত তৈজসপত্রের দিকে ইঙ্গিত করল ও। "শুধুমাত্র একটা বাদে আর কোনোটাতেই কোনো লেখা বা খোদাই নেই। শুধু এটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম।" বলে ও মাটির তৈরি কিছু একটার ভাঙা অংশ তুলে নিয়ে লোরেনকে দিল। ওটাকে অন্যগুলো থেকে সম্মানের সাথে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। যদিও এটাকে আগেও বেশ ভালোভাবেই নেড়েচেড়ে দেখেছি, কিন্তু তবুও লোরেন ওটা দেখা শুরু করতেই চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালাম আমরা। মাটির পোড়ানো টুকরোটায় একটা প্রতীক খোদাই করা।

"কোনো কাপ বা ফুলদানীর কিনারের ভাঙা অংশ। আমাদের ধারণা এটা হলো কার্থেজিয়ান টি (T)।"

লোরেন প্রচণ্ড খুশি হয়ে গেল, আমার দিকে ফিরে কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, "তাহলে তো হয়েই গেল, বেন। এখন তো ওরা তত্ত্বটা স্বীকার করতে বাধ্য, তাই না?"

"সেটা করবে না," হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম আমি। "ওরা বলবে যে এটা 'অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসা'। কোনো জিনিসের ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলে, বা নিজের মতের সাথে না মিললে সেটা বাতিল করে দেওয়ার একটা পুরনো কৌশল এটা। বলে দিলেই হয় যে সম্ভবত এটা ব্যবসা বাণিজ্যের সময় অন্য কোথাও থেকে এখানে এসেছিল।"

"তাহলে তো মনে হয় তোমার মত প্রমাণের কোনো সুযোগই নেই, বেন," মর্মাহত কণ্ঠে বলল লোরেন, তবে আমি দাঁত বের করে হাসলাম।

"তবে আমরা অন্তত চৌদ্দ শতকের কোনো নানকিং[৩৪] মাটির পাত্রতো আর আবিষ্কার করিনি—বা কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবিঅলা কোনো ঘর সাজানোর থালা-ও পাইনি!"

হাসতে হাসতে আমরা পরের প্রদর্শনীর দিকে এগিয়ে গেলাম। এখানে সব তামা আর তামার জিনিসপত্র। হাতের চুড়ি আর বালা, সবগুলোতেই সবুজ আস্তর পড়ে আছে, ক্ষয় দেখা যাচ্ছে খালি চোখেই। তামার তারের একটা গাঁটও আছে। তবে সবচে গুরুত্বপূর্ণ হলো কয়েকটা ধাতব পিণ্ড, যেগুলো দেখতে সেন্ট আন্দ্রুস ক্রস-এর মত। প্রতিটার ওজন বারো পাউন্ড করে।

"এগুলো তো নতুন কিছু না," লোরেন মন্তব্য করল।

"না," সায় দিলাম আমিও। "মধ্য আর দক্ষিণ আফ্রিকার সব জায়গাতেই পাওয়া যায় ওগুলো। কিন্তু এগুলোর আকৃতি ঠিক কর্নওয়ালের টিনের খনি থেকে পাওয়া ফিনিশিয়ানদের ধাতব পিণ্ড...বা সাইপ্রাসের প্রাচীন খনি থেকে পাওয়া তামার পিণ্ডগুলোর মত।"

"তবুও এতে কিছুই প্রমাণ হয় না?" লোরেন আমার দিকে ফিরে প্রশ্নটা করতেই মাথা নাড়লাম আমি। তারপর ওকে নিয়ে গেলাম উদ্ধার করা লোহার জিনিসগুলো দেখাতে। কিন্তু ওগুলো সবই এত বেশি মরচে পড়া আর বাঁকা-চোরা যে আসল আকৃতি আন্দাজ অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। কয়েকশো তীরের ফলক, বর্শার মাথা, তরবারির ফলা, কুড়ালের মাথা আর ছুরি। তীরগুলো বেশিরভাগই পাওয়া গিয়েছে প্রথম আর দ্বিতীয় স্তরে।

"অস্ত্রপাতির মোট পরিমাণ দেখে ধারণা করা যায়, মানে আমরা এগুলোকে অস্ত্র বলেই ধরে নিচ্ছি, যে অ্যানসিয়েন্টরা আসলে যুদ্ধপ্রিয় মানুষ ছিল। বা আরেকভাবে বলা যায় যে, ওরা সবসময় আক্রমণের ভয় করতো আর এর বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিল," বললাম আমি। বাকি সবাইও বিড়বিড় করে সম্মতি দিল। লোহার জিনিসপত্র ছেড়ে এবার গেলাম আমার তোলা ছবিগুলো দেখতে। খোঁড়াখুঁড়ির নানান পর্যায় দেখানো হয়েছে সেখানে, নিচের শহরের দৃশ্য, মন্দির, নগরদুর্গ আর ওই গুহাটা।

"দারুণ তুলেছো, বেন," ছবিগুলোর প্রশংসা করল লোরেন। "আজকের জন্য কি এইটুকুই?"

"সেরাটাকে সবার শেষেই দেখানোর নিয়ম," নিজের প্রেজেন্টেশনের সময় একটু কারিকুরি দেখানোর লোভ সামলাতে পারলাম না। ওয়্যারহাউসের শেষ প্রান্তটা পর্দা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম আমি। আমিই লোরেনকে প্রথম পর্দাটার পেছনে নিয়ে গেলাম। আমার দলের প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে লোরেনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। ব্যাপারটায় পুলক অনুভব করলাম আমি।

---

[৩৪]চীনের জায়গা

"গুড গড!" লোরেন এক পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে শিশ্ন আকৃতির থামগুলোর দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো। ওগুলোর মাথায় কারুকার্য করা। "জিম্বাবুয়ে বার্ডস!"

মোট তিনটা ছিল ওখানে। যদিও অসম্পূর্ণ, তবুও ওগুলোর উচ্চতা পাঁচ ফুটের মত, পরিসীমা তিরিশ ইঞ্চির কাছাকাছি। এর মাঝে শুধু একটাকেই বলা চলে মোটামুটি অক্ষত, বাকি দুটোর অবস্থা এতটাই সঙ্গিন যে সেগুলোকে চেনাই যায় না। প্রতিটা থামেরই উপরের অংশে স্পষ্টভাবে একটা শকুনের মত পাখির অবয়ব খোদাই করা। দীর্ঘ চঞ্চু, কুঁজো হওয়া কাঁধ আর লম্বা বড় বড় নখর। হল, ম্যাকলভার আর অন্যান্যরা মিলে জিম্বাবুয়েতে যেগুলো উদ্ধার করেছিলেন, সেগুলো আর এগুলোর নকশা আর খোদাই-ধরনের দিক থেকে একই।

"এগুলো জিম্বাবুয়ে বার্ড না," লোরেনের ভুল ধরিয়ে দিলাম আমি।

"না," সায় দিল স্যালিও। "এগুলো থেকেই জিম্বাবুয়ে বার্ড নকল করা হয়েছিল।"

"কোথায় পেয়েছো?" বলতে বলতে লোরেন সবুজ সাজিমাটির তৈরি অবয়বগুলোকে আরও কাছে থেকে নিরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেল।

"মন্দিরের ভেতরে," র‍্যাল আর লেসলির দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমি, ওদেরকে এখন মানানসই ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে। "ভেতরের বেষ্টনীর মাঝে। এগুলো সম্ভবত ধর্মীয় কোনো জিনিসপত্র-থামটার গলার কাছের উঁচু জায়গাটায় সূর্য আঁকা দেখতে পাচ্ছো-এতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সূর্য দেবতা বাআল-এর উপাসনার কাজেই ব্যবহৃত হতো এগুলো।"

"আমরা এগুলোর নাম দিয়েছি সানবার্ড," ব্যাখ্যা করল স্যালি, "কারণ বেনের মতে *ওফির-এর পাখি* নামটা নাকি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।"

"এগুলোর এই দশা কেন?" লোরেন ইঙ্গিতে ভঙ্গুর সবুজ পাথরটার একটা জায়গা দেখালো, যেখানকার ভাঙা দেখে বোঝা যাছে যে ইচ্ছাকৃত আঘাতে এহেন দশা হয়েছে এগুলোর।

"সেটা এখন আর কে বলতে পারবে!" আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে উড়িয়ে দিলাম প্রশ্নটা। "তবে আমরা জানি যে এগুলোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, প্রথম স্তরের ছাইয়ের স্তূপের ভেতর নির্দিষ্ট কোনো দিক বা সজ্জা ছাড়াই চাপা পড়ে ছিল সবকটা।"

"ব্যাপারটা তো খুবই অদ্ভুত, বেন।" লোরেনের চোখ তখন ওয়্যারহাউসের শেষে একদম শেষ পর্দাটার দিকে। "এখন বলো দেখি, শালার লুকোঁচুরি খেলা হারামি, এই পর্দার ওপারে কী আছে?"

"যার উপর এই পুরো শহর আর জনপদটা প্রতিষ্ঠিত ছিল-" আমি খুলে দিলাম পর্দা, "-সোনা!"

মাখনের মত সুন্দর ধাতুটার মধ্যে বিশেষ কিছু একটা আছে, যা কিনা যে কোনো কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। ওটার দিকে তাকিয়ে দর্শকদের সবাই যেন দম নিতেও ভুলে গেল। জিনিসগুলো খুব সাবধানতার সাথে পরিষ্কার করা হয়েছে, ফলে উপরিভাগ এক বিশেষ নরম দ্যুতিতে ঝকমক করছে, যা স্বর্ণ ছাড়া আর কিছুতেই পাওয়া সম্ভব না।

দায়সারাভাবে জিনিসগুলোকে ধরন অনুযায়ী সাজিয়ে দিলে কেমন যেন এসবের রহস্য আর উত্তেজনা অনেকটাই মিইয়ে যায়। টুকরোগুলোর মোটামুটি ওজন ৬৮৩ আউন্সের মত। প্রায় পনেরোটা খাদহীন স্বর্ণে তৈরি পিণ্ড ছিল যেগুলো মানুষের আঙুলের সমান মোটা। আটচল্লিশটা গয়না, পিন, ব্রোচ আর চিরুনি পাওয়া গিয়েছে, যার কোনোটাই কারিগরি দিক থেকে তেমন সুন্দর না। একটা সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা মহিলা মূর্তি পাওয়া গিয়েছে–

"অ্যাসটার্টে–তানিথ," ওটার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ফিসফিস করে বলল স্যালি। "চাঁদ আর পৃথিবীর দেবী।"

এছাড়াও ছিল একগাদা স্বর্ণের পুঁতি। এগুলো একসময় সুতোয় গাঁথা ছিল, কিন্তু সেটা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে; আরও পেয়েছি কয়েক ডজন সূর্যের আকৃতির চাকতি আর অসংখ্য স্বর্ণের কুচি, ক্লিপ, নকশাদার টুকরো আর নানান আকৃতির বোতাম, যেগুলোর আপাতদৃষ্টিতে কোনো উপযোগিতা পাইনি আমরা।

"সব শেষে," বললাম আমি, "আছে এটা," বলতে বলতে নিখাদ স্বর্ণের তৈরি ভারি পাত্রটা তুলে নিলাম। জিনিসটাকে পিটিয়ে চ্যাপ্টা বানিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে তলাটা অক্ষত তখনও। "এদিকে দেখো," ওটার গায়ের অনন্য সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা নকশার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম আমি।

"আঁখ? অনন্ত জীবনের মিশরীয় প্রতীক?" লোরেন সম্মতির আশায় তাকালো আমার দিকে, আমিও মাথা ঝাঁকালাম।

"আমার পক্ষে-বিপক্ষে সবাই অন্তত এটা স্বীকার করবে যে ফারাওরা, বিভিন্ন উপলক্ষে তাদের সাম্রাজ্যের জন্য ফিনিশিয়ানদের কাছে থেকে সম্পদ নিতো। প্রশ্ন হলো, এই জিনিসটা–" আমি পাত্রটা আমার হাতের উপর ঘোরালাম, "–কোনো ফারাও-এর পক্ষ থেকে ওফির-এর রাজার জন্য উপঢৌকন কিনা?"

"হোয়াইট লেডি অভ ব্রান্ডেনবার্গ-এর ডান হাতে যে পাত্রটা ছিল সেটার কথা মনে আছে?" জিজ্ঞেস করল স্যালি।

প্রথম দিন আমাদেরকে তর্ক-বিতর্ক আর আলোচনায় মত্ত রাখতে এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। পরের দিন স্যালি, হিদার উইলকক্সের সহায়তায় গুহা থেকে আঁকা ওর ছবি আর চিত্রগুলো দেখালো সবাইকে। ও যখন হোয়াইট কিং-এর নকল চিত্রটা দেখালো, আবারও লোরেন ভ্রূ কুঁচকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইলো ওটার দিকে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আরও ভালো করে দেখতে

কাছাকাছি চলে গেল। আমরা চুপচাপ দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলাম, তারপর স্যালির দিকে চাইলো সে।

"আমাকে কষ্ট করে এটার আরেকটা নকল এঁকে দেবেন? আমার নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। পারবেন না?"

"আরে খুবই খুশি হবো আমি কাজটা করে," হাসিমুখে বলল স্যালি। গতকালকের খোশ মেজাজ আর মুখের হাসি আজ কমেনি একটুও আর ওর করা কাজগুলো সবার মাঝে যে মুগ্ধতা এনে দিচ্ছিল সেটাকে পুরোপুরি উপভোগ করছিল ও। স্যালিও আর দশটা সুন্দরি মহিলার মত, আসরের মধ্যমণি হতে অপছন্দ করে না মোটেও। আর নিজের কাজ যে আসলেই ভালো সে ব্যাপারে সচেতন ও, সেজন্য প্রশংসা পেতেও পছন্দ করে।

"এই জিনিসগুলো যে আসলে কী, তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।" স্যালি হাসিমুখেই কমনরুমের বোর্ডে আরেকটা ছবি ঝোলাতে ঝোলাতে বলল। "এখন পর্যন্ত এই রকম দেখতে সতেরোটা প্রতীক চিহ্নিত করেছি আমি। হিদার এদের নাম দিয়েছে ওয়াকিং কিউকাম্বার বা ডাবল ওয়াকিং কিউকাম্বার। আপনাদের কী মনে হয়?"

"ব্যাঙাচি?" র‍্যাল চেষ্টা করল।

"শতপদী?" লেসলির অনুমান মিললেও মিলতে পারে।

আর কেউ কিছু ভেবে পেল না, চুপ হয়ে গেল ঘরটা।

"আর কারো মাথায় কিছু নেই?" জিজ্ঞেস করল স্যালি। "আমি তো ভাবলাম এখানে যে পরিমাণ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন আর পণ্ডিত মানুষের ভীষণ সমাবেশ, তাতে করে আরও ভালো–"

"একটা বাইরিম[৩৫]!" লোরেন নরম স্বরে বলল। "আরেকটা ট্রাইরিম।[৩৬]"

"মাই জোভ[৩৭]।" আমিও সাথে সাথে সাদৃশ্যটা দেখতে পেলাম। "ঠিকই বলেছো!"

"কুইনকুইরিম অভ নিনেভাহ, সেই সুদূর ওফির থেকে আগত," মজা করে বলল পিটার।

"একটা জাহাজের খোল আর দাঁড়ের লাঠির মত দেখতে," বিশদভাবে বললাম আমি। "তাই তো–আমাদের ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে এরকম জাহাজ নিয়মিত এই হ্রদের ধারে আসা যাওয়া করতো।"

আমরা এটা মেনে নিলেও অন্যরা মেনে নেবে না, তা নিশ্চিত।

দুপুরে খাওয়ার পর আমরা খোঁড়াখুঁড়ির জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে গেলাম, লোরেন আবারও দারুণ কিছু অনুমান করে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিল। পিটারের দলটা পাহাড় আর শহরের বেষ্টনীর দেওয়ালের সংযোগস্থলে,

---

[৩৫]প্রাচীন আমলের জাহাজ যাদের দুই সারি দাঁড় থাকতো

[৩৬]এদের থাকতো তিন সারি দাঁড়

[৩৭]জুপিটার–রোমান প্রধান দেবতা

একগাদা প্রকোষ্ঠের মত বড় বড় কয়েকটা ঘর আবিষ্কার করেছে। ওগুলো একটা লম্বা করিডোর দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত, এছাড়া বাঁধানো মেঝে আর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা-ও থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটা ঘর মোটামুটি পঁচিশ বর্গফুট-এর মত, বেষ্টনীর বাইরে এগুলোই একমাত্র দালান। এগুলো পাথর দিয়ে বানানো, পোড়া মাটির ইট দিয়ে না।

ঘরগুলোর প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে সবচেয়ে কাছের যে অনুমানে আমরা পৌঁছাতে পেরেছিলাম তা হচ্ছে: এগুলো জেলখানা।

"আমাকেই কি এখানকার সব কাজ করে দিতে হবে নাকি?" দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোরেন। "একটু আগেই না আমাকে যুদ্ধ হাতির ছবি দেখালে কতগুলো?"

"হাতির আস্তাবল?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"সাবাস, ব্যাটা!" লোরেন আমার পিঠ চাপড়ে দিতেই আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। "তবে আমার ধারণা ভারতে এগুলোকে বলা হয় হস্তীশালা।"

রাতের খাবারের পর আমি ঘণ্টাখানেক কাটালাম আমার ডার্করুমে, তিন রোল ফিল্ম ডেভেলপ করলাম। কাজ শেষ করে বের হলাম লোরেনকে খুঁজতে। পরদিন ভোরেই ওর চলে যাওয়ার কথা আর এখনও অনেক ব্যাপারে আলাপ করা বাকি।

গেস্ট রুমে ছিল না ও, বা বসার ঘরেও না। ও কোথায় জিজ্ঞেস করাতে র‍্যাল জানালো, "আমার ধারণা উনি গুহার ভেতরে গিয়েছেন, ডক্টর। আমার কাছ থেকে একটা টর্চ চেয়ে নিয়ে গেলেন।"

লেসলি ওর দিকে এমনভাবে তাকালো যার অর্থ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, ভ্রূ কুঁচকে হালকা মাথা ঝাঁকাতে লাগল, কিন্তু এর অর্থ র‍্যালের কাছে যা আমার কাছেও সেটাই হলো। আমি আমার টর্চটা নিয়ে এসে এগিয়ে গেলাম নীরব উপবনটার দিকে। খুঁড়ে রাখা জায়গাগুলো সাবধানে ঘুরে পেরিয়ে এলাম। বিশাল বুনো ফিগ গাছটার আড়ালের প্রবেশপথটা থেকে কোনো আলো দেখা যাচ্ছিল না।

"লোরেন!" চিৎকার করে ডাকলাম আমি। "কোথায় তুমি?" পাহাড়ের পাথরে বাঁধা পেয়ে দুর্বলভাবে ফিরে এল আমার ডাক। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতেই নীরবতা নামলো আবার। আমি গুহার প্রবেশপথে ঢুকে পড়লাম। সামনের অন্ধকারে আলো ফেলতেই বাদুড়ের দল উড়তে শুরু করল, ওগুলোর পাখার ঝাপটা থেকে বাঁচতে মাথা নামিয়ে চলতে হলো। এত সুনসান চারিদিকে যে আমার পদশব্দও শোনা যাচ্ছিল জোরে জোরে।

কোনো আলো দেখা যাচ্ছিল না কোথাও, আমি থেমে দাঁড়িয়ে আবার ডাকলাম চিৎকার করে।

"লোরেন!" আমার কণ্ঠ গুহার ভেতরে গমগম করে উঠলো। কিন্তু কোনো জবাব এল না, আমি আরও এগিয়ে গেলাম সামনে।

সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র, আচমকা গুহার অপর পাশ থেকে টর্চের শক্তিশালী আলো সরাসরি এসে পড়ল আমার চোখে।

"লোরেন?" ডাকলাম আমি। "তুমি নাকি?"

"কী ব্যাপার বেন?" টর্চের পেছনের অন্ধকার থেকে জিজ্ঞেস করল লোরেন। খুবই বিরক্ত মনে হচ্ছিল ওকে, এমনকি মনে হলো রেগে গিয়েছে!

"আমাদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলাপ করতে চাচ্ছিলাম একটু।" আলো থেকে বাঁচতে চোখের উপর হাত চাপা দিলাম আমি।

"কালকেও আলাপ করা যাবে।"

"তুমিতো ভোরেই চলে যাবে–এখনই করলে ভালো হয়।"

আমি গুহার ভেতর ওর দিকে এগোনো শুরু করলাম, চোখ ধাঁধানো আলোটা থেকে বাঁচতে নামিয়ে রেখেছি দৃষ্টি।

"আলোটা অন্যদিকে সরাও না," মৃদু প্রতিবাদ করলাম আমি।

"কানে শুনতে পাও না নাকি তুমি!" প্রচণ্ড বিরক্ত গলায় বলল লোরেন, বোঝাই যাচ্ছে ওর আদেশ কখনও অমান্য করা হয় না। "বললাম না কালকে, বোঝো না?"

আমি জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম, অবাক হয়েছি প্রচণ্ড, বিভ্রান্ত। এর আগে জীবনেও লোরেন আমার সাথে এভাবে কথা বলেনি কখনও।

"লো, ঠিক আছো তুমি?" উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলাম আমি। গুহাটায় কিছু একটা গোলমাল চলছে। টের পাচ্ছিলাম আমি।

"বেন," চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও, "সোজা উল্টো ঘুরে বের হয়ে যাও এখান থেকে। কথা শোনো। কাল আলাপ করবো আমরা।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম আমি। তারপর ঘুরে সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে ফিরে গেলাম আবার। টর্চের আলোর পেছনের অন্ধকারে লোরেনকে এক ঝলকও দেখতে পাইনি।

সকাল বেলায় লোরেনকে চিরচারিত চনমনে লাগতে লাগল আবার। গত রাতের জন্য বিনয়ের সাথে ক্ষমাও চাইলো। "আসলে একটু একা থাকতে চাচ্ছিলাম আমি বেন। আমি স্যরি। মাঝে মাঝে যে কী হয় আমার!"

"আমি জানি, লো। আমারও এরকম হয়।"

দশ মিনিটেই আমরা এব্যাপারে একমত হলাম যে যদিও পারিপার্শ্বিক সব তথ্য প্রমাণ শহরটায় ফিনিশিয়ান দখলদারির দিকেই বেশি যায়, কিন্তু এটা চূড়ান্ত না। আমরা এখনই জনসমক্ষে কোনো ঘোষণা দেব না, কিন্তু তার আগে লোরেন আমাকে একটা পূর্ণাঙ্গ খোঁড়াখুঁড়ি আর তদন্ত চালানোর ব্যাপারে যত খরচ বা ব্যবস্থাপনা লাগে তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে দিল।

সূর্যের আলো ফুটতেই ও চলে গেল, আজ সকালে লন্ডনে গিয়ে নাস্তা করবে বলে জানি আমি।



লোরেন চলে যাওয়ার পরের সপ্তাহটা আমার জন্য ভালো গেল না মোটেও। যদিও ধ্বংসাবশেষের ভেতর কাজগুলো সুস্থিরভাবেই চলছিল, আমার সহকারীদের উদ্যম আর পরিশ্রমের ঘাটতি ছিল না কোনো–কিন্তু ফলাফল ছিল সব মিলিয়ে হতাশাজনক।

এমন না যে পাওয়া যাচ্ছিল না কিছু, অনেক কিছুই উদ্ধার হচ্ছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল ঘুরে ফিরে একই জিনিস। মাটির বাসন, পুঁতি, মাঝে মাঝে স্বর্ণের টুকরা বা গয়না, কিন্তু সেগুলো আর আগের মত উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল না মোটেও। আমরা যা যা জানতে পেরেছিলাম তার সাথে নতুন কোনো তথ্যই আর যুক্ত হচ্ছিল না। আমি অস্থির হয়ে পুরো জায়গাটায় পায়চারি করতে শুরু করলাম, কোথাও কোনো নতুন পরিখা বা কোনো নতুন স্তর খোঁড়া হলেই গিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঁকিঝুঁকি দিতাম, মনে মনে প্রার্থনা করতাম এর পরেই যে মাটিটুকু তোলা হবে সেটার ভেতরে যেন কোনো কিছু লেখা কোনো লিপি বা কোনো কবরের ফলক বের হয়। এখানেই কোথাও সেই প্রাচীন রহস্যের চাবিকাঠি লুকানো আছে, কিন্তু সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

খোঁড়াখুঁড়ির অগ্রগতি পিছিয়ে যাওয়া ছাড়াও, দুর্বোধ্য কোনো কারণে স্যালির সাথে আমার সম্পর্কেরও অবনতি হলো, কিন্তু আমি এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মুন সিটিতে সবাই থাকা শুরু করার পরে শারীরিক ঘনিষ্টতার আর কোনো সুযোগ ছিল না। আমাদের মাঝের সম্পর্ক অন্যদেরকে না জানানোর ব্যাপারে স্যালি ছিল একদমই অনড়। ওকে একাকী কাছে পাওয়ার জন্য আমার ছেলেমানুষি প্রচেষ্টাগুলো খুবই কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছিল। সবচে কাছাকাছি সুযোগটা আমি পেতাম যখন দিনের বেলা গুহার ভেতরে ওর কাজ দেখতে যেতাম। এমনকি এখানেও সে নিজের সহকারীকে সাথে রাখতো সবসময়, মাঝে মাঝে হিদার উইলকক্সও থাকত।

কেমন যেন উদাসী হয়ে থাকত স্যালি, কথাই বলত না, বললেও কর্কশ কণ্ঠে। দিনের বেলা প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে ইজেল নিয়ে পড়ে থাকত, রাতের খাবারের পরপরই টুক করে নিজের কুটিরে চলে যেত। একবার পিছু নিলাম আমি, ওর কুটিরের দরজায় মৃদু কড়া নাড়লাম, কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও সাড়া না পাওয়ায় ভয়ে ভয়ে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললাম দরজা। ও ছিল না ভেতরে। অন্ধকারে অপেক্ষা করলাম আমি। নিজেকে একটা পিপিং টম[৩৮] মনে হচ্ছিল আমার। মাঝরাতের পরে ফিরে এল ও, নীরব উপবনটার ভেতরে দিয়ে পা

[৩৮]লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করে যে

টিপে টিপে একটা পেত্নীর মত করে হেঁটে এসে সোজা চলে গেল নিজের ঘরে, যেখানে লেসলি বহু আগেই বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে।

আমার সদাহাস্য স্যালিকে এরকম মনমরা দেখে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, শেষে আমি গুহায় গিয়ে ধরলাম ওকে।

"তোমার সাথে কিছু কথা ছিল, স্যাল।"

"কী ব্যাপারে?" সামান্য অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলো ও, যেন বহুদিন পরে প্রথমবারের মত খেয়াল হলো আমাকে। আমি কম বয়স্ক আফ্রিকান সহকারীটাকে পাঠিয়ে দিয়ে, অনেকটা জোর করেই স্যালিকে এমারেল্ড দীঘিটার ধারে নিয়ে গিয়ে বসালাম। উদ্দেশ্য ছিল এটার সৌন্দর্য আর মনোরম পরিবেশে ওর মনকে নরম করা।

"কিছু হয়েছে, স্যাল?"

"গুড লর্ড, কী আর হবে?" পুরো কথোপকথনটাই ছিল খুবই বিশ্রীরকমভাবে অসন্তুষ্টিকর। স্যালির ভাব দেখে মনে হলো আমি আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিতে গিয়েছি।

ভেতরে ভেতরে রেগে গেলাম আমি, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল: "তোমার প্রেমিক আমি, মনে নেই? তোমার সব ব্যাপারেই নাক গলানোর অধিকার আমার আছে!"

কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণেই রাখলাম, কারণ ভালোই জানতাম যেএতটা বাড়াবাড়ি করলে, আমাদের সম্পর্কের টানটান হয়ে ঝুলতে থাকা শেষ সুতোটুকুও ছিঁড়ে যাবে। বরং ওর হাত টেনে আমার হাতে নিলাম, এইটুকুতেই আমাব গাল লাল হয়ে গেল আর নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগলাম। নরম গলায় বললাম, "আই লাভ ইউ, স্যালি। শুধু এইটুকু মনে রেখো—আমার পক্ষে যদি সামান্য কিছুও করা সম্ভব হয়—"

আমার ধারণা ওই মুহূর্তে এর চাইতে ভালো আর কিছু আসলে বলা সম্ভব ছিল না, কারণ সাথে সাথেই স্যালিও আমার হাত জোরে আঁকড়ে ধরলো আর ওর চেহারাও নরম হয়ে গেল, চোখজোড়াও কেমন আর্দ্র হয়ে উঠলো বলে মনে হলো যেন।

"বেন, আপনি খুবই মিষ্টি একজন মানুষ। আমার দিকে কয়েকদিন খেয়াল না করলেও চলবে। আসলে কী যেন হয়েছে আমার, কারোই কিছু করার নেই এ ব্যাপারে। কয়েকদিন পরে এমনিই ঠিক হয়ে যাবে সব, শুধু যদি আপনি এটা নিয়ে বেশি বেশি না করেন।"

কিছুক্ষণের জন্য আবার আমার সেই আগের প্রেমিকা হয়ে গেল স্যালি, ওড়া একটা হাসি ছড়িয়ে গেল ওর চেহারার এপাশ থেকে ওপাশে, সেই সাথে ওর গাঢ় সবুজ চোখজোড়ায়।

"সব ঠিক হলে আমাকে জানাবে কিন্তু," বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

"অবশ্যই, ডক্টর। আপনাকেই প্রথমে জানাবো।"



পরের সপ্তাহে আমি জোহানেসবার্গে ফিরে গেলাম। ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা, না গিয়ে উপায় ছিল না। আর তাছাড়া ইউনিভার্সিটি অভ উইটওয়াটারস্রান্ড-এর ফ্যাকাল্টি অভ আর্কিয়োলজিতে লেকচার দেব বলে অনেক আগেই কথা দিয়ে রেখেছিলাম।

খোঁড়াখুঁড়ি থেকে এগারো দিন বাইরে থাকবো বলে পরিকল্পনা ছিল। পিটার উইলকক্সের দক্ষ হাতে ফেলে এলাম সব। তবে আসার আগে ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে এসেছি যে নতুন কোনো কিছু পাওয়া বা জানামাত্র সাথে সাথে আমাকে জানাবে।

তিনটা মেয়ে আমার সাথে সাথে থাকলো সমসময়, আমার ব্যাগপত্র গুছিয়ে দিল, বিমানে খাওয়ার জন্য পিকনিক লাঞ্চ বানিয়ে দিল, বিদায় জানানোর সময় চুমু দেওয়ার জন্য এয়ারস্ট্রিপে দাঁড়িয়ে রইলো সার বেঁধে। স্বীকার করতেই হবে যে ওদের এসব খাতির ভালোই লাগছিল আমার।

আমি প্রায়ই দেখেছি যে কোনো সমস্যার কাছাকাছি থাকলে সেই সমস্যার মূল আকৃতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই ছোট হয়ে আসে। মুন সিটি ছেড়ে আসার তিন ঘণ্টা পরে, আমি ছোটোখাটো একটা আবিষ্কার করে বসলাম। যদি ওই ধ্বংসস্তূপের ফাউন্ডেশনগুলোর উপরে একসময় দেওয়াল আর মিনার থেকেই থাকে, তার মানে হচ্ছে ওগুলো তৈরির পাথর নিশ্চয়ই আশপাশের কোনো জায়গা থেকে আনা হয়েছে...সবচে বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে পাশের পাহাড়গুলো থেকেই। তার মানে হচ্ছে ওই পাহাড়গুলোর কোথাও, শহরের কাছেই, নিশ্চয়ই একটা বিশাল খাদ পাওয়া যাবে।

আমাকে খুঁজে বের করতে হবে সেটা, ওটার পরিসর দেখে আমি শহরটার আসল আকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবো।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবারের মত ভালো বোধ করলাম কিছুটা, এরপরের কয়েকটা দিন ছিল খুবই তৃপ্তিকর আর পুরোপুরি উপভোগ্য। ট্রাস্টিদের সাথে মিটিংটা ছিল অনেকটা উৎসবের মত। এরকম উৎসব তখনই আশা করা যায় যখন তহবিল হয় অপরিমিত আর অগ্রগতিও অনুকূলে। অনুষ্ঠানের প্রধান হিসেবে লোরেন ছিল সবচেয়ে বেশি চাঁদা প্রদানকারী। পরবর্তী বারো মাসের জন্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে আবারও আমার চুক্তি নবায়ন করা হলো। সেই সাথে তিরিশ পার্সেন্ট বেতন বৃদ্ধি উদযাপন করতে লোরেন আমাকে ওর বাড়িতে দাওয়াত দিল, যেখানে বিশাল একটা

হলুদ কাঠের টেবিলে তার চাইতেও বিশাল একটা ডাইনিং রুমে প্রায় চল্লিশজন অতিথিকে আপ্যায়ন করা হলো একসাথে, আমি ছিলাম মধ্যমণি।

হিলারি স্টারভেসান্ট, নকশাদার একটা হলুদ সিল্কের গাউন আর বিখ্যাত স্টারভেসান্ট হীরার গয়না পরে, খাওয়ার সময়ের প্রায় পুরোটা অখণ্ড মনোযোগ দিল আমাকে। সুন্দর জিনিসের প্রতি আমার আলাদা একটা দুর্বলতা আছে, বিশেষ করে সেটা যদি হয়ে মেয়েমানুষ, তাহলে তো কথা-ই নেই। সেই রাতে ওখানে প্রায় বিশজন সুন্দরি ছিল, খাওয়ার পরে ড্রয়িং-রুমে আমি প্রায় রাজকীয় কায়দায় সভা চালাতে লাগলাম। ওয়াইন খেয়ে জিহ্বার বাঁধন আলগা হয়ে গেল, সেই সাথে ভাসিয়ে দিল আমার স্বাভাবিক সময়ের লজ্জা। হিলারি আর লোরেন সম্ভবত অতিথিদেরকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল আমার সবকিছুতেই তাল মেলাতে, তবে সেটাকে গায়ে মাখলাম না আমি। রাত দুইটায় যখন হিলারি আর লোরেন আমাকে ধরে নিয়ে আমার মার্সিডিজে তুলে দিল তখন সাতফুট লম্বা বলে মনে হচ্ছিল নিজেকে।

এই নতুন পাওয়া আত্মবিশ্বাসের জোরে ইউনিভার্সিটি অভ উইটওয়াটারস্রান্ডের চারটা লেকচারেও ফাটিয়ে দিলাম। এর মাঝে প্রথমটায় উপস্থিত ছিলেন পঁচিশজন ছাত্র আর ফ্যাকাল্টির সদস্য। পরেরটায় উপস্থিতির হার বেড়ে গেল দুইগুণ। খবর ছড়িয়ে পড়ল সব জায়গায়, আমার শেষ লেকচারের স্থান পরিবর্তন করে একটা মূল লেকচার থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো, কারণ আগত ৬০০ অতিথির স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। এটা ছিল এক অভাবনীয় সাফল্য। আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবারও এখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানানো হলো আর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর সরাসরি ইঙ্গিতে জানালেন যে পরের বছর আর্কিয়োলজির প্রধানের পদটা খালি হয়ে যাবে।

শেষ তিনদিনের প্রতিটা মিনিট আমি কাটালাম ইনস্টিটিউটে। আমার অনুপস্থিতিতে খুব বেশি ঝামেলা হয়নি দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার বহু গুণে গুণান্বিত সহকারীরা মসৃণভাবেই চালিয়ে নিচ্ছে সব।

কালাহারি রুমে বুশম্যানদের প্রদর্শনীটা সম্পূর্ণ হয়েছে, খুলেও দেওয়া হয়েছে জনসাধারণের জন্য। দুর্দান্ত হয়েছে কাজটা, মূল দলটার মাঝের প্রতিমূর্তিটা আমাকে আমার ছোট্ট বন্ধু ঝাইয়ের কথা মনে করিয়ে দিল সাথে সাথে। এখানে দেখা যাচ্ছে একজন বুশম্যান নিজের গুহার বাড়ির পাথরের দেওয়ালে ছবি আঁকছে। হরিণের শিং দিয়ে বানানো ছিপিঅলা রঙের পাত্র, নলখাগড়ার তৈরি ব্রাশ আর নল, আমি কল্পনা করতে লাগলাম আমার হোয়াইট কিঙকে যে এঁকেছিল, সে-ও নিশ্চয়ই এভাবেই কাজ করতো। ভাবতেই কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি খেলে গেল শরীরে, যেন দুই সহস্রাব্দ কেটে গিয়েছে, মনে হতে লাগল আমার মনটা যেন সেই সময়ে চলে যাচ্ছে বারবার। আমি টিমোথি মাগেবার সাথে এব্যাপারে আলাপ করলাম।

"জি, ম্যাকেইন। আপনাকে আগেই বলেছি যে, আমি আর আপনি অন্যদের চাইতে আলাদা। আমাদের ভেতরে আত্মাদের আসা যাওয়া আছে, আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই যা অন্যেরা পায় না।"

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। "তোমার কথা জানি না, টিমোথি, তবে আমি জীবনেও কখনও কোনো লটারি জিততে–"

"আমি ফাজলামো করছি না, ডক্টর," টিমোথি ভর্ৎসনা করল আমাকে। "আপনার সেই ক্ষমতা আছে। শুধু আপনাকে ক্ষমতাটা উন্নয়নের পদ্ধতি শেখায়নি কেউ।"

সম্মোহিতকরণ তাও মানা যায়, কিন্তু মৃত আত্মার সাথে কথা বলা, জাদুবিদ্যা, ভবিষ্যৎ বলা আর এরকম যা কিছু আছে তা আমাকে খুবই বিব্রত করে। তাই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, " আগেও আমাকে বলেছো যে তুমি নাকি আত্মাদের দ্বারা চিহ্নিত..."

টিমোথি ওর ভয়াল কালো চোখজোড়া দিয়ে আমার দিকে স্থির তাকিয়ে রইলো। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো আমার ইঙ্গিতময় প্রশ্নটায় আহত হয়েছে, কিন্তু আচমকা ওর কামানের গোলার মত মাথাটা নাড়তে শুরু করল। উঠে দাঁড়ালো ও, তারপর অফিসের দরজা বন্ধ করে, ছিটকিনি মেরে আবার ফিরে এল নিজের সিটে। দ্রুত হাতে নিজের ডান পায়ের জুতো মোজা খুলে ফেলে মেলে ধরলো আমার দেখার জন্য।

টিমোথির পায়ের বিকলাঙ্গতাটা দেখে থ' মেরে গেলাম আমি, যদিও এর আগে ছবি দেখেছি এরকম পায়ের। জাম্বেজি উপত্যকার বাটোঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার এটা। ১৯৬৯ সালে *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে* এই ব্যাপারটার উপর একটা প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। এই অবস্থাটাকে বলা হয় 'অস্ট্রিচ-ফুট', এক্ষেত্রে জন্ম থেকেই পায়ের বুড়ো আঙুল আর অনামিকার মেটাটার্সাল হাড়ের মাঝে বিশাল একটা ফাঁক থেকে যায়, ফলে পা দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে চলে যায় আর দেখতে হয়ে যায় উট পাখি বা অন্য কোনো শিকারি পাখির নখরের মত। টিমোথি নিশ্চয়ই ওর এই বিকলাঙ্গতা নিয়ে খুবই সংবেদনশীল, তাই প্রায় সাথে সাথেই আবার জুতো মোজা পরে ফেলল। পরে বুঝেছিলাম যে ও ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে এটা দেখিয়েছিল আমার সহানুভূতি পাওয়ার জন্য, আমাদের মাঝে একটা বন্ধন তৈরির করতে।

"দুই পা-ই?" জিজ্ঞেস করলাম আমি, ও মাথা ঝাঁকালো। "জাম্বেজি উপত্যকার বহু মানুষের পা এরকম," ওকে বললাম আমি।

"আমার মা ছিলেন বাটোঙ্গা সম্প্রদায়ের," জবাব দিল ও। "এই জিনিসটাই আমাকে রহস্যময় ব্যাপারে প্রশিক্ষণ পাওয়ার যোগ্য করে তুলেছিল।"

তোমার কোনো সমস্যা হয় আদৌ?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“নাহ,” রূঢ় স্বরে জবাব দিল ও, তারপর হঠাৎ করেই বাটোঙ্গা ভাষায় কথা বলা শুরু করল। “আমাদের মত পা যাদের, তারা সবচেয়ে দ্রুতগতির হরিণকেও দৌড়ে পিছনে ফেলতে পারবে।”

তার মানে এই পরিবর্তনটা আসলে উপকারী, আমার ইচ্ছে ছিল ব্যাপারটা নিয়ে আরও আলোচনা করার, তবে টিমোথির অভিব্যক্তি দেখে সেই সাহস করলাম না। আমাকে জিনিসটা দেখাতে গিয়ে ওর কতটা মানসিক কষ্ট হয়েছে, সেটা অনুধাবন করতে পারছি।

“চা খাবেন, ডক্টর?” আবার ইংরেজিতে ফিরে এল ও, আগের প্রসঙ্গ বাদ। ওর একজন আফ্রিকান সহকারী আমাদেরকে গাঢ় কালো চা ঢেলে দিল কাপে, টিমোথি জিজ্ঞেস করল, “মুন সিটিতে কেমন কাজ চলছে বলেন দেখি, ডক্টর।”

আধা ঘণ্টামতো গল্পগুজব করলাম আমরা, তারপর চলে এলাম ওখান থেকে।

“এখন উঠতে হবে, টিমোথি। কাল সকাল সকাল ফিরে যাবো, এখনও বেশ কিছু কাজ বাকি।”



মৃদু কিন্তু ক্রমাগত করাঘাতে ঘুম ভেঙে গেল আমার। ইনস্টিটিউটে নিজের স্যুইটে শুয়ে ছিলাম আমি। বিছানার পাশের লাইটটা জ্বেলে দেখি রাত তিনটা বাজে।

“কে?” ডাক দিতেই করাঘাত থেমে গেল। আমি বিছানা থেকে নেমে কোনোমতে একটা ড্রেসিং গাউন আর চপ্পলে পা গলিয়ে রওনা দিলাম দরজার দিকে, তখনই মনে পড়ল আর একটু হলেই কত বড় ঝুঁকি নিতে যাচ্ছিলাম। আবার বেডরুমে ফিরে গিয়ে ড্রয়ার থেকে বিকটদর্শন অটোম্যাটিক ফোরটি ফাইভটা নিয়ে ফিরে এলাম। যদিও অতি নাটুকে মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা, কিন্তু তবুও চেম্বারে এক রাউন্ড গুলি ভরে আবার এগোলাম দরজার দিকে।

“কে?” আবার জিজ্ঞেস করলাম।

“আমি, ডক্টর। টিমোথি!”

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম আমি–যে কেউই নিজেকে টিমোথি বলে পরিচয় দিতে পারে।

“একা এসেছো?” কালাহারি বুশম্যানেরর ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“আমি একা, সানবার্ড,” বাইরের লোকটাও একই ভাষায় জবাব দিল। আমি পিস্তলটা পকেটে গলিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

টিমোথির পরনে কালো একটা পায়জামা আর সাদা শার্ট, কাঁধের উপর একটা চাদর ফেলে রেখেছে। তাকানো মাত্র খেয়াল করলাম শার্টে তাজা রক্তের দাগ আর ওর বাঁ হাতে একটা আলগা কাপড় পেঁচানো। বোঝাই যাচ্ছে যন্ত্রণা পাচ্ছে, চোখ বড় বড় করে আলোর দিকে তাকিয়ে রইলো ও, নড়াচড়াও এলোমেলো আর অনিশ্চিত।

"গুড গড, টিমোথি! ঠিক আছো তুমি?"

"ভয়ানক একটা রাত যাচ্ছে আমার, ডক্টর। আপনার সাথে জরুরি কথা বলা দরকার।"

"হাতে কী হয়েছে?"

"আমার সামনের দরজার কাঁচের শার্সিতে লেগে কেটে গিয়েছে, অন্ধকারে পড়ে গিয়েছিলাম," ব্যাখ্যা করল ও।

"আগে দেখতে তো দাও!" আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

"ও কিছু নাহ, ডক্টর। সামান্য আঁচড় লেগেছে মাত্র। আমি যে কথা বলতে এসেছি সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ।"

"অন্তত বসে বলো," বললাম আমি। "ড্রিঙ্ক দেব ?"

"একটা ড্রিঙ্ক দিতে পারেন। অনেক ধন্যবাদ, ম্যাকেইন, দেখতেই পাচ্ছেন আমার মন খুবই বিক্ষিপ্ত আর দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। একারণেই হাতে ব্যথাটা পেয়েছি।"

আমি দুজনের জন্যেই হুইস্কি ঢেলে নিলাম। গ্লাসটা ডান হাতে ধরে আমার বসার ঘরে নার্ভাস ভঙ্গিতে পায়চারি করতে লাগল টিমোথি, আমি একটা বড় চামড়ার আর্মচেয়ারে বসে রইলাম।

"কী হয়েছে টিমোথি?" তাড়া দিলাম আমি।

"আসলে কীভাবে শুরু করবো বুঝছি না, ম্যাকেইন; কারণ আপনি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আপনাকে তো বোঝাতেই হবে।"

হাঁটা থামিয়ে এক ঢোক হুইস্কি খেয়ে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো ও।

"গতকাল সন্ধ্যায় আমরা মুন সিটি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলাম, ডক্টর। আপনি বলেছিলেন যে কত কত রহস্য বাকি আছে যেগুলো এখনও আপনাকে হতবুদ্ধি করে দিচ্ছে।"

"হ্যাঁ।" আগ্রহ সহকারে মাথা ঝাঁকালাম আমি।

"অ্যানসিয়েন্টদের কবরস্থান," টিমোথি বলে চললো। "আপনার কথামতো ওগুলো খুঁজে পাচ্ছেন না।"

"ঠিক।"

"এরপর থেকেই আমি ব্যাপারটা নিয়ে প্রচুর চিন্তাভাবনা করেছি।" ভেন্ডা ভাষায় কথা বলা শুরু করল ও, এই ভাষায় অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করাটা মানিয়ে যায়। "আমার লোকজনের বলা নানা কিংবদন্তীর স্মৃতিগুলো থেকে ঘুরে এসেছি।" মনের চোখে আমিও স্পষ্টভাবে দেখতে

পেলাম কীভাবে ও নিজেকে সম্মোহন করেছে খোঁজাখুজির জন্য। "ওখানে কিছু একটা ছিল, একটা আগুনের পেছনের ছায়ার মত, একটা অশুভ স্মৃতি যা পালিয়ে যাচ্ছিল আমার কাছ থেকে।" নিজের মাথা নাড়তে নাড়তে আবার ঘুরে গেল ও, তারপর আবার অস্থির হয়ে পায়চারি করতে করতে ড্রিংক-এ চুমুক দিতে লাগল আর নিজের মনে বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগল যেন এখনও নিজের মনের অন্ধকার অলিগলি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"কোনো লাভ হচ্ছিল না, ডক্টর। আমি জানতাম ওটা ওখানেই আছে, কিন্তু ধরতে পারছিলাম না। শেষে হতাশ হয়ে ঘুমাতে গেলাম। কিন্তু ঘুম ভালো হলো না, স্বপ্নের দানোরা এসে বারবার হানা দিতে লাগল–তবে অবশেষে..." ইতস্তত করতে লাগল ও, " আমার দাদা এল আমার কাছে।"

আমি অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলাম নিজের চেয়ারে। পঁচিশ বছর ধরে একজন খুনি হিসেবে কবরে শুয়ে আছেন টিমোথির দাদা।

"ঠিক আছে, ডক্টর।" টিমোথি আমার অবিশ্বাসী নড়া-চড়া খেয়াল করে, সহজেই ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করল। "আমি জানি আপনি বিশ্বাস করেন না যে এরকম কোনো কিছু ঘটা সম্ভব। আমাকে আপনার বোঝার মত করে ব্যাখ্যা করতে দিন। বহুদিন আগে ভুলে যাওয়া একটা স্মৃতির খোঁজে নড়া-চড়া করায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আমার মস্তিষ্ক, স্বপ্নে আমার দাদার একটা প্রতিমূর্তি প্রেরণ করে। যার কাছ থেকে আমি ওই স্মৃতিটা বা তথ্যটা প্রথম পেয়েছিলাম।"

নিজের গা শিউরানো অনুভূতিটাকে লুকানোর জন্য হাসলাম আমি জোর করে; এই গভীর রাতে আধাপাগল কালো লোকটা নানান অশুভ কথাবার্তা শোনাচ্ছে আমাকে, আমার মনে হতে লাগল আমি ওর সম্মোহনে পড়ে যাচ্ছি।

"তারপর?" হালকাভাবেই বলতে চাইলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠ চড়চড় করে উঠলো খানিকটা।

"দাদা আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, তারপর বললেন, "ভাগ্যবান মানুষটার সাথে যাও, রক্ত পাহাড়ে, তাহলে আমি ওখানকার রহস্য তোমাকে জানাবো...আর গোপন জায়গাগুলোর রাস্তাও বলে দেব।""

আমার মনে হলো চামড়ার উপর সুঁই ফুটলো যেন। টিমোথি মাত্রই বলল 'রক্ত পাহাড়', ওকে এই নামটা এর আগে জানায়নি কেউই।

"হিলস অভ ব্লাড," আমিও বললাম ওর সাথে।

"ওই নামটাই বলেছিলেন উনি," টিমোথি সায় দিল। "আমি ধরে নিয়েছি যে উনি আপনার ওই মুন সিটিকেই বুঝিয়েছেন।"

চুপ করে গেলাম আমি; আমার ভেতরের প্রাচীন কুসংস্কারপন্থী সত্তার সাথে বাইরের যুক্তিগ্রাহ্য সত্তার লড়াই শুরু হয়েছে।

"তুমি কাল আমার যাথে যেতে চাও, টিমোথি?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"হ্যাঁ, যাবো," সায় দিল টিমোথি। "আর সম্ভবত আমি আপনাকে এমন কিছু দেখাতে পারবো যেটা আপনি খুঁজছিলেন—তবে না-ও পারতে পারি।"

ওকে সাথে নিলে ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না কোনো। টিমোথি খুবই আন্তরিক, তবে এখন খুবই চিন্তিত আর নার্ভাস হয়ে আছে।

"আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম আমার সঙ্গে আসতে, টিমোথি, তুমি না করায় মন খারাপ হয়েছিল খুব। অবশ্যই আমার সঙ্গে যেতে পারবে তুমি—ওখানকার জিনিসগুলো দেখে তোমার স্মৃতিতে কোনো আলোড়ন ওঠে কিনা সেটা দেখাটা জরুরি।"

"থ্যাংক ইউ, ডক্টর। কখন যাবেন কাল?"

ঘড়ির দিকে তাকালাম আমি।

"গুড লর্ড, চারটা বেজে গিয়েছে দেখি। আমরা ছয়টায় বের হবো।"

"তাহলে তাড়াতাড়ি বাসায় গিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে নেই।" টিমোথি আমার কেবিনেটের উপর নিজের গ্লাসটা রেখে আমার দিকে ঘুরলো। "তবে একটু ঝামেলা আছে, ডক্টর। আমার ঘোরার কাগজপত্রের মেয়াদ শেষ আর আমাদেরকে একটা আন্তর্জাতিক সীমানা পার হয়ে বতসোয়ানাতে যেতে হবে।"

"আয় হায়," বিড়বিড় করলাম আমি, খুবই হতাশ লাগল শুনে। "তাহলে ওগুলো রিনিউ করে নাও, পরেরবার আসলে আমার সাথে যেয়ো।"

"আপনি যা বলেন, ডক্টর," সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল ও। "অবশ্য দুই তিন সপ্তাহ তো লাগবেই—আর ততোদিনে আমার মাথা থেকে পুরো জিনিসটা মুছেও যেতে পারে।"

"হ্যাঁ," মাথা ঝাঁকালাম আমি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে মানতে পারছিলাম না। আমি সাধারণত আইন মেনে চলা মানুষ, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতেই বুঝলাম যে এতে কারো কোনো ক্ষতিই হবে না। টিমোথির সাহায্যে অ্যানসিয়েন্টদের কবর খুঁজে বের করার যে সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তার জন্য যে কোনো ঝুঁকি নেওয়া চলে।

"একটা সুযোগ নিয়ে দেখবে নাকি, টিমোথি?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। স্টারভেসান্টদের বিমান ওঠা-নামা করতে এখন আনুষ্ঠানিকতার বালাই নেই বললেই চলে। প্রতিদিনই ওঠা-নামা চলছে, ছাড়ার আগে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে শুধু একবার ফোন করলেই চলে। স্টারভেসান্ট নামটার ওজন এত বেশি যে আসা যাওয়ার সময় কখনোই গুণে দেখা হয় না যে কতজন এল বা গেল। মুন সিটিতে লোরেন বতসোয়ানা সরকারের সাথে বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছে, তাই আমরা...বলা চলে যে...আমলাতান্ত্রিকতার হাত থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

আমি তিনদিনের ভেতরে টিমোথিকে ওখান থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারবো। এতে কেউ কিচ্ছুটি টের পাবে না, আবার কারো ক্ষতি-বৃদ্ধিও হবে না। রজার ভ্যান ডিভেন্টারকে বললেই হবে যে লোরেন অনুমতি দিয়েছে, আমার কথা অবিশ্বাস করবে না ও। আমি কোনো সমস্যা দেখতে পেলাম না।

"ঠিক আছে ডক্টর, আপনি যা ভালো মনে করেন।" টিমোথি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

"ছয়টার আগেই স্টারভেসান্ট হ্যাঙ্গারে চলে এসো।" আমি বসে একটা চিরকুট লিখতে লাগলাম। "এয়ারপোর্টের গেটে কেউ কিছু বললে, যদিও বলবে বলে মনে হয় না, এটা দেখাবে। এতে লেখা আছে যে তুমি স্টারভেসান্ট হ্যাঙ্গারে কিছু জিনিস দিতে যাচ্ছো। ফ্লাইট অফিসের পেছনে গাড়ি রাখবে, তারপর অফিসের ভেতরে অপেক্ষা করবে আমার জন্য।"

খুব দ্রুত সব ব্যবস্থা করে নিলাম, তারপর আমার বেডরুমের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে যখন দেখলাম যে টিমোথির পুরনো নীল রঙা শেভি গাড়িটা ইনস্টিটিউটের কার পার্ক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন একই সাথে আনন্দ আর আশঙ্কা দুটোই অনুভব করতে লাগলাম। বসে বসে ভাবতে লাগলাম–অবৈধ মানব পাচারের শাস্তি কী হতে পারে, তারপর সব চিন্তা বাতিল করে দিয়ে উঠলাম কফি বানাতে।



রজার ভ্যান ডেভেন্টার আর আমি মার্সিডিসে করে হ্যাঙ্গারে পৌঁছতেই দেখি–টিমোথির শেভিটা একটা পার্কিং বে-তে পার্ক করা। হ্যাঙ্গারের ভেতরে ঢুকলাম আমরা। বিশাল স্লাইডিং দরজাগুলো খোলা, কর্মীরা ডকোটা বিমানটাকে উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত করছে। ফ্লাইট অফিসের কাঁচের দরজা দিয়ে দেখলাম–টিমোথি ডেস্কের পাশে কুঁজো হয়ে বসে আছে। টের পেয়ে মাথা তুলে হাসলো আমার দিকে।

"আমি ক্লিয়ারেন্স নিয়ে আসছি, রজার," সহজভাবে বললাম আমি। "আপনি গিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দিন নাহয়।"

"ওকে, ডক্টর।" আমাকে ফ্লাইট ডোসিয়েরটা ধরিয়ে দিল ও। এর আগেও এসব করেছি আমরা, আমিও তাই এই পদ্ধতিই কাজে লাগাতে চাইলাম। রজার সিঁড়ি বেয়ে ফিউজিলাজ-এর দরজা দিয়ে উঠে গেল, ঝটপট অফিসে ঢুকে পড়লাম আমিও।

"হ্যালো, টিমোথি।" ওর দিকে তাকাতেই কেমন ধক করে উঠলো বুকটা। নীল চাদরটা সারা শরীরে পেঁচিয়ে রেখেছে ও, কপাল আর নাকের

আশপাশে যন্ত্রণাদায়ক কাটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে চামড়া আর ঠোঁট অনেকটা বেগুনি নীল। "ঠিক আছো তো?"

"হাতে ব্যথা আছে একটু, ডক্টর।" বলে নিজের জ্যাকেটের সামনের দিকটা খুলল ও। একটা ফিতে দিয়ে বেঁধে রেখেছে হাতটা, একটু আগে ব্যান্ডেজ করেছে। "তবে ঠিক হয়ে যাবে। দেখিয়ে নিয়েছি।"

"এতোদূর যেতে পারবে?"

"কোনো সমস্যা হবে না, ডক্টর।"

"আসলেই?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"ঠিক আছে, তাহলে।" আমি ডেস্কের পাশে বসে ফোনটা তুলে নিলাম। একবার রিং হওয়ার পরেই ওপাশ থেকে তুললো কেউ।

"এয়ারপোর্ট পুলিশ!"

"ডক্টর কাজিন বলছি–স্টারভেসান্ট, আফ্রিকা থেকে।"

"ওহ, গুড মর্নিং, ডক্টর। কেমন আছেন?"

"ভালো, থ্যাংক ইউ। বতসোয়ানার ফ্লাইট ZA-CEE-র জন্য ক্লিয়ারেন্স চাচ্ছি।"

"একটু ধরেন, ডক্টর। আমি একটু পার্টিকুলার্সগুলো চেক করে নেই। কে কে যাচ্ছেন?"

"একজন যাত্রী, আমি–আর পাইলট যথারীতি রজার ভ্যান ডেভেন্টার।"

আমি বলতে লাগলাম আর অপর প্রান্তের কনস্টেবল দ্রুত হাতে শর্টহ্যান্ডে লিখে নিতে লাগল সব। অবশেষে বলল সে: "ঠিক আছে, ডক্টর। হ্যাভ এ গুড ফ্লাইট। আমি কন্ট্রোলকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিচ্ছি।"

আমি ফোন রেখে টিমোথির দিকে চেয়ে হাসলাম।

"অল ক্লিয়ার।" বলে উঠে দাঁড়ালাম আমি। "চলো।" অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ডকোটার ইঞ্জিনগুলো মৃদু ঘুরতে শুরু করেছে। যে তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ কর্মী কাজ করছিল ওরা আচমকাই ল্যান্ডিং গিয়ারের পাশ থেকে নিজেদের জায়গা ছেড়ে আমার দিকে প্রায় দৌড়ে এগিয়ে এল।

"ডক্টর!" পেছন থেকে টিমোথি ডাক দিতেই সেদিকে ঘুরে গেলম আমি। ওর ভালো হাতটায় যে একটা ছোট নলের চাইনিজ মেশিন-পিস্তল ধরে আছে, সেটা বুঝতে আমার কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল। নলটা সোজা আমার পেটের দিকে তাক করা। আমি *হাঁ* করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

"আমি স্যরি, ডক্টর," নরম সুরে বলল ও, "কিন্তু এটা না করলেই না।"

কর্মীগুলো দুই দিক থেকে কাছিয়ে এসে খপ করে আমার হাত চেপে ধরলো।

"আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন, ডক্টর, আপনি যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে আপনাকে খুন করতে হাত কাঁপবে না।" আমার উপর থেকে

নজর না সরিয়েই গলার স্বর চড়িয়ে দিয়ে *আসো* বলে ভেন্ডা ভাষায় কাউকে ডাকলো ও।

হ্যাঙ্গারের বাইরের দরজা দিয়ে আরও পাঁচজন এসে ঢুকলো। আমি সাথে সাথে দুজনকে চিনতে পারলাম। এরা ইনস্টিটিউটের শিক্ষানবিস, কম বয়স্ক, একটা মেয়েকেও চিনলাম। প্রত্যেকের হাতেই ওই হোঁতকা, ভয়াল-দর্শন মেশিন-পিস্তল। একজন প্রচণ্ড মার খাওয়া, অপরিচিত লোককে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে ওরা। তার পা দুর্বলভাবে ঝুলছে, বুক আর গলায় রক্তমাখা ব্যান্ডেজ।

"বিমানে ওঠাও ওকে," শীতল গলায় আদেশ করল টিমোথি।

পুরোটা সময় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, এতটাই যেনড়া-চড়ার শক্তিটাও ছিল না, ততোক্ষণে লোকটাসহ দলটা আমাকে আটকে রাখা মানুষগুলো এবং পাশের দেওয়ালের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে সামনে। যাওয়ার সময় চেপে আসার কারণে ওদের প্রত্যেকের গুলির নল নিজেদের দিকে ঘুরে গেল, পুরো দলটাকে বেখেয়াল মনে হলো; ঠিক তখন আমি আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে পেলাম আবার। দুই পা শক্ত করে সামনের দিকে সামান্য হেলে পড়ে হ্যাঁচকা টান দিলাম। আমার হাত ধরে থাকা লোক দুজন ছুঁড়ে দেওয়া ডার্টের মত করে ছিটকে গেল সামনে। দুজনেরই মাথা গিয়ে লাগল টিমোথির গায়ে, ওরা তিনজন একসাথে গাদা হয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করতে লাগল।

"রজার!" চিৎকার করলাম আমি। "রেডিয়ো! কাউকে আসতে বলেন!" আশা করছিলাম যে বিমানের ইঞ্জিনের ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে আমার গলা রজারের কান পর্যন্ত পৌঁছাবে। তিন নম্বর কর্মীটা আমার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, এক বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলো আমার গলা। আমি হাত বাড়িয়ে লোকটার কব্জি আর কনুই চেপে ধরে হাতের বাঁধন আলগা করার জন্য কনুই সন্ধি বরাবর টানতে লাগলাম। বোতলের ছিপি খোলার আওয়াজের মত করে কনুই বাঁকা হয়ে গেল লোকটার, মেয়ে মানুষের মত করে চিৎকার দিয়ে উঠলো সে; ওর হাত লগব্যাগ করে আমার মুঠোয় ঝুলছে!

"গুলি কোরো না," চিৎকার করল টিমোথি। "শব্দ করা যাবে না কোনো।"

"বাঁচাও!" এবার আমি চেঁচালাম, কিন্তু ইঞ্জিনের আওয়াজ ডুবিয়ে দিল আমার চিৎকার। ওরা আহত লোকটাকে ফেলে দিয়ে ছুটে এল আমার দিকে। আমি মাথা নিচু করে ছুটে গেলাম সামনে। প্রথম লোকটার কুঁচকি বরাবর চালালাম লাথি। আমার বুট ওর মাংসের ভেতরে ঢুকে গেল—টের পেলাম, নরম আর তুলতুলে অনুভূতি পেলাম বুট আর মোজা ভেদ করে। লোকটার শরীর দুই ভাঁজ হয়ে গেল, আমি এবার হাঁটু তুলে আনলাম ওর চেহারা বরাবর। *মড়াৎ* করে নাকের হাড় ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল।

টিমোথি আর লোক দুজন টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে ততোক্ষণে।

"গুলি করবে না কেউ।" মরিয়া গলায় বলল টিমোথি। "কোনো শব্দ যেন না হয়।" ওর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। রাগে লেপার্ডের মতই উন্মত্ত হয়ে আছি, এই বেঈমানির জন্য আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে ঘেন্না করছি ওকে, নিজ হাতে ওর হাড্ডি ভেঙে রক্ত গায়ে না মাখলে শান্তি পাবো না।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, মেয়েদের একজন মেশিন-পিস্তলের স্টিলের বাঁট দিয়ে বাড়ি দিল আমাকে। টের পেলাম–ওটার ধারালো প্রান্ত মাথের চামড়া কেটে বসে গেল, ভারসাম্যহীন হয়ে গেলাম আঘাতে। কর্মীদের একজনের সাথে ঢুস লাগল আমার, আমি ওকে আমার বুকের সাথে চেপে ধরলাম। চিৎকার করে উঠলো সে, বুঝতে পারলাম যে ওর বুকের খাঁচাটা আমার আঁটুনিতে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

আমাকে আবার আঘাত করল ওরা, খুলির হাড্ডিতে কেটে বসতে লাগল স্টিল। চেহারা বেয়ে উষ্ণ রক্তের স্রোত নেমে এসে অন্ধ করে দিল আমাকে। হাতের বাঁধন আলগা হয়ে গেল, যে লোকটাকে চেপে রেখেছিলাম তাকে ফেলে দিয়ে অন্যদের দিকে ঘুরলাম আক্রমণ করার জন্য। নিজের রক্তে নিজেই অন্ধ হয়ে গেছি, সেই সাথে উন্মাদের মত চিৎকার করতে থাকায় কানে তালা লাগার উপক্রম হলো; এর মাঝেই আবার ওরা আঘাত করল আমাকে, ঘিরে ধরলো চারপাশ থেকে, আমি কানামাছি খেলার মত করে এদিক-সেদিক ঝাঁপ দিয়ে ওদেরকে ধরার নিস্ফল চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার মাথা আর কাঁধে মুহুর্মুহু আঘাত করা হতে লাগল। হাঁটুতে আর শক্তি পেলাম না, পড়ে গেলাম মাটিতে। জ্ঞান হারাইনি তখনও, প্রচণ্ড ক্রোধই মূলত জাগিয়ে রাখছিল। এরপর শুরু হলো বুট দিয়ে মাড়ানো, বুক আর পেটে পড়তে লাগল লাথি। শরীর ভাঁজ হয়ে গেল আমার, বুট জুতার লাথি বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে করতে অন্ধকার, শীতল, তেল চিটচিটে হ্যাঙ্গারের মেঝেতে পড়ে রইলাম গোল হয়ে।

"হয়েছে, বন্ধ করো।" টিমোথির গলা শোনা গেল। "বিমানে ওঠাও ওনাকে।"

"আমার হাত। মেরেই ফেলবো আমি ওকে।" যন্ত্রণায় শুকরের মত চিঁ চিঁ করতে করতে বলল একটা কণ্ঠ।

"খামোশ।" আবারও টিমোথির গলা, সেই সাথে শোনা গেল কারো গালে চটাস করে চড় মারার শব্দ। "বন্দী লাগবে আমাদের। বিমানে ওঠাও ওনাকে।"

ওরা আমাকে মেঝের উপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল, অনেকগুলো হাত অনুভব করতে পারলাম শরীরে। একটু পরে আমাকে তুলে বিমানের ধাতব মেঝেতে আছাড় মেরে ফেলে দেওয়া হলো। দড়াম করে লাগিয়ে দেওয়া হলো দরজা, ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে এল তাতে কিছুটা।

"পাইলটকে বিমান ছাড়তে বলো," আদেশ দিল টিমোথি। "ডক্টরকে রেডিয়োর কামরায় নিয়ে যাও।"

আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে সিটের সারির ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল। চোখের পলক ফেলে ফেলে রক্ত কিছুটা পরিষ্কার করতে পারায় দেখতে পেলাম বিমানের শ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার আর কৃষ্ণাঙ্গ কর্মীদেরকে বেঁধে মুখে কাপড় ঢুকিয়ে ফিউজিলাজের দেওয়ালের সাথে আটকে রাখা হয়েছে।

শক্ত কয়েকটা হাত আমাকে ধরে রেডিয়োর কামরার স্টিলের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে এত শক্ত করে বেঁধে ফেলল যে মাংস কেটে বসে যাওয়ার জোগাড় হলো। চেহারা ফুলে ঢোল, কোনো শারীরিক অনুভূতি আর আছে বলে মনে হলো না। নিজের রক্তের স্বাদ মুখটাকে নোনতা আর ধাতব করে রেখেছে।

মাথা ঘুরিয়ে আমি ককপিটের দিকে তাকালাম। রজার ভ্যান ডেভেন্টার বসে আছে কন্ট্রোল-এ। চোখের ঠিক নিচে লাল টকটকে হয়ে ফুলে আছে তার, ধূসর চুলগুলো এলোমেলো, চেহারা আতংকে ফ্যাকাসে। এদের একজন দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে, মেশিন-পিস্তলের নল সোজা চেপে ধরে রেখেছে ওর ঘাড় বরাবর।

"বিমান ছাড়ুন," নির্দেশ দিল টিমোথি। "নিয়মিত যা যা করেন, সব করবেন। বুঝেছেন কথাটা?"

রজার কাঁপতে কাঁপতে মাথা ঝাঁকালো। বেচারার জন্য খুব খারাপ লাগল আমার, আন্দাজ করলাম ও আসলে সাহসীদের ছাঁচে গড়া না।

"স্যরি ডক্টর," ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল রজার। "আমি বিমানে পা দেওয়ামাত্র ওরা চড়াও হয় আমার উপর।" ওর পূর্ণ মনোযোগ এখন বিশাল বিমানটাকে এখনও অন্ধকারে ছেয়ে থাকা এয়ারফিল্ডটায় নিয়ে যাওয়ার দিকে। আমার দিকে তাকালো না একবারও। "কিছুই করার ছিল না।"

"সমস্যা নেই, রজার। আমিও খুব ভালো কিছু করতে পারিনি," মনমরা গলায় বললাম আমি। "দুই-চারটা চড়-থাপ্পড় দিতে পেরেছি শুধু।"

"বকবক যথেষ্ট হয়েছে এখনকার মত, প্লিজ, ডক্টর। মিস্টার ভ্যান ডেভেন্টারকে এখন বিমান উড্ডয়নের জন্য বিরক্ত না করলেই ভালো হয়," টিমোথি ধমক দিল আমাকে, আমিও ওর দিকে ফিরে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার অবশ শরীরে যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু দিয়ে ওর দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম।

চাইতেই কন্ট্রোল ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিল রজারকে, কোনো ধরনের ঝক্কি ঝামেলা ছাড়াই যথারীতি উড্ডয়ন হলো বিমান। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন কালো চেহারাগুলো শান্ত হলো এবার, কারো কারো নার্ভাস হাসির আওয়াজও পাওয়া যেতে লাগল।

"সোজা বতসোয়ানার কোর্স ধরে যাবেন আপনি," টিমোথি নির্দেশ দিল রজারকে। "একবার সীমানা পার হলে, এরপর কোন কোর্স ধরবেন সেটা বলে দেব।"

রজার মূর্তির মত মাথা ঝাঁকালো, মেশিন-পিস্তল সরানো হলো না মাথা থেকে। দলটার শক্তিমত্তা বিচার করার চেষ্টা করলাম আমি। এদের এসব করার পেছনের কারণটা সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছি এরিমধ্যে। টিমোথি আর আমাকে আক্রমণ করা আটজন বাদে-ও আরও পাঁচজন আছে। এরাই হচ্ছে রজার আর অন্য কর্মীদেরকে ধরে বেঁধে রেখেছে। আহত লোকটা আর যে দুজনকে আমি পিটিয়েছি তাদেরকে শুইয়ে রাখা হয়েছে মালপত্র রাখার জায়গাটায়। মেয়ে দুজন শুশ্রূষা করছে ওদের, দুজনেই কাজ করে ইনস্টিটিউটে। রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ পাল্টে, নতুন করে ব্যান্ডেজ আর স্প্লিন্ট বেঁধে দিচ্ছে।

আমার সামনেই, টিমোথির লোকজন সাধারণ পোশাক পাল্টে প্যারাট্রুপারদের ক্যামোফ্লেজ পোশাক পরে নিল। কাঁধে লাল রঙের তারকা লাগানো দেখতে পেলাম, আমার শেষ সন্দেহটাও মিলিয়ে গেল তাতে। ওদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই দেখলাম টিমোথি তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

"ঠিক ধরেছেন, ডক্টর।" মাথা ঝাঁকালো ও। "স্বাধীনতার সৈনিক।"

"অথবা শয়তানের দাস, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে তুমি দেখছো তার উপর নির্ভর করে ব্যাপারটা।"

টিমোথি আমার কদুত্তরে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল। "আমি আপনাকে সবসময়ই মানবিক একজন মানুষ হিসেবে ভেবেছিলাম, ডক্টর। ভেবেছিলাম আর কেউ না হোক, অন্তত আপনি আমাদের আকাঙ্ক্ষাটা বুঝতে পেরে সহানুভূতিশীল হবেন।"

"হাতে বন্দুক নিয়ে ঘোরাঘুরি করা সন্ত্রাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াটা আসলে আমার জন্য বেশ কষ্টের।"

কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমরা। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে আমার চেয়ারের পাশের রেডিয়ো সরঞ্জামের দিকে এগিয়ে এল ও। সেটটা চালু করে ঘড়ি দেখলো একবার, তারপর বিভিন্ন ব্যান্ড নড়া-চড়া শুরু করল। বেশ স্পষ্টভাবেই ধরে গেল একটা স্টেশন, সাথে সাথে থমকে গেল বিমানের ভেতরে সমস্ত নড়া-চড়া। সবার মনোযোগ ঘোষকের কণ্ঠের দিকে:

"সাউথ আফ্রিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে বলছি। এখন সময় সকাল সাতটা। স্বাগত জানাচ্ছি সকালের সংবাদে। সাউথ আফ্রিকান পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন মুখপাত্র আমাদেরকে জানিয়েছেন যে গত রাত দুইটা

পনেরোর দিকে সিকিউরিটি পুলিশের এক বিশেষ দল, গোপন সূত্রে পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে, জোহানেসবার্গের শহরতলী র‍্যান্ডবার্গের বাইরের দিকের এক বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশ আর অটোম্যাটিক রাইফেলধারী একদল অজ্ঞাত পরিচয় লোকের মাঝে ব্যাপক সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়েছে। চারটা মোটর কার-এ করে অস্ত্রধারী দলটা পালানোর চেষ্টা করে, পুলিশের ধাওয়া এড়িয়ে দুটো গাড়ি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে যে দলটার আটজন সদস্য গোলাগুলিতে নিহত হয়েছে, আহত অবস্থায় আটক করা হয়েছে আরও চারজনকে। ধারণা করা হচ্ছে, যারা পালিয়ে গিয়েছে তাদের মাঝেও আহত ছিল অনেকেই। বাকিদেরকে ধরার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ অভিযান পরিচালনা হচ্ছে, বিমানবন্দরসহ উইটওয়াটারস্রান্ড থেকে বের হওয়া প্রতিটা রাস্তায় নজর রাখা হচ্ছে। অতীব দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, সংঘর্ষে সাউথ আফ্রিকান পুলিশ ফোর্সের তিনজন সদস্যও নিহত হয়েছেন, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন-”

বিমানের ভেতরে গা শিউরানো উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল, এক দুইজনকে দেখা গেল হাত মুঠি করে মাথার উপর তুলে কমিউনিস্টদের মত করে স্যালুট দিচ্ছে।

“কংগ্রাচুলেশন,” টিমোথির দিকে ব্যঙ্গ করে বললাম আমি, ও আমার দিকে ফিরে তাকালো।

“মৃত্যু কুৎসিত জিনিস, কিন্তু দাসত্ব আরও জঘন্য,” নিরুত্তাপ গলায় বলল ও। “ডক্টর, আমাদের মাঝে একটা বন্ধন আছে।”

“আমার মাথা দপদপ করছে, মুখের ভেতরেও এত ব্যথা যে তোমার এসব কমিউনিস্ট বাকোয়াজ শোনার কোনো ইচ্ছে হচ্ছে না,” ওকে বললাম আমি। “এসব আবেগী কথা একদম বলবে না, হারামি কোথাকার। আমার দেশকে আগুনে পুড়িয়ে রক্তে ভেজাতে চাও তুমি। আমার কাছে প্রিয় আর পবিত্র সবকিছুকে তুমি টুকরো টুকরো করে দিতে চাও। এটা আমার দেশ, যত সমস্যাই থাকুক না কেন, একে আমি ভালবাসি। তুমি আমার শত্রু। আমাদের মাঝে কোনো বন্ধন নেই-শুধু অস্ত্রই কথা বলবে।”

আবারও আমরা দীর্ঘ সময় পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর মাথা ঝাঁকালো ও। “অস্ত্রেই কথা হবে তাহলে,” সায় দিয়ে ঘুরে চলে গেল ও। ডকোটাটা স্থিরভাবে উড়ে চলেছে উত্তর দিকে, এতক্ষণে কাটা জায়গাগুলোয় ব্যথা শুরু হলো আমার। চোখটা বন্ধ করে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করতে লাগলাম, ব্যথাটা মনে হচ্ছিল থেকে থেকে তলপেটের নিচ থেকে শুরু হয়ে সারা শরীর বেয়ে মাথায় উঠে বিস্ফোরিত হচ্ছে।



মিরেজ জেট বিমানটা পূর্ব দিক থেকে উদয় হয়ে আমাদের বিমানের নাক বরাবর রূপালি ঝলক মারতে লাগল, প্রচণ্ড গতিতে আমাদেরকে পাশ কাটানোর সময় আমি খেয়াল করলাম–বিমানের গায়ে এয়ার ফোর্সের প্রতীক আঁকা আর গগল পরা পাইলট সোজা তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। পর মুহূর্তেই গায়েব হয়ে গেল ওটা, কিন্তু সাথে সাথেই ট্যানয়টা[৩৯] খড়খড় করে জ্যান্ত হয়ে উঠলো।

"জেড এ সি ই ই। এয়ার ফোর্স রেড স্ট্রাইকার টু বলছি। শুনতে পাচ্ছো?" আমি আমার মাথার পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম, দেখি মিরেজ আমাদের মাথার উপর দিয়ে বাঁক নিচ্ছে, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে ওটার গা। টিমোথি প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে এসে আমার পাশে বসে রেডিয়োটার দিকে তাকিয়ে রইলো একটা মুহূর্ত। পরিবেশ টানটান আর চুপচাপ হয়ে আছে। টিমোথি কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না, ওর বান্টু উচ্চারণভঙ্গী খুব বেশি প্রকট, লুকাতে পারে না ও।

আবারও গর্জন করতে করতে আমাদের বিমানের সামনে চলে এল জেটটা। রজারের মাথায় পিস্তল ধরে রাখা লোকটা ওর সিটের পেছনে মাথা নিচু করে বসল যাতে দেখা না যায়।

"জেড এ সি ই ই।" আবারও ডাকা হলো আমাদেরকে। টিমোথির চেহারায় চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে, হাতের আঘাতের যন্ত্রণায় আর মানসিক চাপের কারণে নীলচে-ধূসর লাগছে ওর মুখটা। ও রেডিয়ো থেকে ঘুরে ওর দুজন লোককে ইশারা করল।

"ওনাকে নিয়ে এসো," শ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল ও। ওরা টানতে টানতে ওনাকে নিয়ে এসে আমার সামনে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলো। লোকটার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে আছে, সেখানে চকচক করছে ঘাম। তার আতংকিত চোখজোড়া আমার চোখের দিকে করুণ আবেদনে তাকিয়ে রইলো, মুখের বাঁধনটা কেটে বসেছে চামড়ায়। একজন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে মাথাটা হেলিয়ে ধরলো পেছনে, লোকটার গলা উন্মুক্ত হয়ে ফ্যাকাসে চামড়ার নিচে শিরা দেখা যেতে লাগল তাতে, নীলচে দেখাচ্ছে, ধকধক করছে। পেছনের লোকটা সামনে এগিয়ে এসে একটা ট্রেঞ্চ নাইফের ঝকঝকে ফলা চেপে ধরলো ইঞ্জিনিয়ারের গলায়।

---

[৩৯]রেডিয়ো প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম

"আমি কিন্তু সিরিয়াস, ডক্টর," আমার হাতের বাঁধন আলগা করতে করতে বলল টিমোথি। তারপর রেডিয়ো ট্রান্সমিটারের মাইক্রোফোনটা ধরিয়ে দিল আমার হাতে। "ওদেরকে আশ্বাস দিন। বলেন যে বিমানে মাত্র দুজন আছেন, আপনারা যথারীতি একটা রুটিন ফ্লাইটে করে মুন সিটিতে যাচ্ছেন।" ও সেটটার ট্রান্সমিট সুইচে আঙুল রাখলো। আমি বেতাল কিছু বলছি দেখলেই চাপ দিয়ে বন্ধ করে দেবে।

আতংকিত ইঞ্জিনিয়ার মুখ বাঁধা অবস্থাতেই গোঙাতে লাগল, ওর কাঁপতে থাকা গলার নরম চামড়ায় আরও চেপে বসল ছুরি। লোকটাকে আরও সামনে ঠেলে দিল ওরা, যাতে ওর চেহারা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

"এয়ার ফোর্স স্ট্রাইকার টু, জেড এ সি ই ই বলছি।" মাইকে আমার গলা শোনা গেল, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ইঞ্জিনিয়ারের আতংকিত চেহারার দিকে।

"আপনার অবস্থা আর গন্তব্য জানান।"

"স্টারভেসান্ট, আফ্রিকার ডক্টর কাজিন বলছি। রুটিন ফ্লাইটে–" এইটুকু বলামাত্রই খেয়াল করলাম বাকিদের উত্তেজনায় ঢিল পড়েছে, টানটান ভাবটা শিথিল যাওয়ায় রেডিয়ো সেটের ট্রান্সমিট সুইচ থেকে সরে গেল টিমোথির আঙুল। ইঞ্জিনিয়ারের চোখ আমার চোখের দিকেই তাকিয়ে ছিল আর আমি ওকে চোখে চোখেই বলতে চাইলাম যে আমি দুঃখিত, সম্ভব হলে আমি ওকে বাঁচানোর সব চেষ্টাই করতাম। আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম যে আমি ওর জীবনের সাথে আমার দেশের চোদ্দজন ভয়ানক সন্ত্রাসীর জীবন বিনিময় করছি, ওর আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না, আমি নিজেও স্বেচ্ছায় এই কাজে নিজের জীবন দিয়ে দিচ্ছি। তারপর হ্যান্ডসেট-এ চিৎকার করে উঠলাম:

"সন্ত্রাসীরা আমাদেরকে হাইজ্যাক করেছে! আমাদের দিকে গুলি করেন! আমাদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবতে হবে না।" টিমোথির হাত ট্রান্সমিট সুইচের দিকে ধেয়ে এল, একই সাথে ও বন্দীর দিকে ফিরলো। আমার ধারণা ও আসলে লোকটাকে খুন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতেই চেয়েছিল। কিন্তু দেরি করে ফেলল ও।

ইঞ্জিনিয়ারের টানটান হয়ে থাকা গলা বরাবর সড়াত করে চলে গেল ছুরিটা, চোয়ালের শেষ প্রান্ত বরাবর গভীর একটা ক্ষত করে দিল সেটা। বাগানে পানি দেওয়ার ছিড়ে যাওয়া পাইপের মত করে রক্ত ছিটকে বের হতে লাগল, লাল রঙা একটা ঝর্ণার মত পিচকারি মেরে বের হয়ে এসে আমাকে আর টিমোথিকে ভিজিয়ে দিল। এত প্রবল বেগে রক্ত ছিটকে বের হচ্ছিল যে বিমানের ছাদে পর্যন্ত পৌঁছে গেল তা, তারপর মোটা মোটা ধারা সৃষ্টি করে বেয়ে নামতে লাগল মেঝেতে। ইঞ্জিনিয়ার কিছু একটা বলার চেষ্টা করল যেন, কেটলি থেকে বাষ্প বের হওয়ার মত করে শোনা গেল শব্দটা। কাটা

জায়গাটা দিয়ে ওর ফুসফুস থেকে গোলাপি ফেনার মত করে বাতাস বেরিয়ে এসে রেডিয়ো সেটটার উপর ছিটকে পড়তে লাগল।

ট্যানয়টা খড়খড় করতে লাগল। "বিমান ঘুরিয়ে নিন! আদেশ অনুসরণ করুণ! এই মুহূর্তে আদেশ অনুসরণ করুণ, নইলে গুলি চালাবো।"

টিমোথি গালাগালি করতে করতে আমার হাত থেকে মাইক্রোফোনটা কেড়ে নিল। আমি বাঁধা অবস্থাতেই ওটা ধরে রাখার জন্য ধ্বস্তাধস্তি আর চিৎকার করতে লাগলাম।

"জানোয়ারের দল! শয়তান খুনি জানোয়ারের দল।"

দলের একজন মেশিন-পিস্তল তুললো আমার মুখে মারার জন্য, কিন্তু টিমোথি ওর হাত সরিয়ে দিল।

"এটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও!" ও মাথা ঝাঁকিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের লাশটা দেখালো। দেহটা এখনও মোচড়াচ্ছে আর কাঁপছে–ওরা আবার সেটাকে টানতে টানতে মাল রাখার জায়গায় নিয়ে গেল।

"মিরেজ থেকে গুলি করছে!" ককপিট থেকে চিৎকার করে বলল রজার। আর আমরা সবাই দেখলাম সোজা সামনে থেকে আসছে আক্রমণ। একটা রূপালি ঝলক দেখা গেল, আমাদের বিমানকে বাঁধা দিতে সোজা নাক বরাবর নেমে এল জেটটা।

টিমোথি ঝট করে ওর মুখের কাছে মাইক্রোফোন তুললো, ওর চেহারা ভরা ইঞ্জিনিয়ারের রক্তের দাগ। "গুলি করবেন না!" চিৎকার করল ও। "আমাদের হাতে বন্দী আছে।"

"আক্রমণ করুণ!" গলা ফাটিয়ে চেঁচালাম আমি। বাঁধন ছেড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। "ওরা আমাদেরকে মেরেই ফেলবে! গুলি করুন!"

মিরেজ জেটটা আমাদের সামনে থেকে সোজা উপরে উঠে গেল, তারপর কোনো গুলি না করেই উড়তে লাগল আমাদের মাথার কয়েক ফুট উপর দিয়ে। ওটার ইঞ্জিনের ধাক্কায় প্রচণ্ডরকম ঝাঁকাতে লাগল ডকোটাটা। আমি তখনও নিজেকে ছাড়ানোর জন্য চিৎকার আর টানাটানি করেই যাচ্ছি। এদেরকে একটা শিক্ষা দিতে প্রচণ্ড জেদ লাগছিল ভেতরে। স্টিলের চেয়ারটা এদিক-ওদিক দুলতে শুরু করেছে। আমি ফিউজিলাজের একপাশে পা বাঁধিয়ে, সর্বশক্তি দিয়ে দিলাম ধাক্কা। সিটটা পেছনে হেলে গেল সামান্য, আবার সেই লোকটা মেশিন-পিস্তল তুললো।

"থামো," চেঁচালো টিমোথি। "ওনাকে জ্যান্ত লাগবে আমাদের। ম্যারিকে বলো মরফিন নিয়ে আসতে।"

মিরেজটা সরে গেল উপর থেকে, তারপর একটা বাঁক নিয়ে আমাদের ডান দিকের পাখা থেকে একশো ফুট দূরে এসে স্থির হলো। ওটার পাইলটের অসহায় মুখটা দেখতে পেলাম জানালা দিয়ে।

"আপনি ডক্টর কাজিনের সাথে তো কথা বলেছেন-ই," টিমোথি জেট-এর পাইলটকে সতর্ক করল। "আরও চারজন বন্দী আছে আমাদের কাছে। এর মধ্যেই একজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে খুন করেছি আমরা এবং যদি আপনি আর কোনো ধরনের শত্রুতামূলক আচরণ করেন তাহলে আরও কাউকে খুন করতেও দ্বিধা করবো না।"

"ওরা আমাদেরকে মারবেই," চিৎকার করলাম আমি, কিন্তু টিমোথি লাইন কেটে দিল।

ইনজেকশন দেওয়ার সময় প্রায় পাঁচজনকে লাগল আমাকে চেপে ধরে রাখতে। আর শত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষমেশ ওরা আমার হাতে সিরিঞ্জ ঢুকিয়েই দিল। তবুও যুদ্ধ চালিয়ে গেলাম আমি, কিন্তু আমার নড়া-চড়া খুবই দুর্বল আর এলোমেলো হয়ে এল আর ধীরে ধীরে অচেতন হয়ে পড়লাম। তার আগে আমার সর্বশেষ স্মৃতি ছিল: টিমোথির রজারকে একটা নতুন রাস্তা বলে দেয়া।

ব্যথা আর পিপাসা জাগিয়ে দিল আমাকে। মুখের ভেতরটা মনে হচ্ছিল বালি দিয়ে ভরা, মাথার ভেতরে যেন কেউ হাতুড়ি দিয়ে পিটছে। আমি উঠে বসার চেষ্টা করতেই ব্যথায় কেঁদে উঠলাম।

"কী অবস্থা, ডক্টর? আস্তে আস্তে।" রজার ভ্যান ডেভেন্টারের গলা, আমি চোখ খুলে তাকালাম ওর দিকে।

"পানি?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"স্যরি, ডক।" মাথা নাড়লো ও। আমি ধবধবে সাদা ঘরটার চারপাশে তাকালাম। চারটা কাঠের বাংক আর একটা টয়লেট করার বালতি বাদে কিছুই নেই ভেতরে। দরজাটায় গরাদ বসানো। ঘরের অপর পাশের একটা বাংক-এ তিনজন বান্টু কর্মচারী বসে আছে। চেহারায় নিরুদ্দেশ আর মনমরা ভাব।

"কোথায় আমরা?" ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"জাম্বিয়া। কোনো একটা মিলিটারি ক্যাম্প-এ। ঘণ্টাখানেক আগে এসে নেমেছি এখানে।"

"এয়ার ফোর্সের জেটটার কী হলো?"

"জাম্বেজি পার হওয়ার পরে ফিরে গিয়েছে। কিছুই করার ছিল না আসলে।"

আর আমাদেরও কিছুই করার ছিল না ওখানে। পাঁচদিন ধরে আলো-বাতাসহীন এই চুলার মত বন্ধ ঘরে দুর্গন্ধযুক্ত বালতিটা সাথে নিয়ে ঠায় বসে রইলাম। পঞ্চম দিনের দিন একজন গার্ড এসে নিয়ে গেল আমাকে। প্রচণ্ড চেঁচামেচি আর একদমই অপ্রয়োজনীয় ধাক্কা আর ঠেলা দিতে দিতে একটা করিডোর ধরে একটা অফিসে নিয়ে আসা হলো আমাকে। ভেতরে আসবাব নেই বললেই চলে, দেওয়ালে শুধু চেয়ারম্যান মাও-এর বিশাল একটা

প্রতিকৃতি ঝোলানো। টিমোথি মাগেবা ডেস্কের পেছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গার্ডদেরকে ইশারা করল বেরিয়ে যেতে।

"ডক্টর বসুন, প্লিজ।" প্যারাট্রুপারের ক্যামোফ্লেজ পরনে ওর, চাইনিজ পিপল'স আর্মির একজন কর্নেলের পদবিসুচক দণ্ড আর তারকা লাগানো তাতে।

কাঠের বেঞ্চিটায় বসলাম আমি, সামনেই একটা ট্রেতে রাখা প্রায় আধা ডজন টুস্কার বিয়ারের বোতলের উপর সেঁটে রইলো দৃষ্টি। ঠান্ডার কারণে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে বোতলগুলোর গায়ে, নিজের অজান্তেই ঢোক গেলা শুরু করলাম আমি।

" ঠান্ডা বিয়ার আপনার কতটা পছন্দ সেটা জানা আছে আমার, ডক্টর।" একটা বোতল খুলতে খুলতে বলল টিমোথি। আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা কিন্তু মাথা নাড়লাম আমি।

"ধন্যবাদ। খুনিদের সাথে ড্রিঙ্ক করি না আমি।"

"আচ্ছা।" মাথা ঝাঁকালো টিমোথি, আমার মনে হলো ওর কালো গভীর চোখজোড়ায় অনুতাপ দেখতে পেলাম যেন। বোতলটা নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়ে এক চুমুকেই অনেকটা সাবাড় দিল ও। পিপাসার্ত অবস্থায় সেদিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

"ইঞ্জিনিয়ারের ব্যাপারটা," বলল ও। "ইচ্ছাকৃত ছিল না। আমি চাইনি এমনটা ঘটুক। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করবেন, ডক্টর।"

"হ্যাঁ, বুঝেছি। আর যখন আমার দেশের জ্বলন্ত মাটির ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে যাবে, মানুষের লাশের দুর্গন্ধে এমনকি তোমার ওই শয়তান আত্মাদেরও গা গুলিয়ে উঠবে, তখনও কি তুমি কেঁদে কেঁদে বলবে, *আমি চাইনি এমনটা ঘটুক?*"

টিমোথি ঘুরে ঘরের জানালাটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। ওখান দিয়ে একটা প্যারেড গ্রাউন্ড দেখা যায়। এই কড়া রোদের ভেতরেও একদল ইউনিফর্ম পরা বান্টু অনুশীলন করছে।

"আপনাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছি আমি, ডক্টর। ডকোটাটাতে করে ফিরে যেতে পারবেন আপনি।" আবার আমার সামনে ফিরে এসে বলল ও, তারপর ইংরেজি ছেড়ে ভেন্ডা ভাষায় বলল, "আপনাকে যেতে দিতে হবে দেখে আমার হৃদয় ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে, ম্যাকেইন। আপনি একজন নিপাট ভদ্রলোক, শক্তিশালী আর সাহসী। আমি খুব করে আশা করতাম যে আপনি আমাদের দলে যোগ দেবেন।"

ভেন্ডাতেই উত্তর দিলাম আমি, "আমার হৃদয়ও কাঁদছে, যাকে আমি একসময় বন্ধু ভাবতাম, চোখ বুঁজে ভরসা করতাম, ভাবতাম কোনো খারাপ কাজ করা যার পক্ষে সম্ভব না, সে কিনা এখন সন্ত্রাসী আর বিনাশকারীদের জগতের বাসিন্দা। আমার কাছে আজ সে মৃত, আমার বুকটাও হু হু করছে।"

বলতে বলতে টের পেলাম, কথাটা আসলেই সত্যি। শুধু ওকে লজ্জা দেওয়ার জন্য কথাটা বলিনি আমি। রাগ আর ঘৃণার অন্তরালে, একটা দুঃখবোধ, একটা হারানোর বেদনাও পুড়িয়ে দিচ্ছিল আমাকে। আমি ওকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতাম। ওর মত একজন মানুষের মাঝেই আমি দেখেছিলাম আমাদের এই গরীব নিপীড়িত মহাদেশটার মানুষগুলোর জন্য আশার আলো। মাত্র চার ফুট দূরত্ব থেকে আমরা দুজন দুজনের দিকে সতৃষ্ণ আর কাতর নয়নে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু এই সামান্য দূরত্বটাই যেন স্বর্গ-নরক-মর্ত-পাতালের চাইতেও বেশি দূর আর গভীর।

"গুডবাই ডক্টর," নরম গলায় বলল ও। "সাবধানে যাবেন, ম্যাকেইন।"



ওরা আমাদেরকে একটা তিনটনি ট্রাকের পেছনে করে এয়ারস্ট্রিপে নিয়ে গেল। বসার জায়গাটা অবশ্য তেরপল দিয়ে ঢাকা ছিল পুরোপুরি। অন্তর্বাস ছাড়া আর সব কাপড় খুলে নেওয়া হয়েছিল আমাদের, পায়ে জুতোটা পর্যন্ত ছিল না।

ট্রাক থেকে ডকোটা পর্যন্ত দুই সারি করে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা। প্রায় ২০০ জন ছিল সম্ভবত, প্যারাট্রুপারের ইউনিফর্ম পরা সবাই। সারির মাঝের সরু জায়গা দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদেরকে। তা দেখে দুই পাশের কালো চেহারাগুলো বিদ্রুপ করতে লাগল। ওদের সাথে চাইনিজ প্রশিক্ষক ছিল, তাদের পাতলা কালো চুল কাপড়ের ইউনিফর্ম টুপির নিচ থেকে বেরিয়ে আছে, আমাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে চওড়া হাসি হাসতে লাগল তারা। তিক্ত মন নিয়ে খেয়াল করলাম, আমার কুঁজো পিঠ দেখে ওদের উপহাসের চাহনি আর বাঁকা হাসি, আমি যত দ্রুত সম্ভব ডকোটায় গিয়ে আশ্রয় নিতে জোর কদমে এগোলাম। আচমকা ওদের একজন সারি থেকে বেরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ইচ্ছাকৃতভাবে সে থুথু মারলো আমার দিকে, সাথে সাথে হাসির একটা হুল্লোড় পড়ে গেল সবার মাঝে। থকথকে হলুদ শ্লেষ্মা সেঁটে থাকলো আমার চুলের সাথে, আমি হাচড়ে পাচড়ে দৌড়ে ঢুকে গেলাম বিমানের কেবিনে।

জাম্বেজি নদী পার হওয়ার এক ঘণ্টা পরে এয়ার ফোর্সের দুটো মিরেজ বিমান এসে যোগ দিল আমাদের সাথে, ওরা আমাদেরকে ভুরট্রেক্কার হুগটে-র সামরিক বিমান ঘাঁটিতে নিয়ে গেল। যাই হোক, এই সেফ-হোমে আসার পর মুক্তির যে অতি আবেগি অনুভূতি হয়েছিল সেটা থাকলো না বেশিক্ষণ।

একজন ডাক্তার এসে আমার মাথার জমাট বাঁধা রক্ত আর পুঁজ পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। তারপরেই কালো কাঁচে ঢাকা গাড়িতে করে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো চারজন গোমড়ামুখো, নির্মম চেহারার অফিসারের কাছে। এরা সবাই পুলিশ আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স-এর লোক।

"ডক্টর কাজিন, এটা কি আপনার সিগনেচার?"

টিমোথির মাগেবার পাসপোর্টের জন্য আমার করা সুপারিশপত্র ছিল সেটা।

"ডক্টর কাজিন, আপনার কি এই লোকটাকে মনে আছে?"

লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে টিমোথিকে দেখতে গিয়েছিলাম যখন, তখন এক চীনা লোকের সাথে পরিচয় হয়েছিল।

"আপনি কি তখন জানতেন যে ইনি কমিউনিস্ট চাইনিজ সরকারের একজন এজেন্ট, ডক্টর?"

টেমস নদীর ধারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমাদের তিনজনের বিয়ার খাওয়ার একটা ছবি দেখালো ওরা আমাকে।

"আপনারা কি নিয়ে আলাপ করেছিলেন সেসব কি একটু বলবেন প্লিজ, ডক্টর?"

টিমোথি আমাকে বলছিল যে চীনা লোকটা নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করছে, আমরা ওল্ডুভাই গর্জ-এ[৪০] লেয়াকি-র সাম্প্রতিক আবিষ্কার নিয়ে আলাপ করেছিলাম।

"আপনি কি মাগেবার জন্য স্টারভেসান্ট বৃত্তির সুপারিশ করেছিলেন?"

"আপনি কি জানতেন যে উনি চীনে গিয়ে গেরিলা ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন?"

"আপনি কি হংকং থেকে এই সাতাশ ড্রাম ফুলারের মাটি[৪১] আনার অর্ডারে স্বাক্ষর করেছিলেন, ডক্টর? আর এই কাস্টমসের ছাড়পত্র?"

ওগুলো ছিল ইনস্টিটিউটের কাগজ, ডেস্কের উপরে রাখা কাস্টমসের কাগজে নিজের স্বাক্ষর চিনতে পারলাম আমি। তবে এগুলো আনার কথা মনে পড়ল না।

"আপনি কি জানতেন যে ওই চালানে প্রায় একশো পঞ্চাশ পাউন্ড প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ছিল, ডক্টর?"

"এগুলো কি চিনতে পারছেন, ডক্টর?"

আফ্রিকার কয়েক ডজন ভাষায় ছাপানো পুস্তিকা। আমি ওগুলোর একটা নিয়ে প্রথম লাইনটা পড়লাম। সন্ত্রাসবাদী প্রচারণা। হত্যা, জ্বালানো পোড়ানো আর লুণ্ঠনের ব্যাপারে প্রণোদনা।

---

[৪০]Olduvai Gorge, তানজানিয়াতে অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান

[৪১]রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য ছাড়াই, তেল বা অন্য তরল রঙ্গিন করার কাজে ব্যবহৃত হয়

"আপনি কি জানতেন যে এগুলো ইনস্টিটিউটে আপনাদের প্রেসে ছাপানো হয়েছে, ডক্টর?"

অবিরাম চলতে লাগল প্রশ্নবাণ, ক্লান্ত, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ভুলভাল বকা শুরু করলাম আমি। মাথার আঘাতের চিহ্নগুলো দেখালাম, হাতের কবজি আর গোড়ালির দড়ির দাগ দেখালাম, তবুও থামলো না প্রশ্ন। মাথা দপদপ করা শুরু করল আমার, খুলির ভেতর মনে হচ্ছিল মস্তিষ্কের জায়গায় তুলতুলে জেলি।

"এগুলো কি চিনতে পারছেন, ডক্টর?"

মেশিন-পিস্তল, গুলি।

"হ্যাঁ!" চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। "আমার মাথায় এরকম পিস্তল দিয়ে মারা হয়েছিল, পেটে চেপে ধরেছিল।"

"আপনি কি জানেন এগুলো আপনার ইনস্টিটিউটের ঠিকানায় আনা বইয়ের বাক্সে করে আমদানি করা হয়েছে?"

"আপনি যখন ডকোটা ফ্লাইটের জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স নিচ্ছিলেন, ডক্টর, তখন আপনি বলেছিলেন–"

"ফোনে কথা বলার পরেই ওরা আক্রমণ করে বসে আমাকে। হাজারবার বলেছি সেকথা, কতবার!"

"মাগেবাকে প্রায় বারো বছর ধরে চেনেন আপনি। আপনার শিষ্য ছিল সে, ডক্টর।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আপনাকে মাগেবা কখনোই দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেনি? কখনোই কি ওর সাথে রাজনীতি নিয়ে আলাপ হতো না?"

"আমি ওদের দলের না! কসম–" বিমানের ছাদে পিচকারির মত রক্ত ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটা ভেসে উঠলো মনে, খুলিতে স্টিলের বাড়ি পড়ার কড়কড় শব্দ মনে এল আমার, চুলে ঝুলতে থাকা থুথুর কথা মনে পড়ল। "আমার কথা বিশ্বাস করেন, প্লিজ! ওহ গড, প্লিজ!" এরপরেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম সম্ভবত, হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গরম লাগতে লাগল মাথার ভেতর, আমি চেয়ার থেকে একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

হাসপাতালের ঘরে জ্ঞান ফিরলো আমার, ধবধবে পরিষ্কার চাদরের ভেতরে–লোরেন স্টারভেসান্টকে দেখলাম বিছানার পাশে বসা।

"লো, ওহ থ্যাংক গড।" আবেগে গলা ধরে এল আমার। লোরেন এসে পড়েছে, তার মানে আর চিন্তা নেই।

আমার দিকে ঝুঁকে এল ও, মুখে হাসি নেই, সুন্দর মুখটা ঠান্ডা আর কঠোর হয়ে আছে, যেন ব্রোঞ্জ দিয়ে বানানো সেটা। "ওরা ভাবছে তুমিও ওই দলের একজন। তোমারই সাজানো নাটক সব, ইনস্টিটিউটকে একটা সন্ত্রাসী সংগঠনের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছো তুমি।"

আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে, ও নির্মমভাবে বলেই চললো, "যদি তুমি আমার আর তোমার দেশের সাথে বেঈমানি করে থাকো, যদি তুমি আমাদের শত্রুর সাথে যোগ দাও, তাহলে আমার কাছে কোনো ক্ষমা পাবে না।"

"তুমিও এসব বোলো না লো। আর নিতে পারবো না তাহলে।"

"এসব সত্যি?" জানতে চাইলো ও।

"না!" মাথা নাড়লাম আমি। "না! না!" আর আচমকাই চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় জল গড়াতে লাগল আর আমি বাচ্চাদের মত কাঁপতে কাঁপতে গোঁ-গোঁ করতে লাগলাম।

"ঠিক আছে, বেন।" গলায় অসম্ভব নম্রতা আর স্নেহ ঢেলে বলল ও। "সব ঠিক আছে পার্টনার। সব ঠিক করে দেব আমি। সব শেষ এখন, বেন।"



ইনস্টিটিউটে আমার ব্যাচেলর কোয়ার্টারে ফিরতে দিল না লোরেন, ধরে স্টারভেসান্টদের বাড়ি ক্লেইন স্কুর-এর একটা গেস্ট স্যুইটে ঢুকিয়ে দিল।

প্রথম রাতে রক্ত আর বিদ্রূপরত কালো চেহারার দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠলাম, লোরেন এসে ঘুম থেকে জাগালো আমাকে। ড্রেসিং গাউন পরনে ছিল ওর, স্বর্ণালি চুলগুলো ঘুমিয়ে থাকার কারণে অবিন্যস্ত হয়ে আছে। আমার বিছানার পাশে বসল ও, তারপর আমরা দুজনে মিলে যেসব ভালো আর সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ একসাথে করেছিলাম আর ভবিষ্যতে করবো বলে ঠিক করে রেখেছি সেসব নিয়ে আলাপ করলাম, অবশেষে আমি নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারলাম একটু।

প্রায় দশটা অলস, শান্ত দিন পার করলাম আমি ক্লেইন স্কুর-এ। হিলারির প্রশ্রয় আর বাচ্চাদের হৈচৈ নিয়ে কেটে গেল সময়। খবরের জন্য হাঁ করে বসে থাকা সাংবাদিকের ঝাঁক এবং বাইরের পৃথিবীর বাস্তবতা আর গোলমাল থেকে বেঁচে থাকতে পারলাম ওখানে। ক্ষতগুলো শুকিয়ে এল, শুকিয়ে ঝরে পড়ল মরা চামড়া, আস্তে আস্তে নতুন নতুন গল্প শোনানোর জন্য বাচ্চাদের ঘ্যানঘ্যানও অসহ্য হয়ে উঠলো। গল্পের পাঞ্চলাইন ওরা সবাই মিলে জোরে জোরে বলত, বিবরণে কোনো ভুল করলে সাথে সাথে ধরিয়ে দিতো। বুঝলাম যে আবারও জলে নেমে পড়ার সময় হয়ে গিয়েছে।

আবারও একটা দীর্ঘ নিরানন্দ দিনে আমি আদালতের সামনে আমার হাইজ্যাকিং-এর কাহিনি বিস্তারিত বললাম, তারপর মুখোমুখি হলাম সারা

দুনিয়ার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের। এরপরে লোরেন আমাকে লিয়ার জেট-এ করে উত্তরে উড়িয়ে নিয়ে মুন সিটিতে রেখে এল।

ফেরার পথে ওকে বললাম কীভাবে আমি পাথর খুঁড়ে আনার জায়গাটা বের করতে চাই–আর সেই সাথে অ্যানসিয়েন্টদের গোরস্থানও।

শুনে যখন ও হাসতে হাসতে আমাকে বলল, "সাবাস বাঘের বাচ্চা–কাজে লেগে যাও বাছা, এর শেষ দেখেই ছাড়া চাই।" তখন বুঝলাম যে ব্যাপারটা নিয়ে আমি আসলে একটু বেশি বেশি উদ্যম আর আবেগ দেখিয়ে ফেলছি। বুড়ো ঝাই যেমন করে সানবার্ড নকল করে দেখিয়েছিলেন সেটা মনে পড়ল আমার। আর আমি আমার অবাধ্য হাতজোড়াকে শক্ত করে কোলে চেপে ধরলাম।

মুন সিটিতে একেবারে নায়কোচিত সংবর্ধনা পেলাম আমি, রেডিয়োর মাধ্যমে আমার প্রতি মুহূর্তের খবরাখবর রেখেছে ওরা। সবাই এরপর উইন্ডহোক বিয়ারের একটা বক্স খুলে আমার চারপাশে গোল হয়ে বসল আর আমি আবার আমার কাহিনি বিস্তারিত বললাম ওদেরকে।

"ওই টিমোথি, ওকে দেখলেই আমার কেমন যেন লাগতো," গম্ভীরভাবে স্যালি ওর অন্তর্দৃষ্টির দারুণ প্রতিভা প্রদর্শন করল আবার। "আমি ভেবেছিলাম, আপনাকে বলবো যে ওর ভেতরে গোলমাল আছে।" তারপর ও উঠে এসে সবার সামনে আমার কপালে চুমু খেলো, আমার চেহারা টকটকে হয়ে গেল মুহূর্তেই। "যাই হোক, আপনি আবার ফিরে এসেছেন, এতেই খুশি আমরা, বেন। আমরা সবাই খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলাম আপনাকে নিয়ে।"

পরদিন সকালে লোরেনকে এয়ারস্ট্রিপে এগিয়ে দিলাম আমি। ওর বিমান চলে গেলে বের হলাম র‍্যাল ডেভিডসনকে খুঁজতে। গিয়ে দেখি একটা পরিখার ভেতরে একটা বেলেপাথরের চাঙ্গড়ের মাপ নিচ্ছে। পরনে একটা নেংটি শুধু, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুলের কারণে শরীরের আর কোনো বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ছে না উপর থেকে, তবে রোদে পুড়ে গায়ের রঙ গাঢ় মেহগনিরঙা হয়ে গিয়েছে। মেদ ঝরে শরীরও সুঠাম হয়ে গিয়েছে এখন। ওকে খুবই পছন্দ হয়ে গিয়েছে আমার। পরিখার কিনারে দুজন পা ঝুলিয়ে বসে পাথর উত্তোলনের জায়গাটা সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললাম ওকে আমি।

"ইশ, ডক! আগে কেন বুদ্ধিটা মাথায় এল না?" উৎসাহী গলায় বলল ও। সেদিন বিকেলে বসে বসে আমরা জায়গাটার খোঁজ করার জন্য একটা বিশদ কৌশল নির্ধারণ করলাম, প্রতিদিন একটু একটু করে খোঁজার পরিসীমা বাড়তে থাকবে। র‍্যালের দলটাকে আপাতত বেষ্টনীর ভেতরের দিকে খোঁড়াখুঁড়ি থেকে সরিয়ে, এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। ধারালো ম্যাশেটি দেওয়া হলো ওদেরকে যাতে পাহাড়ের উপরের ঘন কাঁটাযুক্ত ঝোপগুলো কেটে রাস্তা বের করতে পারে।

একেবারে মিলিটারি অপারেশনের মত করে পরিকল্পনা করে হয়েছিল পুরো খোঁজাখুঁজিটার। না চাইতেও লোরেন আমাদেরকে অনেকগুলো ওয়াকি-টকি পাঠিয়েছিল, ওগুলো ব্যবহার করার জন্য অধীর হয়ে ছিলাম আমি। সেই সুযোগ পাওয়া গেল অবশেষে। র‍্যাল আর আমি চিৎকার করে করে রেডিয়োগুলো পরীক্ষা করতে লাগলাম, "ওভার টু ইউ", "রজার" কিংবা "শুনতে পাচ্ছি ফাইভ ফাইভ!"

পিটার উইলকক্স বয় স্কাউট নিয়ে বিড়বিড় করে বলল কিছু একটা, তবে আমার ধারণা ওকে খোঁজাখুঁজিতে না ডাকায় আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল সে। আমাদের খুশি অবশ্য লেসলি আর স্যালির ভেতরেও সঞ্চারিত হলো, আমাদের অভিযাত্রার জন্যে ওরা এত বেশি পরিমাণে খাবার বানিয়ে দিল যে সেনাবাহিনীর পুরো একটা দলও এক সপ্তাহ পেট ভরে খেয়ে পরে থাকতে পারবে। আমাদেরকে বিদায় দিয়ে শুভকামনা জানাতে গোলাপিরঙা ভোরবেলাতেই এসে উপস্থিত হলো ওরা, তখনও পায়জামা আর ড্রেসিং-গাউন ছাড়েনি, লেসলির চুলে কার্লার লাগানো। খাবার আর যন্ত্রপাতি বোঝাই করে নিয়ে আমার অদম্য দলটাকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললাম। নিজেকে স্কট বা কর্টেজ-এর মত মনে হতে লাগল। পাহাড়ের মাঝের ফাঁকটা দিয়ে এগোলাম আমরা, এখন ওটাই চূড়ায় ওঠার জন্য নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। তারপর দশ ঘণ্টা পরে, ঘেমে গোসল করে, ধুলো ময়লা মেখে, কাঁটার খোঁচার আঁচড় নিয়ে, হিপো মাছি আর অন্যান্য পোকার কামড় খেয়ে, রোদে সিদ্ধ হয়ে আর রাগে গজগজ করতে করতে আবার আমি ওদেরকে নিয়ে নিচে নেমে এলাম ওই পথ ধরে।

পরবর্তী দশদিন এই একই কার্যক্রম চলতে লাগল, দশম দিনের দিন সন্ধ্যায়, পাহাড়ের গা বেয়ে নামার সময় যখন অর্ধেক নেমে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আমরা, তখন র‍্যাল হঠাৎ করে ফাঁকটার খাড়া পাশগুলো খেয়াল করে অবাক কণ্ঠে বলে উঠলো:

"আয় হায় ডক! এটাই তো সেটা!"

প্রায় দশ দিন ধরে আমরা অ্যানসিয়েন্টদেরই বানানো ধাপগুলো ব্যবহার করে তাদের পাথরের খনিতে যাচ্ছি। ঘন ঝোপের কারণে লাল পাথর কেটে বানানো মসৃণ সোপান বোঝা যাচ্ছিল না। কয়েকটা আধাআধি টুকরো পেলাম আমরা, পুরোপুরি কাটা হয়নি তখনও, এই সুরক্ষিত খাদের ভেতরে থাকায় ক্ষয়ও হয়নি তেমন একটা। বাটালির দাগ তখনও ওগুলোর উপর তরতাজা, যেন কারিগর এই গতকালকে বুঝি এইটুক কাজ শেষ করে গিয়েছে, মোটেও ২,০০০ বছর আগের কাটা না। কয়েকটা চাঁই দেখা গেল কেটে আলাদা করা, কিন্তু অর্ধেক গা মসৃণ করার পরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলো সম্পূর্ণ তৈরি, এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়—আর কয়েকটাকে দেখে

মনে হলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু কোনো কারণে যাত্রাপথেই এলোমেলো করে ফেলে রেখে চলে যাওয়া হয়েছে।

ওগুলোর চারপাশ থেকে আগাছা আর ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ফেললাম আমরা। তখনই ওগুলো বানানোর মনোমুগ্ধকর প্রক্রিয়ার পুরোটা চোখের সামনে ধরা পড়ল। বাকিরাও চলে এল সাহায্য করার জন্য। এই নতুন সাফল্যে ওরাও খুব খুশি, কারণ সাম্প্রতিক অগ্রগতির হার কমে যাওয়ায় সবাই-ই একটু হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। আমরা স্কেচ করলাম, মানচিত্র বানালাম, মাপ নিলাম আর ছবি তুললাম, বিতর্ক করলাম, নানান মতামত দিলাম...এক নবোদ্যমের রেনেসাঁ ছড়িয়ে পড়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে পাওয়া গেল সবার মাঝে। আমরা যে এক কানাগলিতে হাতড়ে মরছি, এই ভাবটা উধাও হয়ে গেল সবার ভেতর থেকে। আমাদের এক বান্টু ফোরম্যানের তোলা একটা ছবি আমার কাছে আছে, সে ভেবেছিল আমরা সবাই পাগল হয়ে গিয়েছি বোধহয়। একটা তুলনামূলক বিশাল পাথরের টুকরোর উপর দাঁড়িয়ে বিচিত্র সব ভঙ্গি করে তুলেছিলাম ছবিটা। পিটার দাঁড়িয়ে ছিল নেপোলিয়নের ভাব নিয়ে, হাত ওর জ্যাকেটের বুক পকেটে ঢোকানো। র‍্যাল ওর ঝাঁকড়া চুলের চেহারাটায় চোখ ট্যারা করে রেখে একটা গাঁইতি পিটারের মাথার উপর তুলে রেখেছে, মারার ভঙ্গিতে। লেসলি ওর কাপড়টা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সামান্য তুলে রেখেছে, কিন্তু সেটা র‍্যালের চোখ ট্যারার চাইতেও জঘন্য লাগছে, ওই পা'জোড়া দিয়ে ও হাতিকেও লাথি মেরে কাত করে দিতে পারবে। আমি বসে আছি হিদারের কোলে, বুড়ো আঙুল চুষছি। স্যালি নাকের উপর বসিয়েছে পিটারের চশমা আর কানের উপর আমার হ্যাট; নিজেকে কিম্ভুত দেখানোর চেষ্টা করছে আসলে ও, কিন্তু পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ। এই ছবিটায় ওসব দিনে সবার মেজাজ বোঝা যায় স্পষ্ট।

এখানকার কাজ শেষ হলে, সবাই নবোদ্যমে যার যার কাজে ফিরে গেল আবার। শুধু র‍্যাল আর আমি রয়ে গেলাম ওখানে। আমি থিয়োডোলাইটটা নিয়ে এসে ফাঁকটার ব্যাপ্তি কতটা আর এখান থেকে কতখানি পাথর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেটার হিসাব কষতে বসলাম। কিন্তু জায়গাটা অনিয়তাকার হওয়ায় সঠিক পরিমাপ একরকম অসম্ভবই, তবে মোটামুটি একটা হিসাব করলাম যে দেড় লক্ষ ঘন গজ পাথর এখান থেকে সরানো হয়েছে।

এরপর পাথর কাটার পদ্ধতি বিচার করে আর ফেলে রাখা পাথরের চাঁইগুলোর আয়তনকে পরিমাপক ধরে, আমরা মোট কেটে মসৃণ করা পাথরের চাঁই আর চাঁছার পর ফেলে দেওয়া পাথরের পরিমাণের অনুপাত বের করলাম ৪০:৬০। অবশেষে আমরা একমত হলাম যে ব্যবহৃত পাথরের মোট পরিমাণ ৬০০,০০০ ঘন গজ।

এখন পর্যন্ত আমরা মোটামুটি বাস্তবিক পরিমাণ নিয়েই কাজ করেছি, কিন্তু এবার আমরা অনুমানের মহা সমুদ্রে নেমে পড়লাম যেন।

"অন্তত পায়ের ছাপ দেখে ডায়নোসর আঁকার মত শক্ত ব্যাপার তো এটা না," আমাদের পক্ষে যুক্তি দিল র‍্যাল। আমরা এরপর শহরের ফাউন্ডেশনের মানচিত্র আর আমাদের হিসাব করা পাথরের মোট পরিমাণ মিলিয়ে গায়ব হয়ে যাওয়া মুন সিটির দালান কোঠার একটা পরিপূর্ণ চিত্র তৈরি করতে সক্ষম হলাম।

"দেখি, আমাকে করতে দিন!" বিরক্ত হয়ে স্যালি প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই আমার হাত থেকে ছবি আঁকার ব্রাশটা কেড়ে নিল। এর আগে দশ মিনিট ধরে ও ধৈর্য ধরে আমার ছবি আঁকার প্রচেষ্টা দেখে গিয়েছে।

"আমার মনে হয় মূল দেওয়ালের ইটগুলো আর একটু চওড়া হবে," স্যালির আঁকা দেখতে দেখতে সমালোচনার সুরে বলল পিটার। "যদি আপনি জিম্বাবুয়ের উপবৃত্তাকার ভবনগুলোর দেওয়ালের সাথে তুলনা করেন–"

"হ্যাঁ, কিন্তু মাল্টার টারজিয়েনের মন্দিরটার কথা ধরো," বাঁধা দিল হিদার। "বা কেনসসোস-এর মূল দেওয়ালটা।" আমি আর র‍্যাল ব্যাপারটা থামানোর জন্য কিছু করার আগেই, ছবি আঁকাটা একটা দলগত প্রচেষ্টায় রূপ নিল, কমন রুমের সঙ্গীত উৎসবের জায়গায় তখন চলতে লাগল এই কাজ।

খোঁড়াখুঁড়ি সম্পর্কে যার যার অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের আলোকে পরামর্শ দিতে থাকলো সবাই, তাদের নিজস্ব বিশেষ মেধা আর আগ্রহের জোরে, আমরা আমাদের শহরের বেশ কয়েকটা ছবি এঁকে ফেললাম।

বিশাল লাল দেওয়াল, ওগুলোর গায়ে ফিনিশিয়ার মস্ত ঢেউয়ের মত নকশা কাটা। লাল রঙা দেওয়াল যাতে কিনা অস্তগামী সূর্যের রশ্মি এসে পড়ে, মহান সূর্য দেবতা বাআলের সান্ধ্যকালীন আশীর্বাদ এটা। নীরব উপবনটার ঘন সবুজ গাছপালার ভেতর থেকে উঠে যাওয়া শিশ্ন আকৃতির ঊর্ধ্বমুখী লম্বা মিনারগুলো, যেগুলো উর্বরতা আর সমৃদ্ধির প্রতীক। তার পেছনে, খাড়া পাহাড়ের গায়ের ফাটল, যা কিনা লুকানো প্রবেশপথ দিয়ে একটা রহস্যময় গুহাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। আবারও প্রজনন অঙ্গের প্রতীকী উপস্থাপনা। নিশ্চিতভাবে জায়গাটা দেবী অ্যাসটার্টের কাছে খুবই পবিত্র। মূলত কার্থেজিনিয়ানরা ওনাকে তানিথ নামে পূজা করে–পৃথিবী আর চাঁদের দেবী। আর এজন্যই সাদা জোব্বা পরা পুরোহিতের দল উপবনের ভেতর দিয়ে, মিনারগুলো পেরিয়ে লুকানো গুহাটায় গিয়ে প্রার্থনা করতো।

জানা যায় যে ফিনিশিয়ানরা তাদের দেব দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দিতো। ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখ আছে যে ওরা বাআলের জ্বলন্ত পেটে নিজেদের বাচ্চাকে উৎসর্গ করতো, আমরা ভাবতে লাগলাম আমাদের শান্ত এমারেল্ড দীঘির ধারে না জানি আরও কত ভয়ানক রীতিনীতি পালিত হয়েছে একসময়। হয়তো বলিকে সুন্দর জামা কাপড় আর স্বর্ণের গয়না পরিয়ে দীঘিটার ধারে এনে মাথা নিচু করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো, পাশেই প্রধান পুরোহিত খড়গ হাতে প্রস্তুত থাকত।

"ইস্, যদি দীঘিটা এত গভীর না হতো!" হতাশ হলো স্যালি। "বেন চেয়েছিলেন ডুবুরি নামিয়ে নিচটা পরীক্ষা করিয়ে দেখবেন, কিন্তু এত গভীরে নাকি কারো পক্ষে যাওয়া সম্ভব না।"

বেষ্টনীর ভেতরে আর বাইরের দেওয়ালের মাঝের যে এলাকা, যেখানে ছাইয়ের আস্তরণ অনেক বেশি পুরু আর বেশিরভাগ স্বর্ণের পুঁতি আর দামি অলঙ্কার আবিষ্কার হয়েছে, সেখানে আমরা পুরোহিতদের থাকা জায়গা আঁকলাম। মাটির দেওয়ালের একটা গোলকধাঁধা হলো সেটা, যার উপরে পাতার ছাউনি দেওয়া। তারপর রাস্তাঘাট এবং পুরোহিত আর সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছারি ঘর আঁকলাম আমরা।

"রাজা আর তার দরবার কোথায় থাকবেন?" জানতে চাইলো পিটার। " মূল দেওয়ালের ভেতরে না?" তাই আমরা জায়গাটাকে ভাগ করে পুরোহিতদের থাকার জায়গা আর রাজদরবার আঁকলাম। কেনসসোস, কার্থেজ, টায়ার আর সাইডোন সম্পর্কে আমরা সামান্য যা জানি তার উপর ভিত্তি করে প্রাণ পেল আমাদের ছবিগুলো। র‍্যাল বাইরের দেওয়ালে থাকা দরজার জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে; পুরো দেওয়ালে এটাই ছিল একমাত্র খোলা জায়গা, সেটা পশ্চিম দিকে মুখ করা।

"এটা থেকে একটা রাস্তা সোজা হ্রদের ঘাটে চলে যাওয়ার কথা।" স্যালি এঁকে ফেলল সেটা।

"হ্যাঁ, কিন্তু একটা বাজার থাকার কথা, ঘাটের পাশেই ব্যবসা বাণিজ্যের একটা জায়গা না থাকে কীভাবে?" বলল র‍্যাল। তারপর মানচিত্রের একটা জায়গা দেখালো। "এটাই হবে সেটা। যে এলাকায় পিটার ঘুরে মরছেন।"

"কী পরিমাণ হাতির দাঁত আর তামা আর স্বর্ণ আনা-নেয়া হতো চিন্তা করতে পারেন!" লেসলি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"আর বিক্রি করার জন্য পাথরের চাঁইয়ের উপরে দাঁড় করিয়ে রাখা ক্রীতদাস," হিদারও সায় দিল।

"আরে! আরে! আমাদের সবকিছু তো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করার কথা, অনুমান আর কল্পনার ভিত্তিতে না," ওদেরকে আটকানোর চেষ্টা করলাম আমি।

"আর তীরে ওদের জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকত।" স্যালি আঁকতে শুরু করল। "বিশাল বিশাল জাহাজ, যেগুলোর সামনের দিকটা দেখতে ছিল ভেড়ার মাথার মত, হাতির দাঁত আর স্বর্ণের চালান দিয়ে ভরা।"

আবারও দেওয়াল আর মিনারগুলো উঠে দাঁড়ালো, হ্রদ ভরে গেল পানিতে, বন্দর আর পানশালাগুলোতে গমগম করতে লাগল খদ্দের, যারা প্রায় দুই হাজার বছর আগে মারা গিয়েছে। যোদ্ধারা পায়চারি করছে আর ক্রীতদাসরা গোঙাচ্ছে, ডুলিতে করে সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে,

স্বর্ণ আর অন্যান্য মালামাল নিয়ে সারি সারি বহর আসছে পূর্ব দিক থেকে। একজন শ্বেতাঙ্গ রাজা বিশাল পাথরের দরজাটা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দেখছেন সব, ওনার কাঁধে একটা গোলাপখচিত ঢাল আর বুকের বর্ম সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

পুরো ব্যাপারটায় সবাই মজা পাচ্ছিল বেশ, আমাদের কল্পনার জগতকেও প্রসারিত করতে সাহায্য করল তা। স্যালি ওর ছবিগুলোয় যখন তুলির শেষ আঁচড়টা দিল, ততোদিনে পেরিয়ে গিয়েছে চার সপ্তাহ; ওর কাজটার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে পিটার জাহজাঘাটাটা আবিষ্কার করে বসল...ঠিক স্যালি যেখানে অনুমান করেছিল যে শহরের নিচের বন্দরে জাহাজগুলো ভেড়ানো থাকবে।

ঢালু জায়গাটায় একটা জাহাজের খোল খুঁজে পাওয়া গেল, মূল কাঠামো অক্ষত আছে তখনও। অর্ধেক বানানো জাহাজগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, ওগুলোর পোড়া টুকরোগুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। শুধু কল্পনা আর বিশ্বাস থাকলেই এগুলোকে একটা জাহাজ হিসেবে ভাবা সম্ভব। আমি জানি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা এটাকে চ্যালেঞ্জ করবে, কিন্তু পোড়া কাঠগুলোর কার্বন-১৪ পরীক্ষা আমাদেরকে যে সময়কাল দিল সেটা হচ্ছে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ; সালটাকে আমরা 'অগ্নিকাণ্ডের বছর' হিসেবে নামকরণ করলাম।

ছবি আঁকার কাজের কারণেই আমি স্যালির সাথে আরও বেশি বেশি সময় কাটানোর অজুহাত পেয়ে গেলাম। দুপুরের খাবার আর গোসলের কাপড় নিয়ে যাওয়া শুরু করলাম গুহার ভেতরে। শুরুতে আমাদের মাঝে একটা জড়তা কাজ করছিল, কিন্তু আমি প্রচণ্ড ধৈর্যের সাথে স্যালিকে আবার সহজ করে নিলাম; শীঘ্রই আমরা আবারও বন্ধুত্বপূর্ণ, হাসি-তামাশার সম্পর্কে ফিরে গেলাম যা কিনা আমাদেরকে দুর্দান্ত একটা দলে পরিণত করল। আমি শুধু একবারই আমাদের আরও অন্তরঙ্গ মেলামেশার কথাটা পেড়েছিলাম।

"তোমার মন কি ভালো হয়েছে, স্যাল?" জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, উত্তর দেওয়ার আগে ও আমার দিকে সহজভাবেই অপলক তাকিয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ।

"আমাকে আরও কিছুক্ষণ সময় দিন, বেন। আমার নিজের সাথেই আসলে কিছু বোঝাপড়া করা বাকি।"

"আচ্ছা।" আমি যতটা সম্ভব মনখোলা হাসি হাসার চেষ্টা করলাম, তারপর মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম একটা দীর্ঘ বিরহের জন্য।

মাঝে মাঝে অন্যরাও আমাদের সাথে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য দীঘির ধারে আসতো। কারণ যখন বাইরের তাপমাত্রা এমনকি ১১৫ ডিগ্রিতে উঠে যেত, তখনও গুহার ভেতর ঠান্ডা থাকত। পানি ছিটিয়ে চেঁচামেচি করতাম আমরা, প্রতিধ্বনি গমগম করে আবার ফিরে আসতো আমাদের কাছে। একটা অবিস্মরণীয় স্মৃতি হলোঃ লেসলি একটা জমকালো গোলাপি

বিকিনি পরে দীঘির পাশ দিয়ে ভয়ে ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে–দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন প্রজনন মৌসুমে মাদী জলহস্তী দৌড়ে বেড়াচ্ছে–আর তার পিছু নিয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রমী র‍্যাল।

ফিরে আসার পাঁচ সপ্তাহ পরে শুভ সংবাদ নিয়ে গুহায় ফিরলাম।

"লার্কিন রেডিয়োতে মেসেজ পাঠিয়েছে, স্যাল। লোরেন কাল আসছে।"

স্যালির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখে বেজার হলাম, কারণ নিশ্চিত ছিলাম যে ও অন্তত আমার জন্য লোরেনের প্রতি ওর প্রাথমিক অপছন্দের ভাবটা সরিয়ে ফেলে, ওকে পছন্দ করতে শুরু করেছে।

লোরেনকে এগিয়ে আনতে এয়ারস্ট্রিপে গেলাম আমি, ওকে দেখেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম একটা। বেচারার ওজন কমে গিয়েছে কমপক্ষে প্রায় ২০ পাউন্ড, ওর সুস্বাস্থ্যের প্রতীক, চকচকে স্বর্ণালি আভাযুক্ত গায়ের রঙটা এখন ধূসর সাদা। দুই চোখের নিচেই কালি পড়ে এত কালো হয়ে আছে যে মনে হচ্ছে কেউ মেরেছে ওকে!

"বেন," খুবই আগ্রহভরে দুই হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে চেপে ধরলো লোরেন। "তোমাকে দেখে যে কী ভালো লাগছে, শালা বুড়ো হারামি।" টের পেলাম ওর কণ্ঠে দুশ্চিন্তার সুর, খেয়াল করলাম ওর কপালে কয়েকটা রূপালি চুল...যা আগে কখনোই ছিল না।

"মাই গড, লো!এ কী দশা হয়েছে তোমার?"

"থ্যাংকস," বলে একটা শুকনো হাসি হেসে ব্যাগপত্র সব তুলে দিল ল্যান্ড রোভারের পেছনে।

"সত্যি করে বলো, লো। তুমি অসুস্থ নাকি?" ওকে এত বেশি অসুস্থ আর শুকিয়ে যেতে দেখে অস্থির হয়ে গেলাম আমি।

"খুব বাজে একটা সময় যাচ্ছে, বেন," ল্যান্ড রোভারে আমার পাশে উঠে বসতে বসতে বলল লো। "চার সপ্তাহ ধরে দৌড়াদৌড়ি চলছে, পুরোটাই করতে হচ্ছে এই আমাকে–অন্য কারো উপর ভরসা করতে পারছিলাম না ব্যাপারটা সামলানোর জন্য। অপর পক্ষ এসেছিল দলবেঁধে, একজন হাঁপিয়ে উঠলেই আরেকজন তার জায়গা নিতো।"

"তুমি তো নিজেকে শেষ করে ফেলবে," মৃদু ভর্ৎসনা করলাম আমি, নিজেকে ঘ্যান ঘ্যান করা বৌয়ের মত লাগছিল। আর ও আমার দিকে হেলে পড়ে বাহুতে ঘুষি মেরে হেসে দিল।

"তোমাকেই এখন দরকার, পার্টনার।"

"কী হলো শেষমেশ? কীসের জন্য কষ্ট করলে এত?"

"ব্যাপারটা অনেক বড়, বেন! বিশা-আ-আ-ল! তামা আর লোহার খনি নিয়ে, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায়, কিউনিন নদীর কাছেই, বিশাল বিশাল আকরিকের খনি মিলে মিশে পড়ে আছে। নিম্ন মানের তামা আর উচ্চমানের

লোহা–দুটো মিলে একেবারে গুপ্তধনের সিন্দুক।" ওর কণ্ঠের ক্লান্ত ভাবটা নেই আর। "আমি ওই বাটকু জাপানি হারামিগুলোকে টেবিলের উপর উঠিয়ে পাছায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। ওরা ওগুলো উত্তোলনের জন্য একটা গভীর সমুদ্রবন্দর আর রেললাইন বসানোর ব্যাপারে অর্থায়ন করবে। এতে ওদের খরচ হবে একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন।" উল্লসিত গলায় বলে উঠলো ও, চেহারায় রঙ ফিরছে আবার। "আমার একটা কোম্পানিই সব নির্মাণকাজ সম্পন্ন করবে অবশ্য।" বলে ষড়যন্ত্রীদের মত করে ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে চুপ থাকার ইশারা করল ও, আমিও খুশিতে হেসে উঠলাম হো হো করে। ওর এরকম মেজাজ খুবই ভালো লাগে আমার। "খনি থেকে উত্তোলনের জন্য যন্ত্রপাতি যা যা দরকার তার সব আমিই বসাবো আর " লোরেন ওর পুরো পরিকল্পনাটা খুলে বলল আমাকে, দর কষাকষির যেসব ক্ষেত্রে ও জিতেছে সেসব বলার সময় হেসে হেসে উঠে আমার হাতে ঘুষি মারতে লাগল মুষ্টিযোদ্ধাদের মত।

"তাহলে তুমি কেমন পাবে এর থেকে?" অবশেষে জিজ্ঞেস করলাম আমি। আর ও তাকালো আমার দিকে, একটু যেন আহত হয়েছে।

"মানে টাকার অঙ্ক জানতে চাইছ?" জিজ্ঞেস করল লোরেন।

"অবশ্যই! আর কী?"

"আশ্চর্য বেন। আমি আগেও কিন্তু ব্যাখ্যা করেছি ব্যাপারটা। টাকা এখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। কারণ এটা শুধু টাকার না, এটা হচ্ছে দেশের রপ্তানি আর চাকরির সংস্থানের ব্যাপার, নতুন নতুন উপায়ে সম্পদ প্রাপ্তির দ্বার খোলা আর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের ব্যাপার, আমাদের দেশের সম্ভাবনার কথা অনুধাবন করা আর–আর–"

"আর সুযোগ বুঝে তা থেকে বিশাল একটা দাও মেরে নেওয়া," কথাটা শেষ করলাম আমি।

আবারও হাসলো ও। "শয়তান একটা তুমি, বেন। আশা করি পরিমাণটা ভালোই হবে। সুযোগের কথা বলছি, টাকা না।"

"গত সপ্তাহের *টাইম ম্যাগাজিনটা* পড়েছো?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। জানতাম খোঁচাটা লাগবে।

"ওহ, ঈশ্বরের দোহাই, বেন," ক্ষেপে গেল ও।

"তুমি পৃথিবীর সেরা তিরিশজন ধনীর একজন।"

"শালা হারামিরা," বিরক্তমুখে বিড়বিড় করল লোরেন। "এখন সবাই তাদের দাম দ্বিগুণ করে দিচ্ছে। শালারা নিজের চরকায় নিজেরা তেল দিতে পারে না? শুধু আমারটা নিয়ে টানাটানি।"

"আর এসব করতে গিয়ে নিজেকে শেষ করে দিচ্ছো তুমি।"

"ঠিক বলেছো, বেন। নিজেকে কেমন যন্ত্র যন্ত্র লাগছে, তাই এক সপ্তাহ সব বাদ। পুরো একটা সপ্তাহ ছুটি কাটাবো।"

“কী আমার ছুটি!” নাক সিঁটকালাম আমি। “আধ-ঘণ্টা পরপর তোমার বিওয়াইএমরা এসে এসে আলোচনা করতে বসবে, ওরা যাওয়ার পরে রেডিয়োর পাশে বসে থাকবে তুমি—এই হবে ছুটি কাটানো।”

“আরে নাহ,” হাসলো লোরেন। “সব ছেড়ে দূরে চলে যাবো আমি, তুমিও যাচ্ছো আমার সাথে।”

“মানে?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“পরে বলবো।” প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ও। ধুলোময় রাস্তার একটা মোড়ে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা ততোক্ষণে, আমি গাড়ির গতি কমিয়ে আনলাম থাকার কুটিরগুলোর দিকে যাওয়ার জন্য।

“সোজা যাও, বেন,” নির্দেশ দিল লোরেন। “গুহাটায় যেতে চাই আমি। কয়েক সপ্তাহ ধরে জায়গাটা আমার মাথা থেকে সরছেই না।” ওর গলার স্বর নরম আর স্মৃতিকাতর শোনালো। “দর কষাকষি নিয়ে তর্ক বিতর্কের সময় যখন পেরে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াতো, তখন আমি ওই জায়গাটার নীরবতা আর প্রশান্তির কথা ভাবতাম মনে মনে। মনে হতো যেন ” ও থেমে, বিব্রত ভঙ্গিতে কাশি দিতে লাগল। লোরেন এভাবে কথা বলে না কখনও।

স্যালি গুহার পেছনের দেওয়ালের কাছে কাজ করছিল। পরনে একটা সবুজ সিল্কের ব্লাউজ আর দোকানে বানানো খাকি পায়জামা, চুলগুলো খোলা, ঝলমল করছে। লোরেনকে স্বাগত জানানোর জন্য ও মুখ তুলে তাকাতেই, আমি হালকা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমি ফেরার পর এই প্রথম ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছে।

স্যালিও লোরেনের স্বাস্থ্যের অবনতি খেয়াল করল সাথে সাথেই, ওর চোখে ঠিকই দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করলাম আমি, যদিও মুখে বলল না কিছুই। ওর স্বাগত জানানো ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী, ইচ্ছে করেই কিছু বলল না যেন, তারপরেই আবার ফিরে গেল নিজের ইজেলে। লোরেন হোয়াইট কিং-এর প্রতিকৃতিটার দিকে এগিয়ে গেল। আমিও যোগ দিলাম ওর সাথে, তারপর আমরা দুজন এক বন্ধুত্বপূর্ণ শান্ত নীরবতায় বসে বসে অদ্ভুত অবয়বটাকে দেখতে লাগলাম। লোরেনই কথা বলল প্রথমে।

“আচ্ছা বেন, তোমার কি এমন মনে হয়যে রাজাটা তোমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছে?”

প্রশ্নটা লোরেনের জন্য বেশ আজবই, কিন্তু আমি পূর্ণ গুরুত্ব সহকারে ওটাকে গ্রহণ করলাম কারণ ও খুবই আন্তরিকতার সাথে করেছিল প্রশ্নটা।

“না তো, আমার সেরকম মনে হয় না।”

“এখানে কিছু একটা আছে, বেন,” নিশ্চিত সুরে বলল ও। “কিছু একটা, যা তোমার চোখে এড়িয়ে গিয়েছে। এই জায়গাটার রহস্যের চাবিকাঠি, পুরো গুপ্ত ব্যাপারটাই লুকানো আছে এই গুহায়।”

"আসলে লো, আমরা   আমি বলতে শুরু করলাম, কিন্তু ওর মনোযোগ আর আমার দিকে নেই। নিজের ইজেল রেখে আমাদের দিকে এগিয়ে এল স্যালি। তারপর লোরেনের পাশে বসে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইলো ওর চেহারার দিকে।

"এই অনুভূতিটা আমার কখনও ভুল হয় না, বেন। ডেসোলেশন উপত্যকার খনিটার কথা মনে আছে? আমার জিয়োলজিস্টরা বাতিল করে দিয়েছিল ওটাকে, কিন্তু আমার মনে কেমন কেমন করছিল। মনে নেই?"

মাথা ঝাঁকালাম আমি। ডেসোলেশন উপত্যকা থেকে এখন মাসে বিশ হাজার ক্যারেট আকাটা হীরা উত্তোলিত হয়।

"এখানেও কিছু আছে, আমি নিশ্চিত। কিন্তু কোথায়?" বলতে বলতে ও আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন ও যা খুঁজছে সেটাকে আমিই লুকিয়ে রেখেছি। "কোথায় আছে সেটা, বেন? মেঝেতে, দেওয়ালে নাকি ছাদে?"

"বা দীঘিতে," বললাম আমি।

"ঠিক আছে, দীঘিটা দিয়েই শুরু করা যাক," সায় দিল ও।

"খুব গভীর ওটা লো, কোনো ডুবুরী–"

"ডুবুরীদের সম্পর্কে কী জানো তুমি?" জানতে চাইলো ও।

"আমি নিজেই কয়েকবার ডাইভিং করেছি।"

"ওহ, ঈশ্বরের দোহাই, বেন!" অধৈর্য হয়ে আমাকে বাঁধা দিল ও। "আমার যখন হার্টে অপারেশন করা লাগবে তখন আমি ক্রিস বার্নার্ড-এর কাছে যাবো, কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে না। দুনিয়ার সেরা ডুবুরী কে?"

"কস্তিয়াউ, মনে হয়।"

"ফাইন। আমি আমার লোকদেরকে ওর পেছনে লাগিয়ে দিচ্ছি। দীঘির ব্যাপারটা গেল। এবার মেঝে।"

লোরেনের সাথে কাজকর্ম করতে বসা মানে হচ্ছে হ্যারিকেনের মাঝে পড়ে যাওয়া। এক ঘণ্টা পরেই ও পুরো গুহাটার প্রতিটা ইঞ্চি চষে দেখার একটা পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে ফেলল। সব শেষে খুবই সাধারণভাবে বলল, "ঠিক আছে, বেন। তুমি তাহলে আপাতত ক্যাম্পে ফিরে যাও। আমি ঘণ্টাখানেক একা থাকতে চাই এখানে।" ওর সঙ্গ ছাড়া একটা মিনিটও কাটাতে চাচ্ছিলাম না আমি কিন্তু তবুও সাথে সাথেই উঠে দাঁড়ালাম।

"তুমি আসবে না, স্যাল?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। লোরেন একটু একা থাকতে চাচ্ছিল।

"ওহ, বেন। আমি একদম একটা কাজের মাঝখানে–"

"সমস্যা নেই, বেন," লোরেন বলল আমাকে। "ও থাকলে কিছু হবে না।" আর আমি চলে এলাম ওখান থেকে।

অতিথিদের থাকার জায়গাটা অনেক আগেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল, তবুও আমি একজন চাকরকে সাথে নিয়ে লোরেনের ব্যাগপত্র খোলার

ব্যাপারটা তদারকি করতে গেলাম। খেয়াল করলাম যে কেউ কয়েকটা স্থলপদ্ম কেটে এনে একটা বিয়ারের পাত্রে ভরে, বিছানার পাশে রেখেছে দিয়েছে। ওগুলো পাহাড়ের পাদদেশে জন্মায়। আমি ঠিক করলাম:যে ম্যাটাবেলে লোকটা আমাদের বাবুর্চি, খানসামা আর বুয়ার কাজ করে, তাকে এই চমৎকার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাবো। ঘরের নিরানন্দ পরিবেশটা একেবারেই বদলে দিয়েছে ফুলগুলো।

লোরেনের থাকার ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে আমি গেলাম বিশাল বাংলোয়। ফ্রিজে প্রচুর বরফ আর পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি আছে কিনা নিশ্চিত করলাম। তারপর গ্লেন গ্রান্ট-এর একটা নতুন বোতলের ছিপি খুললাম–লোরেন আর আমার দুজনেরই এই পানীয়টার প্রতি দুর্বলতা আছে। আমি হুইস্কিতে চুমুক দিতেই পাশের অফিসরুমে ধুপধাপ আওয়াজ শুনে বুঝলাম র‍্যাল আর লেসলি খোঁড়াখুঁড়ি শেষে ফিরে এসেছে। আমি ওদের কথাবার্তা শুনতে চাইনি কিন্তু মাঝের পার্টিশনটা একদমই পাতলা।

র‍্যাল একটা রাগী জানোয়ারের মত গরগর করে উঠলো আর লেসলির কণ্ঠে অনুযোগের সুর।

"তুমি খুবই দুষ্টু!" দম আটকাতে আটকাতে বলল ও, বোঝাই যাচ্ছিল যে ওরা ঝাপটা-ঝাপটি করছে। "একদিন কেউ না কেউ ঠিকই দেখে ফেলবে।"

"আজ রাতে যা করবো, সেটা ধরতে না পারলেই হবে," র‍্যাল ঘোষণা দিল।

"সসস!" চুপ হতে বলল লেসলি, কিন্তু পাত্তা দিল না র‍্যাল।

"পাঁচ সপ্তাহ। আমি তো ভেবেছিলাম উনি আর আসবেনই না। পাগল হওয়ার দশা আমার।"

"ওহ, র‍্যাল, আমার সোনা," উত্তেজনায় ঘন ঘন দম ফেলতে ফেলতে বলল লেসলি।

"আমার পাখি, আমার ছোট্ট ময়না," র‍্যাল জবাব দিল। ওদের কথায় রক্ত জমলো আমার চেহারায়। চুপচাপ বোতলটা নামিয়ে রেখে চোরের মত বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। আমি ঠিক বুঝছিলাম না যে লোরেনের আগমন ওদের শারীরিক সম্পর্কের এরকম নাটকীয় পরিবর্তন এনে দিল কীভাবে। কারণ নিশ্চিত বুঝতে পারছিলাম যে র‍্যাল সে কথাই বলেছিল। আমার এরকম কোনো সুযোগ না থাকায় ওদের প্রতি হিংসা হতে লাগল।

টিনজাত সংরক্ষিত খাবার খেতে খেতে সবার পেটে চরা পড়ে গিয়েছে। লোরেন সাথে করে নিয়ে এসেছে একগাদা তাজা ফল, সবজি আর মাংস। সেই রাতে আমরা আস্ত শুয়োর খেলাম একটা, ওটার ঝলসানো খাস্তা চামড়া স্বর্ণালি বাদামি হয়ে ছিল; সাথে রোস্ট করা আলু, সবুজ মটর আর বিশাল এক বাটি সালাদ। খাওয়ার সময় কেউ তেমন কথা বলল না বললেই চলে।

খাবার দাবার শেষে লোরেন সিগার ধরালো একটা। আমি গ্লাসগুলো ভরে দিতেই, লোরেনকে ঘিরে বসে গেল সবাই। প্রথমে আমি পাথরের খনিটা আবিস্কার আর ওটা থেকে আমরা কী কী আন্দাজ করেছি সেটা জানালাম লোরেনকে! তারপর ওকে দেখানো হলো স্যালির আঁকা শহরের ছবিগুলো।

ছবিগুলো দেখে লোরেন যে প্রতিক্রিয়া দেখালো তা ছিল একদমই অপ্রত্যাশিত। আমি ভেবেছিলাম যে ও খুবই বিস্মিত হবে, আমরা সবাই-ই যেমনটা হয়েছি; কিন্তু আমাদের কল্পনাকে প্রমাণিত সত্য হিসেবে গ্রহণ করবে না। কিন্তু দেখা গেল ওর উত্তেজনা বাঁধই মানছে না, চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে প্রতিটা ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে থেকে থেকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল, অথবা আবার চেয়ারে বসে চকচকে চোখ আর পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে দেখতে লাগল চুপচাপ। ওর চেহারা এখনও ফ্যাকাসে আর বিধ্বস্ত, সেকারণেই ওর মুখভঙ্গিগুলো আরও প্রকট হয়ে দেখা যাচ্ছিল।

একজন চতুর ক্রীড়নকের মতই, স্যালি হোয়াইট কিং-এর ছবিটা সবার শেষের জন্য রেখে দিয়েছিল। যেই ও ছবিটা সামনে তুলে ধরলো, আমি খেয়াল করলাম চেয়ারে শক্ত হয়ে গেল লোরেন। শ্বেতাঙ্গ রাজা পূর্ণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত, মাথার শিরস্ত্রাণ আর বুকের বর্ম ঝকঝকে ব্রোঞ্জের, ঢাল ঝুলে আছে, কোমরে বাঁধা একটা ছোট তরবারি। তার লালচে-সোনালি দাড়ি একসাথে করে বাঁধা–পুরোই রাজকীয় ভাব। তার পরিচারকরা বাইরের দেওয়ালের দরজা দিয়ে তার পিছু পিছু এগোচ্ছে, একজনের হাতে তার যুদ্ধ-কুঠার, একজনের হাতে ধনুক আর তূণীর, তৃতীয়জনের হাতে অনন্ত জীবনের সোনার পেয়ালা।

এই বিশেষ ছবিটা আঁকতে গিয়ে স্যালি ওর অঙ্কন প্রতিভার পুরোটাই ধৈর্য ধরে ঢেলে দিয়েছে। তাই এটাই সবচেয়ে অসাধারণ হয়েছে সবগুলোর মধ্যে। আমরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে, কিন্তু আচমকা আমার পা সরে যাওয়ায় দুম করে সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়ে, চমকে উঠে কয়েক ফোঁটা হুইস্কি ফেলে দিলাম টেবিলে। আগে খেয়াল করিনি ব্যাপারটা, সোনালি দাড়িটার কারণেই বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু তখন আচমকা বুঝে ফেললাম যে স্যালি ওর হোয়াইট কিং আঁকার জন্য মডেল হিসেবে কাকে ব্যবহার করেছে। আমি ঘুরে লোরেনের দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম একই রকম চওড়া কপাল, বড় বড় তীক্ষ্ণ নীল চোখজোড়ার উপরের উন্নত ভ্রূ, একই রকম খাড়া নাক, ঠোঁটের গর্বিত বাঁক, নিচের ঠোঁট কামুক ভঙ্গিতে সামান্য গোল হয়ে আছে।

"বেন!" ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল ও, পোর্ট্রেটটার উপর থেকে চোখ ফেরায়নি ও। "অসাধারণ কাজ–আজকের সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত আমি বুঝিনি যে

এটা আসলে কী বোঝাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সবকিছুই ছিল শুধু পাথরের টুকরো, কয়েকটা পুঁতি আর সোনার পাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানকার মানুষগুলোকে নিয়ে ভাবিনি মোটেও। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বেন! এই লোকগুলো যারা দুনিয়ার শেষ মাথা পর্যন্ত চলে যেত; যারা একদম বিরান জায়গায় এত বিশাল কিছু একটা গড়ে তুলতে সমর্থ ছিল–" থেমে গেল ও, ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে লাগল, জিনিসটার পরিব্যাপ্তি, বিশালতা নিয়ে ভাবছে। তারপর ও আমার দিকে ঘুরলো।

"বেন, আমাদেরকে বের করতে হবে লোকগুলোর আর ওদের শহরের কী হয়েছিল। যতদিন লাগে লাগুক, যত টাকা লাগে লাগুক। আমাকে জানতেই হবে।"

মুখের অর্ধেক খাওয়া সিগারটা ফেলে ও উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে, তারপর মারমুখী ভঙ্গিতে ঘরময় পায়চারি করা শুরু করল।

"আমার মনে হয় সবাইকে এখন সব জানিয়ে দেওয়া উচিত, বেন। আমি একটা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করছি। এখানকার সবাইকে ওখানে চাই–সব ব্যাখ্যা করার জন্য। আমার মতে সারা দুনিয়াকে এই লোকগুলো সম্পর্কে জানানো উচিত।"

আমার পেট মোচড় দিয়ে উঠলো দুশ্চিন্তায়, চিঁ চিঁ করে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম আমি।

"কিন্তু, লো, সেটা না করাই ভালো হবে। এখনই না–প্লিজ!"

"কেন?" যুদ্ধংদেহী ভাবে আমার দিকে ঘুরলো ও।

"আমাদের হাতে এখনও পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।" এত দুর্বল দলিলপত্র নিয়ে পুরোটা প্রকাশ করলে সমালোচকেরা কীভাবে তেড়ে আসবে সেটা ভাবতেই ভয়ে আমার সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। "ওরা আমাদের চামড়া ছিলে ফেলবে, লো। ছিলে-কেটে লবণ লাগিয়ে দেবে।"

"আমরা ওদেরকে এগুলো দেখাবো।" ছবিগুলো দেখালো ও।

"গড!" চিন্তাটা করতেই কাঁপুনি ধরে গেল আমার। "এগুলো সবই কল্পনা আর আন্দাজের উপর আঁকা। ছবিগুলোর একটামাত্র জিনিস আমরা বাস্তবে দেখাতে পারবো, সেটা হচ্ছে ওই সোনার পেয়ালা।"

লোরেন তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, তবে আমি দেখতে পেলাম ওর চোখ থেকে উন্মত্ততা কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই ও অপরাধীর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে হাত দিয়ে কপাল চাপড়াতে লাগল।

"ওয়াও!" হাসি চলছেই ওর। "আমি নিশ্চয়ই খুবই ক্লান্ত! আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল ছবিগুলো সব সত্য, চাক্ষুষ দেখে আঁকা!" ও আবারও ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে লাগল ওটা। "আমাকে জানতেই হবে, বেন!" আবার বলল ও, "জানতে আমাকে হবেই!"



পরেরদিন এমারেল্ড দীঘিটার ধারে বসে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময়, লোরেন আমাকে জানালো কীভাবে আমি আর ও হারিয়ে যাবো। স্যালির চারকোলের কাঠিটা দিয়ে একটা চ্যাপ্টা পাথরের উপর এঁকে দেখাতে লাগল ওর পরিকল্পনা।

"আমরা এখন আছি এখানে, এখানে পঁয়ষট্টি মাইল দূরে হচ্ছে ডোম্বোশাবা-র ধ্বংসাবশেষ। যদি তোমার ধারণাগুলো সঠিক হয় তাহলে এই দুটো শহরের মাঝে পশুতে টানা গাড়ি চলাচলের একটা রাস্তা ছিল নিশ্চিত। আমি আর তুমি ল্যান্ড রোভারটা নিয়ে এইদিকে যাবো, পুরনো সেই রাস্তাটা খুঁজে বের করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করবো।"

"খুবই এবড়ো-থেবড়ো এলাকা কিন্তু," মনে করিয়ে দিলাম আমি, কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না। "কেউই কখনো যায়নি ওদিক দিয়ে। কোনো রাস্তা নেই, পানি নেই।"

" বিওয়াইএম-ও নেই," হেসে বলল লোরেন।

"ওহ, তাহলে তো যেতেই হবে।" আমিও হেসে বললাম। আমার মনে পড়েছে যে ভ্রমণটা আসলে আবিস্কারের জন্য না, বিশ্রামের জন্য। "কখন যাবো আমরা?"

"কালকে ভোর বেলায়।"

ঘুম যখন ভাঙলো তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, বিছানার পাশের ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে চারটা বাজে। সময়টা এমন যে, আবার ঘুমানোর জন্য দেরি হয়ে যাবে, আবার উঠে পড়লেও বেশি আগে হয়ে যাবে। কী করবো যখন ভেবে মরছিলাম, তখন কুটিরের দরজাটা চোরের মত করে কেউ খুলে ফেলল, আমি চোর ধরার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। চাঁদের আলোয় র্যাল-এর ঝাকড়া চুলের মাথার আবছায়াটা উদয় হলো দরজার চৌকাঠে।

ওর কারণে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই চেঁচিয়ে উঠলাম, "করছোটা কী?"

আমি যদি ভয় পেয়েও থাকি, সেটা আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে র্যাল-এর প্রতিক্রিয়ার কাছে কিছুই না। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মুখ দিয়ে আর্তনাদের মত শব্দ করে আর দুই হাতে দিয়ে পাখির মত ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ও প্রায় তিনফুট মত লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল...যেন একটা বক পাখি ওর প্রজনন নৃত্য পরিবেশন করছে। এক কি দুই মিনিট লাগল ওর নিজেকে সামলে,

কোনোমতে বিছানায় গিয়ে বসতে। তারপর কাঁপা গলায় বলল, "টয়লেটে গিয়েছিলাম।" যাক ভালোই হয়েছে, মনে মনে ভাবলাম আমি। যাওয়ার আগেই ভয়টা দেখালে কেলেংকারি ঘটে যেতে পারতো। আমি উঠে কাপড় পরে নিলাম, তারপর গেলাম ল্যান্ড রোভারটা পরীক্ষা করে দেখতে। আমি ভেবেছিলাম যে র‍্যাল লেসলির সাথে সময় কাটিয়ে এসেছে, কিন্তু সেটার তাৎপর্য ধরতে পারিনি তখন।

আমি আর লোরেন প্রথম দিনের প্রায় পুরোটাই ব্যয় করলাম হিলস অভ ব্লাডের উপর দিয়ে এমন একটা রাস্তা খুঁজে বের করতে, যেটা দিয়ে ল্যান্ড রোভারটা চলতে পারবে। পাহাড়ের সারির ধার দিয়ে উত্তর দিকে এগোলাম আমরা। একসময় পাহাড়গুলো ছোট হয়ে এসে ঢিবিতে পরিণত হলো, আমরা এরকম দুটোর মাঝের সংকীর্ণ খাতে চড়ে বসলাম। পথটা এতটাই এবড়ো-থেবড়োযে ল্যান্ড রোভারের মত গাড়ির ঘাম ছুটে গেল, তবে একবার উপরে উঠে যেতেই আমরা খোলা সাভানা আর ছেড়া ছেড়া বাবলা বনের ভেতর দিয়ে চলা শুরু করলাম। ভালোই এগোতে লাগল গাড়ি, দুলতে দুলতে আবার দক্ষিণ দিকে যেতে লাগলাম গাড়ি চলাচলের পথটা খুঁজে বের করতে। একটা বিশাল ম্যাপে লোরেন আন্দাজের উপর ভিত্তি করে রাস্তাটা দাগিয়ে রেখেছে।

সেদিন রাতে আমরা রাস্তাটার পাশে তাঁবু খাটালাম, বা অন্তত যেখানে ওটা থাকবে বলে আশা করেছিলাম, সেখানে। যে পরিমাণ গ্যাস আর তেল সাথে ছিল তাতে বিলাসী ক্যাম্প-জীবন যাপনের সুযোগ ছিল না। তাছাড়া এই ভ্রমণটা ইচ্ছে করেই এরকম কঠিন করা হয়েছে যাতে সভ্যতার কালো ধোঁয়া আর কালিঝুলিকে দূর করতে পারি, সেই সাথে তরুণ বয়সে আমরা যেসব অভিযাত্রা করে বেড়াতাম সেসবের স্মৃতিচারণও হবে।

কয়লার উপর একজোড়া বালিহাঁস গ্রিল করে রাতের খাবার সারলাম, সাথে এনামেলের মগে করে খেলাম গ্লেন গ্রান্ট আর রোদে গরম করা পানি। তারপর শক্ত মাটিতে নিতম্ব আর কাঁধ রাখার জায়গাটায় গর্ত করে, ল্যান্ড রোভারের পাশেই স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে সেঁধিয়ে গেলাম দুজন। ঘণ্টাখানেক ঘুম ঘুম চোখে কিন্তু তৃপ্তিসহকারে গল্প করতে করতে তলিয়ে গেলাম ঘুমের দেশে।

ভোরবেলা খুশি মনেই ঘুম থেকে উঠলো লোরেন, তারপর পিঠ ডলতে ডলতে আড়মোড়া ভেঙে মাংসপেশির জড়তা দূর করে দিল।

"মাত্র টের পেলাম যে বয়স আর কুড়ি নেই," হতাশা ঝাড়ল ও। কিন্তু তৃতীয় দিন নাগাদ ওকে সেরকমই দেখাতে লাগল। সূর্যের আলো পেয়ে গায়ের রঙ ফিরলো আবার, গায়েব হয়ে গেল চোখের নিচের কালিও, মন খুলে হাসতে লাগল ও।

আমাদের অগ্রগতি অবশ্য ছিল ধীর। মাঝে মাঝেই কিছুদূর এগিয়ে আবার ফিরে আসতে হল আগের পথ ধরে, কারণ দেখা যেত–ছোট ছোট

পাহাড় বা গিরিখাতের কারণে সামনে এগোনো আর সম্ভব হচ্ছে না। তখন আমরা ল্যান্ড রোভার থেকে নেমে পায়ে হেঁটে একটা রাস্তা বের করার চেষ্টা করতাম। কোনো তাড়া ছিল না আমাদের, সেকারণেই অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে চললেও প্রতিটা মাইল খুবই মজা করতে করতে এগোচ্ছিলাম। উত্তর-পূর্ব দিকে এগোতে লাগলাম আমরা, জায়গাটা তার চরিত্র আর মেজাজ এমন জাদুময় দ্রুততায় বদলাতে লাগল, যা শুধুমাত্র আফ্রিকার একারই বৈশিষ্ট্য।

পূর্বমুখী এই যাত্রার প্রতি মাইলের পুরষ্কার ছিল পাখি আর নানান পশুর আবাসের সন্ধান পাওয়া। শুষ্ক ভূমির পাখির মাঝে ছিল গিনি মুরগি, তিতির, বিশাল কোরি বাস্টার্ড। মোপানি আর মাসাসা গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছিল ছুটন্ত কুদু[৪২]-র রূপালি ঝলক, দৌড়ের সময় ওগুলোর লম্বা স্ক্রু-র প্যাঁচানো মত শিংগুলো পিঠের সমান্তরালে শোয়ানো বলে ভ্রম হয়।

"পানি আছে আশপাশেই," ল্যান্ড রোভারটাকে হলুদ ঘাসের একটা খোলা প্রান্তরের ধারে দাঁড় করিয়ে মন্তব্য করল লোরেন। দূরে দেখা গেল এক পাল কৃষ্ণ হরিণ, কিছু গাছের আবডালে। আফ্রিকার সবচেয়ে মহিমান্বিত হরিণ এরা। গর্বিত মস্তকে বাঁকা চাঁদের মত শিং উচিয়ে আছে আর কালো শরীরের নিচে তুষার শুভ্র স্তন ঝলসাচ্ছে যেন।

"আর একটা বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি," দুঃখিত স্বরে মন্তব্য করলাম আমি। "মানুষের লোভ আর বাড়াবাড়ির বলি হচ্ছে।"

"হ্যাঁ," সায় দিল লোরেন। "আর জানো কিনা, সমস্ত হোমো সেপিয়েন্স-এর একটা নমুনাও এদের অর্ধেক সুন্দরও না," বলল ও, "র‍্যাকুয়েল ওয়েলচ[৪৩]-ও আছে এর মাঝে।"

সেই রাতে আমরা মাসাসা গাছের একটা উপবনে ক্যাম্প করলাম, গাছগুলো বসন্তকালীন অদ্ভুত পাতার ছেয়ে আছে। এরকম পাতার রঙ দুনিয়ার আর কোনো গাছের নেই-গোলাপি, নরম ঝকঝকে ধূসর, আগুন লাল। লোরেন দিনের বেলা একটা ছোট ইম্পালা শিকার করেছিল। ও সেটার হাড় ছড়ানো মাংস বেকন দিয়ে মুড়ে ভারি একটা লোহার কড়াইতে রোস্ট করল আর আমি পেয়াজ, টমেটো আর প্রচুর রসুন দিয়ে চাটনি বানালাম। মোটা মোটা ব্রাউন ব্রেড-এর স্লাইস আর ইয়েলো বাটার সহযোগে পেটে চালান করলাম সেগুলো। খেয়ে মনে হচ্ছিল দুনিয়ায় আর কিছু কখনো খাইনি আমি।

"তোমার যদি কখনো কোনো চাকরি লাগে, লো, তাহলে আমার বাবুর্চির কাজটা চাইলেই পাবে," মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে গব গব করে বললাম আমি। ও দাঁত বের করে হেসে ল্যান্ড রোভারটার কাছে গিয়ে রেডিয়োটা চালু করল।

"কী কথা ছিল?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

---

[৪২]এক ধরনের আফ্রিকান হরিণ

[৪৩]অ্যামেরিকান অভিনেত্রী

"খবরটা শুনবো।" অপরাধী চেহারাতেও ওকে কতইনা সুন্দর দেখায়! "একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তো সমস্যা।"

আমরা বসে বসে এই পাগল হয়ে যাওয়া দুনিয়ার সংগ্রাম আর যুদ্ধের খবর শুনলাম কিছুক্ষণ। কেন যেন এই দূরবর্তী আর প্রশান্ত জায়গাটায় এসব বৈষয়িক ব্যাপার স্যাপার নিতান্তই গুরুত্বহীন, তুচ্ছ আর স্বল্পস্থায়ী মনে হতে লাগল।

"বন্ধ করে দাও, লো," বললাম আমি। "কী হবে শুনে?"

সেটের কন্ট্রোল নব-এর দিকে হাত বাড়ালো লোরেন কিন্তু ঘোষকের কণ্ঠে একটা পরিচিত নাম শোনা যেতেই থেমে গেল।

"লুসাকা রেডিয়ো জানিয়েছে যে, গতকালকে রোডেশিয়ার ওয়াংকি ডিস্ট্রিক্টের এক পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ করে যে সন্ত্রাসবাদী দলটা চারজনকে হত্যা আর আরও দুজনকে আহত করেছে, সেটার প্রধান হচ্ছে, নিজেকে 'কর্নেল' দাবী করা টিমোথি মাগেবা। দুই মাস আগে এক নাটকীয় বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে। রোডেশিয়ান পুলিশের এক মুখপাত্র জানান, মাগেবা সম্ভবত আফ্রিকার সবচেয়ে ভয়ংকর সন্ত্রাসী। তাকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় সন্ধান দিতে পারলে দশ হাজার রোডেশিয়ান ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।"

রাগী একটা ভঙ্গিতে লোরেন রেডিয়োটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল আগুনের কাছে। হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "এখান থেকে উত্তর দিকে একশো মাইল দূরেই ব্যাটার আস্তানা। সুযোগটা নেওয়ার জন্য যে কোনো কিছু করতে রাজি আমি।"

টিমোথির খবরটা শুনে গভীরভাবে আহত হলাম আমি, ওই রাতে মাথার নিচে হাত দিয়ে সারা রাত জেগে জেগে রাতের তারাময় সমারোহ দেখলাম। শুকতারা দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে ঘুমিয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু বাজে বাজে স্বপ্ন দেখায় ঘুম হলো না ভালোমতো।

সকালের রোদ পাহাড়গুলোর চূড়া কাঁচা সোনায় মুড়িয়ে দিল, পুরো আকাশ টকটকে লাল, বেগুনি রঙে দিল রাঙ্গিয়ে, মনের সব বাজে চিন্তাও যেন সেই সাথে ঝেঁটিয়ে দিল বিদায় করে। আমরা হাসতে হাসতে, কথা-বার্তা বলতে বলতে পূর্ব দিকে আমাদের শম্বুক অগ্রযাত্রা শুরু করলাম আবার। সকালের মাঝামাঝি আমরা খেয়াল করলাম উত্তর দিকে শকুনের দল চক্কর দিচ্ছে, কঠিন নীল আকাশের নিচে বিশাল কালো কালো ফুটকির একটা বৃত্ত চাকার মত ঘুরছে। এই সৃষ্টিছাড়া মড়াখেকোদের ওড়ার পথ অনুসরণ করা হচ্ছে আফ্রিকার অন্যতম প্রলুব্ধকারী আকর্ষণ। কারণ ওদের পিছু নিলে প্রতিবারই নিশ্চিতভাবে এই বিজন এলাকার অবিশ্রান্ত নাটকের কোনো-না-কোনো বেসামাল ঘটনার জায়গায় পৌঁছে যাওয়া যাবে।

"কয়েক মাইল দূরেই," মন্তব্য করল লোরেন, উইন্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে আগ্রহভরে সামনে উঁকি দিচ্ছে ও। আমারও একই রকম কৌতূহল হচ্ছে। ধ্বংস হওয়া সভ্যতা আর হারানো শহর গোল্লায় যাক, আমরা নখ আর দাঁতের অদম্য আর নগ্ন ফলাফল প্রত্যক্ষ করতে যাবো।

সিকি মাইল যাওয়ার পরেই দেখলাম পিঠ ভাঙা পাখির আকৃতিগুলো গাছের মাথায় অশুভ ভঙ্গিতে উবু হয়ে বসে আছে, যেন নরকের বাগানের কোনো শয়তানি ফল।

"ওরা শিকার করা থেকে ফিরে এসেছে," লোরেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। "কিছু একটার ভয়ে আকাশ আর গাছের মাথা থেকে নামছে না।"

ল্যান্ড রোভারটা থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল লোরেন। নেমে এলাম আমরা, লোরেন ওর বিশাল .৩৭৫ ম্যাগনামটার গুলি পরীক্ষা করে দেখলো। শক্ত বুলেটগুলো পাল্টে নরম নাকের বুলেট ভরে নিল। এগুলো আরও শক্তিশালী আঘাত করতে সক্ষম।

"হেঁটে যাই চলো," বলল লোরেন। "একটা কালো কেশরের সিংহ মারতে পারলে জবর হবে।" কড়াত করে রাইফেলের বোল্ট আটকে দিল ও। "শটগানটা নাও, বেন, ছররা গুলি ভরে নাও।"

আমার চিন্তাভাবনা অন্য ধারার। যদি একটা সিংহ এত দূরে থাকে যে রাইফেল ব্যবহার করা সম্ভব, তাহলে ওর সাথে আমার কোনো ঝামেলা নেই; তবে এর চাইতে কম দূরত্বে থাকলে আমি এমন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইবো যেটা দিয়ে গুলি মিস করবো না।

লোরেন কোমর সমান উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল, আমিও পিছু নিলাম, ওর শরীর আমার পিস্তলের আওতার বাইরে রাখছি, হাতের শটগান সিংহের জন্য, সাথে গুলি নিয়েছি পকেট ভরে। ধীরে-সুস্থে এগোতে লাগলাম আমরা, চেষ্টা করছি শকুনের সমাবেশের লক্ষ্যবিন্দুটার দিকে এগোতে, কারণ ওরা প্রায় আধা বর্গমাইল জুড়ে গাছের মাথা জুড়ে বসে আছে।

প্রতিটা ধাপ ফেলছি আর টেনশন বাড়ছে যে ভুল করে যে কোনো সময় ঘাসের মাঝে বিশ্রামরত সিংহের দলের কারো গা মাড়িয়ে দিবো! লোরেন প্রতিবার দিক বদলানোর সময় আমার দিকে ইশারা করছে, আমরা সর্বোচ্চ সাবধানতার সাথে পা টিপে টিপে মাটির উপর আগুপিছু করে আগাচ্ছি। আমাদের আশপাশের গাছগুলো থেকে পাখিগুলো উড়াল দিল; যেইমাত্র ওরা একটা বিশ্রী বিশ্রামরত ভঙ্গি ছেড়ে ডানা মেলে সত্যিকার চেহারা পরিগ্রহ করল, সাথে সাথে অলৌকিকভাবে যেন সুন্দর আর মহিমান্বিত একটা জিনিসে রূপান্তরিত হলো।

উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে গেল আমার, সাথে এক আনন্দময় ভয়। লোরেনের দেখলাম ঘামে পিঠের জামা ভিজে গিয়েছে, অথচ এভাবে ঘামের

মত গরমও ছিল না মোটেও। ওর প্রতিটা নড়া-চড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে অসম্ভব শক্তি চেপে রেখে এগোচ্ছে, শিকারের প্রথম লক্ষণ দেখা যাওয়া মাত্র বিস্ফোরিত হবে। শিকারের এই অংশটা পছন্দ আমার, কারণ শিকার করার এক আদিম চেতনা আমাদের মাঝে লুকানো রয়ে গিয়েছে এখনও, শুধু ওই পশু হত্যার ব্যাপারটাই আমার অপছন্দ।

লোরেন জমে গেল, রাইফেল তুলে ধরেছে উপরে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ও, আমি রাইফেলের ভারি গোলার আওয়াজ শোনার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিলাম, আমি জানি এর পরেই হয়তো আমাকেই গুলি করাতে হরে পারে; তেলের ফোঁটা পড়ার মত করে একেকটা সেকেন্ড কাটতে লাগল কিন্তু মাথা সামান্য হেলিয়ে এদিক-সেদিক খুঁজে দেখা ছাড়া আর কিছুই করল না লোরেন।

চুপচাপ আমিও ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের ঠিক সামনেই একটা জায়গার ঘাস চ্যাপ্টা হয়ে আছে, মাড়িয়ে গিয়েছে কেউ। ওটার ঠিক মাঝে পড়ে আছে একটা মহিষের লাশ। গ্যাসে ফুলে ঢোল হয়ে আছে পেট, খোলা মুখ আর চোখের উপর বিশাল বিশাল চকচকে সবুজ মাছি উড়ছে ভনভন করে। মহিষটার গায়ে থাবা বা আচড়ের কোনো দাগ দেখতে পেলাম না আমি, কিন্তু ওর গায়ের ঘন কালো চুলের ভেতর জায়গায় জায়গায় টাক পড়েছে আর দগদগে ঘা দেখা যাচ্ছে সেখানে।

মাটির দিকে তাকালাম আমি, নড়া-চড়ার কারণে একটা ঘাসের ডগাও যাতে না নড়ে সে ব্যাপারে সতর্ক, দেখি পিপড়া বাসা করে ঝুরঝুর করে ফেলেছে মাটি আর তাতে ছোট বাচ্চাদের পায়ের ছাপ!

ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল, সিংহের পালের চাইতেও বহুগুণ ভয়ংকর একটা জায়গায় চলে এসেছি আমরা। দ্রুত আবার মৃত মহিষটার দিকে তাকালাম আমি, ভালো করে খেয়াল করতেই দেখতে পেলাম ওটার ঘাড়ের ভাঁজ হওয়া চামড়া থেকে দুই ইঞ্চি মত দুটো নলখাগড়ার ডাল বের হয়ে আছে। ওগুলোর চারপাশের মাংস ফুলে শক্ত হয়ে আছে।

"লো!" ফ্যাসফেসে গলায় বললাম আমি। "এখান থেকে চলো তাড়াতাড়ি–বুশম্যানদের শিকার এটা।"

মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকালো লোরেন। খেয়াল করলাম ওর নাকের পাটা চীনা মাটির পাত্রের মত সাদা হয়ে গিয়েছে।

"তুমি কীভাবে জানো?" গলার স্বর ফ্যাসফ্যাসে হয়ে গিয়েছে ওরও।

"তোমার পায়ের কাছে দেখো, পায়ের ছাপ।" নিচের দিকে তাকালো লোরেন। "আর মহিষের গলায় দেখো তীর।"

লোরেনও বুঝলো সব। "এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ তুমি, বেন। কী করবো এখন?" আমার মতই দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে ও।

আমি বললাম, "আস্তে, আস্তে! পেছনে ফিরবে না, খুব দ্রুত নড়া-চড়াও করবে না। ওরা আমাদেরকে দেখছে, লো। হয়তো এখানেই আছে।"

পিছিয়ে যেতে শুরু করলাম আমরা, ঘেমে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া হাতে কোনো মতে ধরে রেখেছি অস্ত্রগুলো, চোখ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-সেদিক।

"ওদের সাথে কথা বলো, বেন, ঈশ্বরের দোহাই!" ফিসফিস করে বলল লোরেন। তবে আমি অবাক হলাম এটা ভেবে যে, ওদের বিষের ভয় এমনকি লোরেনের মত একজনকেও কাপুরুষে পরিণত করতে পারে।

"ঠিক হবে না, যে কোনো কিছুই ওদেরকে বেসামাল করে দিতে পারে।"

"আমাদের পেছনেও থাকতে পারে ওরা," লোরেনের গলা কাঁপতে শুরু করেছে। তীরের বাতাস কেটে যাওয়ার শব্দ শোনার অভিপ্রায়ে কান পেতে রাখলাম আমি, আমার শোল্ডার ব্লেডের মাঝের চামড়া কুচকে গেল টের পেলাম। পেছনদিকে প্রতিটা ধাপ ফেলার পরে একটু একটু করে ভয় কমছিল আমার, শিকার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ পেছনে আসার পর মনে হলো এবার ওদেরকে ডাক দেওয়ার ঝুঁকিতে নেওয়া যায়।

"শান্তি," ডাকলাম আমি। "আমরা কারো কোনো ক্ষতি চাচ্ছি না।"

সাথে সাথেই উত্তর এল, পাখির মত কিচিরমিচির করে, তবে কোনদিক থেকে আসছে বোঝা গেল না, মনে হলো যেন এই উষ্ণ বাতাসের ভেতর থেকে আপনাআপনি উৎপন্ন হচ্ছে।

"হোঁতকা সাদা মাথার ব্যাটাকে বলো বন্দুক নামিয়ে রাখতে, আমরা চিনি না ওকে।"

"ঝাই," স্বস্তি আর আনন্দে প্রায় কেঁদে দিলাম আমি। "আমার ভাই!"



"তার চোখ সে তো উজ্জ্বল হলদেটে চাঁদ
আগুনের ফুলকি তোলে ক্ষুরের আঘাত!"

আমরা সবাই মিলে মহিষ সঙ্গীত গাইলাম, জ্বলন্ত আগুনের চারপাশে উবু হয়ে বসে থাকা লোকগুলো এক জটিল তালে আমাদের হাতে হাত দিয়ে তালি বাজাতে লাগল। আমাদেরকে ঘিরে বৃত্তাকারে নাচছে মেয়েরা, কোমর দোলাচ্ছে, জায়গা বদল করছে, মহিষ আর দুঃসাহসী শিকারির ভঙ্গি নকল করে দেখাচ্ছে। আগুনের আলো পড়ছে ওদের সোনালি-হলুদ চামড়ায়, ওদের ছোট বাচ্চাদের মত শরীর আর চমকে যাওয়ার মত বিশালকায় নিতম্ব, সেই সাথে ছোট কিন্তু বলিষ্ঠ হলুদ স্তন ঝাঁকাচ্ছে নাচের তালে তালে।

“আমি নিখুঁত নিশানা করে তীর দেই ছুঁড়ে
বাজ পাখি হয়ে সেটা যায় উড়ে উড়ে।”

আমাদের আশপাশের গাছগুলোর ডালপালা ভারি হয়ে আছে ঝুলন্ত কাঁচা মাংসের ভারে। শুকানোর জন্য রাখা হয়েছে ওগুলো। আগুনের আলোর পেছনে, জিভে জল আনা ঘ্রাণটা শিয়াল আর হায়েনার নাকে যেতেই, ওরা তারকোজ্জ্বল আকাশের দিকে ডেকে ডেকে নিজেদের হতাশা প্রকাশ করছে।

“ওর রক্ত যখন বয়, লাগে যেন ফুল
মধু মাখা মাংসের নেই কোনো তুল!”

অবশেষে শেষ হলো নাচ, মহিলারা হাহা-হিহি করতে করতে আগুনের ধারে এসে জড়ো হয়ে গল্প করতে করতে ওদের ছোট গোলগাল পেটে আরও বেশি বেশি মাংস ঠেসতে শুরু করল। বুশম্যান পুরুষ আর মহিলারা শারীরিক গঠনকে সবসময়ই সম্ভ্রমের চোখে দেখে, ওদের কাছে লোরেন হচ্ছে একটা সোনালি দানব। সহজ সাবলীল আর আন্তরিকভাবে লোরেনকে নিয়ে আলাপ করতে লাগল ওরা। শুরু করল ওর স্বর্ণালি মাথা থেকে, আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসতে লাগল আর একসময় আমি থাকতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলাম।

“এতো হাসির কারণ কী?” লোরেন জানতে চাইলে বলে দিলাম ওকে।

“আয় হায়, ওরা এসব বলে কী!” লোরেন অবাক বিস্ময়ে, আতংকিত চোখে তাকিয়ে রইলো মহিলাদের দিকে, ওরা নিজেদের মুখে হাত চাপা দিয়ে আরও জোরে হিহি করতে লাগল।

আমি ঝাই আর লোরেনের মাঝখানে বসে বসে দোভাষীর কাজ করছি, একজন ধূমপান করছে আর অন্যজন রোমিয়ো অ্যান্ড জুলিয়েটা সিগার চিবিয়ে খাচ্ছে। পশু আর পাখিদের নিয়েই মূলত আলাপ করছে ওরা কারণ ওদের দুজনেই শিকার করতে পছন্দ করে।

“আমার দাদা গল্প শুনিয়েছিলেন: যখন ওনার বয়স কম ছিল তখন নাকি নদীর ধারে এসব জমিতে এত বেশি মহিষ চরতো যে পঙ্গপালের মত লাগতো, পুরো জায়গা কালো হয়ে যেত–কিন্তু এরপরেই শুরু হলো লাল মড়ক।”

“গো-মড়ক,” লোরেনকে ব্যাখ্যা করলাম আমি।

“আর ওরা এমন মরা মরলো যে একটার উপর একটা পড়ে থাকত, শকুনেরাও তখন এমন খাওয়া খেতো যে উড়তেও কষ্ট হতো। হাড়গোড়গুলো রোদের মধ্যে এমনভাবে পড়ে থাকত, যেভাবে বসন্তকালে সাদা নামাকুয়া ডেইজি ফোটে।”

মহিলা আর বাচ্চারা জড়াজড়ি করে ধুলোর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল, দেখতে মনে হচ্ছিল হলুদ কুকুরের ছানা সব। ওরা দুজন তখনও আলাপ চালিয়ে

গেল। বিশাল বিশাল জানোয়ার আর সেগুলোকে শিকার করার কাহিনি বলাবলি করল দুজন, সেরাতে আগুনের পাশে বসেই বন্ধুতে পরিণত হলো ওরা, শেষমেশ ঝাই লজ্জিত মুখে আমাকে বললেন, "আমি কারো সাথে শিকার ভাগ করতে পছন্দ করি না। তবে আমি ওনাকে একটা হাতি দেখাতে পারি, আমার দাদার আমলে যেরকম ছিল সেরকম। ওগুলোর দাঁত আমার কোমরের সমান মোটা, বর্শার সমান লম্বা।"

মনে মনে ভাবলাম, গেল আমাদের ধ্বংসাবশেষ বা গাড়ি চলাচলের রাস্তা আবিষ্কারের আপাত সব সম্ভাবনা। কারণ প্রস্তাবটা শোনামাত্র লোরেনের চেহারা একশো ওয়াটের বাল্বের মত জ্বলে উঠলো।

"তবে," সাথে যোগ করলাম আমি, "উনি বলছেন যে ল্যান্ড রোভারটা এখানেই রেখে যেতে হবে। আসার সময় এখানে পৌঁছার আধা ঘণ্টা আগেই ওরা আমাদের আগমন টের পেয়েছিল। আর হাতিটাও নাকি অনেক বুড়ো আর খুবই চালাক। তার মানে হচ্ছে আমাদেরকে এখন ঘুমাতে হবে কিছুক্ষণ। কালকে সেই একটা দিন পার করতে হবে।"

সূর্য যখন উঠলো, ততোক্ষণে আমরা তিন ঘণ্টা হেঁটে ফেলেছি, হাঁটুর নিচ থেকে পায়জামায় কুয়াশা লেগে ভিজে গিয়েছে, তবে হাঁটার কারণে রাতের ঠান্ডা হাড়ে কামড় বসাতে পারেনি খুব একটা, তবে সামনের ছোট বাদামি অবয়ব দুটোকে দৃষ্টির সীমায় রাখার জন্য পূর্ণ বেগে পা ফেলেও হাঁপাচ্ছিলাম আমরা। ঝাই আর ঘাল এমন ঝাড়া হাত-পা হয়ে চলছে যে সারাদিন না থেমেও মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারবে। ওদের ছোট্ট বাদামি অবয়বগুলো আমাদের সামনে নাচতে নাচতে ঘন কাটা ঝোঁপ আর জেসি ঝোপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

"কী অবস্থা, বেন?"

আমি কিছু না বলে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে শটগানটা কাঁধ বদল করলাম।

"শালার বাটকু হারামি দুটো তো হেঁটেই পুরো দুনিয়া ঘুরে আসতে পারবে," বলল লোরেন।

"ভাইজান, এত কেবল শুরু," ভয় দেখালাম আমি। ওরা আমাদেরকে ভয়ানক রুক্ষ আর বাজে একটা এলাকা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল, যেখানে মাটি থেকে লোহায় ভরা পাথরের চোখা কালো মাথা বের হয়ে আছে। জটপাকানো ঝোপগুলো সব ধূসর কাঁটায় ভরা, গভীর গিরিখাতগুলোয় সমতল ভূমি থেকে খাড়া খাড়া চুনাপাথরের দণ্ড বেরিয়ে আছে; প্রচণ্ড দাবদাহ শরীরের সব আর্দ্রতা চুষে নিয়ে আমাদের জামায় সাদা সাদা লবণের গোল গোল দাগ ফেলে দিল। একটা চতুর বুড়ো হাতি, যাকে মানুষ সারা জীবন দাবড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তার জন্য এই জায়গাটা আবাস হিসেবে উপযুক্ত।

দুপুরে একটা বিশাল পাথরের চাঁই-এর পাশের ছায়ার বসে আধা ঘণ্টার মত বিশ্রাম নিলাম আমরা। চাঁইটার কালো শরীরে স্পর্শ করা মাত্র ছ্যাকা লাগছিল। আমরা কয়েক ঢোক কুসুম গরম পানি খেয়ে, প্রায় সাথে সাথেই আবার রওনা দিলাম গন্তব্যে।

"এখানে আর এখানে।" বিষাক্ত তীরটার মাথা দিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করে, ঝাই লোহার মত শক্ত মাটিতে হাতির দুটো পায়ের ছাপ ইঙ্গিত করলেন। "দেখতে পাচ্ছেন?" আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলেন উনি। আর যদিও আমরা জায়গাটা খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বুঝদারের মত মাথা নাড়লাম, কিন্তু আমাদের কেউই আসলে দেখতে পাইনি সেটা।

"যদি এটা হাতির চলাচলের রাস্তা হয়," লোরেন বিড়বিড় করে বলল, "তাহলে আমি একটা চাইনিজ পরী।" কিন্তু ঝাই তুমুল আত্মবিশ্বাসে, কাঁটার ভেতর দিয়ে, নতুন একটা রাস্তা ধরে এগোনো শুরু করলেন। তা ধরে আমরা একটা পাথুরে সমতলভূমিতে উঠে এলাম, এমন একটা পথসূত্র ধরে এগোচ্ছিলাম যা আমি বা লোরেন কেউই ধরতে পারলাম না। পাহাড়ের চূড়ার কাছে এক দলা হাতির বিষ্ঠা খুঁজে পাওয়া গেল, জায়গাটা জ্বলন্ত উনুনের মত গরম হয়ে থাকার পরেও তখনও ভেজা ভেজা আছে। আর পানি থাকার কারণে একগাদা হলুদ আর কমলা প্রজাপতি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওটার উপর। বিষ্ঠাটা দেখতে অনেকটা নারকেলের ছোবড়া দিয়ে বানানো তোষকের ভেতরের জিনিসপত্রের মত।

"ভেলি সলি," চাইনিজ পরীদেরকে নকল করে লোরেনকে ফিসফিস করে বলালম আমি। "প্লিজ আমাল বাতিতা থিক কলে দাউ–তালাতালি।"

"শালা একটা জাদুকর।" অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল লোরেন। তারপর কাঁধ থেকে ভারি রাইফেলটা নামিয়ে বগলের নিচে চেপে ধরলো শক্ত করে।

আবার চলা শুরু করলাম আমরা, তবে এবার অনেক ধীরে, মাঝে মাঝে ঝাই আর ঘাল থেমে দাঁড়িয়ে সামনের দুর্ভেদ্য ঘন কাঁটাঝোপগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। ঝোপগুলোর এত পাশে থাকায় পেট কামড়ে ধরার মত অনুভূতি হচ্ছিল আমার, প্রতিটা ধাপ ফেলা হচ্ছে শুধুমাত্র ঝাইয়ের চমৎকার গোলাপিরঙা হাতের তালুর ইশারায়। যখন হাত নড়ছে তখন আমরা আগাচ্ছি, যখন থেমে যাচ্ছে, আমরাও থেমে যাচ্ছি।

"আগান," হাত দিয়ে ইশারা করা হলো আর আমরা এগোতে গেলাম, কিন্তু আবার আচমকা–

"থামুন!" দ্রুত থেমে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হলো, ঝি-এর হাতটা তরবারি দিয়ে কোপানোর মত ভঙ্গি করছে, তারপর মুঠিবদ্ধ করে সামনের দিকে দেখালেন, কারণ কোনো শিকারের দিকে আঙুল তুলে দেখানোটা নাকি দুর্ভাগ্য ডেকে আনে।

আমরা মরার মত দাঁড়িয়ে রইলাম, চেহারা ঘেমে চকচক করছে, তাকিয়ে আছি সামনের কাঁটাঝোপের দেওয়ালের দিকে–তারপরেই আচমকা এই ধূসর কাঁটার ভেতরেই ভৌতিক ধূসর রঙা হাতিটা আবির্ভূত হলো, হেলেদুলে, অলস চালে দূরে সরে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে, বৃদ্ধ ধূসর চামড়া কুঁচকে আছে, পেট আর পেছনের পায়ের উরুসন্ধির কাছে আলগা হয়ে ঝুলে আছে থলের মত, লেজের চুল আর অবশিষ্ট নেই তেমন একটা, মেরুদণ্ডের হাড়গুলো উঁচু হয়ে আছে, শিরা বের হয়ে থাকা চামড়ার নিচে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সব। বুড়ো হাতি, বিশাল হাতি।

"তোমরা থাকো এখানে," ঝাই আমাকে আর ঘালকে দেখালেন, আমি বোঝার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম।

"আপনি আসুন আমার সাথে!" আঙুলের ইশারায় লোরেনকে ডাকলেন ঝাই, ওরা দুজন একসাথে এগিয়ে গেল। কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়েই ঘুরপথে হাতিটার পেট লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। লোরেনের বিশাল ধড়টার পাশে বুশম্যানকে নিতান্তই বাচ্চার মত লাগছে, হাতিটার কাঁধ বা মাথায় পরিষ্কার একটা গুলি করার মত জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন উনি লোরেনকে।

হাতিটা থেমে দাঁড়িয়ে, একটা ঝোঁপ থেকে খাওয়া শুরু করল। শুঁড় দিয়ে আলতো করে গাছের কচি, ফ্যাকাসে সবুজ ডালগুলো ভেঙে নিচ্ছে, তারপর সেগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে মুখের ভেতর, বিন্দুমাত্র টের পায়নি যে বিপদ আছে আশপাশেই। ইতিমধ্যে লোরেন ওটার পেট বরাবর গুলি করার মত একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। ও নিজেকে স্থির করল, পা ছড়িয়ে আছে দুপাশে, সামনে ঝুঁকে আছে যাতে বন্দুকের ধাক্কা সামলাতে পারে।

গুলির শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো, এই খরাপ্রবণ এলাকায়, নিঃসীম নীরবতায় চমকে উঠলো সবকিছু। মাংসে বুলেট গাঁথার থ্যাপ শব্দটা শুনতে পেলাম আমি, তবে হাতিটা ঘুরে গিয়ে সামলে নিল আঘাতটা। এখন ওটা সরাসরি লোরেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, হলুদ হয়ে আসা দাঁত তুলে রেখেছে উপরে, বিশাল ধূসর কান দুটো পেছনে টেনে রাখা। মানুষ দেখতে পেয়েই ডাক ছেড়ে উঠলো হাতিটা। এরপর রাগে চিৎকার করে শুরু করল ভীষণ জোরে, দীর্ঘদিন পুষে রাখা একটা ঘৃণা এতদিনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠে বিস্ফোরিত হলো যেন।

হাতিটা একদিকে সরে গিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করল, বিশাল পুরু একটা কাঁটাঝোপের আস্তরণের কারণে লোরেনের গুলির মুখ থেকে আড়াল হয়ে গেল প্রাণীটা। দেখলাম লোরেন ঘুরে অন্য এক পাশে সরে গেল, চেষ্টা করছে পরিষ্কারভাবে গুলি করার জন্য একটা খোলা জায়গা খুঁজে বের করতে। কিন্তু একটা অ্যান্ট-বিয়ারের গর্তে পা আটকে সামনের দিকে মুখ থুবড় পড়ে গেল ও, দৌড়াতে থাকার কারণে পতনটা হলো ভয়াবহ, রাইফেলটা হাত

থেকে ছুটে উড়ে গেল দূরে, একেবারে হাতিটার আক্রমণের পথে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো লোরেন, চমকে গিয়ে নড়ার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলেছে।

"লোরেন!" চিৎকার করে উঠলাম আমি, তারপর ওর দিকে দিলাম ছুট, হাতে শুধু একটা শটগান, সোজা একটা আহত মদ্দা হাতির আক্রমণের মুখ ঘুরিয়ে দিতে দৌড়াচ্ছিলাম আমি।

"এই দিকে!" দৌড়াতে দৌড়াতে হাতিটার দিকে চেয়ে চিৎকার করতে লাগলাম আমি। "এই দিকে!" চেষ্টা করছিলাম লোরেনের দিকে থেকে ওটার মনোযোগ ফিরিয়ে দিতে। চোখের কোনা দিয়ে দেখলাম লোরেন হাতে পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, ব্যথা সামলে চেষ্টা করছে ওর রাইফেলের দিকে পৌঁছাতে।

"হেই! হেই!" ফুসফুসের সমস্ত শক্তি একত্র করে চিৎকার করলাম আমি, ওটার মাথা দুলছে আমার দিকে, কুতকুতে চোখগুলো দিয়ে খুঁজছে, গায়ের গন্ধ তালাশ করছে শুঁড় দিয়ে।

আমি শটগানটা তুলে তিরিশ গজ দূর থেকে হাতিটার চোখ বরাবর তাক করলাম, আশা করছি কানা করে দিতে পারবো ওটাকে।

ধাম! ধাম! হাতিটার চেহারার ডান আর বাঁ দুই দিকেই গুলি করলাম; সঙ্গে সঙ্গে ওটা আমার দিকে ধেয়ে এল এবার। দিক বদলে জন্তুটাকে আমার দিকে তেড়ে আসতে দেখে বিশাল একটা স্বস্তি অনুভব করলাম, কারণ লোরেনের উপর থেকে নজর ফেরানো গিয়েছে ওটার—আমার উদ্দেশ্যই ছিল সেটা। কাঁপা হাতে আমি নতুন কার্ট্রিজের জন্য হাতড়াতে লাগলাম, ভালোমতোই জানতাম যে আবার গুলি ভরার আগেই ওটা আমার উপর এসে পড়বে।

"পালাও, বেন পালাও!" লোরেনের গলা শোনা গেল, জানোয়ারটার মাটির উপরে *দড়াম দড়াম* করে এগিয়ে আসার শব্দের চাইতেও অনেক জোরে চেঁচাচ্ছে ও। কিন্তু আমার পা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে, আমি সোজা হাতিটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলাম; তখনও বেকুবের মত কার্ট্রিজের জন্য হাতড়াচ্ছি, কিন্তু এই ধূসর মাংসের পাহাড়ে পেপারকর্ন ছোঁড়ার মতই অকার্যকর এখন বুলেটগুলো।

লোরেনের রাইফেলের গুলির আওয়াজ আমার অসাড় মস্তিষ্ককে ধাক্কা দিল, একবার—দুইবার, সশব্দে ওগুলো হাতির শরীরে বিদ্ধ হতেই ধূসর পাহাড়টা একটা হিমবাহের মত করে এসে পড়ল আমার উপর; মরে গিয়েছে, অতিরিক্ত পেকে যাওয়া ফলের মত ফেটে গিয়েছে মাথার খুলি।

পায়ে যেন শিকড় গজিয়ে গিয়েছে আমার, নড়তে পারলাম না একটুও; গা নড়িয়ে এড়িয়েও যেতে পারলাম না, ওটার বাইরে ছিটকে আসা শুঁড় প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল আমাকে। নিজেকে বাতাসে আবিষ্কার করলাম আমি,

মুহূর্ত পরেই নিষ্ঠুর মাটিতে আছড়ে পড়লাম ভীষণ জোরে, মাথার ভেতর রঙের ফুলঝুরি ছুটলো, মনে হলো কেউ আলোর ছুরি দিয়ে চাক চাক করে কাটছে আমার মস্তিষ্ক, তারপরেই জ্ঞান হারালাম।

"আস্ত একটা বুদ্ধু! ওহ শালার মদন!" লোরেনের গলা শুনতে পেলাম আমি, মনে হচ্ছিল যেন দীর্ঘ একটা সুড়ঙ্গের অপর প্রান্ত থেকে কথা বলছে ও, শব্দটা অদ্ভুতভাবে আমার মাথার ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ঠান্ডা ভেজা ভেজা পানির একটা ছিটা ভিজিয়ে দিল আমার চেহারা, ঠোঁটের উপর পানি পড়তেই চোখ মেললাম। লোরেন বসে আছে মাটিতে, আমার মাথাটা ওর কোলে শোয়ানো, একটা বোতল থেকে পানি ছিটাচ্ছে আমার চেহারায়।

"মদন বলছো কাকে?" খসখসে গলায় বললাম আমি, সাথে সাথে ওর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারায় স্বস্তির বন্যা বয়ে যাওয়ার যে অভিব্যক্তি দেখলাম, সেটা আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে পরিতৃপ্তিকর দৃশ্য।

সারা গায়ে ব্যথা করে উঠলো আমার, নড়তে পারছিলাম না; ঘাড় আর পিঠের খানিক জায়গায় ছড়ে গিয়েছে, বিশাল একটা আলু গজিয়ে গিয়েছে কপালে, যেটায় স্পর্শ করা মাত্র যন্ত্রণা হয়।

"হাঁটতে পারবে?" ব্যস্ত-বাগিশ ভঙ্গিতে বলে উঠলো লোরেন।

"চেষ্টা করতে পারি।" খুব বেশি ব্যথা অবশ্য ছিল না, আমি এমনকী আগ্রহ নিয়ে মৃত জানোয়ারটার ছবিও তুললাম। হাতিটা প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে স্থির হয়ে পড়ে ছিল, বিশাল হলুদ দাঁত দুটোয় ভর দিয়ে সোজা হয়ে আছে মাথাটা। লোরেন আর বুশম্যান ওটার মাথার উপর গিয়ে বসল।

"আজকে রাতে পাথরের পানির ওখানে থাকবো আমরা," ঝাই বললেন আমাকে। "কালকে ফিরে এসে দাঁতগুলো নিয়ে যাবো।"

"কতোদূর সেটা?" সন্দেহের সুরে বললাম আমি।

"কাছেই!" ঝাই আশ্বস্ত করলেন আমাকে। "খুবই কাছে।"

আমি তবুও অনিশ্চিতভাবে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলাম ওনার দিকে। পঞ্চাশ মাইল হাঁটা পথের ক্ষেত্রেও তাকে এই একই শব্দ ব্যবহার করতে শুনেছি।

"কাছে হলেই ভালো, নইলে খবর আছে," ইংরেজিতে বললাম আমি। অবাক হয়ে দেখলাম জায়গাটা আমার ধারণার চাইতেও বেশি কাছে! শুধু তা-ই না আরও এমন অনেক জিনিস দেখা গেল যেসব স্বপ্নেও দেখব বলে ভাবিনি!

আমরা একটা শৈলশিরা পার হলাম। আমি পার হলাম লোরেনের কাঁধে ভর দিয়ে। ওটার পরেই একটা বিশাল গ্রানাইটের চাকতি চোখে পড়ল আমাদের, বিশাল একটা বাঁকানো পাথরের টুকরো সেটা, কমপক্ষে চার একর তো হবেই। আমি একবার শুধু ওটার দিকে তাকালাম, দেখি পুরো উপরিভাগে

অগভীর ছোট ছোট অনেকগুলো গর্ত; সাথে সাথে আনন্দ-ধ্বনি বের হয়ে গেল মুখ দিয়ে। আচমকাই আমার আর লোরেনের সাহায্যের প্রয়োজন হলো না, দুজনেই প্রায় দৌড়ে নেমে এলাম পাথরটার উপর। ক্ষয়ে যাওয়া গর্তগুলো পরীক্ষা করতে করতে, খুশিতে খিলখিল করে হাসতে লাগলাম আমি।

"এটা তো দেখি বিশাল একটা, বেন," উল্লসিত কণ্ঠে বলল লোরেন। কতগুলো গর্ত আছে সেটার একটা আন্দাজ করল। "এক হাজার?"

"আরও বেশি!" আমি বললাম। "মনে হচ্ছে দুই হাজার।"

তবে উলঙ্গ ক্রীতদাসরা এখানে এই পাথরের উপর সারি বেঁধে হাঁটু গেড়ে বসে থাকত: সেকথা মনে পড়তেই আমি চুপ করে গেলাম। প্রতিটা গর্তের পাশে একজন করে, পাশের জনের সাথেও লোহার শেকল দিয়ে আটকানো থাকত সবাই, হাতে থাকত ভারি লোহার হামানদিস্তা, যেসব পাথরের টুকরোর ভেতরে স্বর্ণের আকরিক থাকার সম্ভাবনা ছিল, সেগুলোকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে গুঁড়ো করা ছিল ওদের কাজ।

কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম: ক্রীতদাসের মালিকরা সারির ফাঁক দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে আর হাতে চামড়ার চাবুক নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে যে পাথরগুলো মিহিভাবে গুঁড়ো হচ্ছে কিনা। দেখতে পেলাম সারি সারি ক্রীতদাস আকরিক ভরা বালতি মাথায় করে নিয়ে কাজের জায়গা থেকে ফিরছে। এই সবই এখানে হয়েছিল ২,০০০ বছর আগে।

"খনিটা কোথায়,তা ভাবছি," লোরেনের মাথায়ও আমার মত একই চিন্তা।

"আর পানি?" বললাম আমি। "স্বর্ণ ধুয়ে বের করার জন্য অবশ্যই পানির প্রয়োজন হতো।"

"আরে পানি দিয়ে কী হবে?" চেঁচিয়ে বলল লোরেন। "আমি চাই খনিটা, ওই আমলের লোকরা শুধু তিন আউন্স বা এর বেশি পরিমাণ ওজন হলেই স্বর্ণ সংগ্রহ করতো আর পানির স্তর বের হলেই বাদ দিয়ে দিতো খোঁড়া–এখানেই কোথাও শালার বিশাল একটা গুপ্তধন আছে।"

এভাবে করেই সব প্রাচীন খনিগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। আধুনিক যুগে মধ্য আফ্রিকায় যতগুলো খনিই আবিষ্কার হয়েছে, সবগুলোই সেই ২০০০ বছর আগের আবিষ্কার। তার কৃতিত্ব ওই আমলের ধাতুবিদ্যা বিশারদদের দক্ষতার। আধুনিক খনিবিদরা তাড়াহুড়ো করে এসব পরিত্যক্ত জায়গাগুলো উন্মোচন করতে গিয়ে প্রাচীন আমলের সব কর্মকাণ্ডের চিহ্নটাও মুছে ফেলেছে। আমি মনে মনে শপথ করলাম যে, ওই ডাকাতগুলো ওদের ড্রিল আর ডিনামাইট নিয়ে ঢোকার আগে অন্তত এই খনিটার ভেতরে আমি প্রথম প্রবেশ করবো।

পানি ছিল একটা পঞ্চাশ ফুট কুয়োর ভেতরে। পাথরের গায়ে সুন্দর করে কেটে বানানো সেটা। পাথরের ইট দিয়ে বানানো দেওয়াল-ও আছে। প্রাচীন

আমলের কুয়োগুলোর মধ্যে আমার দেখা এটাই সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন; বোঝাই যাচ্ছে বুশম্যানরা এটাকে যত্নেই রাখে, আমি ওটার উপর ঝুঁকে দেখতে লাগলাম; ঝাই তখন পাথরের ভেতরের একটা গোপন জায়গা থেকে একটা দড়ি আর চামড়ার বালতি নিয়ে এলেন। কুয়ো থেকে ঝকঝকে পরিষ্কার পানি তুললেন তিনি, তবে তাতে কয়েকটা মরা ব্যাঙ আর একটা ডুবে মরা ইঁদুর ভাসছে। এই পানির একটা ফোঁটাও মুখে তোলার আগে ফুটিয়ে নেব বলে শপথ করলাম।

লোরেন ঝাড়া তিরিশ সেকেন্ড প্রশংসার চোখে তাকিয়ে রইলো কুয়োটার দিকে, তারপর গ্রানাইটের দুটো খন্ডের মাঝের যে সরু জায়গাটা সেদিকে এগিয়ে গেল। আগ্রহভরে খুঁজতে খুঁজতে ওদিকের গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যেতে দেখলাম ওকে, মিনিট বিশেক পরে ওর ক্ষীণ চিৎকার কানে এল আমার।

"বেন! এদিকে এসো! তাড়াতাড়ি!" বহু কষ্টে, কুয়োটার গায়ে হেলান দেওয়া থেকে উঠে দাঁড়ালাম আমি, তারপর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

"পেয়ে গিয়েছি, বেন!" উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে লোরেন। আমি আবারও অভিভূত হলাম এটা দেখে যে স্বর্ণ সবচেয়ে মন্থর নাড়ির গতিকেও ঘোড়ার বেগে ছোটাতে পারে, সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ মানুষটাকেও বানিয়ে দিতে পারে সম্পদলিপ্সু। আমি নিজে তেমন বৈষয়িক মানুষ নই, কিন্তু লোরেনের পাশে দাঁড়িয়ে এই অতি প্রাচীন খনিটার দিকে তাকাতেই তার প্রলোভন ও জাদু আমার নিঃশ্বাসকেও দ্রুত করে দিল।

এমনিতে জায়গাটা দেখতে বিশেষ জাতের না, একটা অগভীর খাত, ওখানকার মাটির তিনফুট গভীরে খোঁড়া হয়েছে একটা পরিখা, পাড়টাও সেভাবে সমান করা না। গাছের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে মাটি কেটে বানানো একটা চলার পথ।

"খনির খোলা মুখ," বলল লোরেন। "এখান থেকে ওই পাহাড়ের গা পর্যন্ত চলে গিয়েছে।"

"তারপর আবার বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে।" আমি অ্যানসিয়েন্টদের এই আজব অভ্যাসটার ব্যাপারে মন্তব্য করলাম। ওরা কোনো জায়গা পরিত্যাগ করার আগে ওদের কাজের জায়গা আবার মাটি দিয়ে ভরে রেখে যেত। এই অগভীর পরিখাটা খোঁড়া হয়েছে খনিটা ভর্তি করার মাটি নেওয়ার জন্য।

"চলো," বলল লোরেন। "এটা কতদূর গিয়েছে দেখি।"

প্রায় মাইল দেড়েক আমরা গাছপালার ভেতর দিয়ে ওই পরিখাটা ধরে এগোলাম, কিন্তু এরপরে ওটা শেষ হয়ে গেল।

"এগুলো থেকে কোথায় মাটি নেওয়া হয়েছে সেটা যদি খুঁজে পাওয়া যেত–" বিড়বিড় করে বলল লোরেন। এরপর আমরা ওখানকার নানান

আকৃতির গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটা পাথরের স্তূপ খুঁজতে শুরু করলাম। "বা অন্তত একট আকরিকের টুকরো, যেটা ওরা খেয়াল করেনি।"

আমার পিঠ ব্যথা করছিল, তাই আমি একটা পড়ে থাকা গাছের গুড়িতে হেলান দিলাম বিশ্রাম নিতে, একাই খোঁজাখুঁজি চালিয়ে গেল লোরেন। গাছগুলোর ফাঁকে হারিয়ে গেল ও, এরকম একটা জায়গায় একা থাকার কারণে নিজের মধ্যে এই মুহূর্তে আমাকে ঘিরে রাখা একটা ঐতিহাসিক চেতনা উপভোগ করতে লাগলাম।

কুয়োর পানি পঞ্চাশ ফুট নিচে, সেখান থেকে আন্দাজ করলাম যে অ্যানসিয়েন্টরা নিশ্চয়ই ওই পর্যন্ত তাদের গর্তগুলো খুঁড়েছিল। তাদের কাছে কোনো পাম্প বা পানি নিষ্কাশনের যন্ত্রপাতি ছিল না, তাই মাটি থেকে পানি বের হওয়া শুরু হতেই ওদেরকে সেটাকে বুজিয়ে দিয়ে আরেকটা খনির সন্ধানে চলে যেতে হতো।

এই খনিটা একসময় ছিল একটা খোলা পরিখা, দেড়মাইল লম্বা, পঞ্চাশ ফুট গভীর আর ছয় ফুট চওড়া, হামানদিস্তা দিয়ে লোহার বাটালি আর পাথরে আটকানো লোহার গোঁজ পিটিয়ে মাটি খুড়ে বানানো হয়েছিল এটা। যখন দেখা যেত পাথর এত শক্ত যে কাজ হচ্ছে না, তখন ওরা পাথরটার উপর আগুন জ্বেলে টক ওয়াইন মেশানো পানি ঢালতো গরম তলে। ফলে পাথরটা ফেটে যেত। হ্যানিবাল[৪৪]ও আল্পস[৪৫]-এর উপর দিয়ে আসার সময়, ওনার হাতির দলের সামনে যদি এমন কোনো পাথর পড়তো, যা পার হওয়া সম্ভব না, তখন এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। তাই বলাই যায় যে এটা একটা কার্থেজিনিয়ান কৌশল। পাথরের টুকরোগুলো ভেঙে গুঁড়ো করে ওরা স্বর্ণের আকরিকের তাল বের করতো, তারপরে তুলে দিতো বালতিতে, সেগুলো চামড়ার দড়িতে করে তুলে আনা হতো মাটির উপরে।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ওরা আফ্রিকার মধ্য আর দক্ষিণ অঞ্চলের ৩০০,০০০ বর্গ মাইল এলাকা থেকে প্রায় ৭০০ টন কাঁচা সোনা উত্তোলন করে নেয়। সেই সাথে প্রচুর পরিমাণ লোহা, তামা আর টিন তো আছেই।

"তার মানে হচ্ছে বাইশ মিলিয়ন আউন্স সোনা, প্রতি আউন্স চল্লিশ ডলার হলে আটশো আশি মিলিয়ন ডলার।" জোরে জোরে হিসাব করলাম আমি, তারপর বললাম, "মাথা খারাপ করে দেওয়ার মত একটা অংক।"

"বেন, কোথায় তুমি?" লোরেন গাছের ফাঁক দিয়ে ফিরে এল আবার। "আমি এক টুকরো পাথর খুঁজে পেয়েছি।" হাতে একটা পাথরের টুকরো তুলে ধরে বলল আমাকে, তারপর আমাকে দেখতে দিল ওটা।

"কী মনে হচ্ছে দেখে?"

---

[৪৪]কার্থেজিনিয়ান সেনাপতি

[৪৫]পর্বত শ্রেণি

"ব্লু সুগার কোয়ার্টজ," বললাম আমি। তারপর ওটার উপরিভাগ ভেজাতে জিহ্বা দিয়ে একটা চাটা দিয়ে রোদে মেলে ধরলাম। "ওয়াও!" ওটার ফাঁকে আটকে থাকা স্বর্ণ আমার দিকে ভেজা আভায় ঝিলিক মেরে উঠতেই অবাক হলাম আমি, স্যান্ডউইচের ভেতরের মাখনের মতই স্ফটিকটার ফাটল আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিড়ের ভেতরে আটকে আছে স্বর্ণ।

"আসলেই ওয়াও!" লোরেনও সায় দিল। "ভালো জিনিস কিন্তু। আমি আমার লোকজনকে পাঠাবো পুরো এলাকাটা খুঁড়ে দেখার জন্য।"

"লো, আমার কথা ভুলে যেয়ো না," বললাম আমি আর ও ভ্রূ কুঁচকে ফেলল।

"তুমি অবশ্যই তোমার ভাগ পাবে, বেন। আমি কি কখনো–"

"বোকার মত কথা বোলো না, লো। আমি সেটা বলিনি। আমি শুধু চাচ্ছি না যে, আমি একটু দেখার সুযোগ পাওয়ার আগেই তোমার যন্ত্রপাতি দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলো জায়গাটা।"

"ঠিক আছে বেন, কথা দিচ্ছি," বলে হাসলো ও। "আমরা আবার যখন খনিটা খুলবো, তখন তুমি সবার আগে ঢুকবে ভেতরে।" স্ফটিকের তালটা হাতে নিয়ে উপরে ছুঁড়ে খেলতে লাগল ও। "চলো যাওয়া যাক। আমি এটাকে ভেঙে বের করে কেমন দাম হতে পারে সেই সম্পর্কে ধারণা নিতে চাই।"

গ্রানাইটের চাকতিটায় পাওয়া একটা বড় পাথরের টুকরোকে নিচে রেখে আর এক তাল আয়রনস্টোনকে হামানদিস্তা হিসেবে ব্যবহার করে লোরেন স্ফটিকের টুকরোটাকে মিহি গুঁড়োয় পরিণত করল। তারপর সেটাকে আমাদের রান্নার পাত্রটায় নিয়ে, কুয়োর জল দিয়ে নেড়ে ধুয়ে ফেলল পাথরের গুঁড়ো। প্রথমে পাত্রটাকে একটু চক্রাকারে ঘুরিয়ে, ভেতরের বালি পানির মিশ্রণকে একটু একটু করে পাত্রের কিনার দিয়ে উপচে ফেলে দিতে লাগল। প্রায় পনেরো মিনিট লাগল স্বর্ণের 'সূতাটা' আলাদা করতে। ওটা পাত্রের তলায় ঘুরপাক খেতে লাগল, চটচটে উজ্জ্বল হলুদ রঙ।

"সুন্দর," বললাম আমি।

"এরচেয়ে সুন্দর আর কিছু হয় না!" দাঁত বের করে হাসলো লোরেন। "পাঁচ আউন্স থেকে টন পর্যন্ত হতে পারে এগুলো।"

"শালা, আস্ত একটা টাকাখোর তুমি," খোঁচা দিলাম আমি।

"এভাবে দেখো ব্যাপারটা বেন," তখনও হাসছে ও, "এখান থেকে পাওয়া লাভটাই হয়তো তোমার ইনস্টিটিউটকে আরও বিশ বছর টিকিয়ে রাখবে। তুমি যেমন ভাবো–অর্থই অনর্থের মূল, সবসময় সেরকম হয় না ব্যাপারটা। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।"

"আচ্ছা, ঠেলবো না," কথা দিলাম আমি ওকে।

কুয়োটার পাশে রাতের বিছানা করলাম আমরা। হাতির সিদ্ধ জিহ্বা আর আলু দিয়ে ভুরিভোজ হলো। কম্বল না নিয়ে আসায় আগুন জ্বেলে রেখে

ব্যবস্থা করা হলো উষ্ণতার। পরেরদিন সকালটা গেল হাতির দাঁত কাটতে কাটতে। ওগুলো আমরা পাথরের বিশাল একটা স্তূপের নিচে লুকিয়ে রাখলাম যাতে হায়েনারা খুঁজে না পায়। ল্যান্ড রোভারটার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে দিতে দুপুর পেরিয়ে গেল।

পথের মাঝে আবারও রাত নামলো, তবে পরদিন সকাল নাগাদ ল্যান্ড রোভারের কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। আমার গোড়ালিতে আঙুরের সমান বড় বড় ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল, সাথে ফোলা আর কাটা জায়গাগুলো টনটন করতে লাগল খুব। ল্যান্ড রোভারের প্যাসেঞ্জার সিটে ঠাস করে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

"আজকের আগ পর্যন্ত আসলে কখনোই ইন্টার্নাল কম্বাস্টন ইঞ্জিনের মহিমা সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারিনি আমি," কৃতজ্ঞ চিত্তে ঘোষণা দিলাম আমি। "আমাকে এখন বাড়ি নিয়ে যেতে পারো, জেমস।"

ঝাই আর তার ছোট্ট গোত্রটাকে এই বিরান প্রান্তরে অনন্ত যাযাবর জীবনে রেখে ফিরে এলাম আমরা। রওনা হওয়ার আটদিন বাদে আবার পা পড়ল মুন সিটিতে। রোদে পুড়ে, ধুলো জমে কয়লা হয়ে গিয়েছি দুজনেই; গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ধুলো ময়লায় জট পাকিয়ে গিয়েছে চুল। লোরেনের দাড়ি দেখা গেল লাল-সোনালিতে মেশানো, সূর্যের আলোয় ঝিলিক মারতে লাগল তা।

প্রায় তিনদিন দুনিয়ার সাথে কোনো যোগাযোগ ছিল না লোরেনের, সেটার জরিমানা-ও হলো ভয়াবহ। রেডিয়োতে মেসেজের বিশাল একটা স্তূপ জমে ছিল ওর জন্য, ফলে গোসল বা শেভ করার আগেই ওকে ঘণ্টাখানেক রেডিয়োর পাশে কাটাতে হলো, ওর অনুপস্থিতিতে যেসব অতি জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সেগুলোর ব্যবস্থা করতে।

"আমার এখুনি লবণের খনিগুলোর ওখানে একবার যাওয়া দরকার," রেডিয়োর ঘরটা থেকে বের হতে হতে আমাকে বলল লোরেন। "এখন বাজে চারটা ত্রিশ। এখনও পৌঁছানো সম্ভব।" বলে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ও, তারপর শক্ত হয়ে গেল চেহারা। "চুলোয় যাক সব! আরও একটা রাত এখানে থাকবো আমি। গোসলে যাচ্ছি, আমার জন্য একটা গ্লেন গ্রান্টের বোতল বের করো দেখি।"

"এইবার ভালো কথা বলেছো।" হাসলাম আমি।

"অল দ্য ওয়ে, পার্টনার।" আমার কাঁধে ঘুষি মারলো ও।

"অল দ্য ওয়ে, লো," আশ্বস্ত করলাম আমি ওকে।

আমরা অনেক গল্প করলাম, অল্প-স্বল্প গানও গাইলাম, মাঝরাতের পর পর্যন্ত হুইস্কি খেলাম সবাই মিলে।

"শুতে চলো!" বলল লোরেন, তারপর উঠে দাঁড়াতে গিয়েও থেমে গেল আবার। "বেন, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে যে আমাকে ওই হোয়াইট কিং-এর কয়েকটা ছবি সাথে নিয়ে যেতে দেবে।"

"অবশ্যই, লো।" আমি সামান্য টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে অফিসের দিকে এগিয়ে গেলাম। ফাইলগুলোর ভেতর থেকে কয়েকটা নয়-বাই-ছয় ইঞ্চি চকচকে ছবি বের করে লোরেনের কাছে ফিরে এলাম আবার। আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ও ছবিগুলোতে নজর বুলাতে লাগল।

"এই ছবিটায় কী হয়েছে, বেন?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও, তারপর আমার হাতে ধরিয়ে দিল সেটা।

"কী? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"চেহারাটা দেখো, বেন। একটা দাগ দেখা যাচ্ছে।"

তখন আমি দেখতে পেলাম; একটা আবছা কালোমতো কাটা দাগ, রাজার ফ্যাঁকাসে সাদা চেহারাটার জুড়ে। আমি কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখলাম সেটা। বেশ অবাক লাগল আমার। আগে এটা খেয়াল করিনি–গরম রুটির মাঝের কাটা ধূসর দাগের মত লাগছে দেখতে।

"এটা মনে হয় প্রিন্টিং-এর গণ্ডগোল, লো," আন্দাজ করলাম আমি। "অন্যগুলোয় আছে?"

লোরেন অন্যগুলোও পরীক্ষা করে দেখলো তাড়াতাড়ি।"নাহ, শুধু ওটায়।"

আমি আবার ছবিটা ফেরত দিলাম ওকে। "তারমানে প্রিন্ট করার সময়েই ঝামেলা হয়েছে।"

"আচ্ছা," আমার ব্যাখ্যা মেনে নিল লোরেন। "গুড নাইট।"

আমি আরও একটা গ্লাস ঢেলে নিলাম, স্যালিসহ অন্যেরা লোরেনের সাথেই উঠে গেল আসর ছেড়ে। আমি খুব ধীরে-সুস্থে পান করতে লাগলাম, একাকী বসে, গুহাটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে খুঁজে দেখার জন্য আমি আর লোরেন যেসব পরিকল্পনা ফেঁদেছিলাম সেসব আবার ভেবে দেখলাম।

স্বীকার করছি যে হোয়াইট কিং-এর চেহারার দাগ নিয়ে আমি আর একটুও ভাবিনি। এবারে আমার অজুহাত হচ্ছে আমি একটু বেশিই মদ খেয়ে ফেলেছিলাম সেদিন।



পরের দুই মাস কোনদিক দিয়ে উড়ে গেল টেরও পেলাম না। র‍্যাল আর আমি দিনরাত উজাড় করে গুহাটার মেঝে খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখলাম।

অগ্রগতি ছিল অবাক করার মত, তবে সেটা আবিষ্কারের স্বল্পতার দিকে দিয়ে। গুহাটা কখনোই মানুষের থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, এখানে কোনো ছাইয়ের স্তূপ বা উনুনের চিহ্নও নেই। এক জায়গায় শুধু পশুর

বিষ্ঠা জড়ো করা দেখতে পেলাম, সেটা একদম নিচের বেডরক পর্যন্ত বিস্তৃত। বেডরক-এর উপরে আমরা একটা বর্গাকৃতির কাটা পাথর পেলাম–এই ছিল আমাদের মোট আবিষ্কার।

আমাদের খোঁড়াখুঁড়ির কারণে নাড়িভুঁড়ি বের হওয়া একটা চেহারা হলো গুহাটার। নিচের বেডরকটা অসমান চুনাপাথরের, তাই আমি আবারও খোঁড়া জায়গাগুলো বুজিয়ে দিয়ে সমান করে দিলাম মাটি। তারপর সেই প্রাচীন আমলের কাটা পাথরের চাঁইগুলো ব্যবহার করে এমারেল্ড দীঘিটার চারদিকে পাড় বানিয়ে দিলাম। কাজটা আমি করলাম এখানকার ভবিষ্যৎ দর্শনার্থীদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। কারণ এটার কথা একবার জানাজানি হলে, বুশম্যান চিরকর্মের এই অসাধারণ গ্যালারিটা দেখতে সারা দুনিয়া থেকে লোক আসবে।

আমাকে দেওয়া কথা মত, হাতি শিকার করতে গিয়ে আমাদের আবিষ্কৃত ওই প্রাচীন খনিটা পুনঃখননের জন্য কোম্পানি প্রস্তুত হতেই, লোরেন আমাকে রেডিয়ো করল। একটা হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে, প্রায় তিন সপ্তাহ ওখানে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কাটালাম।

আমাদের ধারণামতো পানির স্তরের নিচেই খনির তলদেশ খুঁজে পেলাম; যদিও দৈর্ঘ্য বরাবর খনির ভেতরের উচ্চতা ব্যাপক রকম হেরফের করল, তবুও গড়ে সেটা ছিল অস্বাভাবিকরকম বেশি। নিজের অবৈষয়িক চেতনা সত্ত্বেও, মনে মনে আমি খনিটায় আমার নিজের দশ ভাগ মুনাফার কথা ভেবে খুশি হয়ে গেলাম। আমরা প্রায় কয়েকশো হাতিয়ার আর জিনিসপত্র উদ্ধার করলাম, বেশিরভাগই খনিতে কাজ করার যন্ত্র। প্রায় সবগুলোই ছিল ভয়ানক মরচে পড়া লোহার নেহাই বা শাবল, পাথরের হাতুড়ি, শেকলের ভাঙা অংশ, কয়েকটা খুবই ভালো অবস্থায় সংরক্ষিত...আঁশ দিয়ে বানানো ঝুড়ি, এবং সেই পুঁতি এবং মাটির জিনিস।

এগুলোর ভেতরে আঁশের ঝুড়িগুলো পেয়ে খুশি হলাম খুব, ল্যাবরেটরিতে ওগুলোর কার্বন-১৪ ডেটিং করে দেখা সম্ভব হলো। এগুলো সেই মহা অগ্নিকাণ্ডের কিছুদিন আগের, এমনকী সমসাময়িকও হতে পারে; এতে করে হাতির খনিটার সাথে মুন সিটিরও একটা সংযোগ স্থাপিত হলো।

যাই হোক, হাতির খনিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ছিল পনেরোটা মানুষের কঙ্কাল। ওই কাটা পরিখাটার সবচেয়ে গভীর অংশে একটা পুঁতির মালার মত করে সাজানো ছিল কঙ্কালগুলো। লাশগুলো এমন নিয়মিতভাবে সাজানো যে, ওরা যে মাটিধ্বসে মারা গিয়েছে সেই ধারণা সাথে সাথেই বাদ হয়ে যায়। যদিও কঙ্কালগুলো উপরের মাটির চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে, আমি এর মাঝেও বের করতে পারলাম যে এদের পাঁচজন নারী আর দশজন পুরুষ। সবারই বয়স হয়েছিল, একজনের আর্থ্রাইটিস-এরও আলামত

পেলাম। একজনের কনুইয়ের নিচ থেকে হাত নেই, কিন্তু হাড়টা আশপাশে দেখা গেল না কোথাও, তার মানে হচ্ছে আগে থেকেই নেই হাতটা। প্রায় সবারই দাঁত হারিয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেটা লাশেই লোহার শিকলের চিহ্ন পেলাম। আর সব মিলিয়ে যে ছবিটা দাঁড় করালাম তা হচ্ছে খনিটা বুজিয়ে ফেলার আগে পনেরো জন বয়স্ক, দুর্বল ক্রীতদাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে খনির নিচে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

যা যা পেলাম সেগুলোর তালিকা করে, প্যাকেট করে ইনস্টিটিউটে পাঠানোর পরে আবার ফিরে এলাম মুন সিটিতে। পৌঁছেই চলে গেলাম গুহায়। যেমনটা ভেবেছিলাম, গিয়েই দেখি স্যালি কাজে মগ্ন সেখানে। ও নিজেই এগিয়ে এসে চুমু খেলো আমাকে, কিন্তু মনে হলো না যে আমাকে দেখে আলাদাভাবে খুশি হয়েছে।

"ওহ, বেন। অনেক মিস করেছি আপনাকে।" বলেই সাথে সাথে ও একটা কৌশলগত ব্যাপারে আলোচনায় চলে গেল। ওর কথার জবাবে উত্তর দিতে থাকলেও, আমার মন বুশম্যানের চিত্রকর্ম ছেড়ে চরে বেড়াতে লাগল অন্য কোথাও।

আমার চোখে ভাসছিল কথা বলার সময় ও কীভাবে নাক কুঁচকে ফেলছিল, বা কীভাবে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গালের উপর এসে পড়া চুলগুলো সরাচ্ছিল। আমার সমগ্র সত্তা ওর প্রতি ভালোবাসায় তড়পাতে শুরু করল। পেটের ভেতর মনে হলো একটা ভয় খামচে ধরছে। মুন সিটিতে আমাদের কাজ প্রায় শেষ; জোহানেসবার্গে, ইনস্টিটিউটের চার দেওয়ালের মাঝে ফিরে যাবো শীঘ্রই। আমি ভাবছিলাম আমার আর স্যালির সম্পর্কের উপর সেটার কী প্রভাব পড়বে।

"আমরা খুব তাড়াতাড়িই এখান থেকে চলে যাবো, স্যাল।" ভাবনাকে প্রকাশ করলাম আমি।

"জানি," সায় দিল ও, সাথে সাথে সামলে নিল নিজেকে। "ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যায়। এখানে এত্ত ভালো লাগে যে...কীভাবে থাকবো জানি না!"

আমরা চুপচাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর স্যালি উঠে দাঁড়িয়ে হোয়াইট কিং-এর প্রতিকৃতির সামনে গিয়ে মুখ ভার করে তাকিয়ে রইলো, বুকের উপর শক্ত করে হাত বেঁধে রেখেছে।

"কতো কিছু জানতে পারলাম এখান থেকে আমরা," বলে একটু থামলো ও, তারপর আবার বলল, "আবার তার চাইতেও বেশি কিছু জানা হলো না। ঠিক যেন মেঘের পেছনে দৌড়ানোর মত, মাঝে মাঝে মনে হতো, এই বুঝি সব রহস্য ধরেই ফেললাম।" বলতে বলতে রাগের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল ও। "এখনও অনেক কিছু আমাদের জানা বাকি, বেন। সেগুলো আমরা জীবনেও জানতে পারবো না।"

মেয়েটা ঘুরে আমার কাছে ফিরে এল আবার; আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে হাত দুটো হাঁটুর উপর রেখে, চেয়ে রইলো আমার চেহারার দিকে।

"আপনি কি জানেন না যে আমরা কোনো প্রমাণ খুঁজে পাইনি, বেন? আপনি কি বুঝতে পারছেন,যে আমরা এখানে এমন কোনো কিছু খুঁজে পাইনি যেটা পুরনো যুক্তি ব্যবহার করেই বাতিল করে দেওয়া যাবে না?" ও আরও ঝুঁকে এল আমার দিকে। "একটা পাত্রের গায়ে একটা প্রতীক পেয়েছি শুধু। ওরা বলবে বাণিজ্যের সময় বিনিময় হয়েছিল সেটা। আমাদের আছে স্বর্ণের পাত্র, ওরা বলবে হয়তো এখানকার স্বর্ণকারেরা নিজেরা নকশা করতে গিয়ে আঁখ-এর মত নকশা করে ফেলেছে। আমাদের আছে এই চিত্রকর্মগুলো–ওরা বলবে এই সব অন্যের দেখা জিনিস কোনো প্রমাণ না।"

ও আবার পিঠ বাঁকা করে পিছিয়ে গিয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

"এখানকার সবকিছু খুঁড়ে বের করে আলাদা করার পরে আমরা কি পেয়েছি জানেন, বেন? আমরা পেয়েছি বিশা-আ-আ-ল বড় একটা ডিম।"

"জানি," ধরা গলায় বললাম আমি।

"আমরা এমনকি একটা কিছুও পাইনি যা দিয়ে ওদেরকে ওদের জায়গা থেকে নড়াতে পারবো। আমাদের এই সিটি অভ দ্য মুন–এই সুন্দর শহরটাকে আরও একটা অজ্ঞাত বান্টু শহর হিসেবে আখ্যা দেওয়া হবে, আমরা এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবো না। আমরা কখনোই জানতে পারবো না বিশাল বিশাল দেওয়াল আর মিনারগুলোর কী হলো, আমাদের হোয়াইট কিং কোথায় সমাহিত আছেন, সেটাও জানা হবে না কখনো।"



আগস্টের ১ তারিখে খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধ করে দেব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম, তাই জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ আমরা ব্যয় করলাম জায়গাটা একটু গুছিয়ে রাখার কাজে। ফাউন্ডেশনগুলো উন্মোচিত অবস্থাতেই রেখে দিলাম, যাতে আমাদের পরে কেউ আসলে তাদের সুবিধা হয়। অনেক যত্ন নিয়ে আমাদের উদ্ধারকৃত জিনিসগুলো প্যাক করলাম, গাদা গাদা নোটবুকে সবগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধকরণ সম্পন্ন করা হলো, প্রস্তুত করা হলো বিশাল লম্বা একটা তালিকা। এর বাইরে টুকটাক আরও হাজারটা কাজ–শেষ করা হলো সব।

মাঠ পর্যায়ের খোঁড়াখুঁড়ি শেষ, কিন্তু আমার সামনেই রাখা আছে কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফসল, যা যা আবিষ্কার হয়েছে, তার সবকিছুর বিস্তারিত বর্ণনা আর ওগুলোর মাঝের মিল করার চেষ্টা–প্রতিটা জিনিসকে তার যথাযথ

স্থানে বসিয়ে অন্যান্য জায়গায় পাওয়া নানান প্রমাণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর সব শেষে বাকি থাকলো এর সারমর্ম করে একটা বই প্রকাশ করা। অনেক মাস আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম আমার বইয়ের নাম হবে*The Phoenicians in Southern Africa*, কিন্তু এখন আমাকে অন্য একটা নাম ঠিক করতে হবে।

জিনিসপত্রের প্রথম চালান নিতে চলে এল ডকোটা বিমানটা, পিটার আর হিদার উইলকক্সও গেল সেগুলোর সাথে। ওরা এখনও দুই কি তিনমাস ইউরোপে ছুটি কাটাতে পারবে। ওদেরকে যেতে দেখে মনে খারাপ হয়ে গেল সবার, কারণ সবাই মিলে খুবই আনন্দে ছিলাম আমরা।

সেই সন্ধ্যায় লোরেন রেডিয়োতে কথা বলল আমার সাথে।

"অবশেষে কস্তিয়াউকে বাগে পেয়েছি, বেন। ও এখন প্রশান্ত মহাসাগরে বেড়াচ্ছে, আমার স্যান ফ্রান্সিস্কোর অফিস থেকে কথা বলেছে ওর সাথে। ও তো বলল সাহায্য করতে পারবে, কিন্তু আগামী বছরের আগে ওর পক্ষে সময় দেওয়া সম্ভব হবে না। আগামী আট মাস ওর শিডিউল খালি নেই।"

মুন সিটিতে থাকার শেষ অজুহাতটাও গেল। আমি আমার ব্যক্তিগত কাগজপত্র গোছানো শুরু করে দিলাম। স্যালি সাহায্য করতে এল আমাকে। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করলাম আমরা, হাজার হাজার ছবির ভেতর থেকে বাছাই করলাম প্রথমে। থেকে থেকে বিশেষ কোনো ছবি চোখে পড়লে কাজ থামিয়ে সেটা নিয়ে আলাপ করলাম কিছুক্ষণ, বা ওগুলো তোলার সময়ের মজার কিছু মনে করে হাসলাম। গত কয়েক মাসের আনন্দযজ্ঞকেই স্মরণ করতে লাগলাম মূলত।

সবার শেষে হাত লাগালাম হোয়াইট কিং-এর ছবিগুলোতে।

"আমার সুন্দর রহস্যময় রাজা," দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যালি। "তোমার কি আমাদেরকে আর কিছুই বলার নেই? কোথায় বাড়ি তোমার? কাকে ভালোবাসতে তুমি? কোন কোন যুদ্ধে সুন্দর ওই ঢালটা নিয়েছিলে সঙ্গে? আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলে কে কাঁদতে কাঁদতে তোমার কাটা জায়গা পরিষ্কার করে দিতো?"

আমরা ধীরে সুস্থে বিশাল স্তূপটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। প্রতিটা দিক থেকে তোলা হয়েছে ওগুলো, কমিয়ে বাড়িয়ে সব ধরনের আলো ব্যবহার করে, এক্সপোজার আর প্রিন্টিং-এর সবগুলো ধরন ব্যবহার করে।

একটা ছবির একটা জিনিস নজর কাড়লো আমার। আমার মনে হলো যেন অবচেতন মন আমাকে বাধ্য করল সেটা খেয়াল করতে। আমি তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে, আমার চোখ প্রথমবারের মত খেয়াল করল জিনিসটা। আমার মনে হলো ভেতরে একটা খাঁচায় আটকানো পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে যেন, একটা শিহরণ অনুভব করতে লাগলাম সারা শরীরে।

"স্যাল," ডাক দিয়েই আবার থেমে গেলাম আমি।

"কী হলো, বেন?" আমার কম্পিত কণ্ঠের মাঝের চাপা উত্তেজনা টের পেয়েছে ও।

"আলো!" বললাম আমি। "মনে আছে আমরা কীভাবে চাঁদের আলোয় এই শহরটা খুঁজে পেয়েছিলাম? আলোর তীব্রতা আর কোণ ব্যবহার করে।"

"হ্যাঁ," আগ্রহভরে মাথা ঝাঁকালো ও।

"তুমি কি এটা দেখেছো, স্যাল?" আমি হোয়াইট কিং-এর চেহারায় টোকা দিলাম। "লোরেনকে যে আমি একটা ছবি দিয়েছিলাম? ওটার মধ্যে একটা দাগ ছিল মনে আছে?"

ও তাকিয়ে রইলো ছবিটার দিকে। লোরেনেরে ছবিটার চাইতে এটায় আরও অস্পষ্ট দাগটা, তবে বোঝা যাচ্ছে, ধবধবে সাদা চেহারাটার উপর আবছায়া একটা কাটা দাগ।

"কী এটা?" দ্বিধান্বিত গলায় বলল স্যালি। হাতের মাঝে নানান দিকে নেড়ে-চেড়ে স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করছে।

"জানি না," বলতে বলতে আমি যন্ত্রপাতি রাখার তাকটার কাছে গিয়ে খুঁজতে শুরু করলাম, "তবে জিনিসটা খুঁজে বের করবো নিশ্চিত।"

তাক থেকে একটা চার ব্যাটারির টর্চ এনে ধরিয়ে দিলাম স্যালিকে। "এটা নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসো, ওয়াটসন[৪৬]।"

"আমরা দেখি রাতের বেলায় ভালো কাজ দেখাই," বলা শুরু করতে গেল স্যালি, তারপর *কী* বলছে বুঝতে পেরে বলল, "আমি ওসব কিছু বোঝাচ্ছি না!" ফলে আমার আর অশ্লীল মন্তব্য করা হলো না।

ঠিক একটা প্রাচীন সমাধির মতই নিস্তব্ধ হয়ে আছে গুহাটা, আমাদের পদশব্দ পাথুরে মেঝেতে প্রচণ্ড জোরে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল। আমরা দীঘিটা পেরিয়ে হোয়াইট কিং-এর প্রতিকৃতির কাছে চলে এলাম। টর্চের আলো তার চেহারার উপর ফেলতেই বরাবরের মত রাজকীয় আর টানটান ভঙ্গিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইলো সে।

"চেহারায় তো কোনো দাগ নেই," স্যালি বলল। ওর কণ্ঠের হতাশা টের পেলাম আমি।

"দাঁড়াও।" পকেট থেকে একটা রুমাল বের করলাম আমি। ওটাকে ভাঁজ করলাম দুইবার, তারপর আমার টর্চের সামনে চেপে ধরলাম সেটা। উজ্জ্বল আলো কাপড়ের ভেতর দিয়ে পার হয়ে একটা স্থির আভায় পরিণত হলো। আগে থেকেই ওখানে রাখা কাঠের ছোট সিঁড়িটায় উঠে গেলাম আমি।

"তোমারটা বন্ধ করো," স্যালিকে বললাম আমি, তারপর আধা অন্ধকারে সিঁড়িটা বেয়ে উঠে রাজার চেহারাটা অনুজ্জ্বল আলোয় পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম।

---

[৪৬]শার্লক হোমসের সহকারী

গালটা সাদা, কোনো খুঁত নেই। ধীরে ধীরে আলোটা নাড়তে লাগলাম–উপরে, নিচে, রাজার চেহারার চারপাশে চক্রাকারে।

"ওই তো!" ফ্যাকাসে চেহারাটায় আচমকা অস্পষ্ট দাগটা ভেসে উঠতেই, আমরা দুজনেই বলে উঠলাম একসাথে। আমি স্থির অবস্থানে আলোটা ধরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম দাগটা।

"এটা একটা ছায়া, স্যাল," বললাম আমি। "ছবির নিচের পাথর মনে হয় অসমান। মনে হচ্ছে একটা খাঁজ, না না, দুটো খাঁজ, একটা আরেকটার ভেতর দিয়ে গিয়ে গুণ চিহ্নের মত হয়ে আছে।"

"পাথরের ফাটল?" জিজ্ঞেস করল স্যালি।

"সম্ভবত," বললাম আমি। "কিন্তু দাগগুলো একদম সোজা, প্রাকৃতিক জিনিস এরকম নিখুঁত হয় না।"

আমি টর্চের সামনের আলো সরিয়ে তাকালাম ওর দিকে।

"স্যাল, তোমার সাথে সিল্কের কিছু আছে?"

"সিল্ক?" অবাক হয়ে বলল ও, তবে সামলে নিল সাথে সাথেই। "আমার স্কার্ফ।" বলতে বলতে গলায় হাত দিয়ে দেখালো ও।

"আমাকে একটু দাও, প্লিজ।"

"কী করবেন?" জানতে চাইলো ও। ব্লাউজের গলা দিয়ে বের হয়ে থাকা, সুন্দর কাপড়ের টুকরোটার উপর আমার দৃষ্টি থেকে বাঁচানোর ভঙ্গিতে হাত মেলে রেখেছে। "খাঁটি কার্ডিন এটা, মেলা টাকা খরচ হয়েছে কিনতে।"

"নষ্ট করবো না," আশ্বস্ত করলাম ওকে।

"যদি করেন তাহলে নতুন একটা কিনে দিতে হবে," ওটার বাঁধন খুলতে খুলতে আমাকে সাবধান করল ও। তারপর আমার হাতে ধরিয়ে দিল।

"লাইট ধরো এদিকে," আমি অনুরোধ করতেই ও হাতের টর্চের আলো রাজার চেহারার উপর ফেলল। আমি স্কার্ফটাকে রাজার চেহারার উপর মেলে ধরলাম, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে চেপে ওটাকে জায়গা মত ধরে রাখছি।

"কী করছেন একটু বলবেন?" জানতে চাইলো ও।

"যদি তুমি কখনো কোনো সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনতে চাও, অথচ নিশ্চিত হতে চাও যে গাড়িটা কখনো অ্যাকসিডেন্ট করেনি, তাহলে খালি চোখে দেখা যায় না এরকম সব খুঁত তুমি এভাবে বের করতে পারবে।"

আমার ডান হাতের আঙুলের মাথা দিয়ে সিল্কের কাপড়টার উপর দিয়ে কাটা জায়গাটার উপর বুলাতে লাগলাম। কাপড়টার কারণে আমার আঙুল পাথরের উপর দিয়ে সহজেই নড়তে লাগল, তাতে নিচের খাঁজটা আরও ভালোমতো লাগতে লাগল হাতে। একটা খাঁজের মত হাতে বাঁধলো, ওটা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা চৌমাথা পেলাম, সেটা ধরে দক্ষিণে এগিয়ে পেলাম আরও একটা চৌমাথা। ওখান থেকে পূর্ব, উত্তর হয়ে আবার ফিরে এলাম

যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানে। আমার আঙুলের মাথায় একটা আয়তাকার আকৃতি ধরা পড়ল, যার ক্ষেত্রফল মোটামুটি নয় বাই ছয় ইঞ্চি।

"কিছু বুঝতে পারছেন?" স্যালি আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। আমি ওর কথার জবাব দিতে পারলাম না, কারণ আমার মনে হচ্ছিল আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসেছে। আমার আঙুল তখনও ব্যস্ত, সিল্কের নিচে পুরো পাথর জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রতিকৃতি থেকে অনেক দূর পর্যন্ত হাতিয়ে দেখলাম, একেবারে মেঝে পর্যন্ত প্রায়, উপরে আমার হাত যতদূর গেল।

"ওহ, বেন। কিছু তো বলুন! কী পেলেন?"

"দাঁড়াও!" আমার হৃৎপিণ্ড তখন চমকে ওঠা উড়ন্ত ফিঙ্গে পাখির মত লাফাচ্ছে। হাতানোর উত্তেজনায় আঙুলের মাথা কাঁপছে তিরতির করে।

"আর দাঁড়াতে পারবো না, ধূর ছাই," চেঁচিয়ে উঠলো ও। "বলুন এখনই!"

আমি সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে ওর হাত ধরে টান দিলাম। "আসো।"

"কোথায় যাবো?" জানতে চাইলো ও।

আমি ওকে গুহার ভেতর দিয়ে টেনে নিতে নিতে বললাম, "ক্যামেরা আনতে।"

"কী কাজে লাগবে?"

"ছবি তুলবো!"

একটা ছোট ঠান্ডা কেবিনেটে, দুই রোল Kodak Ektachrome Aero-film type 8443 রাখা আছে আমার। ওখানেই সবসময় রাখি সব। আমি এই ইনফ্রারেড ফিল্মগুলোর অর্ডার দিয়েছিলাম শহরের যেসব ফাউন্ডেশনে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়নি, পাহাড়ের উপর থেকে সেগুলোর ছবি তুললে কেমন আসে তা দেখার জন্য। তবে ছবিগুলো তেমন ভালো হয়নি মোটেও। আসলে অনেকগুলো পাথরের স্তর আর প্রচুর গাছপালা থাকায় বোঝা যাচ্ছিল না কিছুই।

আমি আমার Rolleiflex ক্যামেরায় একটা ফিল্মের রোল ভরলাম, তারপর একটা ১২ নাম্বার Kodak Wrattenফিল্টার লাগালাম লেন্সের সামনে। পুরোটা সময় স্যালি ঘ্যান ঘ্যান করেই চললো, কিন্তু ওর সব জিজ্ঞাসার জবাবে আমি একটা উত্তরই দিলাম, "সবুরে মেওয়া ফলে।"

দুটো আর্ক-লাইট নিলাম সাথে, মাঝরাতের একটু পরে আবার গুহায় ফিরে এলাম আমরা।

দীঘির পাশে পানির পাম্পের সুইচ বোর্ডে আর্ক-লাইটের প্লাগ লাগিয়ে সোজা আলো ফেললাম প্রতিকৃতিটার উপরে। তারপর ট্রাইপডে ক্যামেরা বসিয়ে স্পিড আর অ্যাপারচার পরিবর্তন করে প্রায় বিশটার মত ছবি

তুললাম। ততোক্ষণে কৌতূহলে স্যালির মরবার দশা, তাই ওর উপর দয়া পরবশ হয়ে বলে দিলাম সব।

“এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্যানভাসের ছবি তুলে, ছবির রঙের আড়ালে ঢাকা পড়া স্বাক্ষর বা অন্য কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা হয়। আকাশ থেকে মেঘের ভেতর দিয়ে ছবি তুলতে, বা সাগরের ঢেউয়ের ভেতরের কিছুর ছবি তুলতে–মানুষের খোলা চোখে ধরা পড়ে না এমন কিছুর ছবি তোলার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়।”

“শুনতে তো জাদুর মত লাগছে।”

“সেটাই,” পটাপট ছবি তুলতে তুলতে বললাম আমি। “ফিল্টার ইনফ্রারেড ছাড়া বাকি সব কিছুই শুষে নিচ্ছে, ফিল্মটা ইনফ্রারেডকেই ধরতে পারে। এতে করে যেদিকে ধরা হচ্ছে সেখানের যে কোনো গঠন বা তাপমাত্রার পরিবর্তন ধরা পড়বে, তবে সেটুকুর ছবি উঠবে অন্য কোনো রঙে।”

ডার্ক রুমে ঘণ্টাখানেক কাজ করার পরে আমাদের ভিউইং স্ক্রিন-এ প্রজেক্টরে ফেলতে পারলাম ছবিগুলো। কোনো কিছুরই আসল রঙ আসেনি ছবিতে, সবই দেখতে অদ্ভুত–যেন জাহান্নামের আগুন জ্বলছে সবখানে। রাজার চেহারা কটকটে সবুজ রঙের উঠেছে, দাড়ি উঠেছে বেগুনি। অদ্ভুত সব ফুটকি, ছোট বড় দাগ দেখা যেতে লাগল–যেগুলো আমরা আগে কখনোই খেয়াল করিনি। ছবির পেছনের পাথরও মসৃণ না, আঁকার রঙের বাইরেও কিছু আছে ওখানে, এর বাইরে লাইকেনসহ[৪৭] আরও কিছু বাইরের জিনিস দেখা গেল। সবকিছু বিচিত্র সব রঙে জ্বলজ্বল করছে।

এগুলোর কিছুই চোখে পড়েনি আগে। তবে যে জিনিসটা আমার সব মনোযোগ কেড়ে নিয়ে আবার আমার হৃৎস্পন্দনকে ঘোড়ার বেগে ছুটিয়ে দিল, সেটা হচ্ছে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র, যা পুরো প্রতিকৃতি জুড়ে ঝাঁঝরির মত তৈরি করেছে। যেন একটা এলোমেলো চেকার বোর্ড; ফ্যাঁকাসে নীল রঙে দেখা যাচ্ছিল ওগুলো।

“এখন যত দ্রুত সম্ভব লোরেনকে লাগবে এখানে,” ঠাস করে বলে বসলাম আমি।

“কী এটা? এখনও বুঝতে পারছি না আমি। এটার মানে কী?” অনুনয় করল স্যালি, আমি অবাক হয়ে চাইলাম ওর দিকে। ব্যাপারটা আমার কাছে এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, আমি ভেবেছিলাম ও-ও বুঝে ফেলবে দেখামাত্রই।

“এর মানে হচ্ছে, স্যাল, আমাদের হোয়াইট কিং-এর পেছনে পাথরের দেওয়ালে আসলে একসময় একটা ফোঁকর ছিল, যেটা কোনো দক্ষ রাজমিস্ত্রি কাটা চুনাপাথরের টুকরো দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছে। এরপর হোয়াইট কিং এঁকে দেওয়া হয়েছে এর উপরে।”

---

[৪৭]ছত্রাক শৈবালের মিশ্রণে এক প্রকার গাছ



লোরেন স্টারভেসান্ট গুহার ভেতরের পাথরের দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে রাগত চেহারায় তাকিয়ে আছে হোয়াইট কিং-এর দিকে। কোমরের পেছনে বেঁধে রেখেছে হাত। পায়ের গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ও, চোয়াল বের হয়ে আছে আক্রমণাকভাবে। আমরা ওকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছি র‍্যাল, স্যালি, লেসলি আর আমি; সবার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

আচমকা লোরেন নিজের মুখ থেকে সিগারটা নিয়ে সজোরে আছাড় মারলো পাথুরে মেঝেটায়। তবুও মনের ঝাল না মেটায় জুতো দিয়ে পিষলো কিছুক্ষণ। তারপর পাই করে ঘুরে এমারেল্ড দীঘির ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওটার পানির দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলাম।

আবার ফিরে এল ও, পোকা যেমন আগুনের প্রতি আকর্ষিত হয়, লোরেনও তেমনি প্রতিকৃতিটার আকর্ষণ এড়াতে পারছে না।

"এই জিনিসটা হচ্ছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম," বলল লোরেন। "দুই হাজার বছর বয়স এটার। এটার তুলনা নেই, অমূল্য জিনিস।"

"হ্যাঁ," বললাম আমি।

"এটার মালিক আমরা না। এটা ঐতিহ্যের অংশ। আমাদের সন্তান, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা এখনও জন্মায়নি, তাদেরও অধিকার আছে এর উপর।"

"জানি সেটা " বললাম আমি। কিন্তু এরপরেও কিছু ব্যাপার ছিল। বিগত কয়েক মাস ধরে নিজের চোখেই দেখেছি যে প্রতিকৃতিটার প্রতি লোরেনের আবেগ কীভাবে একটু একটু করে বেড়েছে। ওর কাছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কিছু একটায় পরিণত হয়েছে ছবিটা, কিন্তু সেটা কি তা আন্দাজ করা ছাড়া উপায় নেই।

"আর তুমি বলছো এটাকে ভেঙে ফেলতে হবে," লোরেন বলল।

আমরা কেউই কোনো কথা বললাম না। লোরেন আবারও ঘুরে গিয়ে পায়চারি করা শুরু করল, একবার প্রতিকৃতিটার দিকে আসছে আবার ফিরে যাচ্ছে। ওর সাথে সাথে আমাদের মাথাও আগুপিছু করতে লাগল, ঠিক টেনিস খেলার দর্শকদের মত। আমার সামনে এসে হুট করে থেমে দাঁড়ালো আচমকা।

"তোমার ওই বালছালের ছবি তোলার অভ্যাসের জন্যেই," বলল ও, তারপর আবার হাঁটা শুরু করল।

"আচ্ছা, একটা কাজ করলে–" ভয়ে ভয়ে বলতে গেল লেসলি, কিন্তু এটুকু শুনে লোরেন হাঁটা থামিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাতেই মিইয়ে গেল ওর গলা।

"কী?" জানতে চাইলো লোরেন।

"মানে, এটার পেছন দিক দিয়ে যাওয়া যায় না? মানে হচ্ছে–" আবার মিইয়ে গেল ওর গলা। তবে সাথে সাথেই আবার বলে উঠলো, "হোয়াইট কিং-এর এক পাশের দেওয়ালে ড্রিল করা হোক, এরপর ওদিক থেকে রাজার পেছনে যাওয়া যাবে না?"

জীবনে প্রথমবারের মত আমার ইচ্ছে করল ওর গলা জড়িয়ে ধরে চকাস চকাস করে চুমু খাই।

লোরেন ওর খনি বিশেষজ্ঞ একজনকে ডেকে নিয়ে এল এখানে, সাথে ওয়েলকামের কাছের লিটল সিস্টার স্বর্ণ খনি থেকে পাঁচজন মাশোনা পাথর শ্রমিককে। সাথে করে এয়ার-কম্প্রেসর, নিউম্যাটিক ড্রিল মেশিন, জাম্পার বারসহ কাজে লাগে এরকম যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে এল ওরা। খনি বিশেষজ্ঞ লোকটা বিশাল আকৃতির, আদার মত চুলের রঙ, ঝুমকা ফুলের মত নীল চোখজোড়া সবসময় হাসছে, সাথে বাচ্চাদের মত গালে ছুলির দাগ। নাম হচ্ছে টাইনাস ভ্যান ভারেন। আসা মাত্রই জানপ্রাণ দিয়ে লেগে পড়ল নিজের কাজে।

"ধরে নিন, দেওয়ালটা কাটা কোনো ব্যাপারই না, ডক্টর। আমি যেসব সার্পেন্টাইন পাথর আর স্ফটিক ভাঙ্গি, তার তুলনায় এই বেলেপাথর একেবারে পনিরের মত।"

"যতোটা ছোট করে সম্ভব ফুটো করবেন," কড়া গলায় ওকে বলল স্যালি। "দেওয়ালের ছবিগুলোর যেন ন্যূনতম ক্ষতি হয়।"

"চিন্তা করবেন না," আন্তরিক ভঙ্গিতে টাইনাস ওর দিকে চাইলো। "আমি তো একেবারে ইন্দুরের–" শব্দটা বলতে গিয়েও থেমে অন্য একটা শব্দ বলল ও। "কানের ফুটোর সমান একটা ছিদ্র করবো।"

স্যালি আর আমি গুহার দেওয়ালে ফুটো কোথায় হবে সেটা মেপে দিলাম। খুবই সতর্কতার সাথে এমন জায়গা বাছাই করেছি যেখানে কোনো সুন্দর বা গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর্ম নেই। যদিও আমরা টাইনাসের কথাকে আমলে নিয়ে মাত্র দুই ফুট বাই চার ফুটের একটা জায়গা নির্ধারণ করেছি–তবুও একটা দুর্দান্ত সুন্দর জিরাফের দল, বিশাল কানঅলা একটা নাদুসনুদুস হরিণ-এর ছবি নষ্ট হবে।

হোয়াইট কিং থেকে তিরিশ ফুট দূরে বাছাই করলাম ফুটো করার জায়গাটা, যাতে ড্রিলের কম্পনে ওটা থেকে রঙের গুঁড়ো বা পাথরের কুচি খসে না পড়ে আবার। টাইনাস তিরিশ ফুট পর্যন্ত ফুটো করবে, তারপর ডান দিকে ঘুরে রাজার পেছন পর্যন্ত চলে যাবে। পরদিন সকালেই প্রথম কাজ হবে

এটা, তবে সেই রাতে আমরা কমন রুমে মজা করলাম ওকে সাথে নিয়ে। সবার ভাব-দৃষ্টে মনে হচ্ছিল যেন অগ্নি নির্বাপক দলের কোনো বিপজ্জনক কাজে যাওয়ার আগ মুহূর্ত। টেনশনের কারণে হড়বড় করে কথা বলতে লাগলাম আমরা, সবাই স্বাভাবিকের চাইতে একটু বেশিই পান করে ফেললাম।

যেমন, টাইনাস এমনিতে খুবই কম কথা বলছিল, বোঝাই যাচ্ছিল যে কিংবদন্তীতুল্য লোরেন স্টারভেসান্টকে এত কাছে থেকে দেখতে পেয়ে শ্রদ্ধায় কথা বের হচ্ছিল না ওর। কিন্তু ব্রান্ডি পেটে পড়তেই ওর চলনে ঢিল পড়ে ফড়ফড় করে কথা বের হতে লাগল।

"রেসপিরেটর কেন চাচ্ছেন আপনি, ডক?" জিজ্ঞেস করল ও। "গ্যাস বা আগুন লাগতে পারে বলে ভাবছেন নাকি?"

"রেসপিরেটর?" লোরেন স্যালির সাথে আলাপ করা বাদ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। "রেসপিরেটর কে আনতে বলেছে?"

"ওরাতো আমাকে আলাদাভাবে ছয়টা রেসপিরেটরের কথা বলেছে," লোরেনের সরাসরি এরকম প্রশ্নে ভড়কে গেল টাইনাস। "ওরা বলেছে আমাকে, স্যার।"

"হ্যাঁ, লো।" বেচারাকে উদ্ধার করলাম আমি। "আমিই আনতে বলেছি।"

"কেন?"

"কারণ আমরা আশা করে আছি যে একটা পথ হয়তো পাবো, একটা–" আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে সমাধি, তবে আমি চাইলাম না মুখে বলে দুর্ভাগ্য টেনে আনতে, "–গুহা বা এরকম কিছু।"

মাথা ঝাঁকালো লোরেন। সবাইকেই দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে–আর এরকম সাড়া দেওয়া শ্রোতা পেলে আমি আবার একটু জ্ঞান দেওয়ার লোভ সামলাতে পারি না।

"ওই গুহাটা প্রায় দুই হাজারেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ, তার মানে হচ্ছে, ওখানে কিন্তু একটা বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে–"

"ফারাওদের অভিশাপ!" বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো স্যালি। "যারা প্রথম তুতেনখামেন[৪৮]-এর সমাধিতে ঢুকেছিল তাদের কি পরিণতি হয়েছিল জানেন নিশ্চয়ই?" ও নিজের গলার উপর ছোরা চালানোর ভঙ্গি করে ভয়ঙ্করভাবে চোখ ঘোরাতে লাগল। ওর দুই নম্বর গ্লেন গ্রান্ট চলছিল তখন।

"স্যালি, তোমার অন্তত এসব বলা উচিত না," আমি দ্রুত থামিয়ে দিলাম ওকে। "ফারাওদের অভিশাপ একটা কিংবদন্তী। তবে এখানে আজব, কিন্তু কষ্টদায়ক ফুসফুসের কোনো রোগ হওয়াটা অসম্ভব না।"

---

[৪৮]একজন ফারাও

"যাই হোক, আমি অবশ্য এসব অভিশাপ বা এর মত অন্য সব আজগুবি কথায় বিশ্বাস করি না," বলে হাসলো টাইনাস, একটু বেশিই জোরে। সকল সংকোঁচ অনেক আগেই ছেড়ে গিয়েছে ওকে।

"আমিও এই দলে," র‍্যাল ডেভিডসন সায় দিল।

"এটা কোনো কুসংস্কার না," নিরুত্তাপ গলায় ওদেরকে বলল লেসলি। "ছত্রাকজনিত রোগ।"

পরিস্থিতি পুরো আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে বোঝা গেল। তাই আমি গলা চড়িয়ে দিলাম।

"তোমাদের কথা যদি শেষ হয়, তাহলে আমি কিছু বলি," শুনে আবার সবাই মনোযোগ দিল আমার দিকে। "দেয়াল ফুটো করার পরে ক্রিপ্টোকক্কাস নিউরোমাইসিস *(cryptococcusneuromyces)* রোগটা হওয়ার জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হবে, এটা একটা মিথোজীবী ছত্রাক। এর বাতাসবাহিত রেণু প্রাণঘাতী একটা রোগ সৃষ্টি করে।"

"কী হয়ে এটায়?" জিজ্ঞেস করল টাইনাস।

"রেণুগুলো ফুসফুসে চলে যায়, ওখানকার উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে প্রায় সাথে সাথে অঙ্কুরিত হয়ে ঘন গুচ্ছ গুচ্ছ কলোনি গড়ে তোলে।"

"এহহে," চরম বিরক্তি প্রকাশ করে বলল টাইনাস। "মানে বলতে চাচ্ছেন একটা বাসি রুটিতে যেমন সবুজ সবুজ গজায়, সেরকম ফুসফুসের ভেতরেও হবে?"

"হওয়ার পরে কী হয়?" জানতে চাইলো লোরেন।

আমি একেবারে নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিলাম। "প্রথমে ফুসফুসের ভেতর ক্ষত হয়, তারপর শুরু হয় রক্তক্ষরণ, জ্বর আসে আর নিঃশ্বাসের গতি বেড়ে যায়...এরপর শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। কিন্তু এরপরে ছত্রাকগুলো বর্জ্য উৎপাদন শুরু করে, যেগুলো সহজেই রক্তে মিশে যায়। এরপর সেই বিষ চলে যায় মস্তিষ্কে আর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে।"

"মাই গড!" টাইনাসের চেহারা ভয়ের চোটে সাদা দেখাতে লাগল, দাগে ভরা মুখটা থেকে চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে। "তারপর?"

"বিষটা ভয়ানক একটা নিউরোটক্সিন। আক্রান্ত রোগী উল্টাপালটা দেখা শুরু করে। মস্তিষ্কের পর্দায় প্রদাহ হয়, মারাত্মকরকম মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। লাইসার্জিক অ্যাসিড বা মেসক্যালিন-এ যেরকম হয় অনেকটা সেরকম।"

"সেই তো!" বলে উঠলো র‍্যাল, লেসলি ওর পায়ে লাথি হাকালো একটা।

"মানে বলতে চাচ্ছেন মাথা খারাপ হয়ে যাবে?" টাইনাস জানতে চাইলো।

"খুলির ভেতরের সবকিছুই আক্রান্ত হবে," স্যালি নিশ্চিত করল ওকে।

"রোগী মারা যায়?" লোরেন জিজ্ঞেস করল।

"পচাত্তর ভাগ ক্ষেত্রে। বেঁচে যাওয়া নির্ভর করে আক্রান্তের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আর অ্যান্টিবডি তৈরির ক্ষমতার উপর।"

"যদি বেঁচে-ও যায়, কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয়?"

"যক্ষা ভালো হলে যেমন ফুসফুসে দাগ পড়ে যায় সেরকম হয়।"

"ব্রেন ড্যামেজ?"

"না," মাথা নাড়লাম আমি।

"হায় হায়," সাবধানে বলল টাইনাস, গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো তারপর। "এখন আর কাজটা করার সাহস পাচ্ছি না। পাথর ভেঙে পড়া, মিথেন গ্যাস, বিস্ফোরণ–এগুলো নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু এই ছত্রাকের ব্যাপারটা," বলতে বলতে থেমে গেল ও। "ব্যাপারটা ভূতুড়ে। এক্কেবারে নির্জলা নিখাদ ভূতুড়ে।"

"কী কী সতর্কতা নিতে চাচ্ছো, বেন?" জিজ্ঞেস করল লোরেন।

"প্রথম যারা ঢুকবে তারা রেসপিরেটর পরে ঢুকবে," ব্যাখ্যা করলাম আমি। "তারপর আমি বাতাস আর ধুলোর নমুনা নিয়ে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখবো।"

লোরেন মাথা ঝাঁকিয়ে টাইনাসের দিকে চেয়ে হাসলো।

"খুশি?"

"দেখা গেল, পরীক্ষা করে খুঁজে পাননি–কিন্তু ওরা ভেতরে ওঁৎ পেতে থাকলো? আমরা ঢোকার পরে হামলা করল, ওই যে সায়েন্স ফিকশনে যেমনটা দেখায়," টাইনাস বলল।

"যদি থেকে-ও থাকে, তাহলে ঘন হয়ে থাকবে। প্রতিটা ধুলোর নমুনায় পাওয়া যাবে। মাইক্রোস্কোপে ধরা পড়বেই। তিনটা কালো কালো গোল্লার মত দেখা যায়, বন্দকি দোকানের প্রতীকের মত।"

"আপনি নিশ্চিত, ডক?"

"অবশ্যই, টাইনাস।"

লম্বা একটা শ্বাস নিল টাইনাস, ইতস্তত করল একটা মুহূর্ত, তারপর মাথা ঝাঁকালো। "ঠিক আছে, ডক। আপনার কথা মেনে নিচ্ছি," বলল ও।



পাথরের ড্রিল মেশিনের ক্রমাগত কান ফাটানো আওয়াজ আমার যন্ত্রণাকাতর মস্তিষ্ককে খুলির আরও ভেতরে সেঁধিয়ে দিতে লাগল। মনে হলো ব্রেইনটা একটু পরে মোরব্বা হয়ে যাবে। আগের রাতে আমাদের পার্টি শেষ হতে হতে ভোর হয়ে গিয়েছিল।

"এখন কেমন লাগছে, ডক?" টাইনাস ভ্যান ভারেন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিলাম সেদিকে এগিয়ে এসে, এই তালা লাগানো শব্দ ছাপিয়েই চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল। গিটারের তারের মত কাঁপছিল আমার স্নায়ু। টাইনাসকে এমন তরতাজা আর বাচ্চা বাচ্চা লাগছিল যে মনে হলো রাতের বেলা ও গরম দুধ আর মধু খেয়ে টানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠেছে বুঝি। এরকম আরও লোককে চিনি আমি–লোরেন এদের একজন।

"প্রচণ্ড জঘন্য লাগছে, ধন্যবাদ," আমিও চেঁচিয়ে জবাব দিলাম।

"আগামী দুই দিনের আগে এখানে দেখার মত কিছু পাবেন না," টাইনাস জানালো আমাকে। "আপনি গিয়ে বিশ্রাম করেন বরং, ডক।"

"এখানে থাকতেই ভালো লাগছে," বললাম আমি, কিন্তু দেখা গেল সবারই ইচ্ছে সেরকম। লোরেন রেডিয়ো শ্যাকে বসে বসে স্টারভেসান্ট সাম্রাজ্যের সবকিছু চালানোর চেষ্টা করতে লাগল, মুন সিটি থেকে দূরে রাখতে পারছে না নিজেকে। স্যালি জিনিসপত্রের তালিকা আর গোছানোর বৃথা চেষ্টা করল কিছুক্ষণ, কিন্তু দেখা গেল এক দুই ঘণ্টার বেশি মন টানছে না। সব ফেলে চলে এল গুহার ভেতর। র‍্যাল আর লেসলি অবশ্য কোনো ভণিতা করতে গেল না, গুহার ভেতরেই কাটালো সারাদিন, শুধু মাঝে কিছুক্ষণের জন্য গায়েব হয়ে গেল দুজন–আমি আর লোরেন অনুমান করলাম যে সেটা নড়া-চড়া করে হাত-পা খেলাবার জন্য।

টাইনাস নিজ-কাজে সেরাদের একজন, দারুণ দক্ষতার সাথে ওর দলটা সুড়ঙ্গ কেটে ফেলতে লাগল। একেবারে মসৃণ আর নিখুঁত হলো সুড়ঙ্গের দেওয়ালগুলো। ভারি ভারি গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঠেকনা দিয়ে রাখা হলো দেওয়াল, ছাদ জুড়ে বসিয়ে দেওয়া হলো ইলেকট্রিক বাতি। তিরিশ ফিট সুড়ঙ্গ কাটার পর, টাইনাস একটা বিশাল কুঠুরি তৈরি করল–ওখান থেকে নতুন আরেকদিকে কাটা শুরু হলো এরপর, এবার কাটা হবে হোয়াইট কিং-এর পেছন বরাবর।

টাইনাস আর আমি খুব সতর্কতার সাথে সব হিসাব আর মাপজোক করেছি, মোটামুটি নিশ্চিত যে ওই ইটের দেওয়ালের পেছনের জায়গাতেই যেটাই থাকুক, সেখানে পৌঁছতে পারবো।

বান্টু ড্রিলকর্মীদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল রেসপিরেটর ব্যবহার করার জন্য, শেষের কয়েক ফুট পাথর কাটা শুরু হতেই, টাইনাস আর আমি ওদের পেছনে পাথরের ভাঙ্গা টুকরোর আড়ালে হাটু গেঁড়ে বসে পড়লাম আবদ্ধ সুড়ঙ্গটার ভেতরে। ওদের কারো ঊর্ধ্বাংশেই কাপড় নেই, ড্রিল করা শুরু করতেই পিঠের কালো কালো পেশী ঝলসে উঠলো যেন। আবদ্ধ জায়গায় সামান্য শব্দও বজ্রপাতের মত লাগতে লাগল, যদিও ভেন্টিলেশন ফ্যান বাতাস প্রবাহিত করছে কিন্তু ভেতরে গরম লাগতে লাগল ভয়াবহ

রকমের। আমার রেসপিরেটরের মুখোশ বেয়ে ঘাম গড়াতে লাগল, বাষ্প জমে ঝাপসা হয়ে গেল চোখের অংশটা।

সময়ের সাথে এই টানটান উত্তেজনা একসময় পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ালো, ড্রিলের লম্বা লম্বা ইস্পাতের দাঁত পাথরের গায়ে কামড় বসিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকে যাচ্ছে, ছিদ্র দিয়ে পিচ্ছিলকারক তরল ছিটকে পড়ছে চারপাশে। পাশেই টাইনাসের দিকে তাকালাম আমি। কালো রাবার মাস্ক পরায় দানবের মত লাগছে ওকে, তবে চোখের চশমার পেছনে নীল চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে বোঝা গেল। আমার দৃষ্টি খেয়াল হতেই একটা চোখ টিপে বুড়ো আঙুল তুলে আশ্বস্ত করল আমাকে।

আচমকাই ড্রিল ধরে রাখা লোকটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, যেন ড্রিল মেশিনটা তার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে। নিজের তৈরি গর্তে বাধাহীনভাবে পিছলে এগিয়ে গেল ড্রিলটা, কর্মী পাগলের মত তাল সামলানোর চেষ্টা করতে লাগল, কারণ অতিকায় ড্রিলটার ওজন ধরে রাখা চাট্টিখানি কথা না। টাইনাস লোকটার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ড্রিল বন্ধ করার সুইচ টেনে ধরলো। এবার নীরবতাও কানে বাজতে লাগল প্রচণ্ড আকারে, আমাদের ঘন নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল শুধু।

অবশেষে, মনে মনে বললাম আমি, *ঈশ্বরই জানেন আমরা কীসের ভেতর ফুটো করে ফেলেছি।*

টাইনাসের নীল চোখেও আমি আমার নিজের উত্তেজনাটা দেখতে পেলাম। লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাতেই সে ঘুরে ড্রিল কর্মীদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে আঙুলের ইশারায় বোঝালো যে কাজ শেষ। ওরাও ফিরে গিয়ে নিচু সুড়ঙ্গের কাছটায় মাথা নিচু করে বেরিয়ে বাঁকের আড়ালে হারিয়ে গেল।

আমরা দুজন সামনে এগিয়ে ছিদ্রটার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসলাম। প্রথমে ড্রিলের দাঁতটা বের করে আনলাম খুশি মনেই, ওটার সাথে সাথে মিহি ধুলোর কণা ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে, ইলেকট্রিক বাতির নগ্ন আলোয় ধোঁয়াশার সৃষ্টি করতে লাগল তা। আমি আর টাইনাস দৃষ্টি বিনিময় করলাম। তারপর আবার আমি মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করলাম ওকে। টাইনাস-ও সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে, ওর দলবল যেদিকে গিয়েছে সুড়ঙ্গ ধরে সেদিকে চলে গেল। এরপর আমিই ছিদ্রটার সামনে বসে একা কাজ করতে লাগলাম।

লম্বা একটা প্লাস্টিকের দণ্ড ব্যবহার করলাম আমি, একটা সাদা জীবাণুমুক্ত কাপড় আটকানো ওটার এক প্রান্তে। ড্রিলের ছিদ্রটার ভেতর কাঠিটা ঢোকাতে লাগলাম যতটা সম্ভব। প্রায় চোদ্দফুট যাওয়ার পর কিছু একটায় আটকালো ওটা, আবার টেনে নিয়ে আসতেই দেখি প্রান্তের কাপড় ধূসর ময়দার মত ধুলোয় ভরা। নমুনা সংগ্রহের বোতলে ভরে রাখলাম ওটা, তারপর প্রান্তে আরেকটা কাপড় আটকে নিলাম। সব মিলিয়ে আলাদা আলাদা

ছয়টা নমুনা সংগ্রহ করলাম আমি, তারপর টাইনাসের যাওয়া পথে ফিরে গেলাম আবার। সুড়ঙ্গের মাঝের কুঠুরিটায়, একটা বেঞ্চ আর মাথা বাঁকানো যায় এরকম একটা বাতি প্রস্তুত রাখা হয়েছে আমার জন্য। লাইটের নিচেই মাইক্রোস্কোপ, ওটার কলকব্জা ঠিকঠাক করে, মাত্র কয়েক মিনিটের মাঝে নিয়ে আসা ধুলোর নমুনা একটা স্লাইডে লাগিয়ে স্মিয়ার তৈরি করে তার উপর লাল বর্ণের রঞ্জক ছড়িয়ে দিলাম।

ঝাপসা হয়ে আসা গগলসের কারণে মাইক্রোস্কোপের আইপিসের ভেতর দিয়ে ঠিকমতো দেখতে সমস্যা হতে লাগল। একবার দ্রুত নিরীক্ষণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবুও আমি ছয়টা নমুনাই পরীক্ষা করে দেখে নিলাম। কাজ শেষে আমার রেসপিরেটরটা টান দিয়ে খুলে নিয়ে বুক ভরে স্বস্তির দম নিলাম কয়েকটা। এক ছুটে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে মূল গুহায় চলে এলাম তারপর।

ওখানে সবাই অপেক্ষা করছিল আমার জন্য, আমি যেতেই আগ্রহ ভরে ঘিরে ধরলো আমাকে।

"ড্রিল করে একটা কুঠুরি পাওয়া গিয়েছে," চিৎকার করে বললাম আমি, "আর ওটা সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত!"

সবাই ঝাপিয়ে পড়ল আমার উপর, পিঠের উপর দমাদ্দম চাপড় আর হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল একযোগে, উত্তেজনায় হড়বড় করে কথা বলছে আর হাসছে।



আমাকে বাদে আর কাউকে লোরেন ওই ছিদ্রটার কাছে কাজ করার অনুমতি দিল না, যদিও র‍্যাল আর স্যালিকে দেখে বোঝা গেল যে আক্ষরিক অর্থেই ওদের হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে।

আমরা দুজন মিলে খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করতে লাগলাম, একটা চার পাউন্ডের হাতুড়ি আর বাটালি দিয়ে একটু একটু করে চেঁছে বড় করতে লাগলাম ছিদ্রটা। একসময় একটা ইটের গাঁথুনি নজরে এল আমাদের। লাল বেলেপাথরের বিশাল একটা চাঁই ছিল সেটা, আমাদের কেটে বানানো ছিদ্রটার উপর থেকে নিচ, এবং দুই পাশের দেওয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। বোঝা গেল যে ড্রিল আসলে কুঠুরির বাইরের সীমানাটাই ছিদ্র করেছে শুধু।

ওটার মাঝ বরাবর কাটা ড্রিলের ছিদ্রটা আসলে একটা চোখবিহীন অক্ষিকোটর বলে মনে হলো। ছিদ্রের ভেতর দিয়ে দেখার জন্য প্রচেষ্টার পুরষ্কার স্বরূপ এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার স্বাগত জানালো আমাদেরকে। শেষমেশ মনকে সান্ত্বনা দিয়ে এই দুঃসহ ধীরগতির প্রচেষ্টাই মেনে নিতে হলো।

টানা তিন দিন যাবত আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলাম, কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে, ধৈর্য সহকারে খুদে খুদে পাথরটাকে ছিদ্র করতে লাগলাম, গ্লাভস পরে থাকা সত্ত্বেও হাতে ফোসকা পড়ে দগদগে হয়ে পড়ল, চামড়ার ছাল উঠে গেল। ধীরে ধীরে আমরা বিশাল চাঁইটার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ বরাবর পুরোটা বের করে ফেললাম। দেখা গেল দুই পাশেই ঠিক ওটার মতই দেখতে দুটো পাথরের চাঁই, ওগুলোর সবগুলো মিলে মাথার উপর একই রকম প্রকাণ্ড একটা পাথরের পাতের ভার বহন করছে।

আমরা দুটো পঞ্চাশ টনের হাইড্রোলিক জ্যাক লাগালাম উপরের পাথরের কড়িকাঠটার ওজন বহনের জন্য, যাতে দেওয়ালের পাথরের টুকরোটা মুক্ত হয়। তারপর আমরা চাঁইটার গায়ে ছিদ্র করে প্যাঁচানো বল্টু বসিয়ে সেগুলোতে ইস্পাতের শিকল লাগিয়ে দিলাম। সুড়ঙ্গের ভেতর দুটো ইস্পাতের এইচ সেকশন বসিয়ে দিলাম শেকলগুলো আটকানোর জন্য। তারপর দুটো ভারি চাকাঅলা কপিকল ঘুরিয়ে দিয়ে টেনে টেনে চাঁইটাকে ওটার জায়গা থেকে সরিয়ে আনা শুরু করলাম।

পাশাপাশি হাঁটু গেঁড়ে বসলাম আমরা, দুজনেই একটা করে কপিকল ধরে টানছি, একবারে এক আঙটা করে টানার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কপিকলের চাকা প্রতিবার *কট* করে উঠতেই শেকলের উপর টান বাড়তে লাগল, একসময় টানটান হয়ে সোজা ইস্পাতের দণ্ডের মত শক্ত হয়ে গেল শেকলটা। কপিকলের হাতল আর ঘোরানো অসম্ভব হয়ে পড়ল বলা যায়।

"আচ্ছা বেন, দুজনে মিলে একটায় হাত লাগাই চলো," হাঁফাতে হাঁফাতে বলল লোরেন। ওর স্বর্ণালি কেশরাজি ঘাম আর ধুলোয় কালো আর চটচটে হয়ে লেপ্টে আছে খুলির সাথে, বিশাল কাঁধের পেশীগুলো ভরে আছে ঘামে। দুজনে মিলে এবার একটা কপিকল ধরে টান দিতেই বাইসেপস পেশী ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

'কট!' করে শব্দ হলো চাকায়, শেকলটা এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের একভাগ এগিয়ে এল।

'কট!' আবারও নড়লো সেটা। নীরবতায় আমাদের নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আর হিসহিসানি শোনা যেতে লাগল শুধু।

"অল দ্য ওয়ে, পার্টনার," আমার পাশে দাঁতে দাঁত চেপে বলল লোরেন।

"অল দ্য ওয়ে, লো," বলতে বলতে আমার শরীর একটা টেনে ধরা ধনুকের মত বেঁকে গেল, মনে হতে লাগল আমার পিঠের পেশীগুলো ছিড়ে যাচ্ছে যেন, চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়েই আসবে।

তারপরেই মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ করে বিশাল পাথরের চাঁইটা একটু একটু করে সুড়ঙ্গমুখ থেকে আলগা হয়ে গেল, খানিক বাদেই বিকট শব্দ করে আছড়ে পড়ল সুড়ঙ্গের মেঝেতে, ওটার পেছনেই দেখতে পেলাম একটা চৌকো খোলা প্রবেশপথ।

আমরা পাশাপাশি শুয়ে রইলাম মেঝেতে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, চেহারা আর শরীর বেয়ে দরদর করে বইছে ঘামের নহর, প্রচণ্ড পীড়নের কারণে শরীরের পেশীগুলো তখনও কাঁপছে থেকে থেকে। তবে সেসব ভুলে আমরা তাকিয়ে রইলাম অশুভ অন্ধকার গর্তটার দিকে।

কেমন একটা কটু গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। একটা বাসী, বহুদিন আগের নষ্ট হয়ে যাওয়া, শুকনো গন্ধ–কারণ প্রায় ২,০০০ বছর ধরে আটকে থাকা বাতাস বের হয়ে এসেছে ওখান দিয়ে।

"চলো!" লোরেন উঠলো প্রথমে। টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ও হাত বাড়িয়ে ছাদ থেকে ছোট্ট লোহার খাঁচাসহ একটা ইলেকট্রিক বাল্ব খুলে নিল, সামনে এগোতেই ওর সাথে সাথে লাইটের তারও সাপের মত এঁকেবেঁকে এগোতে লাগল। আমিও দ্রুত এগোলাম ওর পিছু পিছু, তারপর দুজনেই হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলাম খোলা জায়গাটা দিয়ে।

পেছনের কুঠুরির মেঝেতে যাওয়ার জন্য প্রায় চার ফুটমতো লাফিয়ে নামতে হলো। দুজনে একসাথে নেমে পাশাপাশি দাঁড়ালাম, লোরেন মাথার উপর ধরে রাখলো লাইটটা, আমরা চারপাশের রহস্যময় ছুটন্ত ছায়ার মাঝে কিছু ঠাহর করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমরা একটা সুপরিসর গলিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম যেটা কোনো রকম বাঁক ছাড়াই গুহার শেষ মাথা থেকে ১৫৫ ফুট এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের কালো দেওয়ালে গিয়ে শেষ হয়েছে। গলিটা আট ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, দশ ফুট চওড়া।

ছাদ বানানো হয়েছে এক দেয়াল থেকে আরেক দেওয়াল পর্যন্ত আড়াআড়ি বেলে পাথরের আড়কাঠ দিয়ে, দেওয়ালে–আমরা যেরকম একটা পাথরের চাঁইকে মেঝেতে ফেলেছি সেরকম–অনেকগুলো চাঁই পাশাপাশি বসানো, মেঝেটা তৈরি চারকোনা বেলে পাথরের টুকরো দিয়ে।

গলির দুই পাশের দেওয়াল জুড়ে পাথরের বানানো কুলুঙ্গি। ওগুলো সব সাত ফুট চওড়া আর দেওয়ালের ভেতর পাঁচ ফুট গভীর, উচ্চতায় মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। সবগুলো কুলঙ্গিতেই পাথরের চাঁই দিয়ে বানানো তাক বসানো, একটার উপর আরেকটা, তিন ফিট পর পর, তাকগুলোর উপরে শত শত মাটির তৈরি পাত্র।

"এটাতো মনে হচ্ছে স্টোর রুম," লোরেন বলল, বাতিটা মাথার উপরেই ধরে রেখে ধীরের ধীরে গলিটার ভেতরে হেঁটে যাচ্ছে ও।

"হ্যা, সম্ভবত ওয়াইন বা ভুট্টা আছে ওর ভেতরে।" মনের চিন্তা জোরে জোরে না করাটা জীবনেও শিখবো না আমি। হৃৎপিণ্ড উত্তেজনায় বুকের ভেতর হাতুড়িপেটা করছে বলে মনে হলো, জিনিসগুলো ভালো করে দেখার চেষ্টা করতেই মাথা এপাশ-ওপাশ ভোঁ ভোঁ করতে শুরু করল আমার।

এরকম বিশটা কুলুঙ্গি দেখা গেল ওখানে, গলির দুই পাশে দশটা করে, আবারও জোরে জোরে ভাবনা শুরু হলো আমার।

"দুই থেকে তিন হাজার পাত্র হবে নিশ্চিত," বললাম আমি।

"একটা খুলে দেখি চলো," লোরেন একদম একজন অনভিজ্ঞ লোকের মত অধৈর্য হয়ে গেল।

"না, লো, ঠিকভাবে কাজ করার সব প্রস্তুতি না নিয়ে আমরা কিছুই করতে পারবো না।"

পুরু ফ্যাকাসে ধুলোর পর্দা পড়ে আছে পুরোটা জায়গায়, এখানকার সবকিছুরই বাইরের দিক আর কিনারাগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে তাতে। নড়া-চড়ায় ধাক্কা লেগে আমাদের পায়ের চারপাশে সেগুলো সমুদ্রের কুয়াশার মত অলসভাবে উপরের দিকে উঠতে লাগল।

"কিছু করার আগে আমাদেরকে ভালো মত ঝেড়ে-পুছে নিতে হবে," বললাম আমি, ততোক্ষণে নাকের ভেতর ধুলো ঢুকে পড়ায় হাঁচতে শুরু করেছি।

"আস্তে আগাও," লোরেন বলল আমাকে। "ধুলোয় নাড়া দিয়ো না।" আর এক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়ালো ও।

"এগুলো কী?" গলির মেঝেতে কয়েক ডজন নির্দিষ্ট আকৃতিহীন জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কালো হয়ে আসা পুরু ধুলোর আস্তরণের কারণে ওগুলোর পরিচয় উদঘাটন সম্ভব হলো না। কোথাও ওগুলো একটা পড়ে আছে, কোথাও স্তূপ করা, অদ্ভুত আকৃতির তরলের ধারা দেখে কি একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ল না। পাত্রগুলো যেরকম তাকের উপর থরে থরে সুন্দর করে গোছানো, সেই তুলনায় এই জিনিসগুলো একদমই অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে বলে মনে হলো।

"বাতিটা ধরো," লোরেনকে বললাম আমি, তারপর ঝুঁকে গেলাম ওগুলোর একটার উপর। আলতো করে একটাকে স্পর্শ করে, মখমলের মত ধুলোর ভেতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে অল্প অল্প করে ঝেড়ে ফেলতে লাগলাম এক পাশে। খানিক বাদেই জিনিসটা কী সেটা ধরতে পারলাম আর প্রচণ্ড অবাক হয়ে অবচেতন মনেই সাৎ করে দূরে ছিটকে গেলাম ওটা থেকে।

ধুলো আর কালের কুয়াশা ভেদ করে একটা চেহারা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বহু আগে মারা যাওয়া মমি হয়ে যাওয়া একটা চেহারা, যাতে ভাঁজ পড়া তামাকের মত বাদামি চামড়া দেখা যাচ্ছে। চোখজোড়া শূন্য কোটর এখন শুধু, ঠোঁট শুকিয়ে চিমসে হয়ে গিয়ে হলুদ দাঁত বেরিয়ে বিকট একটা হাসি দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

"মরা মানুষ," বলল লোরেন। "কয়েক ডজন।"

"বলিদান নাকি?" মন্তব্য করলাম আমি। "নাহ, অন্য কিছু।"

"দেখে তো যুদ্ধক্ষেত্রের মত লাগছে। যেন লড়াই করতে গিয়ে খুন হয়েছে।"

ওগুলো আসলে কী, সেটা জানার পরে এটা সহজেই অনুমান করতে পারলাম যে লাশগুলো কীভাবে একটা হ্যারিকেন ঝড়ের ধ্বংসাবশেষের মত একটার উপর আরেকটা গাদা মেরে ছিল, অথবা পাথরের মেঝেতে আলগা ভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। ধূসর ধুলোর আসনে একটা লাশ দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে, থুতনি সামনে হেলে ঠেকে আছে বুকের উপর, একটা হাত ছুটে গিয়ে পাশের তাক থেকে চারটা পাত্র ফেলে দিয়েছে–ওগুলো লাশটার পাশেই ফ্রেঞ্চ ব্রেড-এর চ্যাপ্টা রোল-এর মত পড়ে আছে।

"সেই লড়াই হয়েছিল নিশ্চয়ই," সমীহের স্বরে বললাম আমি।

"তাতো বটেই," নরম সুরে বলল লোরেন, আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। ওর চোখ ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় চকচক করছে, ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে, একটা বেপরোয়া আধেক হাসি ঝুলছে সেখানে।

"কী বলতে চাচ্ছো?" জানতে চাইলাম আমি। "তুমি কীভাবে জানো তা?"

লোরেন সোজা আমার দিকে তাকালো। তবে প্রথমে এক দুই সেকেন্ড দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না, এরপর ও আমার দিকে মনোযোগ দিল।

"হ্যাঁ?" বলল ও, বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

"কথাটা কেন বললে, যেন কী হয়েছে জানো?"

"তাই নাকি?" জিজ্ঞেস করল ও। "কী জানি। মানে–সেরকমই তো হওয়ার কথা।"

ধীরে ধীরে গলিটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগল লোরেন, ছড়িয়ে থাকা লাশের সারি ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছে, যাওয়ার পথে উঁকি দিচ্ছে প্রতিটা কুলুঙ্গিতে। আমিও এগোলাম পিছু পিছু। খাঁচায় আটকানো ষাঁড়ের মত করে আমার মস্তিষ্ক তড়পাতে লাগল, যে চিন্তাটাই মাথার ভেতর উদয় হচ্ছে সেটার দিকেই পাগলের মত ছুটে যাচ্ছে, তারপর দিক বদলে করে আক্রমণ করতে ছুটে যাচ্ছে আবার। ভালো মতই জানতাম যে এই আপাত উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার আগে মাথা ঠান্ডা হওয়া বা যৌক্তিক চিন্তা করতে পারার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

তবে সবকিছুর মাঝে একটা...শুধু একটা ব্যাপারেই নিশ্চিত ছিলাম আমি: বিশাল একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি। এটা লেয়াকির ওল্ডুভাই গর্জ আবিষ্কারের সমকক্ষ, প্রত্নতত্ত্বের দুনিয়াকে একই সাথে কাঁপিয়ে এবং বিমোহিত করে দেবে। এটা এমন একটা আবিষ্কার, যেটার জন্য আমি বিগত বিশ বছর ধরে প্রার্থনা করছি আর স্বপ্ন দেখে আসছি।

গলির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম আমরা। ওই দেওয়ালটাও বেলে পাথরের টুকরো দিয়ে বানানো, তবে এটায় অলংকরণ আছে। একটা ঘূর্ণনরত সূর্যের নকশাদার খোদাই। তিন ফিট ব্যাস, দেখতে অনেকটা ক্যাথেরিন হুইল[৪৯]-এর মত, পরিধির দিক থেকে আলোক রশ্মি ছিটকে বের হচ্ছে। ছবিটা আমার ভেতর এক সশ্রদ্ধ ভক্তিময় চেতনার জন্ম দিল, একটা চাপা পড়া আধ্যাত্মিক অনুভূতি যা আমি মাঝে মাঝে সিনাগগ বা খ্রিস্টান ক্যাথেড্রালের নির্জন কোণে অনুভব করেছি। লোরেন আর আমি ছবিটার দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়েই রইলাম, তারপর আচমকাই ও ঘুরে ১৫৫ ফুট দূরে ইট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া দেওয়ালটার দিকে ফিরে তাকালো।

"এই-ই সব?" জিজ্ঞেস করল ও, কণ্ঠে কেমন একটা বিরক্তির সুর। "শুধু এই কুলুঙ্গি, মাটির পাত্র আর জিরজিরে হাড্ডি? আরও কিছু আছে নিশ্চিত!"

লোরেন যে আসলেই হতাশ হয়েছে সেটা বুঝতে পেরে বেশ অবাক হলাম। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তরফ থেকে আমার জন্য এর চাইতে বড় উপহার আর হয়না। আমার জীবনের এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ সাফল্যের শিখর–আর লোরেন কিনা হতাশ! টের পেলাম আমার ভেতরে একটা রাগ তাতিয়ে উঠছে হিসহিস করে।

"তুমি কী ভেবেছিলে?" জানতে চাইলাম আমি। "স্বর্ণ, হীরা আর হাতির দাঁতের কফিন আর–"

"সেরকমই।"

"তুমি তো এখনও জানোই না যে কি আছে এখানে, এর মধ্যেই মনে হলো যে এসব যথেষ্ট না।"

"বেন, আমি সেটা বলিনি।"

"তুমি কি জানো তোমার সমস্যাটা কি, লোরেন স্টারভেসান্ট? তোমার মাথাটা আসলে বিগড়ানো। জীবনে যা চেয়েছো সব পেয়েছো, তাই কিছুই তোমার কাছে যথেষ্ট না।"

"আগে আমার কথা শোনো!" আমি নিজের রাগ ওর চোখে দেখতে পেলাম। কিন্তু সেটাকে পাত্তা না দিয়ে বলেই যেতে লাগলাম।

"আমি সারা জীবন পরিকল্পনা করেছি, টাকা জমিয়েছি, কঠোর পরিশ্রম করেছি শুধুমাত্র এটার জন্য। আর যখন আমি সেটা অর্জন করলাম, তুমি কি করতে শুরু করলে?"

"হেই, বেন!" আচমকাই ওর চোখে বোধোদয় দেখতে পেলাম আমি। "আমি সেটা বোঝাতে চাইনি। আমি তোমার অর্জনকে খাটো করছি না।

---

[৪৯]আতশ বাজি

আমি সত্যিই মনে করি যে এটা আফ্রিকায় হওয়া সবচেয়ে অনবদ্য আবিষ্কার, আমি শুধু–”

আমাকে নরম করতে আরও কয়েক মিনিট মাখন সুরে কথা বলে গেল ও, ফলে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাসতে বাধ্য হলাম।

“আচ্ছা, ঠিক আছে,” গলার স্বর নরম করলাম আমি, “শুধু এরকম আর কিছু বোলো না, লো। সারাটা জীবন ওই হারামজাদারা আমার সব তত্ত্ব আর আবিস্কারকে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, তাই দয়া করে এখন আবার তুমিও শুরু কোরো না!”

“একটা কথা অবশ্য ওরা কখনোই তোমার সম্পর্কে বলতে পারবে না, সেটা হলোঃ তুমি তোমার মনের কথাটা বলতে ভয় পাও!” বলতে বলতে আমার কাঁধে হালকা ঘুষি মারলো ও একটা। “এখন চলো দেখি, এগুলোর ভেতরে কী আছে তা খুঁজে দেখা যাক।”

“এগুলো ধরা ঠিক হবে না, লো।” এভাবে রাগ দেখানোয় লজ্জা লাগছে এখন আমার, তাই চেষ্টা করলাম ওকে একটু কদর করতে। “আগে এগুলোর তালিকা আর কোনটা কোথায় ছিল সেটা–”

“কয়েকটা তো মাটিতেই পড়ে আছে, পড়ে গিয়েছে তাক থেকে,” ইঙ্গিতে দেখালো লোরেন। “এসব বালছাল হাজারে হাজার আছে এখানে। টুক করে একটা নিয়ে নেব খালি। ধুরো, বেন, একটায় কিচ্ছুই হবে না!”

ও অনুমতি চাচ্ছিল না, লোরেন স্টারভেসান্ট সেটা করে না, ও আসলে সবচেয়ে বিনয়ী উপায়ে আদেশ দিচ্ছিল মাত্র। বলতে বলতেই সে বাঁকা হয়ে পড়ে থাকা লাশটার পাশের পাত্রগুলোর দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল, আমিও ছুটলাম ওর পেছনে।

“আচ্ছা,” প্রয়োজন ছাড়াই সম্মতি দিলাম আমি, আবিষ্কারটার উপর আমার নামমাত্র কর্তৃত্ব রক্ষার নিমিত্তে। “আমরা শুধু একটা সরাবো ওখান থেকে।” কেন যেন ভেতরে একটা চোরা স্বস্তি অনুভব করলাম, কারণ এই ভুল সিদ্ধান্তটা আমার পক্ষ থেকে আরেকজন নিয়ে দিয়েছে। আমি নিজেও পাত্রগুলোর ভেতরে কী আছে জানার জন্যে অধৈর্যের জ্বরে পুড়ে মরছিলাম।



আগেই বানিয়ে রাখা ওয়্যারহাউসের ওয়ার্কশপ বেঞ্চের ঠিক মাঝখানে রাখা হলো পাত্রটা। বাইরে রাত নেমে এসেছে, তবে মাথার উপরে বাতি জ্বলছে অনেকগুলো। আমরা দাঁড়িয়ে আছি বেঞ্চটা ঘিরে, স্যালি, র‍্যাল, লেসলি আর আমি। টাইনাস ভ্যান ভারেন এখনও গুহার ভেতরে, খনির ক্যাপ্টেন থেকে

এখন পাহারাদারের পদে অবনতি হয়েছে ওর। লোরেন ঠিক করেছে চব্বিশ ঘণ্টা সুড়ঙ্গের মুখে অস্ত্রধারী পাহারাদার রাখবে, নতুন কেউ আসার আগ পর্যন্ত টাইনাসই আপাতত সামলাবে সেই দায়িত্ব।

কুঁড়েটার পাতলা প্রাচীরের ভেতর দিয়ে লোরেনের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রেডিয়োর মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে যাচ্ছে ও।

"একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, *ভ্যাকুয়াম ক্লিনার।* ভ্যাকুয়াম ক্লিনার! ভোদাই-এর ভ, কোথাকারের ক–এই তো ধরে ফেলেছো। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। বিভিন্ন ফ্যাক্টরি পরিস্কার করার জন্য হেভি ডিউটি মডেল আছে না? ওগুলোর দুটো। বুঝতে পেরেছো? গুড! এখন আমার পক্ষ থেকে স্টারভেসান্ট ডায়মন্ড মাইনের সিকিউরিটির হেড রবেসনকে একটা বার্তা দেবে। ও যেন ওর সেরা দুজন লোক আর আধা ডজন বান্টু গার্ড পাঠিয়ে দেয় যত দ্রুত সম্ভব। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছো। হ্যাঁ, অস্ত্রসহ পাঠাতে বলবে।"

তবে আমাদের কারো-ই লোরেন কী বলছে সেদিকে কোনো খেয়াল নেই, সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছি মাটির তৈরি পাত্রটার দিকে।

"স্বর্ণ দিয়ে ভরা নেই," নিশ্চিত স্বরে বলল র‍্যাল। "অতো ভারি না।"

"তরল কিছুও না–ওয়াইন বা তেল না," লেসলি মত দিল। তারপর আবার আমরা ডুবে গেলাম নীরবতায়। পাত্রটা আঠারো ইঞ্চি লম্বা, আচারের বয়ামের মত চারপাশে পুরু। জেল্লাহীন লালরঙা মাটির পাত্র, গায়ে কোনো খোদাই বা অলংকরণ নেই। উপরের ঢাকনাটা দেখতে চায়ের কেটলির উপরের ছোট্ট গুল্টুঅলা হাতলের ঢাকনার মত। কালো রঙের কিছু একটা দিয়ে ঢাকনাটা পাত্রের সাথে আটকানো, সম্ভবত আঠা বা মোম।

"কালকে সকালেই ডকোটায় করে ওগুলো পাঠিয়ে দেবে সব, শুনতে পেয়েছো?" লোরেন তখনও পাশের কামরায় ব্যস্ত।

"তাড়াতাড়ি শেষ করেছেন না কেন উনি!" অধৈর্য শোনালো স্যালির গলা। "ভেতরে কী আছে তা দেখার জন্য মরে যাচ্ছি।"

হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলাম আমি। জানার ইচ্ছেটা চলে গেল আমার–পাত্র খুলে এটা আবিষ্কার করতে চাই না যে ওটা ভরা আফ্রিকান ভুট্টা বা অন্য কোনো দেশীয় শস্য। বাইরের বিজন প্রান্তরের নেকড়েগুলোর মত আমি আমার সমালোচকদেরকে উল্লাস করতে শুনতে পেলাম যেন। মনের ভেতর লাড্ডু ফোটাতে থাকা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কারের সম্ভাবনা সন্দেহের মুখে পড়ে গেল। টুলের কিনারে বসে, শোচনীয়ভাবে আমার নোংরা হাতজোড়া একটার সাথে আরেকটা ঘষতে ঘষতে পাত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হয়তো লোরেনই ঠিক, হয়তো আমাদেরও ওর মতই হতাশ হয়ে বলা উচিত, "এই-ই সব?"

রেডিয়ো শ্যাক থেকে লোরেন কথা বলা বন্ধ করে দিচ্ছে বলে শুনতে পাওয়া গেল, তারপরেই ওয়্যারহাউসে দেখা গেল ওকে। সুড়ঙ্গের ভেতরে করা কাজের কারণে অপরিষ্কার হয়ে আছে এখনও, ধুলো আর শুকিয়ে আসা ঘামের কারণে সোনালি চুল জট পাকিয়ে আছে। কিন্তু সেই নোংরা আর অবিন্যস্ত চুলই ওকে এক মোহনীয় চেহারা এনে দিয়েছে, প্রাচীন কালের জলদস্যুর মত লাগছে দেখতে। বেল্টের ভেতরে দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল গুঁজে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলো লোরেন, আমরা সবাই তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলো ও।

"তা, বেন। আমাদের জন্য কী রেখেছো তুমি?" প্রশ্নটা করে অলস ভঙ্গিতে ঘরের ভেতর ঢুকে আমার কাঁধের পাশে এসে দাঁড়ালো ও। বাকিরাও কাছিয়ে এসে আমার চারপাশে একটা বৃত্ত করে দাঁড়ালো। আমি একটা সার্জিক্যাল স্কালপেল তুলে নিয়ে ওটার সূচালো প্রান্তটা ঢাকনার সন্ধিস্থলে ছোঁয়ালাম।

প্রথম ছোঁয়াতেই টের পেলাম যে আমার অনুমান সঠিক।

"মৌচাকের মোম মনে হচ্ছে।"

সাবধানে আমি তুলে ফেললাম পুরো মোমটা, তারপর স্কালপেলটা রেখে আলতো করে ঢাকনাটা তোলার চেষ্টা করলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে অনায়াসে উঠে এল সেটা।

সবগুলো গলা এগিয়ে গেল সেদিকে, তবে প্রথম দর্শনে ভেতরের জিনিস দেখে হতাশ হলাম। কিম্ভূতকিমাকার একটা জিনিস, যেটা কালের আঘাতে হলদেটে বাদামি হয়ে গিয়েছে।

"কী জিনিস?" লোরেন তার বিশেষজ্ঞ দলটার কাছে জানতে চাইলো, কিন্তু আমাদের কেউই জবাব দিতে পারলাম না। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে হতাশ হবো নাকি স্বস্তি পাবো। জিনিসটা কোনো শস্য না সেটা নিশ্চিত।

"কেমন যেন গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে," বলল স্যালি। খুবই হালকা কিন্তু অপ্রীতিকর একটা গন্ধ, কিন্তু খুব পরিচিত।

"গন্ধটা চেনা চেনা লাগছে," বললাম আমি।

"হ্যাঁ," লেসলিও সম্মত হলো।

আমরা পাত্রটার দিকে তাকিয়ে থেকে গন্ধটা বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। তারপর আচমকাই মনে পড়ল আমার।

"চামড়া পাকা করার গন্ধ।"

"হ্যাঁ!" সম্মত হলো স্যালি।

"চামড়া এটা?" জিজ্ঞেস করল লোরেন।

"দেখা যাক," বলে আমি পাত্রটাকে আমার দিকে মুখ করে টেবিলের উপর কাত করে শুইয়ে দিলাম। তারপর পাত্রের জিনিসগুলো ঢেলে ফেলতে

শুরু করলাম সাবধানে। সাথে সাথে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল যে এর ভেতরের জিনিসটা আকারে বেলনাকৃতির, শক্ত এবং ভঙ্গুর কিছু দিয়ে তৈরি।

জিনিসটা পাত্রের ভেতরে আটকে গিয়েছে বলে মনে হলো, তবে আমি খুবই সাবধানে মোচড় দিতেই মৃদু একটা শব্দ করে মুক্ত হয়ে গেল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওটাকে পাত্রের বাইরে নিয়ে এলাম, ওটা বের হতেই দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে নানা ধারা বিবরণী শোনা যেতে লাগল।

"জিনিসটা দেখি লম্বা আর গোল।"

"দেখতে তো পলনি সসেজ-এর মত।"

"কাপড় দিয়ে মোড়া।"

"লিলেন মনে হচ্ছে!"

"জিনিসটা বোনা। যাক, বান্টু সংস্কৃতির বিপক্ষে অন্তত এই একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।"

"কাপড়টা পচে গিয়েছে। খুবলে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।"

জিনিসটা টেবিলের উপর শুইয়ে ওটার দিকে তাকাতেই বুঝে গেলাম যে আমার স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। *আমি জানি জিনিসটা কি।* লোরেনের স্বপ্নের স্বর্ণ আর হীরার চাইতেও বহুগুণ দামি। আমি দ্রুত স্যালির দিকে তাকালাম, ও ধরতে পেরেছে কিনা সেটা বোঝার জন্য, ওর মুখভঙ্গিতে ব্যাকুলতা কিন্তু বিভ্রান্তভাব কাটেনি। তারপরেই আমার চোখে চোখ পড়ল, আমার চোখের উপচে পড়া আনন্দ চিনতে ভুল হলো না ওর।

"বেন!" ধরতে পারলো ও ব্যাপারটা। "এটাই সেটা? ওহ, বেন, বিশ্বাস হয় না! খোলেন মিয়া! ঈশ্বরের দোহাই খোলেন তাড়াতাড়ি!"

আমি একটা চিমটা তুলে নিলাম, কিন্তু কাঁপুনির চোটে কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। আমি হাত মুঠি করে লম্বা দম নিলাম কয়েকটা যাতে আমার আমার রক্তের দৌড় নি আর কানের ভেতরের ভোঁ ভোঁ শান্ত হয়।

"দেখি আমাকে দেন করতে," বলল র‍্যাল, হাত বাড়িয়ে দিল আমার হাত থেকে চিমটাটা নিয়ে নিতে।

"না!" ঝট করে হাত সরিয়ে নিলাম আমি। আমার ধারণা ও যদি সাথে সাথে নিবৃত না হতো, তাহলে হয়তো ওকে মেরেই বসতাম। র‍্যালের চেহারার হতভম্ব ভাব খেয়াল করলাম আমি, ও এর আগে কখনোই আমার মনের গভীরে ওঁত পেতে থাকা এই হিংস্রতার সাক্ষাত পায়নি।

আমার হাতের কাঁপাকাপি থামার আগ পর্যন্ত আর কেউ কিছু বলল না। তারপর আমি সাবধানে সিলিন্ডারের উপরের ভঙ্গুর হলদেটে কাপড়ের আবরণটা তুলতে শুরু করলাম। আমার চোখের সামনে আবরণের নিচ থেকে জিনিসটা উদ্ভাসিত হতে লাগল, তখন আর সন্দেহের লেশমাত্র রইল না। বেঞ্চের ওপাশ থেকে স্যালির শ্বাস আটকে ধরার শব্দ শুনতে পেলাম আমি, তবে পুরোটা শেষ করার আগে আমি মুখ তুলে তাকালাম না।

"বেন!" অস্ফুট স্বরে বলল স্যালি। "আমার যে কী খুশি লাগছে।" তাকিয়ে দেখি কাঁদছে ও, বিশাল বিশাল অশ্রুবিন্দু ওর গাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে নিচে। সেটা দেখে আমারও অবস্থা খারাপ হয়ে গেল, আমি নিশ্চিত যে ও যদি শুরু না করতো, তাহলে আমি ঠিকই সামলে নিতে পারতাম, কিন্তু সহসাই আমার চোখও কেমন জ্বালা করে উঠে দৃষ্টি আর্দ্র হয়ে ঝাপসা হয়ে গেল।

"থ্যাংকস, স্যাল," বললাম আমি, আমার কণ্ঠস্বর কেমন সিক্ত আর নাকি নাকি শোনালো। যখন টের পেলাম যে গাল বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে, আমি রাগান্বিত হাত দিয়ে ঝাড়ি মেরে সেটা মুছে ফেলে আমার রুমালের জন্য হাতড়াতে শুরু করলাম। এত জোরে নাক ঝাড়লাম যে মনে হলো কেউ শিঙ্গা বাজাচ্ছে, বুকের ভেতরের হৃৎপিণ্ডটাও যেন একই সুরে তাল মেলালো।

জিনিসটা ছিল খুব আঁটসাঁটভাবে প্যাঁচানো একটা চামড়ার লিপি। লিপিটার বাইরের কিনারের দিকে ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া খেয়ে ক্ষয় করে ফেলেছে। তবে বাকি অংশটা অলৌকিকভাবে নষ্ট হয়নি একটুও। পুরোটা জুড়ে লাইনের পর লাইন লেখা, দেখে মনে হচ্ছে কালো কালো পোকা সার বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে যেন। সাথে সাথেই লেখার বর্ণগুলো চিনতে পারলাম আমি। পিউনিক বর্ণমালার প্রতিটা বর্ণ আলাদা করতে পারলাম। লিপিটা চলিত পিউনিক বর্ণমালায় লেখা, যেটুক প্যাঁচ খুলেছি তাতে এই প্রাচীন চামড়ার কাগজে প্রথম তিরিশ লাইন দেখা যেতে লাগল। ভাষাটা আমি পারি না, তাই আবার স্যালির দিকে তাকালাম। ও বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে, অক্সফোর্ডে হ্যামিল্টনের সাথে কাজ করেছে।

"স্যাল, পড়তে পারবে এটা? কী লেখা?"

"এটা কার্থেজিনিয়ান," নিশ্চিত কণ্ঠে ঘোষণা দিল ও। "পিউনিক!"

"তুমি নিশ্চিত?" জানতে চাইলাম আমি।

উত্তরে ও জোরে জোরে পড়তে শুরু করল, ওর গলা তখনও কাঁপছে আর কান্নায় ভেজা, "*আজকে ওপেট-এ একটা বাণিজ্য বহর ফিরেছে* " এইটুক পড়ে থামলো ও, "এই জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে না তবে এরপরে বলা হচ্ছে, *খাঁটি স্বর্ণের আঙুল হিসাবে একশো সাতাশ টুকরা, এর মাঝে দশ ভাগ–*"

"কী এসব?" লোরেন জানতে চাইলো। "মানে কী কথাগুলোর?"

আমি ঘুরলাম ওর দিকে। "এর মানে হচ্ছে আমরা আমাদের মুন সিটির আর্কাইভ[৫০] খুঁজে পেয়েছি–একদম অক্ষত এবং পাঠযোগ্য। আমাদের এই শহরের–একটা মৃত সভ্যতার–পূর্ণাঙ্গ লিখিত ইতিহাস খুঁজে পেয়েছি আমরা, সেটাও ওই লোকগুলো দিয়েই ওদের ভাষাতেই লেখা। ওদের নিজেদের কথা।"

---

[৫০]দলিল দস্তাবেজের সংরক্ষণাগার

লোরেন সোজা তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। বোঝা গেল যে আমাদের এই আবিষ্কারের তাৎপর্য ও এখনও ঠাহর করতে পারেনি।

"লো, এটা হচ্ছে এমন জিনিস যার জন্য একজন আর্কিয়োলজিস্ট আজীবন প্রার্থনা করে। এটা হচ্ছে আমাদের আবিষ্কার প্রমাণের পরম দলিলপত্র, তাও একেবারে সর্বোচ্চ বিস্তারিত এবং নিখুঁত বিবরণে।"

ও তখনও মনে হলো না যে বুঝতে পেরেছে।

"এখানে লেখা একটা লাইনেই আমরা তর্কাতীতভাবে একদল লোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছি যারা কার্থেজের প্রাচীন পিউনিক ভাষায় লিখতো আর কথা বলত, যারা স্বর্ণ দিয়ে লেনদেন করতো, যারা তাদের শহরকে ডাকত ওপেট, যারা–"

"আর এই সব আছে একটা মাত্র লাইনে," আমার কথার মাঝেই বলা শুরু করল স্যালি। "এরকম হাজার হাজার পাত্র আছে, প্রতিটায় এরকম লিখিত লিপি। আমরা ওদের রাজাদের নাম আর কীর্তি সম্পর্কে জানতে পারবো, ওদের ধর্ম, ওদের আচার–"

"ওদের যুদ্ধ আর সংগ্রাম, ওর কোত্থেকে এসেছিল আর কখন।" ল্যাং মেরে কথার বল আমি স্যালির কাছে থেকে নিয়ে নিলাম, কিন্তু দক্ষ খেলোয়াড়ের মত ও আবার ছিনিয়ে নিল সেটা।

"কোথায় ওরা যেত এবং কেন!"

"মাই গড!" অবশেষে ধরতে পারলো লোরেন। "এই জিনিসই তো আমরা খুঁজে মরছিলাম বেন। এত একেবারে পুরো ব্যুফে ডিনার সাথে ফ্রি আইসক্রিম।"

"তা বলা যায়!" সম্মত হলাম আমি। "তাও একেবারে ফাইভ স্টার!"

এই বিজয়ের এক ঘণ্টার মাঝে, আমার ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থানরত অবস্থায়, যখন আমার সামনে শুধু খ্যাতি আর গৌরবময় সাফল্য বাদে আর কিছু চোখে পড়ছিল না, তখন ড. স্যালি বেনাটর আমাকে ধাক্কা দিয়ে সেই চূড়া থেকে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল।

আমরা তখনও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে লিপিটা ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ব্যগ্র কণ্ঠে আলাপ করছি, সেদিনের আলাপচারিতাও ভোরের আগে শেষ হতো না, কারণ ততোক্ষণে গ্লেন গ্রান্ট-এর বোতল খোলা হয়ে গিয়েছে আর গলায় তেল পড়ায় গড়গড় করে বকতে আরম্ভ করেছে সবাই।

লিপিতে বোধগম্য যেটুকু লেখা ছিল তার পুরোটাই অনুবাদ করল স্যালি। এটা ছিল শহরের ব্যবসাপাতির উপরে একটা হিসাব, জিনিসপত্রের তালিকা আর দরদাম, ওগুলোর পাশেই এমন সব জায়গা আর মানুষের উল্লেখ ছিল যা যে কারো মনের কৌতূহলকে চেতিয়ে দিতে যথেষ্ট।

"বিশটা বিশাল আম্ফোরা[৫১] *ভরা জেং-এর রেড ওয়াইন, নিয়েছেন হাব্বাকুক লাল। এর এক দশমাংশ পাবেন গ্রাই-লায়ন।"*

"গ্রাই-লায়ন কী?" লোরেনের শিকারি সত্তা জেগে উঠলো।

"গ্রাই বলতে আসলে উচ্চতর বোঝায়," স্যালি ব্যাখ্যা করল। "মানে গ্রাই-লায়ন হচ্ছে বিশাল সিংহ। সম্ভবত রাজা বা শহরের গভর্নরের উপাধি এটা।"

"দক্ষিণের ঘাসের সাগর থেকে একশো বিরানব্বইটা বিশাল হাতির দাঁত, সবগুলোই ওজনে দুইশো একুশ ট্যালেন্ট, এর মাঝে এক দশমাংশ পাবেন গ্রাই-লায়ন আর এগুলো আল-মুয়াব আদম-এর জাহাজে করে রপ্তানি করা হচ্ছে।"

"এক ট্যালেন্টে কতটুকু?" জিজ্ঞেস করল লোরেন।

"ছাপ্পান্ন পাউন্ডের মত।"

"মাই গড, তার মানে মোট প্রায় দশ হাজার পাউন্ড ওজনের হাতির দাঁত, সেটাও আনা হয়েছে এক দফায়," শিস দিয়ে উঠলো লোরেন। "শালারা তো মারাত্মক শিকারি ছিল দেখা যাচ্ছে।"

লিপিটার যতটুকু খোলা হয়েছিল আর সেটুকুর যতটা বোঝা যাচ্ছিল তার পুরোটা নিয়েই বিস্তারিত আলাপ চালিয়ে গেলাম আমরা, তারপরেই আবারও অধৈর্য দেখা দিল লোরেনের।

"আরও খানিক প্যাঁচ খোলো না," বলল ও।

"বিশেষজ্ঞ কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে হবে, লো," দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলাম আমি। "প্রায় দুই হাজার বছর ধরে এই চামড়াটা এভাবে পাকানো আছে। এখন এতটাই শুকনো আর ভঙ্গুর হয়ে গিয়েছে যে যদি ঠিকভাবে না করা হয় তাহলে ভেঙ্গে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ," স্যালিও সমর্থন দিল আমাকে। "প্রতিটাকে সোজা করতে আমার কমপক্ষে সপ্তাহের উপরে লাগবে।"

ওর এই অনুমান শুনে তব্দা খেয়ে গেলাম আমি। প্রাচীন লিপি আর লেখা নিয়ে ওর অভিজ্ঞতা মাত্র তিন বছরের, সেটাও হ্যামিল্টনের তৃতীয় সহকারী হিসেবে। চামড়া বা প্যাপিরাসের এরকম পাকানো লিপির সংরক্ষণ আর প্রস্তুতির ব্যাপারে ও আসলেই কতটা কাজ করেছে সেই ব্যাপারে সন্দিহান আমি। যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ও পিউনিক পড়ছে, সেটা একটা দশ বছরের বাচ্চা যেভাবে শেক্সপিয়ার পড়ে অনেকটা সেরকম, এতেই ও ধরে নিচ্ছে যে ওকেই এযাবতকালের আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপির শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারটার একছত্র দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হবে!

---

[৫১] প্রাচীন আমলের গ্রিক পাত্র

ও নিশ্চয়ই আমার অভিব্যক্তি ধরতে পারলো, কারণ ওর পরের কথাটার সতর্ক সুরেই প্রকাশ পেল সেটা।

"আমিই তো করবো কাজটা, তাই না বেন?"

আমি চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা ওকে সহজভাবে বলতে, কাউকে কষ্ট দিতে ভালো লাগে না আমার, ও তো আমার ভালোবাসার মানুষ।

"এটা একটা হুলুস্থূল কঠিন কাজ, স্যাল। আমার মনে হয় আমাদের হ্যামিল্টনের মত কাউকে আনা যায় কিনা সেই চেষ্টা করা উচিত, তেল আবিবের লেভি বা শিকাগোর রজার্স হলেও হবে।" খেয়াল করলাম ওর চেহারা ধীরে ধীরে বেঁকে যাচ্ছে, ঠোঁট ঝুলে পড়ে কাঁপতে শুরু করল, চোখ ঘোলা হয়ে আসছে, আমি তাই দেরি না করে ঝটপট বলে বসলাম, "তবে যে-ই আসুক, তুমিই হবে তার ফার্স্ট অ্যাসিসট্যান্ট।"

পাঁচ সেকেন্ড নিস্তব্ধ হয়ে থাকলো চারপাশ, সেই সময়টায় স্যালির হতাশা আমূল বদলে পরিণত হলো এক সর্বগ্রাসী ক্রোধে। মেঘে মেঘে ঝড় সৃষ্টি হওয়ার মতই ব্যাপারটা চোখের সামনেই ঘটতে দেখলাম আমি কিন্তু সেটা আটকানোর ক্ষমতা আমার ছিল না।

"বেঞ্জামিন কাজিন," নরম কিন্তু হিসহিসে কণ্ঠে শুরু করল ও, "জীবনে আপনার মত হারামি আর কারো সাথে দেখা হওয়ার দুর্ভাগ্য হয়নি আমার। দুঃসহ তিন তিনটা বছর ধরে আমি অবিচল আস্থা আর বিশ্বাসের সাথে আপনার সাথে পড়ে আছি–"

এরপরেই ও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল আর ব্যাপারটা ছিল দারুণ দর্শনীয় একটা ব্যাপার। এমনকি যখন ওর কথাগুলো চাবুকের মত আমার ভেতরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্ত ঝরাচ্ছিল, তখনও আমি মুগ্ধ চোখে ওর গনগনে চোখ, রাগে লাল হওয়া গাল আর অসাধারণ আক্রমণের ভঙ্গিটা দেখতে লাগলাম মন ভরে।

"শালা বাটকু, শরীরের মত মনটাও ছোট আপনার।" স্যালি ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিশেষণটা ব্যবহার করল, আমি শব্দ করে দম আটকে ফেললাম। আমাকে এটা বলে কেউ কখনও ডাকে না, এটা এমন একটা শব্দ যা আমার আত্মার ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, ও সেটা খুব ভালো মতই জানে। "আই হেট ইউ। আই হেট ইউ, শালা বাটকু।"

টের পেলাম চেহারায় রক্ত জমে যাচ্ছে আমার, তোতলাতে শুরু করলাম সেই সাথে, নিজের পক্ষে কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই স্যালি ঘুরে গেল লোরেনের দিকে। তখনও ওর রাগ এক ফোঁটা-ও কমেনি, লোরেনের দিকেও গলার উত্তাপ বিন্দুমাত্র না কমিয়ে সমান তেজে চিৎকার করতে থাকলো।

"আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন কাজটা। ওকে বলেন আমাকে দিতে!"

এমনকি নিজের এই করুন অবস্থাতেও বেচারা স্যালির জন্য দুঃখবোধ হলো আমার। এখন আর কোনো পঙ্গু আর নরম হৃদয়ের ছোটখাটো এক প্রত্নতত্ত্বের বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলছে না ও। লোরেনের সাথে এরকম করা মানে হলো অনেকটা ছোট একটা কাঠি দিয়ে ব্ল্যাক মাম্বাকে খোঁচানো বা মানুষখেকো সিংহকে পাথর ছুঁড়ে মারা। স্যালি যে এরকম বোকামো করে বসবে সেটা ভাবতেও পারিনি। লোরেন ওর প্রতি যে হালকা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ দেখিয়েছে তাতেই ও এতদূর ভেবে নিল! আমার বিশ্বাসই হলো না যে ও এই স্বরে লোরেনের সাথে কথা বলার সাহস করছে, শুনে মনে হলো যেন লোরেনের সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো অধিকার আছে ওর, যেন ওদের মাঝে একটা বোঝাপড়া বা আবেগের সম্পর্ক আছে যেটার বলে ও লোরেনের সাথে এরকম উদ্ধত আচরণ করতে পারে। এমনকি আমার এই অধিকারগুলো থাকা সত্ত্বেও আমি কখনও এই ঢঙে সেগুলোর অপব্যবহার করি না। এরকম করার মত আর কাউকে আমি চিনিও না।

লোরেনের চোখ ধক করে ঠান্ডা নীল আলোতে জ্বলে উঠলো, ঠিক বর্শার ফলকে রোদ লাগলে যেভাবে ঝিলিক মারে সেভাবে। অসন্তুষ্টিতে বেঁকে গেল ঠোঁট, নাকের পাটা বড় বড় হয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চাইনিজ বাসনের মত।

"এই মেয়ে!" বরফ ফাটার আওয়াজ বের হতে লাগল ওর কণ্ঠ দিয়ে। "মুখ সামলে!"

মরমে মরে যেতে লাগলাম আমি, কারণ যেরকম ভেবেছিলাম লোরেন হুবহু সেরকমই আচরণ করছে। আমার ভালোবাসার দুজন মানুষই এখন মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য অপেক্ষমান, দুজনকেই খুব ভালোমতোই চিনি আমি, ওদের গোয়ার্তুমি আর দাম্ভিকতার কথা আমার জানা, কেউই এক বিন্দু ছাড় দেবে না। দুর্যোগ সন্নিকটে, সেটা এড়ানো অসম্ভব।

মনে চাইলো স্যালিকে চিৎকার করে বলি, "না, প্লিজ দয়া করে থামো। যেটা চাও সেটাই হবে। শুধু এই কাজ করতে যেয়ো না।"

কিন্তু স্যালির সাহসের বেলুন চুপসে গেল। ওর ভেতরের সব রাগ আর যুদ্ধংদেহীভাব বিদায় নিল সাথে সাথে। মনে হলো লোরেনের কথার চাবুক খেয়ে কুকড়ে গিয়েছে ও।

"নিজের রুমে যান, ভদ্রতা শিখতে না পারলে আর বের হবেন না ওখান থেকে।" ঠান্ডা আগুনের মত কণ্ঠে আদেশ দিল লোরেন।

স্যালি উঠে দাঁড়িয়ে চোখ নিচু করে বেরিয়ে গেল ওখান থেকে।

চোখের সামনে দেখেও বিশ্বাস হলো না ব্যাপারটা। স্যালি যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সেদিক হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম–আমার দুর্বিনীত, অবাধ্য স্যালি–একটা ভদ্র বাচ্চার মত মার্জিত আচরণ করছে। এদিকে এক পীড়াদায়ক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাচ্ছে র‍্যাল আর লেসলি।

"শোয়ার সময় হয়ে গিয়েছে," বিড়বিড় করে বলল র‍্যাল। "এক্সকিউজ আস, চলো লেস। গুড নাইট।" বলে ওরা বিদায় নিল। রয়ে গেলাম শুধু আমি আর লোরেন।

অবশেষে লোরেনই ভাঙলো দীর্ঘ নীরবতা। সহজ-সাবলীল ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো ও। স্নেহপ্রদ ভঙ্গিমায় আলগোছে হাত রাখলো আমার কাঁধে।

"এরকম করার জন্য স্যরি, বেন। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। সকালে দেখা হবে।" তারপর বেরিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

আমি ওখানেই বসে রইলাম, হঠাৎই মূল্যহীন হয়ে পড়া আমার চামড়ার লিপি আর ভগ্ন হৃদয়কে সাথে করে।

"আই হেট ইউ, শালা বাটকু!" স্যালির কণ্ঠ আমার আত্মার ভেতরে বাইরে সব জায়গায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, এক বোতল গ্লেন গ্রান্ট নিয়ে বসলাম আমি।

পুরোপুরি মাতাল হতে অনেক সময় লাগল আমার, একসময় কথাগুলোর তীব্রতা কমে এল খানিকটা, যখন টলতে টলতে বাইরে চাঁদের উজ্জ্বল রূপালি আলোয় বেরিয়ে এলাম, তখন আমার কী কর্তব্য সেটা ঠিক করে ফেলেছি। স্যালির কাছে মাফ চেয়ে ওর হাতেই তুলে দেব এই কাজের দায়িত্ব। ওর মন ভালো করার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নেই আর কিছুই।

স্যালি এখন যে কুঁড়েতে একা ঘুমায় সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। লেসলি চলে গিয়েছে পিটার আর হিদারের পুরনো ঘরটায়। দরজায় খুবই মৃদু টোকা দিলাম প্রথমে, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো উত্তর এল না। আরও একটু জোরে টোকা দিয়ে নাম ধরে ডাকলাম স্যালির।

"স্যালি, প্লিজ, তোমার সাথে কথা আছে আমার।"

তাও জবাব না পেয়ে, শেষে দরজার হাতল ধরে মোচড় দিলাম, ওটা খুলে গিয়ে ভেতরের অন্ধকার ঘরটা উন্মোচিত হলো সামনে। আমি প্রায় ঢুকেই পড়েছিলাম, কিন্তু এরপরেই সাহস ফুরিয়ে গেল। আলতো করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে আবারও টলতে টলতে ফিরে গেলাম নিজের কুঁড়েতে। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রইলাম আমি। আর ওভাবেই নোংরা অবস্থায় কাপড় না পাল্টেই বেহুঁশ হয়ে গেলাম ঘুমিয়ে।

"বেন! বেন! ওঠেন।" স্যালির গলা আর হাত আলতো করে কিন্তু বিরতিহীনভাবে ঝাঁকাতে লাগল আমাকে। মাথা ঘুরিয়ে জ্বলতে থাকা চোখজোড়া খুললাম আমি। বাইরে ঝকঝকে সকাল। স্যালি বিছানার কিনারে বসে ঝুঁকে আছে আমার দিকে। একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছে ও। যদিও গোসল করার কারণে ওর ত্বক থেকে আভা আসছে আর চুলগুলোও মাত্রই আচড়ে বেগুনি ফিতে দিয়ে বেঁধে রেখেছে, কিন্তু ওর চোখজোড়া ফুলে ঢলঢলে হয়ে আছে, যেন রাতে ভালো ঘুম হয়নি বা অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে।

“কাল রাতের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি, বেন। বোকার মত কত সব আজেবাজে কথা বলে ফেলেছি, আমার ওই জঘন্য আচরণ–” ওর কথা শুনে আমার হৃদয়ের ভাঙ্গা টুকরোগুলো যেন আবারও আগের জায়গায় গিয়ে জুড়ে গেল, মাথা আর বুকের ব্যথাটাও কমে এল প্রায় সবটা।

“আর যদিও আপনি সম্ভবত আপনার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছেন, কিন্তু আমি আসলে কাজটার যোগ্য না। হ্যামিল্টন বা আর যে-ই কাজটা করুক, আমি তাদের ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে পারলেই খুশি হবো।”

“কাজটা তুমিই করবে,” ওর দিকে চেয়ে হাসলাম আমি। “কথা দিলাম।”



আর্কাইভে আমাদের প্রথম কাজ ছিল সবকিছুকে আচ্ছাদিত করে রাখা ধুলোর পুরু আস্তরণটা পরিষ্কার করা। তবে জায়গাটা যেভাবে বায়ুরোধী করে আটকানো ছিল, তাতে এই ধুলোর উৎস কোথায় ভেবে ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম শুরুতে, তবে পরে দেখি যে ছাদের পাথরের চাঁইগুলোর মাঝের সন্ধি, দেওয়ালের চাঁইগুলোর সন্ধির মত অতো আঁটো না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ফাটল দিয়ে ঝরে ঝরে পড়েছে মিহি ধুলো।

ডকোটায় করে লোরেনের চেয়ে পাঠানো যন্ত্রপাতি আর ওর নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ দলটা এসে পৌঁছাতেই, কোনো রকম বিলম্ব না করে কাজে নেমে পড়লাম আমরা।

সিকিউরিটির দল সুড়ঙ্গের মুখে একটা কুঁড়ে বসিয়ে নিল, সেখানে স্থায়ীভাবে একজন গার্ড থাকবে সবসময়। শুধু আমাদের পাঁচজনের অনুমতি ছিল ভেতরে প্রবেশ করার।

ভ্যাকুয়ামের যন্ত্রপাতি দিয়ে সহজেই আর্কাইভের ধুলোবালি সরিয়ে ফেলা সম্ভব হলো। র‍্যাল আর আমি ব্যস্ত গৃহিণীর মত কোমর বেঁধে বাইরের দিক থেকে পরিষ্কার করা শুরু করলাম, কিন্তু ধুলোর ঝড় উঠে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় রেসপিরেটর পরে বাকি কাজ শেষ করতে হলো।

কাজ শেষে আমাদের আবিষ্কার আরও নিখুঁতভাবে মূল্যায়ন করার সুযোগ পেলাম আমরা। মোট ১,১৪২টা ঢাকনা আটকানো মাটির পাত্র আছে পাথরের কুলুঙ্গিগুলোয়। এর মাঝে ১৪৮টা তাক থেকে পড়ে গিয়েছে, ভেঙ্গে বা ফেটে গিয়েছে ১২৭টা, ওগুলোর ভেতরের লিপি বাতাসে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে সবচে খারাপ যা হওয়ার সেটাই হয়েছে। ওগুলোর উপরে প্যারাফিন ছিটিয়ে দিলাম যাতে ভেঙ্গে না যায়, তারপর জায়গা থেকে তুলে, চিহ্নিত করে, রেখে দিলাম প্যাকেটে ভরে।

এরপরে পূর্ণ মনোযোগ দিলাম পুরো আর্কাইভ জুড়ে সংঘটিত ভয়ানক লড়াইয়ের দিকে, যেটার জন্য তাক আর পাত্রগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মোটমাট আটত্রিশটা লাশ কুলুঙ্গির দুই সারির মাঝের গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, যেন আচমকা কোনো ভয়াবহ লড়াই শেষে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে ওগুলো, লাশগুলো এমনভাবে সংরক্ষিত হয়েছে যে, এক কথায় অনবদ্য। এর মাঝে কয়েকজন মরার আগ মুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে কুলুঙ্গির ভেতরে দিয়ে ঢুকেছে, তারপর ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে সেখানেই ত্যাগ করেছে শেষ নিঃশ্বাস। শরীরে সৃষ্ট ভীতিকর ক্ষতটা চেপে রেখেছিল যারা, মমি অবস্থায় এখনও তারা সেই জায়গাটা চেপে ধরেই আছে। তাদের কুঁচকে যাওয়া শরীরেও পরিষ্কারভাবে ফুটে আছে মৃত্যুযন্ত্রণার ছাপ। বাকিরা দ্রুত মারা পড়েছে, এদের সবার শরীরেই বীভৎস আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান। কারো হাত-পা কাটা পড়েছে, কারো মাথার খুলি কাঁধ পর্যন্ত চেরা, বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গড়াতে গড়াতে কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়েছে।

নারকীয় তাণ্ডবের চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারিদিকে, যেন অতিমানবীয় কোনো ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে এখানে।

এখানে মৃত সবাই জাতিগতভাবে নেগ্রয়েড–সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পরনে চামড়ার লম্বা পোশাক, তাতে পুঁতি বা ছোট ছোট হাড়ের অলংকরণ বসানো। পায়ে চামড়ার হালকা স্যান্ডেল, মাথায় টুপি অথবা চামড়া, পালক আর পাকানো রশি দিয়ে বানানো শিরস্ত্রাণ, সেগুলোতেও পুঁতি, ঝিনুক বা হাড় বসানো।

পাশেই পড়ে আছে ওদের অস্ত্রপাতি; অশোধিত লোহা পিটিয়ে বানানো বর্শা–যেগুলোর হাতল আবার পালিশ করা শক্ত কাঠের তৈরি। অনেকগুলো হাতলই ভেঙ্গে গিয়েছে বা তীক্ষ্ণ ধারালো কোনো অস্ত্রের আঘাতে কেটে দুই টুকরো হয়ে পড়ে আছে। পাশেই পড়ে আছে শত শত নলখাগড়ার তৈরি তীর, পেছনের প্রান্তে বুনো হাঁসের পালক বসানো, মাথাটা হাতে বানানো ভয়াল দর্শন লোহার কাঁটাযুক্ত। তীরের আঘাতে নরম বেলেপাথরের দেওয়ালে জায়গায় জায়গায় গর্ত বা চলটা উঠে গিয়েছে, ওগুলো দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, গলির মুখ বন্ধ করে দেওয়ার আগেই সেগুলো বাইরের থেকে ছোঁড়া হয়েছে। কিন্তু এখানকার কারো গায়েই তীরের আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, তাই আমরা ধারণা করলাম যে, মরে পড়ে থাকা এই লোকগুলোই প্রথম বাইরে থেকে তীর ছুঁড়ে আক্রমণ শুরু করেছিল।

গলির বন্ধ মুখটার পনেরো ফুট দূরেই অগ্নিকাণ্ডের আলামত পাওয়া গেল, সেটার কারণে ওখানের দেওয়াল ছাদ আর মেঝে কালো হয়ে গিয়েছে। গাদা মারা পোড়া কাঠ পড়ে আছে তখনও। সুড়ঙ্গমুখটা বন্ধ করে দেওয়ায়,

বাতাসের অভাবে হয়তো নিভে গিয়েছিল আগুনটা। কেন জ্বালা হয়েছিল আগুনটা তা নিয়ে ধাঁধায় পড়ে গেলাম আমরা, তবে লোরেন লড়াইটা কীভাবে হয়েছিল সেটা বের করে আমাদের সন্দেহ দূর করল। ও পুরো আর্কাউভ জুড়ে অস্থিরভাবে একবার এদিক আর একবার ওদিক করতে লাগল, পায়ের আঘাতে ঠকাস ঠকাস শব্দ হতে লাগল পাথুরে মেঝেতে, দেওয়ালে অদ্ভুতভাবে নড়তে লাগল ওর দানবাকৃতির ছায়া।

"এরা ওদেরকে তাড়িয়ে এখানে নিয়ে আসে, আমাদের ওপেটের বেঁচে থাকা সর্বশেষ লোক ওরা, ছোট কিন্তু সবচে দুঃসাহসী আর শক্তিশালী একটা দল।" বলতে বলতে ওর কণ্ঠ গুনগুনিয়ে উঠলো, যেন কোনো গীতিকবি কিংবদন্তীর প্রাচীন নায়কদের গল্প শোনাচ্ছে। "শত্রুরা ওদের সেরা লোকদেরকে পাঠিয়েছিল এই গণহত্যা শেষ করার জন্য, কিন্তু ওপেটের ওই বীরেরা ওদেরকেই উল্টো হত্যা করে আর বাকিরা পালিয়ে যায়। এরপর এই সংগ্রহশালার মুখে ওদের তীরন্দাজদেরকে আক্রমণে পাঠায়, ওরা এর ভেতরে তীর মারতে শুরু করে। আবারও ওরা ভেতরে প্রবেশ করে, কিন্তু ওপেটের বীরেরা ওঁত পেতে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য, আবারও ওরা মারা পড়ে ডজনে ডজনে।"

লোরেন ঘুরে আবার গলি ধরে এগিয়ে, আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। মাথার উপর একটা ইলেকট্রিক বাল্ব দুলছে, আমরা চুপচাপ কল্পনার চোখে ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"মাই গড, বেন। ভেবে দেখো একবার। কী লড়াইটা না হয়েছিল। জীবনের শেষ দিনে কত বড় গৌরবের বিজয় পেয়েছিল ওই লোকগুলো!"

যদিও আমি শান্তির পক্ষের লোক, তবুও ঘটনাটা নাড়া দিল আমাকে। টের পেলাম আমার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে, একটা বাচ্চা ছেলে যেভাবে গল্পের অর্ধেক শোনার পরে সাগ্রহে প্রশ্ন করে সেভাবে জানতে চাইলাম, "এরপর কী হলো?"

"আমাদের বীরেরা এরমধ্যে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, শরীরে অসংখ্য ক্ষতের কারণে খুবই দুর্বল। লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মত আর একবিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না তাদের মধ্যে। তাই ওরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, বীর হিসেবে জীবন কাটিয়েছে এরা, মরণেও সেটাই রইলো, ক্লান্ত শরীরেও দাঁড়িয়ে থাকলো অস্ত্র হাতে, তবে শত্রু ফিরে এল না আর, বরং এই গলির মুখে একটা আগুন জ্বালিয়ে দিল যাতে ধোঁয়ায় বেরিয়ে আসে ভেতরের লোকেরা, কিন্তু যখন এরপরেও বেরিয়ে এল না, ওরা আক্রমণ থামিয়ে প্রবেশপথপটা বন্ধ করে দিল, ফলে জীবিত আর মৃত দুই পক্ষের জন্যেই এটা পরিণত হলো একটা সমাধি কক্ষে।"

আমরা সবাই চুপচাপ শুনতে লাগলাম, মনে মনে ভাবছি লোরেনের গল্পটা নিয়ে। গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য, একটা দিক বাদে সব তথ্য-প্রমাণই এটার দিকেই

ইঙ্গিত করছে। আমি সেটা নিয়ে কিছু বললাম না, কারণ এমন মর্মস্পর্শী কাহিনিটা নষ্ট করতে মন চাচ্ছিল না, কিন্তু স্যালির মনে কোনো মায়া-দয়া নেই বলেই মনে হলো।

"সেটাই যদি হয়, তাহলে আপনার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়াই করা বীরেরা সব গেল কোথায়–ওরা কি চাঁদের আলোয় রূপান্তরিত হয়ে ভেসে ভেসে বেরিয়ে গিয়েছে?" ওর কণ্ঠে খোঁচা মারার আভাস ছিল, কিন্তু কথাটা সত্যি। তবে আমি মনে মনে চাইছিলাম ওর কথাটা ঠিক না হোক।

লোরেন হাসলো, কিঞ্চিত বিব্রত হাসি। "তাহলে আপনিই বলেন আসলে কি হয়েছিল," স্যালিকে চ্যালেঞ্জ করল লোরেন।

এই প্রাচীন নাট্যমঞ্চের নায়কদের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও, শুধু গলির শেষ প্রান্তে বাআল দেবতার সূর্যের প্রতীকটার নিচে মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসটা বাদে। ধুলো পড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল ওটা, আর্কাইভের মেঝে থেকে সর্বশেষ আবিষ্কার ছিল ওটাই–একটা যুদ্ধ-কুঠার। সৌন্দর্য আর উপযোগিতায় ভরা একটা অস্ত্র। প্রায় ২,০০০ বছর পড়ে থাকার পরে আমরাই মেঝে থেকে তুললাম ওটাকে। হাতলটা মুঠো করে ধরলাম আমি, খাঁজগুলোয় এমনভাবে আঙুল বসে গেল যেন আমার হাতের মাপেই বানানো। হাতলের শেষ মাথায় একটা ছিড়ে যাওয়া চামড়ার কবজি বন্ধনি ঝুলছে।

দুই ধারি ফলাটা সাতচল্লিশ ইঞ্চি চওড়া, বানানো হয়েছে গণ্ডারের শিং থেকে। শিংটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ইস্পাতের মত দৃঢ় আর শক্ত করে ফেলা হয়েছে। হাতল তৈরি হাতির দাঁত দিয়ে আর পুরোটা ইলেকট্রাম[৫২]-এর তার দিয়ে প্যাঁচানো, জিনিসটা হাতলের অন্তর্নিহিত শক্তি যেমন বাড়িয়ে দেয় তেমনি শত্রুর অস্ত্রের ফলার আঘাত থেকেও রক্ষা করে। ফলাটা দেখতে অনেকটা জোড়া-অর্ধচন্দ্রের মত, দুই পাশেই সাড়ে সাত ইঞ্চি করে ধারালো প্রান্ত। ফলার মাঝ দিয়ে হাতল থেকে বেরিয়ে আছে একটা কাটাবিহীন বারো ইঞ্চি গজাল, এর ফলে অস্ত্রটা দিয়ে যেমন কাটা যায় তেমন চাইলে সোজা সেঁধিয়েও দেওয়া যাবে।

কুঠারের দুই পাশই চমৎকারভাবে খোদাই এবং অলংকরণ করা, চারটা শকুন পাখা মেলে আছে সেখানে, জোড়া ফলার দুইপাশে একটা করে। পাখিগুলো এমন বিশদভাবে ফুটিয়ে তোলা যে প্রতিটা পালক দেখানো হয়েছে সেখানে, তার পেছনে সূর্য উদিত হচ্ছে, সেটা থেকে আলোক রশ্মি এমনভাবে ফেটে বের হচ্ছে যে দেখে মনে হয় কোনো ফুল ফুটছে। খোদাইগুলো ইলেকট্রাম দিয়ে গিলটি করা, ফলাগুলোর রূপালি ঔজ্জ্বল্য দেখেই বোঝা যায় যে ওগুলোতে অন্য কোনো ধাতু মেশানো হয়েছে। অস্ত্রটার গায়ে কিছু একটা জমাট বেঁধে উজ্জ্বলতা হ্রাস করে দিয়েছে, যেটা রক্ত ছাড়া কিছু না, এটাই

---

[৫২] স্বর্ণ ও রূপার সংকর

নিশ্চয়ই আর্কাইভে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা লাশগুলোর শরীরে ফুটে থাকা ভয়াবহ ক্ষতগুলোর নেপথ্য-কারিগর।

এই অনিন্দ্য সুন্দর অস্ত্রটা হাতে ধরে আচমকা যেন ছিটগ্রস্ত হয়ে পড়লাম আমি। অবচেতন মনে কোনো কারণ ছাড়াই মাথার উপর বাই বাই করে ঘোরাতে শুরু করলাম ওটা, এত জোরে যে আলোর ঝলকের একটা বৃত্ত দেখা যেতে লাগল শুধু। বিশাল কুঠারটার ওজন আর সামঞ্জস্য এতটাই নির্ভুল আর সুষম ছিল যে এভাবে উঁচু করে ধরে ঘোরানোর পরেও মনে হচ্ছিল আমার কোনো শক্তিই খরচ হচ্ছে না, বা কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করতেও হাত কাঁপবে না। ধারালো প্রান্তটা বাতাস কাটার সময় একটা গা শিউরানো হিস শব্দ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতলটা ধরে নড়া-চড়া করতেই মনে হলো আমার হাতে ওটা যেন জ্যান্ত হয়ে গিয়েছে, ২,০০০ বছরের লম্বা একটা ঘুম শেষে জেগে উঠেছে আবার।

আমার আত্মার অতি প্রাচীন গভীরতা থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসছে বলে মনে হলো আমার, এমন এক উল্লাসময় ধ্বনি যা কিনা এই কুঠারের মরণ সঙ্গীতের সাথে স্বভাবজাতভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। চিৎকারটা ভেতর থেকে আমার ঠোঁটে পৌঁছানোর আগেই বহু কষ্টে কুঠার ঘোরানো বন্ধ করে আমাকে ঘিরে রাখা বাকিদের চেহারার দিকে তাকালাম।

ওরা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যেন আমি প্রলাপ বকছি আর আমার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। দ্রুত নামিয়ে নিলাম কুঠারটা। বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম ওখানে, এরকম একটা বিরল সম্পদ নিয়ে এরকম বাচ্চামি করার জন্য লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল। হাতির দাঁতের হাতলটা এতদিনে সহজেই ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার কথা, এভাবে ঘোরাঘুরির ফলে ছুটে যেতে পারতো যে কোনো সময়।

"একটু টেস্ট করে দেখছিলাম," ফালতু একটা অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করলাম। "স্যরি।"



সেদিন রাতে আমরা প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত আর্কাইভের এই ধাঁধা নিয়ে নানান পর্যালোচনা আর সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে চলে এলাম ওখান থেকে, লোরেন আমার সাথে আমার কুঁড়ে পর্যন্ত এগিয়ে এল।

"আমাকে নিতে কাল লিয়ারটা (বিমান) আসবে, বেন। দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে এখানে আসার, আর একদিনও থাকা সম্ভব না। গড, এখানে খোঁড়াখুঁড়ি

শুরু হওয়ার পরে আমি আমার আসল দায়িত্বে যেভাবে অবহেলা শুরু করেছি!"

কুঁড়ের দরজায় এসে থেমে দাঁড়ালাম আমরা, লোরেন একটা সিগার ধরালো।

"আচ্ছা, এই জায়গাটায় কী আছে বলত বেন? আমরা সবাই এরকম অদ্ভুত আচরণ করছি কেন? তুমি কী কিছু টের পাও? কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি," একটু ইতস্তত করল ও, "যেন নিয়তির লিখন।"

মাথা ঝাঁকালাম আমি, লোরেন উৎসাহ পেল তাতে।

"কুঠারটা, ওটা তোমার উপরেও প্রভাব ফেলেছিল। আজ ওখানে তুমি কয়েক মিনিটের জন্য আর নিজের মধ্যে ছিলে না।"

"আমি জানি।"

"আর্কাইভের লিপিগুলোয় কী আছে সেটা জানার জন্য মরে যাচ্ছি আমি, বেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করতে হবে।"

"ওখানে প্রায় দশ বছরের কাজ জমে আছে, লো। তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে।"

"ধৈর্য আমার কোনো কালেই ছিল না, বেন। গতরাতে আমি তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কারের ঘটনাটা পড়ে দেখলাম। লর্ড কার্নার্ভন-এর প্রচেষ্টায় আবিষ্কারটা সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু মৃত ফারাওয়ের শবাধারটার ভেতরে কী আছে দেখার আগেই মারা যান উনি।"

"এসব বাজে চিন্তা বাদ দাও, লো।"

"ঠিক আছে," বলল লোরেন। "তবে সময় নষ্ট কোরো না, বেন।"

"তুমি হ্যামিল্টনকে জোগাড় করে দাও," বললাম আমি। "ওনাকে ছাড়া একটা কাজও করা সম্ভব না।"

"আমি শুক্রবারে লন্ডন যাবো," লোরেন বলল। "নিজে দেখা করবো ওনার সাথে।"

"উনি কিন্তু খুবই বদমেজাজি বুড়ো শেয়াল," সতর্ক করলাম আমি ওকে।

দাঁত বের করে হাসলো লোরেন। "আমার উপর ছেড়ে দাও সেটা। এখন শোনো দেখি, বেঞ্জামিন বাবু, তুমি যদি আর কিছু খুঁজে পাও এখানে, তাহলে সাথে সাথেই জানাবে আমাকে, বুঝেছো? যখন ব্যাপারটা হবে তখন আমি এখানে থাকতে চাই।"

"যখন *কী* হবে?"

"জানি না–কিছু একটা। এখানে আরও কিছু আছে, বেন। আমার মন বলছে।"

"তোমার কথা-ই যেন ঠিক হয়, লো।" শুনে লোরেন আমার কাঁধে চাপড় মেরে রাতের অন্ধকারে ওর কুঁড়ের দিকে হেঁটে চলে গেল।

আমরা যখন আর্কাইভে কাজ করছিলাম, লাশের অবশিষ্টাংশ তুলছিলাম আর অস্ত্রপাতি গাদা করছিলাম, তখন ডকোটায় করে একদল নির্মাণ শ্রমিক এসে উপস্থিত হলো। ওরা লিপিগুলোর জন্য একটা সংরক্ষণাগার বানাবে। এটা হবে একটা বিশাল ওয়্যারহাউস যেখানে থাকবে বায়ুরোধী দরজা আর একটা শক্তিশালী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যাতে করে লিপিগুলো অত্যানুকূল তাপমাত্রা আর আর্দ্র আবহাওয়ায় থাকতে পারে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চারপাশে কাঁটাতারের উঁচু বেড়া দিয়ে, লিপিগুলো সংরক্ষণের জন্য যতটা সম্ভব সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হতে লাগল।

একই সময়ে শ্রমিকরা পরে আসা সদস্যদের জন্য আরও আধা ডজন থাকার কোয়ার্টার বানিয়ে ফেলল, এগুলোর প্রথম বাসিন্দা ছিল বতসোয়ানা সরকারের চারজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকার-ই মুলত লিপিগুলো এই জায়গা ছেড়ে স্থানান্তর নিষিদ্ধ করে এই নতুন ঘরগুলো নির্মাণের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি মেহমানরা দুইদিন থেকে, আবিষ্কারটা যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ভেতরেই থাকবে সেটা বুঝে, সন্তুষ্টচিত্তেই ফিরে গেলেন। তবে যাওয়ার আগে আমি সবকিছু গোপন রাখার ব্যাপারে আন্তরিক ওয়াদা আদায় করে নিলাম তাদের। শুধুমাত্র আমি নিশ্চিত হবার পর, জায়গাটার ব্যাপারে জানানো হবে সবাইকে।

আমরা মাটির পাত্রগুলোকে তাকগুলো থেকে সরিয়ে চিহ্নিত করে রাখতে শুরু করলাম। ওগুলোর তালিকা করার দুর্বিষহ কাজ চলতে লাগল একই সাথে, নির্দিষ্ট অবস্থানে প্রত্যেকটার ছবি তুলে সাথে লিখিত নোটও করে রাখা হলো। ধারণা করলাম যে, ওগুলো সময় অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবেই রাখা, এতে করে আমাদের পাঠোদ্ধার কাজে সুবিধা হবে অনেক।

সোমবারে লোরেন আমাকে ছোট্ট একটা খবর পাঠালো, যা কিনা একেবারে খোঁড়া করে দিল আমার পুরো পরিকল্পনাকেই।

"হ্যামিল্টনকে পাওয়া যাবে না। অন্য কারো কথা বলো।"

আমি একই সাথে হতাশ হলাম, কষ্ট পেলাম এবং রেগেও গেলাম। হতাশ কারণ হ্যামিল্টন ছিলেন এই কাজে দুনিয়ার সেরা, তার উপস্থিতিই আমার এই আবিষ্কারের ওজন আর প্রামাণিকতা বাড়িয়ে দিতো বহুগুণ। কষ্ট পেলাম কারণ হ্যামিল্টন নিশ্চয়ই ভেবেছেন যে আমার দাবীগুলো ভুয়া, আমার সমালোচক আর প্রতিদ্বন্দ্বী সহকর্মীদের কারণে আমার নামে কুখ্যাতি ভালোই ছড়িয়েছে, হ্যামিল্টন নিশ্চিত এসব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। উনি নিশ্চয়ই আমার কোনো ভুল অথবা ইচ্চাকৃতভাবে জালিয়াতি করা কোনো আবিষ্কারের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে চাচ্ছেন না। সবশেষে খুব রাগ হলো, কারণ হ্যামিল্টনের এভাবে কাজটা নাকচ করে দেওয়াটা সরাসরি অপমান। উনি আমার গায়ে অচ্ছুৎ সীল মেরে দিলেন, এতে করে অন্যরাও আমাকে সহায়তা

করতে আর ইচ্ছুক হবে না, অথচ সেটাই এখন আমার নিদারুণভাবে দরকার। আমি কাজটা শুরু করার আগেই আমার সব অবদান বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

"উনি আমাকে একটা সুযোগও দিলেন না," স্যালির কাছে অভিযোগ করলাম আমি। "একটাবার কথাটা শুনলেন পর্যন্ত না। ক্রাইস্ট, আমি জানতাম না যে আমি এরকম একজন অচ্ছুৎ হয়ে গিয়েছি। এমনকি আমার সাথে কথা বললেও জাত যাবে।"

"শালা একটা চিমসে, টাকলা বুড়ো ছাগল!" স্যালিও সান্ত্বনা দিল আমাকে। "নর্দমার কীট একটা, আর–"

"আর প্রাচীন লিপির ব্যাপারে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ, জীবিত কর্তা-ব্যক্তি," তিক্ত কণ্ঠে ওকে বললাম আমি। তবে এটার আর কোনো জবাব স্যালি দিল না, আমরা কিছুক্ষণ শূন্য নীরবতায় বসে রইলাম।

তারপরেই স্যালির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল। "চলুন ওনাকে ধরে নিয়ে আসি!" পরামর্শ দিল ও।

"আমাদের সাথে দেখা-ই করতে চাইবেন না," বিমর্ষ কণ্ঠে বললাম আমি।

"আমার সাথে দেখা করতে আপত্তি করবেন না উনি," স্যালি আশ্বস্ত করল আমাকে, কথাগুলোর পেছনে একটা না বলা গল্প ছিল যা আমার রক্তের ভেতরে জ্বালাময় ঈর্ষার আগুন ধরিয়ে দিল। স্যালি ওনার সাথে তিন বছর কাজ করেছে, নিজেকে আমি এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে স্যালির রুচি নিশ্চয়ই এতটা উঁচু ছিল যে ও এলড্রিজ হ্যামিল্টনের সাথে কিছু না করেই থেকেছে সেই সময়টা।



বাহাত্তর ঘণ্টা পরে আমি হার্লি[৫৩]-র বেল হোটেলের সামনের লাউঞ্জে এক পাইন্ট ইংলিশ বিয়ার নিয়ে বসে, একটু পরপর কার পার্কের দিকে তাকাতে লাগলাম উদ্বিগ্ন চোখে। অক্সফোর্ড থেকে এখানে আসতে মাত্র পনেরো মিনিটমতো লাগে, অনেক আগেই এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা ওদের।

জোহানেসবার্গ থেকে হিথ্রো পর্যন্ত সারা রাতব্যাপী আয়ু ক্ষয় করা বিমান ভ্রমণের পর খুবই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত এবং বিষণ্ন লাগছিল আমার। এয়ারপোর্ট থেকেই হ্যামিল্টনকে ফোন করেছিল স্যালি।

---

[৫৩]জায়গার নাম

"প্রফেসর হ্যামিল্টন, আশা করছি ফোন করায় বিরক্ত হননি," কণ্ঠে মধু ঢেলে বলল স্যালি। "স্যালি বেনাটর বলছি, ষেষট্টি সালে আপনার অধীনে কাজ করেছিলাম, মনে আছে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবুজ চোখা স্যালি।" তারপরই ও লাজুক ভঙ্গিতে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

"আমি আসলে ইংল্যান্ড এসেছি। এক দুই দিন থাকবো। খুব একা আর নস্টালজিক লাগছে–দারুণ সময় কাটিয়েছিলাম তখন।" ওর কণ্ঠে নিমন্ত্রণ আর না বলা প্রতিশ্রুতির হাজারটা অন্তরঙ্গ স্বর ওঠানামা করছে।

"লাঞ্চ? সেটা তো খুবই ভালো হয়, প্রফেসর। আমিই নাহয় তুলে নেব আপনাকে। একটা গাড়ি ভাড়া করেছি আমি।" ও আমাকে বিশ্বজয় করার ভঙ্গিতে বুড়ো আঙ্গুলটা তুলে দেখালো।

"হার্লির বেল রেস্তোরায়? হ্যাঁ, অবশ্যই, মনে আছে আমার। কীভাবে ভুলি বলেন!" বলে আমার দিকে একটা বিকট মুখভঙ্গি করল স্যালি। "দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি আমি।"

রূপালি রঙের জাগুয়ারটা কারপার্কে এসে ঢুকলো, স্যালিকে দেখলাম চালকের আসনে। স্কার্ফ দিয়ে চুল বাঁধা, ঠোঁটে হাসি, ওকে দেখে মোটেও মনে হচ্ছে না যে মেয়েটা চোদ্দ ঘণ্টা বিমানের চিপা সিটে বসে এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে এসে পৌঁছেছে কিছুক্ষণ আগে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো ও, রোদে পোড়া অনিন্দ্য সুন্দর উরু যুগলের এক ঝলক দেখার সৌভাগ্য হলো আমার, তারপর এদিকেই এগিয়ে আসতে শুরু করল। এলড্রিজ হ্যামিল্টনের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ, খিলখিল করে হাসছে।

হ্যামিল্টন অনেক লম্বা, কাঁধ ঝুঁকে থাকে সামনের দিকে, বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, একটা ঢলঢলে হ্যারিস ট্যুইডের স্যুট পরনে, ওটার কনুইয়ের কাছে আবার চামড়ার পট্টি মারা, লোকটার হাড় জিরজিরে শরীরে মনে হচ্ছে একটা বস্তা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাক–পাখির ঠোঁটের মত, চকচকে টাক এই ফ্যাকাসে হয়ে আসা সূর্যের আলোতেও চকচক করছে যেন খুব ভালো মানের ওয়াক্স পালিশ দিয়ে ঘষে রেখেছেন। সব মিলিয়ে লোকটা আসলে আমার জন্য দুশ্চিন্তা করার মত কোনো প্রতিযোগী না, তবে যতবার স্যালির দিকে তাকাচ্ছেন, ততোবারই ভারি হর্ন-রিমের চশমার আড়ালে জ্বলজ্বল করে উঠছে তার কুতকুতে চোখজোড়া আর ঠোঁট কামনায় অধীর হয়ে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, ভেতরে একগাদা আঁকাবাঁকা দাঁত দেখা যাচ্ছে তাতে। ওনাকে কাজে লাগাতে হলে চড়া মূল্যই দিতে হবে বলে মনে হলো।

স্যালি ওনাকে আমার টেবিলে নিয়ে এল, ছয়ফুট দূরে থাকতেই চিনে ফেললেন উনি আমাকে। একেবারে জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন সাথে সাথে, চোখ পিটপিট করতে দেখলাম একবার। বুঝে ফেলেছেন যে ওনাকে আসলে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, এক মুহূর্তের জন্য পুরো ব্যাপারটাই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল। উনি চাইলেই এখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে চলে যেতে পারেন।

"এলড্রিজ!" লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, বিনয়ের অবতার একেবারে। "আপনাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে।" ভদ্রলোকের সিদ্ধান্তহীনতার সুযোগে আমি ওনার কনুই সাঁড়াশির মত আকড়ে ধরলাম। "আমি আস্ত এক বোতল জিলবি'স জিন আর টনিক অর্ডার দিয়েছি–আপনি তো ওটাই পছন্দ করেন, তাই না?"

ওনার সাথে শেষ দেখা হওয়ার পর পাঁচ বছর পেরিয়ে গিয়েছে, এখনও তার ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপারটা মনে রাখায় কিছুটা নরম হলেন বলে মনে হলো। আমি আর স্যালি ওনাকে টেনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেও তাই প্রতিবাদ করলেন না, আমি ঝটপট ওনার ডান হাতে জিন-এর গ্লাসটা ধরিয়ে দিলাম। এরপর শুরু করলাম জ্ঞাত সকল উপায়ে আমাদের দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওকে পটানোর চেষ্টা! কিন্তু রহস্যজনকভাবে পুরোটা সময়েই চুপ মেরে রইলেন তিনি, জিনের প্রথম পর্ব গেল পেটে। আবারও অর্ডার দিলাম আমি, উনিও গলায় ঢালতে শুরু করলেন; তিন নম্বরটার মাঝপথে আর সামলাতে পারলেন না, মুখের বাঁধন খুলে গেল।

"জার্নালে উইলফ্রেড স্নেল আপনার *ওফির* বইটার যে জবাব দিয়েছেন সেটা কী পড়ে দেখেছেন?" জিজ্ঞেস করলেন উনি। আমার পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে উইলফ্রেড স্নেলই হচ্ছেন সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ আর নির্দয়। "খুব মজার কিন্তু, তাই না?" এলড্রিজ একটা কামুক ঘোড়ার মত চিঁহিঁহিঁ করে উঠে স্যালির একটা সুন্দর উরু খামচে ধরলেন।

আমি সর্বদা শান্তির পক্ষের লোক, কিন্তু ওই মুহূর্তে আমার আসলে কথাটা মাথায় রাখতে খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বিদঘুটে একটা হাসি ধরে রাখলাম চেহারায় কিন্তু এলড্রিজের ঠ্যাং ধরে সারা ঘরে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ানোর ইচ্ছাটা দমন করতে গিয়ে আমার হাতের আঙুল মুঠ হয়ে তালুর ভেতরে গেঁথে বসতে লাগল।

স্যালি পা নাড়িয়ে ওনার হাত থেকে নিস্তার পেল, সাথেই সাথেই আমি চাপা গলায় বললাম, "খেতে যাওয়া যাক, চলুন।"

খাওয়ার জায়গায় বসতে গিয়ে ছোটখাটো একটা মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা হয়ে গেল, কারণ এলড্রিজ স্যালির একেবারের পাশেই বসার চেষ্টা করলেন আর আমি চেষ্টা করলাম সেটায় বাগড়া দিতে।

দুজন মিলে আমরা চালাকি করে হারিয়ে দিলাম ওনাকে। প্রথমে ওনাকে সুযোগ দিলাম স্যালির পাশে বসতে, উনি বিজয়ীর ভঙ্গিতে মেনু দেখার ছলে জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর আচমকাই আমি বলে উঠলাম, "স্যালি, ওখানে তো ঠান্ডা লাগবে তোমার।" এরপর আমরা সহজেই দুজন ব্যালে ড্যান্সারের মত জায়গা বদল করে নিলাম।

এরপরেই শান্তি এল মনে, খাবারের দিকে ওটার প্রাপ্য মনোযোগ দিতে পারলাম, যদিও এলড্রিজ যে পানীয়টা খেতে পরামর্শ দিলেন সেটা খুবই বিস্বাদ ছিল।

খেতে খেতে স্বভাবজাত সূক্ষ্ম কৌশলে যে বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা জড়ো হয়েছি, সেটার কথা পাড়লেন এলড্রিজ।

"কয়েকদিন আগে আপনার আরেক বন্ধুর সাথে দেখা হয়েছিল, গাট্টাগোট্টা গোলগাল চেহারা। যেন একটা পুরুষ মডেল আর পেশাদার কুস্তীগিরের সংকর। উচ্চারণভঙ্গি শুনে মনে হয় যেন সর্দি লাগা কোনো অস্ট্রেলিয়ান। কেপ টাউনের বাইরের কোন গর্তে কী সব লিপি-টিপি খুঁজে পাওয়ার এক আষাঢ়ে গপ্পো শোনালো আমাকে।" এরপরেই এলড্রিজ এত জোরে চিঁহিঁহিঁ করে উঠলেন যে এক মুহূর্তের জন্য ওখানকার সকলের কথা বন্ধ হয়ে গেল। "ব্যাটার আস্পর্ধা কত যে আমাকে টাকার গরম দেখায়। এই ধরনের মানুষ চেনা আছে আমার, শালার ঘটে নাই ফুটো পয়সা, ভাব ধরে এমন যে হাগার পর টাকা দিয়ে গু পরিষ্কার করে। দেখলেই বোঝা যায়, কপালে বড় বড় করে লেখা 'মতলববাজ'।"

স্যালি আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আর লোরেন স্টারভেসান্টের চরিত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি দুজনেই।

"ব্যাটাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছি," রসিয়ে রসিয়ে বললেন এলড্রিজ, তারপর মুখ ঠেসে মুরগির বুকের মাংস ভরে নিলেন।

"আপনি ঠিক কাজটাই করেছেন সম্ভবত," বিড়বিড় করে বললাম আমি। "ঘটনাক্রমে ওই জায়গাটা হচ্ছে বতসোয়ানার উত্তরে। কেপ টাউনের বাইরে ঠিক আছে, তবে পনেরোশো মাইল দূরে।"

"হ্যাঁ, তাই নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন এলড্রিজ, মুখ ভর্তি মাংস আর পচা দাঁত নিয়ে যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে নিজের অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন উনি।

"আর লোরেন স্টারভেসান্ট এ বছরের টাইম ম্যাগাজিনের মতে বিশ্বের সেরা তিরিশ জন ধনীর একজন," এবার বলল স্যালি। চাবানো বন্ধ করে হাঁ করে রইলেন এলড্রিজ, আমরা অর্ধেক চাবানো মুরগির বুকের চমৎকার একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম।

"হ্যাঁ," আমিও সায় দিলাম। "আমার খননকার্যের খরচাপাতি ও-ই দিচ্ছে। এর মাঝেই দুই লাখ ডলার দিয়েছে, বলেছে যত লাগবে দেবে।"

এলড্রিজের চেহারা দেখে মনে হলো কারেন্টের শক খেয়েছেন। কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার এরকম পৃষ্ঠপোষকতা ইউনিকর্নের মতই বিরল, এলড্রিজ

সহসাই বুঝতে পারলেন এরকম একটা সুযোগ তার হাতের মুঠোতেই ছিল কিন্তু উনি সেটাকে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রফেসর হ্যামিল্টনের ভেতর থেকে হামবড়া ভাব বিদায় নিল।

ওয়েট্রেসকে ইশারা করলাম আমার প্লেট সরিয়ে নিতে, কসম করে বলছি যে আমি সত্যিকার অর্থেই এলড্রিজের জন্য অন্তরের ভেতর থেকে সমবেদনা অনুভব করলাম। টেবিল পরিষ্কার হতেই, আমি ব্রিফকেস খুলে ভেতর থেকে একটা সিলিন্ডার আকৃতির গাঁটরি বের করলাম। ওটার উপর ক্যানভাসের তৈরি প্রতিরক্ষামূলক মোড়ক পরানো।

"কাল আমি তেল আবিবে রুবেন লেভির সাথে দেখা করতে যাবো, এলড্রিজ।" বলতে বলতে ক্যানভাসের আবরণটা খুলে ফেললাম।

"আমাদের কাছে এরকম এগারোশো বেয়াল্লিশটা চামড়ার লিপি আছে। তার মানে হচ্ছে আগামী কয়েক বছর রুবি খুবই ব্যস্ত থাকবে। আর অবশ্যই লোরেন স্টারভেসান্ট তেল আবিব ইউনিভার্সিটির সহায়তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রত্নতত্ত্ব অনুষদে এক লক্ষ ডলার অনুদান দেবে। যদি সব শেষে ওদেরকে একটা দুটো লিপি দিয়েও দেওয়া হয়, তাতেও অবাক হবো না মোটেও।"

এলড্রিজ এমনভাবে ঢোক গিললেন যেন ওনার মুখের ভেতর মাংস না, কাঁচের টুকরো। ন্যাপকিন দিয়ে আঙুল আর মুখটা মুছে সামনে ঝুঁকে এলেন লিপিটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

"*দক্ষিণের ঘাসের সমতলভূমির ওদিক থেকে,*" পড়তে পড়তে ফিসফিসিয়ে বলতে লাগলেন উনি, স্যালির অনুবাদের সাথে ওনার অনুবাদের পার্থক্যটা খেয়াল হলো আমার। "*পেয়েছি একশো বিরানব্বইটা হাতির দাঁত, ওজন দুইশো একুশ ট্যালেন্ট–*" ওনার গলার স্বর মিলিয়ে গেল কিন্তু ঠোঁট নাড়িয়ে পড়তেই থাকলেন। আবার যখন কথা বললেন, তখন ওনার গলা উত্তেজনায় কাঁপছে।

"পিউনিক হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভাষারীতি, খেয়াল করেছেন কীভাবে মাঝখানের এই M-গুলো টান দিয়েজোড়া লাগানো, কীভাবে প্রতিটা লাইনের বর্ণগুলোয় মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে, এটা নিশ্চিত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর আগের। এই যে, স্যালি, তুমি খেয়াল করেছো নাকি এই যে A বর্ণটাকে কীভাবে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী কেটে দেওয়া হয়েছে?"

"আমাদের কাছে এরকম হাজারের উপরে লিপি আছে, সবগুলো সময়ক্রম অনুসারে সাজানো–লেভি তো শুনেই খুব অস্থির হয়ে গিয়েছে।" এসব খটোমটো পরিভাষা আলোচনার মাঝে একটা নির্বিষ মিথ্যা বলে বাগড়া দিলাম আমি। লেভি এগুলোর কথা জানেন-ও না।

"লেভি," এলড্রিজ নাক সিটকালেন, ওনার চশমা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠলো যেন। "লেভি! হিব্রু আর ইজিপ্সিয়ানের বাইরে কিছু দিলেই জঙ্গলে

হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার মত কান্না শুরু করবে!" উনি আমার কবজি আঁকড়ে ধরেছেন ততোক্ষণে।

"বেন, আমি অনুরোধ করছি। আমি কাজটা করার জন্য খুবই আগ্রহী।"

"আমার তত্ত্বের ব্যাপারে উইলফ্রেড স্নেলের সমালোচনার কী হবে? আপনার কাছে তো সেটা বেশ ভালোই লেগেছে বললেন।" ওর লাগাম তখন আমার হাতে, তাই ভাবলাম একটু খেলিয়ে নিলে মন্দ হবে না। "যার সব চিন্তাধারাকেই সন্দেহের চোখে দেখুন, তার সাথে কাজ করবেন কীভাবে?"

"উইলফ্রেড স্নেল," আন্তরিকভাবে বললেন এলড্রিজ। "ও তো একটা আস্ত গর্দভ। ও জীবনে কোনোদিন পারবে এক হাজার পিউনিক লিপি খুঁজে বের করতে?"

"ওয়েটার," ডাকলাম আমি। "আমাদেরকে দুটো লার্জ কর্ডন আর্জেন্ট ব্রান্ডি দেন তো। চালু করে।"

"তিনটা দিতে বলেন," বলল স্যালি।

ব্রান্ডি আমাদের শরীরে কোমল একটা উষ্ণতা এনে দিল, খেতে খেতে এলড্রিজ লিপি নিয়ে বকবক করতে লাগলেন আর স্যালির কাছে জানতে চাইলেন ঠিক কীভাবে, কখন এবং কোথায় আমরা খুঁজে পেলাম এগুলো। লোকটাকে ধীরে ধীরে পছন্দ করতে শুরু করলাম আমি। এটা সত্যি যে ওনার দাঁতগুলো দেখতে দাবানলে পুড়ে যাওয়া পাইন বনের পোড়া কাণ্ডের মত, কিন্তু আমি নিজেও তো কোনো নিখুঁত শারীরিক অবয়বের নমুনা না। এটাও সত্যি যে ওনার জিলবি'স জিন আর সুন্দরি মেয়েদের প্রতি দুর্বলতা আছে–এই ক্ষেত্রে ওনার আর আমার পার্থক্য হচ্ছে শুধু পছন্দের পানীয়ের ক্ষেত্রে। আর গ্লেন গ্রান্ট যে ওটার চাইতে উপাদেয় সেটা আমি বলার কে?

তাই ভেবে দেখলাম, কিছুটা আক্রোশ থাকলেও সেটা সরিয়ে ওনার সাথে কাজ করতে পারবো, শুধু হাড্ডিসার হাতটা স্যালির দিক থেকে দূরে রাখলেই হবে।

মুন সিটিতে ফেরার এক সপ্তাহ পরে এলড্রিজ যোগ দিলেন আমাদের সাথে, এয়ারস্ট্রিপে গিয়ে নিয়ে এলাম উনাকে। উত্তরাঞ্চলের শীত থেকে সোজা এখানের ১১০° ফারেনহাইটে যে ওনার সমস্যা হতে পারে, এই ব্যাপারে সচেতন ছিলাম আমরা। তবে আসলে দুশ্চিন্তার ছিল না কিছুই। ভদ্রলোক ওই ইংরেজদের একজন, যারা শুধু রোধ প্রতিরোধী একটা টুপি পরে মধ্যদুপুরের প্রখর সূর্যের আলোয় কাজ করলেও এক ফোঁটা ঘাম বের হবে না। ওনার সাথে নিয়ে এসেছেন ব্যক্তিগত জিনিস ভরা ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ আর প্রায় ডজনখানেক বিশাল প্যাকিং কেস, যেগুলো ভর্তি নানান রাসায়নিক দ্রব্য আর যন্ত্রপাতি।

আমি উনাকে পুরো জায়গাটায় ঘুরিয়ে দেখালাম, চেষ্টা করলাম সিটি বা গুহাটার দিকে তার আগ্রহ জাগাতে, কিন্তু কোনো লাভ হলো না। এলড্রিজ হচ্ছেন একজন একমুখী বিশেষজ্ঞ।

"হুম," বললেন উনি। "ভালোই তো–তা লিপিগুলো কোথায়?" আমার ধারণা তখনও উনি সন্দেহে ভুগছিলেন, কিন্তু যেই আমি ওনাকে আর্কাইভে নিয়ে গেলাম, উনি একটা বুড়ো বেড়ালের মত গরগর করে উঠে লাফালাফি করতে করতে এক তাক থেকে অন্য তাকে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

"বেন," বললেন উনি। "এখন শুধু একটা জিনিসই ঠিক করা বাকি আছে। সত্যিকার লিপিগুলো নিয়ে গবেষণাপত্রটা আমি লিখতে চাই, রাজি?" আমরা আসলে এক অদ্ভুত জাত, সম্পদ না বরং সম্মানের পেছনে ছুটি। আর এলড্রিজ ওনার হিসসা বুঝে নিতে চাচ্ছেন।

"রাজি।" বলে আমরা করমর্দন করলাম।

"ঠিক আছে তাহলে, এখন আমাকে কাজ শুরু করা থেকে আটকাতে পারবে না কেউ," বললেন উনি।

"না," বললাম আমি। "কেউ আসবেও না আটকাতে।"



লিপিগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা আসলে ঠিক বিজ্ঞান না, বরং শিল্প। প্রতিটা লিপির জন্য ব্যবস্থাপনার কৌশল আলাদা। আর সেটা নির্ভর করে তাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা, চামড়ার মান, কালির উপাদান আর অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ের উপর। স্যালি এক দুর্বল মুহূর্তে আমার কাছে স্বীকার করেছিল যে ও কাজটা সামলাতে পারতো না, এটার জন্য যে বিপুল ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সেটা ওর ছিল না মোটেও।

এলড্রিজের কাজের ভঙ্গি একজন মধ্যযুগীয় অপরসায়নবিদের মত, এই পানি সিদ্ধ করছেন, তাতে লিপি ভিজিয়ে রাখছেন বা কিছু স্প্রে করছেন বা লেপে দিচ্ছেন। ওনার কাজ করার জায়গাটা নানান রাসায়নিক আর অন্যান্য আজব গন্ধে ভরে গেল। ওনার আর স্যালির আঙুলে সবসময় কালি লেগে থাকত দেখতাম। স্যালি জানালো যে কাজের ভেতরে ডুবে থাকার কারণে, ওনার পাশবিক সত্তাটা কমতে কমতে এখন আচমকা স্যালির শারীরের স্ফীত অংশগুলোতে আকস্মিক আর দুর্বল খামচিতে এসে সীমাবদ্ধ আছে।

প্রতিটা লিপির প্যাঁচ খোলার পর, ওটায় যা যা আছে সেগুলো মূল্যায়ন আর বিস্তারিত অনুবাদ করা হতে লাগল। প্রায় প্রতিটাই দেখা গেল শহরের

ব্যবসা বাণিজ্যের হিসাবের খাতা, বা গ্রাই-লায়ন আর তার পরিষদের নয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের জারিকৃত কোনো ঘোষণা। এগুলোর লেখক হচ্ছে নামবিহীন কেরানিরা, ওদের লেখনী হচ্ছে দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত, কারণ অযথা কাব্য করার বা অদরকারি বিবরণ লেখার সময় হাতে ছিল না। এদের এই পুরোদস্তুর ভোগবাদী জীবনধারা, খোঁড়াখুঁড়ির জায়গাটায় আমাদের পাওয়া জিনিসগুলো থেকে যা যা অনুমান করেছিলাম সেসবেরই প্রতিধ্বনি করল যেন। আমাদের রাত্রিকালীন আলোচনা সভায় আমরা এসব নিয়ে আলাপ করতাম।

"লেখাগুলো একদম সাদামাটা পিউনিক," এলড্রিজ রায় দিলেন। "আঁকাআকির দিকে খুব একটা আগ্রহ ছিল না এদের, ওদের বানানো মাটির জিনিসপত্রগুলোও খুব বেশি জাতের না, বানাতোও একসাথে অনেকগুলো। আমার মতে ওদের শিল্পকলা–যে যৎসামান্য একটু আছে– সেটুকুও জঘন্য।"

"শিল্প করার জন্য টাকা, অবসর আর নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়," মত দিলাম আমি।

"সেটা সত্যি–রোম আর গ্রিসই সেটার উদাহরণ। কার্থেজ, এর আগে ফিনিশিয়া মাঝে মাঝেই আক্রমণের সম্মুখীন হতো, হঠাৎ হয়তো টিকে থাকার জন্য লড়াইও করতে হতো–এরা ছিল অস্থির আর কর্মচঞ্চল। ব্যবসায়ী আর যোদ্ধা, জীবনযাত্রার খুঁটিনাটির চাইতে সম্পদ আর ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের দিকেই নজর ছিল ওদের।"

"অতো দূরে যাওয়ার দরকার নেই, আধুনিক সব শিল্পকলাই এসেছে সব ধনী আর নিরাপদ জাতিগুলো থেকে।"

"শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানরা হচ্ছে সেই কার্থেজিনিয়ানদের মত," বলল স্যালি। "যখন পাহাড়ের ভেতরে স্বর্ণ পাওয়া যাচ্ছে, তখন আর ছবি আঁকতে গিয়ে টিটকারি শুনবে কে।"

লিপিগুলো আমাদের ধারণার গোঁড়াতেই পানি ঢাললো। জিম্বাও আর পান্ট থেকে আসতো স্বর্ণ, দক্ষিণের সমতল তৃণভূমি বা বিশাল নদীর ধার থেকে হাতির দাঁত, চামড়া আর শুটকি মাংস, হ্রদ থেকে ধরা লবণ মাখা মাছ, জেং-এর সুশোভিত বাগানের ওয়াইন আর তেল, টুয়া-র পাহাড়ের খনি থেকে তামা, হ্রদগুলোর পশ্চিম তীরের ঘের থেকে লবণ, দুই নদীর মিলনস্থল থেকে টিন, মধ্যপ্রদেশ থেকে বেতের ঝুড়িতে ভরা ভুট্টা, দক্ষিণের কুমির নদী থেকে সান স্টোন, সালা-র খনি থেকে লোহার দণ্ড–আর ক্রীতদাস, হাজারে হাজার মানুষের সাথে গৃহপালিত পশুর মত আচরণ করা হতো তখন।

সময়টা কখন শুরু হয়েছিল সেটা এখানে উল্লেখ করে নেই, আমরা অনুমান করলাম যে সম্ভবত শহরটার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সময় গণনা শুরু হয়েছে। প্রতিটা লিপিভুক্তির আগে তারিখ দেওয়া আছে এভাবে, '১৬৯ সাল, হাতির মাস'। এটা থেকে আমরা একটা দশ মাসের বছর বের করেছি, প্রতি বছরে দিন ছিল ৩৬৫টা।

একবার লিপিগুলোর বৈশিষ্ট্য ধরে ফেলার পরে, আমি এলড্রিজকে পরামর্শ দিলাম, এভাবে সংগ্রহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে ধরে শেষ করার চাইতে মাঝে মাঝে থেকে একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখা যাক, এতে করে শহরটার সামগ্রিক একটা ইতিহাস দাঁড় করানো যাবে।

আমার পরামর্শকে আমলে নিলেন তিনি, আফ্রিকার মধ্য আর দক্ষিণাঞ্চলে একটা যুদ্ধংদেহী আর কর্মতৎপর জাতির উত্থানের চিত্র প্রকাশিত হতে লাগল। এদের কেন্দ্র ছিল ওপেট শহর, শাসক ছিল পুরুষানুক্রমিক রাজা গ্রাই-লায়ন আর নয়টা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত শাসন পরিষদ। এই পরিষদ যেসব ফরমান জারি করতো সেসব ছিল নানান কিসিমের, হ্রদ থেকে খাল খননের মাধ্যমে জলজ আগাছার বৃদ্ধি রহিতকরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বাআল এবং অ্যাসটার্টে দেবীর কাছে কোন দূত পাঠানো হবে সেটা পর্যন্ত। এখানে অ্যাসটার্টেকে দেখা যাচ্ছে এটার সচরাচর উল্লেখ পাওয়া কার্থেজিনিয়ান রূপ, তানিথের চাইতে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। আর 'দূত' বলতে মানব বলিদানকে বোঝানো হয়েছে বলে আমরা অনুমান করলাম।

সাবধানতার সাথে সংরক্ষিত পারিবারিক বৃক্ষ আবিষ্কার করলাম আমরা, জিনিসটা অনেকটা ইহুদিদের মাতৃকূলভিত্তিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গরা মনে হলো। প্রতিটা সম্ভ্রান্ত পুরুষ বা নারীর কূলরেখা ধরে এগোলে শহরের প্রতিষ্ঠাতা কারো নাম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যাবে। আর সময়ক্রম থেকে এটাও পরিষ্কার হলো যে, ধর্ম ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা অংশ। আর এখান থেকেই অনুসিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ধর্মটা ছিল বহু-ঈশ্বরবাদেরই একটা গতানুগতিক রুপ, তাদের প্রধান দেব এবং দেবী ছিল বাআল এবং অ্যাসটার্টে।

সময় ধরে আরও সামনে এগিয়ে যেতেই আমরা নতুন নতুন কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা পেতে লাগলাম, নতুন নতুন দৈব ঘটনা তৎকালীন শাসক রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ওপেটের হ্রদটার পানি খুব দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ায় শহরের জীবনযাত্রা হুমকির মুখে পড়ে যায়, ২৯৬ সালে গ্রাই-লায়ন ৭,০০০ ক্রীতদাস প্রেরণ করেন সাগরের সাথে হ্রদের সংযোগকারী খালগুলোর পুনঃখননের জন্য। এছাড়া উনি সেনাপতি রামোসের নেতৃত্বে ওনার নিজস্ব সেনাবাহিনী থেকে ১,০০০ সৈন্যের একটা দল পাঠান, যাদের প্রতি নির্দেশ ছিল পূর্বের সাগর দিয়ে উত্তর দিকের ভূমিতে যাওয়ার যে নৌপথের কথা মহান নাবিক এবং অভিযাত্রী হাব্বাকুক লাল বলে গিয়েছিলেন সেটা আবার খুঁজে বের করা। ওদেরকে দেওয়া আদেশপত্রে লেখা ছিল, "পূর্বে সূর্যোদয়ের দিকে যেতে থাকবে, কোথাও থামবে না, নিজের সংকল্প পূরণের আগে না।"

এক বছর পরে ফিরে আসে রামোস, সাথে মাত্র সত্তরজন সৈনিক, বাকিরা মহামারীতে ভরা জলাভূমির দেশে এক জঘন্য জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা

পড়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত পূর্ব সাগরে ঠিকই পৌঁছেছিল ও, ওখানে ব্যবসায়ী আর সমুদ্রে ভ্রমণকারীদের একটা শহর খুঁজে পেয়েছে 'কালো মানুষ, দাড়িঅলা, পরনে মসৃণ লিলেন, ওদের কপালেও একই রকম কাপড় বেঁধে রাখে।' ওরা এসেছে পূর্ব সাগরের ওপারের কোনো একটা দেশ থেকে, রামোসকে বিশটা স্বর্ণের বাঁট আর বিশ জন ক্রীতদাস দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এটা ছিল আমাদের এই ওপেট শহরের লোকদের সাথে আরবদের প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা। এরা ওদেরকে ডাকত, 'দ্রাভস' বলে, সোফালা উপকূলে বসবাস করতো তখন আরবরা।

আরও জানতে পারলাম কীভাবে গ্রাই-লায়ন মরিয়া হয়ে ক্রীতদাসের নতুন উৎসের সন্ধান করেছেন। খনির তত্ত্বাবধায়কদেরকে আদেশ দেওয়া হয় যেন যে কোনো উপায়ে ওখানে কর্মরত ক্রীতদাসদের আয়ুষ্কাল বাড়ানোর সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মাংস আর শস্যের জোগান বাড়ানো হয়, এতে উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও ক্রীতদাসদের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বাড়তে থাকে। মালিকদেরকে নিষেধ করা হয় তারা যেন তাদের মহিলা দাসীদেরকে নিয়মিত গর্ভবতী করে না ফেলে, মেয়েদের খৎনা করার প্রচলনটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ক্রীতদাস খোঁজার জন্য অনেক দূরে দূরে পাঠানো হয় অভিযাত্রী দল, এমনকি ইয়ুয়িদেরকেও ধরে নিয়ে আসা হয়। এসব হলুদ চামড়ার ইয়ুয়িদের বর্ণনা শুনে আমাদের অনুমান হচ্ছে এরাই হটেনটট জাতির পূর্বপুরুষ।

এরপর আচমকাই উত্তর দিকে যাওয়া অভিযাত্রী দলটা প্রায় ৫০০ 'বর্বর কিন্তু লম্বা আর শক্তিশালী' নুবিয়ান গোত্রের লোক ধরে নিয়ে ফিরে আসলে গ্রাই-লায়ন খুবই খুশি হন। দশটা স্বর্ণের আঙুল উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় অভিযাত্রী দলের সর্দারকে। পরবর্তী একশো বছরে এই খুশি আস্তে আস্তে কমতে থাকে, কারণ বিশাল নদীটার উত্তর দিকে বিপুল একটা কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। দলে দলে বান্টুদের দেশান্তর শুরু হয়। তখন গ্রাই-লায়নের দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়ায় এই মানববন্যা! ওদেরকে দক্ষিণ দিকে পাঠিয়ে দেওয়া তার মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়, তার সৈন্যদল নিয়মিত উত্তর সীমানায় পাহারা দেওয়া শুরু করে।

এলোমেলো বাছাইয়ের মাধ্যমে আমরা অতীতের এই কয়েকটা ঝলক উদ্ধার করতে সমর্থ হই, কিন্তু সেগুলো ছিল শুধুমাত্র একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নির্মোহ বর্ণনা। আমাদের দরকার একজন প্লিনি[৫৪] বা লিভি[৫৪]-এর মত কারো লেখা যিনি কিনা অর্জিত সম্পদের এই নিখুঁত হিসাবপত্রের কংকালের গায়ে মাংস চড়িয়ে জীবন দান করতে পারবেন।

প্রতিটা তথ্য আমাদের সামনে শত শত অনুত্তরিত প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতে লাগল। এর মাঝে সবচেয়ে বেশি খোঁচাচ্ছিল যে প্রশ্নটা তা হলো: ওপেটের

---

[৫৪]দুজনেই রোমান ঐতিহাসিক

এই লোকগুলো কোত্থেকে আর কখন এসেছিল এখানে? কখন এরা চলে গেল আর কেন? আমরা আশা করলাম যে এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর এই লেখার গোলকধাঁধার কোথাও না কোথাও খুঁজে পাবো, এর মাঝে আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করলাম কম জরুরি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কাজে।

লেখাগুলোয় যে জায়গাগুলোর উল্লেখ আছে সেগুলো চিহ্নিত করাটা ছিল খুবই সহজ, জিম্বাও আর পান্ট হচ্ছে আধুনিক রোডেশিয়ার দক্ষিণ আর উত্তর প্রান্ত, মহান নদীটা হচ্ছ জাম্বেজি, হ্রদগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে, জেং-এর বাগানগুলো হচ্ছে পরিষ্কারভাবে পূর্ব রোডেশিয়ার ইনিয়াঙ্গার পাহাড়ের কোল ঘেঁষা কয়েকশো হাজার একরব্যাপী বাগান, টুয়া-র পাহাড় হচ্ছে সিনোইয়ার উপরের দিকের তামা-সমৃদ্ধ এলাকা; ধাপে ধাপে আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের এই ওপেট শহরের লোকজন প্রায় সব আবিষ্কৃত প্রাচীন ভূমিতে বিচরণ করতো, একই সাথে প্রত্যক্ষ করলাম এক অপরিমেয় সম্পদের বেড়ে ওঠা। যদিও এই সম্পদের সিংহভাগই রপ্তানি করা হতো কিন্তু তবুও প্রতিটা ক্ষেত্রেই বারবার 'গ্রাই-লায়নের জন্য এক দশমাংশ' কথাটা জোড়া থাকত।

এই বিপুল সম্পদ রাখা হতো কোথায়, ওগুলোর শেষ পরিণতি কী হলো? ওগুলোও কি শহরের সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে গেল, নাকি এখনও এখানেই হিলস অভ ব্লাডের লাল পাথর কেটে বানানো কোনো গোপন গুদামে সংরক্ষিত আছে?

একটা মানসিক অনুশীলনের অংশ হিসেবে আমি এই সম্পদের বিপুলতার একটা অনুমান করার চেষ্টা করলাম। যদি ধরে নেই যে স্বর্ণের একটা 'আঙুল' হচ্ছে শহরের ফাউন্ডেশনে আমরা দামী ধাতুটার আঙুলের মত যে দণ্ড আবিষ্কার করেছিলাম সেটা হয়, তাহলে ওদের ক্যালেন্ডারের বিশ বছরে, যেটা শুরু ৩৪৫ সাল থেকে আর শেষ ৫০১ সালে, তালিকাভুক্ত স্বর্ণের আমদানির একটা হিসাব করলাম আমি। তাতে ৭৫০ টন স্বর্ণ না, বরং হিসাব মতে সেই প্রাচীন খনিগুলো থেকে উত্তোলিত স্বর্ণের পরিমাণ ৪,০০০ টনের কম হবে না–আর এর মাঝের এক দশমাংশ পেয়েছে গ্রাই-লায়ন।

ধরে নিলাম যে এই ৪,০০ টনের অর্ধেক খরচ হয়েছে তার সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে, এই শহর আর অন্যান্য জনহিতকর কাজে, এরপরেও প্রায় ২০০ টনের মত স্বর্ণ হয়তো এই শহরের আশপাশেই কোথাও লুকানো আছে–২০০ টন মানে হচ্ছে প্রায় ৮ কোটি ডলারের সমতুল্য সম্পদ।

লোরেন পরেরবার আসলে ওকে আমার হিসাবটা দেখালাম। স্বর্ণের লোভে চকচক করে উঠলো ওর ফ্যাকাসে নীল চোখ। যে কাগজটায় হিসাব কষেছিলাম সেটা নিয়ে নিল ও, পরেরদিন সকালে জোহানেসবার্গে যাওয়ার সময় লিয়ারে চড়ার সময় আমাকে ডেকে নিয়ে কথার ছলে বলল, "শোনো বেন, আমার মনে হচ্ছে যে তোমার আর র‍্যালের আসলে শৈলশিরা ধরে

এলাকাটা আরও একটু ভালো করে রেকি করে দেখা উচিত, সারাক্ষণ ওই আর্কাইভের ভেতর থাকার কী দরকার?"

"ওখানে কী খুঁজবো আমরা, লো?" এমনভাবে কথাটা বললাম যেন আমি কিচ্ছুটি বুঝি না।

"ওই হারামি ব্যাটারা জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখতে ওস্তাদ ছিল। এরা সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে গোপন জাতি, আমরা এখনও ওদের গোরস্থান বা এরকম কিছু খুঁজে পাইনি।"

"আচ্ছা, তার মানে তুমি কবর খুঁজতে যেতে বলছো আমাকে।" দাঁত বের করে হেসে বললাম আমি, আর ও শব্দ করে হেসে দিল।

"হ্যাঁ, সেটাই বেন, তবে সেটা খুঁজতে গিয়ে যদি ওদের লুকানো ধন সম্পদের ভাণ্ডারে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাও, তাহলে তোমার উপর রাগ করবো না আমি। আট এর পরে সাতটা শূন্য–টাকার হিসাবে খারাপ না মোটেও।"

আমরা ততোদিন আর্কাইভ থেকে ২৬১টা পাত্র সরিয়ে নিয়েছি আমাদের সংগ্রহশালায়। এলড্রিজ আর স্যালির আগামী দুই-তিন মাস ব্যস্ত থাকার মত মাল-মশলা আছে সেখানে, তাই ঠিক করলাম লোরেনের পরামর্শমতো আপাতত আর্কাইভের কাজ বন্ধ রেখে এলাকাটা আরেকবার বিশদভাবে ঘুরে দেখবো। একেবারে নিখুঁত সময় বাছাই করেছিলাম আমি, শেষ কুলুঙ্গিতে কাজ করছিল তখন র‍্যাল, ওটার গভীর অন্ধকারের ভেতরে ছিল ছোট ছোট কিছু পাত্র যেগুলোর ঢাকনায় সানবার্ডের প্রতীক আঁকা। পাত্রগুলোকে সামনের সারিতে থাকা ওগুলোর দ্বিগুণ আকৃতির পাত্রগুলোর পেছনে সেঁধিয়ে রাখা হয়েছিল, এমন কার্যকরভাবে লুকানো ছিল যে আমরা ওগুলোকে আমাদের মোট গণনায় অন্তর্ভুক্ত করিনি। র‍্যাল ধীরে সুস্থে কাজ করে করে আগাচ্ছিল ওগুলোর দিকে, তিনদিন হলেই হয়ে যেত, কিন্তু আমি ওকে সরিয়ে নিয়ে গেলাম পাহাড়টা পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

নভেম্বর মাসকে আফ্রিকায় আমরা বলি 'আত্মহত্যার মাস'। সূর্য তখন পরিণত হয় একটা হাতুড়িতে, পৃথিবী হচ্ছে নেহাই; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা শুরু করলাম পাহাড় বাওয়া। দুপুরের দিকে শুধু ঘণ্টা দুইয়ের জন্য বিশ্রাম নিলাম, কারণ তাপমাত্রা হয়ে দাঁড়ালো প্রাণঘাতী আর এমারেল্ড দীঘির শীতল সবুজ পানির জন্য আইঢাই করে উঠলো প্রাণটা।

এখন আমরা ওপেটের ওই প্রাচীন লোকগুলোর চালাকি আর নানান কৌশল সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। আগের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি যে কতটা দক্ষতার সাথে ওরা ওদের অস্তিত্ব গোপন করতে পারে আর কত চতুরতার সাথে ওদের রাজমিস্ত্রিরা ইট গেঁথে দেওয়াল তুলতে পারে, তাই আগেও খুঁজে দেখেছি এরকম জায়গাতেই গেলাম আবার। নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে ওদেরকে বুদ্ধির খেলায় পেছনে ফেলার চেষ্টা করলাম আমি।

র‍্যালকে সাথে নিয়ে আবার নতুন করে গুহার প্রতিটা ইঞ্চির ছবি তুললাম, তবে এবার তুললাম ইনফ্রা রেড ফিল্ম দিয়ে। তবে আর কোনো নতুন আবদ্ধ গুহা খুঁজে পেলাম না।

ওখান থেকে আমরা বাইরে কাজ করা শুরু করলাম এবার। প্রতি দিন আমি একটা ৩০০ ফুটের মত জায়গা চিহ্নিত করে নিতাম, তারপর সেখানে চলতো চিরুনি অভিযান। শুধু চোখের দেখায় পাহাড়ের গা দেখে সন্তুষ্ট ছিলাম না, আমরা স্পর্শ করে করে, অনুভব করে দেখতে লাগলাম। অন্ধ মানুষের মত হাতড়ে হাতড়ে আগাতাম পথ দিয়ে।

প্রতিটা দিন ছোট ছোট রোমাঞ্চের সম্মুখীন হতে লাগলাম আমরা। একবার একটা ব্ল্যাক মাম্বার তাড়া খেলাম, আমার কাজে বিরক্ত। আট ফিট লম্বা সাক্ষাৎ মৃত্যু ছিল সেটা, চোখগুলো কাঁচের পুঁতির মত আর কালো জিহ্বাটা ক্রমাগত ঢোকাচ্ছে বের করছে। পাহাড়ের গায়ের যে ফাটলটা ছিল ওটার আবাস আর দুর্গ, সেটায় খোঁচাখুঁচি করায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আমার উপর। ওই এবড়ো-থেবড়ো মাটিতে আমার ভোঁ দৌড় দেখে খুবই আমোদ পেল র‍্যাল, আমাকে পেশাদার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পরামর্শ দিল ও।

সপ্তাহখানেক বাদে গোটা বিশেক নুনো মৌমাছির কামড় খেয়ে ওর খোমা বিগড়ে যাওয়ার পর আমি ওর কটাক্ষের জবাব দিলাম যে, এখন ওকে দেখতে আগের চাইতে সুদর্শন লাগছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন দাড়ি গোফঅলা আস্ত কুমড়ো একটা, ফুলে যাওয়া মাংসের মাঝে লোকটার চোখজোড়া সূক্ষ্ম একটা ফাটল মাত্র। প্রায় পাঁচ দিন বেচারা র‍্যাল আমার সাথে কোনো কাজ করতে পারলো না।

নভেম্বর পার হয়ে মাঝ ডিসেম্বরের দিকে সোয়া এক ইঞ্চির মত বৃষ্টিপাত হলো, যেটা আফ্রিকার এই অঞ্চলের জন্য ঠিকই আছে। এতে ঘণ্টাখানেকের জন্য ধুলো মরে গেল শুধু, এতেই শেষ হলো বর্ষাকাল। অনুমান করলাম যে ওপেটের প্রাচীন হ্রদটা এই এলাকায় আরও বেশি আর দীর্ঘকালীন বৃষ্টিপাত ঘটাতো। খোলা জলাশয় থাকলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ে, কারণ এতে পানির বাষ্পীভবন যেমন বেশি হয়, তেমনি সেটা বাতাসকে ঠান্ডা করে করে জমাট বাঁধতেও সাহায্য করে।

র‍্যাল আর আমি কোনো প্রকার ফলাফল ছাড়াই কাজ করে যেতে লাগলাম, তবে এতে আমাদের উদ্দীপনা বা সংকল্প কোনোটাতেই ভাটা পড়ল না। দিনের বেলা ওই খুনে সূর্যের নিচে জান ক্ষয় করা পরিশ্রমের পরে সন্ধ্যায় পড়ে থাকতাম শহরের ফাউন্ডেশনের মানচিত্রের উপর। অনুমান, বিশ্লেষণ আর বাতিলকরণের মধ্য দিয়ে বের করার চেষ্টা করতাম যে অ্যানসিয়েন্টরা কোথায় তাদের সমাধিকক্ষ বানাতে পারে। ততোদিনে আমি র‍্যাল

ডেভিডসনকে প্রচণ্ড পছন্দ করে ফেলেছি। এই লম্বু তালপাতার সেপাই, করিতকর্মা যুবকটার মধ্যে আমাদের পেশার একজন মহীরুহে পরিণত হওয়ার সব লক্ষণই বিদ্যমান। এখানের কাজ শেষ হলেই আশা করি ওকে ইনস্টিটিউটে একটা স্থায়ী পদ দিয়ে দেওয়া যাবে, আমি নিজে দেখবো ব্যাপারটা।

আমাদের অর্জনের তুলনায় এলড্রিজ হ্যামিল্টন, স্যালি আর লেসলির সহায়তায় লিপিগুলো থেকে অনেক সমৃদ্ধ আর মাথা খারাপ করা সব তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। প্রতি সন্ধ্যায় আমি ওদের সাথে ঘণ্টাখানেক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংগ্রহশালায় কাটিয়ে সারা দিনের কাজ যাচাই করতাম। আস্তে আস্তে টাইপ করা অনুবাদের পাতার সংখ্যা বাড়তে লাগল, ওগুলোর মার্জিনে এলড্রিজের নোংরা হাতে কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাঙের মত হাতের লেখায় গাদা গাদা টীকা লেখা।

ক্রিসমাস চলে এল, আমরা বিশাল একটা রূপার থালার মত চাঁদের নিচে বসে আড্ডা দিলাম আর উপহার আদান প্রদান করলাম। আমি সবাইকে বিং ক্রসবির[৫৫] 'হোয়াইট ক্রিসমাস' গেয়ে শোনালাম। যদিও রাতের তাপমাত্রা ছিল আশির উপরে। তারপর এলড্রিজ আর আমি মিলে গাইলাম 'জিঙ্গেল বেল' গানটা। এলড্রিজ দেখা গেল জিঙ্গেল বেল-এর অংশটা বাদে গানের বাকি কথা ভুলে গিয়েছেন। এলড্রিজ বেশ ভালোই তাল ঠুকতে পারেন, বিশেষ করে দশটা জিন পেটে পড়ার পর। র‍্যাল আর আমি যখন তাকে টেনে বিছানায় নিয়ে গেলাম তখনও দেখে গেল উনি ফুর্তিতে গানটা গুনগুন করেই চলেছেন।

নতুন বছরের শুরুতে যেটা হলো সেটাকে বলা চলে রাজকীয় পরিদর্শন। অবশেষে হিলারি স্টারভেসান্ট, লোরেনকে রাজি করাতে সমর্থ হলো ওকে আমাদের মুন সিটি ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। পরিদর্শনের প্রস্তুতির জন্য এক সপ্তাহ সময় পেলাম আমরা। হিলারি সাথে করে ওর বড় বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আসবে বলে জানালো, মুন সিটিতে পছন্দের সব রমণীদেরকে একসাথে পাওয়ার সম্ভাবনায় উত্তেজনায় নির্ঘুম রাত কাটতে লাগল আমার। র‍্যালের কাছে পাহাড়ের খোঁজাখুঁজির দায়িত্ব গছিয়ে দিয়ে আমি ছুটলাম থাকা খাওয়ার জায়গা ঠিকঠাক করতে আর স্টোর ঘুরে দেখলাম কোকা কোলা আর চকলেটের মত দরকারি জিনিস মজুদ আছে কিনা। এসব জিনিস আছে বলেই ববি স্টারভেসান্টের মত বাচ্চারা বেঁচে আছে এখনও।

ওরা পৌঁছেই, আগে ঠান্ডা গোশত আর সালাদ দিয়ে দুপুরের খাবার খেলো, যেটা আমি নিজে বানিয়েছিলাম; কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মাঝে পুরো ভ্রমণটা তিক্ততার দিকে মোড় নিচ্ছে। স্যালি বেনাটর খেতে এল না,

---

[৫৫]অ্যামেরিকান রেডিয়ো সঙ্গীতশিল্পী

বলে পাঠালো যে ওর নাকি মাথা ব্যথা করছে তাই শুয়ে থাকবে। কিন্তু আমি ওকে দেখলাম চুপিচুপি টাওয়েল আর গোসলের কাপড় নিয়ে এমারেল্ড দীঘির দিকে যাচ্ছে।

এলড্রিজ হ্যামিল্টন আর লোরেন স্টারভেসান্ট একবার পরস্পরের দিকে তাকাতেই নিজেদের শেষ দর্শনের কথা মনে পড়ে গেল। দুটো মদ্দা হরিণের মতই গোঁয়ার্তুমি করতে লাগল দুজন। এলড্রিজ যে লোরেনকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছেন বলে বেশ একটা ভাব নিয়েছিলেন সেকথা মনে পড়ল আমার। দুজনেই দুজনের নামে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে শুরু করল, আমি পুরোটা সময় ব্যস্ত থাকলাম যাতে কোনো ধরনের হাতাহাতি বেঁধে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে। শেষে যখন এলড্রিজ কিছু কিছু মানুষ যাদের 'টাকা বেশি কিন্তু শিষ্টাচার বা বুদ্ধি কম'–তাদেরকে নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন, তখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আমি আমার প্রাচীন লিপি বিশেষজ্ঞকে এবার হারাবো।

কিন্তু এখানেই শেষ না, স্পষ্টতই বোঝা যেতে লাগল যে হিলারি আর লোরেনের মাঝেও ঘরোয়া ঝামেলা চলছে, সেই কারণে ওদের পক্ষে একজন আরেকজনকে সরাসরি সম্বোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সব যোগাযোগ সংঘটিত হচ্ছিল ববি স্টারভেসান্টের মাধ্যমে আর প্রতিটা নির্দেশনা শুরু হচ্ছিল এভাবে: "তোমার মাকে বলো যে..." বা "যদি তোমার বাবা চায় তো...

হিলারি লাঞ্চের টেবিলেও কালো চশমা পরে বসে রইলো, আমি অনুমান করলাম যে ও সম্ভবত খুব বেশি কেঁদেছে...সেটা ঢাকার জন্যেই এই ব্যবস্থা। একদমই চুপচাপ আর নিজের মত করে থাকলো পুরোটা সময়, র‍্যাল আর লেসলিরও দেখা গেল একই অবস্থা। স্টারভেসান্টদের উপস্থিতিতে ওরা দুই তরুণ তুর্কি লজ্জায় মিশে যাচ্ছিল; যখন লোরেন আর এলড্রিজ রাগে গরগর করতে করতে সাময়িক যুদ্ধবিরতি করলেন, তখন মাত্র দুজন বাকি থাকলো যারা তখনও কেউ কারো কাছ ছাড়েনি–ববি স্টারভেসান্ট আর আমি।

ববি ওর উপর থেকে বাবা-মায়ের শাসন সাময়িকভাবে সরে যাওয়ার পুরো ফায়দা ওঠাতে লাগল, পরিণত হলো ভয়ানক ইঁচড়ে পাকা এক মহা দুষ্টু মেয়েতে। খাওয়ার পুরোটা সময় কাটালো ওর সৎ মায়ের সাথে নির্লজ্জের মত ভাব নিয়ে বা বেয়াদবি করে। আমার মনে হচ্ছিল ওকে হাঁটুর উপর ফেলে পিঠের উপর আচ্ছাসে বেতাতে পারলে শান্তি পেতাম বোধহয়।

খাওয়াদাওয়ার এই পীড়াদায়ক সমাপ্তির পরপরই, এলড্রিজ ফিরে গেলেন তার সংগ্রহশালায়, র‍্যাল আর লেসলি বিড়বিড় করে কিছু একটা অজুহাত দিয়ে পালিয়ে বাঁচলো। লোরেন আমার কাছ থেকে ল্যান্ড রোভারটার চাবি নিয়ে, শটগানটা সাথে করে চলে গেল উত্তর দিকে, আমার কাছে থেকে গেল

শুধু হিলারি আর বাচ্চা-কাচ্চারা। আমি হিলারিকে আমাদের জাদুঘরে নিয়ে গেলাম আর আমাদের প্রদর্শনীর মুগ্ধতায় দ্রুতই মনের দুঃখ সব ভুলে গেল ও।

আমি খুব সাবধানে বিশাল যুদ্ধ-কুঠারটা পরিষ্কার করে ঝকঝকে করে রেখেছিলাম। রূপালি, সোনালি আর শুভ্র রঙ্গে ঝকঝক করছে সেটা, আমরা দুজনে মিলে ওটা বানানোর কারিগরি সূক্ষ্মতা পরীক্ষা করে দেখলাম, তারপরে গেলাম সংগ্রহশালায়, লিপিগুলো দেখতে। স্যালিকে দেখা গেল এত ব্যস্ত যে কথা বলারও সময় পাচ্ছে না। আমরা ঢোকার পরে এমনকি মাথা তুলেও চাইলো না, কিন্তু হিলারি ওর অমায়িক কারিশমা প্রয়োগ করল এলড্রিজ হ্যামিল্টনের উপরে; ভদ্রলোকের সেটা আটকানোর কোনো সামর্থ্য ছিল না। এক ঘণ্টা পরে যখন আমরা ফিরে এলাম, তখন হিলারি আরও একজন অনুগত ভক্ত পেয়ে গিয়েছে।

এরপর গেলাম গুহার ভেতরে, আমরা দুজন এমারেল্ড দীঘির পাড়ে বসে রইলাম আর বাচ্চারা শীতল সবুজ পানি ছিটাছিটি করে হল্লা করতে শুরু করল। পুরনো বন্ধু হিসেবে সেই আগের মত দুজনে বসে গল্প করলাম আমরা, শেষমেশ দীর্ঘ সময় আলোচনার পরে ওর মূল সমস্যাটা পাড়লো হিলারি।

"বেন, তুমি ওর মধ্যে আলাদা কিছু খেয়াল করেছো?" একজন অসুখী মহিলার সেই আদিতম প্রশ্ন, আমিও প্রাচীন অজুহাতটাই দিলাম লোরেনের পক্ষে।

"সারাদিন খেটে মরে ও, হিল।" সাথে সাথে সেটা ধরে বসল হিলারি।

"হ্যাঁ, বেশ কয়েক মাস ধরে হোটেল ব্যবসা নিয়ে খুবই দৌড়াদৌড়ি করছে ও। ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোয় ছুটি কাটানোর জন্য বিলাসবহুল হোটেলের চেইন বানানোর কাজ শুরু করেছে। কোমরেস, সিশেলস, মাদাগাস্কার, মোট দশটায়। কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে যাচ্ছে ও।"

সন্ধ্যায় ওখান থেকে ফিরলাম আমরা। কুঁড়ের দিকে যাওয়ার সময় আচমকা প্রশ্ন করে বসল হিলারি, "তোমার কি মনে হয় ও অন্য কোনো মেয়েতে আসক্ত হয়ে পড়েছে, বেন?"

হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। "গুড লর্ড, হিল। এই ধরনের চিন্তা তোমার মাথায় আসলো কীভাবে?"

"জানি না। হয়তো কিছুই হয়নি। কিন্তু কেন যেন–" কথাটা শেষ না করেই ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

"ওর এখন যে আছে তার চাইতে ভালো কাউকে ও আর কোথায় খুঁজে পাবে?" নরম স্বরে বললাম আমি, হিলারি আমার হাত ওর হাতের মুঠোয় নিয়ে চেপে ধরলো।

"ইশ বেন, তুমি না থাকলে আমাদের যে কী হতো!"

রাতে যখন ববিকে বিছানায় শুইয়ে গুডনাইট কিস দিতে গেলাম তখন ওকে বললাম যে দুপুরের ব্যবহার দেখে কী মনে হয়েছে আমার। ও প্রথমে নাক সিটকালেও পরে স্যরি বলল। তারপর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম আর এসবের পরেও যে আমাদের ভালোবাসা কমেনি–একমত হলাম সে ব্যাপারে। লাইট বন্ধ করার আগেই ঘুমে ঢলে পড়ল ও। শেষে আজ দুপুরের ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তির আশংকায় দুরু দুরু বুকে ফিরে গেলাম কমন রুমে।

কিন্তু দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলাম আমি। লোরেন, এলড্রিজ আর স্যালি তিনজনে বন্ধুবৎসল আর উল্লসিত ভঙ্গিমায় ঝুঁকে রয়েছে অনুবাদকৃত পাতাগুলোর উপর। র‍্যাল আর লেসলি আগ্রহ নিয়ে হিলারির সাথে ওদের বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করছে। এই পরিবর্তনটা এক কথায় বলা চলে অলৌকিক। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গ্লেন গ্রান্টের একটা বোতল খুলে আধা গ্লাস ঢেলে নিলাম।

"আমাকেও একটা দিন," স্যালি এগিয়ে এল আমার দিকে। তবে ওর চেহারায় মাথা ব্যথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। চেহারা জুড়ে উজ্জ্বল লিপিস্টিক দগদগে হয়ে আছে, যে রেশমি কাপড়টা পরে আছে সেটা এমনভাবে কাটা যে ওর শক্তিশালী বাদামি পিঠ আর কাঁধের পুরোটাই উন্মুক্ত হয়ে আছে। উঁচু করে খোঁপা বেধেছে আজ, আমার মনে হলো ওকে এত সুন্দর রূপে খুব কমই দেখেছি আমি এর আগে।

ওকেও একটা ড্রিংক ঢেলে দিলাম আমি, তারপর এগিয়ে গিয়ে যোগ দিলাম লিপিগুলো নিয়ে আলোচনায়। পূর্বেকার মেজাজের পুরো বিপরীত মেজাজে আছে এখন লোরেন, মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে, এমনকি এলড্রিজ পর্যন্ত সেটায় প্রভাবিত হয়ে গেলেন।

"প্রফেসর হ্যামিল্টন এখানে অসাধারণ কাজ দেখিয়েছেন, বেন," এই বলে আমাকে স্বাগত জানালো ও। "এরকম একজনকে সহকর্মী হিসেবে বাছাই করে নেওয়ার জন্য অভিনন্দন তোমাকে।" এলড্রিজ বিনীতভাবে হেসে গ্রহণ করলেন প্রশংসাটা।

"আরেকটা কথা, ব্যাপারটা আমরা আর বেশিদিন চেপে রাখতে পারবো না, বেন," লোরেন বলে চললো। "শীঘ্রই আমাদেরকে ঘোষণা দিয়ে দিতে হবে। এটাকে আর গোপন রাখা যাবে না।"

"জানি," সায় দিলাম আমি।

"এব্যাপারে কিছু চিন্তা ভাবনা করেছো নাকি?"

"মানে, আসলে–" বলতে গিয়ে ইতস্তত করতে লাগলাম আমি। লোরেনকে টাকা খরচ করতে বলতে বাধে আমার। "আমি আসলে বড়সড় কিছু একটা করার কথা চিন্তা করছিলাম।"

"কী রকম?" লোরেন উৎসাহ দিল।

"বেশ, আমি ভাবছিলাম যদি রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে, আফ্রিকান প্রাচীন ইতিহাসের উপর একটা বিশেষ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা যায়। এলড্রিজ ওখানকার কাউন্সিলের সদস্য। উনি নিশ্চয়ই সেটা ব্যবস্থা করতে পারবেন।"

আমরা ওনার দিকে তাকাতেই মাথা ঝাঁকালেন উনি।

"তাহলে আশা করি স্টারভেসান্ট ইন্টারন্যাশনাল আমন্ত্রিত অতিথিদের মেহমানদারীর দায়িত্বটা নিতে পারবে, লন্ডন থেকে যাতায়াত আর অন্যান্য খরচপাতি দিলে আমি নিশ্চিত মেহমানরা না এসে পারবেন না, বা অন্তত কয়েকজন তো আসবেনই।"

লোরেন মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল। "তুমি যে আসলে কত বড় মতলববাজ, বেন। তোমার পরিকল্পনা ধরতে পারছি আমি। তুমি তোমার সব সমালোচক আর শত্রুদের আর জি এস-এর সীমানার ভেতরে একসাথে পেতে চাচ্ছো, তারপর প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে আল কাপনগিরি[৫৬] করে ওদের উপর বৈজ্ঞানিকভাবে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'স ডের গণহত্যা[৫৭] চালাবে। বাজে ভাষায় বলতে গেলে তুমি ওই হারামিগুলোকে খুন করবে। সেটাই তো, তাই না?"

পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত অর্থ এভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় চেহারা লাল হয়ে গেল আমার।

"হুম," লাজুক ভঙ্গিতে হেসে মাথা ঝাঁকালাম আমি। "সেরকমই ইচ্ছা, লো।"

"দারুণ।" খুশিতে হাতে তালি দিয়ে উঠলো স্যালি। "আমরা অতিথিদের একটা তালিকা করে ফেলি।"

"পুরো কাজটা দুর্দান্তভাবে করবো আমরা," কথা দিল লোরেন। "আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে করে উড়িয়ে নিয়ে এসে ডোরচেস্টারে[৫৮] রাখবো। দুপুরে ঠেসে শ্যাম্পেন খাইয়ে ঠান্ডা করে ওদের মধ্যে বেন আর এলড্রিজকে ছেড়ে দেব, ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত।" লোরেন পুরো আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যের একদম ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, এরপর ও এলড্রিজের দিকে ফিরলো।"আয়োজন করতে কতদিন লাগবে?"

"উম্ম, অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলে উত্থাপন করতে হবে। ওদেরকে সিম্পোজিয়ামের বিষয়াবলী নিয়ে কিছুটা ধারণা দিতে হবে আগে, তবে আপনি যদি বলেন যে সব খরচ দেবেন তাহলে সবই সহজ হয়ে যাবে

---

[৫৬]অ্যামেরিকান গ্যাংস্টার

[৫৭]ভ্যালেন্টাইন ডে-র দিনে একটা গ্যারেজের ভেতরে আল কাপন কর্তৃক প্রতিপক্ষের সাতজনকে একসাথে খুন করার ঘটনা

[৫৮]হোটেল

অনেক। আমি আর দুয়েকজন কাউন্সিল মেম্বারের সাথে আলাপ করবো দেখি।" এলড্রিজও মজা পাচ্ছেন বোঝা গেল। কারো শত্রুকে পেশাদারভাবে খুন করার পরিকল্পনা করা আর সেটা বাস্তবায়নের মধ্যে এক পৈশাচিক আনন্দ আছে। "এপ্রিলের দিকে আয়োজন করা যাবে বলে আশা করছি।"

"পয়লা এপ্রিল," প্রস্তাব দিলাম আমি।

"চমৎকার," হেসে বলল লোরেন।

"উইলফ্রেড স্নেলকে আনতেই হবে," অনুনয় করল স্যালি।

"উনি তালিকার এক নম্বরে," ওকে আশ্বস্ত করলাম আমি।

"আর ওই ঘিনঘিনে পিচ্চি রজার্স।"

"আর ডি ভায়োস।"

বুনো মুরগি দিয়ে রাতের খাবার খেতে বসার সময়েও আমরা সমান আগ্রহে নানান পরিকল্পনা ভাজতে লাগলাম আর মনে হচ্ছিল যে রাতের গুমোট হাওয়া তাতে কিছুটা হলেও তুলনামূলক শীতল হয়ে এল। জগভর্তি ঠান্ডা বিয়ারের ব্যবস্থা ছিল সাথে খাওয়ার জন্য। খাবারটা উৎসবমুখর পরিবেশে রূপ নিল। আমাদের বৈজ্ঞানিক শত্রুদের কী কী দুরবস্থা হবে তা নিয়ে তখনও আলোচনা করে যাচ্ছিলাম আমরা, কথা হচ্ছিল তাদেরকে মোকাবেলার বিশদ পরিকল্পনা নিয়ে, তখনই স্যালি আচমকা হিলারির দিকে ফিরলো, ও এতক্ষণ ধরে চুপচাপ আমার পাশেই বসে ছিল।

"মাফ করবেন, মিসেস স্টারভেসান্ট। আপনার নিশ্চয়ই খুব বোরিং লাগছে। আমরা যা বলছি সেসবের সম্ভবত কোনো অর্থ নেই আপনার কাছে।" স্যালির কণ্ঠ ছিল একদম মধুমাখা আর বিনয়ে ভরা। হিলারির মত আমি নিজেও অবাক হলাম বেশ, কারণ মহিলাদের গোপন ভাষা সম্পর্কে সামান্য যেটুকু জ্ঞান আছে সেটা দিয়েও এটাকে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হিসেবে চিনতে ভুল হলো না। আশা করলাম যে ভুল শুনেছি, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই আবার আক্রমণ করে বসল স্যালি।

"আপনার নিশ্চয়ই এখানকার গরম আর আদিম পরিবেশ খুবই বিরক্তিকর লাগছে, মিসেস স্টারভেসান্ট। আপনার টেনিস পার্টি করার মত কোনো আবহাওয়া না, তাই না?"

স্যালি এমনভাবে বলল কথাটা যে মনে হলো টেনিস হচ্ছে বড়লোক কিন্তু বখে যাওয়া অকর্মার ধাড়িদের অবসর বিনোদন। কিন্তু এবার হিলারি প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুত হয়েই ছিল। একেবারে একজন দেবীর মত চেহারা করে আর স্যালির চাইতেও বেশি চিনি কণ্ঠে ঢেলে এক বিধ্বংসী কাউন্টার অ্যাটাকের মাধ্যমে এর শোধ তুললো।

"ব্যাপারটা যে বেশ অস্বাস্থ্যকর–সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, তা সেখানে কেউ বেশি সময় থাকুক আর কম, ড. বেনাটর। সূর্যের আলোয় পুড়ে যে কারো-ই চামড়া কয়লা হয়ে যেতে পারে, তাই না? আর আপনাকে দেখে মনে

হচ্ছে এখনও আপনার মাথা ব্যথা যায়নি পুরোপুরি। আমরা আপনাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলাম। আশা করছি এখন আগের চাইতে ভালো আছেন।"

স্যালি বুঝলো যে যতই নম্র, সাধু সাজুক না কেন, হিলারি ওর একজন যথার্থ প্রতিযোগী। তাই ওর আক্রমণের ধারা বদলে ফেলল। ওর সমস্ত মনোযোগ সরিয়ে দিল লোরেনের দিকে, লোরেনের প্রতিটা কথায় হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল আর এক মুহূর্তের জন্যেও চেহারা থেকে দৃষ্টি সরালো না। হিলারি এই কৌশলের সামনে অসহায় হয়ে পড়ল। দেখে মনে হলো যে, পার্টিতে একমাত্র আমিই এই চলমান লড়াই সম্পর্কে সচেতন, এদের মাঝে বসে চুপচাপ বোঝার চেষ্টা করে যেতে লাগলাম যে এই সব কিছুর মানেটা কি–অবশেষে হিলারি ওর ট্রাম্প কার্ডটা খেললো।

"লোরেন, ডার্লিং, আজকের দিনটায় খুবই দৌড়াদৌড়ি গেল। শুতে চলো, প্লিজ।"

লোরেনের হাত ধরে মাঠ ত্যাগ করল ও, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে মনে স্বীকার করলাম যে, আমার স্যালি তার প্রাপ্যটাই পেয়েছে।



আচমকা ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম যে কেউ একজন আমার সাথে বেডরুমের ভেতর আছে, আচমকা আক্রমণের আশংকায় আমি সাই করে ঘুরে গিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে উঠে বসে দরজার দিকে তাকালাম। ওটা খোলা। বাইরের চাঁদের আলো উজ্জ্বল আর পরিষ্কার। স্যালি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

সিনেমার নায়িকাদের মত শোয়ার পোশাক পরে আছে ও, রূপালি চাঁদের আলোয় ওর নগ্ন শরীরের অসম্ভব সুন্দর বাঁকগুলোর একটাও আড়াল করতে পারেনি পোশাকটা–ওর লম্বা পদযুগল, নারীসুলভ স্ফীত নিতম্ব, কোমরের খাঁজ আর উদ্ভাসিত স্তনযুগল, হরিণীর মত গ্রীবার উপর হেলে থাকা নিটোল মাথা।

"বেন?" নরম গলায় ডাক দিল ও।

"হ্যাঁ," পুরোপুরি উঠে বসলাম আমি, ও সাই করে চলে এল আমার কাছে। "কী হয়েছে, স্যাল?"

উত্তরে খোলা মুখ আর জিহ্বা দুটো দিয়েই আমাকে চুমু খেলো ও। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওর বাহুর মাঝেই জমে গেলাম আমি, আমার গালের সাথে গাল ঠেকিয়ে রাখলো ও। তারপর কামনায় অধীর গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, "আমাকে আদর করেন, বেন।"

কিছু একটা গণ্ডগোল আছে, টের পেলাম আমি, মারাত্মক গণ্ডগোল। এত কিছুর পরেও ভেতরে কোনো কামনা জাগলো না আমার, শুধু স্যালির জন্য কেমন একটা মায়া অনুভব করতে লাগলাম।

“কেন স্যাল?” জিজ্ঞেস করলাম আমি। “এখন কেন?”

“কারণ আমার দরকার এখন।”

“না স্যালি, আমার মনে হয় না যে তোমার দরকার এটা। আমি তো বলবো এই মুহূর্তে দুনিয়ায় এটাই তোমার সর্বশেষ দরকার।”

তারপরেই কাঁদতে শুরু করল ও, ফোঁপাতে লাগল নীরবে। দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদলো স্যালি। আর আমি ওকে জড়িয়ে ধরে রাখলাম। কান্না থামলে ওকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলাম শরীর।

“আমি একটা মাগী, তাই না বেন?” অস্ফুট স্বরে বলল ও, তারপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে জেগে থাকলাম সারারাত। আমার ধারণা আমি একটু একটু টের পেয়েছিলাম যে আসলে কী ঘটছে, কিন্তু সেটা নিজের কাছেই স্বীকার করতে চাচ্ছিলাম না।

সকালের নাস্তার সময় অকস্মাৎ লোরেন ঘোষণা দিল যে, ওরা যে আরও একটা দিন এখানে থাকতে চেয়েছিল সেই পরিকল্পনা বাতিল। সবাই তখনই জোহানেসবার্গে ফিরে যাবে। আমি চেষ্টা করেও হতাশা লুকাতে পারলাম না, লোরেন আর আমি একাকী হতেই ওকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম, ও উপরের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ক্রোধান্বিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো।

“বিয়ে না করে কী যে সৌভাগ্যের কাজ করেছো, বেন। মাই গড–মেয়ে মানুষ!”

সপ্তাহখানেকের জন্য মুন সিটির জীবনযাত্রা আবার আগের মত স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে গেল, এর মাঝে র‍্যাল আর আমি মিলে আমাদের সমাধিকক্ষ খোঁজার কাজ চালিয়ে গেলাম আর আগের মতই লিপি উদ্ধারের কাজ করে গেল বাকিরা। এরকমই একটা দিনে, গনগনে দুপুরে যখন আমি আর র‍্যাল একটা ক্যামেল থর্নের যৎকিঞ্চিত ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমার পায়ের কাছে ঘাস ফুঁড়ে এক খর্বকায় অবয়ব উদয় হলো।

“সানবার্ড,” নরম স্বরে ডাকলেন ঝাই। “আমি অনেকদিন হেঁটে তোমার চাঁদমুখটা দেখতে এসেছি।” এরকম একটা প্রশংসা বাক্য শোনার পর আমার মনটা উনার প্রতি প্রসন্ন হয়ে গেল।

“র‍্যাল,” ডাকলাম আমি। “তোমার তামাকের পুঁটলিটা দাও তো, প্লিজ।”

আমরা সেদিন সারা বিকেল ক্যামেল থর্নের নিচে বসে আড্ডা দিয়ে কাটালাম। প্রাচীন আফ্রিকার কথোপকথন শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। প্রশ্ন আর উত্তরের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন মেনে চলা হয় এখানে, তাই ঝাই যে ব্যাপারে আলোচনা করতে এসেছেন সেটা পাড়তে পাড়তে সন্ধ্যা হয়ে এল প্রায়।

"সানবার্ডের কি ওই পাথরের ভেতরের কুয়াটার কথা মনে আছে, যেখানে আমরা হাতিটাকে মেরেছিলাম?"

সানবার্ডের সেটা খুব ভালোই মনে আছে।

"সানবার্ডের কি মনে আছে যে পাথরের গায়ে সাদা ভূতেরা যেসব গর্ত বানিয়েছিল সেসবের কথা?"

সানবার্ড ওগুলো জীবনেও ভুলবে না।

"ওই গর্তগুলো সানবার্ড আর ওই বিশাল সোনালি মানুষটাকে খুবই আনন্দ দিয়েছিল, তাই না?"

আসলেই দিয়েছিল।

"সেদিনের পর থেকে শিকার করার সময় আমি খুব খেয়াল করে পাহাড়ের গায়ে নজর বুলাই। সানবার্ড কি এরকম আরেকটা জায়গায় যেতে চায় যেখানে এরকম আরও অনেকগুলো গর্ত আছে?"

চাই না মানে!

"আমি তোমাকে নিয়ে যাবো," কথা দিলেন ঝাই।

"আর আপনি যত চান, তত তামাক দেবো।" আমিও কথা দিলাম ওকে আর দুজনের চেহারাই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো হাসিতে।

"এখান থেকে কত দূরে জায়গাটা?" জিজ্ঞেস করলাম আমি, উনি ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন। উনি জানালেন এটা নাকি 'বিশাল বেড়া'-টার পেছনে। এই বেড়া আসলে রোডেশিয়ার সীমানা বরাবর ৩০০ মাইলব্যাপী শিকার ধরার এলাকা চিহ্নিত করে দেওয়া পাঁচিল বলা চলে, যেটা বসানো হয়েছে বন্য প্রাণীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যাতে করে ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ না ছড়ায়। তার মানে যেতে হলে আমাদেরকে রোডেশিয়ার অনুমতি নিতে হবে। আর যখন ঝাই এলাকাটার বর্ণনা দিলেন তখন স্পষ্টতই বোঝা গেল যে ওটা জাম্বিয়া আর জাম্বেজি নদীর মধ্যবর্তী সীমানার খুব কাছে। ওখানে খোঁজাখুঁজির আয়োজন করতে হলে লোরেনকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে আগে। তাছাড়া জায়গাটায় নিয়মিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

ঝাই আমার সাথে ক্যাম্পে যেতে রাজি হলেন না, কারণ ওখানে ওনাদের চিরশত্রু বান্টু দিয়ে ভরা। বরং আমরা তিনদিন পরে এই ক্যামেল থর্নের নিচেই দেখা করবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই কদিনে ঝাই ওনার ফাঁদ পাতার সরঞ্জাম তৈরি করে ফেলবেন।

ভাগ্য ভালো যে সেদিন সন্ধ্যায় ফোন করে লোরেনকে পেয়ে গেলাম, এক ঘণ্টা আগেই নাকি ও মাদাগাস্কার থেকে ফিরেছে।

"কোনো সমস্যা, বেন?" রেডিয়োর ভেতরে ওর গলা গমগম করে উঠলো।

"কোনো সমস্যা না, লো। তোমার পিচ্চি বুশম্যান দোস্ত আরেকটা প্রাচীন সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে। আমাকে সাদরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে ওখানে।"

“সে তো খুবই ভালো, বেন। আগের খনিটায় এর মধ্যেই উত্তোলন শুরু হয়ে গিয়েছে, দেখে-শুনে মনে হচ্ছে বেশ ভালোই মাল আছে ভেতরে।”

“কিন্তু ঝামেলা অন্য জায়গায়, লো। ওটা রোডেশিয়ায়, নিষিদ্ধ এলাকায়।”

“সমস্যা নেই, বেন। আমি দেখছি ব্যাপারটা।”

পরেরদিন সন্ধ্যায় আবার কথা হলো আমাদের।

“এই সপ্তাহের সোমবারে ঠিক করা হয়েছে সব। পান্ডা মাতেঙ্গা সীমানার গেট থেকে একদল রোডেশিয়ান পুলিশ আমাদের সাথে যাবে।”

“আমাদের মানে? ” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

“আমি দুটো দিন ফাঁকি মারবো, বেন। কোনোভাবেই না এসে পারছি না। তুমি বুশম্যানটাকে নিয়ে চলে আসো, ল্যান্ড রোভার নিয়ে পান্ডা মাতেঙ্গার ভেতর দিয়ে চলে যাও। আমি বুলাওয়ে থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে আসবো। দেখা হবে তাহলে। সোমবার সকালে। ঠিক আছে?”



পুলিশের দলের কমান্ডার এক গাট্টাগোট্টা বালকসুলভ চেহারার রোডেশিয়ান তরুণ। আচার-ব্যবহারে একেবারে নিপাট ভদ্রলোক, দেখেই বোঝা যায় যেনিজের কাজ জানে এ, সেটাই আমাকে আশ্বস্ত করল সবচেয়ে বেশি। ছেলেটা নাকি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর। সাথে একজন আফ্রিকান সার্জেন্ট আর পাঁচজন কনস্টেবল। লোকটার পদমর্যাদা আর আমাদের রক্ষীদলের সদস্যদের দেখেই বুঝলাম যে লোরেন আসলে কোন পর্যায়ে সহায়তার জন্য আবেদন করেছে।

ওদের সাথে আছে দুটো ল্যান্ড রোভার, দুটোরই বনেটে মাঝারি মেশিনগান বসানো, বাকি সদস্যদের সাথে থাকা অস্ত্রপাতিও যথেষ্ট সমীহ জাগানিয়া, কারণ আমরা এমন দুই দেশের সীমানায় যাচ্ছি, যেখানে উত্তরদিক থেকে অব্যাহতভাবে সন্ত্রাসী দখলদারেরা এসে নিয়মিত হয়রানি করে যায়।

“ডক্টর কাজিন,” বলে ইন্সপেক্টর স্যালুট করল আমাকে, আমরা করমর্দন করলাম। “আমার নাম ম্যাকডোনাল্ড। অ্যালিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। আমার লোকদের সাথে কথা বলিয়ে দেব?”

বাকিরা ছিল ম্যাটাবেলে, বাকি সবাই। বিশাল চাঁদের মত গোলগাল মুখের অধিকারী, শাকা[৫৯]-র যোদ্ধা জাতির উত্তরপুরুষ, ১৫০ বছর আগে

[৫৯]জায়গা

বিদ্রোহী জেনারেল এমজিলিকাজি ওদেরকে নিয়ে আসেন এখানে। সবার পরনে ক্যামোফ্লেজ পোশাক আর মাথায় জঙ্গলের নরম টুপি। ম্যাকডোনাল্ড আমাকে ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় সিনা টানটান করে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সবাই।

"ইনি হচ্ছেন সার্জেন্ট এন্ডাবুকা।" যেই আমি পরিচয় দানের প্রত্যুত্তরে সাবলীল সিন্ডেবেলে ভাষায় জবাব দিলাম, লোকটার কঠোর মলিটারি মুখভঙ্গি বদলে গিয়ে বিশাল ঝকঝকে একটা হাসিতে পরিণত হলো।

ঝাই অবশ্য এতসব লোকের সামনে জবুথবু হয়ে রইলেন। একটা কুকুরছানার মত আমার পিছু ছাড়লেন না মুহূর্তের জন্যেও।

"একটা ব্যাপার জানেন নাকি ডক্টর, ব্রিটিশ সাউথ আফ্রিকা পুলিশের প্রতি একটা মাঠপর্যায়ের নির্দেশ আছে, যেটা এখনও তুলে নেওয়া হয়নি," ঝাইয়ের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ম্যাকডোনাল্ড। "সেটা হচ্ছে দেখামাত্র সব বুশম্যানকে গুলি করার নির্দেশ। আমি জীবনে এই প্রথম এদের কাউকে দেখলাম। বেচারা অসভ্যের দল।"

"হ্যাঁ," আমিও ওই নির্দেশটার কথা শুনেছি, যদিও এটার ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে, কিন্তু বিগত শতাব্দীতে মানুষের মন-মননের একটা নিখুঁত পরিচয় এটা থেকে পাওয়া যায়। একটা সময় বুশম্যান নিধনের মহামারী শুরু হয়েছিল, যখন শ'খানেক অস্ত্রসজ্জিত লোক একত্র হয়ে কমান্ডো দল গঠন করে বের হতো এই ছোটখাটো হলদে রঙের মানুষগুলোকে খুন করতে, যেন এরা খুবই ভয়ানক কোনো জানোয়ার।

শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, উভয় পক্ষই নির্মমভাবে শিকার করেছে ওদেরকে। যে পাশবিকতা দেখানো হয়েছে তা ছিল ভয়াবহ। কোথাও দেখা গেলেই গুলি করা হতো–বা আরও খারাপ। ১৮৬৯ সালে রাজা খামা, সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার কথা বলে খাবারের নিমন্ত্রণ করে একটা পুরো গোত্রকে ডেকে আনেন। যখন অস্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে রাজার দরবারে গিয়ে বসে ওরা, রাজার সৈন্যদল তখন আটক করে ফেলে তাদের। রাজা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের উপর অত্যাচারের ব্যাপারটা পরিচালনা করেন। চতুর্থ দিন শেষ বুশম্যানটাও মারা যায়। এই ইতিহাস মাথায় রাখলে ঝাই যে কখনোই আমার এক হাতের বাইরে যাচ্ছেন না, ভীতসন্ত্রস্ত কুতকুতে চোখে এই বিশাল অপরিচিত লোকদেরকে দেখছেন–সেটা অবাক করার মত কিছু না।

আমি ম্যাকডোনাল্ডকে আমাদের আনুমানিক গন্তব্য সম্পর্কে একটা ধারণা দিলাম; ঝাইয়ের বর্ণনা থেকে যেটুক আন্দাজ করতে পেরেছি, সেটা ইন্সপেক্টরের মানচিত্রে দেখিয়ে দিলাম। দেখেই তার চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল। নাকের মাথা থেকে খানিক রোদে পোড়া চামড়া তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে জবাব দিল ও।

"জায়গাটা বিশেষ সুবিধার না, ডক্টর।" তারপর চলে গেল ওর লোকজনের সাথে কথা বলতে।

দুপুর নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব দিকের গাছের মাথাগুলোর উপর দিয়ে ভটভট করতে করতে এসে হাজির হলো হেলিকপ্টার। লোরেন লাফিয়ে নামলো ওটার পেট থেকে, নিজের ব্যাগ নিজেই বইছে।

"স্যরি বেন, দেরি হয়ে গেল। নিউ ইয়র্ক থেকে একটা ফোন আসার কথা ছিল।"

ম্যাকডোনাল্ড এগিয়ে এসে ওর ক্যাপের কিনারা উঁচু করল একটু।

"আফটারনুন, স্যার।" আচরণে শ্রদ্ধা ফুটে বের হচ্ছে ওর। "প্রধানমন্ত্রী ওনার তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, মিস্টার স্টারভেসান্ট। আর বাকিটা সময় আমিই দায়িত্বে থাকবো আপনার।"

টেটে-এর কাছাকাছি পশুর খামারি এলাকায় পৌঁছে আমরা মূল সড়ক থেকে নেমে গেলাম, এরপর ছুটলাম উত্তর দিকে জাম্বেজি নদীর অভিমুখে। সামনের ল্যান্ড রোভারে আছে ম্যাকডোনাল্ড, সাথে ড্রাইভার একজন আর মেশিনগানে বসে আছে একজন সৈনিক। আমরা ছিলাম মাঝে, লোরেন চালাচ্ছে গাড়ি আর প্যাসেঞ্জার সিটে শটগান হাতে বসে একজন। ঝাই আর আমি বসেছি পেছনে। পুলিশের দ্বিতীয় ল্যান্ড রোভারটা পেছনের দিকটা পাহারা দিচ্ছে। ওটায় সার্জেন্ট এন্ডাবুকা রয়েছে কমান্ডে।

ধীরে ধীরে বিরান সমভূমি শেষ হয়ে এল, গাড়ির বহর মোপেন বনের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে এগোতে লাগল। ছোট ছোট গ্রানাইটের টিলা পেরোতে হলো মাঝে মাঝে। কোনদিকে যেতে হবে সে ব্যাপারে কোনো দ্বিধা জাগলেই ঝাই হাত তুলে নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, আমরা আবার এগোচ্ছিলাম সেদিকে। কখনও এবড়ো-থেবড়ো জায়গায় ঝাঁকি খেতে খেতে এঁকেবেঁকে, কখনও বাদামি ঘসের দঙ্গলের উপর দিয়ে মসৃণভাবে। কিছুক্ষণ পর টের পেলাম যে ঝাই আসলে আমাদেরকে হাতির চলার রাস্তা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ওই বিশাল জানোয়ারগুলো নদীর ধার থেকে দক্ষিণ দিকে ওয়াঙ্কির শিকার সংরক্ষিত এলাকার অভয়ারণ্যের দিকে যাওয়ার সময় ভেঙ্গে-চুরে রাস্তা তৈরি করে রেখে গিয়েছে। রাস্তা বাছার ক্ষেত্রে খুবই দক্ষ হাতিরা, এমন একটা রাস্তা বেছে নেয় যেটা ধরে যেতে গেলে সবচেয়ে কম কষ্ট হয়। দেখা গেল সবসময়ই রাস্তাটা সহজ জায়গা ধরে এগিয়েছে, পাহাড়ের ফাঁকের নিচু জায়গা, বা অল্প ঢালু নদীবক্ষ দিয়েই চলার জন্য বাছাই করেছে ওরা।

এরকমই একটা নদীর ঢালে তাঁবু গাড়লাম আমরা। নদীবক্ষ শুকিয়ে কাঠ, ফাঁকে ফাঁকে মসৃণ কালো পাথরের চাঁই মাথা তুলে আছে, সূর্যের আলো লেগে সরীসৃপের মত ঝিলিক মেরে উঠছে ওগুলো। নদীর পাড় চিনির মত সাদা বালু দিয়ে ভরা, এখানে সেখানে লম্বা লম্বা নলখাগড়ার ঝোঁপ আর চটচটে সবুজ পানিতে ভরা একটা ডোবা দেখা গেল, উপরে ফিভার গাছের শাখা ঝুলছে।

নদীর পেছনে ভূমি খাড়াভাবে সোজা উপরে উঠে আরও একটা পাথুরে পর্বতশ্রেণী তৈরি করেছে, মেরুলা গাছ আর ছোট ছোট ঝোঁপ বিন্দু বিন্দু হয়ে ফুটে আছে ওগুলোর পটভূমিতে। যা হোক, নদীর এই পাড়ে ঝোপঝাড় একদমই উন্মুক্ত, তাঁবুর চারপাশে যে কোনো দিক থেকে গুলি করা সম্ভব হবে। ম্যাকডোনাল্ড গাড়ি তিনটাকে তিনদিকে বসিয়ে ত্রিভুজাকৃতির একটা প্রতিবন্ধক তৈরি করল। আর যখন ও রক্ষীরা কোথায় বসবে সেই নির্দেশনা দিচ্ছিল, আমি আর লোরেন, ঝাইয়ের পিছু পিছু ডোবাটার ধারে চলে গেলাম।

ডোবার পাড়ের পাথরের উপর বসে, আমরা সবুজ পানির উপর ফিভার গাছটার ডালে ঝুলতে থাকা ঘাস দিয়ে বোনা বাবুই পাখির বাসা দেখতে পেলাম কয়েকটা। পাখিরা ওদের বাসার চারপাশে কিচির-মিচির করে ওড়াউড়ি করছে।

লোরেন ঝাইকে একটা সিগার দিল; আমরা যখন কথা বলতে লাগলাম, পিচ্চি বুশম্যানটা এক মুহূর্তের জন্যেও আমাদের চেহারা থেকে দৃষ্টি ফেরালো না। ঠিক যেন একটা প্রভুভক্ত কুকুর। খাপছাড়া আলাপ করছিলাম আমরা, এলোমেলো এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছিলাম থেকে থেকে। লোরেন আমাকে দ্বীপগুলোতে ওর হোটেলের প্রকল্প সম্পর্কে জানালো। এটার সাফল্যের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ও।

"এই ব্যবসাটা আমার সেরাগুলোর একটা হবে, বেন।" আর আমি যখন ওর অন্যান্য সেরা ব্যবসাগুলোর কথা ভাবলাম–গবাদি পশুর খামার, হীরার খনি, স্বর্ণ, ক্রোম আর তামা–তাতেই বুঝে গেলাম যে প্রকল্পটা আসলে কতটা বড় হতে যাচ্ছে।

আমি হিলারির সাথে ঝামেলা নিয়ে হালকা একটু কথা পাড়লাম।

"মাই গড, বেন। মেয়েরা যদি শুধু বুঝতো যে বিয়ের কাবিন দিয়ে ওরা তোমাকে কিনে ফেলেনি!" এরকম আরও তিনজন ছিল যারা বহু কাহিনির পর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, আশা করছি হিলারি চার নম্বর হবে না।

ম্যাকডোনাল্ড যখন আমাদের ডাকতে এল তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়।

"মাফ করবেন, মিস্টার স্টারভেসান্ট। এখন মনে হয় গাড়ির সীমানার ভেতর চলে আসলে ভালো হবে। অযথা ঝুঁকি নেওয়াটা পছন্দ না আমার।" আর লোরেনও ভালো মানুষের মত ওর সিগারের গোড়াটা ডোবার পানিতে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো।

"একসময় এই দেশে মানুষ তার খুশিমতো যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারতো। দিন আর আগের মত নেই, বেন।"

তাঁবুতে ফিরে দেখি একটা ঘিরে রাখা আগুনে কফি বসানো হয়েছে, ধূমায়িত মগে চুমুক দিতে দিতে খেয়াল করলাম ম্যাকডোনাল্ড আমাদের জন্য কী কী ব্যবস্থা করেছে। ওর চেহারা দেখে যে ভরসা করেছিলাম তা যে ভুল

নয়, সেটারই প্রমাণ পেলাম। নিজের পাহারা দেওয়ার সময় শেষ করে আমাদের পাশে এসে বসল ও।

“আপনাদেরকে আরও আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, আপনারা কি এফএন রাইফেল আর সিক্সটি ক্যালিবারের রাইফেল চালাতে পারেন?” লোরেন আর আমি দুজনেই জানালাম যে আমরা পারি।

“যাক,” বলে ম্যাকডোনাল্ড সুদূর উত্তরে ফিরে তাকালো। “সীমানার যত কাছে যাচ্ছি, ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ছে। ইদানিং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিমাণ আশংকাজনক হারে বেড়ে গিয়েছে। ঘোঁট পাকাচ্ছে ওরা।”

বলতে বলতে ও নিজেও এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে একটা চুমুক দিল।

“তো, জেন্টলম্যান, কালকের পরিকল্পনা কী? গন্তব্য থেকে কত দূরে আছি এখন?” জানতে চাইলো ম্যাকডোনাল্ড।

আমি ঝাইয়ের দিকে চাইলাম। “পাথরের গায়ের ছিদ্রের জায়গাটা আর কতদূর, ভাই?”

“সূর্য এভাবে আসার আগেই পৌঁছে যাবো,” চিকন হাতটা দিয়ে দুপুরকে ইঙ্গিত করলেন উনি। “আমার লোকেরা ছিদ্রঅলা পাথরের কাছের পানির ডোবার কাছেই আছে এখন। আমরা গিয়ে আগে ওদেরকে খুঁজে বের করবো, কারণ ওরা আমার ফিরে আসার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছে।”

আমি তাকিয়ে রইলাম ওনার দিকে, আমার প্রতি ঝাইয়ের বন্ধুত্বের পরিসীমাটা এই প্রথম টের পেলাম। তারপর লোরেনের দিকে ফিরে বললাম, “ব্যাপারটা ভাবতে পারো, লো, এই পিচ্চি শয়তানটা প্রায় একশো পঞ্চাশ মাইল পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন শুধু আমাদেরকে এমন একটা কথা বলতে যেটা ওনার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদেরকে আনন্দ দেবে।”

“মানে?”

“যেই উনি ওই প্রাচীন খনিটা আবিষ্কার করেছেন সাথে সাথে গোত্রের সবাইকে ওখানে ফেলে রেখে আমাকে খবর দিতে বেরিয়ে পড়েছেন।”

সেই রাতে ঝাই আমার আর লোরেনের মাঝে ঘুমালেন। এখনও বিশালদেহী ম্যাটাবেলে সৈন্যদেরকে এক ফোঁটাও ভরসা করতে পারছেন না।

পরদিন সকাল এগারোটার দিকে আমরা উত্তর দিকের আকাশে শকুন দেখতে পেলাম। ম্যাকডোনাল্ড যাত্রা থামিয়ে আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে এল।

“কিছু একটা হয়েছে সামনে। হয়তো সিংহ শিকার ধরেছে...কিন্তু আমাদের কোনো ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।”

ঝাই সিট থেকে নেমে ল্যান্ড রোভারের ছাদে উঠে গেলেন। মিনিটখানেক দূরের পাখিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলেন ভালোভাবে, তারপর নেমে এসে এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

“আমার লোকেরা একটা বিশাল জানোয়ার মেরেছে। সম্ভবত কোনো মহিষ, সে জন্যই পাখিরা আমাদের থাকার জায়গার উপর উড়ছে। ভয়ের কিছু নেই। সামনে যাই চলুন।”

আমি ম্যাকডোনাল্ডোকে অনুবাদ করে শোনালাম, মাথা ঝাঁকালো ও।

“ঠিক আছে ডক্টর, তবে আমরা আগের মতই খুব খেয়াল করেই এগোবো।”

একটা কাদা আর নোংরা পানিতে ভরা ডোবার পাশে পাঁচটা ভাঙ্গাচোরা থাকার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে বুশম্যানের দলটা। ঘরের কাঠামো বানাতে গিয়ে ওরা গুটিকয়েক গাছের ডাল ভেতরের দিকে বাঁকা করেছে শুধু, এরপর উপরে ঘাস আর পাতা দিয়ে ছেয়েছে। গাড়িতে করে ছোট্ট বস্তির কাছে যাওয়ার পরেও কোনো আগুন বা ছোট ছোট হলুদ লোকগুলোর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না কোথাও। ঝাইকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাতে লাগল, ঘন ঝোপের ভেতর পাখির মত গলা বাড়িয়ে খুঁজতে খুঁজতে দাঁতের ফাঁক দিয়ে নরম সুরে শিস দিতে লাগলেন। বস্তির চারপাশের সবগুলো গাছের মাথায় শকুনের দল বসে আছে, আমরা এগোতেই আচমকা কুঁড়েগুলোর ভেতর থেকে হট্টগোলের আওয়াজ পাওয়া গেল আর বিশ বা তিরিশটা বিশাল কুৎসিত পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল বাতাসে।

ঝাই নরম সুরে কান্নার মত করে ডেকে উঠলেন। আমি ঠিক বুঝলাম না যে কী হয়েছে আসলে, শকুনের দল গাছের ডাল ছেড়ে যে কুঁড়ের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে সেটা খুব বেশি আশ্চর্যের কিছু না, তবে ঝাই সেটা থেকেই অনুমান করে নিতে পারলেন। নিজের সিটে বসে দুলতে শুরু করলেন উনি, তারপর বুক চাপড়াতে চাপড়াতে নিচু স্বরে আর্তনাদ করতে লাগলেন।

ল্যান্ড রোভারটা থামিয়ে নেমে এল ম্যাকডোনাল্ড। কিন্তু এগোতে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা কিছু একটায় হোঁচট খেয়ে পড়তে গেল, সেটা সামলে দাঁড়িয়ে কিছু একটা আদেশ দিল ও। ওর সৈনিকেরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে অস্ত্র বাগিয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। লোরেন আমাদের ল্যান্ড রোভারটাও দাঁড় করালো একপাশে, আমরা নেমে কুঁড়েগুলোর মাঝে ম্যাকডোনাল্ড যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ঝাই পড়ে রইলেন পেছনের সিটেই, দুলছেন আর বিলাপ করছেন।

বান্টুদের কাছে বুশম্যান মেয়েরা ওদের উদ্ভট যৌনলিপ্সা পূরণের এক মাধ্যম। আমি জানি না এর পেছনের কারণটা কি, হয়তো ওদের স্বর্ণালি হলুদাভ গায়ের রঙ, অথবা ওদের ছোট ছোট পুতুলের মত অবয়ব। ওরা ঝাইয়ের দলটার মহিলাদেরকে ধর্ষণ করেছে, প্রত্যেককে, এমনকি বাচ্চারাও রেহাই পায়নি। এরপর বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে করুন অবস্থায় ফেলে চলে গিয়েছে। ঘাল আর বাকি পুরুষ দুজনকে গুলি করে হত্যা করেছে।

অটোম্যাটিক রাইফেলের ঝাঁঝরা গুলিতে ওদের দেহ এত বেশি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে যে ছিন্নভিন্ন মাংসের ভেতর থেকে হাড্ডির চলটা আর টুকরো বেরিয়ে আছে। রক্ত জমে কালো রঙের ধারা তৈরি করে আশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা তৈরি হয়েছে। মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে সব জায়গায়, বিশাল বিশাল ভয়াল দর্শন সবুজ মাছি যেগুলো মৌমাছির মত ভোঁ ভোঁ করতে করতে আমার ঠোঁট আর চোখের উপর এসে বসার চেষ্টা করতে লাগল। আমি রেগেমেগে ওগুলোকে হাত দিয়ে বাড়ি মেরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পাখিগুলো লাশের উপর ছিল এতক্ষণ; এটাই হলো এখানকার সত্যিকার বীভৎস ব্যাপার।

"গড," বলল লোরেন। "ও গড। কেন? এই কাজ করেছে কেন?"

"ওদের কারবারই এরকম," ম্যাকডোনাল্ড জবাব দিল। "ফ্রেলিমো, মাউ মাউ, ওরা সবাই-ই নিজেদের লোকজনের উপরেই বেশি অত্যাচার করে।"

"কিন্তু কারণটা কী?" আবার জানতে চাইলো লোরেন।

"ওদের হাতে অস্ত্র আছে। আর সেগুলো ব্যবহারের জন্য হাত নিশপিশ করে। শ্বেতাঙ্গ খামারি বা পুলিশের পোস্ট আক্রমণের চাইতে এটা অনেক বেশি সহজ।" পুলিশের দুজন সৈনিক কোনো একটা ল্যান্ড রোভার থেকে একটা তেরপল নিয়ে এল। তারপর লাশগুলো মুড়ে ফেলতে শুরু করল সেটায়। আমি আমাদের গাড়ির কাছে গিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আচমকা আমার কেমন অসুস্থ বোধ হতে লাগল, মনে হলো পেটের ভেতরের যা আছে সব বেরিয়ে আসবে। গলার কাছে তেতো এসিড উঠে এল, পেটে মোচড় দিয়ে বমি করে দিলাম আমি।

উঠে দাঁড়িয়ে জামার হাতা দিয়ে মুখ মুছে সোজা হয়ে তাকাতেই দেখি ঝাই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। লোকটা নিজের জীবন বাদে আর সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছেন বলা যায়। ওই কালো চোখজোড়ায় যে কী পরিমাণ বিষাদ, কী পরিমাণ যন্ত্রণা ওই কুঁচকে যাওয়া চেহারায়, দেখে আমার মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ডটা ধরেই টান দিয়েছে কেউ।

"কাজটা কে করেছে, সেটা খুঁজে বের করি চলুন, সানবার্ড," ফিসফিস করে বললেন ঝাই, তারপর বস্তির চারপাশের ছোট ছোট ঘাসের দিকে এগিয়ে গেলেন। দ্রুত কাজ করতে লাগলেন উনি, ঠিক একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের মত।

বালিময় মাটিতে পিতলের ঝকঝকে কার্ট্রিজ কেস পড়ে আছে এখানে সেখানে। জিনিসগুলো দুই নম্বর, গায়ে চাইনিজ ভাষায় লেখা, কয়েকশো কমপক্ষে। বন্দুকধারীরা বাচ্চাদের মত আহ্লাদে গুলি করেছে, আক্ষরিক অর্থেই গুলি বৃষ্টি হয়েছে এখানে। মাটিতে শেভরনের[৬০] মত ছাপ ফেলেছে ওদের

---

[৬০]পাশাপাশি অনেকগুলো V বসালে যেরকম হয়

বুট। যে পরিমাণ মাটি খুবলে উঠেছে, ঘাস মাড়ানো হয়েছে, তাতে মনে হলো কয়েকশো লোক এসেছিল কমপক্ষে।

"রাতের বেলা এসেছিল ওরা," নরম গলায় ব্যাখ্যা করলেন ঝাই। "দেখুন! এই এখানে দাঁড়িয়ে ছিল।" ঝোপগুলোর মাঝের একটা থেঁতলানো জায়গা দেখালেন উনি। "অনেক মানুষ ছিল ওরা।" বলে ওনার দুই হাতের আঙুল ছড়িয়ে দেখালেন, তিনবার। মানে তিরিশজন...বিশাল দল। "ভোরবেলা আক্রমণ করে। গতকাল ভোরে।" তার মানে বত্রিশ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলাম যে ওরা এতক্ষণে বহুদূর চলে গিয়েছে। আবার যখন গাড়ির কাছে ফিরলাম, ততোক্ষণে নয়টা লাশই ক্যানভাসে মুড়ে সার বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে, ঠিক যেন কোথাও পাঠানোর জন্য পার্সেল। চারজন সৈনিক মাটি খুঁড়ছে, সবাইকে একসাথেই কবরস্থ করা হবে।

ঝাই মৃতদেহের সারির পাশে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন। এখন অবশ্য কোনো শব্দ করছেন না, এই নীরবতাই বরং ওর অসহায় আর্তনাদের চাইতে বেশি পীড়া দিতে লাগল। সামনের দিকে ঝুঁকে, যেন ভয় পাচ্ছেন এমনভাবে সবুজ ক্যানভাসে মোড়া লাশের গাদাটা স্পর্শ করলেন। একটা চিন্তা এল মাথায়, এই ছোট মানুষগুলোর কতজনকে এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে তার গোত্রের লোকের গণহত্যার জন্য উবু হয়ে শোক করতে হয়েছে? ঠিক এরকম সময়গুলোতেই আমাদের এই ভূমির বর্বর হিংস্রতাকে ঘেন্না লাগে আমার। ঝাইয়ের শোক সহ্য করতে পারছিলাম না আমি, তাই লোরেন আর ম্যাকডোনাল্ড যেদিকে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল, সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

"বিশাল দল একটা, বেন।" কাছে যেতেই লোরেন বলল আমাকে।

"ঝাই বললেন তিরিশজন নাকি ছিল," বললাম আমি, লোরেন মাথা ঝাঁকালো।

"সেরকমই। ইন্সপেক্টর বলছেন যে আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত, আমিও ভেবে দেখলাম ওনার কথা শোনাই ভালো হবে।"

ম্যাকডোনাল্ড ব্যাখ্যা করল, "যদি ভুল করে ওদের মুখোমুখি হয়ে যাই তাহলে বিপদ হয়ে যাবে। ওরা আমাদের চাইতে সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশি, ডক্টর। এই শুয়োরগুলো দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আর সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। এখন আর কয়েক বছর আগের মত অবস্থা নেই যে ওরা নিরীহ কাউকে শুধু অস্ত্র হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। এখন আসলেই মারাত্মক ওরা, আমাদের সাথেও খুব বেশি অস্ত্রপাতি নেই। আমাদের যত দ্রুত সম্ভব চলে যাওয়া উচিত এখান থেকে। তারপর হেলিকপ্টারকে খবর দিলেই হবে। একবার ওদের অবস্থান বের করতে পারলেই হান্টার জেটগুলো নাপাম বোমা দিয়ে একটা ডলা দিয়ে দিতে পারবে।"

"হুম," সায় দিলাম আমিও। এই ভয়াবহতার মধ্যে ওই প্রাচীন খনির গুরুত্ব আর নেই। সৈনিকরা যেখানে লাশগুলো কবরে নামাচ্ছিল সেখানে

তাকালাম আমি। ঝাই পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছেন সব। কবরটা ঝুরো মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পরে আমি ঝাইয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে ওনার কাঁধে একটা হাত রাখলাম।

"চলুন, ভাই," বলে আমি ওনাকে ল্যান্ড রোভারটার কাছে নিয়ে গেলাম। গাড়ির বহরটা ঘুরে আবার ঠিক আগের ক্রমেই ফিরে যেতে লাগল দক্ষিণ দিকে।

যাত্রাটা ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তা আর টানটান উত্তেজনার এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে লাগল। এই এবড়ো-থেবড়ো আর ভাঙ্গা মাটির উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার থামা আর গিয়ার পরিবর্তনের প্রয়োজন হচ্ছিল, সেটার আওয়াজ আমাদের গমনপথকে সম্প্রচার করে দিচ্ছিল অনেকটা সামনে পর্যন্ত। প্রতি মাইলে এরকম অনেক জায়গা ছিল যেগুলো ওঁত পেতে থেকে আক্রমণ করার জন্য একদম আদর্শ, রাস্তার দুই পাশেই ঘন ঝোপের আবডাল। রাস্তায় আমাদের আসার সময়ের গাড়ির চাকার দাগ একদম পরিষ্কারভাবে ফুটে আছে, ফেরার জন্যেও আমাদেরকে এদিক দিয়েই যেতে হবে। ওদেরও সেটা বোঝার কথা, সুতরাং আমাদের জন্য পথের আশপাশেই অপেক্ষা করবে। ওদের কাছে ল্যান্ডমাইনও থাকতে পারে। আমরা তাই উদ্বিগ্ন চোখে খেয়াল রাখতে লাগলাম, রাস্তার মাটিতে খননের কোনো আলামত দেখা যায় কিনা সেই আশঙ্কায়। আমরা সবাই প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছিলাম। লোরেন চুপচাপ গম্ভীর মুখে চালাচ্ছে গাড়ি, ঠোঁটের কোণে সিগার ধরে রেখেছে একটা অনেকক্ষণ, কিন্তু ধরানোর কথা ভুলেই গিয়েছে সম্ভবত।

"আশপাশে কোনো পশু পাখি নেই, খেয়াল করেছো, বেন?" আচমকা জিজ্ঞেস করল লোরেন। ওর কথা ঠিক। বুশম্যানদের বস্তিটা ছাড়ার পর থেকে আর কোনো বন্য প্রাণী চোখে পড়েনি আমার, অথচ যাওয়ার সময় আমাদের গাড়ির সাথে সাথেই চলছিল ওরা, এমনকি সুদৃশ্য বাদামি ইম্পালা হরিণের কোনো পালও দেখা গেল না।

"ব্যাপার সুবিধার লাগছে না আমার, লো।"

"আমার অবস্থায় স্বাগতম," ঘোঁত ঘোঁত করে বলল লোরেন।

"বত্রিশ ঘণ্টায় তো হারামজাদাগুলো বহুদূর চলে যেতে পারবে। যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে এখন।" কোলের রাইফেলটার গুলির পরিমাণ নির্দেশক সুইচটা অস্থিরভাবে টানাটানি করতে লাগলাম আমি। হেভি মেশিনগানে বসে থাকা দুই সৈনিকের বেকার রাইফেল দুটো জোর করেই ম্যাকডোনাল্ড আসার সময় ধরিয়ে দিয়েছিল আমাদেরকে। এখন বেশ খুশি হলাম এটার জন্য। কাঠ আর ইস্পাতের এই যন্ত্রটাই এখন সবচেয়ে বেশি ভরসা দিচ্ছে।

আচমকাই আমাদের সামনের ল্যান্ড রোভারটা মাটি ঘষড়ে ঘ্যাচ করে থেমে দাঁড়ালো, লোরেনও সর্বশক্তিতে ব্রেক চেপে পেছনে ঝোলানো

রাইফেলটা তুলে নিল হাতে। আমরা আমাদের অস্ত্র বাগিয়ে বসে রইলাম, চারপাশের পাথর আর ঝোপঝাড়ে ভরা বিরান জায়গাটার ভেতর আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখছি। আর কান খাঁড়া করে রেখেছি মেশিন গানের গা শিউরানো গর্জন শোনার জন্য। দীর্ঘ একেকটা সেকেন্ড যেতে লাগল আর আমার মনে হলো আমার বুকের ধুকপুকানিই বুঝি কানে তালা লাগিয়ে দেবে!

"স্যরি," ম্যাকডোনাল্ড সামনে থেকে জানালো। "ফলস অ্যালার্ম!"

আবার চালু হলো ইঞ্জিন, আফ্রিকার এই পরম নিস্তব্ধতায় সেটাকে খুবই নৃশংস বলে মনে হলো আমার, আবার এগোলো গাড়ির বহর।

"ক্রাইস্টের দোহাই, ওই জিনিসটা নিয়ে অযথা নড়া-চড়া বন্ধ করো!" খামাখা আমার দিকে চেয়ে চেঁচালো লোরেন। আমি খেয়ালই করিনি যে আবার কখন রাইফেলের সুইচটা টানাটানি শুরু করেছি।

"স্যরি," অপরাধী গলায় ফিসফিস করলাম আমি। দুশ্চিন্তাটা সংক্রামক। লোরেনের হঠাৎ ক্ষেপে যাওয়া সেটারই একটা লক্ষণ, কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই কাঁধের উপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসলো ও।"এ তো স্রেফ খুন!"

মনে হলো অনন্তকাল পরে যেন আমরা একটা পাহাড় পেরিয়ে বনের ভেতর দিয়ে হাচড়ে পাচড়ে ঝাঁকি খেতে খেতে সেই জমে থাকা নোংরা পানির ডোবাটা আর শুকনো নদীবক্ষের কাছে পৌঁছালাম, যেটার কাছে গতকাল রাতে ক্যাম্প করেছিলাম। তীরের কাছে পৌঁছাতেই ম্যাকডোনাল্ড ইশারা করল বহরটাকে থেমে দাঁড়াতে। তারপর এগিয়ে এল আমাদের গাড়ির দিকে।

"গাড়িতে তেল ভরে নেই এখান থেকে, মিস্টার স্টারভেসান্ট। আমি সেটা দেখছি। আপনি দু-একজনকে সাথে নিয়ে একটু পানির কন্টেইনারগুলো ভরে আনলে ভালো হয়।"

লোরেন দুজন সৈনিককে সাথে করে দুটো পাঁচ গ্যালনের জেরি ক্যান নিয়ে এগিয়ে গেল ডোবার দিকে আর ম্যাকডোনাল্ডকে দেখলাম তেল ভরা শুরু করেছে। গরমে গ্যাসোলিনের বাষ্প মরীচিকার মত করে পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল উপরে, গন্ধে গলায় জ্বালা ধরে গেল আমার। একজন সৈনিক তেল ঢালতে গিয়ে সামনের গাড়িটার একপাশে চলকে ফেলে দিলে ম্যাকডোনাল্ড কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করে উঠলো তাকে।

"এখানেই থাকেন," ঝাইকে বললাম আমি। "কোথাও যাবেন না।" মাথা ঝাঁকালেন উনি। ল্যান্ড রোভারের পেছনের সিটেই বসে আছেন তখনও।

ওনাকে ওখানে রেখে আমি ডোবার ধারে লোরেনের কাছে এগিয়ে গেলাম। শান্ত সৌম্য একটা পরিবেশ, একদমই আফ্রিকার চিরচেনা রূপ। লম্বা লম্বা নলখাগড়ার দল, একটুও না বেঁকে ফোলা মাথা নিয়ে দুলছে। কালো কাদামাটি, তাতে হাজার হাজার পশুর পায়ের ছাপ, সবুজ, ঘন, আঠালো

পানি–তাতে কিছুক্ষণ পর পর বুদবুদ সৃষ্টি করছে নিচের জমা গ্যাস। বাবুই পাখি মাথা নিচের দিকে দিয়ে ওদের দুলতে থাকা বক্সের মত বাসা থেকে ঝুলছে। জেরি ক্যানগুলো ভরতে ভরতে সৈন্য দুজন আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে, লোরেন দাঁড়িয়ে আছে পাশেই, হাতে অটোম্যাটিক রাইফেল।

"আর ঘণ্টাখানেক যেতে পারলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে," কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল লোরেন। পকেট থেকে একটা সিগার বের করে সেটার মোড়ক খুলতে শুরু করল, তবে আশপাশের ঝোপঝাড়ের দিকে নজর বুলাতে বেখেয়াল হলো না।

পানির ধারে পড়ে থাকা পাথরগুলোয় সামান্য একটু সাদা দাগমতো কী যেন দেখতে পেলাম। ওটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সেদিকে তাকালাম আমি, পাখির বিষ্ঠা ভেবে নজর ফিরিয়ে নিতে যেতেই আরেকটা জিনিস নজরে এল আমার, আশংকায় শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত নেমে গেল নিচের দিকে। যেন কিছুই বুঝিনি এমনভাবে আমি ডোবাটার দিকে হেঁটে গেলাম, পায়ের ডগায় পৌঁছার আগে পর্যন্ত সাদা জিনিসটার দিকে তাকালামও না। তারপরে নিচে তাকাতেই গলার কাছে যেন দম আটকে গেল। প্রথমেই ইচ্ছে করল চিৎকার করে লোরেনকে সাবধান করি আর নিজে দৌড় লাগাই ল্যান্ড রোভারের দিকে, কিন্তু জোরপূর্বক সেই ইচ্ছা দমন করে অন্য আরেকদিকে ঘুরে তাকালাম। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের দৌড়াদৌড়ি আর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, আমি কোনোমতে জলের ধার থেকে একটা নুড়ি তুলে নিয়ে ডোবার পানিতে ছুঁড়ে মারলাম, ওটা ঝপ করে পানিতে পড়ে পানিতে বিশাল বিশাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে তলিয়ে গেল পানিতে। দ্রুত আমি আরেকবার তাকালাম নিচের দিকে।

সাদা জিনিসটা আসলে একটা গায়ে মাখার সাবানের টুকরো, তখনও ওটা ভেজা, ফেনা বের হয়ে হয়ে সারা গায়ে ফিতার মত করে জমা হচ্ছে। পাথরের গায়ে ভেজা ভেজা দাগ, এই প্রখর রোদেও শুকিয়ে যায়নি তখনও। পানির কিনারেও কাদা লেগে আছে। বন্য জানোয়ারের হাজার হাজার থাবা বা ক্ষুরের ছাপের মাঝে একটা পায়ের ছাপ। অদ্ভুত একটা অর্ধেক পায়ের ছাপ, যেন কোনো বিশাল পাখির নখর। বুড়ো আঙুলটা পায়ের বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, মাঝ বরাবর দুই ভাগ হয়ে গোড়ালি পর্যন্ত চলে গিয়েছে, আমার মনে হতে লাগল যে টিমোথি মাগেবা আমাকে কোনো একটা অটোম্যাটিক অস্ত্রের দেখার জায়গা দিয়ে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে।

মনে হলো চামড়ার নিচে কয়েক হাজার ভয়ের পোকা একসাথে কামড়ে ধরলো আমাকে। আমার শরীরের ভেতর দিয়ে বেয়ে বেয়ে স্নায়ুর গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেল ওগুলো। ধীরে ধীরে আমি লোরেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। সিগারটা ঠোঁটে ধরা, আমি কাছে পৌঁছাতেই দেয়াশলাই জ্বাললো একটা।

গোল করে ধরে রাখা হাতের ভেতর কাঠিটা ফস করে নীলাভ নাইট্রাস শিখায় জ্বলে উঠলো, ও ঝুঁকে গেল আগুনের উপর।

"লো," নরম গলায় বললাম আমি। "ঝট করে কিছু করতে যেয়ো না। যতটা সম্ভব স্বাভাবিক আচরণ করো। ওরা আছে এখানেই। আশপাশেই। আমাদেরকে দেখছে।"

"কোথায়?" জিজ্ঞেস করল ও।

"জানি না, তবে ওরা আছে খুবই কাছে। ম্যাক রেডি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে।"

"সৈন্য দুটোকে বলো," বলল লো।

সৈন্য দুজন জেরি ক্যানগুলোর ছিপি আটকাচ্ছিল, যেই ওরা আমাদেরকে ছেড়ে সামনে এগিয়ে গেল, আমি থামালাম ওদেরকে।

"খুব ধীরে ধীরে আগাও। ভুলেও তাড়াহুড়া করবে না। পেছন ফিরে তাকাবে না। শয়তানগুলো আছে এখানে। ইন্সপেক্টরের কাছে গিয়ে বলো গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিতে। চালু হলেই আমরা দৌড়ে চলে আসবো।"

ওরা মাথা ঝাঁকালো শুধু, মুখভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হলো না; সাথে সাথেই বুঝে ফেলেছে সব। আর ঠিক তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে আফ্রিকার সবচেয়ে চমৎকার সৈন্য হিসেবে এদের এত সুখ্যাতি কেন। ওরা শান্তভাবে শুকনো নদীর তীর বেয়ে এগিয়ে গেল, জেরি ক্যানগুলোর ওজনের কারণে নুয়ে পড়ছে একদিকে।

"শ্যুটিং গ্যালারিতে গুলি করার জন্য কাঠের বানানো হাঁস থাকে না? আমার নিজেকে সেরকম মনে হচ্ছে," বলে হাসার চেষ্টা করলাম আমি। সেটা বিকট মুখব্যাদান ছাড়া হলো না কিছুই। "আক্রমণ করতে ওরা দেরি করছে কেন?"

"সম্ভবত সবকিছু ঠিকমতো বসানোর সময় পায়নি।" বলে হাসলো লোরেন, ওরটা অবশ্য আমার চাইতে বেশ ভালো হলো। দেখে ভরসা পেলাম। "ওরা এখন যার যার জায়গায় সরে যাচ্ছে। এরপর অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না আমরা সবাই একসাথে এক জায়গায় জড়ো হই, এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে আক্রমণ করবে না।"

"ঈশ্বর, শালারা ঠিক কোথায় আছে সেটা যদি ধরতে পারতাম, কোন দিক থেকে গুলি আসতে পারে বলে মনে হয় তোমার?"

"কী দেখে টের পেলে ওদের কথা?" লোরেন জিজ্ঞেস করল, আমাদের কথোপকথনে যাতে কোনো ছেদ না পড়ে সেটাই উদ্দেশ্য ওর।

"সাবানের একটা টুকরো, পাথরে ভেজা পায়ের ছাপ। আমাদের গাড়ির আওয়াজ যখন পায়, তখন সম্ভবত গোসল করছিল ওরা।"

লোরেন ওর সিগার থেকে ছাই ঝাড়ল, এই ফাঁকে পাথরের দিকে তাকিয়ে সাবানটা দেখে নিল একবার। তারপরই আমার দিকে তাকিয়ে পিটপিট করে

উঠলো ওর চোখ। নদীর পাড়ের ওপাশ থেকে নীরবতা ভেঙ্গে গাড়ির ইঞ্জিন চালু হওয়ার জোরালো আওয়াজ পাওয়া গেল, ধীরে সুস্থে চলতে শুরু করল ইঞ্জিন। একে একে এক, দুই, তিনটাই।

লোরেন মাত্রই ধরানো সিগারটা ডোবার ধারের কাদায় ফেলে পা দিয়ে পিষে আমার দিকে ফিরলো। ধপাশ করে একটা হাত রাখলো আমার কাঁধে।

"অল দ্য ওয়ে, পার্টনার?" বলল ও।

"অল দ্য ওয়ে, লো।" তারপর একসাথেই ঘুরে তীরের দিকে উঠতে শুরু করলাম, দৌড়াতে দৌড়াতেই কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে নিয়েছি। আমার কেমন যেন স্বস্তি লাগল খুব। অপেক্ষার যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছিল না। অবশেষে যা ঘটার তা ঘটতে শুরু করেছে।

ভেতরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল আমার; ইচ্ছে হচ্ছিল যেন না দৌড়াই, সময়টাকে না কাজে লাগাই, দাঁড়িয়েই থাকি ঠায়। নদীর তীর বেয়ে উঠতে গিয়ে মনে হলো যেন সেটা শেষই হচ্ছে না, পায়ের ওজন এত বেশি মনে হচ্ছে...যেন সীসা দিয়ে বানানো! চারিদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ...ল্যান্ড রোভারের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বুঝি আবার; কিন্তু আমাদের পদশব্দের আওয়াজ কানে বাজছিল ছত্রভঙ্গ জানোয়ারদের দিগ্বিদিক দৌড়ের আওয়াজের মত।

নদী তীরের উপর উঠে আসতে পারলাম আমরা অবশেষে।

সার্জেন্ট এভাবুকা চালাচ্ছে আমাদের গাড়িটা, সোজা আমাদের দিকেই আসতে লাগল ও, কাছে এসে গতি কমিয়ে দিল যাতে উঠে যেতে পারি।

বাকি ল্যান্ড রোভার দুটো পেছনে পেছনে আসতে লাগল, আমাদেরকে আড়াল করে রাখছে। রাস্তার দিকে উঠে যাচ্ছে ওগুলো, বনেটে সৈন্য দুজন হেভি মেশিনগান ঘুরিয়ে বসিয়ে নিচ্ছে সুবিধা মত।

"উঠে পড়ো! চিৎকার করে বলল ম্যাকডোনাল্ড। "আরেক মুহূর্ত না এখানে।"

আমি ল্যান্ড রোভারের পাশের দিক দিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম, লোরেনও উড়ে এসে পড়ল আমার পাশে।

"যান!" সার্জেন্টের দিকে সাথে সাথে চিৎকার করে বলল ও। ইঞ্জিন আবারও গর্জে উঠতেই সামনে বাড়লাম আমরা। ডোবার পাশ থেকে দৌড় শুরু করার পর চলন্ত গাড়িটায় লাফিয়ে ওঠা পর্যন্ত সাকুল্যে সময় লেগেছে ছয় সেকেন্ড। খুবই দ্রুত ঘটতে লাগল সব, আমি হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে অটোম্যাটিক রাইফেলটা সামনে বাগিয়ে ধরলাম গাড়ির পাশের দিকটা কভার দিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা গুলি শুরু করল আমাদের দিকে। আমার আশপাশের বাতাস ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল হাজার হাজার ষাঁড়ের গুতোর মত আওয়াজে, গুলির আওয়াজ শুনে মনে হতে লাগল যেন একটা ঢেউ টিনের বেড়ার উপর দিয়ে কেউ খুব দ্রুত একটা কাঠি টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ম্যাকডোনাল্ডের গাড়ি এগিয়ে গেল সবার সামনে, যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সেদিকেই। আর এতে করে প্রতিপক্ষের গুলির সহজ লক্ষ্যেও পরিণত হলাম আমরা। বনেটের সৈন্যটা গুলি খেলো দেখলাম। ওর মাথাটা এমনভাবে পেছন দিকে বেঁকে গেল যেন কেউ প্রচণ্ড শক্তিতে ঘুষি মেরেছে তাকে। মাথার টুপি উড়ে গেল বাতাসে। বসার জায়গাটাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে, ওর মুঠো আলগা হয়ে যাওয়া অস্ত্রটা অলসভাবে দুলতে লাগল ওটার কাঠামোর উপর।

নদী তীরের নিচের দিকের ঝোঁপ আর নলখাগড়ার আড়ালে, সার বেঁধে লুকিয়ে ছিল ওরা। বন্দুকের নল ঝলসে উঠতে দেখলাম আমি, ঠিক তরবারির মত ঝিলিক দিচ্ছে। আমিও সেদিকে তাক করে এপাশ থেকে ওপাশ গুলি করলাম একটানা, কিন্তু ল্যান্ড রোভারের ভেতরে থাকায় আমার বন্দুক খুব বেশি উপরে তুলতে পারলাম না। তীরের সামান্য নিচে ধুলো উড়তে লাগল, যেন কেউ ওখানে চাবুক দিয়ে বাড়ি মেরেছে। আমি নিশানা ঠিক করে আবার করলাম গুলি, হাতের ভেতর অস্ত্রটা কাঁপতে লাগল থরথর করে। আমার বুলেট নলখাগড়ায় আঘাত করতেই দেখলাম ওখানে কিছু একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠলো। আর্তনাদ করে উঠলো কেউ, হালকা প্রাণহীন আওয়াজ, আমার অস্ত্রও খট করে উঠে জানান দিল যে গুলি শেষ।

আমি সামনের দিকেই তাকিয়ে থেকে নতুন একটা গুলির ম্যাগাজিন টেনে নিলাম, মনে মনে হিসাব করছি যে আর কতক্ষণ আমাদেরকে গুলি খেতে হতে পারে। ম্যাকডোনাল্ডের গাড়িটা বনের ধারে পৌঁছে গিয়েছে, রাস্তার দুই ধারেই উঁচু গাছের সারি, সেটাই রাস্তাটাকে নির্দেশ করছে। ম্যাকডোনাল্ড যেদিকে সাঁ সাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে, সেদিকেই দেখলাম একটা জায়গার মাটি খোঁড়া; এতক্ষণে বুঝলাম যে ওরা আসলে কেন গুলি করা শুরু করতে দেরি করছিল, আমাদেরকে সোজা এই ফাঁদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসাই ছিল লক্ষ্য।

আমি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে সতর্ক করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ক্রমাগত গুলি বর্ষণ আর ইঞ্জিনের গর্জনে চাপা পড়ে গেল সেটা।

আমাদের ফেরার রাস্তা জুড়ে ল্যান্ড মাইন বিছিয়ে রেখেছে ওরা, ম্যাকডোনাল্ডের গাড়ি সোজা গিয়ে পড়ল ওটার উপরে, সাথে সাথে উজ্জ্বল সাদা বিস্ফোরণে চোখের ভেতরটা পর্যন্ত অসাড় হয়ে গেল। কানের পর্দা ফটিয়ে আওয়াজ এল, একটা আহত সিংহের মত করে ম্যাকডোনাল্ডের ল্যান্ড রোভারটা ছিটকে গেল পেছনে। ওটার সামনের দিকটা তুবড়ে ঢুকে গিয়েছে ভেতরে, একটা চাকা বাতাসে ঘুরছে অলসভাবে। গাড়িটা উল্টে গিয়ে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল, আরোহীরা সবাই চাপা পড়ল নিচে। দ্বিতীয় ল্যান্ড রোভারটা ঘণ্টায় তিরিশ মাইল গতিতে এগিয়ে গেল ওটার দিকে। দুটোয়

সংঘর্ষ হতেই গা শিউরানো একটা ধাতব ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে কেপে উঠলাম আমি।

"সাবধানে!" চিৎকার করে উঠলো লোরেন, সার্জেন্ট পাগলের মত বনবন করে স্টিয়ারিং আরেকদিকে ঘুরিয়ে দিল যাতে গাড়ির ওই ধ্বংসস্তূপের সাথে আমাদেরও সংঘর্ষ না হয়। কাত হয়ে একদিকের দুই চাকায় দাঁড়িয়ে পড়ল আমাদের ল্যান্ড রোভার, তারপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল একপাশে। আমরা পাথুরে মাটিতে ছিটকে গেলাম সজোরে।

তিন থেকে চার সেকেন্ড একটা শব্দও শোনা গেল না। সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে যেন, এমনকি আমাদের শত্রুরাও তাদের সৃষ্ট ধ্বংসলীলার ভয়াবহতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছে বলে মনে হলো। নদীবক্ষের যেখানে টিমোথির লোকেরা শুয়ে আছে, সেখানে থেকে পঞ্চাশ গজ মত দূরে আছি তখন আমরা। মাঝের জায়গাটায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে ফিভার গাছ। ওগুলো আর গাড়িগুলোর দোমড়ানো দেহের কারণে আমরা সামান্য আড়াল পাচ্ছি।

রাইফেলটা ছুটে গিয়েছিল হাত থেকে, ওটা নিতে হাত বাড়াতেই খেয়াল হলো যে পাশেই গুটিসুটি মেরে পড়ে আছেন ঝাই। ওনার আতংকে ফ্যাকাসে চেহারাটার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই লোরেনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

"কী অবস্থা তোমার?"

জবাবে বলল, "দেখো!" বিশ ফুট দূরে অ্যালিস্টার ম্যাকডোনাল্ড চিত হয়ে শুয়ে আছে, কোমর বরাবর ল্যান্ড রোভারটা চাপা দিয়ে রেখেছে তাকে। দুর্বল, কম্পমান হাতে ও ওই বিশাল ধাতুর স্তূপকে সরানোর চেষ্টা করল একবার। তারপর আর্তনাদ করে উঠলো দুর্বল গলায়।

আমি উঠে দাঁড়ালাম তার দিকে যাওয়ার জন্য, ঠিক সেই মুহূর্তে আবার গর্জে উঠলো বন্দুক। ঠা ঠা করে ল্যান্ড রোভারের গায়ে লেগে ঝন ঝন করে ঝরে পড়তে লাগল, ধুলোর ঢেউ আর পাথরের গুঁড়োর ঝড় উঠে গেল জায়গাটায়, রেশমি কাপড় ফাঁড়ার মত শব্দ করে করে ছিটকে যেতে লাগল এদিক সেদিক–লোরেন টান দিয়ে বসিয়ে দিল আমাকে।

পাশেই নড়া-চড়া টের পেয়ে তাকিয়ে দেখি ঝাই একটা অস্থির বাচ্চার মত খুনখুনে গলায় কাঁদছেন। আমি তাকে শান্ত করতে গায়ের উপর হাত রাখলাম একটা, কিন্তু আমার স্পর্শে মনে হলো বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে।

ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন উনি, ওনার ঘন বাদামি চোখজোড়া ভয়ে, আতংকে ধকধক করছে, তারপরেই দিলেন ছুট।

"ঝাইইই, দাঁড়ান," চিৎকার করে ডাকলাম আমি, তারপরেই তার পিছু নেওয়ার জন্যে হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালালাম। লোরেন

আমাকে ধরে ফেলে চেপে আটকে রাখলো; ঝাইকে দেখলাম ওই আযাবের ঝড়ের ভেতরে দৌড়ে ঢুকে যেতে।

সাথে সাথে সবার গুলির লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেলেন উনি। বুলেটের ধারা অব্যাহতভাবে আঘাত করতে লাগল তাকে। গাড়ির আলো চোখে পড়া ঘোরগ্রস্ত খরগোশের মত করে দৌড়ে গেলেন উনি, লুকানোর কোনো চেষ্টাই করলেন না। আর আমি লোরেনের মুঠোর ভেতর ছটফট করতে লাগলাম।

"না!" চেচিয়ে উঠলাম আমি। "ছেড়ে দে ওনাকে! না! না!" কিন্তু ওরা ঝাইকে ছাড়লো না, গুলির আঘাতে ছিটকে গিয়ে একটা ছোট বাদামি বলের মত করে পাথুরে মাটিতে গড়িয়ে গেলেন কিছুদূর, আবার উঠে দাঁড়ালেন উনি, তখনও দৌড়াচ্ছেন, গুলির আঘাতে ওনার বাম হাত কনুইয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক চিলতে রক্তে ভেজা মাংসপেশি দিয়ে ঝুলছে আর শরীরের পাশের দিকটায় দৌড়ের তালে তালে বাড়ি খাচ্ছে। আবার গুলি করল ওরা, এবার জায়গামতো লাগল, শোল্ডার ব্লেডের ঠিক মাঝে, মনে হলো অদৃশ্য কোনো দেয়ালে বাড়ি খেয়ে থেমে গেলেন তিনি, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে চেহারা ঘষে চলে গেলেন খানিকটা। উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় নিথর হয়ে পড়ে রইলেন, কড়া রোদে দেহটাকে খুবই ছোট লাগতে লাগল। লোরেনের মুঠির ভেতরে শান্ত হয়ে গিয়েছি আমি ততোক্ষণে, বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা অবস্থানে নেওয়া শুরু করেছে শত্রুর আক্রমণের জবাব দেওয়ার জন্য। লোরেন গড়িয়ে সরে গেল আমার কাছ থেকে, উপুড় হয়ে শুয়ে উল্টে থাকা ল্যান্ড রোভারের পেছন দিকে এক পশলা গুলি করল ও।

জবাবে বুলেটের ঝড় ছুটে গেল আমাদের উপর দিয়ে, ম্যাকডোনাল্ড তখনও কোঁকাচ্ছে। বুলেট বৃষ্টির কারণে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে কেউই তার কাছে পৌঁছাতে পারছে না। ঝাইয়ের নিথর লাশটার দিকে তাকিয়ে আমি শক্ত মাটির উপর হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলাম, রাগের চোটে মনে হচ্ছিল আমার আত্মার ভেতর দিয়েও গরম বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। অনেক গভীর আর দূর থেকে থেকে উঠে এল সেটা, একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে আমার স্বাভাবিক যৌক্তিক চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল পুরোপুরি।

আমি লাফিয়ে উঠে, মাইনে বিধ্বস্ত ল্যান্ড রোভারটার দিকে ছুটে গেলাম, তারপর ওটার উপর বসানো মেশিনগানটার নিচের পিন খুলে কাঠামো থেকে উঠিয়ে ফেললাম এক ঝটকায়। চারটা কার্ট্রিজের বেল্ট ঝোলালাম কাঁধে, মৃত্যুর দূতগুলো একটা হাওয়াইয়ান ফুলের মালার মত ঝুলে রইলো গলায়। বন্দুকটা নিতম্ব বরাবর ঝুলিয়ে এবার আমিই আক্রমণ শুরু করলাম, নদী বক্ষের দিকে শুরু করলাম দৌড়, সোজা ওদের গুলির রেখা বরাবর।

ঘোরের মধ্যেই নিজেকে চিৎকার করতে শুনলাম আমি, আশপাশ দিয়ে গুলি ছুটে যেতেই প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হতে লাগল বাতাসে। কানে তালা

লেগে গেল শব্দে আর শুষ্কগরম বাতাস এসে লাগতে লাগল চেহারায়। চিৎকার করতে করতেই আমি দৌড়াতে লাগলাম, বন্দুকের পশ্চাৎবেগে এমনভাবে কাঁপতে লাগলাম যেন ওটা একটা বিশাল মুষ্ঠি। খরচ হওয়া কার্ট্রিজের খাপগুলো চকচকে একটা ধারা সৃষ্টি করে বন্দুকের পেছন থেকে বের হতে লাগল, নিচের পাথুরে মাটিতে পড়তেই রূপার ঘন্টির মত করে ঝুনঝুন করে শব্দ করতে লাগল। নদী তীরের দিকে এগোতেই ওটার কিনারের প্রান্ত গুলির আঘাতে ঘূর্ণায়মান ধুলোর ঝড় তৈরি করে বিলীন হয়ে গেল, ওদের একজনের গায়েও লাগল গুলি, পেছন দিকে ছিটকে গেল সে।

ওদিকের গুলির ধারা কমে এল, ওদের দৌড়াদৌড়িতে নলখাগড়ার ভেতর আলোড়ন দেখতে পেলাম। একজন থেমে দাঁড়িয়ে গুলি করল আমার দিকে এক পশলা। আমার ঠিক পাশের ফিভার গাছটার গা থেকে সাদা সাদা বাকল বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমি বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দিলাম তার দিকে। লোকটার পরনে ছিল ক্যামোফ্লাজ যুদ্ধের পোশাক, মাথায় একটা স্টিলের তৈরি পুডিং-বেসিন হেলমেট, লোকটা অস্ত্র বাগিয়ে ঝুঁকে বসল, বন্দুকের নলটা দেখে মনে হলো আমার দিকে চেয়ে ওটার তপ্ত লাল চোখ দিয়ে চোখ টিপ দিচ্ছে। দেখে যে কথাটা মাথায় এল তা হচ্ছে এত কাছে থেকে কি ওর বন্দুকের গুলি মিস হতে পারে?

আমার বন্দুকের একটা গুলি লোকটার মুখে গিয়ে লাগল, হেলমেট আর করোটির ভেতর যা কিছু ছিল তা গোলাপি মেঘ সৃষ্টি করে, ছিটকে বেরিয়ে গেল মাথার পেছন দিক দিয়ে। নদী তীরের পেছনে উল্টে পড়ে গেল সে।

"ওর পেছনে পেছনে যান! কাভার দিন ওকে!" আমার পেছনে লোরেনকে চেঁচাতে শুনলাম, কিন্তু পাত্তা দিলেম না সেদিকে। তীরে পৌঁছে শুষ্ক নদীবক্ষের দিকে তাকালাম। ওরা সবাই দৌড়াচ্ছে, আতংকিত, নদীর অপর পাড়ের দিকে যাচ্ছে, আমি বন্দুকের নল সেদিকে ধুরিয়ে দিলাম। ঝুপ ঝুপ করে মুখ থুবড়ে পড়তে শুরু করল ওরা, আচমকা ছোট ছোট ঝর্ণা তৈরি করে মাঝের সাদা বালি নাচানাচি শুরু করল। আমি তখনও সমানে চেঁচিয়েই যাচ্ছি।

কার্ট্রিজের শেষ পাকটাও আমার কাঁধ থেকে সটকে নেমে হাতে ধরা মেশিনগানের ক্ষুধার্ত নলের ভেতর ঢুকে গেল। অস্ত্রটা বেকার হয়ে বন্ধ হয়ে গেল আমার হাতের ভেতরে, সজোরে ওটা ছুঁড়ে দিলাম ওদের পেছনে। রাগ আর শোক আমাকে যুক্তি আর ভয়ের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর ঠেলে নিয়ে এসেছে। নিরস্ত্র আর নির্ভয় অবস্থাতেই নদীর এপাড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, টের পেয়ে টিমোথি মাগেবা ঘুরে দাঁড়ালো অপর পাড় থেকে। ওর ডান হাতে ধরা একটা পিস্তল, সেটা তাক করল আমার দিকে। কানের ঠিক পাশ দিয়ে একটা বুলেট চলে গেল বলে টের পেলাম।

“খুনি!” চিৎকার করে উঠলাম আমি, ও আবার গুলি করল। দুবার। মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যুর ফেরেশতারা তাদের ডানা দিয়ে ঘিরে আড়াল করে রেখেছে আমাকে, কারণ গুলির শব্দও কানে আসছিল না তখন। টিমোথি তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, ভয়ানক ধোঁয়াটে চোখজোড়া আর বিশাল কামানের গোলার মত মাথাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোণঠাসা কোনো আহত জানোয়ার।

তারপর হঠাৎই লোরেন এসে দাঁড়ালো আমার পাশে, রাইফেল তাক করে গুলি করল টিমোথির দিকে। আমার ধারণা লোরেনের গুলি লাগল ওর দেহে, কারণ লোকটাকে দেখলাম কেমন একটু ঝাঁকি খেয়ে টলে উঠতে; কিন্তু ততোক্ষণে ও অপর পাড়ের উঁচু জায়গাটাকে ঘিরে রাখা ঘন ঝোপের আড়ালে চলে গিয়েছে। পুলিশের সৈন্যরা আমাদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। তীর আর নদীবক্ষের যেখানে গোলাগুলি হয়েছে, সেদিক বরাবর পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে গেল ওরা। ওপারের ঝোপের দিকেও কয়েক রাউন্ড গুলি করল, তারপর লোরেন ডাক দিল ওদের।

আমার দিকে ফিরে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোরেন। “তোমার গায়ে তো দেখি একটা দাগ-ও পড়েনি,” বিস্মিত হয়ে বলল ও। “একটা বুলেট-ও না–মাই গড, বেন, মাই গড!” মাথা নাড়তে লাগল সে। “তোমার কাণ্ড দেখে আমি যে ভয়টা পেয়েছিলাম। শালার পাগল একটা। ভয়ে আত্মায় পানি ছিল না আমার।” হাত দিয়ে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে গাড়িগুলোর দিকে নিয়ে গেল সে।

ম্যাকডোনাল্ড তখনও মৃদু আর্তনাদ করেই যাচ্ছে। আমি আর লোরেন ল্যান্ড রোভারটাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশ তুলে ধরলাম। সৈন্যরা ম্যাকডোনাল্ডকে গাড়িটার নিচ থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করতেই আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলো বেচারা। পা দুটো অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মুচড়ে আছে তার, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে একদম;ধুলো-ময়লা জমে নোংরা বাদামি দেখাচ্ছে ওর মুখ, মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে উপরের ঠোঁটে।

লোরেন ওকে মরফিন দিয়ে, ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যাওয়া হাড়গুলোয় স্প্লিন্টার বাঁধার চেষ্টা করতে লাগল। আমি এগিয়ে গেলাম ঝাই যেখানে পড়ে আছেন সেদিকে।

বুলেট প্রবেশের জায়গাটা ওনার পিঠের ঠিক মাঝে নীলচে কালো হয়ে কুচকে আছে, কোনো রক্ত নেই সেখানে। কিন্তু তবুও দেখা গেল থকথকে ঘন রক্তের একটা পুকুরে পড়ে আছে দেহটা;, তাতেই বুঝলাম যে বের হওয়ার সময় বুলেটটা তার বুকে কী ভয়ানক ক্ষতই না সৃষ্টি করেছে। আমি ওনাকে সোজা করলাম না, আসলে করতে পারলাম না। বেচারার মাথাটা পাশের দিকে কাত হয়ে আছে, আমি উবু হয়ে বসলাম পাশে। তারপর আঙুল দিয়ে তখনও তাকিয়ে থাকা ছোট ছোট চোখগুলোর পাতা বন্ধ করে দিলাম।

"শান্তিতে ঘুমান, আমার ভাই," ফিসফিস করে বললাম আমি।

"চলে আসো বেন। ওরা কিন্তু আসবে আবার। তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের," ডাক দিল লোরেন।

দুজন সৈন্য মারা গিয়েছে, সার্জেন্ট তাদেরকে তাদের কম্বলের ভেতরে মুড়ে ফেলেছে। "বুশম্যানকেও নিন," তাকে বললাম আমি। প্রথমে ইতস্তত করলেও আমার চেহারার দিকে খেয়াল হতেই সেদিকে দৌড়ে গেল তাড়াতাড়ি।

তৃতীয় গাড়িটাকে আমরা ঠেলে সোজা করে ফেললাম, সৈন্যরা আহতদের পাশাপাশি লাশগুলোও তুলে ফেলল সেটায়; লোরেন আর আমি তদারকি করলাম কাজটার। দুটো টায়ার গুলিতে ফুটো হয়ে গিয়েছে, দুমড়ে গিয়েছে পেট্রলের ট্যাংক, স্টিয়ারিং বক্স ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে বুলেটের আঘাতে আরেকটা বুলেট গুড়িয়ে দিয়েছে ইঞ্জিনের উপরের প্লাস্টিকের আবরণটাকেও। সেখান দিয়ে তেল চুইয়ে পড়ে গরমে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

লোরেন দ্রুত সার্জেন্ট আর বাকি তিন সৈন্যকে ফিভার গাছগুলোর ভেতরে রক্ষণাত্মক অবস্থানে বসিয়ে দিল; আমরা ভাঙ্গা গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে গেলাম বাকি বিধ্বস্ত গাড়িদুটোর পেছনে, যাতে ওগুলোর আবডালে সারানোর চেষ্টা করতে পারি এই গাড়িটা।

ম্যাকডোনাল্ডের ল্যান্ড রোভারে একটা টুল বক্স ছিল। একেবারের গ্রান্ড প্রিক্স-এর মেকানিকদের দক্ষতায় সর্বনিম্ন সময়ে চাকা দুটো পাল্টে ফেললাম আমরা। বিধ্বস্ত গাড়ি থেকে খুলে নিলাম অতিরিক্ত চাকা। গাড়ির চাকার শেষ বল্টুটা টাইট দেওয়া শেষ হতেই আবার শুরু হলো গোলাগুলি। অনেক দূর থেকে আসছিল গুলি, সোয়া মাইল দূরের নদীর অপর পাড়ের পাহাড় থেকে। ভালোই শিক্ষা পেয়েছে ওরা, তাই সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখতে লাগল এখন। আমাদের সৈন্যরাও জবাব দিতে লাগল, দুটো ভারি মেশিনগানের ঝলকানিতে ওরা আর সামনে বাড়ার হিম্মত করল না।

এই বন্দুকযুদ্ধের মাঝেই আমি আর লোরেন কাজ করে গেলাম। কনুই পর্যন্ত গ্রিজ লেগে চটচটে হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে চোখা ইস্পাতে লেগে ছড়ে গেল হাতের উল্টোপাশের পুরোটা চামড়া, তারপর আবার গাড়ির প্রচণ্ড উত্তপ্ত মেইনফোল্ড আর এগজস্ট সিস্টেম ধরতে গিয়ে ফোসকা ফেলে দিলাম সেখানে।

তোবড়ানো ল্যান্ড রোভারটার তেলের ট্যাংকের ঢাকনাটা টেনে নিয়ে এলাম আমরা, তারপর সেটাকে গাড়ির উপর বসাতে যেতেই, গরম তেল এসে ছিটকে লাগল চেহারায়, কোনো মতে ঢাকনা বসিয়েই চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম বালির উপর। ঢাকনার নিচের রাবারে টুকরোটা ছিঁড়ে গিয়েছে, তেল চুঁইয়ে পড়তেই থাকবে, তবে আমরা নিরাপদে পৌঁছা পর্যন্ত তেল থাকবে এখন।

স্টিয়ারিং বক্সটা পালটে দিল লোরেন, আমি আমার ব্যাগ হাতড়ে একটা সাবানের টুকরো বের করে তেলের ট্যাংকের বুলেটের ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতে লাগলাম। কাজ করতে করতে মনে মনে ওই চাইনিজ কোম্পানিকে আশীর্বাদ করতে লাগলাম যারা ওই শয়তানগুলোর দুই নম্বর অস্ত্রগুলো বানিয়েছে, চাইনিজ অস্ত্র বলেই ওগুলোর নিশানা আর পাল্লা দুটোই কম।

আমরা ইঞ্জিনের তেল বদলে ভরে নিলাম আবার, কাজ করার প্রয়োজনে বারবার আড়াল ছেড়ে বের হয়ে আসার প্রয়োজন হতে লাগল; পাশের পাহাড়ে কোনো বন্দুকবাজ থাকলে, তার জন্য একেবারে সহজ নিশানা হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। জোর করে আতংকিত না হয়েই চেষ্টা করে গেলাম পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া গা শিউরানো বুলেটের আওয়াজকে পাত্তা না দিয়ে ঠিকঠাক কাজ করে যাওয়ার ।

লোরেন ড্রাইভারের সিটে বসে মোচড় দিল চাবিতে; ওটা শুধু ঘুরতেই লাগল, বারবার চাপতেও কাজ হলো না কোনো, আমি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করা শুরু করলাম। আরও কয়েকবার চেষ্টা করে চাবি মোচড়ানি ছেড়ে দিতেই, নীরবতায় শুনতে পেলাম মনের সুখে গালাগালি করে যাচ্ছে ও। আবার চেষ্টা করল, ব্যাটারি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এখন, ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ কমতে কমতে মিলিয়েই গেল শেষমেশ।

এক পশলা বুলেট এসে গাড়ির সামনের কাঁচটা গুড়িয়ে দিল, চকচকে কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল আমাদের সারা শরীরে। লোরেন তখনও গালাগাল করেই যাচ্ছে। অসহায় চোখে আমি ডুবতে বসা সূর্যটার দিকে তাকালাম, দিনের আলো থাকবে আর বড়জোর আধা ঘণ্টা বা একটু বেশি। অন্ধকারে ওই হায়েনাগুলো অবশ্যই পাহাড় থেকে নেমে আসবে। ঠিক যেন আমার মনের কথা পড়তে পেরেই, উপরের ওদিক থেকে গুলির তীব্রতা বেড়ে গেল আরও। একটা বুলেট এসে ল্যান্ড রোভারটার গায়ে লেগে ছিটকে যেতে শুনলাম। লোরেন ড্রাইভারের সিট থেকে লাফ দিয়ে নেমে বনেটটা খুলল আবার। ও কাজ করতে শুরু করতেই আমি এন্ডাবুকার দিকে তাকিয়ে চেঁচালাম।

"আপনারা গুলি করছেন না কেন, সার্জেন্ট? ওরা তো টার্গেটের প্র্যাকটিসের সহজ সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে মাথা তোলার সুযোগ কেন দিচ্ছেন, বলেন তো!"

"আমাদের গুলি প্রায় শেষ, স্যার," জবাব দিল সে, আমার পেটের মধ্যে মনে হলো প্রজাপতি ওড়াউড়ি শুরু হয়েছে। গুলিও নেই, আঁধারও ঘনিয়ে আসছে দ্রুত।

লোরেন বনেট বন্ধ করে, মাথা নিচু করে উঠে বসল ড্রাইভারের সিটে। তারপর ভাঙ্গা উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে তাকালো আমার দিকে।

“আবার দোয়া করো, বেন। আগেরবার মন থেকে করোনি মনে হয়।” বলে ও মোচড় দিল চাবিতে। কেশো রোগীর মত খকখক করল কিছুক্ষণ কিন্তু ইঞ্জিন চালু হলো না।

“আর সম্ভব না, বেন,” লোরেন বলল। “বাকি দুটো গাড়ির ব্যাটারিরও দফা-রফা হয়ে গেছে।”

“সার্জেন্ট–আপনারা সবাই এদিকে আসেন। ধাক্কা দিতে হবে,” চেঁচিয়ে ডাকলাম আমি। “এদিকে আসেন, সাহায্য করেন আমাকে।”

ওরা ল্যান্ড রোভারের পেছনে আমার সাথে এসে হাত লাগালো।

“সেকেন্ড গিয়ারে চেষ্টা করে দেখো,” লোরেনকে বললাম আমি। সাথে সাথে এক ঝাঁক বুলেট এসে পায়ের আশপাশের মাটিতে এসে গাঁথলো, পাথরের চলটা এসে কামড় বসালো পায়ে।

সবার সম্মিলিত ধাক্কায় ল্যান্ড রোভারটা এবড়ো-থেবড়ো মাটিতে লাফিয়ে উঠলো, আবার নদীর দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

“এখন,” চেঁচিয়ে ডাকলাম লোরেনকে। ল্যান্ড রোভারটা সশব্দে কেঁপে উঠে ধীর হয়ে যেতেই আমরা ওটার গায়ে নিজেদেরকে ঠেসে ধরলাম, যাতে ওজনের বিরুদ্ধেও ওটা চলতে থাকে।

আরও একবার খকখক কাশি শোনা গেল। “চেষ্টা করতে থাকো!” কোনো মতে দম আটকে বললাম আমি। তারপর আচমকাই ইঞ্জিন গর্জে উঠে প্রাণ ফিরে পেল, বিজয়োল্লাস করে উঠলাম আমরা।

“উঠে পড়ো,” চিৎকার করে বলতে বলতে লোরেন ল্যান্ড রোভারটাকে আবার রাস্তার দিকে নিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু আমি দৌড়ে গেলাম ওর পাশে।

“ম্যাচটা দাও দেখি!” হাফাতে হাফাতে বললাম আমি।

“কী?”

“আরে তোমার ম্যাচের বক্সটা দাও তো বাল।” আমি ওর হাত থেকে বক্সটা নিয়ে, গাড়ির ধ্বংসস্তূপের কাছে ফিরে গেলাম। একটার ভাঙ্গা গ্যাসের ট্যাংক থেকে তেল গড়িয়ে পড়ছে, আমি একটা কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে দিলাম সেদিকে, হিসহিস করতে করতে অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল সাথে সাথে, আগুনের আঁচ এসে লাগল আমার চেহারাতেও, চোখের পাতার লোম পুড়ে গেল তাতে। আমি ঘুরে দৌড় দিলাম ল্যান্ড রোভারটার দিকে। পেছনের দিক দিয়ে লাফিয়ে চড়ে বসলাম ওটায়, পেছনের লাশ আর আহত লোকগুলোর উপরে মুখ থুবড়ে পড়লাম তাতে।

কাঁটা ঝোপের ভেতর দিয়েই লোরেন সব মাড়িয়ে নতুন একটা রাস্তা করে চলা আরম্ভ করল, মূল রাস্তা এড়িয়ে যাচ্ছে, তারপর বহুদূর যাওয়ার পরে আবার ঘুরে ফিরে যেতে লাগল মূল রাস্তার দিকে।

জঙ্গলের আচ্ছাদনে হারিয়ে যেতেই পেছনের গুলির আওয়াজ মিলিয়ে গেল। লাল হয়ে আসা সন্ধ্যার আলোর পটভূমিতে দেখতে পেলাম কালো

কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। খুশি হলাম এই ভেবে যে ওরা জিতলেও অন্তত সেটা থেকে কোনো গণিমত লাভ করতে পারবে না বলে। আচমকাই আমি প্রচণ্ড জ্বরগ্রস্ত একজনের মত কাঁপতে শুরু করলাম। বিস্ময় আর প্রতিক্রিয়ার শীতল লহরী গ্রাস করে নিল আমাকে।

"ঠিক আছো তুমি, বেন?" লোরেন ডাকলো আমাকে।

"হ্যাঁ, ঠিক আছি," জবাব দিয়ে আমি আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকা কম্বলে মোড়া মর্মন্তুদ শরীরগুলোর দিকে তাকালাম।



সেদিন পুরোটা রাত আমরা দক্ষিণ দিকেই এগোলাম, এবড়ো-থেবড়ো মাটিতে একটু পরপর লাফ ঝাঁপ দিয়ে উঠতে লাগল গাড়ি, মাঝে মাঝেই রাস্তা হারিয়ে ফেলতে লাগলাম, আবার খুঁজে বের করতে হলো সেটা। আফ্রিকার হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় কাপতে লাগলাম, কারণ হু হু করে বাতাস ঢুকতে লাগল ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে।

ভোরবেলায় যখন চারপাশ আঙুরের মত বেগুনি আর ধোঁয়াটে নীল লাগছিল, তখন আমি লোরেনকে বললাম গাড়িটা একবার থামাতে। নেমে সৈন্যগুলোর সহায়তায় দুটো ছোট টিলার মাঝের বালিময় মাটিতে ছোট কবর খুঁড়লাম একটা। ল্যান্ড রোভারের ভেতর থেকে, গাঢ় ধূসর রঙের পুলিশের কম্বলে আবৃত ঝাইয়ের লাশটা নামিয়ে নিয়ে এলাম আমি। এত হালকা তার শরীরটা যে মনে হচ্ছিল আমার কাঁধে বুঝি একটা বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে। তাকে কবরে শুইয়ে দিলাম আমি, আমরা সবাই কবরটা ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কম্বল ছাপিয়ে বেরিয়ে এসেছে রক্ত, শুকিয়ে কালো রঙে জমাট বেঁধে আছে সেখানে।

আমি সৈন্যদের দিকে মাথা ঝাঁকালাম। "ঠিক আছে। মাটি চাপা দিয়ে দিন।" ওরা দ্রুত কাজটা সেরে ফিরে গেল ল্যান্ড রোভারে। তখনও ঠান্ডা চারপাশে, পাতলা সুতির শার্ট পরে থাকায় কেঁপে উঠলো শরীর। টিলার উপরে ডেকে উঠলো একটা বুড়ো পুরুষ বেবুন, ওটার চিৎকার পুরো উপত্যকা জুড়ে বিকট আকারে ছড়িয়ে পড়ল।

আমিও সৈন্যদেরকে অনুসরণ করে ল্যান্ড রোভারে ওদের পাশে এসে উঠলাম। গাড়ি চলতে শুরু করতেই আবার ফিরে তাকালাম পেছনে, এক পাল মহিষ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। আপন মনে ঘাস খাচ্ছে ওরা, মাথা মাটির কাছে আর লেজ ঝাইয়ের কবরটার দিকে দুলছে। আমার ভাইয়ের জায়গা এটাই, এই জানোয়ারগুলোর সাথে, তার ভালোবাসার বুনো প্রান্তরে।



"ওরা সম্ভবত নদীটা ধরে পালিয়ে চলে গিয়েছে," পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার বললেন আমাকে। "এই মাগেবা লোকটাকে ধরতে পারলে আমাদের চাইতে খুশি আর কেউ হতো না।"

ম্যাকডোনাল্ডের সাথেই পুলিশের হেলিকপ্টারে করে বুলাওয়েতে এসে পৌঁছেছি আমরা, দুই দিন আগে। লোরেন আমাকে রেখে গিয়েছে রোডেশিয়ান পুলিশকে যতটা সম্ভব সাহায্য করার জন্য। আর ও লিয়ারটা ডেকে এনে সোজা জোহানেসবার্গ ফিরে গিয়েছে। এখন আমি পুলিশের হেডকোয়ার্টারে সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে নিচ্ছি, মুন সিটিতে ফিরিয়ে নিতে একটা ভাড়া করা বিমান অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার লম্বা মানুষ, কাঁধে মিলিটারি প্রতীক লাগানো; মাথায় ছোট করে ছাটা ধূসর চুল। চেহারায় অসংখ্য ভাঁজ আর কাটাকুটি, রোদে পুড়ে একেবারে পাতিলের তলার মত হয়ে গিয়েছে গায়ের রঙ। বুকের কাছে অনেকগুলো ফিতা ঝুলছে, সেগুলো চিনলাম আমি, সাহস আর সম্মানের প্রতীকচিহ্ন ওগুলো।

"সত্যি কথা হচ্ছে, আমাদের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার একদম প্রথমেই আছে সে। খুবই জঘন্য একটা মানুষ, আপনার তো সে সম্পর্কে অন্যদের চাইতে ভালো জানার কথা।" কথাগুলো বলে উনি ইস্পাতের মত ধূসর চোখজোড়া দিয়ে সোজা তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, মনে হতে লাগল যেন আমাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

"আমি চিনি ওকে," সায় দিলাম আমি। বিমান ছিনতাই-এ আমার ভূমিকার কথা সবাই জানে।

"ওর ব্যাপারে আপনার ধারণা কী?"

"খুবই বুদ্ধিমান লোক সে, ব্যক্তিত্বও প্রখর। কী যেন একটা আছে ওর মধ্যে।" কীভাবে ব্যাপারটা বোঝাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। "ও আসলে এমন একজন মানুষ যে যেটা চায়, সেটা আদায়ের জন্য এগিয়ে যাবেই...এরকম মানুষকেই তো অন্যরা অনুসরণ করে।"

"হ্যাঁ," অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারও সায় দিলেন। "আমাদের নিজস্ব ধারণাও এরকম। সে ওদের সাথে যোগ দেওয়ার পর থেকেই নদীর ওপাড় থেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হার বেড়ে গিয়েছে অনেকখানি।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লৌহ-ধূসর কপালের দুই পাশ টিপতে লাগলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। "আমি ভেবেছিলাম এবার বোধহয় ধরেই ফেলবো। ওরা ওদের লাশগুলো মাটি চাপা না দিয়ে ওভাবেই ফেলে নদী ধরে পালিয়েছে। একেবারে হাতের মুঠো থেকে ফসকে গেল বলা যায়।"

অপেক্ষারত পুলিশের গাড়িটার কাছে আমাকে এগিয়ে দিলেন উনি, একটা জাকারান্ডা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। গাছটা ছেয়ে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ বেগুনি ফুলে।

"ম্যাকডোনাল্ডের কী অবস্থা?" পুলিশের গাড়িটার পাশে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"ঠিক হয়ে যাবে! দুটো পা-ই বাঁচানো গিয়েছে।"

"শুনে খুশি হলাম।"

"হ্যাঁ," অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারও সায় দিলেন। "ভালো মানুষ সে। এরকম আরও কয়েকজন থাকলে বেশ হতো। যাই হোক, ডক্টর, এখানে যা ঘটলো সেটা বাইরের কাউকে না জানালেই ভালো হবে। এসব ঘটনা নিয়ে খুব বেশি হইচই হোক সেটা চাই না আমরা। এতে ওদেরই লাভ হয়, বোঝেন তো। ওরা যে ভীতি ছড়াতে চায় সেটারই প্রচারণা হয়ে যায়।"

করমর্দন সেরে তিনি ঘুরে লম্বা পা ফেলে ফিরে গেলেন ভবনের ভেতরে। গাড়িটা শহরের ব্যস্ত রাস্তায় নেমে আসতেই দেখলাম যে আশপাশের সব মানুষের মুখেই হাসি, কেন কেউ এই মানুষ বা সমাজকে ধ্বংস করতে চাইবে সেটা আমার মাথায় ঢুকলো না। ওরা যদি সেটায় সফল হয়-ও, তাহলে এই হাসি ওরা কি দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে?

এরপর স্বাভাবিকভাবেই মুন সিটির চিন্তা এল মাথায়। এরা ছিল এক মহান সভ্যতা, এমন এক জাতি–যারা কিনা প্রায় ইউরোপের সমান একটা এলাকার কর্তৃত্বে ছিল, ওখানকার মানুষ পাথর দিয়ে বিশাল বিশাল শহর তৈরি করেছিল, তাদের পরিচিত দুনিয়ার সব প্রান্তে জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছিল ব্যবসার উদ্দেশ্যে। এখন অবশিষ্ট আছে শুধু কয়েকটা ভাঙা ধ্বংসাবশেষ, সেগুলোও আমরা বহু কায়ক্লেশের পর উদ্ধার করেছি। পৃথিবীর অন্য কোনো মহাদেশে মানুষ আর প্রকৃতির মাঝের সম্পর্কে এত বেশি ওঠা-নামা দেখা যায় না, এখানে প্রকৃতি দুই হাত ভরে দান করে মানুষকে লালন করে বড় করে তোলে, আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে যে কারো স্মৃতিতেও আর জায়গা হয় না মানুষগুলোর। এক নিষ্ঠুর মাটি এটা, বর্বর, নির্মম। অবাক করার ব্যাপার হচ্ছে এরপরেও এত এত মানুষ এটাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসে।



মুন সিটিতে ফিরে এসে বেশ হতাশ হলাম। বিগত কয়েকদিনের স্নায়ুক্ষয়ী ঘটনার পরে এখানে ফিরে এসে মনে হলো বিক্ষুব্ধ সাগর থেকে বুঝি নিস্তরঙ্গ জলে এসে নেমেছি। সবার ভাবে মনে হলো আমি যে ছিলামই না সেটাই কেউ খেয়াল করেনি।

"কেমন মজা হলো?" টাইপরাইটারে খটখট করতে করতে অনুবাদকৃত কাগজের স্তূপের উপর দিয়ে প্রশ্ন করল স্যালি।

"ভালোই। অনেক কাহিনি হয়েছে।"

"খুব ভালো। আপনার চোখের পাপড়িতে কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার দুই আঙুল দিয়ে কীবোর্ডের উপর থাবানো শুরু করল ও, মনোযোগের চোটে আনমনে জিহ্বায় কামড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে শুধু চোখের উপর এসে পড়া চুল ঠেলে কানের পেছনে গোঁজার জন্য থামছে।

"আপনাকে দেখে ভালো লাগছে, বেন," এলড্রিজ হ্যামিল্টন বললেন। "আপনার সাথে একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলার ছিল।" বলে উনি আমাকে একটা টেবিলের দিকে নিয়ে গেলেন। ওখানে একটা লিপির প্যাঁচ খুলে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি মন দিতে পারলাম না সেদিকে। আচমকাই, জীবনে প্রথমবারের মত মনে হলো এই অতি সম্প্রতি যে তাজা আর টকটকে রক্ত ঝরতে দেখেছি সেটার তুলনায় এই সব কিছুই অতি অতীতকালের আর অগুরুত্বপূর্ণ।

র‍্যাল আর লেসলি অবশ্য আমার অনুপস্থিতির পুরো ফায়দা লুটে একটা পরিকল্পনা এঁটে রেখেছিল। র‍্যাল ওদের দুজনের হয়ে কথাটা পাড়লো, পাশ থেকে লেসলি শুধরে দিতে লাগল। "মানে হচ্ছে গিয়ে, ডক্টর, ভেবে দেখলাম যে আমাদের অন্তত একজনের একটা স্থায়ী চাকরি-বাকরি না হলে আসলে বিয়ে করাটা ঠিক হবে না। তাই, ভাবলাম আপনার পরামর্শ নেই। মানে হচ্ছে আমার এখানে কাজ করতে খুবই ভালো লাগছে, আমাদের দুজনেরই। আমরা এখানে থাকতেই চাচ্ছি, কিন্তু আমরা বিয়েটাও করতে চাচ্ছি তাড়াতাড়িই। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনার সম্পর্কে আমরা খুবই উঁচু ধারণা রাখি, ডক্টর। আর আমরা চাচ্ছিও না এখানকার খোঁড়াখুঁড়ির বাকিটা থেকে বাদ যেতে, কিন্তু–"

আমি সেদিন সন্ধ্যায় লোরেনের সাথে কথা বলে রাতে খাবারের সময় ডেকে পাঠালাম ওদেরকে।

"চাকরিটার বেতন সাড়ে তিন হাজার, লেসলি পাবে দুই। আর অবশ্যই ইনস্টিটিউটেই থাকার জন্য ফ্রি ফ্লাট পাওয়া যাবে, বিয়ের গিফট হিসেবে ওটার আসবাব পত্র কেনার ব্যাপারে আমি সাহায্য করবো।"

লেসলি প্রথমে র‍্যালকে চুমু খেলো, এরপর আমাকে। চাকরির প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার একটা দারুণ উপায় বলেই মনে হলো এটাকে আমার।

র‍্যাল নবোদ্যমে পাহাড়ের গায়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল, কিন্তু আমি আর ওকে তেমন সময় দিলাম না। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে আমার বক্তব্য প্রস্তুতির কাজে। কাজটা ভালোবাসা আর উত্তেজনায় ভরা একটা কাজ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু

দেখলাম বারবার ভুল করে বসছি। লিপিগুলোতে সবকিছুরই বিশদ বিবরণ ছিল, কিন্তু ওই অনুত্তরিত প্রশ্নগুলোর কাছে সবই মনে হচ্ছি অপ্রাসঙ্গিক: ওরা এসেছিল কোত্থেকে আর কখন, ওরা গেল কোথায়, এবং কেন?

প্রতিবার সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টায় লিখতে গিয়ে দেখি: লেখাটা এত দীর্ঘ, প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে এমন দশা হচ্ছে যে নিজেই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি। টাইপরাইটার থেকে কাগজ টান দিয়ে নিয়ে দুমড়ে গোল বানিয়ে ছুঁড়তে লাগলাম দেওয়ালে। একটা ফাঁকা কাগজের পাতার চাইতে নিঃসঙ্গ জায়গা আর নেই, ভেতর ভেতর ভয় পেতে লাগলাম যে আমার নিয়ন্ত্রণহীন আবেগ সম্ভবত বাগড়া দিয়ে আমাকে আমার চিন্তা আর বাস্তবতাকে এক করে সুবিন্যস্তভাবে ভাবতে দিচ্ছে না। নানান কথা ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগলাম। সাম্প্রতিক ওই ভয়াবহ ভ্রমণটার প্রতিক্রিয়ার কারণে হয়তো এমন হচ্ছে, স্যালির হেঁয়ালিমূলক ব্যবহার আমাকে গভীরভাবে পীড়া দিচ্ছে সে কারণেও হতে পারে, বা হয়তো কিছুই না-, কিছুদিন পরে আমার প্রবল প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবেলা নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছি।

যতো কৌশল জানা ছিল সব খাটিয়ে দেখলাম, কমপক্ষে দশ হাজার শব্দ লেখার আগ পর্যন্ত জোরপূর্বক টাইপরাইটারের সামনে বসে থাকলাম...মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে আমার অসাড় মস্তিষ্ক থেকে কিছু কথা বের করা যায় কিনা সেই প্রচেষ্টাও চালিয়ে দেখলাম।

বক্তব্য আর লেখা হলো না, একদিন দেখি আমি চন্দ্রগস্তের মত আমার অফিসে বসে যুদ্ধ কুঠারটা পালিশ করতে করতে এত বেশি ঝকঝকে বানিয়ে ফেলেছি যে সেটা চোখে লাগলে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, আবার কখনো গিটারটা হাতে নিয়ে আনাড়ির মত টুং টাং করতে করতে নানান গান বাঁধছি যার সবগুলোই দুঃখের আর শোকের। অন্য সময় দেখা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হোয়াইট কিং-এর ছবির সামনে উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে বসে দিবা স্বপ্ন দেখছি, বা সারাদিন পাহাড়ে পাহাড়ে চরে বেড়াচ্ছি, রোদ আর গরমের কোনো হুঁশই থাকত না, মাঝে মাঝে মনে হতো যেন ছোট ছোট পাখির মত কিছু একটা আছে আমার আশপাশে, একটা অশুভ বাদামি প্রেতাত্মার মত আমার দৃষ্টির অন্তরালে ঘুরছে। বা মাঝে মাঝে আর্কাইভের ভেতরে গিয়ে একা একা বসে থাকতাম, ওই নদীবক্ষের ওখানে লাশগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে টিমোথি যে ঘৃণাভরা গনগনে চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল সেটা মনে আসতেই এক অসহায় ঘোরের ভেতরে চলে যেতাম। আমি বা টিমোথি–আমাদের কেউই বাইরে দিয়ে যা দেখা যায় এরকম না, আমাদের দুজনের ভেতরেই অন্ধকার আর কুৎসিত একটা দিক আছে। মনে পড়ল নির্মমভাবে খুন করে শকুনে খাওয়ার জন্য গাদা মেরে ফেলে রাখা বুশম্যানদের লাশগুলো, আমার চিৎকার করতে করতে ওই নদীবক্ষের সাদা

বালির উপর দিয়ে লোকগুলোর দিকে ধেয়ে যাওয়ার পাগলামিটার কথা। আমার এই নৈরাশ্যকাল কতদিন স্থায়ী হতো জানি না, যদি না এটা আবিষ্কার হতো যেটা তখনও এই শহরটাকে ঘিরে রাখা অনেকগুলো রহস্যের চাদর উন্মোচিত করে দিল।

আমার এই উদাসী দশার বিপরীতে দেখা গেল এলড্রিজের দলটা সাঁ সাঁ করে লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার করে চলেছে। নিয়মিত অভ্যাসের কারণে ভাষাটা ততোদিনে ভালোই আয়ত্ব করে ফেলেছে স্যালি, এখন বলা যায় প্রায় এলড্রিজের মতই দ্রুত আর সাবলীলভাবে অনুবাদ করতে পারে। এমনকি লেসলি পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে কাজটায়, এলড্রিজ 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' নীতি অনুসরণ করে লিপিগুলোর প্যাঁচ খোলা আর সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিটা বের করে ফেলেছেন, ফলে এখন পুরো প্রক্রিয়াটায় সময় বেঁচে যাচ্ছে অনেকখানি।

দেখা গেল শুধু সকালের নাস্তার সময়েই আমরা একত্র হতে পারছি। নাস্তা খেতে খেতেই এলড্রিজ আমাকে বললেন আর্কাইভ থেকে মাটির পাত্রগুলো আবার আমাদের সংগ্রহশালায় সরানোর কাজটা শুরু করতে। সত্যি কথা বলতে কী, টাইপরাইটারে ভরে রাখা সফেদ কাগজগুলোর নির্বাক দৃষ্টির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য একটা অজুহাত খুঁজে পেয়ে আমি বেশ খুশিই হলাম, র‍্যালও খুশি হলো পাহাড়ে পাহাড়ে নিস্ফল খোঁজাখুঁজি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ায়।

আর্কাইভের ঠান্ডা, শান্তিময় আঁধারে আবার আমরা আগের গৎবাঁধা নিয়মে কাজ শুরু করলাম। প্রতিটা পাত্রের ছবি তুলে সেটার অবস্থানের জায়গাটা চিহ্নিত করে, তারপর ওটাকে লেবেল করে টুকে রাখতে লাগলাম আমাদের নোটবুকে। কাজটা মোটেও শক্ত কিছু না, র‍্যালই মূলত বক বক করে গেল পুরোটা সময়। কারণ আমার ক্লান্তি ভাব কাটেনি তখনও। র‍্যাল তাক থেকে আরও একটা পাত্র টেনে নামালো, তারপর তাকটার পেছন দিকে কৌতূহলী হয়ে গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে রইলো। ওখানে দেওয়ালের পাথর কেটে একটা চৌকো খোপ বানানো।

"আরে," বিস্মিত হয়ে বলল র‍্যাল। "এটা কী?" সাথে সাথে মনে হলো আমার শরীর থেকে খুলে ফেলা একটা কাপড়ের মতই সকল ক্লান্তি খসে পড়ল। আমি প্রায় দৌড়ে গেলাম ওর কাছে, ওই যত্ন করে বানানো খোপটার ভেতরে লুকিয়ে রাখা ছোট, হোঁতকা পাত্রগুলোর দিকে তাকাতেই কেন যেন মনে হলো–এগুলো কী তা আমি জানি। অনুভব করতে পারলাম যে বিশাল একটা অগ্রগতি হয়ে গেল এই আবিষ্কারের মাধ্যমে, প্রাচীন রহস্যের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এটা হলো একটা বিশাল ধাপ। এই ধারণাটা কেন যেন আমার মনের মধ্যে তখনই বদ্ধমূল হয়ে গেল, এমন মনে হচ্ছিল যেন আমি

এই ছোট পাত্রগুলোকে ভুল করে এড়িয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু এখন আবার খুঁজে পেয়েছি সেগুলোকে।

র‍্যাল ছাদ থেকে লাইটটা খুলে নিয়ে এল খোপের ভেতরটা ভালো করে দেখার জন্য, সাথে সাথেই আমরা আরও একটা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলাম ওটার। সামনের দিকে যতগুলো পাত্র দেখা যাচ্ছে তার সবগুলোরই মুখ বাঁধা–স্বর্ণের তার পেঁচিয়ে ঢেকে আর পাত্রটাকে আটকে রাখা হয়েছে, তার উপরে একটা কাদা মাটির মোহর মারা যাতে একটা পাখির প্রতিকৃতির ছাপ। আমি সামনে ঝুঁকে হালকা ফুঁ দিয়ে মোহরের ছাপটার উঁপরে জমে থাকা ধুলো উড়িয়ে দিলাম। ছাপটা একটা মাথা ঝুঁকিয়ে রাখা শকুনের, নিচে কিরণ ছড়ানো অবস্থায় সূর্য–জিম্বাবুয়ের সভ্যতাটার চিরপরিচিত সাজিমাটির পাখি। আধুনিক রোডেশিয়ার প্রতীকচিহ্ন হিসেবে ব্যবহার হওয়া এই মোহরটা, প্রায় সন্দেহাতিতভাবে প্রমাণিত একটা ২,০০০ বছরের পুরনো পিউনিক সভ্যতায় দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে ব্রিটিশ কোট অভ আর্মসের সিংহ আর ইউনিকর্নের প্রতীকটা বিংশ শতাব্দীতে এসে কোনো মিশরীয় সমাধিতে আবিষ্কার করে বসার মত।

কাজের মধ্যে কোনো ভুল না করেই যতটা সম্ভব দ্রুত হাত লাগালাম এবার আমরা; প্রথমেই খোপটার সামনের সব পাত্র ছবি তুলে চিহ্নিত করে সরিয়ে ফেললাম, সরানো শেষে দেখা গেল ওগুলোর পেছনে পাঁচটা ছোট পাত্র ঢাকা পড়েছিল! প্রতি মুহূর্তে আমার উত্তেজনা বাড়তেই লাগল, একটা বিশাল আবিষ্কার সম্পর্কে প্রত্যাশাটাও পোক্ত হতে লাগল আরও। পাত্রগুলোর মুখ আটকানোর ধরন, মোহরটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এগুলোর গুরুত্ব আলাদা। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছিল যেন আমি দিন গুনছিলাম, অপেক্ষায় ছিলাম পাত্রগুলো আবিষ্কারের জন্য, আমার আশার বেলুন ফুলে ফেঁপে বড় হতে লাগল। যখন ওগুলো খোপটা থেকে বের করার সময় এল, তখন "কিন্তু ওগুলো খুঁজে বের করলাম তো আমি!" বলে র‍্যালের গাঁইগুঁই সত্ত্বেও ওগুলো সরানোর সম্মানীত দায়িত্বটা আমিই নিয়ে নিলাম জোর করে।

মইটার সবার উপরের ধাপে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, আমি হাত বাড়িয়ে ওগুলোর প্রথমটা তুলে আনার চেষ্টা করলাম।

"আটকে আছে," বললাম আমি, কারণ টানাটানির পরেও পাত্রটা পাথরের তাকের উপর অনড় বসেই থাকলো। "নিশ্চিত নিচে কিছু একটা দিয়ে আটকে রেখেছে।" আমি খোপটার ভেতরে আরও খানিকটা মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে সাবধানে পাত্রগুলোর পেছনের দিকে হাত ঢুকিয়ে দিলাম কীসে আটকানো সেটা বোঝা যায় কিনা দেখতে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি সেরকম কিছুই নেই।

"অন্য আরেকটা টেনে দেখুন," পরামর্শ দিল র‍্যাল, আমার ঘাড়ের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে ও। একটা কাঠের মোড়ার উপর ওর ঢ্যাঙ্গা পা দুটো রেখে দাঁড়িয়ে আছে। "আমিও হাত লাগাবো নাকি?"

"আরে, র‍্যাল, তুমি যদি আমাকে নড়া-চড়ারই জায়গা না দাও, তাহলে তো দম বন্ধ হয়েই মরে যাবো।"

"স্যরি, ডক," বিড়বিড় করে বলল ও, তারপর পুরো সোয়া ইঞ্চি সরে গেল পেছনে।

আমি পরের পাত্রটাও আনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেটাও তাকের উপরে শক্ত হয়ে এঁটে বসে রইলো। বাকি তিনটার অবস্থাও দেখা গেল একই রকম।

"অদ্ভুত তো," র‍্যাল ব্যাপারটা বুঝলো, আমি আবার প্রথম পাত্রটা তোলার চেষ্টা করলাম, তাকের শেষ প্রান্তে কনুই বাধিয়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করতে লাগলাম সেটাকে। শরীরের পুরো শক্তি খাটাতে হলো তা করতে গিয়ে; হাতের সবগুলো পেশী ফুলে উঠে টানটান হয়ে যাওয়ার পরে সামান্য নড়ে উঠলো পাত্রটা। আমার দিকে এগিয়ে এল এক ইঞ্চিমতো, সাথে সাথে ধরতে পারলাম যে, পাত্রগুলো তাকের উপর এভাবে অনড় বসে থাকার কারণ এটাকে কিছুর সাথে আটকে রাখা হয়েছে বলে না, বরং এর কারণ নিজের অপরিমেয় ওজন। আকৃতিতে দ্বিগুণ আগের পাত্রগুলোর চাইতে এগুলো কমপক্ষে পঞ্চাশ গুণ বেশি ভারি।

"র‍্যাল," ডাকলাম আমি। "তোমার সাহায্য না নিয়ে আর পারা গেল না বোধহয়।"

আমরা দুজনেই ধরে টেনে টেনে তাকটার সামনের কিনারায় নিয়ে এলাম ওটাকে, তারপর একটা সদ্যজাত বাচ্চার মত দুই হাতে কোলের সাথে চেপে ওটাকে নিচে নামালাম আমি। পরে মেপে দেখেছিলাম ওটার ওজন ১২২ পাউন্ড, অথচ পাত্রটা শ্যাম্পেনের দেড়সেরি বোতলের চাইতে বড় হবে না।

র‍্যাল সাবধানে ওটাকে ধরে আমাকে সাহায্য করল ফাইবার গ্লাসের ট্রেতে তুলে রাখতে, পাত্রগুলো পরিবহনের জন্য এটাকে বিশেষভাবে বানিয়েছি আমরা। আমরা দুজন দুটো হাতল ধরে, আর্কাইভ থেকে বেরিয়ে, তারপর বের হওয়ার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে, ঢোকার মুখে গার্ডদের পোস্ট পার করে নিয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি বাইরে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, এমারেল্ড দীঘির উপরের খোলা জায়গাটা দিয়ে তারার আলোর মিটিমিটি আলোক বিন্দু দেখা যাচ্ছে।

আমাদের দুজনের উচ্চতার ভিন্নতার কারণে ট্রে-টা বয়ে নিতে অসুবিধা হচ্ছিল বেশ, কিন্তু সেটাকে পাত্তা না দিয়ে দ্রুত পাথরের গুহাটা পেরিয়ে ক্যাম্পের দিকে ছুটলাম। সংগ্রহশালায় তখনও আলো জ্বলছে দেখে স্বস্তি

পেলাম খুব। র‍্যাল আর আমি যখন আমাদের মহামূল্যবান পাত্রটা নিয়ে ঢুকলাম ভেতরে তখন অন্যরা কাজ ফেলে চোখ তুলে-ও তাকালো না।

র‍্যালের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলাম আমি, তারপর দুজন পাত্রটাকে মূল কাজের বেঞ্চটার কাছে নিয়ে গেলাম। ট্রে থেকে বেঞ্চের উপর তুলতে গিয়ে দুজনকেই একসাথে শরীর দিয়ে চেপে ধরতে হলো। জোরে দম ফেলতে ফেলতে এবার তাকালাম ঘরের ভেতরের ঝুঁকে থাকা তিনটা মাথার দিকে।

"এলড্রিজ, কষ্ট করে একবার দেখবেন নাকি যে এটা কী?"

"একটু দাঁড়ান," বলে এলড্রিজ ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে একটা প্যাঁচ খোলা লিপির উপর নজর বুলাতে লাগলেন, র‍্যাল আর আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলাম; অবশেষে উনি গ্লাসটা পাশে নামিয়ে রেখে মুখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে। ঠিক আমার মতই সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া দেখালেন তিনি। তার চশমার ঝলকানি চোখে পড়ল আমার, টাক মাথা জুড়ে গোলাপি রঙের আভা–ঠিক যেন তাজ মহলের গম্বুজের উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ছে। দ্রুত উনি এগিয়ে এলেন বেঞ্চের দিকে।

"কোথায় পেলেন এটা? কয়টা আছে এরকম? মোহর মারা দেখছি!" মাটির পাত্রটা স্পর্শ করা মাত্রই দেখলাম ওনার হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ওনার গলার স্বরে মেয়ে দুজনও টের পেল ঘটনার গুরুত্ব, প্রায় উড়ে এল আমাদের কাছে। সশ্রদ্ধ চিত্তে আমরা পাত্রটা ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"খোলেন।" নীরবতা ভাংলো স্যালি।

"রাতের খাবারের সময় হয়েছে।" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। "কালকে করলেই ভালো হবে মনে হয়।" হালকা চালে বললাম, দুই মেয়েই চোখ লাল করে তাকালো আমার দিকে।

"হবে না," শুরু করল স্যালি, তারপরেই আমার মুখভঙ্গি চোখে পড়ল ওর, স্বস্তি বয়ে গেল চেহারায়। "এসব ব্যাপারে ফাজলামো করা উচিত না মোটেও," কড়া গলায় বলল ও আমাকে।

"প্রফেসর হ্যামিল্টন, তাহলে আমরা অপেক্ষা করছি কেন?"

"সেটাই তো!" বললেন উনি, তারপর দুজনেই মোহরটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম। দুটো সাইডকাটার দিয়ে স্বর্ণের তারটা কেটে ফেললাম প্রথমে, তারপরে সাবধানে মোহরটাকে আলগা করে দিলাম। ঢাকনা উঠে এল সহজেই, ভেতরটা আগের মতই লিলেনে আবৃত সিলিন্ডার। তবে চামড়ার দুর্গন্ধের আলামত পাওয়া গেল না। এলড্রিজের হাতগুলো চিকন সাদা মোমবাতির সমান, ওনার পক্ষে পাত্রটা নাড়ানো সম্ভব হলো না। আমি সাবধানে ওটাকে একদিকে কাত করে ধরলাম, তিনি ওটাকে স্থির করে আটকে ধরে রাখলেন, শেষে ভেতর থেকে ভারি রোলটা বের করে আনলাম আমিই। উপরের আবরণ খুবই ভালো অবস্থাতে আছে, অক্ষতভাবে পেঁচিয়ে রেখেছে পুরোটা।

কেউ কিছু না বলে বের করে আনা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলো। এতে কী আছে সেটা অনুমান করতে পারছিলাম আমি। শুধুমাত্র একটা পদার্থই আছে যেটা এতটা ভারি, কিন্তু তবুও নিজের প্রত্যাশা পূরণ হতে দেখতে পাওয়ার মাঝেও এক অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে।

এটাও আরেকটা লিখিত লিপি, তবে চামড়ার তৈরি না। এই লিপিটা হচ্ছে খাঁটি স্বর্ণে তৈরি একটা গোল করে প্যাঁচানো দীর্ঘ পাত। এক ইঞ্চির ষোলো ভাগের এক ভাগ পুরু, আঠারো ইঞ্চি চওড়া আর আটাশ ফুটের চাইতে সামান্য লম্বা। ওজন ১,৯৫৪ আউন্স যার বাজার মূল্য ৮৫,০০০ ডলার। এরকম আছে আরও পাঁচটা–মানে ৪,২৫,০০০ ডলার, যদিও এতে যা লেখা আছে সেটার দামের তুলনায় এই মূল্য কিছুই না।

চমৎকারভাবে পেটানো পাতটা সহজেই প্যাঁচ খুলে সোজা হয়ে গেল, যেন একটা প্রাচীন রহস্যের সমাধান করে দেওয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে। খুবই ধারালো কোনো খোদাইকারের যন্ত্র দিয়ে দুর্দান্ত কারিগরি দক্ষতার সাহায্যে প্রতিটা বর্ণ খোদাই করা হয়েছে তাতে, গা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে পাঠকের চোখ।

আমরা মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে, শেষে এলড্রিজ কুপির কালি এনে ওটার চোখ ধাঁধানো অংশটার উপর লেপে দিলেন, তারপর সাবধানে মুছে ফেললেন অতিরিক্ত অংশটুকু। প্রতিটা প্রতীক বোঝা গেল তখন–সোনালি পটভূমিতে কালো খোদাই হিসেবে ফুটে আছে। হ্যামিল্টন চশমাটা ঠিক করে নিলেন, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন খোদাই করা পিউনিক ভাষার বাক্যগুলোর উপর। পড়া শুরু করার পর, থেকে থেকে আজব সব আওয়াজ আর বিড়বিড় করতে লাগলেন। আমরা আরও কাছে ঘেঁষে এলাম, বাচ্চারা যেরকম গল্পের আসরে জাঁকিয়ে বসে, সেভাবে।

শেষে থাকতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে আমিই সবার মুখপাত্র হয়ে বললাম, "ঈশ্বরের দোহাই লাগে, জোরে জোরে পড়েন এটা!"

এলড্রিজ আমার দিকে তাকিয়ে শয়তানের মত হেসে উঠলেন। "দারুণ জিনিস লেখা আছে এখানে।" বলে উনি সিগারেট ধরাতে শুরু করলেন, আমরা চুপচাপ এই অসহ্য নীরবতা সয়ে গেলাম। তারপর পড়তে শুরু করলেন তিনি। সাথে সাথে বোঝা গেল যে আমরা এগুলোর প্রথম লিপিটাই বের করে এনেছি, এলড্রিজ লেখকের কথা পড়ে শোনাচ্ছেন আমাদেরকে।

"*আমার দোকানে গিয়ে, ওখান থেকে ওপেটের সবচে খাঁটি স্বর্ণে তৈরি পাঁচ শত সোনার আঙুল নিয়ে নেবে। ওটা দিয়ে এমন একটা লিপি তৈরি করবে যেটা কখনও নষ্ট হবে না, যাতে করে এই কাব্যগুলো আজীবন অমর হয়ে থাকতে পারে। যাতে আমনের পুত্র, বাআলের সর্বোচ্চ পুরোহিত এবং অ্যাসটার্তের প্রিয়পাত্র, অমৃত পাত্রের ধারক, সব দেবতার কুঠারবাহক,*

আমাদের সবার প্রিয় হুই-এর কথার মাধ্যমে আমাদের জাতির মহিমান্বিত ইতিহাস আজীবন স্মরিত হতে পারে। লোকেরা যেন এসব পড়ে তেমন উল্লাস করে, যেমন উল্লাস আমি করেছি; লোকজন যেন তার গান শুনে এমন কান্না কাঁদে, যেমনটা আমি কেঁদেছি; তার হাসি প্রতিধ্বনিত হোক অনাগত কাল জুড়ে আর তার জ্ঞান টিকে থাকুক চিরজীবন।

"এ হলো লানন হাইকানাস-এর কথা, ওপেটের সাতচল্লিশতম গ্রাই-লায়ন, পান্ট এবং বাকি চারটা সাম্রাজ্যের রাজা, দক্ষিণ সাগরের শাসনকর্তা আর নদীপথের রক্ষাকারী, ঘাসের সমতলভূমি আর তার পেছনের পাহাড়ের প্রভু।"

এলড্রিজ পড়া থামালেন, তারপর তাকে ঘিরে থাকা ব্যগ্র চেহারাগুলোর দিকে তাকালেন একবার। আমরা সবাই চুপ মেরে আছি। ওসব নীরস হিসাব-কিতাব, বাজারের ফর্দ বা পরিষদের আদেশের বিবরণের চাইতে অনেক অনেক ভিন্ন কিছু লেখা এখানে। এই লিপিটা এখানকার মাটি আর মানুষের অস্তিত্ব আর জীবনের কথা দিয়ে ভরা!

"ওয়াও!" ফিসফিসিয়ে বলল র‍্যাল। "ওই আমলেও তো দেখি খুব ভালো সাংবাদিক ছিল।" কেন যেন এই টিটকারিতে বিরক্তি এসে চুলকাতে লাগল আমার স্নায়ুর প্রান্ত।

"এরপর?" বললাম আমি, এলড্রিজ মাথা ঝাঁকিয়ে কনুইয়ের কাছে থাকা অ্যাশট্রেতে সিগারেটের গোড়াটা পিষে ফেলে আবার পড়তে আরম্ভ করলেন। মাঝে মাঝে থেমে আরও খানিকটা প্যাঁচ খুলে, উন্মুক্ত অংশটায় কালি লেপে দেওয়ার জন্য থামলেন শুধু, উনি একটানা পড়ে গেলেন আর আমরাও শুনে গেলাম চুপচাপ, একেবারে ঘোরের ভেতরেই ছিলাম সবাই। সাঁ সাঁ করে কেটে যেতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রায় ২,০০০ হাজার বছর পরে আবার আমরা হুই বেন-আমনের কবিতা আবৃত্তি হতে শুনলাম।

ওপেটের প্রথম দার্শনিক আর ঐতিহাসিকের সন্ধান পেলাম আমরা। সেই আদ্যিকালে মারা যাওয়া এই কবির কাব্য শুনতে শুনতে আমার কেমন যেন তার সাথে আত্মার একটা বন্ধন সৃষ্টি হলো। আমি তার গৌরব আর ক্ষুদ্র ব্যাপারেও আত্মশ্লাঘার ব্যাপারটা ধরতে পারলাম, তার সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি বেশ পছন্দ হলো, তার লাগামছাড়া কল্পনা আর নিশ্চিত অতিরঞ্জনকে যদিও আমলে নিলাম না...আর উনি আমার চারপাশে গল্পের যে জাল বুনে দিলেন, সেটায় আটকে রইলাম আষ্টেপৃষ্ঠে।

তার গল্পের শুরু হচ্ছে রোমের নেকড়েদের কার্থেজ ঘিরে রাখার কাহিনির মাধ্যমে–কার্থেজ অবরুদ্ধ, রক্তাক্ত, স্কিপিয়ো অ্যামেলিনিয়াস-এর নেতৃত্বে সেনাদল কার্থেজের দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আক্রমণ শুরু করল। মুখে শ্লোগান দিচ্ছে তারা–"*কার্থেজের পতন হোক।*"

তার কাব্যে জানতে পারলাম–কীভাবে হাসদ্রুবাল একটা দ্রুতগামী জাহাজ ভূমধ্যসাগরে পাঠিয়ে দেন; যেখানে বার্কাদের শেষ বংশধর, হামিলকার সাতান্নটা হিপ্পোর তৈরি জাহাজ সম্বলিত বিশাল এক নৌবহর নিয়ে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অপেক্ষা করছিলেন। এই পরিবারটা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা আর রাজনীতির বাইরে ছিল তখন।

কীভাবে অবরুদ্ধ নেতা সাহায্য চেয়ে পাঠান আর ঝড় আর প্রতিকূল বাতাসের কারণে সেটা পেতে ব্যর্থ হন–সেই গল্পও আছে। স্কিপিয়ো দরজা ভেঙ্গে শহরে ঢুকে পড়েন, হাসদ্রুবাল পাহাড়ের উপরের আশমান-এর মন্দিরের বিশাল বেদীটার উপর লড়াই করতে করে মারা যান, তার হাতের তরবারিটা রোমান সৈন্যদলের আঘাতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

এইটুক বলে এলড্রিজ থামলেন একটু, আধা ঘণ্টার ভেতর প্রথম কথা বলে উঠলাম আমি।"এখান থেকে প্রথম তারিখটা জানা যাচ্ছে। তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ আর কার্থেজের চূড়ান্ত পতন, যা ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব একশো ছেচল্লিশ সালে।"

"আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে ওপেটের ক্যালেন্ডারও কিন্তু এই দিন থেকেই শুরু হয়েছে," এলড্রিজ সায় দিলেন।

"এরপর কী?" বলল স্যালি। "প্লিজ পড়েন!"

দুটো পালতোলা জাহাজ শুধু কার্থেজের এই গণহত্যা, লুটতরাজ আর ধর্ষণের হাত থেকে পালাতে পারলো। ওরা বাতাসের সহযোগিতায় পালিয়ে চলে এল হিপ্পোতে, যেখানে হামিলকার ঝড়ের কারণে জাহাজ আটকে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। জাহাজের লোকজন জানালো যে কীভাবে হাসদ্রুবাল মারা গিয়েছেন আর স্কিপিয়ো শহরটাকে নরকের দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন; একেবারে দেওয়াল পর্যন্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছেন সব, কীভাবে বেঁচে থাকা ৫০,০০০ নগরবাসীকে দাস হিসেবে বিক্রি করেছেন, কীভাবে লবণ ঢেলে নষ্ট করেছেন ফসলের মাঠ এবং ধ্বংসাবশেষের ভেতরে কেউ ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে অত্যাচার করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন।

"*এতো নির্মম ছিল সেই ঘৃণা, এত নিষ্ঠুর আচরণ, এ শুধু একজন রোমানের হৃদয় থেকেই উতসরিত হতে পারে,*" কবির কাব্যে শোকের মাতম। বার্কা হামিলকার বিশ দিন আর বিশ রাত ধরে কার্থেজের জন্য শোক করলেন, তারপর ডেকে পাঠালেন তার জাহাজের কাপ্তানদেরকে।

তারা সবাই এল নেতার কাছে, নয়জনের প্রত্যেকেই; কবি হুই তাদের নাম লিখেছেন–জাডাল, হানিস, ফিলো, হাব্বাকুক লাল আর বাকিরা। কয়েকজন লড়াই করতে চাইলো কিন্তু বেশিরভাগই পরামর্শ দিল পালিয়ে যেতে, কারণ কার্থেজিনিয়ান সৈন্যদলের এই গুটিকয়েক সদস্য দিয়ে তো আর

রোমের বিশাল সৈন্য বাহিনী আর ভয়ানক যুদ্ধ জাহাজের বহরের মোকাবেলা করা সম্ভব না।

বোঝা গেল যে, কার্থেজিনিয়ানদেরকে কেউই আর আশ্রয় দিল না, রোম তার অত্যাচারি পদতলের নিচে সমগ্র দুনিয়াকে নিয়ে এল। তারপর হাব্বাকুক লাল, সমুদ্রের বুড়ো সিংহ আর চৌকশ নাবিক, সবাইকে ৩০০ বছর আগে হান্নোর করা একটা সমুদ্রাভিযানের কথা মনে করিয়ে দিলেন। হান্নো হারকিউলিসের দরজা পেরিয়ে এমন এক দেশে গিয়ে পৌঁছেছিলেন যেখানে ঋতু পুরো উল্টো এখানের তুলনায়। পাথরের উপরে ফুলের ন্যায় ফুটে থাকে স্বর্ণ আর সমতলে ঝাঁকে ঝাঁকে হাতি ঘুরে বেড়ায়। কার্থেজের বাআল হাম্মন-এর বিশাল মন্দিরটার গায়ে হান্নোর নিজের লিখিত সমুদ্রাভিযানটার বর্ণনা শিলা লিপি আঁকারে সাটানো আছে, এরা সবাই পড়ে দেখেছেন সেটা। রোমানরা সেটা ধ্বংস করে দিয়েছে। সবার মনে পড়ল যে ওখানে উনি বিশাল একটা নদী আর হ্রদের কথা লিখেছিলেন, যেখানে শান্তশিষ্ট হলুদ চামড়ার লোকেরা তাকে স্বাগত জানায় আর পুঁতি এবং কাপড়ের সাথে স্বর্ণ এবং হাতির দাঁত বিনিময় করে; তাকে জাহাজ সারাইয়ের জন্য ওখানে অবস্থান করতে হয় আর সেই ফাঁকে মাঠে ফসল ফলানো শুরু করেন।

"জায়গাটা খুবই ভালো," লিখেছেন উনি। *"আর উর্বর।"*

আর এভাবেই নির্বাসনের প্রথম একটা বছর বার্কা হামিলকার ৫৭টা বিশাল জাহাজের একটা বহর নিয়ে ঘুরতে থাকেন, প্রতিটায় ছিল ১৫০ জন মাল্লা আর নাবিক, প্রথমে তারা পশ্চিম দিকে বিশাল হারকিউলিসের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে তারপর দক্ষিণ দিকে এক অজানা সমুদ্রে ভেসে পড়েন। তার সাথে ছিল নয় হাজার পুরুষ, মহিলা আর বাচ্চা। যাত্রাটা ছিল দুই বছরের, তারা একটু একটু করে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে এগিয়ে আসতে থাকেন। পথিমধ্যে হাজারটা বিপদ আর কষ্টের বাঁধা অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে হয়ে তাদেরকে। কোথাও নামলেই বর্বর কৃষ্ণাঙ্গ গোত্র, জন্তু জানোয়ার আর রোগ-শোকে ছেয়ে ধরতো; সাগরে থাকলে ডুবোচর আর ঢেউ, ঘূর্ণি বায়ু এসে ফেলতো বিপদে।

যাত্রা শুরু করার দুই বছর পরে এসে ওনারা একটা চওড়া আর শান্ত নদীর মোহনায় এসে উপস্থিত হন। তারপর ষোলোদিন সেটা ধরে এগোতে থাকেন, কোথাও কোথাও আটকে গেলে ঠেলে নিয়ে অবশেষে সেই বিশাল হ্রদের কাছে পৌঁছান, যেটার কথা হান্নো লিখেছিলেন। ওনারা সবচেয়ে দূরের পাড়ে একটা লম্বা লাল পাথরের পাহাড়ের গোঁড়ায় এসে নামেন। বার্কা হামিলকার ওখানেই কাঁপুনি জ্বরে ভুগে মারা যান, উত্তরের মশকপ্রবণ এলাকা থেকে তিনি অসুখটা বাঁধিয়েছিলেন। ওনার বাচ্চা ছেলে, লানন হামিলকারককে নতুন রাজা হিসেবে বাছাই করা হয়; নয় কাপ্তান হন তার

সভাসদ। ওনারা তাদের এই নতুন আবাসের নাম দেন *ওপেট*, য়া কিংবদন্তীর স্বর্ণনির্মিত দেশের নাম, ওনারা ওনাদের প্রথম শহরটা এমন এক জায়গায় পত্তন করেন যেখানে পাহাড়ের ভেতর থেকে একটা সুগভীর দীঘি উঠে এসেছে। ওই দীঘি আর এই শহরটা অ্যাসটার্টে দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়।

"মাই গড, ভোর চারটা বাজে।" র‍্যাল ডেভিডসন আমাদের ঘোর ভাঙ্গালো, রাতের বেশিরভাগটাই কাটিয়ে দিয়েছি! তখনই বুঝলাম যে কতটা ক্লান্ত আমি, শারীরিক আর মানসিক দুই দিক থেকেই অবসন্ন হয়ে আছি; কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত। আমি আমার প্লিনিকে খুঁজে পেয়েছি, এখন বিজয়ীর বেশে লন্ডন যাওয়া যাবে। সবকিছু পেয়ে গিয়েছি আমি।

খুবই দ্রুততার সাথে দিন যেতে লাগল। সূর্যোদয়ের আগেই এখন কাজে লেগে যাই। টাইপরাইটারে খটাখট চলতেই থাকে আর লেখায় ভরা কাগজের স্তূপ জমতে থাকে সেটার পাশে। প্রতিদিন দুপুর পর্যন্ত কাজ করতাম, বিকেল আর সন্ধ্যা কাটাতাম সংগ্রহশালায়। কবি হুইয়ের স্বর্ণ নির্মিত বইগুলো থেকে তার রচিত কাব্য শুনতাম। এর অনুবাদ যে এপ্রিলের এক তারিখের আগে কোনো ভাবেই শেষ হবে না, সে ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন ছিল না। তবে ভাগ্য ভালো হলে হয়তো পাঁচটার ভেতরে প্রথম দুইটা শেষ করা সম্ভব হবে। আর একই সাথে ওই দিনের জন্য রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির কমিটির অনুমোদন পেয়ে যাওয়ায় এখন আর সেটাও কোনোভাবে পেছানো সম্ভব হবে না। অ্যাংলো-স্টারভেসান্টের লন্ডন শাখার পাবলিক রিলেশনস অফিস সব আয়োজন সেরে ফেলেছে, আমন্ত্রণ জানিয়ে কার্ড পাঠানো হয়েছে, সেগুলো গৃহীতও হয়েছে, থাকা খাওয়া, যাতায়াত আর এরকম হাজারটা খুঁটিনাটির ব্যবস্থা করে নিশ্চিত করে ফেলা হয়েছে সব।

ব্যাপারটা অনেকটা বিস্কুট দৌড়ের মত, হাতে যতটা সময় আছে তার ভেতরেই এই অনবদ্য আর বিপুল তথ্য আর কিংবদন্তীর যতটা পারা সম্ভব উপস্থাপন করতে হবে আমাকে। বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে অতিরঞ্জন যাতে না হয়ে যায়, সেই তাড়নার মুখে লাগাম দিতে হচ্ছে সবসময়। হুইয়ের ভাষা আমার আবেগের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল প্রচণ্ডভাবে। আমি নিজেও তার লেখার উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমাটা অনুসরণ করার চেষ্টা করছিলাম, তার মতই বীরদের ভূয়সী প্রশংসা আর খলনায়কদেরকে কড়া সমালোচনা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। মুন সিটির সবাই গল্পটার সাথে গভীরভাবে একাত্ম হয়ে পড়ছিলাম। এমনকি এলড্রিজ হ্যামিল্টন, যিনি আমাদের ভেতরে একমাত্র আফ্রিকার বাইরের লোক, তিনিও লেখার জাঁকজমকে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছিলেন। বাকি আমরা, যাদের জন্য আফ্রিকা জীবিকা আর আবেগ দুই দিক দিয়েই অস্তিত্বের উৎস, তাদের জন্য এই কাব্য ছিল এক পরম শোভনীয় আনন্দ-যাত্রা!

মাঝে মাঝেই মনে হতো আমাদের, এই সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আসলে ওপেটের এই মানুষগুলোর প্রচেষ্টা আর দুঃসাহসিকতারই প্রতিরূপ মাত্র। মাঝে প্রায় ২,০০০ বছরের একটা ছেদ থাকলেও তাদেরকে আমাদের কাছের সম্পর্কের বলে মনে হতে লাগল।

হ্রদের পাশের এই উপনিবেশ প্রথম পাঁচ বছর উন্নতির শিখরে উঠতে থাকে। কাদা আর গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি হতো বাসা-বাড়ি, ওপেটের লোকজন তাদের নতুন আবাসের সাথে কিছু অলিখিত চুক্তি করে নেয়। স্থানীয় ইয়ুয়িদের সাথে ওরা একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ইয়ুয়িরা সেই হলুদ চামড়ার লোক, যাদের কথা হান্নো তিনশো বছর আগেই বর্ণনা করেছিলেন। লম্বা সুতনু দেহ সাথে ঢলঢলে চোখ আর পলকা দেহাবয়ব। পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে এরাই হচ্ছে হটেনটটদের পূর্বপুরুষ। জাতিটা ছিল মূলত পশুপালক, ছাগল আর ছোট ছোট গরুর পাল ছিল সবার। এছাড়াও শিকার আর ফাঁদে ফেলে পশু ধরতেও ওস্তাদ ছিল তারা, নুড়িতে ভরা নদীবক্ষ থেকে পলিমাটির ভেতরে থাকা স্বর্ণের কুচি সংগ্রহ করতো। বাচ্চা রাজার নামে, হাব্বাকুক লাল ইয়ুয়িদের সাথে, মানে ইয়ুয়ি রাজার সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তি মোতাবেক এই বিশাল নদী আর টুয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী সব ভূমি ওপেটের লোকজনকে দিয়ে দেওয়া হয়, বিনিময়ে ইয়ুয়িরা পায় লিলেনের পাঁচটা গাঠরি আর লোহার বিশটা তরবারি।

সন্তুষ্ট হয়ে, হাব্বাকুক লাল, যার কাছে সমুদ্রযাত্রা আর সাগরের ঘ্রাণ ছিল ধমনীর মধ্যে রক্তের প্রবাহের মতই, পাঁচটা দ্রুতগামী জাহাজে ওপেটের স্বর্ণ আর হাতির দাঁত বোঝাই করে মধ্য সাগরে যাত্রা করেন। নয়মাস পরে ফিরে আসেন উনি, এই যাত্রায় উনি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল জুড়ে নানান জায়গায় যাত্রাবিরতির কেন্দ্র স্থাপন করেন; সাথে নিয়ে আসেন অজস্র পুঁতি, লিলেন আর নানান বিলাস সামগ্রী। উনিই প্রথম এই বাণিজ্য পথটা বের করেন যেটা দিয়ে পরবর্তীতে জানা দুনিয়ায় আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের সম্পদ আনা-নেয়া করা হতো, কিন্তু রোমের প্রতিহিংসাপরায়ণ দৃষ্টি থেকে বাঁচতে উনি ওনার এই যাত্রাপথকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখেন যা কেবলমাত্র তার মত একটা দক্ষ বুড়ো সমুদ্র-শেয়ালের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

তিনি সাথে করে ওপেটের আবাসের জন্য নতুন কর্মচারীও নিয়ে আসেন–ধাতুবিদ, রাজমিস্ত্রি, জাহাজ শ্রমিক আর সাধারণ অভিযাত্রী। যাই হোক, ইয়ুয়িদের স্বর্ণ আর হাতির দাঁতের ঝলকানি কমে আসতে লাগল ধীরে ধীরে, কারণ প্রাচীন খনিগুলো থেকে উত্তোলন করে ফেলা হলো সব। হাব্বাকুক লাল একশো লোকের একটা দল নিয়ে ইয়ুয়িদের শহরে গমন করেন। উনি সমগ্র ইয়ুয়ি রাজ্য জুড়ে শিকার এবং বাণিজ্যের অনুমতি চান, রাজা-ও সাথে সাথে রাজি হয়ে, দুর্বোধ্য সব হিজিবিজি লেখা একটা চামড়ার

লিপির নিচে নিজের মোহর মেরে দেন। এরপর আদেশ দেন অতিথিদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করার। বিশাল লাউয়ের খোলের পাত্রে করে আনা হয় মদ, গনগনে কয়লার উপর ঝুলিয়ে রোস্ট করা হয় আস্ত ষাঁড়, চপলা ইয়ুয়ি নর্তকীরা নগ্ন শরীরে নাচ প্রদর্শন করে, সূর্যের আলোয় ঝিলিক মারতে থাকে তাদের তেল চকচকে দেহ।

ইয়ুয়িদের হৈ-হট্টগোল যখন চরমে, তখন রাজা উঠে দাঁড়ান আচমকা, তারপর হাত মুঠো করে ইঙ্গিত করেন সামনের লোকগুলোর দিকে যাদের চাহিদা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

"খুন করো এই সাদা শয়তানগুলোকে," চিৎকার করে ওঠেন রাজা। ওনার সৈন্যরা, যারা শহরের মাটির দেওয়ালের ওপাশেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওপেটের দলটার উপর।

হাব্বাকুক লাল কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেন, হাতের যুদ্ধ কুঠারটা ভয়ানকভাবে দুইপাশে ঘোরাতে ঘোরাতে শত্রুবুহ্য থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। পেছন পেছন ওনার তিনজন লোকও পারলো বেরিয়ে যেতে, কিন্তু বাকিদের সবাইকেই আটক করে গদার আঘাতে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হলো।

হাব্বাকুক লাল আর তার তিন দুঃসাহসী সঙ্গী ধাওয়াকারী ইয়ুয়ি সৈন্যদের দৌড়ে হারিয়ে, পৌঁছে গেলেন বিশাল নদীটার তীরে যেখানে তাদের জাহাজগুলো ভেড়ানো ছিল। সাদা পাল উড়িয়ে তারা প্রায় উড়ে গিয়ে ওপেটে পৌঁছে দিলেন সতর্কবার্তা। যখন ইয়ুয়িদের ৪০,০০০ শক্ত সামর্থবান সৈনিক ঝাঁক বেঁধে লাল পাহাড়গুলোর মাঝ দিয়ে ওপেটে এসে পৌঁছালো, তখন ওপেটের ৫,০০০ লোক মোকাবেলা করার জন্য মুখোমুখি হলো তাদের।

সারাটা দিন হলুদ মানুষের দল আক্রমণ চালানোর চেষ্টা চালালো। ওপেটের তীরন্দাজদের সামনে ওরা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতই আছড়ে পড়ল। প্রায় সারাদিনই পঙ্গপালের মত তাদের দিকে ছুটে যেতে লাগল তীর বৃষ্টি। যখন মনোবল ভেঙ্গে, অবসন্ন ইয়ুয়ি সৈন্যদল পিছু হটলো, ঠিক তখনই হাব্বাকুক লাল পদাতিক সৈন্যদেরকে যুদ্ধ-কুঠার হাতে লেলিয়ে দিলেন। ঠিক যেমন খরগোশকে তাড়া করে গ্রেহাউন্ড, নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেড়ার পালের উপর, ওরাও ওদেরকে সেভাবেই তাড়া করে বেড়ালো, আঁধার নেমে এলে তবেই থামলো সেই হত্যাযজ্ঞ। ইয়ুয়ি সাম্রাজ্যের পতন হলো তার জ্বলন্ত শহরের শিখায়, ওটার লোকেদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে নেওয়া হলো। এটাই আফ্রিকার নিয়ম, এটা এমন একটা দেশ যেখানে শক্তের পূজা করা হয় শুধু, সিংহ একা হলেও মাথা উঁচু করেই বাঁচে।

তখন হঠাৎই এতদিন যে বসতিটা চুপচাপ নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, শুধু শিকড় ছড়িয়ে নিজের ভিত্তিটা মজবুত করার কাজে

মগ্ন ছিল, সেটা যেন বসন্তের ছোঁয়ায় ফুলে-ফলে-পত্র-পল্লবে বিস্ফোরিত হয়ে গেল।

ওদের ধাতুবিদরা খুঁজে বের করলেন ধাতুগুলোর মূল উৎস, শিকারিরা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল; খামারিরা ইয়ুয়িদের ছোট বাছুরগুলো থেকে শুরু করে বড় বড় ষাঁড় প্রতিপালন শুরু করল, যেগুলো হাব্বাকুক লাল তার জাহাজে করে উত্তর দিক থেকে নিয়ে এসেছিলেন। কৃষকরা জমিতে ফসল বুনে হ্রদ থেকে পানি এনে সেচ দিতে লাগল। শহরের নাগরিক আর দেবতাদের নিরাপত্তা দিতে ওপেটের চারপাশে দেওয়াল তৈরির একটা কাজও শুরু করা হয় তখন। এই ভূমি আর তার সম্পত্তি নয়টা সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং নির্বাসনের সময় আসা জাহাজগুলোর কাপ্তানদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হতো, তারা সবাই তখন রাজার সভাসদ।

হাব্বাকুক লাল ততোদিনে বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছেন, বিশাল অবয়বটা কুঁকড়ে থাকে সারাক্ষণ; আগুন-লাল চুল আর দাড়ি ততোদিনে রূপ নিয়েছে ছাই ধূসর রঙে। একসময় মারা গেলেন তিনি। কিন্তু তার বড় ছেলে, যে ততোদিনে ওপেটের নৌবহরের প্রধান নিযুক্ত হয়েছে, বাবার নাম গ্রহণ করল। আরও একজন হাব্বাকুক লাল ওপেটের বর্ধনশীল নৌবহরকে বাণিজ্য আর নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। তার বহর ততোদিনে উত্তর দিকে সুপরিচিত হয়ে যাওয়া উপকূল ধরে যেমন এগোতো, তেমনি দক্ষিণ দিকেও যাত্রা করতো...যেখানে ভূমি নিজেই নিজের উপর উঠে যেত আরেকটা বিশাল ভোঁতা মাথার পাহাড় দক্ষিণের অন্তরীপটা পাহারা দিতো। এখানেই উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আগত আচমকা একটা ঝড়ে ওপেটের নৌবহরের প্রায় অর্ধেক গিয়ে আছড়ে পড়ে ওই পাহাড়ের পাদদেশের পাথরে। পুরোহিতরা এটাকে দেবতাদের একটা ইশারা বলে রায় দেন, এবং আর কখনোই যেন ওপেটের কোনো জাহাজ এতটা দক্ষিণে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক করেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেল। সিংহাসনে নতুন নতুন রাজা অধিষ্ঠিত হলেন, তারাও চলে গেলেন। নতুন নতুন রীতিনীতি উদ্ভূত হতে লাগল, এই জায়গার সাথে তাল রেখে দেবতাদের আরাধনা আর আচার অনুষ্ঠানও পাল্টে নেওয়া হলো, ইয়ুয়ি আর ওপেটের সংমিশ্রণে নতুন এক জাতের মানুষের উদ্ভব হলো। এরাও দেশের নাগরিক, কিন্তু ক্ষমতা থাকত শুধু ওই নয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের অধীনে। একজন নাগরিকের সকল অধিকার ভোগ করতো এরা বা কর্তব্যও পালন করতো, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো স্তরেই কোনো ভূমিকা রাখতে পারতো না। এটা সংরক্ষিত ছিল শুধু ওই প্রাচীন, বিশুদ্ধ আর অকলঙ্কিত রক্তধারীদের জন্য। এই অভিজাত সম্প্রদায়ের ভেতর থেকেই একটা যোদ্ধা পুরোহিত দলের উদ্ভব ঘটলো। এরা ছিল সবাই আমন-এর

সন্তান। আরেকটা ব্যাপার জেনে দারুণ মজা পেলাম যে, এই দলটার পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রাচীন সাম্রাজ্যের একজন; প্রাচীন সাম্রাজ্য মানে হলো কান্নান-এর সীমানার টায়ার আর সাইডন সাম্রাজ্য। তার মানে এই পুরোহিতরা সম্ভবত ছিলেন ইহুদি বংশোদ্ভূত। যে কোনো চটকদার গল্পে আমরা[৬১] না থেকে পারি না, তাই না?

নতুন নতুন বীরের আগমন ঘটতে লাগল যারা দেশের সীমান্তে যুদ্ধ করতে লাগলেন, শক্ত হাতে দাসদের বিদ্রোহ দমন করলেন, বা বিশাল কোনো বুনো জানোয়ার কতল করলেন। হাতি পালনের পুরনো বিদ্যা শুরু হলো আবার, সৈন্যদলের অগ্রবাহিনী হিসেবে যুক্ত হলো হাতির পালও। খনির ভারি মালপত্র উত্তোলন বা বিশাল জিনিস পরিবহনের কষ্টকর কাজ সহজ হয়ে গেল পুরোপুরি।

স্বর্ণ নির্মিত বই-এর মাধ্যমে আমরা অতীত থেকে এক চরম উদ্দীপক ভ্রমণ সেরে নিচ্ছিলাম। হুই দেওয়ালের নকশার বর্ণনা লিখেছেন, বাআলের মিনারগুলোর কথা লিখেছেন। আমরা যে ফাউন্ডেশন আবিষ্কার করেছি হুবহু সেটার সাথে মিলে গেল। হুইয়ের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে দেওয়ালগুলোর উচ্চতা পঁয়ত্রিশ ফিট আর পুরুত্ব পনেরো ফিট, কিন্তু শহরের সবাই কীভাবে গায়েব হয়ে গেল সেটার রহস্য তখনও কাটলো না।

একটা জায়গায় গ্রাই-লায়নকে–রাজা এই উপাধি দিয়েছেন ততোদিনে–পাঠানো কাদিজ-এর মিশরীয় প্রতিনিধির উপহারের কথা লিখেছেন কবি; এর ভেতরে আছে একটা স্বর্ণের পাত্র, সেটার গায়ে চমৎকারভাবে অমর জীবনের প্রতীক অঙ্কন করা। এটাই হচ্ছে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ভেতরে পাওয়া আমাদের পানপাত্রটা। সেই রাত্রে আমি আবার সেটাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। নতুন দৃষ্টিতে অবলোকন করলাম ওটার ক্ষত-বিক্ষত সৌন্দর্য।

হুইয়ের কাব্য পড়ার সময়, উনি যেসব জায়গা আর প্রাণীর উল্লেখ করেছেন, সেসবের আধুনিক নাম অনুমান করাটা একটা ধাঁধার খেলার মত হয়ে গেল আমাদের জন্য। ওসব শহর আর সৈন্যদের আস্তানা অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, বা হারিয়ে গিয়েছে রহস্যময় প্রাচীন পাথরের নিচে; যেগুলো মধ্য আফ্রিকার মানচিত্র জুড়ে বিন্দু বিন্দু হিসেবে টিকে আছে। যাই হোক, আমরা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে, কীভাবে ওপেটের লোকজন এমন জমি খোঁজা শুরু করল যেখানে আঙ্গুর আর জলপাই বাগান করতে পারবে। উত্তর দিক থেকে পঞ্চম হাব্বাকুক লালের জাহাজে করে যে তেল আর মদ আসতো সেগুলো ছিল খুবই দামী, যাত্রা পথের খরচ ধরলে ওগুলোর ওজনের চাইতেও বেশি স্বর্ণ দিয়ে দাম চুকাতে হতো।

---

[৬১]ইহুদিরা

গ্রাই-লায়নের উদ্যানবিদ আর আঙুর বিশেষজ্ঞরা পূর্ব দিকে একটা উঁচু পর্বতশ্রেণী খুঁজে বের করল। পাহাড়গুলো কুয়াশা আর বিশুদ্ধ শীতল বাতাসে ভরা। পাহাড়ের গা কেটে কেটে ঢালু সোপান তৈরি করা শুরু হলো, কয়েক হাজার দাসকে নিযুক্ত করা হলো এই কাজে। মাটির পাত্রে করে গাছের চারা কয়েকটা দ্রুতগামী জাহাজে করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দক্ষিণ দিকে, তারপর হাতির পিঠে করে নিয়ে আসা হলো জেং-এর পাহাড়ে, ওখান থেকেই আসা শুরু হলো জেং-এর সুস্বাদু রেড ওয়াইন, কবি হুই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে সেটার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ওখানে ওই আঙুর বাগান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বর্ণনা দেওয়া আছে, ওগুলোর কিছু অংশ এখনও ইনিয়াঙ্গা পাহাড়ে বিদ্যমান।

পান্ট এবং বাকি চার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জানোয়ার আর বন্য পাখির বর্ণনা থেকে আমরা ওগুলোর বেশিরভাগকেই চিনতে পারলাম। পবিত্র সানবার্ড, যেটা বাআলের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া মাংস বয়ে নিয়ে যেত, সেটা একটা মেঘহীন আকাশেও সোজা উপর দিকে এত উঁচুতে উঠে যেত যে একসময় মানব চক্ষুর পাল্লার বাইরে পৌঁছে যেত। এটা অবশ্যই শকুনকে বোঝাচ্ছে। তখন আমরা এই স্বর্ণের লিপির পাত্রের উপর খোদাই করা শকুনের প্রতীক আর মোহরটার তাৎপর্য ধরতে পারলাম। আমনের পুত্র, বেন-আমন, যোদ্ধা পুরোহিতরা শকুনকে নিজেদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই হুই লিপি ভরা পাত্রের উপর নিজের ব্যক্তিগত মোহরই মেরে দিয়েছিলেন।

কবির বর্ণনায় আরও প্রাণীর বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলো এখন বিলুপ্ত না হয়ে পারে না, এই মধ্যবর্তী দুই হাজার বছরে গায়েব হয়ে গিয়েছে সেগুলো। এর মাঝে আসলটা হচ্ছে গ্রাই-লায়ন। কারণ আমরা লিপি থেকে জানতে পেরেছি যে রাজা সত্যিকার একটা জানোয়ার থেকেই নিজের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এগুলো ছিল বিশাল আকৃতির বেড়াল গোত্রের শিকারি প্রাণী যারা থাকত হ্রদের দক্ষিণ পাড়ের নলখাগড়াময় অঞ্চলে। ওপেট বর্ষ ২১৬-এর দিকে এই প্রাণীটা সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। ততোদিনে ওটা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছে। এই সংরক্ষণের উদ্যোগের কারণ ছিল নতুন রাজার সিংহাসনে আরোহনের যে আচার-অনুষ্ঠান ছিল সেটায় ওটার ভূমিকা; অনুষ্ঠানটার নাম হুই লিখেছেন 'গ্রাই-লায়ন বধ'। ওনার বর্ণনা মতে জন্তুটা হচ্ছে লালচে বাদামি রঙের, চেহারায় ছিল কালো আর সাদা রঙের ডোরাকাটা। দাঁড়িয়ে থাকলে কাঁধ বরাবর পাঁচ ফুট উঁচু হতো ওগুলো। শ্বদন্ত বের হয়ে থাকত গালের ভেতর থেকে, চোয়ালে ছিল একেকটা দশ ইঞ্চি করে নিখুঁতভাবে বাঁকানো দাঁত। যদিও বাকিরা হুইয়ের বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করল, কিন্তু আমার মনে পড়ল যে আমি এর আগেও এরকম

বড় বাঁকা দাঁতঅলা বন বিড়ালের কথা পড়েছি। স্টার্কফন্টেইন গুহার[৬২] উপরের স্তরের আবিষ্কৃত হাড়গোড়ের ভেতরে এরকম একটা জানোয়ারের কংকালও আবিষ্কার হয়েছে।

হুইয়ের বর্ণনা থেকে জানতে পারলাম কীভাবে জ্যান্ত প্রাণীর কেনা-বেচা আরম্ভ হলো। ওদের প্রাচীন শত্রু, রোম, আফ্রিকার উত্তর অঞ্চল থেকে সার্কাসের জন্য সিংহ, গণ্ডার আর হাতি ধরে ধরে ওই অঞ্চল খালি করে ফেলেছিল। হানিস, যিনি হচ্ছেন দক্ষিণের সমতল তৃণভূমির শিকারি, একটা পদ্ধতি বের করলেন যাতে জানোয়ারগুলোকে জ্যান্ত ধরে তারপর বুনো লতাপাতের বীজ থেকে সংগৃহীত রস দিয়ে তৈরি ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলা যায়। জ্ঞানহীন অবস্থায় ওগুলোকে হাব্বাকুক লালের জাহাজে তুলে দিয়ে, দ্রুত উত্তর দিকের উপকূল ধরে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। হুই এসব জানোয়ারের প্রায় পঞ্চাশ ভাগের বেঁচে থাকার কথা লিখেছেন, সেটা ছিল অভাবনীয়, এসব প্রাণী রোমের রোমাঞ্চকামী ইতর জনগণের বিনোদনের মাধ্যমে আকাশ ছোঁয়া মূল্য এনে দিতো।

ওপেট বর্ষ ৪৫০-এ, জাতিটা যখন তার সম্পদ আর শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে, তখন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা অতিরিক্ত বেড়ে যায়। রাজ্যের সীমানা বর্ধিত হতে থাকে, যে পরিমাণ দাস ছিল তা দিয়ে এর বহুবিধ প্রতিষ্ঠানগুলো সামলানো আর সম্ভব হচ্ছিল না। মরিয়া হয়ে গ্রাই-লায়ন দাস সংগ্রহের জন্য অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেন যারা বিশাল নদীটা পেরিয়ে উত্তর দিকে দশ দিন ধরে যাত্রা করে। হাসমন বেন-আমন ৫০০ বলশালী কৃষ্ণাঙ্গ নুবিয়ান বন্দীকে নিয়ে ফিরে আসেন আর গ্রাই-লায়নের কাছ থেকে লাভ করে বিশেষ পুরস্কার।

হুই বেন-আমনের দ্বিতীয় স্বর্ণের বইটা শেষ করতে করতে লিয়ারটা চলে এল আমাদেরকে নেওয়ার জন্য। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়া বাদ দিয়ে উঠে পড়তে হলো ওটায়।

র‍্যাল আর লেসলিকে জায়গাটা দেখাশোনার ভার দিয়ে, এলড্রিক, স্যালি আর আমি চললাম লুয়ান্ডা থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ধরতে। মালের জন্য ২০০ পাউন্ড অতিরিক্ত ভাড়া দেওয়া লাগল আমাদের, আরও দেওয়া লাগল বোতসোয়ানা পুলিশ ইন্সপেক্টরের বিমান ভাড়া, আমরা সাথে করে যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ নিয়ে যাচ্ছি সেগুলোর দিকে নজর রাখতে সরকারের তরফ থেকে পাঠানো হয়েছিল একে।

---

[৬২]সাউথ আফ্রিকার গুয়াতেং প্রদেশের একটা প্রাগৈতিহাসিক গুহা



লন্ডন পৌঁছে আমরা এক দিন ছুটি পেলাম, আমাদের নিজেদের জন্য মূল্যবান একটা দিন, যথারীতি একদিনেই সব ঘুরে ফেলতে চাইলাম আমি। লিঙ্কন'স ইন ফিল্ড-এর সামনের খোলা জায়গায় দেখলাম ক্রকাস ফুটে আছে, ডিউক স্ট্রিটের বার্লি মৌ-এর বিয়ার আগের চাইতে বেশি সুস্বাদু মনে হলো এবার, কিংস রোড-এ সদ্য যুবতী মেয়েদের দেখলাম গতবারের চাইতে বেশি সুন্দরি লাগছে। সন্ধ্যা ছয়টায় যখন ন্যাশনাল গ্যালারি বন্ধ হয়ে গেল তখন আমি আর স্যালি একটা ক্যাব নিয়ে সোজা বিউশ্যাম্প প্যালেসের স্যান লোরেঞ্জোতে গিয়ে ওখানকার অসাধারণ অসোবুকো[৬৩] অর্ডার দিলাম, তারপর শিয়ান্তি নামের ওয়াইন দিয়ে পেটে চালান করলাম সেটা। এরপর পর্দা উত্তোলনের ঠিক আগ মুহূর্তে গিয়ে ঢুকতে পারলাম কুইন্স থিয়েটারে। মুন সিটিতে আমাদের জীবনযাত্রার চাইতে এখানকার সবই সম্পূর্ণ আলাদা।

ডরচেস্টারে যখন পৌঁছলাম তখন মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু স্যালি তখনও এই অসাধারণ শহরটা দর্শনের ধাক্কা কাটাতে পারেনি।

"এখনই ঘুম আসবে না আমার, বেন। কী করা যায়?"

"উম্ম, আমার স্যুইটে এক বোতল শ্যাম্পেন আছে," ইঙ্গিত করলাম আমি, ও আমার দিকে চোখে দুষ্টুমি নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

"বেন কাজিন, আমার সবচে পছন্দের বয় স্কাউট। সদা প্রস্তুত![৬৪] ঠিক আছে, চলুন শেষ করা যাক।"

শ্যাম্পেনের নাম ক্রাগ, একদমই স্বচ্ছ আর শুষ্ক। বোতল অর্ধেক খালি হওয়ার পরে ছয় মাসের ভেতরে প্রথম আদর করলাম আমরা। কোনো কোনো দিক দিয়ে বলা চলে যে এবারের অভিজ্ঞতা ছিল প্রথম বারের চাইতেও ভয়ানক। পরে আমি শারীরিক এবং আত্মিক দুই ভাবেই রিক্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে রইলাম; স্যালিই পরে খালি গ্লাসগুলো নিয়ে লাউঞ্জ থেকে কানায় কানায় স্বচ্ছ ওয়াইন ভরে নিয়ে এসে আমার উপর দাঁড়িয়ে রইলো, নগ্ন এবং অনিদ্য সুন্দর হয়ে।

"আমি জানি না কেন করলাম কাজটা," টিউলিপের আকৃতির একটা গ্লাস আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল ও।

---

[৬৩]বাছুরের মাংস আর সবজি

[৬৪]স্কাউট শ্লোগান

"খারাপ লাগছে এখন?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"না, বেন। আমাদের মধ্যে যা হয়েছে তার জন্য আমার জীবনেও খারাপ লাগেনি। আমি শুধু চেয়েছি–" কিন্তু কথা শেষ না করেই ও থেমে গিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল একটা তারপর বিছানায় আমার পাশে এসে বসল।

"তুমি তো জানো যে আমি ভালোবাসি তোমাকে," বললাম আমি।

"হ্যাঁ," বলে ও আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেটার গভীরতা আমি ধরতে পারলাম না।

"আমি সবসময়ই তোমাকে ভালোবেসে যাবো," বললাম আমি।

"যতো যা-ই হোক না কেন?" জিজ্ঞেস করল স্যালি।

"যতো যা-ই হোক," বললাম আমি।

"আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, বেন," মাথা ঝাঁকালো ও, ওর চোখজোড়া গাঢ় সবুজ লাগছে এখন। "থ্যাংক ইউ।"

"স্যালি–" আবার শুরু করলাম আমি, কিন্তু ও যত্ন চর্চিত একটা লম্বা আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁট চাপা দিয়ে এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগল যে ওর পেলব কেশ গুচ্ছ গালের উপর এসে দোল খেতে লাগল। "ধৈর্য ধরেন, বেন, প্লিজ ধৈর্য ধরেন।" কিন্তু আমি ওর আঙুল টেনে আমার ঠোঁটের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম।

"স্যালি–" এবার ও সামনে ঝুঁকে ওর ঠোঁট দিয়ে আমার ঠোঁট বন্ধ করে দিল। চুমু ধরে রেখেই বিছানার পাশে ওর গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো, আমারটাও দুর্বল মুঠো থেকে ছাড়িয়ে ওরটার পাশেই রাখলো আবার। তারপর আবার এমন আগ্রাসী দক্ষতা আর কৌশলে আদর করতে লাগল যে আমার ভেতরে আর কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি অবশিষ্ট রইলো না। পরদিন সকাল নয়টায় আমি স্যালিকে একটা ট্যাক্সিতে করে বন্ড স্ট্রিটের এলিযাবেথ আর্ডেন-এ পাঠিয়ে দিলাম, যদিও ওর ওই ঘন কালো চুলগুলোর কী হতে পারে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন বোধ করলাম কিছুটা। কোনো সুন্দরি মেয়ে পেলেই ওই গবেটের দল যা করে, তাতে ওদেরকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। তারপর আমিও একটা ট্যাক্সিতে উঠে এম৪ ধরে হিথ্রো-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ট্র্যাফিক জ্যামের খপ্পর পড়তে; যা কিনা ব্রিটিশ পরিবহন ব্যবস্থাকে এমন অলস আর নিরস একটা অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছে।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দেখি লোরেনের বিমান এসে নেমে পড়েছে, আমি দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম আন্তর্জাতিক টার্মিনালে, হাজারে হাজারে মানুষ গিজগিজ করছে সেখানে।

ভিড়ের মধ্যে কাউকে বিস্ময় প্রকাশ করতে শুনলাম, "নিশ্চয়ই ডিকি আর লিজ![৬৫]" আর সাথে সাথে আমি স্টারভেসান্টের সাঙ্গপাঙ্গদের অবস্থান

---

[৬৫]রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেইলর

সম্পর্কে সতর্ক হয়ে গেলাম। ভূমি থেকে আমার স্বল্প উচ্চতার কারণে আমি যে সীমিত দৃষ্টিক্ষেত্র পাই, তাতে আমাকে সবসময় বাধ্য হতে হয় এসব অন্যের দেখা তথ্যের উপর নির্ভর করতে।

আমি ধাক্কাধাক্কি করতে করতে বার্টন ভেবে ভুল করে বসা দলটার কাছে পৌঁছলাম, গিয়েই বুঝলাম যে লোকজনের আসলে দোষ দেওয়া যায় না। লোরেন স্টারভেসান্ট একেবারে জমকালো ভাবে এসে পৌঁছেছে, একদম সেইরকম ভাবসাব নিয়ে, ওর সাথের লোকেরা আগে আগে দৌড়ে লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে ওর জন্য দরজা পর্যন্ত রাস্তা করে দিল। ওদের পাশ দিয়েই সার বেঁধে এগোচ্ছে সাংবাদিকদের একটা ছোট দল, যাদের সাথে বারবার ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে, কিন্তু বিওয়াইএমদের সাথে খুব বেশি সুবিধা করতে পারলো না ওরা। কারণ ওদের কৌশল ছিল একদমই প্রচলিত। আমি ভিড়টা বরাবর দাঁড়িয়ে, মাথা নিচু করে দিলাম ছুট, সাথে সাথেই চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল, "আরে কী করছেন," আর "ধরো একে," যেটা খুব দ্রুতই পরিবর্তিত হলো, "স্যরি, ডক্টর!"-এ।

আর আমি পৌঁছে গেলাম সারির মাঝখানে। ববি স্টারভেসান্ট গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠে আমার গলা ধরে ঝুলে পড়ল। আর আমাদের স্বাগতম জানানোর পালা শেষ পর্যন্ত পুরো অগ্রযাত্রাটাই থেমে থাকলো ওখানে। হিলারি পরে আছে হানি বেজির চামড়ায় তৈরি নরম পোশাক যেটা ওর চুলের ঔজ্জ্বল্যের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে, ওর পাশেই বিশালদেহী লোরেন, ঘাড়ের কেশর রোদে পুড়ে সাদাটে সোনালিতে রূপ নিয়েছে আর চেহারা পুড়ে হয়েছে বাদামের মত গাঢ়বাদামি।

"বেন, শালা বুড়ো হারামি," ও আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরলো। "থ্যাংক গড যে আসতে পেরেছো। হিল আর বাচ্চাদেরকে একটু দেখে রাখতে পারবে না? কয়েকটা কাজ আছে আমার, ডরচেস্টারে এসে দেখা করবো।"

দুটো লম্বা কালো ঝকঝকে লিমোজিন অপেক্ষা করছিল বাইরের চত্বরে, দলটা সুন্দরমতো দুই ভাগ হয়ে গেল, কিন্তু লোরেন আবার ফিরে এসে আমাকে গর্ব ভরে বলল, "সিচেলসে একটা কালো মার্লিন[৬৬] কিনেছি আমি–নয়শো পাউন্ডের, বেন। সেই রকম সুন্দর।"

"সাবাস," অভিনন্দন জানালাম আমি তাকে।

"গ্লেন গ্রান্টটা বের করে রেখো। বেশি দেরি হবে না আমার।"

হিলারির উল্টো দিকের জাম্প সিটে গিয়ে বসলাম আমি, একটা বিওয়াইএমকে টক্কর দিতে হলো এজন্য। হিলারিকে এরকম সমুজ্জ্বল চেহারায় দেখে খুবই ভালো লাগল আমার। আনন্দের উজ্জ্বল চকচকে ভাব রয়েছে চোখে-মুখে, যা কসমেটিকস বা আই লাইনার দিয়ে ঢাকা যায় না।

---

[৬৬]প্রমোদতরী

"আমরা দশ দিন ছিলাম দ্বীপগুলোতে, বেন। দারুণ কেটেছে সময়টা।" স্মৃতিগুলো মনে হতেই ও একদম স্বপ্নালু আর নরম হয়ে গেল। "আমাদের অ্যানিভার্সারি ছিল। দেখো!" বলে ও ওর বাঁ হাতটা তুলে ধরলো যেখানে হীরে বসানো একটা লাল স্বর্ণের তৈরি বিশাল আঙটি শোভা পাচ্ছে। লোরেনের জীবনযাত্রার প্রণালীর সাথে পরিচিত আমি, কিন্তু তারপরেও চোখ পিটপিট করতে লাগলাম। হীরেটার রঙ ছিল নীলচে সাদা আর দেখতে জবরদস্ত, নিশ্চিত পঁচিশ ক্যারেটের এক রত্তি কম হবে না।

"খুবই সুন্দর, হিলারি।" কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই আমার মনে চিন্তা এল–অপরাধ যত গভীর, উপহারও ততো বড়।

ডরচেস্টারে পৌঁছার পর বারোক কায়দায় তৈরি অলিভার মেসেল স্যুইটের বিশালতা দেখে হাঁ হয়ে গেল হিলারি, বিস্ময় চাপতে মুখে হাত চাপা দিতে হলো ওর।

"দেখে তো বিশ্বাসই হচ্ছে না, বেন," হাসতে হাসতে বলল ও। "এ সত্যি না।"

"হেসো না," সতর্ক করলাম আমি ওকে। "লোরেনের প্রতিদিন কমপক্ষে একশো পাউন্ড খরচ হচ্ছে।"

"ওয়াও!" প্রকাণ্ড একটা আর্মচেয়ারের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে যেতে বলল ও। "একটা ড্রিংক এনে দাও না, বেন সোনা। আমার দরকার।"

ড্রিংক ঢালতে ঢালতে কোনো দরকার ছাড়াই জিজ্ঞেস করে বসলাম, "তার মানে তোমাদের ঝামেলাটা তেমন গুরুতর ছিল না আসলে, হিল?"

"আমাদের যে কোনো ঝামেলা ছিল সেটাই তো ভুলে গিয়েছি, বেন। ও এখন আগের যে কোনো সময়ের চাইতেও ভালো হয়ে গিয়েছে।"

যখন লোরেন ফিরে এল তখন বুঝতে পারলাম হিলারির কথার আসল অর্থ। লোরেন বেশ খোশ মেজাজে আছে, হাসি-তামাশা করছে; শরীর শক্তিতে ভরপুর, গায়ের চামড়া মসৃণ, টানটান আর রোদে পোড়া। সাথে থাকা শেষ দুইজন বিওয়াইএমকেও বিদায় করে দিল লোরেন আর আমি ওকে গ্লেন গ্রান্ট ঢেলে দিলাম কোট আর টাই একটা চেয়ারের উপর ছুঁড়ে দিল ও, তারপর ফুলে ওঠা বাদামি পেশীর উপর শার্টের হাতা গুটিয়ে হাতে নিল ড্রিংকের গ্লাস।

"ঠিক আছে, বেন। দেখাও আমাকে।" আমরা ডুবে গেলাম লিপিগুলো আর সেটার অনুবাদের উপর নানান নিরীক্ষা আর আলোচনায়।

লোরেন প্রথম পাতার প্রথম লাইনটাই ধরে বসল।

"*আমার দোকানে গিয়ে, ওখান থেকে ওপেটের সবচে খাঁটি স্বর্ণে তৈরি পাঁচ শত সোনার আঙুল নিয়ে নেবে–*" লাইনটা আরও একবার পড়ল লোরেন, তারপর মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে। "এতো একেবারে বুড়ো

রাজার মুখের কথা বেন। *আমার দোকান!* ওটাই হচ্ছে ওনার কোষাগার। বলদ হ্যামিল্টন এটার অনুবাদ ভুল করেছেন। এটা হওয়া উচিত 'কোষাগার'।"

"হঠাৎ পিউনিকে এত দক্ষ হয়ে গেলে যে," প্রশংসা করলাম আমি ওর।

"দোহাই, বেন, স্বর্ণ আনার জন্য কেউ কোনোদিন দোকানে পাঠায়?" বলে ও গ্লেন গ্রান্টে একটা চুমুক দিল। "যদি তোমার ধারণ সত্যি হয়–"

"আমাকে এসব যদি-ফদি বলতে এসো না, লো। তোমার নাম উইলফ্রেড স্নেল না।"

"ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি যে আমাদের শহরটার একটা ভয়ানক আর আচমকা মৃত্যু হয়েছে। আগুনে পুড়ে মরে গিয়েছে সব মানুষ, কিন্তু যে আর্কাইভটাকে ওরা এতটা প্রিয় মনে করতো সেটা কেউ স্পর্শ করতে পারলো না! তার মানে হচ্ছে ওই কোষাগারটাও যে কেউ স্পর্শ করতে পারেনি সেটারও খুব ভালো একটা সম্ভাবনা আছে। আমাদেরকে শুধু সেটা খুঁজে বের করেতে হবে।"

"বেশ!" বলে আমি মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে হাসলাম। "এটা তো একটা বিশাল আবিষ্কার। গত ছয় মাস ধরে আমি এটা খোঁজার জন্য আমার হাড় কালি করে ফেলছি।"

"ওটা আছে ওখানে, বেন।" আমার হাসির জবাবে কিছু বলল না ও।

"কোথায়, লো? কোন জায়গায়?"

"কাছে-পিঠেই কোথাও। মূল দেওয়ালের ভেতরেই কোথাও, কে জানে হয়তো ওই গুহার আশপাশেই।"

"হেল, লো। আমি কমপক্ষে পঞ্চাশবার ওটার ইঞ্চি বাই ইঞ্চি খুঁজে দেখেছি," আমি মৃদু কিন্তু বর্ধমান বিরক্তি নিয়ে বললাম কথাটা।

"আর যখন একশোবার ওটা খোঁজা শেষ হবে, তখন তুমি বুঝবে যে কীভাবে চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে ছিলে।"

"কী সব বলছো, লো!" শুরু করলাম আমি। "আমার মনে হয় না–"

"ফুঁসে ওঠার আগে একটা ড্রিঙ্ক নাও, পার্টনার।"

ওর কথামতোই কাজ করলাম আমি, লোরেন বলে চললো। "আমি বলছি না যে তুমি যা করেছো তাতে ভুল ছিল, বেন। শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই–উনিশশো নয় সালে থিয়োডোর ডেভিস তার বই শেষ করেছিলেন এই কথা বলে যে, "আমি ভয় পাচ্ছি যে ভ্যালি অভ দ্য কিংস ফুরিয়ে গিয়েছে।"

"হ্যাঁ, আমি জানি, লো, কিন্তু–"

আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে লোরেন বলে চললো, "তার মাত্র তেরো বছর পরেই হাওয়ার্ড কার্টার তুতেন খামেনের সমাধি আবিষ্কার করেন, যা ওই উপত্যকায় আবিষ্কৃত সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ।"

"কেউ খোঁজা বাদ দিয়ে দেওয়ার কথা বলছে না, লো। তুমি যত দিন পয়সা দেবে, ততোদিন আমি খোঁজা বাদ দেব না।"

"তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে আমার চেক বইয়ের চাইতে তোমার কৌতূহলই নাছোড়বান্দা বেশি।"

"হেরে যাবে," সতর্ক করলাম ওকে আমি, আমরা আবার হাসিতে ভেঙ্গে পড়লাম।

বিকেলের মাঝামাঝি সময়ে উঠলাম আমরা, বিওয়াইএম-এর পাল এসে লোরেনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। হোটেলের সামনেই একটা কালো রোলস অপেক্ষা করছিল, সেদিকেই গেল ওরা, আমি পাশ দিয়ে বের হওয়ার দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম পার্ক লেনে আমার নিজের থাকার জায়গায় যাওয়ার ট্যাক্সি ধরতে।

এলড্রিজ হ্যামিল্টন আমার জন্য রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির বাইরের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ওর উজ্জ্বল লাল মিনিতে করে অক্সফোর্ড যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। বরাবরের মতই কনুইতে পট্টি মারা ট্যুইডের স্যুট পরনে, তবে পরের দিনের দুশ্চিন্তায় অসুস্থ লাগছিল তাকে।

"আমার আর তর সইছে না, বেন," শয়তানি উল্লাসে খলখল করে হেসে উঠলেন উনি। "সবাই কি হোটেলে এসে পৌঁছেছে?"

"না, তবে স্নেল আসবে আজ সন্ধ্যায়।"

এলড্রিজ খুশির চোটে বাচ্চাদের মত ছোট ছোট লাফ দিতে দিতে বললেন, "ঠিক যেভাবে একটা জলহস্তী জলপ্রপাতের কিনারের দিকে এগিয়ে যায়।" তুলনাটা নিষ্ঠুর হলেও যথাযথ, ভাবলাম আমি। আমরা দুজনে মিলে দুই স্তরের ওক কাঠের দরজা পেরিয়ে সুসজ্জিত হল ঘরে এসে পৌঁছলাম, জায়গাটা আমাদের পেশার ক্ষেত্রে একটা সম্মানিত মন্দিরের মত। ভবনটা জুড়ে একটা চাপা সম্ভ্রম কাজ করে, যেটা এই পাগলাটে আর সদা পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় আমার জন্য বেশ ভরসা আর স্থায়িত্বের প্রতীক।

পাশাপাশি দুজনে মিলে বিশাল সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম, মহান সব ব্যক্তিত্বের পোর্ট্রেট আর সোসাইটি কর্তৃক সম্মানিত নানান ব্যক্তির নামের তালিকা ঝোলানো দেওয়ালে।

"আপনার ছবিটা কে আঁকবে, সেটা কিন্তু বেশ ভেবে চিন্তে ঠিক করবেন, বেন।" এলড্রিজ পোর্ট্রেটগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। "সবাই বলে যে ওই বিদেশি শিল্পী, জনি–কি যেন নাম, অ্যানিগনি?–তার কাজ নাকি বিশেষ খারাপ না।"

"এসব ফাও কথা বলবেন না তো," ঝট করে বললাম আমি, উনি ওনার সেই ঘোড়ার ডাকের মত হাসিটা হাসলেন যেটা এই ফাঁকা ভবনটার ভেতরে বিউগলের আওয়াজের মতই বেজে উঠলো। আমার একান্ত ব্যক্তিগত আর

বহুবার করা কল্পনাটার উপর এলড্রিজের এই ন্যাক্কারজনক হামলায় খুবই বিরক্ত হলাম আমি। একজন বিনয়ী এবং অতিমাত্রায় চাপা স্বভাবের মানুষ আমি; কিন্তু যেবার প্রথম পা রেখেছিলাম এখানে, এই পোর্ট্রেটগুলোর দিকে তাকিয়েছিলাম, সাথে সাথে কল্পনার চোখে দেখতে পেয়েছিলাম–আমার নিজের কালো মুখায়বটাও এই ওয়াল অভ অনার থেকে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। আমি এমনকি কীভাবে পোজ দেব সেটাও ঠিক করে রেখেছি–বসে থাকবো, যাতে আমার শরীরটার বিকৃতিগুলো খুব বেশি দৃষ্টিগোচর না হয়, চেহারা ঘুরিয়ে রাখবো খানিকটা। আমার চেহারার ডান পাশের ছবি খুব ভালো আসে। কপালের পাশটায় সম্ভ্রান্ত লোকদের মত এক গুচ্ছ শুভ্র চুল থাকবে, ল্যাপেলে থাকবে বিদেশি কোনো সাজগোজের রঙচঙে ফিতা, সম্মানের প্রতীক হিসেবে আরকি। মুখভঙ্গি হবে গম্ভীর, ভ্রু থাকবে কুঁচকে

“আসেন আসেন,” ডাকলেন এলড্রিজ, আমরা এগিয়ে গেলাম যেদিকে সভাপতি আর কয়েকজন পরিষদের সদস্য শেরি আর আর বিস্কুট নিয়ে আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন, সামনে ভালো মানের কোনো হুইস্কি চোখে পড়ল না। তা সত্ত্বেও, এ ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম যে, কয়েক মিনিট আগে যে কল্পনাটায় বিভোর ছিলাম, সেটা সত্যি করার ক্ষমতা রাখেন শুধু এই ভদ্রলোকেরাই। আমি চেষ্টা করে গেলাম যতটা সম্ভব বিনয়ী আর অমায়িক থাকতে সবার সাথে, কিছুক্ষণ পরেই দেখে গেল এর ফলে কাঙ্ক্ষিত প্রভাবই পড়তে শুরু করেছে।

আমরা সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধন নিয়ে আলাপ করলাম, যেটা আগামীকাল বিকেল আড়াইটায় হওয়ার কথা।

“মহামান্য রাজা উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবেন,” ওনাদের একজন ব্যাখ্যা করলেন। “আমরা অনুরোধ করেছি সেটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাঝেই শেষ করতে, যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন অর্কিড চাষ বা পাহাড় বাওয়া নিয়ে কিছু না বলার জন্য।”

এরপর আমি আমার পেপারটা পড়বো। ছয় বছর আগে আমি যে পেপারটা পড়েছিলাম সেটার সম্পূরক হিসেবে ধরা হবে এটাকে। ‘খ্রিস্টের জন্মের আগে মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরীয় প্রভাব’–এটা হলো সেই পেপার যেটা উইলিয়াম স্নেল আর তার সাঙ্গপাঙ্গকে চরম বিনোদনের খোরাক এনে দিয়েছিল। আমার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে চার ঘণ্টা।

এলড্রিজ ওনার পেপার পড়বেন পরেরদিন সকালে, ‘দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা উদ্ভূত বিশেষ প্রাচীন লিপি এবং প্রতীক’। এলড্রিজ ইচ্ছে করেই এরকম একটা অস্পষ্ট শিরোনাম বাছাই করেছেন, যাতে করে আমার মত মুগুর তাকে খেতে না হয়।

এলড্রিজ আর আমি নিজেদেরকে প্রবোধ দিলাম এই বলে যে, আমরা সাথে করে আফ্রিকা থেকে যে প্রদর্শনী নিয়ে এসেছি সেগুলো সোসাইটির সিন্দুকের মাঝে নিরাপদেই আছে, তারপর লন্ডনের রাশ আওয়ারের ট্র্যাফিক পেরিয়ে ডরচেস্টারে ফিরলাম এলড্রিজের ওই জঘন্য লাল রঙা মিনি গাড়িটায়। ঝাঁকির চোটে হাড়গোড় খুলে যাবে বলে মনে হলো। হাইড পার্ক কর্নারের চারপাশে চার চারবার চক্কর খেতে হলো, ধুমিয়ে গালাগাল করতে লাগলেন এলড্রিজ; ওনার টাক মাথাটা বাতিঘরের আলোর মত চকচক করতে লাগল আর আমি দরজার হাতল ধরে জান হাতে নিয়ে ঝুলে রইলাম, যে কোনো মুহূর্তে নেমে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত; তবে এলড্রিজ তার আগেই ট্র্যাফিক ভেদ করে পার্ক লেন-এ ঢুকে পড়তে পারলেন।

আমি ওনাকে একটা ককটেল বার-এ নিয়ে গেলাম, তখনও বুকের ধুকধুকানি কমেনি কারও। বারে দুটো ডাবল জিলবি খাইয়ে রেখে চলে এলাম ওনাকে। সেদিন সন্ধ্যায় আরও কাজ ছিল আমার, এদিকে ছয়টা বেজে গিয়েছে এর মধ্যেই।

স্যালি লিফট থেকে নামতেই আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। মনে মনে মাফ চাইলাম ওর হেয়ার ড্রেসারের কাছে। সে ওর চুলগুলোকে এমনভাবে বেঁধেছে যে, দেখে মনে হচ্ছে খোলা চুল ছড়িয়ে আছে মেঘের মত। ওর চেহারাতেও যেন কোনো জাদু খেলিয়েছে। বিশাল চোখজোড়া এবং নরম গোলাপি মুখটা খেয়াল হচ্ছিল শুধু। আপাদমস্তক ছড়ানো, পাতলা সবুজ কিছু একটা দিয়ে তৈরি একটা পোশাক পরেছে ও যেটা ওর সবুজ চোখের দ্যুতি বাড়িয়ে দিয়েছ আরও।

"বেন," দ্রুত এগিয়ে এল ও আমার দিকে। "আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালো হলো। আপনার দরজার নিচে দিয়ে একটা চিরকুট রেখে এসেছিলাম আমি। আজকের সন্ধ্যার ব্যাপারে। আমি আসলে আজকে যেতে পারবো না বেন, আমি স্যরি।"

"সমস্যা নেই, স্যাল। যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই," বললাম আমি, তারপর জোর করে হাসি দিয়ে নিজের হতাশা লুকানোর চেষ্টা করলাম কারণ আমার সব পরিকল্পনা ভেজা পেস্ট্রির মতই ধ্বসে পড়েছে।

"আমার আসলে কয়েকজনের সাথে দেখা করতে হবে। ওরা সবাই পুরনো বন্ধু, বেন। সেই ব্রাইটন থেকে এসেছে।"

আমি অগত্যা লোরেনের স্যুইটের দিকে গিয়ে হিলারি আর ওর বাচ্চাদের সাথে গল্প গুজব করে লোরেনের ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলাম। সাড়ে সাতটার দিকে ফোন করল ও, হিলারি কথা শেষ করে আমাকে ধরিয়ে দিল টেলিফোন।

"একসাথে ডিনার করতে পারলে ভালো লাগতো বেন, কিন্তু আমি যে কতক্ষণ এই মরার প্যাঁচে আটকে থাকবো তা কে জানে! গর্দভের দল এখানে

চুক্তির কর দেওয়ার দফায় বিশাল এক ঝামেলা পাকিয়ে রেখেছে। আমরা চেষ্টা করছি আবার নতুন করে চুক্তিনামাটা লিখতে। তুমি একটু কষ্ট করে হিলারিকে ডিনারে নিয়ে যাও না?"

কিন্তু হিলারি বলল ওর খুব ক্লান্ত লাগছে, তাই রাতে আগে আগেই শুয়ে পড়বে। আইসো-তে একা একাই রাতের খাবার খেলাম আমি, কলিজা আর পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করা চমৎকার একটা খাবার। এরপরে সামনের গলি পেরিয়ে রেমন্ডসে গেলাম, মাত্র পাঁচ পাউন্ড খরচ করে দেখে এলাম লন্ডনের সেরা সুন্দরিদের কাপড় খোলার দৃশ্য। ব্যাপারটা ছিল একটা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা। এসব আমাকে আরও বেশি নিঃসঙ্গ আর হতাশ করে দিল। তারপর, যদিও আমি লুচ্চা না, কিন্তু ওয়ার্ডোর স্ট্রিট-এর অন্ধকার দরজাগুলো দিয়ে যখন লাস্যময়ী যুবতীর দল আমাকে হাতের ইশারায় ডাক দিল...তখন কামনায় অধীর হয়ে আমি তাতে সাড়া দিয়েই ফেলেছিলাম প্রায়।

মাঝরাতের কিছু আগে ফিরে আমি স্যালির ঘরে ফোন করলাম। ঘুমানোর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, এক ঘণ্টা পরে আবার দিলাম। কেউ ধরলো না কোনোবারই, টেলিফোনটা করুন সুরে বেজেই যেতে লাগল, যেন কোনো পতঙ্গ তার সঙ্গীকে মিলনের জন্য ডেকেও ব্যর্থ হচ্ছে। যখন ঘুম এল তখন ভোর হয় হয়।

লোরেন ডেকে তুললো আমাকে, একদম তরতাজা আর উৎফুল্ল কণ্ঠে, ফোনের ভেতর হাঁক শোনা গেল ওর, "অবশেষে সেই দিন উপস্থিত, বেন। এসে নাস্তা করো আমাদের সাথে। আমি অর্ডার দিচ্ছি, তোমার জন্য কী বলবো?"

"কফি," কোনোমতে বললাম আমি। ওর স্যুইটে পৌঁছে দেখি স্টেক আর বেকন, কিডনি আর ডিমের বিশাল এক প্লাটার অর্ডার করে রেখেছে, সাথে আছে ধোঁয়া ওঠা স্যামন মাছ, খাওয়ার শুরুতে আর শেষে পুডিং, কমলার আচার, সব শেষে কফি। লোরেনের জন্য অবশ্য এটা বেশ সাধারণ নাস্তা-ই।

"অনেক শক্তিক্ষয় হবে আজ, পার্টনার। বুকে সাহস বেঁধে খাওয়া শুরু করে দাও দেখি।"

আমার উদ্দীপনার পালে এরকম একটা শক্ত হাওয়া পাওয়ায়, পুরো সকাল জুড়েই আমি ভাসতে লাগলাম প্রত্যাশার বিশাল ঢেউয়ের মাথায় চড়ে, যখন দুপুরে আমরা আমাদের অতিথিদের মোকাবেলা করতে গেলাম তখন নিজেকে একটা সিংহ বলে মনে হচ্ছিল...সিংহ মানে একেবারে মানুষখেকো সিংহ। আমার নিখুঁতভাবে কামানো গালে দুহাত ভরে ডিয়োর-এর আফটারশেভ লাগালাম, কালো কাশ্মীর স্যুটটা পরলাম সাথে সাদা শার্ট আর মেরুন টাই, হিলারি আমার স্যুটের পকেটে একটা গোলাপি ফিতে গুঁজে দিল। আমার গা থেকে গোলাপ বাগানের সুঘ্রাণ ভেসে আসতে লাগল;প্রতি

পদক্ষেপে আগ্রহ প্রবল হচ্ছে, সেই সঙ্গে পেটের ভেতরে মনে হলো শিকারির চরম উত্তেজনা টের পাচ্ছি।

লোরেন আর আমি একসাথে প্রাইভেট লাউঞ্জে এসে ঢুকলাম, সাথে সাথে কথাবার্তার যে গুঞ্জন চলছিল সেটা স্তিমিত হয়ে এল। আমি জানি যে কোথাও আমার উপস্থিতি কখনও সবাইকে চুপ হয়ে যাওয়ার মত প্রভাব রাখে না, তবে লোরেনেরটা রাখে। শুধু একটা কণ্ঠ আগের তেজেই বাজতে লাগল; চমৎকারভাবে ব্রিটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্চারণভঙ্গি নকল করে যাচ্ছে কণ্ঠটা–পুরো লাউঞ্জ গমগম করছে। উইলিয়াম স্নেল তার মোসাহেবের দল পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের সবার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার মাথা, স্বাভাবিক মানুষের চাইতে লম্বা তিনি, দেখে মনে হচ্ছে খুব বাজে ভাবে তৈরি নিজের একটা ভাস্কর্য বুঝি। দুই পা ছড়িয়ে আছে দুই দিকে, প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা সামলাতে গিয়ে পেছন দিকে এমনভাবে হেলে আছেন যে, প্রসবের সময় সমাগত কোনো গর্ভবতী মহিলা বলে মনে হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, তিনি সম্ভবত জামার নিচে একটা আধা ভর্তি মদের পিপে নিয়ে এসেছে! মুক্তার মত ধূসর স্যুটের যে কাপড়টা তার এই দৈত্যাকার অবয়বকে ঢাকতে প্রয়োজন হয়েছে, সেটা একটা থিয়েটারের পর্দার সমান। মুখটা ঝুলে আছে বুকের উপর, কয়েক স্তরের থুতনি দেখে মনে হয় যেন পুকুরে ঢিল পড়ার ফলে সৃষ্ট লহরী। পুরো চেহারাটাই কেমন সাদাটে আর তুলতুলে দেখতে–যেন একটা প্লাস্টিকের চামড়ার ভেতরে নষ্ট দুধ ভরে দেওয়া হয়েছে। এই সাদার মাঝে তার মুখটা দেখাচ্ছে একটা গাঢ় বেগুনি ক্ষতের মত–থলথলে, সবসময়ই হাঁ হয়ে থাকছে; এমনকী যখন কথা বলছেন না তখনও। মাথার চুল দেখাচ্ছে ঘন কোঁকড়া বুনো ঝোপের মত, সেখান থেকে খুশকির সাদা কোমল ধারা এসে পড়েছে তার কাঁধ আর ল্যাপেলে, পুরো মুখায়বেই নানান জিনিস ঝোলানো–একটা রিডিং গ্লাস ঝুলছে গলায়, দেখে মনে হচ্ছে কোনো যুদ্ধের সেনাপতির বাইনোকুলার বোধহয়, বুক পকেট থেকে বেরিয়ে আছে একটা স্বর্ণের তৈরি সিগারেট কাটার, ল্যাপেল থেকে বেরিয়ে আছে কালো ফিতেয় বাঁধা একটা এক চোখের চশমা, একটা ঘড়ির চেইন আর একটা চাবির রিং।

আমি কোনাকুণিভাবে এগোলাম তার দিকে, থেমে থেমে পরিচিতজনদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম, সহকর্মীদের সাথে খোশগল্প করলাম, কিন্তু পায়ে পায়ে এগোতে লাগলাম তার দিকেই। কেউ একজন আমার হাতে একটা গ্লাস গুঁজে দিতেই আমি ফিরে তাকালাম সেদিকে।

"স্কচ সাহস জোগাবে," হেসে বলল স্যালি।

"আমার এসব লাগে না, সোনা।"

"গিয়ে কথা বলেন ওর সাথে," পরামর্শ দিল ও।

"আমি ভাবছিলাম সেই আনন্দটা সবার শেষেই উপভোগ করবো।"

আমরা সোজা তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে। প্রত্নতত্ত্বের আপনি মোড়ল বাজনাদার, যার লেখা আধা ডজন বই ৫০০,০০০ কপির বেশি বিক্রি হয়েছে; তবে এগুলো এমন বই যেগুলো জনপ্রিয় মতামতগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে লেখা হয়েছে এবং জনপ্রিয়ও হয়েছে প্রত্যাশা মতই। বইগুলো মারাত্মকভাবে কুম্ভীলকতার দোষে দুষ্ট, প্রচণ্ডভাবে অন্যদের কুৎসা রটনা করেছেন সেগুলোতে; অর্থহীন কথাবার্তা দিয়ে ভরে পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করা হয়েছে বইগুলোতে, তথ্য-উপাত্তকে ইচ্ছেমতো চেপে রাখা হয়েছে বা বাদ দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোথাও বা নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বদলেও ফেলা হয়েছে।

আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ কেউ না, কিন্তু যখন এই ধুমসো জল্লাদটাকে দেখি, এই মর্ষকামী, এই-যাই হোক, তার দিকে তাকালেই মনে হয় আমার চোখের পেছনে রক্তের মাঝে বুদবুদ তৈরি হচ্ছে আর ফাটছে। আমি সোজা এগিয়ে গেলাম তার দিকে।

তিনি আমাকে আসতে দেখেও না দেখার ভান করে রইলেন। সারা ঘরের দৃষ্টি এখন আমাদের দিকে, সম্ভবত এখানে আসার আমন্ত্রণ পাওয়ার দিনটা থেকেই সবাই এই ঘটনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ব্যাটাকে ঘিরে রাখা লোকগুলো সরে গেল একদিকে, আমাকে জায়গা করে দিল যাতে তিনি আমার উপস্থিতি টের পান।

"কোনো সন্দেহ নেই যে-" উইলফ্রেড বলেই চলছেন, ওর দৃষ্টি আমার মাথার কয়েক ফুট উপরে। সাধারণত প্রতিটা উক্তি সে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত করে একটা একটা করে বলেন।

"যেমনটা আমি সবসময়ই বলি-" ওর কণ্ঠ ঘরের শেষ কোনা পর্যন্তও পৌঁছে যাচ্ছে, আমি ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার একটা বহুল চর্চিত হাসি আছে যেটা আমি এরকম পরিস্থিতিতে ব্যবহার করি। হাসিটা লাজুক, নিজেকে ছোট করে দেখানো।

"এব্যাপারে সবাই একমত-" উইলফ্রেড যখন কিছু সম্পর্কে একথা বলেন, সাধারণত তার মানে: যা নিয়ে আলাপ হচ্ছে সেটা আসলে চরম একটা বিতর্কিত বিষয়।

"সত্যি কথা বলতে-" আর উনি ক্রমাগত ডাহা সব মিথ্যা বলেই চললেন।

অবশেষে উনি চোখটা নামালেন, কথার মাঝেই থেমে গিয়ে এক চোখের চশমাটা চোখে লাগিয়ে, প্রচণ্ড অবাক আর খুশি হয়ে আবিষ্কার করলেন যে ওনার পুরনো বন্ধু ও সহকর্মী ডক্টর বেঞ্জামিন কাজিন দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

"বেঞ্জামিন, প্রাণপ্রিয় ছোট্ট বন্ধু আমার," চিৎকার করে উঠলেন উনি, ওই বিশেষণটা ষাঁড়ের কুঁজে নিক্ষিপ্ত বাণ-এর মতই এসে বিঁধলো আমার গায়ে। "আপনাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে!"

এরপর উইলফ্রেড স্নেল একটা হঠকারী কাজ করে বসলেন। ওনার বিশাল তুলতুলে, লোম ভরা, রক্তহীন থাবাটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। এক মুহূর্ত তো আমি আমার সৌভাগ্যকে বিশ্বাসই করতে পারলাম না; সাথে সাথেই উইলফ্রেডের মনে পড়ল ছয় বছর আগে সর্বশেষ যখন আমরা করমর্দন করেছিলাম তখন কী ঘটেছিল...সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালালেন। ওনার প্রতিক্রিয়ার চাইতে আমার গতি বহু বেশি, ঝট করে ধরে ফেললাম হাতটা।

"উইলফ্রেড," খুশিতে কু কু করে উঠলাম আমি, "আমার প্রিয়, প্রিয় মানুষ।" হাতটা ধরে মনে হলো গরম জেলিতে ভরা একটা দস্তানা বোধহয়। বিশেষ করে যখন আমার আঙুলগুলো ওনার হাতের এক কী দুই ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে হাড় পর্যন্ত অনুভব করে নিল।

"আপনি আসতে পারায় আমরা যারপরনাই আনন্দিত," বললাম ওনাকে আমি, জবাবে মৃদু কাতর ধ্বনি করে উঠলেন উনি। ঝুলে থাকা বেগুনি ঠোঁটজোড়া থেকে কয়েক ফোটা থুথুও ছিটকে পড়ল।

"আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো?" জিজ্ঞেস করলাম আমি, এখনও লাজুকভাবেই হাসছি। চরম অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছেন এখন উইলফ্রেড, একটু পরপর পায়ের ভর বদল করছেন। ওনার নরম শুভ্র মাংসের ভেতর আমার আঙুলগুলো একদম গায়েব হয়ে গেল বলা যায়, আমি ওনার প্রতিটা অস্থিসন্ধি পরিষ্কারভাবে অনুভব করতে পারছি এখন। ব্যাপারটা অনেকটা ট্রাউট মাছ ধরার বড়শিতে জেলিফিশ আটকানোর মত।

"সিম্পোজিয়াম শেষ হওয়ার আগেই আমার সাথে একান্তে একটু আলাপ করতে হবে কিন্তু," বললাম আমি, এবার আর উইলফ্রেডের ফুসফুস বাতাস ধরে রাখতে পারলো না। উনি খুবই মৃদু হিসহিস শব্দ করতে শুরু করলেন, দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ফাটা বেলুনের মতই চুপসে যাচ্ছেন। হঠাৎ করেই, নিজের এই নিষ্ঠুরতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেলাম, প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে নিচ্ছি আমি। ছেড়ে দিলাম ওনার হাত, আমি নিশ্চিত যে, এই নিপীড়িত হাতে আবার রক্ত চলাচল শুরু হওয়াটা, আমার ওটার উপর চালানো অত্যাচারের চাইতে ব্যথার। যত্নের সাথে হাতটাকে বুকের সাথে চেপে ধরে রাখলেন উনি, বড় বড় কামুক চোখজোড়ায় পানি টলমল করে উঠলো আর আহ্লাদী বাচ্চার মত কাঁপতে লাগল ঠোঁটজোড়া।

"চলুন," নরম সুরে ডাকলাম আমি। "আরেকটা ড্রিঙ্ক নিয়ে দেই আপনাকে।" তারপর হাতি আর তার মাহুতের মতই ওনাকে এগিয়ে নিয়ে

গেলাম সামনের দিকে, উনি কোনো বাঁধা দিলেন না, বা না করলেন না। তবে উইলফ্রেড স্নেল আর যাই হোন, খুবই প্রাণবন্ত একজন মানুষ, দ্রুতই আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলেন। পুরো মধ্যাহ্নভোজের সময়টাতে তার কথা-বার্তার টুকরো টাকরা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল আমাদের টেবিলে। আবার খোশগল্প শুরু করে উনি সবাইকে 'মোটেও বাড়িয়ে বলছিলেন না' আর 'শুধু ওনাদেরকেই একটা গোপন ব্যাপার সম্পর্কে জানাচ্ছিলেন'। যতটুকু শুনলাম তাতে বুঝলাম যে উনি আগের মতই আফ্রিকার সকল ধ্বংসাবশেষের উৎপত্তির যে মধ্যযুগে বান্টু গোত্রের মাধ্যমেই ঘটেছে সে ব্যাপারে দৃঢ়-প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন। সেই সঙ্গে হালকা চালে, দারুণ কৌশলে আমার লেখার কথাই পাড়ছিলেন ঘুরে ফিরে। এক পর্যায়ে থাকতে না পেরে সেদিকে তাকিয়ে দেখি ওনার প্লেটের পাশেই এক কপি *ওফির* খোলা আর ওনার টেবিলের বাকি সঙ্গীদের মজা দেওয়ার জন্য সেখান থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

তবে, তখন আমার সামনে আরেকটা নতুন সংকট উপস্থিত হলো যেটা সামাল দিতে আমার সমস্ত দক্ষতাতেও কুলাচ্ছিল না। স্যালি ছিল আমার লাঞ্চ পার্টনার, আমরা বসেছিলাম স্টারভেসান্টদের ঠিক উল্টো পাশে। বসার পাঁচ সেকেন্ডের মাথায় স্যালি খেয়াল করল হিলারির হাতের নতুন হীরার আঙটিটা। এরপর তো আর সেটা থেকে নজর ফেরাতেই পারে না, সারা ঘর জুড়ে রূপালি আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল আঙটিটা, তীরের মত দ্যুতি বের হচ্ছে। খাওয়ার অর্ধেক সময় জুড়ে স্যালি চুপ করেই রইলো, কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর পরই দেখা গেল ওর চোখ আপনাআপনিই চলে যাচ্ছে ওই জ্বলন্ত রত্নটার দিকে। আমরা বাকি সবাই হড়বড় করে কথা বলেই যাচ্ছিলাম, হাসি ঠাট্টা, হট্টোগোল, উত্তেজিত বাতচিত চলছিল। লোরেনকে দেখে মনে হলো হিলারির দিকে আলাদাভাবে খেয়াল রাখছে, কিন্তু হঠাৎ করেই নীরবতা নামলো টেবিলে।

স্যালি সামনে ঝুঁকে ওর সবচেয়ে মধুর কণ্ঠে হিলারিকে বলল, "কী সুন্দর আঙটি। আপনার ভাগ্য কত ভালো যে আপনি ইমিটিশনের গয়না পরতে পারেন! আমার হাড়গুলো বেশি ছোট। সে জন্যই মনে হয় আমাকে মানায় না।" তারপরেই আবার সোজা হয়ে আমার সাথে উৎফুল্ল হয়ে গল্প করা শুরু করল। জায়গা মত একটা খোঁচা দিয়েই সবার পুরো আমেজটাই নষ্ট করে দিল ও। লোরেনের দিকে তাকিয়ে দেখি ভ্রু কুঁচকে আছে, রাগে লাল হয়ে গিয়েছে চেহারা। হিলারি ঠোঁট চেপে বসে রইলো আর ওর চোখের দিকে তাকাতেই বুঝলাম যে মাথার ভেতর হাজারটা জবাব কিলবিল করছে কিন্তু সামলে রাখছে নিজেকে। আমি কৌতুক করে কিছু একটা বলে নীরবতাটা কাটাতে চাইলাম, কিন্তু আমার ভাঁড়ামোতেও কারো মেজাজ ঠিক হলো না। শেষে লোরেন যখন ওর ঘড়ি দেখে, যে বিওয়াইএম সকল আয়োজনের

দায়িত্বে ছিল তার দিকে তাকিয়ে সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সাথে সাথে ওই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর বিচিত্র ব্যক্তিত্বগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল যে চত্বরে গাড়িগুলো রাখা সেখানে। লবি দিয়ে যাওয়ার সময়, উইলফ্রেড স্নেল ওনার ভক্তকূল পরিবেষ্টিত অবস্থায় দাঁত বের করে হসতে হাসতে হুড়মুড় করে ঠেলা ধাক্কা দিতে দিতে এগিয়ে এলেন আমার পাশে।

"আজ খাওয়ার সময় আবার আপনার বইটায় চোখ বুলালাম একবার। বইটা যে কতটা মজার ছিল তা ভুলেই গিয়েছিলাম!"

"থ্যাংক ইউ, উইলফ্রেড," কৃতজ্ঞ চিত্তে জবাব দিলাম আমি। "আপনার কাছে থেকে এমন প্রশংসা পেয়ে ভালো লাগছে।"

"আপনি কিন্তু আমার বইটায় সই করে দেবেন।"

"অবশ্যই, অবশ্যই।"

"বিকেলে আপনার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছি, প্রিয় ছোট্ট বন্ধু।" আর আবারও আমার মেজাজ শান্ত রেখে গলার স্বর চড়তে না দেওয়ার জন্য নিজের সাথে যুঝতে হলো আমাকে।

"আশা করছি আপনার ভালো লাগবে অনেক।"

"লাগবে যে সে ব্যাপারে নিশ্চিত আমি, বেঞ্জামিন।" ইঙ্গিতময় ভঙ্গিতে শব্দ করে হাসলেন উনি, তারপর যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই হৈ হৈ করতে করতে এগিয়ে গেলেন। লিমোজিনে ওঠার সময় শুনলাম উনি ডি ভায়োসকে বলছেন, "ভূমধ্যসাগরীয় প্রভাব! মাই গড, ওদিকে যদি এগোবেনই তাহলে একেবারে এস্কিমো পর্যন্ত চলে গেলেই পারতেন!"

আমরা পার্কের ভেতর দিয়ে এমনভাবে এগোতে লাগলাম যেন কোনো নিরানন্দ শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শোক করতে যাচ্ছি, কালো কালো লিমোজিনের সারি, তারপর দ্বিতীয় গেটটা দিয়ে কেনসিংটন গোর-এ বেরিয়ে এলাম।

সোসাইটি ভবনের দরজায় এসে নামলাম আবার আমরা, তারপর এগিয়ে গেলাম লেকচার হলের দিকে। বক্তা আর কাউন্সিলের সদস্যরা বসলেন মঞ্চে, হলের বাকি অংশও ভরে গেল কানায় কানায়। উইলফ্রেড বসেছেন নিজের জায়গায়, সামনের সারির মাঝে, যেখান থেকে আমি তার প্রতিটা মুখভঙ্গি দেখতে পাবো। পেছনেই বসেছে ওনার সাঙ্গপাঙ্গরা।

হিজ গ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে এল কমিটির লোকজন, সিগার আর দামী সুগন্ধির ঘ্রাণ আসছে শরীর থেকে। মনে হলো একটা কামানকে ধরে দর্শকদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো, তারপর খুলে দেওয়া হলো মুখের লাগাম। পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ মিনিট উনি অর্কিড আর পাহাড় বাওয়ার মৌসুম নিয়ে আলাপ করলেন। সোসাইটির সভাপতি বুদ্ধি করে ওনার কোটের কোনা ধরে টানাটানি আরম্ভ করলেন, কিন্তু আরও বিশ মিনিটের আগে ক্ষ্যামা দিলেন না উনি। এরপর এল আমার পালা।

"ছয় বছর আগে, এই সোসাইটির সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করার সম্মান পেয়েছিলাম আমি। আমার বিষয় ছিল, 'খ্রিস্টের জন্মের আগে মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরীয় প্রভাব'। আমি আবারও সেই একই বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে, তবে এবার হাজির হয়েছি আরও নতুন নতুন প্রমাণ সাথে নিয়ে, যেগুলো এই মধ্যবর্তী সময়ে আলোর মুখ দেখেছে।"

কয়েক মিনিট পরপর দেখা যেতে লাগল উইলফ্রেড নিজের সিট থেকে এদিক-সেদিক বেঁকে, পেছনের সারিতে বসা রজার্স নাহয় ডি ভায়োসকে কিছু একটা মন্তব্য করছেন। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফিসফিস করে কথা বলেই যেতে লাগলেন উনি। আমি সেটাকে উপেক্ষা করে আমার বক্তব্যের ভূমিকা চালিয়ে যেতে লাগলাম। এটা মূলত ছিল পূর্বে প্রাপ্ত সকল তথ্যপ্রমাণ আর সেগুলো বিচার করে নেওয়া নানান অনুসিদ্ধান্তের উপর পুনরায় আলোচনা। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই এই অংশটা বেশ নীরস আর অপ্রতুল করে উপস্থাপন করলাম, যাতে করে উইলফ্রেড আর তার খয়ের খাঁর দল ভাবে যে আমার হাতে আসলে মতামতটা প্রমাণের মত নতুন তেমন কিছুই নেই।

"তারপর গত বছরের মার্চ মাসের দিকে, মিস্টার লোরেন স্টারভেসান্ট আমাকে একটা ছবি দেখান।" এখান থেকেই আমি পাল্টে ফেললাম আমার বাচনভঙ্গি, কথার ঢঙ্গে সামান্য বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হতে দিলাম। সামনের চেহারাগুলোয় আগ্রহের শিখা জ্বলে উঠতে দেখলাম যেগুলো কৌতূহলে চকচক করতে লাগল। আমি রয়ে-সয়ে তা দিতে থাকলাম সেটায়। হঠাৎ করে আমি সবাইকে একটা গোয়েন্দা গল্প বলা শুরু করলাম। এবার উইলফ্রেডের পেছনে ফেরার হার কমতে লাগল। তার ভক্তকূলের মুখের হাসি মুছে গিয়েছে আগেই। পুরো দর্শক এখন আমার হাতের মুঠোয়, ওনারা যেন আমার আর স্যালির সাথে চাঁদের আলোয় সেই দীর্ঘ প্রাচীন শহরটার ভূতুড়ে প্রান্ত ধরে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। কাটা পাথরের চাঁইগুলো দেখাতেই আমাদের মতই এনারাও সবাই দম বন্ধ করে ফেললেন উত্তেজনায়।

ঠিক যখন আমি চাচ্ছিলাম, তখনই সব লাইট বন্ধ করে অন্ধকার করে ফেলা হলো ঘরটা আর আমার পেছনের পর্দায় প্রথম ছবিটা ভেসে উঠলো।

ছবিটা ছিল হোয়াইট কিং-এর–গর্বিত, নির্লিপ্ত, প্রদীপ্ত পৌরুষে জাজ্বল্যমান হয়ে স্বর্ণ নির্মিত সাজপোশাকে রাজকীয়ভাবে দণ্ডায়মান। অন্ধকারের ভেতরেই একের পর এক ছবি ফুটতে লাগল পর্দায়। দর্শকরা সবাই মোহাবিষ্ট হয়ে চুপচাপ দেখতে লাগল শুধু, পর্দার ছবিগুলো থেকে পড়া আলোর প্রতিফলনে তাদের মুগ্ধ চেহারাগুলো দেখা যেতে লাগল। শুধুমাত্র সামনের সারিতে বসা সাংবাদিকদের পাগলের মত হাত নেড়ে সব লিখে নেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কোনো নড়া-চড়া নেই, আমার বলা প্রতিটা ছবির বর্ণনা মন্ত্রের মত ওদের হাতকে নেড়েই যাচ্ছিল যেন।

কাহিনি বল'তে বলতে চলে এলাম যেখানে আমরা সমতল আর গুহাটা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তখনও হোয়াইট কিং-এর প্রতিকৃতির পেছনের দেওয়ালে আবদ্ধ সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার করতে পারিনি।

আমার সংকেতে আবার জ্বলে উঠলো বাতি, দর্শকরা ঝটকা মেরে ফিরে এলেন বাস্তবে, শুধু হিজ গ্রেস বাদে যিনি মদের নেশায় চুর হয়ে মরা মানুষের মত ঘুমাচ্ছেন। এই দুইশো মানুষের মাঝে উনিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে আমি আমার কাহিনি শুনিয়ে মাত করতে পারিনি। এমনকি উইলফ্রেডকেও দেখে মনে হলো অস্থির আর বিভ্রান্ত, ঠিক যেন একজন বেধড়ক মার খাওয়া মুষ্টিযোদ্ধা যে কিনা গণনা শেষ হওয়ার আগেই আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারলাম না, লোকটা শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়বেনই না। উনি আবার উল্টো ঘুরে ডি ভায়োসের দিকে ফিরে ইচ্ছাকৃতভাবে জোর দিয়ে ফিসফিসানির ভঙ্গিতে বললেন:

"তেরশো খ্রিস্টাব্দের বান্টুদের কোনো পাথরের কাজ, আমি নিশ্চিত। তবে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ওই সময়ের দেশান্তরের ব্যাপারে আমার যে ধারণা সেটাকেই সমর্থন দিচ্ছে।"

আমি চুপচাপ লেকচার টেবিলটার উপর হাত মুঠো করে ধরে রইলাম, মাথা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি খুব ভালো একজন সিনেমার অভিনেতা হতে পারতাম। নাটকীয় ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা তুলে সোজা তাকিয়ে রইলাম উইলফ্রেডের দিকে, আমার মুখভঙ্গি একদমই হতাশার। তা দেখে আরও প্রবল উৎসাহ পেয়ে গেলেন উনি।

"এই ছবিটার আসলে কোনো অর্থই নেই অবশ্যই। সত্যি কথা বলতে এটা সম্ভবত আসলেই একটা বান্টু সংস্কৃতিরই নিদর্শন, ঠিক ব্রান্ডবার্গ-এর হোয়াইট লেডির মত।"

আমি তখনও কিছু না বলে চুপ রইলাম, ওনাকে সুতো ছড়াতে দিলাম, ঠিক যেন উনি বড়শিতে গাঁথা একটা মাছ। আমি চাচ্ছি টোপটা উনি একদম ওনার গলার গভীর পর্যন্ত গিলে ফেলুন, তারপরেই আমি টেনে তোলা শুরু করবো।

"নতুন কোনো তথ্য প্রমাণ এখানে নেই বললেই চলে।"

একটা আত্মতুষ্টির হাসি হেসে উনি নিজের চারপাশে তাকালেন, ওনার ভক্তকূল চাবি দেওয়া পাপেটের মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

আমি সরাসরি ওনার নাম ধরে বলা শুরু করলাম এবার।

"প্রফেসর উইলফ্রেড স্নেল মাত্রই যেমন বললেন, এতক্ষণ যা দেখলাম তা যতই মুগ্ধকারী হোক না কেন, এখানে নতুন কোনো তথ্য প্রমাণ উপস্থাপিত

হয়নি।” শুনে এরা সবাই আরও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। “সে কারণেই আমি আরও গভীরে খুঁজে দেখবো বলে প্রতিজ্ঞা করলাম।”

তারপর ফিরে গেলাম বদ্ধ সুড়ঙ্গটা আবিষ্কারের কাহিনিতে, হোয়াইট কিংকে অক্ষত রেখেই পেছনের পাথর কেটে রাস্তা করার সিদ্ধান্তের কথা জানালাম সবাইকে। তারপর কথা থামিয়ে উইলফ্রেড স্নেলের দিকে তাকালাম আবার। আচমকাই ওনার জন্য খুব দুঃখ হতে লাগল; উনি ছিলেন আমার হৃদয়হীন শত্রু, আমার পেশাগত জীবনের একজন প্রকাশ্য দগদগে ঘা, এখন ওনাকে লাগছিল একটা ভোঁটকা আর কিম্ভূতকিমাকার অবয়ব হিসেবে।

ঠিক ওই কবি হুইয়ের মত–যিনি ছিলেন সকল দেবতার কুঠারবাহক–আমি ফেঁড়ে ফেললাম ওনাকে। ওখানে পাওয়া লিপি, শকুনের ছাপঅলা কুঠার আর পাঁচটা স্বর্ণ নির্মিত বইয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত বলে ওনাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললাম।

আমি কথা বলতে বলতেই একজন পরিচারক একটা দুই চাকার ছোট ঠেলা গাড়ি ঠেলে নিয়ে এল, একটা সবুজ মখমল দিয়ে ঢাকা সেটা। সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সেদিকে, আমার ইশারায় কাপড়টা সরাতেই দেখা গেল সেই বিশাল ঝকঝকে যুদ্ধ-কুঠার আর লিপিগুলোর একটা।

হুইয়ের স্বর্ণের বইয়ের প্রথম লাইনগুলো পড়তেই দেখি উইলফ্রেড স্নেল নিজের বিশাল ভুঁড়িটা চেগিয়ে সিটে নেতিয়ে পড়লেন আর ওনার বেগুনি মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলতে লাগল।

“লোকেরা যেন এসব পড়ে তেমন উল্লাস করে, যেমন উল্লাস আমি করেছি, লোকজন যেন তার গান শুনে এমন কান্না কাঁদে, যেমনটা আমি কেঁদেছি; তার হাসি প্রতিধ্বনিত হোক অনাগত কাল জুড়ে আর তার জ্ঞান টিকে থাকুক চিরজীবন।”

শেষ করে আমি সবার দিকে তাকালাম। একেবারে বুকে খামচি দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে বলে মনে হলো, প্রত্যেকের। এমনকি লোরেন, হিলারি আর স্যালি, যারা কিনার এই সব আদ্যোপান্ত জানে তারাও নিজেদের সিটের সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, চোখ চক চক করছে আগ্রহে।

তখন বাজে সাড়ে সাতটা, অবাক হলাম বেশ। আমার নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে আরও এক ঘণ্টা আগেই কিন্তু আমার পাশেই বসা প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে থামার সংকেত পাইনি।

“আমাদের সময় শেষ আজকের মত, কিন্তু গল্প এখনও বাকি। আগামীকাল সকালে প্রফেসর এলড্রিজ হ্যামিল্টন এই লিপি আর সেগুলোতে কী লেখা আছে সেসব নিয়ে ওনার পেপারটা পড়বেন। আশা করছি আপনারা সবাই আসতে পারবেন সেটায়। ইয়োর গ্রেস, প্রেসিডেন্ট, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।”

তবুও নীরব হয়ে রইলো সবাই, ঝাড়া দশ সেকেন্ড কেউ এক চুল নড়লো না বা কথাও বলল না, এরপরেই আচমকা সবাই একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে মুহুর্মুহু করতালিতে ফেটে পড়ল। সেই ১৮৩০ সালে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই প্রথম কোনো পেপার উপস্থাপনা এমনভাবে হলো যেন কোনো নাটক মঞ্চায়িত হয়েছে! সবাই নিজের সিট ছেড়ে উঠে এসে আমার চারপাশে জড়ো হয়ে করমর্দন করতে লাগল, এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল যেগুলোর উত্তর আমি কোনো দিন দেব বলে আশা করিনি। ডায়াসের পেছনে আমার জায়গা থেকে দেখলাম উইলফ্রেড স্নেল নিজের সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পা টেনে টেনে এগিয়ে যাচ্ছেন দরজার দিকে। তবে উনি একা-ই যাচ্ছেন, ওনার চাটুকারের দল ওনাকে পরিত্যাগ করে আমার চারপাশে জড়ো হয়েছে। আমার ইচ্ছে করল ওনাকে ডাক দিতে, ডেকে বলতে যে ওনার জন্য খারাপ লাগছে আমার, যে পারলে আমি ওনাকে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু বলার আসলে কিছু ছিল না। এর আগেই উনি কয়েকশোবার এসব বলে ফেলেছেন।

পরদিন সকালে প্রতিটা জাতীয় পত্রিকায় চলে এল সংবাদটা, এমনকি *দ্য টাইমস-এ* পর্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হলো পুরো ব্যাপারটা। ‘কার্থেজিনিয়ান গুপ্তধনের আবিষ্কার,’ লিখেছে ওখানে, ‘তুতেনখামেনের সমাধি আবিষ্কারের পর প্রত্নতত্ত্বের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার এটাই।’

লোরেন সবগুলো পত্রিকা কিনে আনালো, আমরা সংবাদপত্রের সমুদ্রে বসে বসে আগের দিনের মত রাক্ষসের নাস্তা করতে লাগলাম। আমার অর্জনে লোরেনের এই গর্ব দেখে আসলেই আবেগপীড়িত হয়ে গেলাম আমি। ও প্রতিটা প্রতিবেদন জোরে জোরে পড়ে, নিজের মত মন্তব্য করতে লাগল।

“পুরোই কাঁপিয়ে দিয়েছো, পার্টনার।”

“বেন, তুমিতো ওই নিস্কর্মাগুলোকে মেরেই ফেলেছো।”

“তুমি যেভাবে বলেছো সব, এমনকি আমার পর্যন্ত প্যান্ট ভিজে যাচ্ছিল। বাপরে! আমি নিজে ছিলাম আবিষ্কারের সময়।”

ও স্তূপের ভেতর থেকে বাম ঘরানার একটা ট্যাবলয়েড তুলে নিয়ে খুলল। সাথে সাথে মুখভঙ্গি বদলে গেল ওর। আচমকাই প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে গেল চোখ, এমন ফেনিয়ে ওঠা বিষের মত উন্মত্ত ক্রোধ দেখে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, “কী হয়েছে, লো?”

“নাও,” ছুঁড়ে দিল ও পত্রিকাটা আমার দিকে। “নিজেই পড়ে দেখো, আমি কাপড় বদলে আসি।” বলে বেডারুমে ঢুকে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।

তাকাতেই দেখতে পেলাম প্রতিবেদনটা। পুরো এক পাতা জুড়ে ছবি দিয়ে নিচে শিরোনাম লেখা, ‘স্বাধীনতার শক্তি’। ছবিতে বন্দুক হাতে, ট্যাংকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ লোক। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ

কুচকাওয়াজ করছে, সারির পর সারি। মাথায় ডিমের খোলের মত হেলমেট দেখে মনে হচ্ছে ঘৃণায় পরিপূর্ণ একেকটা ব্যাঙের ছাতা, ক্যামোফ্লেজ পোশাক পরা কাঁধে ঝুলছে আধুনিক অটোম্যাটিক অস্ত্র, বুট পরা পা উঠছে আর নামছে। তবে এগুলো দেখে আমার চোখ আটকায়নি। পাতার ঠিক মাঝে একটা লম্বা লোকের ছবি, কাঁধ ফাসিকাষ্ঠের মত চওড়া। চকচকে কামানের গোলার মত মাথাটা আফ্রিকার প্রখর রোদে চকচক করছে। গোমড়া মুখে সে দুজন হাস্যজ্জ্বোল চাইনিজের মাঝে হাঁটছে, পরনে ওই ঢলঢলে কোঁচকানো ইউনিফর্ম পরা যেগুলো দেখতে রাতে পরার পোশাকের মত লাগে।

মোটা হরফে শিরোনাম লেখা: 'দ্য ব্ল্যাক ক্রুসেডার। মেজর জেনারেল টিমোথি মাগেবা, পিপলস লিবারেশন আর্মির নবনিযুক্ত কমান্ডার, সাথে তার দুজন সামরিক পরামর্শদাতা।'

ওই দগদগে ঘৃণায় ভরা চেহারাটার দিকে তাকাতেই মনে হলো এক অজানা আশঙ্কার ভেতরে ডুবে যাচ্ছি যেন। ওই চওড়া কাঁধ আর ভীতিকর অঙ্গভঙ্গিতে যে ক্ষমতা আর ভয়াবহ উদ্দেশ্য ফুটে বেরুচ্ছে তা আসলেই উদ্বেগজনক।

কোনো এক অব্যাখ্যেয় কারণে এই খবরটা আমার নিজের অর্জনকে খাটো করে দিল। এই মানুষটার চেহারার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, ২,০০০ বছর আগে কী ঘটেছিল সেটা কোনো গুরুত্বই বহন করে না। দেশের ভেতর চলমান এই কালো শক্তির অপব্যবহার আচ্ছন্ন করে দিল আমাকে।

আমার মনে হলো যে এই লোকটা আসলে নতুন কিছু না। আফ্রিকা এর মত অনেককেই জন্ম দিয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ অপহত্যা, যারা এই মহাদেশের সমতল ভূমি ভরে দিয়েছে মানুষের সাদা সাদা হাড় দিয়ে। শাকা, এমজিলিকাজি, মামাটি, মুটেসা আর ইতিহাসের বাঁকে হারিয়ে যাওয়া এরকম শত শত স্বৈরাচারী ছিল এই দেশে। টিমোথি মাগেবা শুধু এই অপযোদ্ধাদের লম্বা সারির সাম্প্রতিক সংযোজন, যারা সময়ের অলীক কিন্তু দুর্ভেদ্য পর্দার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে।

লোরেন বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে, সাথে বেরুলো হিলারি। ও এগিয়ে এসে আবার আমাকে চুমু খেয়ে অভিনন্দন জানালো। আমি পত্রিকাটা আমার হাত থেকে ফেলে দিলাম, তবে মন থেকে গেল না।

"দুঃখিত, আজকে এলড্রিজের বক্তৃতা শুনতে যেতে পারছি না, বেন। আমার মিটিং শেষ হয়নি এখনও। হিলের দিকে খেয়াল রেখো একটু। ভালো কোথাও দুপুরের খাবার খেয়ো, কেমন?" লোরেন বলতে লাগল আর আমরা তিনজন এগিয়ে গেলাম লিফটের দিকে।

যথারীতি ট্যুইড আর কনুইয়ের পট্টি নিয়ে উপস্থিত হলেন এলড্রিজ। তবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নিজের বিষয়টাকে বলৎকার করে দিলেন বলা যায়। পুরো

সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে উনি অস্ফুট স্বরে 'মাত্রা' আর 'টান' নিয়েই বলে গেলেন শুধু, মাঝে মাঝে ওনার ওই বিশেষ হাসিটা দিয়ে উঠতে লাগলেন, তাতে করে যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা উঠে পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে খালি হতে লাগল হল, ক্রমাগত হাই তুলতে তুলতে কাগজে এলোমেলো দাগ কাটতে থাকা সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম। নিশ্চিতভাবেই উনি আমার অর্জনকে ছাপিয়ে যেতে পারবেন না।

লাঞ্চের এক ঘণ্টা আগে স্যালি পেছনের সিট থেকে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল আমাকে। "আর পারছি না আমি। একটু শপিং-এ যাবো। পরে দেখা হবে–এস।"

পাশের দরজা দিয়ে চুপে চুপে ওকে কৃতজ্ঞচিত্তে বের হয়ে যেতে দেখে হাসলাম আমি। হিলারি আমার দিকে ফিরে চোখ টিপলো, আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম।

এলড্রিজ বলতে বলতে গলার স্বর আরও নিচু করে একটা সমাধানহীন উপসংহারে এসে শেষ করলেন, তারপর ক্রমহ্রাসমান দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রইলেন জ্বলজ্বলে চোখ করে।

"যাই হোক," বললেন উনি। "আমার মনে হয়, সবকিছুই চলে এসেছে কথায়।" আর সাথে সাথেই সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টলতে টলতে ছুটলো দরজার দিকে।

সোসাইটির লবিতে আমাকে আরও একবার ঘিরে ধরলো অত্যুৎসাহীর দল, তাই দরজার দিকে এগোনো হলো খুবই ধীরে ধীরে, লাঞ্চেরও দেরি হতে লাগল।

অবশেষে আমি আর এলড্রিজ, হিলারিকে দুই দিক থেকে ধরে নিয়ে ট্যাক্সিতে নিয়ে তুললাম। আমি কেবলমাত্র ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ট্রাট্টোরিয়া টেরাজ্জার ঠিকানাটা দিয়েছি ঠিক তখনই হিলারি কোলের উপর রাখা নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো।

"আমার আঙটি!" আর প্রথমবারের মত আমরা খেয়াল করলাম যে বিশাল রত্নটা ওর হাতে শোভা পাচ্ছে না। আমি হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলাম নগ্ন আঙুলটার দিকে, আমার স্বপ্নেরও অতীত একটা মূল্যবান জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। হীরাটার দাম ৩০,০০০ ডলারের কম হবে না।

"কখন পরেছিলে শেষ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। এক মুহূর্ত ভাবনার পরেই ওর চিন্তিত ভ্রূর জায়গায় স্বস্তির একটা ভাব দেখা গেল চেহারায়।

"ওহ, মনে পড়েছে। হোটেলে, নেইলপলিশ লাগাচ্ছিলাম। আমার চেয়ারের পাশের স্ফটিকের অ্যাশ ট্রে-টায় রেখেছিলাম তখন ওটা।"

"কোন রুমে? কোন চেয়ার?"

"লাউঞ্জেই, টিভি সেটের পাশেই ট্যাপেস্ট্রি চেয়ার।"

"এলড্রিজ, আপনি একটু মিসেস স্টারভেসান্টকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান, প্লিজ। আমি আরেকটা ক্যাব নিয়ে হোটেল থেকে ঢুঁ মেরে আসি, নইলে ঘর পরিষ্কার করতে এসে কারো চোখে পড়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে। সাথে চাবি আছে না, হিল?"

হিলারি ওর হাতব্যাগ হাতড়ে বের করে আনল চাবিটা।

"বেন, তুমি একটা সুইটহার্ট। আমি আসলে খুবই দুঃখিত।" বলতে বলতে আমাকে ধরিয়ে দিল চাবিটা।

"সুন্দরীদের বিপদের সময় সাহায্য করতে পারাটা আমার বিশেষ গুণ।" বলে আমি ফুটপাতে নেমে এলাম। গাড়িটা চলে যেতেই পরের পাঁচ মিনিট প্রবাহমান ট্যাক্সির স্রোতের দিকে এক ক্ষ্যাপা সেমাফরিস্ট[৬৭]-এর মত করতে লাগলাম। ওগুলোর উপরের ওই ছোট্ট বাতিগুলো জ্বলছে কিনা সেটা আমি কখনোই বুঝতে পারি না, তাই প্রায় সবগুলোকেই সংকেত দিয়ে গেলাম।

হিলারির চাবিটা দিয়ে অলিভার মেসেল স্যুইটে ঢুকে পড়লাম আমি, তারপর বেডরুম পেরিয়ে লম্বা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেলাম দ্রুত পায়ে। স্ফটিকের অ্যাশ ট্রে-টায় সিগারেটের পাশেই আঙটিটা দেখতে পেয়ে শব্দ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আমার। হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে আসা আলোর দিকে এগিয়ে গেলাম ওটার সৌন্দর্য আরও ভালোভাবে দেখতে পাওয়ার জন্য। জিনিসটার সৌন্দর্য এত বেশি চোখ ধাঁধানো যে আমার পেট মনে হলো ভেতরের দিকে সেঁধিয়ে গিয়েছে। ভেতরে কেমন একটা ঈর্ষা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে চাইলো, একটা সূক্ষ্ম বেদনা, যে আমি জীবনেও কোনোদিন এরকম বিশুদ্ধ মোহনীয় কোনো জিনিসের মালিক হতে পারবো না। তারপর আমি সেই অনুভূতিকে চাপা দিয়ে, দ্রুত রুমালের এক কোণে বেঁধে নিলাম আঙটিটা, তারপর আবার প্যাসেজ ধরে রওনা দিলাম ফিরতি পথে।

বেডরুমের দরজার কাছে আসতেই খেয়াল করলাম যে ওটা অল্প খোলা, আমি হাত বাড়িয়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেলাম টেনে বন্ধ করে দেব বলে।

দরজার ওপাশ থেকে একটা মহিলার গলার আওয়াজ ভেসে এল, কামনায় অধীর হয়ে থাকা একটা কণ্ঠ, ক্রমাগত হাঁফানোর কারণে ভেঙ্গে যাওয়া আর কাঁপতে থাকা একটা গলা।

"ইয়েস, গড, ইয়েস। জোরে! আরও জোরে!" সাথে সাথেই একটা পুরুষ কণ্ঠও মিশে গেল তার সাথে, আহত জানোয়ারের ফ্যাসফেসে কান্নার মত লাগল কণ্ঠটা।

"সোনা! আমার সোনা!" কণ্ঠ দুটো একসাথে ভাসতে লাগল, মোচড় খেতে লাগল আবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে লাগল, প্রেমের উত্তাল ঝড়ে আবেগের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যেতে লাগল বারবার। ওটার সাথে আরও একটা শব্দ হতে লাগল–ছন্দময়, দ্রুত, দড়াম দড়াম করে শব্দটা সৃষ্টির আদিম

---

[৬৭]যারা হাত-পা নেড়ে সংকেত দেয়

অভিপ্রায়কেই প্রকাশ করছে যেন, মানব ইতিহাসের মতই প্রাচীন এই শব্দটা, তারাদের গতিপথের মতই এর কোনো পরিবর্তন হয়নি আজও।

ওখানেই জমে গেলাম আমি, হাত তখনও বাড়ানো দরজার হাতলের দিকে, ভালোবাসার ধড়াস ধড়াস স্পন্দন থেমে গেল একটু পরেই, এরপর ভেসে আসতে লাগল শুধু শব্দ করে দম নেওয়ার আওয়াজ আর থেকে থেকে আবেগ অবসানের পরের অবসন্নতার ছোট ছোট দীর্ঘশ্বাস এবং গোঙ্গানি।

আমি এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ালাম যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছি। কোন শব্দ না করেই আমি সামনের দরজা পেরিয়ে এসে সন্তর্পণে লাগিয়ে দিলাম সেটা।

পুরো লাঞ্চ জুড়ে একটা ঘোরের ভেতর থাকলাম আমি, খেলাম কিন্তু কী খেলাম জানি না, কথা বললাম সবার সাথে কিন্তু কিছুই ঢুকছিল না কানে। কারণ স্যুইটের ওই দরজার পেছনে আমি যাদের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলাম তারা হচ্ছে স্যালি বেনাটর আর লোরেন স্টারভেসান্ট।

রয়্যাল সোসাইটিতে ফিরে যাওয়ার কথা আর স্মরণে নেই আমার, শেষ দিকের পেপার উপস্থাপনার আর সমাপনী অনুষ্ঠানের অস্পষ্ট এক দুইটা ছবি মাথায় আছে শুধু।

সামনের সারিতে আমার সিটে বসে রইলাম ঠিক, কিন্তু পুরোটা সময় কুঁজো হয়ে বসে নিচের ঝকঝকে পালিশ করা মেঝের একটা ফাটলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমার মন ছুটে যাচ্ছিল অতীতে, লুকানো পাখি খুঁজতে থাকা একটা শিকারি কুকুরের মত বিগত কয়েক মাসের স্মৃতির ভেতর খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।

মুন সিটির ওই রাতটার কথা মনে পড়ল–যেদিন আমি মাতাল অবস্থায় শুতে গিয়েছিলাম, স্যালির নিজের হাতে ঢেলে দেওয়া হুইস্কি খেয়ে মাতাল হয়েছিলাম সেদিন। মনে পড়ল, লোরেন তাঁবুতে এসে ডেকে তুলেছিল আমাকে, তাঁবুর পর্দার পেছন দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ভোরের আকাশের ফ্যাকাসে আলো ।

একদিন রাতে লোরেনকে খুঁজতে গুহায় যাওয়ার কথা মনে পড়ল আমার। যখন লোরেন টর্চের আলো ফেলে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল।

র‍্যাল আর লেসলির মধ্যকার কথোপকথন যে শুনে ফেলেছিলাম সেটা মনে পড়ল। ব্রাইটন থেকে আসা স্যালির বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে পড়ল, হিলারির উপর অযৌক্তিক হিংস্র আক্রমণ, ওর সেই উদাসী আর চুপচাপ হয়ে থাকা, ওর হঠাৎ হঠাৎ ফুর্তি আবার আরও আচমকা বিষণ্ণতা, কথা বলতে গিয়েও আটকে যাওয়া, গোপন কথাটা বলতে গিয়েও আবার থেমে থাকা, মাঝরাতে আমার কাছে আসা, আরও কয়েকশো সূত্র আর ইঙ্গিত–নিজের অন্ধত্বে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। কীভাবে চোখে পড়ল না আমার এসব, বা কিচ্ছু টেরও পেলাম না?



কেউ আমার নাম ধরে ডাকলো, ঘোরটা ভাঙ্গাতে প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হলো আমাকে, কি বলা হচ্ছে সেটা শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। কথা বলছেন গ্রাহাম হবসন, সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, বক্তৃতা দিচ্ছেন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন, মুখে চওড়া হাসি। আশপাশের সবাইও গলা বাড়িয়ে দেখছে আমাকে, তাদের মুখেও হাসি, বন্ধুত্বপূর্ণ সদয় মুখ সব।

"সোসাইটির প্যাট্রন'স অ্যান্ড ফাউন্ডার'স মেডেলে ভূষিত করা হলো," বললেন হবসন। "সেই সাথে পরিষদের পক্ষে আমাকে এটাও ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে যে, আমাদের তহবিল থেকে একটা অংশ আলাদা করে রাখা হবে, এবং সেই অর্থ দিয়ে একজন শীর্ষস্থানীয় চিত্রশিল্পী দিয়ে ডক্টর কাজিনের একটা প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নেওয়া হবে। একটা উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিকৃতিটা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে–"

আমি মাথাটা ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার করে নিতে চাইলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, বেকুব মনে হচ্ছে নিজেকে। হবসনের কণ্ঠ মিলিয়ে যেতে লাগল আর আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলাম মনোযোগ দেওয়ার। এরপর মৃদু কিন্তু ক্রমাগত ধাক্কা পড়তে লাগল পিঠে, সবাই আমাকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল মঞ্চের দিকে।

"কিছু বলেন!" সবাই বলতে লাগল, হাসছে, হাতে তালি দিচ্ছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, প্রথমে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলেও, একটু পরে স্থির হয়ে এল ঘরটা, কিন্তু আবারও সবকিছু ঝাপসা হয়ে এসে ঘুরতে লাগল।

"ইয়োর গ্রেস," শুরু করেই গলা আটকে গেল আমার, গলার ভেতর মনে হলো শিরিষ কাগজ যেন। "আমি সম্মানিত বোধ করছি।" থেমে গিয়ে শব্দের জন্য হাতড়াতে লাগলাম, সামনের সবাই চুপচাপ বসে আছে, কিছু শোনার আশা করছে। আমি পুরো হল জুড়ে তাকালাম একবার, কিছু একটা খুঁজছি যা থেকে অনুপ্রেরণা পেতে পারি বা আমাকে উদ্ধার করতে পারে।

স্যালি বেনাটর দাঁড়িয়ে ছিল পাশের দরজাটার পাশে। আমি জানি না কতক্ষণ ধরে ওখানে আছে ও। মুখে হাসি, রোদে পোড়া বাদামি সুন্দর মুখটায় সাদা দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে, কাঁধের উপর ঘন কালো চুল ঝকঝকে ডানা মেলে উড়ছে যেন, গাল লালচে হয়ে আছে, চিকচিক করেছে চোখজোড়া, প্রেমিকের বিছানা থেকে সদ্যই উঠে আসা পরিতৃপ্ত একজন মেয়ে।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। "কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না," অস্ফুট স্বরে বললাম আমি, স্যালি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে আর হেসে উৎসাহ দিল আমাকে–আর আমার হৃদয় ভেঙে গেল তাতে; শারীরিকভাবেই কষ্ট হতে লাগল আমার, একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা, মনে হল আমার বুকের মাংস ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে কিছু একটা, এতটা তীব্র যে দম আটকে গেল আমার। আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছি, আমার ভালোবাসা, আমার একমাত্র ভালোবাসা, এই সব সম্মান, এই অর্জন সবকিছুই এখন অর্থহীন আমার কাছে।

আমি ওর দিকে তাকিয়েই রইলাম, প্রচণ্ড নিঃসঙ্গ লাগছে, মনে হচ্ছে বেঁচে থেকে লাভ নেই আর। টের পেলাম অশ্রু জমে জ্বলে উঠলো চোখ। আমি চাচ্ছিলাম না কেউ দেখুক সেটা, আমি মঞ্চ থেকে নেমে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। আবার মুহুর্মুহু করতালিতে ভরে গেল গোটা ঘর, এই গোলমালের মাঝেও কিছু কথা কানে এল আমার।

"বেচারা, একদম অভিভূত হয়ে গিয়েছে।"

"কী মর্মস্পর্শী!"

"উনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না।"

আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরের রাস্তায়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল বাইরে আর আমি পাগলের মত দৌড়াতে লাগলাম। একটা আহত পশুর মতই আমি চাচ্ছিলাম একা হয়ে গিয়ে এই আঘাতের ক্ষত সারাতে। ঠান্ডা বৃষ্টি শান্তি দিল আমার তপ্ত চোখজোড়াকে।



এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে, আমি একা থাকতে চাচ্ছিলাম, সেই সুযোগ পেলাম মুন সিটিতে। এলড্রিজ ইংল্যান্ডে এক মাস লেকচার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন আগেই, স্যালিও গায়েব হয়ে গেল। সেদিন রাতের পর আমি আর ওর সাথে কথা বলিনি, কিন্তু লোরেন কথা প্রসঙ্গে জানালো যে স্যালি নাকি ওর পাওনা দুই সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ইতালি আর গ্রীসের দ্বীপগুলোয় ঘুরতে গিয়েছে। মুন সিটিতে একটা এয়ারমেইল চিঠি এল স্যালির কাছ থেকে, পদুয়া-র ডাকের সীল মারা; চিঠিতে লোরেনের কথাটাই নিশ্চিত করে, লিখেছে যে লন্ডন ছাড়ার আগে আমার সাথে দেখা করতে চেষ্টা করেও না পারায় কতটা দুঃখ পেয়েছে ও। এতে অবশ্য অবাক হলাম না, কারণ আমি আর ডরচেস্টারে ফিরে যাইনি, আমার জিনিসপত্র সব ব্লু বার্ড হাউসে আনিয়ে

নেই আর পরের দিন ভোরের ফ্লাইটেই ফিরে আসি আফ্রিকায়। আমাকে আবারও অভিনন্দন জানিয়ে, শেষে জানিয়েছে যে এই মাসের শেষের দিকে জোহানেসবার্গ ফিরবে আর সেখান থেকে প্রথম যে ফ্লাইট পাবে সেটায় করেই চলে আসবে মুন সিটিতে।

ওর চিঠি পড়ে আমার কেমন একটা অবাস্তব অনুভূতি হতে লাগল, যেন কবরে থাকা কারো কাছ থেকে খবর পেলাম কোনো। কারণ ও এখন আমার কাছে মৃত, আমার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে চিরতরে। আমি পুড়িয়ে ফেললাম চিঠিটা।

লোরেন একদিন এল সব দেখতে। কিন্তু আমি দেখলাম ওকে বলার মত কিছুই নেই। মনে হচ্ছিল আমরা যেন অপরিচিত কেউ; একসময় ওর যা কিছু ছিল অতি-পরিচিত আর পরম পছন্দের, সেগুলোই এখন আমার কাছে একদমই অচেনা বলে ভ্রম হতে লাগল।

লোরেনও আমাদের মাঝের ফাঁকা জায়গাটা টের পেল, যেটা আলাদা করে রেখেছে আমাদেরকে, চেষ্টা করল সেটাকে অতিক্রম করার। কিন্তু আমি তাতে সাড়া দিতে পারলাম না; তাই ও ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করে ফিরে গেল আগেভাগেই। আমি ওর হতবুদ্ধি অবস্থাটা ধরতে পারলাম, সেজন্য খানিকটা মন খারাপও হলো। কিন্তু ওকে কোনোভাবেই ভেতর থেকে ঘৃণা বা দোষারোপ কোনোটাই করতে পারছিলাম না।

আমার নিঃসঙ্গতার সীমানায় র‍্যাল ও লেসলি ছিল অস্পষ্ট অবয়বের মত। আমি এখন যে ব্যক্তিগত দুনিয়ায় বাস করি সেটায় ওরা কোনোরকম নাক গলাতে এল না।

হুই বেন-আমন-এর দুনিয়াটাও এরকমই ছিল, কষ্ট আর দুঃখের ওপারের একটা জায়গা। এলড্রিজ যখন লিপিগুলো নিয়ে কাজ করতেন, তখন থেকেই আমি ওনার অনুবাদের খুঁটিনাটি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি। ভাষা হচ্ছে আমার সবচেয়ে সেরা প্রতিভার জায়গা, এটা শিখতে আমাকে তেমন কোনো কষ্টই করতে হয় না। লরেন্স অভ অ্যারাবিয়া মাত্র চারদিনে আরবি বলা শিখে ফেলেছিলেন। আমি দশ আমি শিখে ফেললাম পিউনিক, এই কাজ করে পেয়ে গেলাম হুইয়ের স্বর্ণের বইয়ের কল্পরাজ্যের চাবিকাঠি।

তৃতীয় বইটাও ছিল লেখকের জীবদ্দশা পর্যন্ত ওপেটের ধারাবাহিক ইতিহাস। এটাও যথারীতি আগের দুটোর মতই মন্ত্রমুগ্ধকর, তবে আমার জন্য আসল জাদু অপেক্ষা করছিল বাকি থেকে যাওয়া স্বর্ণের বই দুটোয়।

এগুলো ছিল হুইয়ের কাব্য, আধুনিক ভাষা বিজ্ঞান মতে এগুলো হলো কবিতা আর গান। এটা ছিল যোদ্ধা হুই, সকল দেবতার কুঠারবাহকের কাব্য সত্তার প্রকাশ, রোদে ঝলসাতে থাকা চকচকে পাখির ডানার মত তার যুদ্ধ কুঠারটার প্রতি নিবেদন করে গীতিকাব্য রচনা করেছেন তিনি এখানে।

এখানে উনি প্রথমে কীভাবে দক্ষিণ দিকের খনিগুলো থেকে আকরিক আনা হতো সেই বিবরণ দিয়েছেন। কীভাবে মানুষের জরায়ুর মত দেখতে একটা চুল্লিতে বিগলন করা হতো, বা গনগনে কয়লার ঘ্রাণ আর গলিত ধাতুর ঝরে ঝরে পড়ার কথা লিখেছেন।

কীভাবে ওটাকে বিশুদ্ধ করে হতো, অন্য ধাতুর সাথে মিশিয়ে সংকর করা হতো, ওগুলোকে পিটিয়ে পাত বানানো হতো বা খোদাই করা হতো, যখন উনি চারটা শকুন আর চারটা সূর্যের প্রতীক খোদাইয়ের কথা বর্ণনা শুরু করলেন, তখন আমি আমার ডেস্কের উপর ঝুলিয়ে রাখা বিশাল কুঠারটার দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

হুইয়ের সাথে আমিও যেন শুনতে পেলাম ওটার ঝিলিক মারা ফলাটা যুদ্ধের ময়দানে আর্তনাদ করছে, হাড়ের ভেতর ওটা গেঁথে যাওয়ার আওয়াজ, মাংসের ভেতর থেকে টেনে বের করার সময় যে চুষনীর মত শব্দ হয় সেটাও কানে বেজে উঠলো। আমি অবাক হয়ে পড়তে লাগলাম যে এটার দ্বারা কোন কোন শত্রুর ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। আর তাদের অপরাধ আর পাপ কী ছিল সেগুলো অনুমান করার চেষ্টা করলাম।

এরপরই হুইয়ের মেজাজে পরিবর্তন আসে, উনি ছিলেন একজন ফূর্তিবাজ মানুষ, এক চুমুকে জেং ওয়াইনের জগ সাবাড় করে দিতেন। বন্ধু-বান্ধবের সাথে হৈ-হল্লা করতেন মশালের আলোয়।

এক জায়গায় উনি সাদা লিলেনের অভিজাত পোশাক পরে থাকার কথা লিখেছেন, সুগন্ধি তেল মেখেছেন গায়ে, ওনার দাড়িতে বেণী করে রশির মত পাকিয়ে রাখা।

এক জায়গায় উনি পুরোহিত, দেবতাদের সাথে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, তাদের নানান রহস্য সম্পর্কে কৌতূহল মেটাচ্ছেন, এবং তাদের ভাগের নজরানা তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। হুই একাকী হাঁটু গেঁড়ে বসে প্রার্থনা করছেন, ভোর বেলায় দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে সূর্য দেবতা বাআলকে স্বাগত জানাচ্ছেন, হুই ধর্মীয় আপ্তবাক্যের বাস্তব উদাহরণ।

আবার কোথাও হুই হচ্ছেন বন্ধু, একজন খাঁটি সঙ্গী, তার বন্ধুর সঙ্গ পেলে কত আনন্দ পান সেটা বর্ণনা করেছেন। মনের মিল সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, আনন্দ ভাগাভাগির মজা, একই সাথে বিপদ মোকাবেলা করা আর সেগুলো থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথা লিখেছেন। এই কাব্যে এই ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে হুই একজন বীর পূজারী, বন্ধুর কোনো দোষই চোখে পড়ে না ওনার, তার শারীরিক সৌন্দর্য প্রায় একজন মহিলার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। বন্ধুর কাঁধের মাপ, বুক পর্যন্ত নেমে আসা আগুন লাল দাড়ির রাজকীয় বাঁক, যেখানে মসৃণ মাংসপেশি ফুলে জিম্বাও পাহাড়ের পাথরের

চাঁইগুলোর মত শক্ত হয়ে আছে, শালকাঠের মত পা, মুখের হাসি যেন সূর্য দেবতা বাআলের উষ্ণ আশীর্বাদের মত, বর্ণনা শেষ করেছেন এই লাইনটা দিয়ে, "*লানন হাইকানাস তুমি ওপেটের রাজার চাইতেও বেশি কিছু, তুমি আমার বন্ধু।*" এটা পড়ে, আমার অনুভব হলো যে হুইয়ের বন্ধুত্ব পাওয়া মানে হচ্ছে মূল্যবান কিছু একটা লাভ করা।

আবারও কবির মেজাজ পাল্টে গেল, এবার উনি হচ্ছেন প্রকৃতির পর্যবেক্ষক, একজন শিকারি, ওনার শিকারকে পরম স্নেহের সাথে বর্ণনা দিয়েছেন, বিস্তারিত কিছু বাদ দেননি, শ্বেতশুভ্র গজদন্ত থেকে শুরু করে একটা সিংহীর পেটের তলের তুলতুলে কোমলতা–কিছুই বাদ যায়নি।

এরপরই উনি একজন প্রেমিক, ওনার প্রিয়তমার সৌন্দর্যে বিভোর।

তানিথ, যার চওড়া ভ্রূ পূর্ণিমার চাঁদের মত শুভ্র কিরণ ছড়ায়, যার কেশরাজি নরম আর হালকা হয়ে ওড়ে, ঠিক যেন জলাভূমিতে প্যাপিরাসের আগুন থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী, যার চোখ এমন সবুজ দ্যুতি ছড়ায় যা অ্যাসটার্টে দেবীর মন্দিরের দীঘিটার চাইতেও গভীর।

তারপর আচমকা মারা যায় তানিথ, কবি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তার মৃত্যু ওনার কাছে পাখি উড়ে যাওয়ার মত মনে হয়, তার শ্বেত শুভ্র বাহু ছড়িয়ে থাকা ডানার মত করে ঝলকাতে থাকে, তার শেষ কান্না স্বর্গের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে দেবতাদের অন্তর পর্যন্ত ছুঁয়ে দেয়। হুইয়ের অশ্রু যেন আমার চোখ দিয়েই ঝরতে থাকে, ওনার বিলাপ আমার গলা দিয়ে বের হয়, ওনার শঙ্কা আর উল্লাস আমার নিজের হয়ে ধরা দেয়, মনে হতে থাকে যেন হুই হলেন আমি, আমিই হুই।

আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতাম, শুতে যেতাম অনেক দেরি করে। যেটুক না খেলেই না তার বেশি খেতাম না কিছুই। আমার চেহারা ভেঙে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, একটা জরাগ্রস্ত চেহারা আয়নার ভেতর থেকে ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে।

কিন্তু অবশেষে বাস্তবতার মুখোমুখি আমাকে হতেই হলো, আমার কল্পরাজ্যের ভঙ্গুর কাঁচের দেওয়ালটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল তা। লোরেন আর স্যালি একই বিমানে করে হাজির হলো মুন সিটিতে। যে যন্ত্রণাটা থেকে এতগুলো দিন আমি পালিয়ে ছিলাম সেটা আবার শুরু হলো নতুন করে।

আবারও আমি লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করলাম। আর্কাইভটাকেই বানিয়ে ফেললাম আমার আশ্রম। প্রতিটা দিন ওখানে সময় কাটিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম লোরেন বা স্যালির সাথে যাতে যতটা সম্ভব দেখা না হয়। তবুও রাতের খাবারের ভয়ঙ্কর একটা ঘণ্টা কাটাতে হতো ওদের সাথে, যতক্ষণ না কোনো অজুহাতে উঠে আসতে পারতাম, ততোক্ষণ চেষ্টা চলাতাম পুরোটা সময় হাসিমুখে কাটাতে আর হাসাহাসি বা আলোচনায় অংশ নিতে, চেষ্টা

করতাম লোরেন আর স্যালির মধ্যে চলমান একান্ত অন্তরঙ্গ দৃষ্টি বিনিময় দেখেও না দেখার ভান করতে।

লোরেন দুইবার এল আমার কাছে।"কিছু একটা হয়েছে তোমার, বেন।"

"আরে নাহ, লোরেন। না। কসম। ভুল ভাবছো তুমি।" তারপরই আমি পালিয়ে যেতাম আর্কাইভের নিস্তব্ধতায়।

ওখানে র‍্যাল চুপচাপ সঙ্গ দিতো আমাকে, সাথে ছিল সবকিছু তালিকাবদ্ধ করা, ছবি তোলা আর পাত্রগুলো প্যাকেট করার শারীরিক পরিশ্রম। এর বাইরেও আমি মনোযোগ সরানোর আরও একটা উপায় পেয়ে গেলাম। এই গুহাটা প্রায় ২,০০০ বছর বদ্ধ ছিল, আমরা যখন প্রথম এটা খুললাম তখন এটা ছিল উষর, এর ভেতরে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু এখন এর ভেতরে নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠছে, প্রথমে ছোট ছোট ডাঁশ পোকা এল, এরপর বালি মাছি, পিঁপড়া, মাকড়শা, শুঁয়োপোকা, সবার শেষে এল ছোট ছোট বাদামি টিকটিকি। আমি আর্কাইভের ভেতরের এদের বসতি স্থাপনের ভিডিও রেকর্ড করে রাখতে লাগলাম।

কাছ থেকে ওই মাছি বা পতঙ্গগুলোর দুরূহ কোনো ছবি তোলার আশায় ক্যামেরাটা বসিয়ে দিনের বহু ঘণ্টা আমি চুপচাপ ঠায় বসে থাকতাম, তা করতে গিয়েই আমি মুন সিটির শেষ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা করে বসি।

আমি একাকী আর্কাইভের শেষ প্রান্তে কাজ করছিলাম, যে দেয়ালটায় সূর্যের প্রতীক আঁকা সেটার একদমই কাছে। একটা টিকটিকি দেওয়াল ধরে নেমে এল নিচে, তারপর ছুটে গেল পাথরের মেঝে ধরে। ঠিক সেখানে, যেখানে ওই বিশাল যুদ্ধ কুঠারটা পড়ে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার হয়েছিল। টিকটিকিটা ওখানে গিয়ে থেমে দাঁড়ালো। তারপর ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, ওটার গলার নরম চামড়া ধক ধক করছে আর কালো পুঁতির মত চোখজোড়া চকচক করছে প্রত্যাশায়। যে পোকাটাকে ওটা নজরে রাখছে, সেটার দিকে খেয়াল করলাম তখন। একটা সাদা মথ যেটা ডানা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে সূর্যের প্রতিকৃতিটার উপর।

দ্রুত ক্যামেরাটা নিয়ে এলাম আমি, ফ্ল্যাশ বাল্ব এবং এক্সপোজার চালিয়ে দিলাম। টিকটিকির শিকার ধরার মুহূর্তটা ক্যামেরায় ধরতে পারবো কিনা সেই চিন্তায় অস্থির। ধীরে ধীরে আমি এমন একটা অবস্থানে চলে এলাম যেখান থেকে আমি মথটার উপর ফোকাস করতে পারবো, তারপর অপেক্ষা করতে লাগলাম। টিকটিকিটা দ্রুত লম্বা কয়েকটা লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। মথটা থেকে বারো ইঞ্চি দূরে থাকতে আবার থেমে দাঁড়ালো ওটা, দেখে মনে হলো চূড়ান্ত আঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম, আঙুল চেপে বসেছে ক্যামেরার ট্রিগারে। টিকটিকি সামনে ঝাঁপ দিতেই আমি বিস্ফোরণ ঘটালাম বাল্বে।

টিকটিকিটা মথের শরীর মুখের মধ্যে ঠেসে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে মাথা নিচের দিকে দিয়ে মেঝের দিকে নামতে লাগল; দেওয়াল আর মেঝের কোনায় পৌঁছে ওটা গায়েব হয়ে গেলে আমি এই উদ্ভট কর্মকাণ্ড দেখে হেসে ফেললাম।

ফিল্মটা বের করে নিলাম আমি, তারপর ফ্ল্যাশ বাল্বটা পাল্টে ক্যামেরার কেস-এ ভরে রাখলাম আবার। তারপর আবারও আগের কাজে ভেজতে যেতেই একটা ভাবনা খেলে গেল মাথায়। ফিরে গেলাম গুহার শেষ দেওয়ালের কাছে, ঠিক যেখানে টিকটিকিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। হাঁটু মুড়ে বসে দেওয়াল আর মেঝের সংযোগস্থলটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। প্রথম দর্শনে জায়গাটা নিরেটই লাগল, কোনো ফাটল বা গর্ত চোখে পড়ল না যেখানে টিকটিকিটা আশ্রয় নিতে পারে। টিকটিকিটার গায়েব হওয়ার ঘটনায় কৌতূহলী হয়ে আমি একটা লাইট তার সহ খুলে নিয়ে এসে এমনভাবে বসালাম যাতে পুরো দেওয়ালটাই আলোকিত করতে পারে।

তারপর হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে দেওয়াল জুড়ে হাতড়াতে লাগলাম। আমার মনে হচ্ছিল বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ডঙ্কার মত বাজছে, টের পাচ্ছিলাম কানের পেছনে রক্তের নাচন, গাল গরম হয়ে যাচ্ছে রক্তের প্রবাহে। পকেট থেকে পেন নাইফটা বের করতে গিয়ে দেখি হাত কাঁপছে, ছুরির ফলাটা বের করতে গিয়ে বুড়ো আঙুলটা প্রায় কেটেই ফেললাম।

তারপর দেওয়াল আর মেঝেকে আলাদা করে রাখা ঝাপসা চেরা জায়গাটার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম ফলাটা, ধুলোয় ভরে আছে সেখানে। ছুরির ফলার পুরোটাই ঢুকে গেল ভেতরে।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি, সূর্যের প্রতিকৃতিটা আর্ক লাইটের আলোয় অদ্ভুতুড়ে সব আবছায়ার সৃষ্টি করেছে।

"সম্ভবত," আমি জোরে জোরে ভাবতে লাগলাম, "এটা খুবই সম্ভব..." তারপর আমি আবারও বাআলের প্রতিকৃতির নিচে উপুড় হয়ে পড়লাম, ঠিক যেন ওনার একজন পূজারী। উন্মাদের মত আমি ফাটলটা খোঁচাতে খোঁচাতে ছুরির ফলা টেনে মেঝেতে সেটা কতদূর গিয়েছে দেখে নিলাম, তারপর হঠাৎ করেই ওটা নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে নিয়ে দেওয়াল ধরে উপরে উঠতে লাগল। এখানে ফাটলটা গোপনে সংযুক্ত, প্যাঁচ খেয়ে আবার ওটার উপরেই এমনভাবে ফিরে এসেছে যে অদৃশ্য হয়ে আছে পুরোপুরি। যে চতুর দক্ষতার সাথে এই সন্ধিটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাতে নিশ্চিত হলাম যে এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয়ে পারেই না। এই দেওয়ালটার গঠন শৈলীর সাথে ছাদের পাথরের চাঁইয়ের নড়বড়ে ধুলো চোয়ানো সন্ধির যোজন যোজন পার্থক্য।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে শূন্য দেওয়ালটার সামনে পায়চারি করতে লাগলাম। এবার মুন সিটিতে ফিরে আসার পর এই প্রথম নিজেকে জ্যান্ত মনে

হচ্ছে। শরীরে শিহরণ বয়ে গেল যেন, এত জোরে হাঁটছিলাম যে মনে হচ্ছিল পায়ে স্প্রিং লাগানো, হাতের মুঠো খুলতে আর বন্ধ করতে লাগলাম উত্তেজনায় মাথার ভেতর বিদ্যুৎ বইতে লাগল যেন।

"লোরেন," আচমকাই মাথায় এল আমার। "ওর দেখা উচিত এটা।" আমি প্রায় দৌড়ে এলাম আর্কাইভ ধরে, তারপর ছুটে গেলাম সুড়ঙ্গে। সুড়ঙ্গের মুখ আটকে থাকা কাঠের নিরাপত্তা চৌকিতে একজন গার্ড হাত-পা ছড়িয়ে বসে ছিল চেয়ারে, বুট রাখা ডেস্কের উপর। নীল ইউনিফর্মের কলারের বোতাম লাগানো নেই, ক্যাপ ঠেলে মাথার পেছনে রাখা। গানবেল্ট ঝোলানো পেছনের দেওয়ালে একটা আঙটায়, হোলস্টারের ভেতর থেকে রিভলবারের কালো বাটটা বেরিয়ে আছে। হাতের পেপারব্যাক ওয়েস্টার্ন বইটা থেকে মুখ তুলে তাকালো সে, পাখির চঞ্চুর মত বাঁকা নাক আর ঈগলের মত ঠান্ডা চোখ লোকটার।

"হাই, ডক। তাড়া নাকি খুব?"

"বলস, মিস্টার স্টারভেসান্টের কাছে যেতে পারবে একটু? ওনাকে বলবে যে এক্ষুণি ওনাকে এখানে আসতে বলেছি আমি।"



লোরেন যখন এল তখনও আমি হাঁটু মুড়ে বসে আছি সূর্যের প্রতিকৃতিটার সামনে।

"লো, এদিকে আসো, একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।"

"হেই, বেন!" হাসলো লোরেন, আমার কাছে মনে হলো সেটা অনেকটাই স্বস্তির আনন্দে। "গত দুই সপ্তাহে এই প্রথম হাসতে দেখলাম তোমাকে। গড, আমি তো চিন্তায় মরেই যাচ্ছিলাম।" বলে ও আমার কাঁধ চাপড়ে দিল, তখনও হাসছে। "এখন আবার আগের বেন-এর মতই লাগছে।"

"লো, এটা দেখো।" ও আমার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল।

দশ মিনিট পরে অবশ্য মুখের হাসি মুছে গেল ওর, চেহারা হয়ে গেল শীতল আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমনভাবে ওই ফ্যাকাসে চোখজোড়া দিয়ে দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইলো যেন ও নিরেট পাথরের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে।

"লো," আবার ডাকলাম আমি, কিন্তু ও কড়াভাবে হাতের ইশারায় আমাকে চুপ করতে বলল। দেওয়াল থেকে নজর ফেরালোই না আর আমার

মনে হতে লাগল যে ও এমন কিছু শুনতে পাচ্ছে যা আমার কানে আসছে না। আচমকা আমি এক অপার্থিব বিস্ময়ের অনুভূতি নিয়ে ওই দেবতাতুল্য চেহারাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কেন যেন মনে হতে লাগল যে অতিপ্রাকৃত কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে, এক পা এক পা করে লোরেন এগিয়ে গেল সূর্যের প্রতিকৃতিটার দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে বিশাল চক্রটার ঠিক মাঝে হাত রাখলো। আঙুলগুলো ছড়িয়ে রেখেছে, দেখে মনে হচ্ছে প্রতিকৃতিটার সাথে মেলাতে চাচ্ছে। ধীরে ধীরে চাপ দিতে শুরু করল দেওয়ালে, ওর আঙুলের মাথা পাথরের গায়ে চেপে বসতে লাগল দেখলাম, হাতের চাপে আকৃতি বদলে যাচ্ছে ওটার।

লম্বা কয়েকটা সেকেন্ড ঘটলো না কিছুই। তারপরেই আচমকা দেওয়ালটা নড়তে শুরু করল। কোনো শব্দ হলো না, আটকে থাকা কোনো কব্জার ঘড়ঘড় বা কিচকিচ শব্দও হলো না, কিন্তু পুরো দেওয়ালটাই একটা লুকানো অক্ষ কেন্দ্র করে ঘুরে যেতে লাগল। কষ্টকর কিন্তু বাধাহীনভাবে দেওয়ালটা সরে গিয়ে বাআলের প্রতিকৃতিটার পেছনে লুকিয়ে রাখা আরও একটা সুড়ঙ্গের চৌকো অন্ধকার প্রবেশপথ খুলে গেল।

ওই প্রাগৈতিহাসিক প্রবেশপথটার দিকে তাকিয়ে আমি লোরেনের দিকে না ফিরেই অস্ফুট স্বরে বললাম, "কীভাবে করলে, লো? কীভাবে বুঝলে যে এভাবে হবে?"

জবাবে ওর গলার স্বরে বোঝা গেল যে ও নিজেও বিভ্রান্ত। "জানি না–কেন যেন মনে হলো এভাবেই করতে হবে।" আবারও চুপ হয়ে গেলাম দুজনেই, তাকিয়ে আছি খোলা জায়গাটার দিকে। এর ভেতরে কি আছে সেই চিন্তায় হঠাৎ এক অজানা ভয় পেয়ে বসল আমাকে।

"লাইটটা নিয়ে আসো, বেন," দরজাটা থেকে চোখ না সরিয়েই আদেশ করল লোরেন। আমি লাইটটা নিয়ে আসতেই, সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে নিল ও। তারপর ওর পিছু পিছু খোলা জায়গাটা পেরিয়ে ঢুকে গেলাম ভেতরে।

আমাদের সামনে একটা সুড়ঙ্গ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে পাতালে, মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হবে ঢালটা। সুড়ঙ্গটা সাত ফুট ছয় ইঞ্চি উঁচু, নয় ফিট চওড়া। মেঝেতে পাথর কেটে সিঁড়ি বানানো। প্রতিটা ধাপ ক্ষয়ে গিয়েছে, প্রান্তের দিকে ভেঙ্গেও পড়েছে কয়েকটা। এই সুড়ঙ্গের দেওয়াল আর ছাদ অমসৃণ পাথরের, ছায়া আর অন্ধকারের কারণে এটা আসলে কতটা গভীর সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

"কী এটা?" সিঁড়ির মাথায় পড়ে থাকা দুটো বিশাল গোলাকৃতির জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল লোরেন। ওগুলোর উপরের ব্রোঞ্জের ফুলের নকশার অস্পষ্ট ঝলকানি চোখে পড়ল আমার।

"ঢাল," বললাম আমি। "যুদ্ধের ঢাল।"

"মনে হচ্ছে খুব তাড়াহুড়া করে ফেলে গিয়েছে কেউ।"

খুব সাবধানে ওগুলো পেরিয়ে নিচে নামতে লাগলাম আমরা। মোট ১০৬টা ধাপ, প্রতিটা ছয় ইঞ্চি উঁচু।

"ধুলোবালি নেই এখানে," মন্তব্য করল লোরেন।

"না," সায় দিলাম আমিও। "দরজাটা খুব মজবুত ছিল।"

লোরেনের কথা আসলে সতর্কবার্তা হিসেবে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি তখন এই নতুন আবিষ্কারের বিস্ময় আর উত্তেজনায় বিভোর হয়ে ছিলাম। সিঁড়ির উপরিভাগ এতটাই পরিষ্কার ছিল যে মনে হচ্ছিল এইমাত্র ঝাড়া হয়েছে।

সিঁড়ির শেষ মাথায় আমরা ইংরেজি T আকৃতির একটা সংযোগস্থলে এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে ডানদিকের গলিটা চলে গিয়েছে একটা লোহার গেটমতো জায়গায়, যেটা বন্ধ করে বল্টু মেরে আটকানো। আর বামদিকে নেমে গিয়েছে আরও একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি, সেটা পাতালের পাথরের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

"কোনদিকে যাবো?" জিজ্ঞেস করল লোরেন।

"দরজার ওপাশে কী আছে তা দেখা যাক," পরামর্শ দিলাম আমি, উত্তেজনায় গলা ধরে আছে, আমরা সেদিকেই এগিয়ে গেলাম।

ভারি কব্জাগুলোয় তালা নেই, তবে স্বর্ণের একটা তার দেখা গেল দরজার চৌকাঠের বাজু বরাবর প্যাঁচানো, একটা ভারি কাদার তৈরি মোহর আটকে রেখেছে ঢোকার জায়গা।

মোহরের উপরের অবয়বটা হলো একটা কাঁচা হাতে খোদাই করা জানোয়ার, নিচে লেখা, 'লানন হাইকানাস, গ্রাই লায়ন অভ ওপেট, পান্ট এবং চার সাম্রাজ্যের সম্রাট।'

"তোমার ছুরিটা দাও," লোরেন বলল।

"লো, এভাবে হবে না," বলা শুরু করলাম আমি।

"দিতে বললাম না তোমাকে?" ওর গলা কাঁপছে, এক অদ্ভুত কামনা আর নেশায় ভারি হয়ে আছে গলা। "তুমি কি বুঝতে পারছো না যে এটা কী? এটাই সেই কোষাগার, ওপেটের স্বর্ণের ভাণ্ডার।"

"না, সব কিছু ঠিকভাবে করা উচিত, লো," অনুনয় করলাম আমি, কিন্তু ও খালি হাতেই মোহরটা ধরে টান দিয়ে দরজা থেকে ছিড়ে ফেলল।

"এসব করতে যেয়ো না, লো," থামানোর চেষ্টা করলাম আমি লোরেনকে, কিন্তু ও দরজার হুড়কো ধরে টেনে খুলে ফেলল, তারপর শরীরের পুরো ভর চাপিয়ে দিল দরজার উপর। দরজায় মরচে পড়ে আটকে ছিল এতদিন, ও শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চাপ দিতে লাগল দরজার

উপরে। একটু একটু করে হলেও শেষ পর্যন্ত হার মেনে নিল দরজা, খুলে গিয়ে যথেষ্ট ফাঁক হয়ে গেল যেটা দিয়ে লোরেন ভেতরে গলতে পারবে। ও দৌড়ে ঢুকে গেল ভেতরে, আমিও ছুটলাম ওর পেছনে, সুড়ঙ্গটা একটু এগিয়েই ডানে বাঁক নিয়ে বিশাল একটা প্রকোষ্ঠে গিয়ে শেষ হয়েছে।

"গড!" চিৎকার করে উঠলো বেন। "ওহ গড! দেখে যাও, লোরেন, খালি দেখে যাও একবার।"

ওপেটের কোষাগার উন্মুক্ত পড়ে আছে আমাদের সামনে, এর সকল সম্পদ এখনও অক্ষত। পরবর্তীতে আমরা সবকিছু গুণে, ওজন করে মেপে দেখেছিলাম, কিন্তু ওই মুহূর্তে আমরা হতভম্ব অবস্থায় ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

কক্ষটা ছিল ১৮৬ ফিট লম্বা আর ২১ ফিট চওড়া। একপাশের দেওয়ালের প্রায় পুরোটা জুড়ে হাতির দাঁড় দাঁড় করিয়ে রাখা। মোট ১,০১৬টা বড় বড় হাতির দাঁত ছিল ওখানে। সব নষ্ট হয়ে চক-এর মত ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে। ২,০০০ বছর আগে এই জিনিস নিশ্চয়ই বিপুল একটা সম্পদ হিসেবে গণ্য ছিল।

৯০০র বেশি তেলের ঘড়া ছিল, মোম দিয়ে মুখ আটকানো। দামী তেলগুলো অনেক আগেই বাষ্পীভূত হয়ে এখন চটচটে কালো একটা পদার্থে পরিণত হয়েছে। আমদানিকৃত লিলেন আর সিল্ক কাপড়ের গাঁটরি ছিল অনেকগুলো, ওগুলোও পচে এমন অবস্থা যে ছোয়া দেওয়া মাত্র গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

ধাতুগুলো সাজানো ছিল কক্ষের উল্টোদিকের দেওয়ালের গায়ে–১৯০ টন তামা, সেন্ট আন্ড্রুর ক্রস-এর মত দেখতে বাট বানিয়ে রাখা হয়েছে, ৩ টন টিন, সেটাও একই আকৃতিতে বানানো; ১৬ টন রুপা; ৯৬ টন সীসা; ২টন অ্যান্টিমনি।

আমরা কক্ষটার মাঝখান ধরে ওগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম, এই বিশাল সম্পদের স্তূপের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি।

"স্বর্ণ," ফিসফিস করে বলল লোরেন। "স্বর্ণ কোথায়?"

কাঠের সিন্দুকের একটা স্তূপ দেখা গেল, আবলুস কাঠ দিয়ে তৈরি, ঢাকনাগুলোর উপরে হাতির দাঁত আর মুক্তা দিয়ে বাঁধানো। পুরো কক্ষে শুধু এই জিনিসটাই ছিল কোনো শিল্পসম্মত জিনিস, এগুলোতেও খুবই কাঁচা হাতে যুদ্ধ অথবা শিকারের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

"না, না, না, লো," আমি আবারও চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু লোরেন সেদিকে কর্ণপাত না করেই ঢাকনা তুলে ফেলা শুরু করল।

ওগুলো আধা দামী রত্ন দিয়ে ভরা, নীলা, ফিরোজা, টাইগার্স আই, জেড আর ম্যালাকাইট। এগুলোর মাঝে কয়েকটাকে কোনোমতে কেটে স্বর্ণের

অলংকারের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কয়েকটা আছে মোটা বেখাপ্পা টুকরো, এছাড়াও ছিল গলাবন্ধ, ব্রোচ, নেকলেস, আঙটি।

লোরেন ঝটপট এগিয়ে গেল সামনে তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল আচমকাই। মূল কক্ষ থেকে আরও একটা কুলুঙ্গি বেরিয়েছে, সেটাতেও একটা লোহার গেট। সেখানেই সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে স্বর্ণ। যথারীতি এগুলো সব আঙুলের মত বাঁট বানানো। এখানেও আগের ধাতুগুলো ছিল, তবে তখন ওগুলোর স্তূপ দেখতে খুব বেশি মনে না হলেও, কয়েক মাস পরে যখন মেপে দেখা হলো তখন দেখি সব মিলিয়ে মোট ৬০ টনেরও বেশি।

ওটার মূল্য ছিল ৬০,০০০,০০০ স্টারলিং-এর চাইতেও বেশি। স্বর্ণ রাখা ওই একই কুলুঙ্গিতে দুটো ছোট কাঠের সিন্দুক ছিল। ওখান থেকে বের হলো প্রায় সকল রঙের আর আকৃতির ২৬,০০০টি ক্যারেট আকাটা বা আধা কাটা হীরা। এগুলোর কোনোটাই দেড় ক্যারেটের ছোট না, সবচে বড়টা ছিল একটা বিশাল আটত্রিশ ক্যারেটের গোমড়া মুখো হলুদ দানব, সাথে সাথে সেগুলো মোট গুপ্তধনের সাথে আরও ২,০০০,০০০ পাউন্ড যুক্ত করে দিল।

এখানেই জমা হয়ে আছে ওপেটের সাতচল্লিশজন রাজার সম্পদ, ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা হয়েছিল সব। পুরাকালের আর কোনো গুপ্তধনই এর তুলনায় কিছুই না।

"খুব সাবধানে কাজ করতে হবে আমাদেরকে, বেন। এগুলোর কথা যেন বাইরে বের না হয়। যদি হয় তাহলে কী হতে পারে সেটা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই?" দুই হাত ভর্তি খাঁটি স্বর্ণের আঙুল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল ও, তাকিয়ে আছে বাকি সম্পদের স্তূপের দিকে। "এই সবই হানাহানি শুরু করার জন্য যথেষ্ট, যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে যে কেউ।"

"আমাকে কী করতে বলো তুমি, লো? আমাকে তো কাউকে না কাউকে সাহায্যের জন্য লাগবে। র‍্যাল বা স্যালি অন্তত।"

"না!" হিংস্রভাবে আমার দিকে ফিরে তাকালো ও। "আর কেউ ঢুকতে পারবে না এখানে। আমি গার্ডদেরকে বলে দেব, শুধু তুমি আর আমি বাদে আর কেউ না।"

"আমার তো সাহায্য লাগবে, লো। আমি একা তো কিছুই করতে পারবো না, এখানে কত কিছু দেখতেই পাচ্ছো।"

"আমি সাহায্য করবো তোমাকে," লোরেন বলল।

"কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে।"

"আমি সাহায্য করবো," আবার বলল ও। "আর কেউ না। আর কাউকে একটা কথাও বলা যাবে না।"

সেদিন সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত লোরেন আর আমি গুপ্তধনের কক্ষটা খুঁজে খুঁজে দেখলাম।

“চলো সুড়ঙ্গের অন্য দিকটা কোথায় গেল দেখে আসি সেটা,” প্রস্তাব করলাম আমি।

“না,” লোরেন থামিয়ে দিল আমাকে। “আমরা অতিরিক্ত সময় কাজ করবো না এখানে। আমি চাই না কেউ সন্দেহ করুক যে আমরা স্বাভাবিকের বাইরে কিছু একটা করছি। আমরা এখন ক্যাম্পে ফিরে যাবো। আগামীকাল সুড়ঙ্গের অন্য দিকটা দেখা যাবে। ওদিকে তো আর এরকম কিছু নেই।”

আমরা পাথরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গোপন সুড়ঙ্গটা বন্ধ করে দিলাম আবার। গার্ডের চৌকির কাছে এসে লোরেন ওর নতুন আদেশ জারি করল, কয়েকবার করে বলে বলে তারপরে আবার গার্ডদের নির্দেশনার পাতায়ও লিখে রাখালো। সুড়ঙ্গে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্তদের তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হলো র‍্যাল আর স্যালির নাম। পরে রাতের খাওয়ার সময় ওদেরকে জানিয়েও দিল ব্যাপারটা। ওদেরকে বলল যে আমি আর ও দুজনে মিলে একটা নতুন ধরনের নিরীক্ষা চালাতে চাচ্ছি। সেদিন সন্ধ্যাটা খুব জটিল হয়ে গেল আমার জন্য। সারা দিনের ঘটনায় অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে ছিলাম, এখন যখন আমার এতদিনকার উদাসী ভাবটা অবশেষে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম, তখন নিত্যদিনের সাধারণ বিষয়েও অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে লাগলাম। অকারণে জোরে জোরে হাসতে লাগলাম, গলা পর্যন্ত মদ খেলাম আর আমার ভেতরে জ্বলতে থাকা ঈর্ষার আগুন ফিরে এসে অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে তীব্রভাবে জ্বলতে লাগল।

যখন লোরেন আর স্যালি দুজনে দুজনের দিকে ওভাবে তাকাতে লাগল, আমার ইচ্ছা করতে লাগল ওদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলি, “আমি জানি। সব জানি আমি। শালা হারামিরা, ঘেন্না করি আমি তোমাদেরকে।”

কিন্তু আবার টের পেলাম যে কথাটা সত্যি না। আমি ওদেরকে ঘৃণা করি না। আমি ওদের দুজনকেই ভালোবাসতাম, এটাই বরং এই কষ্ট বহন করা আরও কঠিন করে দিচ্ছে।

সেদিন রাতে আর একটা ফোঁটাও ঘুম এল না। যখন আমি এরকম নির্দিষ্ট কোনো মানসিক অশান্তিতে ভুগি, তখন দেখা যায় যে দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত চলে যাচ্ছে আমার অতিরিক্ত গরম মাথাটা কোনোভাবেই আর ঠান্ডা করতে পারছি না। আমি চাচ্ছিলাম না যে ওর উপর গোয়েন্দাগিরি করতে। কিন্তু কাকতালীয়ভাবেই স্যালি যখন ওর নিজের কুঁড়ে থেকে বের হলো, তখন আমি আমার কুঁড়ের জানালায় দাঁড়িয়ে, অন্ধকার ঘর থেকে বাইরে পূর্ণিমার আলোয় উদ্ভাসিত রাতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

ওর পরনে ছিল একটা লম্বা ফ্যাঁকাসে রঙের ড্রেসিং গাউন, ছেড়ে রাখা চুল দেখে মনে হচ্ছিল কাঁধের উপর কালো মেঘ জমে আছে। ও নিজের কুঁড়ের দরজায় থেমে দাঁড়িয়ে চারপাশে দেখে নিল একবার, ক্যাম্পের বাকি

সবাই যে ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিত হয়ে নিল সে ব্যাপারে। তারপর চোরের মত, দ্রুত পা ফেলে পূর্ণিমার আলোয় উদ্ভাসিত সামনের খোলা উঠোন পেরিয়ে লোরেন যে কুঁড়েতে আছে সেদিকে এগিয়ে গেল। কোনো রকম ইতস্তত না করেই ও দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। আর শুরু হলো আমার আরও একটা যন্ত্রণাকাতর নিশিযাপন।

দুই ঘণ্টা আমি দাঁড়িয়ে রইলাম জানালার সামনে, চাঁদের আলোয় ছায়াগুলো আকৃতি বদলাতে লাগল, তারাগুলোর নকশা পরিবর্তিত হয়ে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে, তারাগুলো এত বেশি বিশাল আর উজ্জ্বল শুধুমাত্র এরকম বিজন প্রান্তরের পরিষ্কার বাতাসেই দেখা সম্ভব। কিন্তু আজ রাতে এই সৌন্দর্যের কিছুই ধরা পড়ল না আমার কাছে। আমি তাকিয়ে ছিলাম লোরেনের কুঁড়ের দিকে, কল্পনা করছিলাম প্রতিটা ফিসফিস করে বলা কথা, প্রতিটা স্পর্শ, প্রতিটা নড়া-চড়া, নিজের প্রতিই ঘেন্না ধরে গেল তখন। হিলারি আর ওর বাচ্চাদের কথা খেয়াল এল আমার। ভাবতে লাগলাম যে কোন ভূতে পেলে মানুষ সামান্য সময়ের কিছু আলগা সুখের জন্য তার সবকিছু নিয়ে এভাবে জুয়া খেলতে পারে। ওই কুঁড়ের ভেতর ওরা দুজন কত জনের সাথে যে বেঈমানি করছে সেটা হিসেব করতে গেলে কষ্ট হবে, কত জনের আনন্দকে যে ওরা ঝুঁকির মুখে ফেলে দিচ্ছে!

তারপর হঠাৎ মনে হলো, আমি ধরেই নিচ্ছি যে এই সম্পর্কটা আসলে লোরেন শুধু খেলা হিসেবেই নিচ্ছে, এমনও তো হতে পারে যে ও আসলে সিরিয়াস। আর হয়তো ও হিলারিকে ছেড়ে স্যালিকেই গ্রহণ করবে। আর সেই চিন্তাটা আরও বেশি চেপে বসল আমার বুকে। আমার পক্ষে আর ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না, আমার মন সরাতে হবে...তাই দ্রুত কাপড় পাল্টে সংগ্রহশালার দিকে ছুটলাম।

রাতের পাহারাদার ঘুম ঘুম চোখে স্বাগত জানালো আমাকে, দরজার তালা খুলে স্বর্ণের বই রাখা কক্ষটায় গিয়ে ঢুকলাম। তারপর হুইয়ের চার নম্বর বইটা বের করে নিয়ে চলে এলাম নিজের অফিসে, তবে বসার আগে এক বোতল গ্লেন গ্রান্টও নিয়ে এলাম। আমার দুটো নেশা, ভাষা আর হুইস্কি।

আমি আন্দাজে লিপিটার একটা পাতা খুলে আবারও যুদ্ধ কুঠারটার প্রতি লেখা হুইয়ের গীতিকাব্যটা পড়তে লাগলাম, যেটাকে উনি বলেছেন–*সূর্যের পাখির জ্বলজ্বলে ডানা*। পড়া শেষ হলে কেমন একটা ঘোরের ভেতর চলে গেলাম আমি, বিশাল কুঠারটা ওটার জায়গা থেকে নামিয়ে নিয়ে এলাম। ওটার চকচকে শরীরে হাত বুলালাম, নতুন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম জিনিসটাকে। এটাই যে কবিতায় বর্ণিত ওই অস্ত্রটা সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না। ওখানের বর্ণনার সাথে নিখুঁতভাবে মিলে যায় এরকম আরেকটা কী আছে? আমি ওটাকে কোলের উপর রেখে দিলাম, মনে মনে

ভাবছিলাম এটার কাছ থেকে যদি ওপেটের শেষ দিনগুলোর ঘটনাবলি বের করতে পারতাম। অস্ত্রটা যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত, সেটা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম, কিন্তু কেন এটাকে এভাবে অবহেলায় ফেলে রেখে যাওয়া হলো? এত ভালোবাসার একটা জিনিস এমন অযত্নে প্রায় ২,০০০ বছর ধরে অনাদরে পড়ে থাকলো? কুঠারবাহক হুইয়ের কী হলো? উনার রাজা আর উনার শহরের?

আমি পড়তে পড়তে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। স্যালি আর লোরেনের চিন্তা আর মাথায় এল না। কিন্তু প্রতিবার পড়া থামাতেই ওরা ঈর্ষার চোরা স্রোতের মতই আমার ভাবনায় আসতে লাগল, অসহায় লাগতে লাগল আমার। বর্তমান আর সুদূর অতীতের টানাটানিতে ছিন্নভিন্ন হতে লাগলাম আমি।

পড়তে পড়তে লিপির যে সকল জায়গা এখনও অস্পষ্ট বা আমরা জানি না, সেসব জায়গা চিহ্নিত করতে লাগলাম। হুইস্কির বোতলের উচ্চতা কমতে লাগল ধীরে ধীরে আর কেটে যেতে লাগল দীর্ঘ রাতটাও।

একসময় রাতটা শেষ হয়ে নতুন দিনের জন্ম হতে লাগল, এমন সময় কাব্যের ছোট্ট একটা অংশ আমার নজরে এল, আমার ভেতরের নতুন গভীরতার একটা উপলব্ধিতে স্পর্শ করল সেটা। হুই আচমকাই তার অন্তরাত্মার গভীর থেকে হৃদয় নিংড়ে ক্রন্দনের কথা লিখেছেন। ব্যাপারটা ঠিক যেন দীর্ঘদিন চেপে রাখা কোনো আবেগ আর ধরে রাখতে পারছিলেন না উনি, সেটা বের করে দিয়ে এই নিবেদন করছেন যে, যেন তার মূল্য বিচার করার সময় তার শারীরিক গঠনকে আমলে না নেওয়া হয়। পায়ের নিচের নিকৃষ্ট মাটির ভেতর থেকেই খাঁটি সোনার জন্ম হয়, হুই-ও কাঁদতে কাঁদতে এখানে বলছেন যে ওনার বিকৃত কাদামাটির ভেতরেও গুপ্তধন লুকানো আছে।

আমি প্রায় ডজনখানেক বার পড়লাম অনুচ্ছেদটা, আমার অনুবাদ ঠিক আছে কিনা সেটা কয়েকবার পরখ করে দেখার পরে নিশ্চিত হলাম যে, হুই বেন-আমন ছিলেন আমার মতই একজন বিকলাঙ্গ!



স্বর্ণের বইটাকে আবার জায়গামতো রেখে বেরিয়ে এসে দেখি ভোরের প্রথম কিরণ পাহাড়চূড়ার আবছায়ার ধার বরাবর ফ্যাকাসে গোলাপি রঙে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে। আমি ধীর পায়ে আমার কুঁড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

স্যালি লোরেনের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারের ভেতর সোজা আমার দিকেই এগিয়ে এল। ওর গাউনটা ভৌতিকভাবে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে,

ওকে দেখে মনে হলো ভেসে ভেসে এগোচ্ছে মাটির উপর। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে পড়লাম, আশা করছিলাম যেন ও আমাকে না দেখে। সম্ভাবনা আছে যে আমি ওর কুঁড়ের বেশি অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে ফিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

মাটিতে স্যালির জামা ঘষটানোর আওয়াজ পেলাম আমি, খুব কাছেই অন্ধকারে ধুলোর উপর ওর পা চলার মৃদু আওয়াজ এল কানে, তারপরেই আমার উপর চোখ পড়তেই ও শব্দ করে দম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি ফিরে তাকালাম ওর দিকে। ও আমাকে দেখলেও বুঝতে পারেনি যে ওটা আমি। চেহারা ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে, হাত দিয়ে চেপে রেখেছে মুখ।

"ভয় পেয়ো না, স্যালি," বললাম আমি। "আমি।"

ওর ঘ্রাণও পাওয়া শুরু করলাম এরপরে। মরুভূমির রাতের পরিষ্কার বাতাসে যে সুবাসটা ভেসে আসছে তাতে মনে হচ্ছে গোলাপের পাঁপড়ি পিষে, সাথে ঘাম আর প্রেমের উষ্ণ সুগন্ধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো আমার।

"বেন?" ডাকলো ও, আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলাম। "আপনি কতক্ষণ ধরে আছেন এখানে?"

"যথেষ্ট সময়," জবাব দিলাম আমি, আবারও নামলো নীরবতা।

"আপনি তো তাহলে জানেন?" খুবই নিচু স্বরে বলল ও কথাটা, লজ্জা আর দুঃখ মেশানো।

"আমি গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি," বললাম আমি, আবারও চুপ হয়ে গেলাম দুজন।

"আমি সেটা জানি," বলে ও চলে যেতে গেল। তারপর আবার ফিরে এল। "বেন, আমি আপনাকে সব খুলে বলতে চাই।"

"সেটার কোনো প্রয়োজন নেই," বললাম আমি।

"হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে। আমি বলতে চাই।"

"তাতে আর কিছু আসে যায় না, স্যাল।"

"আসে যায়।" আমরা দুজন দুজনের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। "আসে যায়," আবার বলল ও। "আমি চাই না যে আপনি ভাবেন যে, আমি, মানে, আমি এত বাজে একটা মানুষ।"

"বাদ দাও, স্যালি," বললাম আমি।

"আমি এরকম করতে চাইনি, বেন। কসম করে বলছি।"

"ঠিক আছে, স্যালি।"

"আমি আসলে পারিনি, সত্যিই। অনেক চেষ্টা করেছি আটকানোর। আমি চাইনি এরকম কিছু ঘটুক।" ও কাঁদতে শুরু করল, নিঃশব্দে, ফোঁপানোর তালে ওর কাঁধ ঝাঁকি দিতে থাকলো।

"এসব কোনো ব্যাপার না," বলে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ওকে ধরে ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। আলোয় দেখতে পেলাম চুমুর চোটে ওর ঠোঁটটা কীরকম ফুলে আছে।

"ওহ, বেন, এরকম না হওয়ার জন্যে আমি যে কোনো কিছু করতে রাজি ছিলাম।"

"আমি জানি, স্যালি।"

"অনেক চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু পারিনি। উনি যেন আমাকে কোনো জাদু মন্ত্র দিয়ে বশ করে ফেলেছিলেন, একদম প্রথম দেখা থেকেই।"

"এয়ারপোর্টের সেই সন্ধ্যায়?" আমি প্রশ্নটা না করে থাকতে পারলাম না, কারণ ওইদিন প্রথম দেখায় ও লোরেনের দিকে কীভাবে তাকিয়ে ছিল আর পরে ওর নামে কী কী আজেবাজে কথা বলেছিল সেসব মনে পড়ল আমার।

"সেজন্যই–পরে, আমার সাথে–সেজন্যই আমরা–" আমার আর উত্তরটা শুনতে ইচ্ছে হলো না, কিন্তু আমার জানা প্রয়োজন যে ও আসলে প্রথম আমার কাছে এসেছিল আরেকজন মানুষের চিন্তায় উদ্দীপ্ত হয়ে কিনা।

"না, বেন।" ও কথাটা অস্বীকার করতে চাইলো, কিন্তু আমার চোখের দিকে চোখ পড়ল ওর, ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। "ওহ, বেন। আমি স্যরি। আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি।"

"আচ্ছা," মাথা ঝাঁকালাম আমি।

"আমি সত্যিই কষ্ট দিতে চাইনি। আপনি এত ভালো, এত ভদ্র, ওনার চাইতে একদমই আলাদা।" ওর চোখের দৃষ্টিতে নিদ্রাহীনতার গাঢ় ছায়া পড়েছে, গালের পীচ-রঙ্গা তুলতুলে ভাবটা উঠে গিয়েছে লোরেনের না কামানো গালের ঘষায়।

"আচ্ছা," বলতে গিয়ে হৃৎপিণ্ড দুমড়ে মুচড়ে গেল আমার।

"ওহ, বেন, কী করবো আমি?" অসহায়ের মত কেঁদে দিল ও। "আমি এমনভাবে ফেঁসে গিয়েছি, পালাতেও পারছি না।"

"লো–কিছু বলেছে নাকি যে ও কী করবে? ও কি তোমাকে বলেছে...যে...মানে, ও হিলারিকে ছেড়ে দিয়ে তোমাকে বিয়ে করবে?"

"না," স্যালি মাথা নাড়তে লাগল।

"কেন সেটার কোনো কারণ কি–"

"না! না!" আমার হাত টেনে ধরলো ও। "ওহ, বেন, এই সবই ওনার কাছে মজা। ছোট্ট একটা রোমাঞ্চ।"

কিছু বললাম না আমি। স্যালির অনিন্দ্য সুন্দর পীড়িত মুখটা দেখে এটা জেনে অন্তত খুশি হলাম যে লোরেনকে চিনতে পেরেছে ও। বুঝতে পেরেছে যে লোরেন হচ্ছে শিকারি আর ও হচ্ছে শিকার। লোরেনের জীবনে এরকম স্যালি অনেক এসেছে, সামনেও আরও আসবে। সিংহের স্বভাবই হলো নিয়মিত শিকার করা।

“আমার কি কিছু করার আছে, স্যালি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম অবশেষে।

“না, বেন। আমার তা মনে হয় না।”

“যদি কিছু লাগে, তো বলবে আমাকে।” বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

“বেন,” আমাকে থামিয়ে দিল ও, তারপর উঠে বসে বলল। “বেন, আপনি কি এখনও আমাকে ভালোবাসেন?”

অনিশ্চিতভাবে মাথা ঝাঁকালাম আমি। “হ্যাঁ, এখনও ভালোবাসি।”

“থ্যাংক ইউ, বেন,” ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। “আপনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি সেটা নিতে পারতাম না কোনোভাবেই।”

“সেটা আমি কখনোই করবো না, স্যালি,” বলে আমি বাইরে সূর্যের সবুজাভ গোলাপি আভার ভেতর বেরিয়ে এলাম।



লোরেন আর আমি সূর্যের প্রতিকৃতিটার পেছনের সিঁড়ি ধরে নেমে এলাম নিচে। প্রথমে আমরা গেলাম গুপ্তধনের কক্ষটায়। ওখানে লোরেন জুলজুল করে তাকিয়ে রইলো স্বর্ণের আঙুলগুলোর দিকে, আমি তাকিয়ে রইলাম ওর চেহারার দিকে। ঘুম কম হওয়ার কারণে মাথা হালকা হয়েছিল, গলার পেছনটায় রাতভর খাওয়া মদের ঝাঁজ টের পাচ্ছিলাম তখনও। লোরেনের দিকে তাকিয়ে ওর জন্য আমার ভেতরে ঘৃণা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সফল হলাম না। যখন ও মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, আমিও জবাবে না হেসে পারলাম না।

“এটা তো থাকবেই, বেন,” বলল ও। “চলো গিয়ে অন্য পথটা ধরে দেখে আসি।”

সুড়ঙ্গের সংযোগস্থলের ওপারে কী পাওয়া যাবে সেটা আমি আগেই অনুমান করে রেখেছিলাম, আমরা ওই প্যাঁচানো সিঁড়িগুলো বেয়ে নিচে নেমে এসে আরেকটা ছোট গলির সামনে এসে পৌঁছাতেই আমার সব সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেল।

গলিটা শেষ হলো আরেকটা নিরেট পাথরের দেওয়ালের সামনে গিয়ে। এখানে অবশ্য কিছু লুকিয়ে রাখার কোনো প্রয়াসই চালানো হয়নি, বরং পাথরে খোদাই করা একটা লিপি সাটানো আছে দেওয়ালে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম ওটার সামনে, লোরেন লাইটটা ধরলো ওটার উপর।

"কী লেখা এখানে?" জিজ্ঞেস করল ও।

আস্তে আস্তে লিপির পুরোটা পড়লাম আমি। এতবার অনুশীলনের পরেও পড়ার গতি খুব বেশি হলো না, কারণ পিউনিকে স্বরবর্ণের জন্য কোনো আলাদা প্রতীক নেই আর বাক্যে প্রতিটা শব্দের প্রাসঙ্গিক ব্যবহার থেকে সেটা অনুমান করে নিতে হয়।

"কী হলো?" লোরেন অধৈর্য হয়ে বিড়বিড় করতে লাগল।

"যে এখানে এসেছো ওপেটের রাজাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাদের সমাধিকে অপবিত্র করতে, যে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবে। অ্যাসটার্টে আর মহান বাআলের অভিশাপ তাদেরকে কবর পর্যন্ত তাড়া করে ফিরবে।"

"আবার পড়ো," আদেশ করল লোরেন, আমি আজ্ঞা পালন করলাম। শুনে মাথা ঝাঁকালো ও।

"আচ্ছা," বলল ও, তারপর হাতড়াতে শুরু করল পাথরের দরজাটা। কব্জার মত কিছু একটা খুঁজছে, যেটায় চাপ দিলে দরজাটা সরে যাবে বা ঘুরবে। তবে সূর্যের দরজাটার মত এতটা ভাগ্যবান হলাম না আমরা এখানে। প্রায় দুই ঘণ্টা পরেও দেখা গেল সামনের নিরেট পাথরের দেওয়ালটা আমাদের পথ আটকে অটল দাঁড়িয়ে আছে।

"বালের দরজাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেব আমি," হুমকি দিল লোরেন, তবে আমি জানি যে এরকম পবিত্র একটা জায়গায় এতটা হঠকারী কিছু করতে যাবে না ও। আমরা বিশ্রাম নিতে নিতে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করলাম কিছুক্ষণ, তারপর আবার ফিরে এলাম দরজার সামনে। এখানেও নিশ্চয়ই কোনো সাদাসিধে ঘোরানোর প্রক্রিয়াই থাকবে, তবে সেজন্য চাপ দেওয়ার জায়গা আর কোন দিকে ঘোরাতে হবে সেটা বের করতে হবে।

অবশেষে যখন সেটা খুঁজে পেলাম, তখন নিজের বেকুবির জন্য মনে মনে গালাগাল করলাম নিজেকে। প্রথম প্রচেষ্টাতেই এটা পারা উচিত ছিল। সূর্য দেবতা বাআলের নামের যে প্রতীকটা, সেটাই এখানেও চাপ দেওয়ার জায়গা হিসেবে রাখা হয়েছে।

দরজাটা ঘুরে খুলে গেল, ধীরে ধীরে, বিশাল ওজনটা সামলে, আমরা ওপেটের রাজাদের সমাধির ভেতরে প্রবেশ করলাম।

এরকম পরিবেশের আরেকটামাত্র জায়গাই জানা আছে আমার। ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে, যেখানে ইংল্যান্ডের রাজাদের সবার সমাধি আছে। এখানেও কেমন একটা সময় বয়ে যাওয়ার আর ইতিহাস পুনর্জন্মের চাপা ভাব ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

লম্বা সরু সমাধিটার ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলাম আমরা, দুজনের কেউই কিছু বলছি না। এই নিঃসীম নীরবতা আমার কানের পর্দার উপর প্রচণ্ড

পীড়াদায়ক চাপ সৃষ্টি করছিল। পরম নিস্তব্ধতা, এতটাই সম্পূর্ণ যে মনে হলো অলক্ষুণে আর ভয়ানক। এখানের বাতাসও দীর্ঘদিন আটকে পড়ে আছে, কিন্তু আরও বেশি ভারি আর ঝাঁঝালো। আমার মনে হলো, ধুলো আর মাশরুমের খুবই হালকা একটা গন্ধ পাচ্ছি যেন।

প্রতিটা দেওয়াল ভরাবর, ওটার সমান্তরালে, ওপেটের রাজাদের পাথরের শবাধার সাজানো। বিশাল বিশাল গ্রানাইটের চাঁই কুদে বানানো হয়েছে ওগুলো। নিরেট, খাটো আর ধূসর। উপরে ঢাকনাগুলো ওদের নিজেদের প্রচণ্ড ওজনের কারণেই জায়গামতো আটকে আছে। উপরে দিকটা ঘষে মসৃণ করে ভেতরের লাশের নাম আর শারীরিক বর্ণনা লিখে রাখা হয়েছে। এই মহান লোকগুলোর নাম হুইয়ের স্বর্ণের বই জুড়ে বারবার এসেছে। আমি চিনতে পারলাম তাদেরকে, হামিলকার, হানিবাল, হাইকানাস। সাতচল্লিশটা মস্ত কফিন, কিন্তু শেষেরটা খালি, ঢাকনাটা ওটার পাশের দেওয়ালে ঠেকনা দিয়ে রাখা। শবাধারের ভেতরটা একজন মানুষের আকৃতিতে খোদাই করা, ওপেটের শেষ রাজাকে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত।

বিশাল পাথরের কফিনটার গোঁড়ায়, সমাধির মেঝেতে টানটান হয়ে চিত হয়ে পড়ে আছেন একজন মানুষ। মাথায় কোনো শিরস্ত্রাণ নেই আর পুরো শরীর চিমসে গিয়ে মমির মত হয়ে গিয়েছে, তবে তার লালচে সোনালি চুল আর দাঁড়ির কারণে অতোটা বিকট লাগছে না দেখতে। বুকের বর্ম সরিয়ে ফেলায় টিংটিঙে বুকের খাঁচার উপর লেপ্টে থাকা, শুকিয়ে পার্চমেন্টের মত হয়ে যাওয়া চামড়া দেখা যাচ্ছে। সেই বহু আগেই মারা যাওয়া বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে একটা তীরের ভাঙা দণ্ড। চামড়ার একটা বর্ম পরনে তার, ব্রোঞ্জের তৈরি ফুল বসিয়ে নকশা কাটা সেখানে; হাঁটুর আবরণীও ব্রোঞ্জের তৈরি, পায়ে হালকা চপ্পল।

লোকটার দুই হাত ছড়িয়ে আছে দুই পাশে, দুই গোড়ালি একসাথে করা। মৃতদেহটা খুবই যত্নে আর অবশ্যই ভালোবেসে এভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে।

তার উপরেই উবু হয়ে আছে আরেকটা অবয়ব, প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। এই অবয়বটা অবশ্য সম্পূর্ণ বর্মে আচ্ছাদিত, তবে শিরস্ত্রাণ আর বুকের বর্ম খুলে শবাধারের পাশে মেঝেতে রাখা। লম্বা কালো চুল সামনের দিকে ঝুলে ঢেকে রেখেছে তার ঝুঁকে থাকা মুখটাকে। দুই হাত একসাথে মুঠো করে তার পেটের মাঝ বরাবর চেপে ধরে আছে। তার বুকের ভেতর থেকে তখনও বের হয়ে আছে একটা তরবারির ফলা, উল্টো দিক থেকে ঢুকেছে শরীরে, তরবারির হাতল শক্তভাবে আটকে আছে মেঝের পাথরের উপরে, চোখা মাথাটা বুকের হাড়ের ঠিক নিচ দিয়ে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো অঙ্গকে গেঁথে ফেলেছে।

লোকটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে সে চিরমুক্তি লাভের জন্যেই করেছে এমনটা, একজন লোক যে কিনা চরম হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে নিজেই নিজের শরীরে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়েছে। অস্ত্রটা এত বছর ধরে তার ওজন বহন করেই যাচ্ছে, এরকম হাঁটু মোড়া অবস্থাতেই বসিয়ে রেখেছে তাকে।

এই সুপ্রাচীন বিয়োগাত্মক মূকনাট্যের কাছে এগিয়ে গিয়েও, লোরেন বা আমি কেউই কোনো কথা বলতে পারলাম না। এই শুকিয়ে চিমসে মারা মানুষের খোসা দুটোর পরিচয়ের ব্যাপারে অবশ্য কোনো সন্দেহ ছিল না আমার।

লানন হাইকানাস, ওপেটের সর্বশেষ রাজা, টানটান হয়ে শুয়ে আছেন ঠান্ডা পাথুরে মেঝেতে। আর ওনার উপরে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন তার বন্ধু আর সর্বোচ্চ পুরোহিত, হুই বেন-আমন।

নিয়তির এক অমোঘ অনুভূতিতে গলার কাছটা ধরে এল আমার, সেই সাথে হুই বেন-আমনের জন্য একটা ঠান্ডা পীড়াদায়ক কষ্ট উথলে উঠলো বুকের ভেতর–কারণ দেবতাদের কুঠারের বাহক ছিলেন একজন *কুঁজো*।

ওনার চেহারা দেখার ইচ্ছা হলো আমার। দেখতেই হবে! আমি ছুটে গেলাম সামনে, তারপর তার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসলাম।

ওনার হাড় জিরজিরে কাঁধটা স্পর্শ করলাম আমি, ফিনফিনে হলদেটে লিলেনের কাপড় দিয়ে শরীরটা ঢাকা। সামান্য পলকা ছোঁয়া, নিঃশ্বাসেও এর চাইতে কম জোর থাকে, কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট ছিল এই নাজুকভাবে আটকে থাকা মমিটাকে ধ্বসিয়ে দেওয়ার জন্য।

হুই বেন-আমনের মৃতদেহ সামনের দিকে পিছলে গিয়ে রাজার দেহের উপর আছড়ে পড়ল। মেঝেতে পড়ে ইস্পাত ও ব্রোঞ্জ ঝনঝন করে উঠে, এই আবদ্ধ সমাধির ভেতরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সংঘর্ষে দুটো লাশই ধুলোয় পরিণত হলো, সরিষা-হলুদ রঙের ধুলোর নরম হলুদ বিস্ফোরণ, লাইটের আলোয় ধোঁয়ার মত পাক খেতে খেতে উপরের দিকে উঠতে লাগল। ধাতব বর্ম আর তরবারি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রইলো না তাদের, মিহি ধুলোর পুকুরের ভেতর সোনালি আর কালো কয়েক গোছা চুল ভাসতে লাগল যেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম, হলুদ ধুলোয় দম আটকে আসছে। বিস্ময়ে চোখ বড়বড় হয়ে ভরে গিয়েছে জলে, সাথে ধুলো ঢুকে জ্বলতে আরম্ভ করল। ধুলো থেকে মাশরুমের গন্ধ আসছে।

লোরেন স্টারভেসান্ট আর আমি দুজন দুজনের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম। আমরা মাত্রই একটা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।



দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করতে করতে জেগে উঠলাম আমি। রক্ত, আগুন আর ধোঁয়ায় ভরা স্বপ্ন, চকচকে কালো কালো চেহারা আর ঘামে সিক্ত দেহগুলো ঘিরে রেখেছে আগুনের লেলিহান শিখা, মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তচিৎকার আর রক্তপিপাসু কিছু কণ্ঠের জান্তব উল্লাস। হাফাতে হাফাতে উঠে বসলাম আমি, স্বপ্নটা মনে হতেই আবার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আর সেই ভয়াবহ আতংক নীরব রাতে আমার নিস্তব্ধ কুঁড়েতে আরও অনেকক্ষণ ব্যাপী একাকী সঙ্গ দিয়ে গেল আমাকে।

বিছানার পাশের বাতি জ্বেলে ঘড়ির দিকে তাকালাম আমি। তখনও তেমন রাত হয়নি, এগারোটা বাজতে সামান্য বাকি। গায়ের চাদর সরিয়ে নেমে দাঁড়ালাম, অবাক হয়ে দেখি আমার পা কাঁপছে, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে খানিকটা। প্রতিবার শ্বাস নিতে গেলেই মনে হচ্ছিল বুকের ভেতর পিন ঢুকে যাচ্ছে বুঝি। চোখের পেছনেও ভোঁতা যন্ত্রণা। গা গরম লাগছে, জ্বর এসেছে সম্ভবত। আমি কুঁড়ের অন্যপাশে হাতমুখ ধোঁয়ার জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলাম, ওখান থেকে অ্যাসপিরিনের বোতল থেকে তিনটা চালান করে দিলাম মুখে। মুখ ভর্তি পানি নিয়ে গিলে ফেললাম ওগুলো, সাথে সাথেই ফুসফুসের ভেতরের অস্বস্তিটা বেড়ে গেল আরও! এমনভাবে কাশতে শুরু করলাম যেন দিনে ষাটটা সিগারেট খাই, কাশির চোটে সারা শরীর ঘেমে কাঁপতে শুরু করল, মনে হলো হাতের চামড়ায় আগুন ধরে গিয়েছে বুঝি।

ঠিক কী কারণে জানি না, দরজার পেছনের আঙটা থেকে ড্রেসিং গাউনটা নামিয়ে, পরে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরের উঠোনে। আকাশে অর্ধেক চাঁদ উঠেছে, শিংঅলা আর হলুদ দেখতে। গাছ আর ঘরগুলোর আশপাশের ছায়া খুবই ঘন আর বিশ্রী দেখাচ্ছে। আমার অফিসের দিকে ছুটে যেতে যেতে টের পেলাম–দুঃস্বপ্নটার দীর্ঘস্থায়ী ভয় আর আতঙ্কটা এখনও চেপে আছে আমার উপর, চিন্তিত হয়ে নিজের দিকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। রাতের বাতাসে খুবই সামান্য ধোঁয়ার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, সেটাতেও সমস্যা হতে লাগল আমার। নাক টেনে শুঁকে দেখলাম সেটা, ফুসফুসের গভীরে সেটার হালকা কামড় টের পেলাম।

নিজের অফিসের দরজায় পৌঁছে গেলাম আমি। তবে মনে হলো, ভবনটার পাশের গভীর অন্ধকারে কিছু একটা ওঁত পেতে আছে আমার জন্য। চোখের কোনা দিয়ে সেটাকে আমি আমার দিকে ছুটে আসতে দেখলাম,

একটা বিশাল কালো জিনিস, গোলাকার, আকৃতিবিহীন আর মৃত্যুর মত নিঃশব্দ। ওটার মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, কিন্তু ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়লাম কুঁড়ের দরজার উপর, ভয়ের চোটে কি করবো বুঝছিলাম না। একটা চিৎকার আমার গলার কাছে উঠে এসেও মিলিয়ে গেল আবার, কারণ সামনে নেই কিছুই। চলে গিয়েছে সেটা। পুরো ব্যাপারটাই ছিল আমার কল্পনা কিন্তু মাথায় এমন যন্ত্রণা শুরু হলো যে মনে হলো কেউ ভেতরে হাতুড়ি দিয়ে নেহাই পেটাচ্ছে।

দরজাটা খুলে হুড়মুড় করে অফিসের ভেতরে ঢুকেই দড়াম করে আটকে দিলাম আবার। এক অজানা আর যুক্তিহীন আতঙ্কে মরার দশা হয়েছে। বাইরে থেকে দরজায় আঁচড় কাটতে লাগল কিছু একটা, একটা গা শিউরানো জান্তব আওয়াজ যা আমার টানটান হয়ে থাকা স্নায়ুকে ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করল।

আমি দরজা থেকে দূরে সরে, ডেস্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে, ওটার পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে বসে কাঁপতে লাগলাম, খুবই দুর্বল লাগছিল আমার।

আবারও শোনা গেল শব্দটা, তবে এবার আমার পাশের দেওয়াল থেকে, আমি ঘুরে গেলাম ওটার দিকে, টের পেলাম–নাকি সুরে কাঁদতে শুরু করেছি!

একটা অস্ত্র দরকার, মরিয়া হয়ে চারপাশে তাকাতেই, ডেস্কের উপরে ঝোলানো হুইয়ের বিশাল যুদ্ধ কুঠারটা চোখে পড়ল আমার। ঝট করে ওটাকে নামিয়ে, এক কোনায় সরে গিয়ে, আক্রমণের ভঙ্গিতে বুক বরাবর তুলে ধরে দাঁড়ালাম আমি। তারপরেই শুরু হলো কাশি।

আমার ডেস্কের উপর এক তা সাদা কাগজ পড়ে ছিল। ওটা নড়ে উঠতেই মনে হলো–আমার সারা শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। কাগজটার চৌকো আকৃতি কাঁপতে কাঁপতে এদিক সেদিক নড়া-চড়া করতে লাগল, আকার পরিবর্তন হয়ে গেল ওটার, তারপর হেঁটে বেড়াতে লাগল আমার সারা ডেস্ক জুড়ে, সাদা রঙের বাদুড়ের মত পাখা গজালো দুদিক দিয়ে। তারপর আচমকাই ওটা উড়তে শুরু করল, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ছুটে এল সোজা আমার চেহারা বরাবর। ওটার হাঁ করা মুখের ভেতরে খেয়াল হলো আমার, ভ্যাম্পায়ারের মত সূচালো দাঁত দিয়ে ভরা পুরো চোয়াল, আক্রমণের সাথে সাথে ওটার গা শিউরানো কিচকিচ আওয়াজও কানে এল আমার। আতংকে চিৎকার করে উঠে কুঠারটা দিয়ে কোপাতে শুরু করলাম। সাদা জিনিসটা এদিক সেদিকে নড়ে-চড়ে আমার গলা আর চেহারায় এসে বাড়ি খেতে লাগল, আমি লড়াই করতে করতে ওটার গায়ে আঘাত করে যেতেই লাগলাম, বাড়ি মেরে ওটাকে ফেলে দিলাম মেঝেতে, তখন ওটা বুকে ভর দিয়ে জঘন্যভাবে একেবেঁকে সামনে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি কুঠারটার ফলা বসিয়ে দিলাম ওটার উপর, সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা থেকে

পিচকারির মত কালো রক্ত বেরিয়ে এসে কুঁড়ের কাঠের মেঝেতে ছোট একটা পুকুর তৈরি করল।

জিনিসটা থেকে দূরে সরে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসলাম আমি। দুর্বল লাগছিল আমার, প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি। কাশতে আরম্ভ করলাম আবার। কাশির দমকে পুরো শরীর একসাথে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল, দুলতে লাগলাম আমি, দেওয়ালের গায়ে বাড়ি লাগতে লাগল শরীর। কাশতে কাশতে চোখের সামনে সব উজ্জ্বল আলোর ধাঁধা দেখতে লাগলাম একসময়, মুখের মাঝে টের পেলাম একটা নোনতা মিষ্টি স্বাদ।

আমি দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে মাথা দুই হাঁটুর ভেতর গুঁজে বসে রইলাম, মুখ ভরে আছে ভেজা ভেজা উষ্ণ কিছু একটায়, থু করে ফেলতেই দেখি একদলা তাজা রক্ত ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে, কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছি না কিছুই। হাত মুখের কাছে নিয়ে ঠোঁটজোড়া মুছলাম। হাত সরাতেই দেখি রক্তে ভরে আছে।

ঠিক তখন বুঝলাম যে আসলে ঘটছে কী। লোরেন আর আমি ওই মাটির নিচের সমাধির ২,০০০ বছর ধরে বন্ধ থাকা দুটো মোহর বসানো দরজা পার হয়েছি–সেখানেই ফারাওদের অভিশাপ, ক্রিপ্টোকক্কাস নিউরোমাইসিস-এর রেণুভরা বাতাসে শ্বাস নিয়েছি আমরা।

যথা সময়ে সাবধানতা না নেওয়ার জন্য এখন আর আফসোস বা নিজেকে বকাবকি করে লাভ নেই। যেহেতু আর্কাইভটা নিরাপদ ছিল, তাই ধারণা করেছিলাম যে বাকিগুলোও সেরকমই হবে। অতিরিক্ত আগ্রহ আর উত্তেজনার কারণে ছত্রাকের এই বিপদটা নিয়ে আর একবারও চিন্তা আসেনি মাথায়, এমনকি যখন লোরেন আর আমি দরজার মোহরগুলো নিয়ে আলাপ করছিলাম বা রাজাদের সমাধিতে যখন বাতাসে মাশরুমের গন্ধ পেয়েছিলাম, তখনও না।

এখন আমার ফুসফুস ভরে আছে জ্যান্ত ছত্রাকের ভয়ানক বসতি দিয়ে, আমার ভেতরেই আরেকটা জীবিত জিনিস বেড়ে উঠছে, আমার শরীরের নরম টিস্যুগুলোকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে, বিনিময়ে রক্তে ঢেলে দিচ্ছে বিষ যা চলে যাচ্ছে আমার মস্তিষ্কে।

“চিকিৎসা,” হাফাতে হাফাতে নিজেকে বললাম আমি। “যাও চিকিৎসা নাও।” টলতে টলতে আমার বুকশেলফের দিকে এগিয়ে গেলাম। বইয়ের দাঁড়গুলো পড়ে দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সেগুলো ছোট ছোট পোকায় রূপান্তরিত হয়ে হেঁটে চলে গেল একদিকে। আচমকা একটা বিচিত্র রঙের সাপ প্যাঁচ খুলে মাথা নামিয়ে দিল সবার উপরের তাক থেকে, তারপর ছোবল দিল আমার চেহারা বরাবর, বিশাল নাকের ফুটো দিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে আর কালো জিহ্বাটা বের করছে বারবার। আমি পিছিয়ে গেলাম, তারপর ঘুরে দৌড়ে পালিয়ে এলাম রাতের আঁধারে।

ঘন ধোঁয়া পাক খাচ্ছে আমার চারপাশে, দম আটকে দিচ্ছে আমার, যাতে পাগলের মত কাশতে পারি। আমার চারপাশের আগুনের শিখা দোযখের আগুনের মত লকলক করছে, একবার জ্বলছে আবার নিভে যাচ্ছে। চারিদিকে অদ্ভুত সব আকৃতি আর আজব শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। লোরেনের কুঁড়ে চোখে পড়ল আমার, দৌড়ে গেলাম সেদিকে।

"লোরেন," ডাকতে ডাকতে দরজায় ধাক্কা মেরে ঢুকে গেলাম ভেতরে। "লোরেন!" হাফাচ্ছি, কাশছি।

লাইট জ্বলে উঠলো। স্যালি একা শুয়ে আছে লোরেনের বিছানায়, উঠে বসল ও, চোখে ঘুম, ঢুলুঢুলু করছে চোখ, গায়ে কাপড় নেই, আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

"কোথায় ও?" ওর দিকে চিৎকার করে উঠলাম আমি। ওকে কেমন বিভ্রান্ত দেখালো, কিছু বুঝছে না যেন।

"বেন, কী হয়েছে? রক্ত কেন আপনার গায়ে?"

"লো কোথায়?" খুব জরুরি ব্যাপার এটা। ওকে লাগবে এখনি। ও-ও ছত্রাকের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছে। ওকে খুঁজে বের করতে হবে।

স্যালি বিছানায় ওর পাশে তাকালো। লোরেনের মাথাটা যেখানে ছিল, বালিশের সেই জায়গাটা ডেবে আছে।

"জানি না," বলল স্যালি। চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছে, বিভ্রান্ত। "এখানেই তো ছিলেন। বাইরে গিয়েছেন বোধহয়।"

আমি কাশতে লাগলাম, লম্বা লম্বা আটকে আটকে দম নিচ্ছি, মুখের ভেতর তাজা রক্ত টের পেলাম আবার। স্যালি এতক্ষণে পূর্ণ সজাগ হয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

"বেন, কী হয়েছে?"

"নিউরোমাইসিস," ওকে বললাম আমি, আমার গাল বেয়ে রক্তের ধারা নামতে দেখে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ।

"লোরেন আর আমি আর্কাইভের পেছনে একটা গোপন সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছি। ওটার ভেতরের বাতাস এই রেণু দিয়ে ভরা। আমরা কোনো ব্যবস্থাই নিয়ে যাইনি। আমাদেরকে ধরে ফেলেছে এখন। আমি নিশ্চিত লোরেন আবার ওখানে গিয়েছে। আমি ওর কাছে যাচ্ছি।" আমি দম নেওয়ার জন্য থামলাম একবার। স্যালি বিছানা থেকে নেমে ওর গাউনটা গায়ে গলিয়ে দৌড়ে এল আমার কাছে।

"র‍্যাল ডেভিডসনকে ডেকে আনো। রেসপিরেটর। সব ব্যবস্থা নাও। তারপর আসো আমাদের পিছু পিছু। আমি দরজাগুলো সব খুলে রাখবো। সিঁড়ি ধরে নিচে নামবে। তারপর বাম দিকে গিয়ে একদম নিচে চলে আসবে। আমরা যেখানে গিয়েছি সেখানে। লোরেনেরও এটা হওয়ার কথা, মাথা পাগল

করে দেয় জিনিসটা। উন্মাদ একেবারে। ভয়ানক সব ব্যাপার হয়। দ্রুত আসো–বুঝতে পেরেছো?"

"হ্যাঁ, বেন।"

"র‍্যালকে ডাকো," বলে আমি ঘুরে গেলাম। তারপর আবার দৌড়ে গেলাম ওই ধোঁয়া আর আগুন আর অন্ধকারের ভেতরে, পাহাড় আর গুহার দিকে দৌড়াচ্ছি। শহরের বিশাল বিশাল দেওয়াল আমার মাথার উপর দেখা যাচ্ছে, যেসব দেওয়াল বহু আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বাআলের বিশাল বিশাল শিশ্ন আকৃতির মিনারগুলো চাঁদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, জ্বলন্ত শহরের লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে আছে সেগুলোও। বহুদিন পর আবার মিনারগুলো উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই চিৎকার করছে, মহিলারা, বাচ্চাকাচ্চাসহ জ্যান্ত পুড়ে মরছে সবাই। আমার পথের সামনে জমে আছে মৃত মানুষের স্তূপ, ফসলের মত করে কেটে ফেলে রাখা হয়েছে যেন, মৃত চেহারাগুলো চাঁদের আলোয় ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

"লোরেন," চিৎকার করতে করতে আমি শহরের ভেতর দিয়ে দৌড়ালাম। আমার পথ আটকে দাঁড়ালো ওরা, কুৎসিত আর বর্বর; আমাকে আটকানোর জন্য সামনে ধেয়ে আসছে। আকৃতিগুলো অন্ধকার, আকৃতিবিহীন, ভীতিকর; আমি ওদের দিকে আমার রক্তে ভেজা গলা দিয়ে অদ্ভুত এক রণ চিৎকার করতে করতে ধেয়ে গেলাম। আগুনের আলোয় রূপালি বৃত্ত তৈরি করে ঝলসাতে লাগল মস্ত কুঠারটা, ওদেরকে ছাড়িয়ে এলাম আমি, দৌড়াচ্ছি তখনও।

গুহাটায় পৌঁছে গেলাম, দেখি ওটা টিমটিমে মশাল জ্বেলে আলোকিত করে রাখা, সবুজ বৃত্তাকার সৌন্দর্যের এমারেল্ড দীঘিটা ঘিরে রাখা পাথরের পাড়টা চোখে পড়ল আমার। সারি সারি পাথরের বেঞ্চ আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, ঠিক ২,০০০ বছর আগে যেরকম সার বাঁধা ছিল, সেরকম। শরীরের শেষ সকল ইচ্ছাশক্তি একত্র করে, আমি আমার মস্তিষ্ককে জোর করলাম এই কল্পনাকে ঝেড়ে ফেলে বাস্তবে ফিরে আসতে।

গার্ডের কাঠের চৌকিটা গুহার ভেতরে আমার পথ আটকালো। আমি টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম ওটার দিকে। ডেস্কে বসে বই পড়ছিল গার্ড। চোখ তুলে তাকালো সে, মুখভঙ্গি প্রথমে বিস্ময় পরে সন্দিগ্ধতায় রূপ নিল।

"গুড গড, আপনি ঠিক আছেন, ডক্টর?"

"মিস্টার স্টারভেসান্ট, উনি কি সুড়ঙ্গের ভেতরে গিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"ঘণ্টাখানেক আগে।" গার্ড আমার দিকে এগিয়ে এল। "কোনো সমস্যা? আপনার রক্ত বের হচ্ছে, ডক্টর!"

"এখানেই থাকেন," বললাম আমি ওকে। "বাকিরা আসছে। ওরা জানে যে কী করতে হবে।"

আর্কাইভের দিকে ছুটে গেলাম আমি, নাকে লেগে আছে ধোঁয়ার গন্ধ আর মুমূর্ষু শহরটার শেষ আর্তনাদটাও কানে বেজে চলেছে তখন।

সূর্য দেবতার প্রতিকৃতিটার সামনে মস্ত যুদ্ধ কুঠারটা ছেড়ে দিয়ে, ওটাকে পাথরের মেঝের উপরেই পড়ে থাকতে দিলাম। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললাম পাথরের দরজাটা, তারপর পড়ে থাকা একটা ঢাল দিয়ে ঠেকনা দিয়ে রাখলাম যাতে আবার ঘুরে বন্ধ না হয়ে যায়।

সিঁড়ি ধরে দৌড়ে নামলাম আমি। অর্ধেক নামতেই নিচের সমাধি থেকে আলোর আভা আসতে দেখতে পেলাম।

খোদাই করা দরজাটা দেবতাদের অভিশাপ নিয়ে চিচিং ফাঁক হয়ে আছে, লাইটের তারের কারণে আটকে আছে কব্জা। সমাধির মাঝখানে লোরেন যেখানে ফেলে দিয়েছে, বাতিটা কাত হয়ে পড়ে আছে সেখানেই।। আলো জ্বলছে তখনও, তীব্র আলোয় ভরে আছে সমাধিটা।

ওপেটের শেষ রাজা, লানন হাইকানাসের বিশাল গ্রানাইটের শবাধারের গোঁড়ায়, মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে আছে লোরেন।

শরীরের ঊর্ধ্বাংশে কোনো কাপড় নেই ওর। চেহারা মুমূর্ষু মানুষের মত ফ্যাকাসে, চোখ বন্ধ, উজ্জ্বল তাজা রক্ত লেগে আছে ঠোঁটের কষে, সেখান থেকে গাল বেয়ে কানের পাশ দিয়ে চুলের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে রক্তের ধারা।

শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে, কোনো মতে ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানে পৌঁছে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম আমি। ওর উপর উবু হয়ে, ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে তুলে বসানোর চেষ্টা করলাম ওকে।

ওর সারা শরীর ভেজা, উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে, তুলতেই মাথাটা ঝুলে পড়ল পেছন দিকে। মুখ দিয়ে নতুন করে আরও খানিক রক্ত বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিল আমার হাত।

"লোরেন," কেঁদে উঠলাম আমি, আমার বুকের সাথে চেপে ধরলাম ওকে। "ওহ, প্লিজ, ঈশ্বর, দয়া করো! সাহায্য করো আমাকে!"

তখনও বেঁচে ছিল ও, নিভে যাওয়ার আগের প্রদীপের টিমটিমে আলোর মত। চোখজোড়া খুলল ও, ওর ফ্যাকাসে নীল চোখজোড়ায় মৃত্যুর অমানিশা বাসা বাঁধতে শুরু করেছে।

"বেন," অস্ফুটে বলল ও। নিজের রক্তেই ওর দম আটকে আসছে। কেশে উঠলো ও, ফুসফুস ফেটে তাজা রক্তের ফোঁটা ছিটকে বের হতে লাগল মুখ দিয়ে।

"বেন," ও এত আস্তে ডাক দিল যে আমি শুনতেই পেলাম না বলা চলে। "অল দ্য ওয়ে?"

"অল দ্য ওয়ে, লো," ফিসফিসিয়ে বললাম আমি, একটা ঘুমন্ত শিশুর মত বুকে জড়িয়ে রেখেছি আমি ওকে। সোনালি চুল ভর্তি মাথাটা আমার ঘাড়ের উপর ঠেস দেওয়া। কিছুক্ষণ চুপ থাকলো ও, তারপর আচমকাই ঝাঁকি দিয়ে উঠলো আবার, শেষবারের মত যখন কথা বলে উঠলো তখন একদম পরিষ্কার শক্ত গলায় কথা বলল।

"উড়ে যাও!" বলল ও। "আমার জন্য উড়ে যাও, সূর্যের পাখি।" তারপরেই প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল ওর, আমার হাতের উপর নিশ্চল পড়ে রইলো লোরেন, ওর মহান বন্য আত্মা উড়ে গেল–চিরতরে।

ওর পাশে ওভাবেই বসে রইলাম আমি, আমার নিজের চেতনাও লোপ পাচ্ছে বলে টের পেলাম। আশপাশের সবকিছু চক্কর দিয়ে উঠলো, মনে হলো আমার নিচ থেকে সরে যাচ্ছে সব। আমি সেটার কিনার দিয়ে যেন পিছলে পড়ে গেলাম, ঘুরতে ঘুরতে ডুবে যেতে লাগলাম কালের অন্ধকার গর্তের ভেতর। এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখানে না আছে মৃত্যু, না আছে জীবন, যেন এক স্বপ্নের ভেতর দিয়ে মরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। বিষের প্রতিক্রিয়ার ফলে আমি কতক্ষণ মরণ ঘুমে ছিলাম জানি না, সেটা এক মুহূর্তও হতে পারে, আবার এক লক্ষ বছরও হতে পারে, তবে তার মাঝেই দেখতে পেলাম বহু আগেই গত হওয়া একজন মানুষের বহু আগের কাহিনি

দ্বিতীয় ভাগ



দৈববাণী মোতাবেক তিরিশ দিন শেষ হতে বাকি আছে আর মাত্র দুই দিন। লানন হাইকানাস আর ওনার সঙ্গীরা অবশেষে বিশাল হ্রদটার সর্ব দক্ষিণ উপকূলের বে অভ দ্য লিটল ফিশ-এ এসে পৌঁছলেন। নৌবহরের দশটা জাহাজ বে-র অগভীর পানিতে নোঙ্গর ফেলল যখন, তখন আঁধার নেমে গিয়েছে। জাহাজের মশাল আর কুপিগুলোর আলো কালো পানির উপর লম্বা লালাভ পথ সৃষ্টি করছে।

লানন দাঁড়িয়ে আছেন জাহাজ চালানোর ডেকটার পাশের কাঠের গলুইটার উপর, দৃষ্টি সামনের অবারিত প্যাপিরাসের মাঠ আর দক্ষিণের লুকানো জলপথের দিকে, যেখানে উন্মুক্ত দেশের সীমানা শুরু; যেটা শেষ হয়েছে অজানা কোনো এক অন্তহীন অসীমে। উনি খুব ভালোই জানেন যে এখানেই বাঁধা আছে নিজের আর তার জাতির নিয়তি। আটাশ দিন ধরে উনি উন্মাদের মত খুঁজে মরছেন সেটা; অথচ এখন এক অজানা ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে ওনার, যে ভয়ানক জানোয়ারটা উনি খুঁজতে এসেছেন সেটাকে ভয় পাচ্ছেন না, বরং বারংবার জানোয়ারটা যে ওনাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেটার পরিণতি চিন্তা করে ভয় লাগছে।

পেছনে কাঠের পাটাতনে হালকা পদশব্দ পাওয়া গেল। সাথে সাথে ঘুরে গেলেন লানন, হাত চলে গিয়েছে চামড়ার আলখাল্লার নিচের ছোরাটার হাতলে, তবে মশালের আলোয় একটা মানুষের অতি পরিচিত অবয়ব চোখে পড়তেই ঢিল পড়ল পেশীতে।

"হুই," স্বাগত জানালেন উনি লোকটাকে।

"জাঁহাপনা, এখন খেয়ে ঘুমাবেন চলুন।"

"ওরা কি ফিরেছে?"

"এখনও না, তবে সকালের আগেই ফিরবে," কুঁজো লোকটা বলতে বলতে, আরও এগিয়ে এলেন রাজপুত্রের দিকে। "চলুন এখন। আগামীকাল আপনার স্থির হাত আর পরিষ্কার চোখের দৃষ্টি খুবই প্রয়োজন হবে।"

"মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে আমার বৌ আসলে নয়টা না, দশটা," বলে হাসলেন লানন, তবে সাথে সাথেই ঠাট্টাটা করার জন্য আফসোস করলেন মনে মনে কারণ কুঁজো লোকটার চেহারায় রক্ত জমে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে মুহূর্তেই। পরিস্থিতি সামলাতে সাথে সাথেই বললেন, "তুমিই তো লাই দাও আমাকে, বন্ধু, কিন্তু আমার মনে হয় যে বাবার শেষকৃত্যের পরে

বিগত আটাশ দিন ধরে গ্রাই-লায়নটা যেমন আমাকে ধরা দিয়েও দিচ্ছে না, তেমনি ঘুমও আজ রাতে অধরা হয়েই থাকবে আমার চোখে।" উনি জাহাজের কিনারের রেলিং পেরিয়ে বাকি নয়টা জাহাজের দিকে তাকালেন। নয়টা পরিবারের জাহাজ ওগুলো, সাথে এসেছে; লালান ওপেট আর চার রাজ্যের সিংহাসনের সত্যিকার দাবীদার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন কিনা, সেটা দেখতে। গ্রাই-লায়ন শিকার করা দেখতে এসেছে ওরা!

"ওদেরকে দেখো হুই।" আর ওনার বন্ধু পাশে এসে দাঁড়ালেন ওনার। "আমার ব্যর্থতার জন্য প্রার্থনা করে ওদের ভেতর কয়জন দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিয়েছে?"

"তিনজন যে দিয়েছে সেটা নিশ্চিত–কাদের কথা বলছি সেটা বুঝতেই পারছেন। তবে আরও বেশিও হতে পারে।"

"আর যারা বার্কা পরিবারের প্রতি বিশ্বস্ত, তাদেরকে কি আমরা চোখ বন্ধ করে হিসাবে ধরতে পারি?"

"ওদেরকেও চেনেন আপনি, মাই লর্ড। সমুদ্রের পানি শুকিয়ে বালি হয়ে যাওয়া পর্যন্তও হাব্বকুক লাল আপনার পাশেই থাকবে। আমন পরিবার, হাসমন পরিবার–"

"হ্যাঁ," কথার মাঝেই বলে উঠলেন লানন। "আমি চিনি ওদেরকে, হুই, ওদের প্রত্যেককে, পক্ষের আর বিপক্ষের। কিন্তু এসব বলছি শুধু তোমার কাছ থেকে সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য।" স্নেহের প্রকাশ হিসেবে উনি কুঁজো লোকটার কাঁধ স্পর্শ করলেন, তারপর আবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইলেন দক্ষিণের বুনো প্রান্তরের দিকে।

"যখন এই দৈববাণীটা বানানো হয়েছিল, তখন কি ওরা জানতো যে গ্রাই-লায়ন কখনো এই ভূমি ছেড়ে চলে যাবে? কখনো কোনো রাজপুত্র তার জন্য বরাদ্দকৃত তিরিশ দিন খুঁজেও ওপেটের মাটিতে এমনকি জানোয়ারটার একটা পায়ের ছাপ পর্যন্ত পাবে না?" বলতে বলতেই আচমকা রেগে গেলেন লানন। বলতে বলতে ঝট করে আলখাল্লাটা টান দিয়ে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে নগ্ন বুকের উপর হাত ভাজ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। গায়ে একটু আগেই তেল মেখেছেন বলে মশালের আলোয় চকচক করতে লাগল পেশী, নিজের লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে নিজের মাংসই পিষতে লাগলেন রাগের চোটে।

"আমার বাবা পঁচিশ দিনের দিন পেরেছিলেন শিকার করতে, সেটাও ছেচল্লিশ বছর আগে। সবাই বলে যে এমনকি তখনও নাকি গ্রাই-লায়ন বিপন্ন হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে এখানে আর কয়টার দেখা পাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে?"

"মাই লর্ড, দেবতারাই ঠিক করে দেবেন সব," হুই ঠান্ডা করার চেষ্টা করলেন ওনাকে।

"গত দুইশো বছরে যতগুলো গোপন আস্তানায় গ্রাই-লায়ন দেখা গিয়েছে তার সবগুলোয় ঢুঁ মেরেছি আমরা। পুরো পাঁচটা পদাতিক দল উত্তরের সবগুলো জলাভূমি চষে ফেলেছে, বিশাল নদীটার ধারে খুঁজেছে আরও তিনটা দল।" কথা থামিয়ে ডেকের উপর পায়চারি শুরু করলেন উনি, মাঝে মাঝে থেমে জাহাজের নিচের উলঙ্গ ক্রীতদাসগুলোকে দেখতে লাগলেন শুধু। ওরা সবাই যার যার বসার জায়গাতেই বাঁধা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছে, বিশাল দাঁড়গুলোর উপর ঝুঁকে আছে মাথা, এই অবস্থাতেই একদিন মারা যাবে ওরা। জাহাজের ভাঁড়ার থেকে দুর্গন্ধ ভেসে এল নাকে, এই আর্দ্র বাতাসে সেটা স্বাভাবিকের চাইতে প্রকট লাগতে লাগল। উনি আবার ঘুরলেন হুইয়ের দিকে।

"পুরো সাম্রাজ্যের ভেতরে এটাই হলো সর্বশেষ জলাভূমি যেখানে গ্রাই-লায়ন থাকতে পারে। যদি না থাকে, তাহলে কি হবে, হুই? আর কি কোন উপায়ই নেই যেভাবে আমি আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি? এসব লিপির হাত থেকে কি মুক্তি নেই কোনো?"

"নেই, মহামান্য।" দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন হুই।

"রাজতন্ত্রের অবসান হবেই?"

"যদি কোনো গ্রাই-লায়ন শিকার করা সম্ভব না হয়, তাহলে ওপেটে আর কোনো রাজা থাকবে না।"

"রাজা ছাড়া তাহলে রাজ্য চালাবে কে?"

"নয় পরিবারের পরিষদ, একাই।"

"আর রাজ প্রাসাদের কী হবে? বার্কা পরিবারেরই বাকী হবে?"

"এখনই এসব নিয়ে না ভাবলেও চলবে," নরম সুরে বললেন হুই। "চলুন, মাই লর্ড। এক দাসকে বলে এসেছি এক জগ গরম ওয়াইন আর মাছের স্ট্যু বানাতে। ওয়াইনটা খেলে ঘুমাতে পারবেন।"

"তুমি কি কালকের জন্য একটা ভবিষৎবাণী করতে পারবে, আমার প্রিয় বাআলের পুরোহিত?" আচমকাই বললেন লানন।

"যদি ভবিষৎবাণীটা আপনার বিপক্ষে যায়, তাহলে ঘুমাতে পারবেন?" জিজ্ঞেস করলেন হুই, লানন এক মুহূর্ত ওনার দিকে তাকিয়ে থেকে ফেটে পড়লেন কর্কশ হাসিতে।

"ঠিকই বলেছো, সবসময়েই বলো। চলো তাহলে, ক্ষিদে লেগেছে আমার।"

লানন ওনার পশমে মোড়া বিছানায় নগ্ন হয়ে বসে আয়েশ করে মাছের গামলা থেকে খেতে লাগলেন। চুল ছেড়ে দিয়েছেন আর এখন কাঁধের উপর ঝুলছে সেগুলো, ঝুলন্ত কুপিগুলোর আলোয় কোকড়া চুলগুলো অদ্ভুত রকম স্বর্ণালি আভায় জ্বলজ্বল করছে। এই কালোচুলো মানুষগুলোর ভেতরে তাকে আলাদা দেবতাতুল্য মনে হয় এই কারণে।

চামড়ার পর্দাগুলো তুলে দিতেই দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে হালকা বাতাস ভেসে এসে কক্ষটাকে শীতল করে দিল, সেই সাথে উড়িয়ে দিল রান্না ঘরের আবর্জনার দুর্গন্ধ। বাতাসের ধাক্কায় মৃদু দুলে উঠলো জাহাজটা, পাটাতনে চাপ পড়ে কাঠ সরে গেল সামান্য, নরম সুরে ককিয়ে উঠলো সেখানে কেউ। একজন দাস দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠলো, উপরের পাটাতন থেকে ভেসে এল রাতের প্রহরীর পদশব্দ–সমুদ্রে ভাসমান কোনো জাহাজের পরিচিত স্বস্তিদায়ক শব্দ সব এগুলো।

লানন এক টুকরো ভুট্টার রুটি দিয়ে স্ট্যুর বাটিটা মুছে মুখে পুরে দিলেন, তারপর ওয়াইনের বোতলের তলানিটুকু দিয়ে নামিয়ে দিলেন সেটা। একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে চাইলেন হুইয়ের দিকে।

"একটা গান শোনাও দেখি, আমার সূর্যের পাখি!"

হুই বেন-আমন রাজপুত্রের বিছানার পায়ের কাছে পাটাতনের উপর উবু হয়ে, লুট[৬৮]-টা কোলের উপর রেখে ঝুঁকে বসলেন। পিঠের বক্রতা তার এই ভঙ্গিটাকে আরও প্রকট করে দিল, আলকাতরার মত কালো চুলের গোছা সামনের দিকে ঝুলে পড়ে চেহারাকে আড়াল করে দিল; ওর বিশাল পেশল বাহুর তুলনায়, লুট ধরে রাখা লম্বা আঙুলগুলো নিতান্তই পলকা মনে হয়। একটা সুর ধরতেই, পুরো রাত মনে হলো নিশ্চুপ হয়ে গেল তার গান শোনার জন্য। থেমে গেল উপরের পদশব্দ, দাসী মেয়ে দুটো তাদের কাজ থামিয়ে লাননের বিছানার পাশে এসে বসে পড়ল, পাশের জাহাজগুলো থেকে যে হট্টগোলের আওয়াজ আসছিল সেটাও চুপ হয়ে গেল সাথে সাথে, সুরের তালে গান ধরলেন হুই।

কালো পানির ছাড়িয়ে হুইয়ের সুমধুর কণ্ঠ বেজে যেতে লাগল, রাজপুত্রসহ পুরো নৌবহর তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সেটা। কাছের জাহাজগুলোয় দেখা গেল কালো কালো অবয়ব রেলিং-এর কাছে এগিয়ে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাজপুত্রের জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইলো। হুই হারানো ভালোবাসার গান ধরতেই, সুন্দরি এক দাসীর গালে অশ্রুবিন্দু জমে স্থির হয়ে রইলো, কুপির আলোয় জ্বলজ্বল করতে লাগল তা। আবার এরপরেই হুই পদাতিক দলের কুচকাওয়াজের একটা চটকদার গান শুরু করতেই কান্নার মাঝেই হাসতে শুরু করল সে।

"আজকের জন্য থাকুক," অবশেষে লুট থেকে মুখ তুললেন হুই। "আগামীকাল অনেক কাজ বাকি, মাই লর্ড।"

লানন মাথা ঝাঁকিয়ে একটা দাসীর গালে স্পর্শ করলেন। সাথে সাথে সে উঠে দাঁড়িয়ে তার লিলেনের পোশাকের কাঁধের ফিতা খুলে ফেলল, ঝপ করে পোশাকটা পড়ে গেল মাটিতে। মেয়েটা কম বয়সী আর চটপটে, বাতির

---

[৬৮]এক প্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র

আলোয় ওর দেহটা অনেকটাই ছেলেদের মত একহারা মনে হচ্ছে। মাথা নামিয়ে ও নিজের পোশাকটা তুলে নিল মাটি থেকে, তারপর সেটাকে দরজার পাশের বেঞ্চের উপর রেখে নগ্ন হয়েই লাননের বিছানায় উঠে বসল। অন্য মেয়েটা গেল বাতি নিভিয়ে দিতে, হুই লুটটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন পাটাতন থেকে।

একটা কণ্ঠ ভেসে এল অন্ধকার থেকে, প্যাপিরাসের দঙ্গলের ভেতর থেকে মস্ত একটা ষাঁড় ডেকে উঠলো যেন, পানি পেরিয়ে রাজপুত্রের জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছে গেল সেটা।

"জাহাজের মইটা কেউ নামিয়ে দিন!"

"কে মই নামানোর দাবী করছে?" রক্ষীদের একজন জানতে চাইলো, জবাব এল অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে।

"মুরসিল, বার্কা পরিবারের প্রধান শিকারি।" শুনেই এক লাফে লানন নিজের বিছানা থেকে নেমে এলেন।

"ও এসে গিয়েছে!" বিস্মিত কণ্ঠে স্বগোক্তি করতে করতে কাঁধের উপর নিজের আলখাল্লাটা চাপিয়ে ঝটপট উনি জাহাজে ওঠার মইয়ের দিকে ছুটলেন, হুইও প্রায় লাফাতে লাফাতে ছুটছেন ওনার পাশে।

একটা ছোট্ট ডোঙা এসে ভিড়লো জাহাজের গায়ে, মুরসিল জাহাজে ওঠার জায়গাটা দিয়ে উঠে এল উপরে। লানন আর হুইও সেই মুহূর্তেই ডেকের উপর উঠে এলেন। মুরসিল গায়ে-গতরে বিশাল, দেখতে বেঢপ আর শিম্পাঞ্জির মত, গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, রোদে পুড়ে আর ওয়াইনের কারণে লাল হয়ে থাকে সারাক্ষণ।

জাহাজটা জেগে উঠেছে আবার। কর্মকর্তারা সব ডেকের উপর ভিড় করছে, সবগুলো মশাল জ্বেলে দিয়ে একেবারে দিনের আলোর উজ্জ্বলতা এনে ফেলা হলো, উত্তেজিত ছোটাছুটি আর গুঞ্জন ওদের সবাইকেই প্রভাবিত করেছে।

লাননকে চোখে পড়তেই মুরসিল দৌড়ে গেল সেদিকে, দেখেই লোকজন সরে জায়গা করে দিল তাকে ভিড়ের ভেতর দিয়ে। মুরসিলের পেছন পেছন গা ঘেঁষে এগোচ্ছে একটা বেঁটে লোক–একটা ছোটখাটো বাদামি উলঙ্গ বামন–যে তার ঢুলুঢুলু চোখে নির্জলা আতংক নিয়ে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশের চারপাশে দেখছে।

"মাই লর্ড।" বলে মুরসিল নিজের আলখাল্লা খুলে ধপ করে এক হাঁটু ভেঙে লাননের সামনে বসে পড়ল। "সুখবর নিয়ে এসেছি আমি।"

"সেক্ষেত্রে স্বাগতম তোমাকে।"

"এই ব্যাটা," বলে মুরসিল পেছনে হাত বাড়িয়ে ছোট্ট বুশম্যানটাকে সামনে টেনে নিয়ে এল, "আমরা যা চাচ্ছি এই ব্যাটা সেটা খুঁজে পেয়েছে।"

“তুমি দেখেছো ওটাকে?” জানতে চাইলেন লানন।

“পায়ের ছাপ দেখেছি শুধু, কিন্তু এই ব্যাটা বলছে যে, জানোয়ারটাকে নিজের চোখে দেখেছে।”

“তোমার কথা সত্যি হলে, অনেক পুরস্কার পাবে, তোমাদের দুজনেই,” লানন হাইকানাস ওয়াদা করলেন, তারপর বিজয়োল্লাসে দাঁত বের করে হুইয়ের দিকে তাকালেন উনি।

“দেবতারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। বার্কা পরিবার আরও একবার সিংহাসনে বসার সুযোগ পাবে।”



সামনের কালো জলাভূমির চাইতে আকাশটা মাত্র একপোচ কম হালকা; সূর্যের আগেই জেগে ওঠা হাঁসের দল মাথার উপর থেকে ভৌতিক কণ্ঠে শিস বাজিয়ে উড়ে গেল আর প্রতি মিনিটে বাড়তে লাগল আলোর পরিমাণ।

খোলা প্রান্তরের আধা মাইল ভেতরে এক পাল মহিষ কালো রঙের গুচ্ছ বেঁধে ঘাস খাচ্ছে। মাঠে নিচের দিকে, লেজ নাড়ছে অলস ভঙ্গিতে, ধীরে সুস্থে লম্বা লম্বা প্যাপিরাস ঘাসের ছাওয়া জলার কিনারের দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

আলো বাড়তে শুরু করতেই ওদের চলার গতিও বেড়ে গেল, ঘাসে ছাওয়া অভয়াশ্রমে ফিরতে চাচ্ছে দ্রুত। ২০০ প্রকাণ্ড চারপেয়ে অবয়ব তাদের শিঙঅলা মাথা আর ফেঁপে ওঠা কালো কাঁধ বয়ে নিয়ে চলেছে। ভোরের প্রথম আলোয় দেখা গেল কালো পালটার উপর বসে আছে সাদা টিক পাখির দল, নরম আলোয় ওদের গায়ে রঙ বদলে হয়ে গিয়েছে গোলাপি। জলায় ভরা ভূমিটা জুড়ে কুয়াশা জমে ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছে; প্যাপিরাসে ভরা অসীম জলার ধারা ভোরের আগমনে যেন জমে গিয়েছে জায়গায়, এই একটা সময়েই বোধহয় প্যাপিরাসের ফোলা সাদা মাথাগুলো দোলে না বা নাচে না–তবে আজ ওগুলোর ভেতর দিয়ে নড়া-চড়া করে এগোচ্ছে কিছু একটা।

জিনিসটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকের প্যাপিরাসের মাথাও কেঁপে উঠছে, দুইদিকে ভাগ হয়ে সরে গিয়ে আবার ফিরে আসছে আগের জায়গায়, স্থির হয়ে যাচ্ছে আগের মত। নড়া-চড়াটা খুবই মন্থর কিন্তু তবুও এতটা চওড়া যে ওটার নিচে লুকিয়ে থাকা প্রাণীটার আকৃতি ফাঁস করে দিচ্ছে।

প্যাপিরাসের দঙ্গল থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতেই মহিষের পালটার সর্দার যে প্রকাণ্ড মহিষটা, সেটা আচমকা থেমে দাঁড়ালো। নাকটা উঁচু করে, মস্ত শিং দুটোর নিচে দুই কান ছড়িয়ে দিল যতটা সম্ভব। ছোট ছোট সন্দিহান

কুতকুতে চোখে, সামনের ঘাসগুলো পরখ করতে লাগল সে। পেছনে পুরো পালটাই থেমে দাঁড়িয়েছে, সর্দারের থেমে দাঁড়ানো দেখে সতর্ক সবাই।

গ্রাই-লায়নটা প্রবল বিক্রমে ধেয়ে এল ঘাসের জঙ্গলের ভেতর থেকে, নরম ফ্যাকাসে বাদামির একটা ঝলক দেখা গেল শুধু, প্রাণীটা লম্বায় প্রায় ওটার শিকারের সমান আর ওজনেও কাছাকাছি। খোলা প্রান্তরটা এত দ্রুত পার হলো যে মহিষটা এমনকি ঘাড় ঘোরানোর আগেই গ্রাই-লায়ন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার উপর।

গ্রাই-লায়ন মহিষটার পিঠের উপর গিয়ে পড়ল, বাঁকানো হলুদ থাবা বসে গেল কালো পুরু চামড়া আর কাঁধ এবং কুঁজ-এর মাংসের ভেতরে। লম্বা নখর ডেবে গেল মহিষটার ঘাড়ের পেছনের দিকে। এক থাবা দিয়ে ওটাকে সোজা ধরে রেখে, অন্য পা সামনে বাড়িয়ে ষাঁড়টার নাক চেপে ধরলো। একটা মাত্র শক্তিশালী মোচড়ে, ধরে রাখা থাবার ভেতরে বেঁকে গেল কালো ঘাড়টা, গা শিউরানো মট শব্দ করে ভেঙে গেল মেরুদণ্ড, মহিষটা আছড়ে পড়ল সামনের পা ভাঁজ করে।

মহিষটা মাটিতে পড়ার আগেই গ্রাই-লায়ন ছেড়ে দিল ওটাকে, আলতো করে লাফিয়ে নামলো মাটিতে, মনে হলো মাটিতে পড়ার আগেই আবার শূন্যে লাফিয়ে উঠে গেল ওটা, একটা দীর্ঘ বক্র লম্ফ, ভোরের গোলাপি আকাশের পটভূমিকায় ঝাপসা বাদামি ঝলক দেখা গেল শুধু। ষাঁড়টার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা বুড়ো কালো গাভীর পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ল এবার।

ঠিক একটা হামিং বার্ড যেভাবে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে পলকে পলকে উড়ে বেড়ায়, গ্রাই-লায়নটাও ঠিক সেরকম ক্ষিপ্রতায় আরও একটা মহিষ শিকার করল। ভোরের আলোর সাথে সাথে ভেসে আসতে লাগল হাড় ভাঙার তীব্র আওয়াজ। পেছনের পলায়নরত মহিষের ধাক্কায় আক্রান্ত মহিষটা গ্রাই-লায়নটাকে কাঁধে করেই এগিয়ে নিয়ে গেল সামনের দিকে, গাভীটা মারা পড়তেই গ্রাই-লায়ন কাঁধ থেকে নেমে উড়ে গেল পরেরটার উপরে, তারপর দুই থাবার দ্রুত এক মোচড়ে সেটাকে মেরে লাফিয়ে গেল আবার।

উন্মত্ত, ধাবমান, আতংকিত মহিষের দলটা ৩০০ কদম দৌড়ে যাওয়ার আগেই ছয়টাকে ধরাশায়ী করে ফেলল গ্রাই-লায়নটা। তারপর সে ওদেরকে পালাতে দিল, ওদের ক্ষুরের বজ্র ধ্বনি মিলিয়ে গেল একসময়, দূরের এক জলার কিনারের প্যাপিরাস গ্রাস করে নিল মহিষগুলোকে আর গায়েব হয়ে গেল ওরা।

গ্রাই-লায়ন ভোরের রেশমি আলোয় দাঁড়িয়ে রইলো। তার লম্বা, কালো ঝুঁটির লেজটা এখনও শিকারের রোমাঞ্চে এপাশ থেকে ওপাশে বাতাস কেটে দুলছে। মস্ত প্রাণীটা অর্ধেক উবু হয়ে যেতেই তার প্রতিটা পেশী টানটান হয়ে ফুলে গেল, ভোঁতা সাপের মত দেখতে মাথাটা এমনভাবে তুলে ধরলো যেন

ওই সাদা সাদা বিশাল দাঁতগুলোর ওজন বইতে কষ্ট হচ্ছে। দাঁতগুলো এমনভাবে বেঁকে আছে যে ওটার লোমশ বুক স্পর্শ করছে প্রায়।

ওটার চেহারা জুড়ে প্যাঁচানো কালো আর চকচকে সাদা ডোরা কাটা, সেটার কারণেই দূরে ছড়ানো চোখ দুটোয় আলাদা স্বর্ণালি আভা ছড়ানো নির্মমতা এনে দিয়েছে। তবে চোখের পাপড়ি আর গোঁফ আবার লম্বা সাদা চুলের, এগুলো আবার জানোয়ারটার চেহারায় নরম ভাব এনে দিয়েছে। তবে, যখন ওটা আবার মাথা সোজা করল, ঘাড় থেকে পিঠ বরাবর মালবেরি-বাদামি রঙের খাটো কেশর রাজি খাড়া হয়ে গেল, তখনই গায়েব হয়ে গেল ওসব নরম ভাবের বিভ্রান্তি।

মানুষের সমান লম্বা আর ঘোড়ার মত ওজনদার, ওই ভয়ানক দাঁত আর থাবা মিলিয়ে, এটাই হচ্ছে প্রকৃতির সকল চমক আর বিবর্তন পেরিয়ে জন্ম নেওয়া বিড়াল গোত্রের সবচেয়ে বিপজ্জনক সদস্য।

বিড়ালটা ঘুরে জোর কদমে এগিয়ে গেল যেখানে তার সর্বশেষ শিকার সমতলের খাটো ঘাসের উপর পড়ে আছে। ওটা মৃত মহিষটার উপর উঠে দাঁড়ালো, ব্যাপারটা দেখে অসম্ভবই মনে হয় যে এত বিশাল একটা জানোয়ার শিকার ধরার সময় এরকম উচ্চতার একটা শিকারের উপর এত দ্রুত উঠে যেতে পারে।

গ্রাই-লায়ন মাথাটা তুলে হাঁ করল, অতিকায় চোয়াল দুটো আলাদা হতেই, লম্বা গোলাপি জিহ্বাটা বেরিয়ে এল ওই অবিশ্বাস্য দাঁত দুটোর ফাঁক দিয়ে, সর্বশক্তিতে গর্জন করে উঠলো ওটা।

শব্দটায় মনে হলো ভোরের ঈষৎ বেগুনি আকাশটাও কেঁপে উঠলো, ঝাঁকি দিয়ে উঠলো পায়ের নিচের মাটি আর আলোড়ন উঠে গেল বিশাল হ্রদটার নিস্তরঙ্গ পানিতে।



ভোর বেলা, নলখাগড়ায় ভরা জলার কিনারের পাশে, কাদায় ভরা এক চিলতে সৈকতে, হুই বেন-আমন তার দেবতাদের আরাধনা সেরে নিলেন। হুইয়ের পরনে চামড়ার তৈরি হালকা শিকারের পরিচ্ছদ, ছোট একটা লিলেনের জামার উপর পরেছেন বুক আর বাহু ঢাকার চামড়ার বর্ম আর একটা ব্রোঞ্জখচিত চামড়ার কিল্ট[৬৯], অস্ত্রগুলোও পাশেই রাখা; কারণ উনি এখন বলি দান করবেন, মহান বাআলকে বার্তা পাঠাবেন একটা। একজন দূত লানন

[৬৯]ঘাঘরার মতো পোশাক

হাইকানাসের অনুরোধ বয়ে নিয়ে যাবে দেবতার কাছে। রাজপুত্র আর তার সভাসদগণ পুরোহিতকে ঘিরে একটা অর্ধবৃত্ত করে দাঁড়িয়ে আছে, সকলের মুখ পূর্ব আকাশের দিকে ফেরানো। বাআল দিগন্তের সামান্য উপরে তার গনগনে গোলকটার মাথা তুলেছেন কেবল, সবাই হাত তুলে অভিবাদন জানালো তাকে। আঙুল ছড়িয়ে আছে সূর্যের প্রতীক তৈরি করে।

"মহান বাআল," হুই এমন সুমধুর কণ্ঠে ডাক দিলেন যে সেটা আকাশ পর্যন্ত না পৌঁছে পারেই না। "আপনার সন্তানেরা আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছে!" হুইয়ের কৃষ্ণকায়, চঞ্চুর মত নাকের অবয়বটা এক ঐশ্বরিক আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আর অদ্ভুতরকম সুন্দর লাগতে লাগল তাকে।

"আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আপনার প্রজাদের জন্য একজন রাজা নির্বাচন করতে। এই প্রচেষ্টায় আমরা আপনার আশীর্বাদ কামনা করছি।" হুই খুব নিবিড়ভাবে তার দেবতাদেরকে চেনেন, যদিও তাদেরকে ভালোবাসেন কিন্তু উনি তাদের মানবসুলভ দুর্বলতাগুলোর ব্যাপারেও ওয়াকিবহাল। এরা সবাই দাম্ভিক, অসংলগ্ন, অভিমানী, লোভী আর মাঝে মাঝে হাড়-আলসে। সবসময় তেল মেরে ভুলিয়ে রাখতে হয়, ঘুষ দিতে হয়, তোষামোদ করতে হয়, আলাদা বিশেষ আচার অনুষ্ঠান আর প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের আগ্রহ আর মনোযোগ আদায় করতে হয়...সেই সঙ্গে দিতে হয় বলিদান–যেটার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে হুই পক্ষপাতী নন–যার মাধ্যমে তাদের তাজা রক্তের কামনা প্রশমিত হয়। শুধু বলিদান করাটাই যথেষ্ট না, সেটাও করতে হবে দেবতাদের সামনে সকল রীতিনীতি মেনে, শুধু তখনই সেটা গৃহীত হবে। ওনার অধস্তন একজন পুরোহিত যখন সাদা ষাঁড়টাকে খেদিয়ে সামনের দিকে নিয়ে এল, তখন হুইয়ের মাথায় চিন্তা এল যে উনি সঠিক কাজটা করছেন কিনা। কারণ উনিই লাননকে প্ররোচিত করেছেন দাসের বদলে একটা জানোয়ারকে বলি দিতে। দেবতারা মানুষের রক্ত পছন্দ করে বেশি, কিন্তু হুই লাননের সাথে তর্ক করে রাজি করিয়েছেন যে এখন একটা ষাঁড়, পরবর্তীতে একটা দাস বলি দিলে বেশি কার্যকর হবে ব্যাপারটা। ওই অমর সত্তাগুলোর সাথে দরাদরি করতে হুইয়ের বাঁধে না মোটেও, বিশেষ করে সেই মুহূর্তটাকে যদি পিছিয়ে দেওয়া যায় যখন তাকে অতি অবশ্যই একজন দুর্ভাগা দাসের আতংকিত আর অনুনয়ে ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। বিগত পাঁচ বছর ধরে হুই ওপেটের ধর্মীয় নেতা, এর মাঝে প্রায় শ'খানেক মানব দূতকে প্রেরণ করা হয়েছে দেবতাদের কাছে। অথচ শহরটার ইতিহাসে এমন দিনও আছে, যখন একদিনের কোনো অনুষ্ঠানেই এই সংখ্যক দাস বলি দেওয়া হয়েছে।

"আমরা আপনাকে এই চমৎকার সাদা ষাঁড়টা পাঠাচ্ছি আমাদের দূত হিসেবে।" এরপর হুই ঘুরে এগিয়ে গেলেন প্রাণীটার দিকে। ওপেটের আদি

ছোট জাতের একটা ওটা, সাদার মাঝে ধূসর ফুটকি, পিঠে একটা ভোঁতা কুঁজ, সোজা চওড়া শিং। ওটা চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকলো আর হুইয়ের আরেকজন সহকারী তাকে শকুন আঁকা কুঠারটা এগিয়ে দিল। সভাসদদের বৃত্তটা পিছিয়ে গেল খানিকটা, কুঠার চালনা আর রক্ত ছিটকে পড়ার জন্য জায়গা করে দিতে।

"মহান বাআল, আমাদের দূতকে গ্রহণ করুন!" চিৎকার করে বললেন হুই, কুঠারটা নেমে এল ষাঁড়ের গলা বরাবর, সূর্যের নরম রশ্মি ওটার ঝলসানো ফলা থেকে প্রতিফলিত হতে লাগল। সাঁই করে বাতাস কেটে নেমে এল ওটা, ষাঁড়টার মোটা গর্দানটা কেটে দিল নিখুঁতভাবে, মনে হলো মাথাটা লাফিয়ে সরে গেল ধড় থেকে। মুন্ডুহীন অবস্থায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ধড়, ভকভক করে রক্ত ছুটে এসে জমতে লাগল পাশ দিয়ে।

হুই তার কুঠারটার উপর ভর দিয়ে একজন কুঠারবাহকের চিরচারিত দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

"একটা লক্ষণ দেখান, মহান বাআল!" হুই চিৎকার করে উঠলেন, অনুরোধের চাইতে সেটাকে বরং একটা দাবী হিসেবে পেশ করছেন। "আপনার সন্তানদেরকে একটা লক্ষণ দেখান!" ওনার গলার স্বর এই জলা, আকাশ এবং পানির বিশালতার তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ। জলার অনন্ত নীরবতায় শামিল হলেন ওনারাও, ধোঁয়াটে বেগুনি ভোরে সেই অনাদি কাল ধরে চলে আসছে এই নীরবতা।

বিশাল ডানার এক দল হাঁস উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে, ঘন ঘন পাখা ঝাপটাচ্ছে, বাড়িয়ে রেখেছে লম্বা গলা, সূর্যের আলোর স্পর্শ পাওয়া কুয়াশার গোলাপি কিরণের বিপরীতে অন্ধকার অপচ্ছায়া মনে হচ্ছিল ওগুলোকে। হুই আশার চোখে তাকালেন পাখিগুলোর দিকে, ওগুলোকেই দেবতাদের বাহক হিসেবে চালিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে প্রচণ্ড।

"একটা লক্ষণ দেখান মহান বাআল!" প্রলোভন সংবরণ করে বললেন উনি, তবে ভেতরের বিরক্তি বাড়ছে ক্রমাগত। একেবারে নিখুঁতভাবে বলি দেওয়া হয়েছে, একেবারে শুরু থেকে কুঠারের এক কোপে ষাঁড়টার গলা কাটা পর্যন্ত–এটা কি তবে এমন কোনো উপলক্ষ হতে যাচ্ছে যখন দেবতাদের আশীর্বাদ পাওয়া হবে না, বা উনি গোঁয়ার্তুমি করে ফেলেছেন, বোকামো হয়েছে? একটা জলহস্তী পানিতে আলোড়ন তুলে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে চলে গেল, হুই প্রত্যাশা নিয়ে তাকালেন ওটার দিকে, কিন্তু ওই ধুমসো ধূসর পানির গাভীটা মৌমাছির পাখার মত ওটার কানটা মৃদু নেড়ে, শরীর মুচড়ে আবার তলিয়ে গেল পানির ভেতর।

"একটা লক্ষণ, মহান বাআল!" তৃতীয় আর চূড়ান্ত অনুরোধ করা হলো, প্রায় সাথে সাথে জবাব পাওয়া গেল সেটার।

বিকট একটা আওয়াজ ভেসে এল প্যাপিরাসের দঙ্গলের ভেতর থেকে, চমকে উঠে ওড়া-উড়ি শুরু করল পানিতে ভাসতে থাকা পাখিরা, নলখাগড়ার মোটা মাথাগুলো ঝাঁকি দিয়ে উঠলো, মনে হলো বজ্রপাতের মত একেবারে ষাট আসমান পেরিয়ে উঠে গেল আওয়াজটা। এরকম কোনো আওয়াজ এখানের কেউই কোনোদিন শোনেনি। গ্রাই-লায়নের হুংকার।

হুইয়ের গোমড়া মুখটা তলিয়ে গেল একটা ঝলমলে হাসিতে, উনি ওনার রাজপুত্রের হরিণের মত লম্বা পাপড়ির চোখের দিকে তাকালেন।

"দেবতারা আপনার জবাব পাঠিয়েছেন, লানন হাইকানাস।" একে একে বাকি পুরোহিত, সভাসদ, যোদ্ধা আর শিকারিদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন উনি। সবাই এক কুসংস্কারচ্ছন্ন সম্ভ্রমে তাকিয়ে আছে তার দিকে। উনি পরে বাআলকে আলাদাভাবে বলি দেবেন বলে ঠিক করলেন, জাঁকালো বা দামী কিছু না, হয়তো একটা মুরগি...আজকের এই চমৎকার সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। এযাবতকালের তার সেরা বলিদানের ঘটনা এটা। হুই তার এই সাফল্যে এতটাই খুশি হয়ে গেলেন যে পরের কথাটা বলতে গিয়ে নাটকীয় একটা ভঙ্গি করার লোভ সামলাতে পারলেন না।

"বেরিয়ে পড়ুন, ওপেটের রাজপুত্র...অধিকার করুন আপনার গ্রাই-লায়নকে।"



ছোট্ট বুশম্যানটা ওদেরকে মহিষদের চলার একটা পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেল। জায়গাটা হচ্ছে সবুজ নলখাগড়ার একটা সুড়ঙ্গ, প্যাপিরাস মাথার উপরে উঠে ঢেকে দিয়েছে আকাশ, পায়ের নিচে স্যাঁতসেঁতে জলার মাটি, নাকে এসে লাগছে জলার নানান প্রাণীর গায়ের দুর্গন্ধ। অবশেষে খোলা তৃণভূমিতে বেরিয়ে এল সবাই। উজ্জ্বল সবুজ রঙের ঘাসগুলো অগণিত মহিষের পালের চারণের কারণে ছোট হয়ে কাটা পড়ে আছে। উপকূলের এতটা দূর পর্যন্তও এদের দেখা মেলে।

বুশম্যানটা ঘুরে, প্যাপিরাসের দঙ্গলের কিনার বরাবর ধরে এগিয়ে নিয়ে গেল দলটাকে। বিশাল এক বহর নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দলটা–চার থেকে পাঁচশো জন শক্তিশালী মানুষ, কারণ সম্ভ্রান্ত নয় পরিবারের অনেকেই গ্রাই-লায়নকে দেখতে নিজেদের চারপাশে তীরন্দাজ ও কুঠারবাহকের পুরু আবরণ ছাড়া উপকূলে আসতে রাজি হয়নি। ওরা অবশ্য লাননের দলটার চাইতে অনেক পেছনে পড়ে আছে। এই দলে আছে শিকার-সর্দার মুরসিল, তার গা থেকে ভুরভুর করে জেং-এর ওয়াইনের ঘ্রাণ বের হচ্ছে, বুশম্যান, হুই, রাজপুত্র নিজে আর তার দুই অস্ত্রবাহক।

সকাল বেলাতেই কৃত ওয়াদা এখনও মেনে চলছেন দেবতারা। বুশম্যান তাদেরকে প্যাপিরাসে মোড়া জলার কিনার ধরে এমন একটা সমতল ভূমিতে নিয়ে এল যেটা দেখতে একটা তুলে ধরে তর্জনির মত, ওটার প্রান্ত পেরিয়ে আসতেই আরও একটা খোলা ঘাসের সমুদ্রে এসে উপনীত হলেন ওনারা। জায়গাটা একদমই প্রাকৃতিক, তিনদিকে কালো রঙের নলখাগড়া জন্মে বেড়ার মত হয়ে আছে, সেখান থেকে প্রায় আধা মাইলের বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তরতাজা ঘাসের রাজ্য।

প্রান্তরটার ঠিক মাঝে, নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর ছয়টা বিশাল কালো জিনিস পড়ে আছে, খোলা জায়গা হওয়ার কারণে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একদম; তবে ওগুলো কী তা বোঝার জন্য জায়গাটা অনেক দূর।

শিকার-সর্দার মুরসিল দ্রুত পিগমি পথপ্রদর্শকটার সাথে অদ্ভুত এক ভাষায় কী সব আলাপ করে নিল। হুই মনে মনে ঠিক করলেন যে, এই ভাষাটা শিখবেন, পুরো চার রাজ্যের মাঝে এটাই একমাত্র কথ্য ভাষা যেটায় উনি অনর্গল কথা বলতে পারেন না।

"জাঁহাপনা, ও বলছে যে ওগুলো নাকি গ্রাই-লায়নের মারা মহিষ," মুরসিল অনুবাদ করে শোনালো, সেই সাথে উগরে দিল ওয়াইনের উষ্ণ ঢেকুর।

"জানোয়ারটা কোথায়?" লানন জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বুশম্যান আঙুল তুলে দেখালো।

"ওখানেই আছে, দুই নম্বর শিকারটার পেছনে। ওটা আমাদেরকে দেখেছে, আওয়াজও শুনতে পেয়েছে, তাই এখন শুয়ে পড়ে লুকিয়ে আছে," ব্যাখ্যা করে বলল মুরসিল।

"ও কি দেখতে পাচ্ছে জানোয়ারটাকে?" জানতে চাইলেন লানন।

"হ্যাঁ, হুজুর। ওটার কানের ডগা আর চোখও দেখতে পাচ্ছে। সোজা আমাদের দিকে নাকি তাকিয়ে আছে এখন।"

"এতো দূর থেকে?" বুশম্যানের দিকে ফিরে অবিশ্বাসী সুরে বললেন লানন। "বিশ্বাস করি না।"

"ব্যাপারটা সত্যি, হুজুর। ওর চোখ ঈগলের মত।"

"যদি ওর কথা ভুল হয়, তাহলে দায় তোমার," সাবধান করলেন লানন।

"দায় পুরোটা আমার," সাথে সাথে সম্মতি দিল মুরসিল, লানন হুইয়ের দিকে ফিরলেন।

"প্রস্তুত করে দাও আমাকে, সূর্যের পাখি।"

ওরা লাননের গায়ের সব বর্ম খুলে ফেলল, তারপর লিলেনের এক টুকরো কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিল কোমর, পায়ে পরিয়ে দিল হালকা চপ্পল। দলের বাকিরাও ওখানে পৌঁছে গেল ততোক্ষণে। কয়েকজন বৃদ্ধ সভাসদ সারা গায়ে

কাদা মাখামাখি হয়ে গিয়েছেন। আসমান নামের এক বৃদ্ধ অভিজাত–দেখতে দুর্বল আর চুল সাদা হয়ে এসেছে–ওনার ডুলির বাহকদেরকে লাননের পাশে এসে থামালেন।

"আশা করছি প্রথম আঘাতেই শিকার করতে পারবে," রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করলেন উনি। "ঠিক তোমার বাবা করেছিলেন যেভাবে।" তারপর বাহকরা তাকে এমন জায়গায় বয়ে নিয়ে গেল যেখান থেকে উনি মাঠটার একটা পরিষ্কার দৃশ্য দেখতে পাবেন। দলের বাকিরা নলখাগড়ার কিনার ধরে ছড়িয়ে পড়ল, ওদের অস্ত্র আর বর্মে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে, পরনের আলখাল্লা বেগুনি, সাদা আর লাল, কালো নলখাগড়ার বিপরীতে ধূসর রঙের ছিটে বলে মনে হচ্ছে। লানন সামনে এগিয়ে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই চুপ করে গেল সবাই।

কোমরের নেঙটি বাদে শরীরে আর কোনো কাপড় নেই তার, গায়ের চামড়া মসৃণ আর ধবধবে সাদা, শুধু যেসব অংশে রোদ লাগে সেসব জায়গায় পোড়া একটা ভাব। দারুণ সুঠাম দেহ তার, লম্বা আর প্রতিটা অঙ্গই মাধুর্যময়। চওড়া কাঁধ এবং চিকন কোমর আর পেট। মাথার কোকড়া চুল একটা বেগুনি ফিতা দিয়ে বাঁধা, তার লালচে-সোনালি দাঁড়িও মুঠো করে বেঁধে গলায় সামনে ঝোলানো।

উনি সামনে অপেক্ষারত সম্মানীত ব্যক্তিবৃন্দের দিকে তাকালেন।

"আমি ওপেট শহর, এবং বাকি চার সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দাবী করছি," সোজা সাপ্টা বলে দিলেন উনি, ওনার কণ্ঠ সামনের সবার কানেই পরিষ্কারভাবে পৌঁছে যেতে লাগল।

হুই ওনার অস্ত্র এগিয়ে দিলেন। প্রথমে দিলেন ঢাল। জিনিসটা দেখতে মহিষের মাথার মত–বড়সড় উপবৃত্তাকার আকৃতির, উচ্চতায় মানুষের সমান আর ওনার কাঁধ সমান চওড়া। ঠিক মাঝখানে আছে 'চোখ'–সাদা আর হলুদে আঁকা ক্রুদ্ধ একজোড়া পেঁচার চোখ সেগুলো। এগুলো যখন কোনো জানোয়ারের চোখে পড়ে, সেটা তখন প্রাকৃতিক আগ্রাসী দৃষ্টি হিসেবে ধরা দেয় আর সাধারণত শিকারি প্রাণীকে উস্কে দেয় আক্রমণ করতে।

"আশা করি এই বর্মটা আপনাকে ভালোভাবেই রক্ষা করবে," নরম স্বরে হুই বললেন তাকে।

"ধন্যবাদ, বন্ধু।"

এরপর হুই তার হাতে তুলে দিলেন সিংহ বধের বর্শা। জিনিসটা এত ভারি আর কষ্টসাধ্য অস্ত্র যে শুধুমাত্র কোনো শক্তিশালী মানুষই পারে সেটা সামলাতে। দণ্ডটা তৈরি খুব বাছাই করে নেওয়া শক্ত কাঠে, এরপর সেটাকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে, সবশেষে বাঁধাই করা হয়েছে কাঁচা চামড়া দিয়ে। পদ্ধতিটা সহজ–কাঁচা চামড়া এর উপর বসিয়ে দেওয়া হয়, পরে ওটা নিজেই

শুকিয়ে গিয়ে এঁটে বসে উপরে। লাননের কবজির সমান মোটা অস্ত্রটা, লম্বায় ওনার চাইতে দ্বিগুণ।

অস্ত্রটার ফলায় কোনো কাঁটা নেই, দণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে যথেষ্ট চওড়া ও ভারি ফলাটা। চামড়ার রশি দিয়ে বেঁধে আটকানো দণ্ডের সাথে, মাথাটা গোল হলেও শান পাথরে ঘষে ক্ষুরের মত ধারালো। এমনভাবে অস্ত্রটা নকশা করা, যেন সর্বোচ্চ পরিমাণ মাংস ভেদ করে ঢুকে যেতে পারে; একবার ঢুকে যেতে পারলে এত বড় ক্ষত সৃষ্টি করে যে, প্রচুর রক্তপাত শুরু হয়ে যায় সাথে সাথেই।

"ফলাটা যেন জন্তুটার হৃৎপিণ্ড খুঁজে পায়," ফিসফিসিয়ে বললেন হুই, তারপর জোরে বললেন, "হুঙ্কার দিন, ওপেটের গ্রাই-লায়ন।"

লানন হাত বাড়িয়ে পুরোহিতের কাঁধ স্পর্শ করলেন। তারপর আলতো চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলেন সেটা।

"উড়ে যাও, সূর্যের পাখি," বলে ঘুরে গেলেন উনি। ঢালটা ঝোলানো কাঁধে, 'চোখ'-জোড়া যাতে দেখা না যায় সেদিকে সতর্ক থেকে, অপেক্ষারত জানোয়ারটার দিকে এগিয়ে গেলেন লালন। রোদের মাঝেও খাড়া হেঁটে গেলেন উনি সেদিকে, শুধু নামে না, সব দিক দিয়েই রাজা; হুইয়ের হৃদয়টাও যেন ছুটে গেল তার সাথে। চুপচাপ হুই প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, আশা করছেন যে দেবতারা এখনও মনযোগ দিচ্ছেন তার দিকে।

লানন তার হাঁটু স্পর্শ করে থাকা নরম ঘাস মাড়িয়ে হেঁটে গেলেন। যেতে যেতে মনে করতে লাগলেন ওনার সেরা এবং বয়স্ক শিকার-সর্দারদের উপদেশগুলো, ওনাদের শেখানো প্রতিটা কৌশল মনে মনে দেখে নিতে লাগলেন, প্রতিটা বাক্য আওড়াতে লাগলেন।

"'চোখ'-জোড়া দেখানোর আগে, ওটাকে গর্জন করতে দেবেন।"

"আপনার দিকে কোনাকুণিভাবে আসতে দেবেন ওটাকে।"

"ওটা সবসময় মাথা নিচু করে আক্রমণ করবে। তাই পাশ থেকে ওটার বুক বরাবর মারতে হবে।"

"ওটার খুলিটা পুরো লোহার মত। কাঁধের হাড়ে তো সবচে শক্ত ধাতুও আটকে যাবে।"

"আঘাত করার জায়গা একটাই। ঘাড়ের গোড়া—মেরুদণ্ড আর কাঁধের ঠিক মাঝের জায়গাটায়।"

তারপর মাথায় এল এদের মাঝে একমাত্র যিনি গ্রাই-লায়নের মুখোমুখি হয়েছেন তার কথা, হামিলকার বার্কা, ওপেটের ছেচল্লিশতম গ্রাই-লায়ন, "একবার বর্শাটা ঢুকিয়ে দিলে, সেটাকে ধরে রাখবে। বাবা, জীবন দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে সেটা। কারণ তখনও গ্রাই-লায়নটা জ্যান্ত থাকবে, ওটা মরার আগ পর্যন্ত বর্শার দণ্ডটাই ওর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে।"

লানন ধীরে সুস্থে হেঁটে যেতে লাগলেন, দৃষ্টি সামনের কালো পেট ফোলা মহিষের লাশের দিকে, কিন্তু যে জানোয়ারটাকে শিকার করতে এসেছেন সেটার নামগন্ধও নেই।

"ওরা ভুল করেছে," মনে মনে ভাবলেন। "এখানে তো নেই কিছুই।"

নীরবতার মাঝে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলেন উনি, ওনার প্রতিটা পদশব্দ, প্রতিটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হিস হিস শব্দও কানে আসতে লাগল। মৃত মহিষটা পরখ করে এগিয়ে গেলেন সামনে, ডান বগলের নিচে সিংহ মারার বর্শাটার শেষ প্রান্ত আরও জোরে চেপে ধরেছেন।

"কিছুই নেই এখানে। চলে গিয়েছে গ্রাই-লায়ন," ভাবনাটা মাথায় আসতেই আচমকা সামনেই নড়া-চড়ার আভাস পেলেন উনি। শুধু দুটো কান এক মুহূর্তের জন্য খাড়া হয়ে নেমে গেল আবার, কিন্তু এতেই বুঝে গেলেন যে ওটা ওখানে বসে ওনার জন্যেই অপেক্ষা করছে। টের পেলেন শরীরের নিম্নাংশে যেন আর বল পাচ্ছেন না, ভয় জমে ভারি হয়ে গিয়েছে পা; কিন্তু জোর করে সামনে এগোলেন উনি।

"ভয়ই হচ্ছে বিনাশকারী," মনে মনে জপলেন উনি, চেষ্টা করতে লাগলেন জোর করে ভয়টা সরিয়ে দিতে। কিন্তু এই অনুভূতিটা একটা ঠান্ডা ভারি জিনিস, ঠিক ওনার পেটের ভেতরের চর্বির মত। উনি এগিয়ে গেলেন, হঠাৎ করেই গ্রাই-লায়নটা একটা মহিষের লাশের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো। সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে, খাঁড়া হয়ে আছে কান, অলসভাবে দুলছে লেজটা, মাথা সোজা করে তাকিয়ে আছে ওনার দিকে–লানন শব্দ করে দম আটকে ফেললেন। জন্তুটা যে এত বড় হবে সেটা উনি ভাবেননি। একটা পা বাড়াতে গিয়েও বাড়ালেন না আবার, ইতস্তত করতে লাগলেন। জানোয়ারটা প্রকাণ্ড, অবিশ্বাস্য, ঠিক যেন দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে এসেছে।

জানোয়ারটা থেকে প্রায় ২০০ পেস তথা আড়াই ফুট দূরে আছেন লানন, সাহস সঞ্চয় করে সোজা ওটার দিকে হাঁটা শুরু করলেন, 'চোখ' সরিয়ে রেখেছেন আড়ালে, সামনে এগোতেই খেয়াল করলেন বিশাল বিড়ালটার লেজ উত্তেজনায় আগের চাইতে দ্রুত দুলতে শুরু করেছে।

এখন দূরত্ব ১০০ পেস, লেজটা রাগান্বিত ভঙ্গিতে বাতাস কাটতে শুরু করল, যেন গ্রাই-লায়নের পেটের দুই পাশে একটা চাবুক বাড়ি দিচ্ছে। বিড়ালটা ঝুঁকে গেল সামান্য, খুলির সাথে লেপ্টে গিয়েছে কান। লানন এখন ওটার চোখজোড়াও দেখতে পাচ্ছেন, ডোরাকাটা মুখায়ববের মাঝে গনগনে হলুদ চোখ।

এগিয়ে যেতে লাগলেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাই-লায়নটার ঘাড়ের কেশর দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে, ফুলে উঠলো ওটার মাথার আকৃতিতে। মাথা নিচে রেখেই পুরো শরীর নিচু করে ফেলল জানোয়ারটা। ওটার লেজ ভয়ানকভাবে

বাড়ি খাচ্ছে এখন, লানন না থেমে সোজা এগিয়ে যেতে লাগলেন ওটার দিকে।

এখন তাদের মাঝের দূরত্ব ৫০ পেস মাত্র, আচমকা গ্রাই-লায়নটা গর্জন করে উঠলো। শুনতে মনে হলো অনেক দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দের মত, ভূমিকম্পের সময় পাতালের ভেতরে হওয়া গমগমের মত, ঝড়ের সময় উপকূলে ঢেউ আছড়ে পড়ার পেট মোচড়ানো আওয়াজের মত। লানন থেমে পড়লেন, এই হুংকার কানে আসার পর আর পা বাড়ানোর সাহস হলো না। জমে গেলেন জায়গায়, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ক্রোধান্বিত জানোয়ারটার দিকে।

একটা দীর্ঘ মুহূর্ত ইতস্তত করলেন উনি, তারপর আতঙ্ক সামলাতে না পেরে, ঝপ করে কাঁধ থেকে ঢালটা নামিয়ে নিয়ে এসে 'চোখ'টা দেখিয়ে দিলেন। ওই গনগনে গোলক দুটোই শুধু বাকি ছিল জানোয়ারটার ক্রোধকে সর্বোচ্চ চূড়ায় তুলে দিতে। কালো ঝুঁটিঅলা লেজটা স্থির হয়ে গেল, পিঠের চাইতে সামান্য উপরে তুলে ধরে রেখেছে, মাথা নিচু করে বুকের সাথে ঠেকানো, তারপরেই ধেয়ে এল ওটা।

ঠিক একই মুহূর্তে, সিংহটা ধাওয়া শুরু করতেই লাননও পায়ের আঙুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, ছুট দিলেন সামনে। শরীর থেকে খসে পড়েছে ভয়ের যত শেকল, হালকা কিন্তু দীর্ঘ পদক্ষেপে উনি সোজা এগিয়ে যেতে লাগলেন আক্রমণোদ্যত জানোয়ারটার দিকে। এগোতে এগোতে গ্রাই-লায়নটার সামনের দিক থেকে সরে গিয়ে কোনাকুণি একটা অবস্থানে চলে যেতে লাগলেন উনি, ওনার দিকে ঘুরে যেতে বাধ্য করলেন ওটাকে, এমন এক দিকে নিয়ে আসতে লাগলেন, যাতে বুকের পাশ দিয়ে ওটার ঘাড় উন্মুক্ত হয়ে যায়।

লাননের দৌড়ের সাথে সাথে বর্শার ফলাটা ওনার সামনের মাটির উপর নাচতে লাগল, ঠিক যেন রোদের ভেতর দৌড়াতে থাকা কোনো ফড়িং।

গ্রাই-লায়নটা প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে এল, মাটি ঘেঁষে দৌড়াচ্ছে, মাথা এত নিচু যে প্রকাণ্ড বাঁকানো শুভ্র দাঁত দুটো বুক স্পর্শ করে আছে প্রায়। শিকার কাছে এসে পড়ায় ঘাসের ভেতরে এঁকেবেঁকে এগোতে লাগল ওটা, লানন পুরো দৃষ্টি জুড়ে শুধু ওটার বিশাল বপু দেখতে পেলেন।

একেবারে সর্বশেষ মুহূর্তে লানন বর্শার মাথাটা সামান্য উপরে তুলে ধরলেন, ঘাড়ের গোড়ার সবচে নাজুক জায়গাটার দিকে নিশানা করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রাই-লায়নটা বর্শাটার দিকে তার সকল ওজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাদামি লোমশ শরীরে ঢুকে গেল ফলাটা, বাঁধা না পাওয়ায় মাংস টেনে নিল সেটাকে, সংঘর্ষের ফলে বর্শার দণ্ডটা উঠে গেল উপরে আর ধাক্কায় লানন প্রায় উল্টে পড়ে যেতে লাগলেন—কিন্তু বর্শাটা ছাড়লেন না।

লালনের মনে হলো একটা ঝড় পাক খেয়ে উঠছে ওনাকে ঘিরে, হুংকারে প্রকম্পিত হতে লাগল চারপাশ, ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো কানের পর্দা, গ্রাই-লায়ন তার মরণ আর্তনাদ শুরু করেছে। সিংহ বধের বর্শাটা চাবুকের মত সপাং সপাং করে নড়তে লাগল তার মুঠোর মধ্যে, বুকের পাঁজরে বাড়ি খেয়ে, আঘাতে মাংস কেটে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে লাগল, এত জোরে ওনাকে ঝাঁকি দিতে লাগল যে দাঁতে দাঁত বাড়ি খেতে লাগল খট খট করে, জিহ্বাও কেটে গেল খানিকটা। কিন্তু উনি বর্শাটা ছাড়লেন না।

গ্রাই-লায়নটা পিছিয়ে যেতেই লাননের পা আর মাটিতে থাকলো না, বর্শার দণ্ড ধরে ঝুলতে লাগলেন শূন্যে। মস্ত বিড়ালটা আবার সামনে আক্রমণের চেষ্টা করতেই এবার আছড়ে পড়লেন মাটিতে। বাহু আর কাঁধের পেশী আর তন্তু ছিঁড়ে গেল বলে মনে হলো লাননের, গ্রাই-লায়নের থাবা তার পলকা চামড়ার ঢালে আচড় কাটছে টের পেলেন। দুর্বল লাগতে লাগল তার, চোখে অন্ধকার দেখছেন, কিন্তু তখনও সিংহের গর্জন চলতেই লাগল, কেঁপে উঠলেন উনি তাতে।

আরও একবার গ্রাই-লায়ন গর্জন করে পিছিয়ে গেল। লাননের কাছে মনে হল কেউ তাকে টান দিয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল যেন, সিংহ বধের বর্শার দণ্ডটা একটা কচি ডালের মত মড়াত করে ভেঙে গেল। এবারের ধাক্কায় লানন দণ্ডটার গোড়া চেপে ধরা অবস্থাতেই ছিটকে গেলেন। কয়েকটা দীর্ঘ সেকেন্ড ধরে উড়ে গেলেন উনি, পাখির মতই মুক্ত, তারপরেই দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ে ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের হয়ে গেল। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে নিজেকে টেনে বসিয়ে হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগলেন চারপাশে, বর্শার ভাঙা দণ্ডটা তখনও বুকের সাথেই ধরে রেখেছেন।

দশ পেস দূরেই গ্রাই-লায়নটা ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। বর্শার ভাঙা দণ্ডটা, ঠিক লানন যেখানে নিশানা করেছিলেন, সেখান দিয়েই বেরিয়ে আছে। এভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকায় ফলাটা নির্মমভাবে ওটার মাংসের আরও গভীরে ঢুকে গিয়েছে, একটা মারাত্মক জখম হয়ে জায়গাটা থেকে টকটকে লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে ছলকে ছলকে। কিন্তু ওটার হলুদ-চোখজোড়া এখনও ওনার উপরেই নিবদ্ধ, ওই প্রকাণ্ড বাঁকা দাঁতগুলো তার মাংসের লোভে ঝিলিক দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ওটা, শ্বাসের তালে চওড়া গলাটা কাঁপছে, অবশ হয়ে যাওয়া দেহের পেছনের অংশ টেনে টেনে এগোচ্ছে, মারা যাচ্ছে কিন্তু এখনও বিপজ্জনক।

"মর," মনে মনে বললেন লানন, মোহাবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছেন ওটার দিকে, মাটিতে আছাড় খাওয়ার প্রচণ্ডতায় নড়া-চড়ার শক্তি আর অবশিষ্ট নেই ভেতরে। "মর," আবার বললেন মনে মনে। "দয়া করে মরে যা।"

আচমকাই মস্ত বিড়ালটাকে চূড়ান্ত খিঁচুনিতে পেয়ে বসল। পিঠ বাঁকা হয়ে গেল ওটার, সোজা হয়ে গেল পা, মাটির ভেতরে গেঁথে দিল থাবা, মুখটা হাঁ করে ফেলল, গোলাপি দেখা যাচ্ছে ভেতরটা, তারপর ডেকে উঠলো একবার। জীবনের শেষ যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ, তারপরেই মারা গেল।

দর্শকদের অর্ধবৃত্তটা উল্লাসধ্বনি করে উঠলো, জলাভূমির নিঃসীম নীরবতায় অবশ্য সহসাই হারিয়ে গেল সেই হল্লা। তারপর ওনারা সবাই আস্তে আস্তে ঘাসের সমতলে পড়ে থাকা রাজার দিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু হুইকে দেখা গেল দৌড়াচ্ছেন। তার পা দুটো বিকৃত ধড়ের তুলনায় বেশিই লম্বা, দেখে মনে হচ্ছিল যেন মাটির উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলছেন, তার লম্বা কালো চুলের বেণী মাথার পেছনে ঢেউ খেলিয়ে উড়ছে আর কাঁধে ঝুলছে শকুনখচিত কুঠারটা।

লানন যেখানে বাঁকা হয়ে ঘাসের উপর বসে আছেন, হুই সেখান থেকে অর্ধেক দুরত্বে থাকতে আরেকটা গ্রাই-লায়ন উঠে দাঁড়ালো। ওটা এতক্ষণ সবচে কাছের মহিষটার লাশের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। হুই সেটা দেখতে পেয়েই চিৎকার করে সাবধান করার চেষ্টা করলেন।

"লানন! পেছনে! সাবধান!"

লাননও পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন সেটা। এটা হচ্ছে জোড়ার মাদীটা, গায়ের রঙ আরও হালকা, তবে শারীরিক গঠন বেশ মনোহর, কিন্তু পুরুষটার চাইতে বেশি নিষ্ঠুর লাগে চলনে-বলনে।

"বাআল গতি দাও আমাকে!" প্রার্থনা করতে করতে রাজপুত্রের দিকে দৌড়ে গেলেন হুই, রাজপুত্র তখন নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। গ্রাই-লায়নটা মাটিতে পেটে ঠেকিয়ে এগিয়ে আসছে, ছোট ছোট লাফ দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছে সামনে।

হুই তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়াতে লাগলেন, রাজপুত্রের জন্য ভয় আর আতংকে গতি বেড়ে যাচ্ছে তার। লানন ততোক্ষণে পায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়েছেন, দুর্বলভাবে চেষ্টা করছেন ওনাকে অনুসরণ করতে থাকা বিড়ালটা থেকে দূরে সরে যাওয়ার। আর এতে বরং গ্রাই-লায়নটার শিকারি সত্তাটাকে উস্কে দেওয়া হলো আরও। কোন রাখঢাক না করেই এগিয়ে আসতে লাগল এবার জানোয়ারটা।

হুই ওটার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। "এদিকে!" চিৎকার করলেন উনি। "এদিকে আয়!" বিড়ালটাও তাকে প্রথমবারের মত খেয়াল করল। ওটা মাথা তুলে তাকালো হুইয়ের দিকে। দীর্ঘ ফ্যাকাসে দাঁত দুটো ঝিলিক মারছে, হলুদ আর ধকধক করছে চোখ দুটো।

"এই তো," আবার চেঁচালেন হুই। "এই তো আমি!" দেখতে পেলেন লানন টলে উঠে পড়ে গেলেন আবার, মুখ থুবড়ে পড়ে চলে গেলেন ঘাসের

আড়ালে, তবে হুই জানোয়রটার দিকেই মনোযোগ দিলেন। লেজ সোজা করে, মাথাও নিচু হয়ে করে ফেলল আবার। সবেগে আক্রমণ করে বসল ওটা, হুই এগোনো থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ওখানেই দাঁড়িয়ে গ্রাই-লায়নটার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন উনি, শক্তিশালী দুই পা শক্ত করে ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন, কুঠারটা তখনও কাঁধে, সোজা ওনার দিকে আসতে দিলেন বিড়ালটাকে।

ওটা কাছে এগিয়ে আসতেই, হুই গ্রাই-লায়নের দুই চোখের মাঝের হীরার মত দেখতে কালো জায়গাটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, সেই সাথে কাঁধ থেকে নামিয়ে দুই হাতে চেপে ধরলেন কুঠারটা, সাবধানে সুবিধামতো উঁচু করে তুলে ধরলেন সেটাকে।

সর্বশেষ ধাপ কয়টা গ্রাই-লায়ন দুইরঙ্গা তরলের ঝাপসা নড়া-চড়ার মতই এগিয়ে এল হুইয়ের দিকে, একটা বামন কুঁজোর মাথার উপরে বিশাল লাগতে লাগল ওটাকে।

"জয় বাআল," চিৎকার করে উঠলেন হুই আর সাঁ করে ছুটে গেল কুঠারটা। ফলাটা কড়াত করে ফাটিয়ে দিল গ্রাই-লায়নটার খুলি, মস্তিস্কের গভীর ঢুকে গেঁথে গিয়ে, সাথে সাথেই ছুটে গেল তার মুঠো থেকে, বিশাল জানোয়ারটা ওটার সমস্ত ওজন নিয়ে আছড়ে পড়ল তার বুকের উপর।

হুইয়ের মনে হলো এক বহু দূরের, প্রচণ্ড কোলাহলে ভরা অতল কোনো সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে যেন টেনে তুলে আনল তাকে কেউ। চোখ খুলতেই দেখলেন লানন হাইকানাসকে, ওপেটের সাতচল্লিশতম গ্রাই-লায়ন, সূর্যের আলোয় ঝুঁকে বসে আছেন তার উপর।

"বুদ্ধু কোথাকার," বললেন রাজা, তার নিজের চেহারাও কাটা-ছেঁড়ায় ভরা, ফুলে আছে জায়গায় জায়গায়। রক্তের ধারা শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে। "ওহ! দুঃসাহসী বেকুব কোথাকার।"

"দুঃসাহসী মানতে পারি," কাতর কণ্ঠে অস্ফুটে বললেন হুই। "তবে বেকুব জীবনেও না, মহামান্য।" দেখতে পেলেন লাননের চোখে স্বস্তি নেমে এল।



ওরা গ্রাই-লায়ন দুটোর চামড়া ছাড়িয়ে রাজপুত্রের জাহাজের প্রধান মাস্তুলে টাঙ্গিয়ে দিল। আর লানন হাইকানাস ওটার নিচে একটা নরম পশমের গদিতে হেলান দিয়ে বসে নয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রশানদের কাছ থেকে তাদের আনুগত্য আর সহযোগিতার শপথ গ্রহণ করলেন।

"তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, হুই। মারাত্মক আঘাত পেয়েছো। বুকের হাড্ডি ভেঙে গিয়েছে নিশ্চি..."

"জাঁহাপনা, আমি হচ্ছি পাত্র-ধারক। আপনি আমাকে সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চান?"

নয়জনের মাঝে আসমান সবার আগে শপথ নিলেন। ওনার ছেলেরা ওনাকে ডুলি থেকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল, কিন্তু লাননের দিকে এগোনোর সময় ওনাকে ধরতে যেতেই, ওদের হাত সরিয়ে দিলেন উনি।

"আপনার ভ্রূর শুভ্রতা, আপনার শরীরের আঘাতের চিহ্নের প্রতি সম্মান রেখে বলছি, আপনাকে হাঁটু মুড়ে বসতে হবে না।"

"আমি হাঁটু মুড়েই বসবো, আমার সম্রাট," আসমান জবাব দিলেন, তারপর রোদের ভেতরেই ডেকের উপর বসে পড়লেন উবু হয়ে। বাআলকে অবশ্যই এই দুর্বল অশীতিপর বৃদ্ধের শপথ গ্রহণ প্রত্যক্ষ করতে হবে। হুই অমৃত পাত্রটা ওনার ঠোঁটের সামনে ধরতেই উনি সেটা থেকে পান করলেন, তারপর হুই সেটা নিয়ে গেলেন রাজার কাছে। উনিও পান করে ফেরত দিলেন হুইকে।

"তুমিও খাও, পুরোহিত।"

"কিন্তু সেটা তো রীতি না," সংকোঁচে বললেন হুই।

"ওপেট আর চার সাম্রাজ্যের রাজাই রীতির স্রষ্টা। খাও!"

হুই তবুও ইতস্তত করলেন একটু, তারপর পাত্রটা তুলে লম্বা একটা চুমুক দিলেন তাতে। নয়জনের মাঝে সবার শেষে শপথ নিলেন হাব্বাকুক লাল, এর মাঝেই পাঁচবার পাত্রটা জেং-এর মিষ্টি ওয়াইন দিয়ে পূর্ণ করে নিতে হলো।

"তোমার ব্যথা কমেছে?" হুই সর্বশেষবার লাননের কাছে পাত্রটা নিয়ে গেলে নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন উনি।

"মহামান্য, আমার কোনো ব্যথা নেই," জবাব দিলেন হুই। তারপর আচমকাই এমনভাবে খিলখিল করে হেসে উঠলেন যে রাজার বুকের উপর এক ফোঁটা ওয়াইন চলকে পড়ল।

"উড়ে যাও, সূর্যের পাখি," লাননও হাসলেন।

"গর্জে উঠুন, গ্রাই-লায়ন," বললেন হুই, হাসি চলতে লাগল তার। লানন সামনের ডেকে জড়ো হয়ে থাকা বিশিষ্টজনদের দিকে ফিরলেন এবার।

"সবার জন্য খাবার আর পানীয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।" অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ। লানন হাইকানাস এখন রাজা। "হাব্বাকুক লাল!" ফ্যাকাসে-সোনালি দাড়িঅলা, সাগরের অত্যাচারে জর্জরিত হয় মুখে ফুটকি পড়া নাবিককে ডাক দিলেন লানন।

"বলুন প্রভু।"

"ওপেটের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারবেন না?"

"রাতের বেলা?"

"হ্যাঁ, আমি আগামীকাল দুপুরের আগে শহরের পৌঁছাতে চাই; আমার জানামতে আপনার চাইতে দক্ষ কেউ নেই।"

হাব্বাকুক লাল প্রশংসার জবাবে মাথা ঝোঁকালেন সামান্য, কানের ভারি দুলগুলো তার গালের সাথে দোল খেলো তাতে। তারপর গোড়ালির উপর ঘুরে গিয়ে দুদ্দাড় করে এগিয়ে গেলেন ডেকের অপর দিকে, হাঁক ছেড়ে ওনার কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতে লাগলেন।

নোঙর তোলার আওয়াজ পাওয়া গেল, জাহাজের মাস্তুলের উপরে বসে একজন ঢাকি কাঠের কাঠি দিয়ে ফাঁপা গাছের গুঁড়িতে বাড়ি দিতে শুরু করল, যাত্রা শুরুর বাজনা বাজানো শুরু করেছে।

তিনটা বাড়ি জোরে, দুটো আস্তে, আবার তিনটা জোরে। দাঁড়ের মাথাগুলো পানিতে ছপ করে ডুবে মাথা ঘুরিয়ে আবার উঠে এল পানির উপরে, আবার সেটাকে সামনে এনে ছন্দের তালে তালে বাইতে লাগল মাল্লারা। একদম নিখুঁত ঐকতানে ঢেউয়ের মত আন্দোলিত হতে লাগল, ঠিক যেন কোনো জলের পাখির ভেজা রূপালি ডানা ঝাপটাচ্ছে। লম্বা সরু খোলটা এগিয়ে যাচ্ছে হ্রদের পানিতে প্রতিফলিত অস্তগামী সূর্যের আলো কেটে কেটে, পেছনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে তরঙ্গের রেখা। মাস্তুলের মাথায় পতপত করে উড়ছে হাউস বার্কার পতাকা আর জাহাজের সামনে-পেছনের কাঠের খুপরিগুলো খাড়া হয়ে দুই ধারের প্যাপিরসের চাইতেও উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গৌরবের সাথে।

রাজার জাহাজটা বাকি জাহাজগুলোকে পেরিয়ে যেতেই সবগুলো তাদের পতাকা হেলিয়ে দিয়ে রওনা দিল পেছনে। প্রত্যেকটা জাহাজ একেবারে নিখুঁত একটা সারি করে এগোচ্ছে, জাহাজের হালিরা সব শক্ত হাতে ধরে আছে হাল, পুরো হ্রদ জুড়ে গম্ভীর গর্জন তুলে ছড়িয়ে পড়ছে ঢাকের আওয়াজ।

মশালের আলোয় আলোকিত ডেক জুড়ে ঘুরে ঘুরে হুই সবার সাথে গল্প করতে লাগলেন, শুধু ওনার ওই জবুথবু চলার ভঙ্গির জন্যেই ওনার যত অস্বস্তি লাগতে লাগল; পাশা খেলার আসরে, ওয়াইনের পেয়ালা উল্টে ধরে তারকোজ্জ্বল আকাশের দিকে তুলে ঝাঁকিয়ে ডেকের উপর হাতির দাঁতের তৈরি গুটি ছুঁড়ে দিলেন।

"শালার ভাগ্যও আপনার," হেসে বললেন ফিলো, কিন্তু সেই হাসিও তার গাট্টাগোট্টা রোদে পোড়া চেহারাটার রাগকে লুকাতে পারলো না। "আমি কি পাগল নাকি যে দেবতাদের প্রিয়পাত্রের একজনের সাথে পাশা খেলবো?" কিন্তু দেখা গেল বোর্ডের উপর স্বর্ণ জমা করে, হুইকে আহ্বান করে বসলেন; হুই গুঁটি চালতেই আবারও তিনটা কালো মাছ উঠলো তাতে। ফিলো ওনার জোব্বাটা দুই হাতে শরীরের সাথে টেনে ধরে আগের মতই হাসতে হাসতে

সরে গেলেন ওখান থেকে, যারা ওর দিকে তাকিয়ে ছিল গালাগাল পাড়তে লাগলেন তাদেরকে।

অ্যাসটার্টের উজ্জ্বল সাদা তারাটা[৭০] যখন উঠলো, তখন লানন আর হুই গ্রাই-লায়নের ছাড়ানো চামড়াটার নিচে দাঁড়িয়ে সামনের ডেকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লড়াই শেষ হওয়ার পরের যুদ্ধক্ষেত্রের মত লাগছে দেখতে। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে মানুষ, যেখানে পড়েছে সেখানেই শুয়ে আছে, আলুথালু, হুঁশ নেই কারো। জাহাজের মৃদু দুলুনিতে একটা ওয়াইনের পেয়ালা গড়িয়ে যাচ্ছে এদিক সেদিক। অন্ধকারেও সমান গতিতেই চলছে জাহাজ।

"আরও একটা বিজয়," লানন ভরাট গলায় বললেন, ঝাপসা দৃষ্টিতে ইতিউতি তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন সামনের শুয়ে থাকা দেহটার দিকে।

"একটা উল্লেখযোগ্য বিজয়, মহামান্য।"

"আমার মনে হয়," লানন বলতে শুরু করলেন কিন্তু শেষ করলেন না। পা ভর সামলাতে পারলো না তার। ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে পড়ে যেতে গেলেন উনি। সাথে সাথেই তাকে ধরে ফেললেন হুই, তারপর কাঁধ চেপে ধরে সোজা করে রাখলেন। নিজের বুকের ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে রাজাকে ধরে নিয়ে গেলেন ডেকের নিচের মূল কক্ষে। বিছানায় শুইয়ে লাননের হাত-পা আর মাথা আরামদায়ক অবস্থানে বসিয়ে দিলেন। এক মুহূর্তে ওভাবেই থাকলেন উনি, চিত হয়ে থাকা মূর্তিটার উপর চেহারা ঝুঁকিয়ে।

"আরাম করে ঘুমান, মহামান্য," অস্ফুটে বলে নিজেও টলতে টলতে ফিরে গেলেন নিজের কক্ষে। ঢুকতেই দাসী মেয়েটা জেগে উঠলো।

"আমি আপনার লেখার সব উপকরণ গুছিয়ে রেখেছি," মেয়েটা বলল ওনাকে, হুই চোখ ছোট ছোট করে ঝোলানো কুপির নিচে থাকা লিপি, কালির দোয়াত আর লেখনীর দিকে তাকালেন।

"আজ রাতে না।" বলে উনি বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু আরেকদিকে সরে গিয়ে ছাদ থেকে বেরিয়ে থাকা বর্গা কাঠে মাথায় বাড়ি খেয়ে পিছিয়ে এলেন আবার। দাসী মেয়েটা দৌড়ে এল তাকে সাহায্য করতে, তারপর ওনাকে ধরে নিয়ে গেল জায়গামতো।

হুই চিত হয়ে শুয়ে মেয়েটার দিকে চাইলেন। মেয়েটা লাননের অন্দরমহলের একজন। হুইয়েরও ইচ্ছে করে এরকম একটা দাসী কিনতে, কিন্তু এর দাম কমপক্ষে দশটা স্বর্ণের আঙুলের কম হবে না।

"আর কিছু লাগবে, মহানুভব?" জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। মেয়েটা ছোটখাটো কিন্তু অনেক সুন্দরি, গায়ের রঙ ফ্যাঁকাসে সাদা আর হলুদের মিশ্রণ। হুই ওকে স্পষ্ট করে দেখার জন্য একটা চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

---

[৭০] চাঁদ

“আছে,” লজ্জিত কণ্ঠে বললেন হুই। “যদি তুমি একটু সাহায্য করো।” কিন্তু ওনার আকাঙ্ক্ষাটা উচ্চাভিলাষীই ছিল বলতে হবে, কারণ কয়েক মুহূর্ত পরেই ওনার নাক ডাকার আওয়াজে জাহাজের নিচের খোল পর্যন্ত কেঁপে উঠতে লাগল। মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠে নিজের পোশাক পরে নিল আবার, তারপর ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে।

ভোরে হওয়ার একটু আগে ঘুম থেকে উঠে জাহাজের সামনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হুই তার কুঠার চালনা অনুশীলন করলেন, অদৃশ্য শত্রুকে ধরে কোপালেন কিছুক্ষণ, আবছায়ার ভেতরে হিস হিস করে গুঞ্জন উঠলো তাতে। অনুশীলন শুরু করতেই তার ধমনীতে জমে থাকা অলস ওয়াইন ছুটতে শুরু করল দ্রুত, শরীরে জমতে শুরু করল ঘাম, হ্রদের ঠান্ডা বাতাসও আটকাতে পারলো না সেটা। আঘাত করার সময় সুনিপুনভাবে কুঠারটা হাতবদল করতে লাগলেন উনি, মস্ত কুঠারটাও সেই তালে দুলতে লাগল। কেটে যেতে লাগল তার মাথার ভেতরের ভোঁতা ভাবটা আর দরদর করে ঘাম বেয়ে তার হাত আর পেশল পা বেয়ে নামতে লাগল জাহাজের মেঝেতে, মহিষের কুঁজের মত পিঠের উপর দিয়ে নেমে কোমরের কাপড় ভিজিয়ে দিল তা, চোখের ভেতর ঢুকে যেতে লাগল; এদিকে হুই যেন নেচে নেচে বেড়াতে লাগলেন, হালকা চালে কয়েকবার ঘুরে ছোট্ট লাফ দিয়ে উঠে আবার নেমে এলেন, সেটার তালে তালে উড়তে লাগল কুঠারটাও।

সূর্যের প্রথম কিরণের ছোঁয়ায় আকাশ গোলাপি হওয়ার পরে অবশেষে ক্ষান্ত দিলেন উনি, তারপর কুঠারটার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শীতল বাতাসের ছোঁয়ায় ওনার শ্বাস বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে লাগল, কিন্তু শরীরের ভেতর রক্ত দৌড়াতে শুরু করেছে, আবার নিজেকে ; মনে হচ্ছে ওনার।

কক্ষে ফেরার পরে লাননের একজন দাসী এসে একটা স্বর্ণের বাঁকানো কাঁক দিয়ে ওনার গা থেকে ঘাম চেছে দিল, এটাও লাননের উপহার। এরপর ওনার সারা গায়ে সুগন্ধি তেল মেখে দিল মেয়েটা, চুল-দাড়ি আচড়ে বেণী করে দিল, সব শেষে একটা সাদা লিনেনের ঢিলেঢালা কোমরবন্ধনীবিহীন আলখাল্লা বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

উনি যখন উপরের ডেকে উঠে এলেন তখন মাত্রই নৌবহরকে থামার আদেশ দেওয়া হয়েছে, এখন ওরা সবাই পূর্ব উপকূলের দিকে ছুটছে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করার জন্য, ক্রীতদাস মাল্লারা কৃতজ্ঞচিত্তে নিজেদের দাঁড়ের উপর নেতিয়ে পড়ল। দিগন্তের উপরে সূর্যদেব দেখা দিতেই হুই বাআল-এর প্রতি প্রার্থনা সেরে নিলেন। এরপরে খোলা ডেকেই নলখাগড়া দিয়ে বোনা পাটিতে পা মুড়ে বসে বাকিদের সাথে সকালের নাস্তা সারা হলো। হুই সবার চেহারার দিকে তাকালেন, ফ্যাঁকাসে আর বিধ্বস্ত লাগছে, চোখ ফোলা আর মুখ গোমড়া। এমনকি লাননকেও মলিন লাগছে; এক বাটি গরম দুধ এবং মধু খেতে গিয়েই হাত কাঁপতে শুরু করল তার।

তেল আর মধু দিয়ে বানানো ভুট্টার তৈরি পিঠা দিয়ে নাস্তা শুরু করলেন হুই, তারপর খেলেন হ্রদ থেকেই ধরা, লবণ দিয়ে ভাপে সিদ্ধ করা বিশাল একটা ব্রিম মাছ। এরপর যখন উনি বুনো আদা পুরে আস্ত সিদ্ধ করা একটা বুনো হাঁস আর আরও গাদা খানেক পিঠা নিয়ে আসার আদেশ দিলেন তখন সবাই বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। হুই হাঁসটা ছিড়ে মুখে পুরে পরম আমোদ পাচ্ছেন এমন একটা মুখভঙ্গি করলেন, কারণ উনি নিজের এই সুখ্যাতির প্রতি ঈর্ষান্বিত।

ফিলো শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে সবার মনের কথাটাই যেন আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, "হায় বাআল! আপনার খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে শুধু আপনার পেট না আমার পেটটাও ফেটে যাবে।" বলেই উনি উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে নেমে গেলেন নিচে।

"ঠিক বলেছেন।" প্রথমবারের মত হাসলেন লানন। "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা বাচ্চার মত যে তার মায়ের দুধের চাইতে বিষাক্ত আর কিছু পান করেনি।"

"উনি মায়ের দুধ ছেড়েই লাল জেং ওয়াইন খাওয়া শুরু করেছেন, ওনার একটা দাঁতও ভেঙেছে যুদ্ধ-কুঠারে লেগে।"

"যদি হ্রদে পানির বদলে ওয়াইন থাকত তাহলে এতদিন উনি সেটাকে কমিয়ে আমাদের হেঁটে পার হওয়ার মত করে দিতে পারতেন।"

হুই একটা অপকর্মা বামন ভূতের মত বাকিদের দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে, হাঁসের শরীর থেকে আরও একটা পা ছিঁড়ে পুরে দিলেন মুখে।

সকাল গড়িয়ে যেতেই অগভীর পানিতে পৌঁছে গেলেন ওনারা, হাব্বাকুক লাল নিজে এগিয়ে জাহাজগুলো সরু খালের ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। কচুরিপানা, প্যাপিরাসসহ আরও ডজনখানেক আগাছা জন্মে ওপেটের এই জীবনদায়ী প্রস্রবণের মুখ বন্ধ করে ফেলার হুমকি সৃষ্টি করেছে। খালের নৌকাগুলোকে সরু জলপথটা থেকে টেনে সরিয়ে ফেলা হলো; দশটা বিশাল জাহাজ তাদের ভেজা রূপালি ডান ঝাপটাতে ঝাপটাতে এগিয়ে গেল সামনে। কর্মকর্তারা মাস্তুলে ঝোলানো বার্কার পতাকাকে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সালাম জানালো, তবে যে দাসের দলকে রাখা হয়েছে হ্রদের আগাছার সাথে লড়াই করার জন্য, তারা সবাই বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থেকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে রইলো ওটার দিকে।

ওপেটের কাছাকাছি চলে আসায় এখন পানিতে মাছধরা নৌকা দেখা যেতে লাগল, ওগুলোর পাশ দিয়ে জাল টেনে ওঠাতেই দেখা গেল তাতে আটকানো মাছগুলো রূপালি আভায় চকচক করছে, যেন একগাদা তারা আটকা পড়েছে জালে, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শঙ্খচিলের সাদা মেঘ, তাদের চিৎকারে কান পাতা দায়।

এরপরেই পাহাড়গুলো দেখা দিল দিগন্তে, রোদ পড়ে ম্যাড়মেড়ে লাল দেখাচ্ছে সেটা, জাহাজের কিনারে এসে ভিড় করল সবাই, বহুদিন পরে বাড়ি ফেরা আনন্দে উদ্বেল।

শিকার-সর্দার মুরসিল জাহাজের সামনের ডেকে উঠে এসে লাননের সামনে এক হাঁটু ভাজ করে সম্মান দেখালো।

"আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, মহামান্য।"

"হ্যাঁ–আর ওই পিগমিটা।"

"ও জাহাজেই আছে, মহামান্য।"

"তোমাদেরকে পুরষ্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কী চাও বলো।"

"জাঁহাপনা, আমার তিনজন স্ত্রী। তারা সবাই খুব লোভী।"

"স্বর্ণ?"

"আপনার যা মর্জি, জাঁহাপনা।"

"হুই, পাঁচটা স্বর্ণের আঙুল মুরসিলকে দেওয়ার জন্য কোষাধ্যক্ষকে আদেশপত্র লিখে দাও তো।"

"বাআল সর্বদা আপনাকে আলো দিক!"

"পিগমিটা কী চায়?"

মুরসিল পিচ্চি হলুদ বুশম্যানটাকে ডেকে আনল, লানন আগ্রহভরা চোখে দেখতে লাগলেন ওকে।

"ওর নাম কী?"

"ঝাই, মাই লর্ড।"

"ও কি আমাদের ভাষা বোঝে?"

"না, মাই লর্ড, ও শুধুমাত্র ওদের প্রাচীন ভাষায় কথা বলে।"

"জিজ্ঞেস করো যে কী চায় ও–মুক্তি নিশ্চয়ই?"

"ও আসলে মুক্তির ব্যাপারটাই বোঝে না। এর স্বভাব একটা কুকুরের মত, মহামান্য। মাথার উপরে যদি একজন মনিব না থাকে, তাহলে ওর জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না।"

"জিজ্ঞেস করো যে কী চায়।"

মুরসিল আর বুশম্যানটা পাখির মত কিচিরমিচির করে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর শিকারসর্দার আবার ফিরলো রাজার দিকে।

"একটা আজব অনুরোধ।"

"বলে ফেলো।"

"ও গ্রাই-লায়নের শিকারির সাথে সাথে শিকারে যেতে চায়।"

লানন তাকিয়ে রইলেন বুশম্যানটার দিকে, সে রাজার দিকে শিশুসুলভ সারল্য নিয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

"বেয়াদবি মাফ করবেন, হুজুর," মুরসিলের কপালে ঘাম জমেছে, অস্বস্তি বোধ করছে যেন, "এর ধারণা আপনি দেবতাদের একজন, তাই ও আপনার হয়েই থাকতে চায় আজীবন।"

লানন ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে হেসে উঠে নিজের উরুতে থাপড়াতে লাগলেন।

"তবে তাই হোক। ওকে রাজকীয় শিকারি দলের একজন সর্দার হিসেবে ঘোষণা দিলাম–সাথে সকল সম্মানী এবং সুযোগ সুবিধা পাবে। ওকে নিয়ে যাও, হুই। আমাদের ভাষা শেখাও ওকে, যদি সেটা না পারো তাহলে তুমিই শিখে নেবে ওর ভাষা।"

"সব খোঁড়া আর কানা একই দলে," দুঃখ নিয়ে মনে মনে ভাবলেন হুই। ওনার বাসা ভরে আছে এসবে, যখনই দেখা যায় যে একটা লাস্যময়ী যুবতী দাসী কেনার মত স্বর্ণ জমা হয়েছে, তখন সেটা খরচ হয় বৃদ্ধ আর দুর্বল হয়ে কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়া কোনো দাসীর পেছনে যাকে তার মালিক অ্যাসটার্টের দীঘিতে বলি দিতে ধরে নিয়ে যেত। অবশ্য এই পিগমিটা অন্তত শিকার-সর্দার হিসেবে কিছু টাকা-পয়সা পাবে, এ দিয়ে খরচাপাতি চলবে কিছু।

লানন কাজ শেষ করে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন রেলিং ধরে। অবশেষে দিগন্তের ওপারে দেখা যাচ্ছে তার মাতৃভূমি। রোদ পড়ে রক্তাভ লাল দেখাচ্ছে মন্দিরের দেওয়াল, নিচের শহরটা লাগছে উজ্জ্বল সাদা, কারণ শহরের বাড়িঘরের দেওয়াল হ্রদের ধরা মাছের খোল পোড়ানো ছাই দিয়ে লেপে রঙ করা হয়।

ওপেটের যুদ্ধবহর বন্দর থেকে এগিয়ে এসে স্বাগতম জানালো তাদেরকে। প্রতিটা জাহাজ রাজার জাহাজের চারপাশে চক্কর দিল একবার, রোদে ঝিকমিক করতে লাগল ওগুলোয় থাকা সৈন্যদের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ; সেই সাথে জাহাজগুলোর গিলটি করা তীরের মত সূচালো অগ্রভাগে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝলসাতে লাগল। বার্কা পরিবারের পতাকার নিচেই ছাড়ানো চামড়া দুটো দেখতে পেতেই সবার উল্লাসধ্বনি ছড়িয়ে গেল পানি ছাড়িয়ে।

রাজার জাহাজটাই আগে আগে ওদেরকে নিয়ে গেল বন্দরে, দাঁড় তুলে ফেলা হয়েছে, কিন্তু এতক্ষণ ছুটে আসার জড়তায় সুন্দর ভাবেই এগিয়ে গেল সামনে। হাব্বাকুক লাল শহরের নিচের পাথরের জেটিতে এগিয়ে নিয়ে গেলেন জাহাজটা, যেখানে এর মধ্যেই ভিড় জমে গিয়েছে। পুরো শহরের সকল জনগণ তাদের সবচেয়ে দামী আর সুন্দর পোশাকটা পরে বের হয়ে এসেছে, প্রায় ১০০,০০০ কণ্ঠ চিৎকার করে আনন্দধ্বনি দিচ্ছে আর স্বাগত জানাচ্ছে তাদের নতুন রাজাকে।

একেবারে সর্বশেষ মুহূর্তে হাব্বাকুক লাল হাত নামিয়ে সংকেত দিলেন ঢাকি আর হালিদের দিকে। জায়গায় ঘুরে গেল জাহাজ, প্রতিটা দাঁড় পানিতে থাবা বসিয়ে জাহজটাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, ওটার একটা পাশ হালকা ভাবে পাথরের জেটি স্পর্শ করল। লানন হাইকানাস আর তার সঙ্গী-সাথীরা নেমে এলেন জেটিতে।

হুই ভগ্ন হৃদয়ে তাকিয়ে রইলেন সামনের মহিলাদের দিকে। এরা কেউই নিষ্কর্মা, বুদ্ধিহীন দাসী মেয়ে না, যাদের সাহচর্য উনি সারা জীবন পেয়েছেন। এরা হচ্ছে পুর্ণাঙ্গ মহিলা। জীবনের সুখ দুঃখের ভাগিদার করতে তার এরকম একজন মহিলা দরকার, তিনি চেষ্টারও কমতি করেননি। ওপেটের প্রতিটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাণিপ্রার্থনা করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। ওদের কারোরই তার পিঠের বাইরে কিছু চোখে পড়ে না, অবশ্য তাদেরকে এজন্য দোষও দিতে পারেন না।

আচমকা "হু! হু!" শব্দের প্রচণ্ড আওয়াজে আনন্দ উল্লাসের ধ্বনি চাপা পড়ে গেল কিছুটা। লাননের যমজ মেয়ে দুজন তাদের আয়ার কোল থেকে নেমে ছুট দিল জেটির দিকে, কে আগে পৌঁছাতে পারে সেই প্রতিযোগিতা চলছে। ওদের বাবা এবং তার চারপাশে জড়ো হওয়া সম্ভ্রান্তদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ওরা হুইয়ের কাছে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওনার কাপড় ধরে টেনে ওদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। ওদেরকে কোলে তুলে নিতেই এবার শুরু হয়ে গেল কে ওনাকে বেশি চুমু খেতে পারে সেটা নিয়ে পাগলামি, যা শেষ পর্যন্ত চুলোচুলিতে রূপ নিল। আয়া দুজন উড়ে এসে ওদেরকে উদ্ধার করে সরিয়ে নিয়ে গেল দূরে।

ইমিলচির হাত তখনও হেলাঙ্কার সোনালি বেণী ধরে টানছে, লাননের চেহারার বিকৃতি দেখেই হুই বুঝে ফেললেন যে এর সাজা পাবে মেয়েটা, ওর তুলতুলে পাছাটা শীঘ্রই লাল করে দেওয়া হবে বেতিয়ে। হুই আফসোস করলেন যে কোনো ভাবে যদি সেটা বন্ধ করতে পারতেন!

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন হুই। মন্দিরে ফেরার পথে উনি এক দোকানির সাথে একটা মুরগি নিয়ে দরাদরি করে বেশ কম দামেই কিনে ফেললেন সেটা। বাআলকে বলিদানের পর উনি পুরোহিতদের থাকার জায়গায়–নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন, এটা মন্দিরের বেষ্টনীর দেওয়ালের মাঝে। ঘরের সবাই বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে ওনাকে স্বাগত জানাতে, ধূসর মাথা আর দাঁতবিহীন মাড়ি দিয়ে ওনাকে নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে ফুসফাস আলাপ করছে ওরা। অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে তার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শোনার জন্য। তাকে গোসল করিয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে সবাই শিকারের গল্প শুনতে লাগল।

অবশেষে উনি যখন ওদের হাত থেকে পালিয়ে নিজের বিছানায় বিশ্রাম নিতে যাওয়ার সুযোগ পেলেন–যেখানে দীর্ঘদিন ওনার শোয়ার সুযোগ হয় না–তখনই বড় চারজন রাজকুমারী এল তার কাছে। এদের সবার বয়স দশ থেকে ছয়, ওরা তার দাসীদের দুর্বল প্রতিরোধ ভেঙে ওনার ঘরে এমনভাবে আক্রমণ চালালো যেন এটা ওদের নিজেদেরই কামরা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হুই আপাতত বিশ্রাম মূলতবি রেখে একজনকে পাঠালেন তার লুটটা আনতে; যেই উনি গাইতে শুরু করলেন, একজন একজন করে দাসীরা সবাই চুপিচুপি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে চুপচাপ দেওয়াল ধরে বসে রইলো। হুই বেন-আমেন ঘরে ফিরেছেন আবার।



ওপেট শহর প্রতিষ্ঠার ৫৩৩ সালে, গ্রাই-লায়ন বধ করে চার সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠানের ছয় মাস পরে, লানন হাইকানাস, বার্কা পরিবারের প্রধান, ওপেট শহর ত্যাগ করে, তার রাজ্যের সীমানা বরাবর অভিযানে বের হলেন। এই রীতি পালনের মাধ্যমে তার কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত হবে। সেই বসন্তে তার বয়স হবে উনত্রিশ, তার সর্বোচ্চ পুরোহিতের চাইতে এক বছরের বড় উনি।

স্ত্রীদের মধ্যে চারজন নিয়েছেন সাথে, এদের কারো সন্তান হচ্ছে না, আশা করছেন দুই বছরের ভ্রমণে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। সাথে নিয়েছেন ৬,০০০ সৈন্যের দুটো বাহিনী, এর মাঝে আছে হপলাইট[৭১], হালকা পদাতিক, কুঠারবাহক আর তীরন্দাজ। সৈন্যদের বেশিরভাগই মুক্ত করে দেওয়া ইয়ুয়ি দাস, ওদের নেতৃত্বে আছে ওপেটের নয় অভিজাত পরিবারের সদস্যরা। সৈন্যদেরকে রোমানদের মত করে সংগঠিত করা হয়েছে, ইটালিয়াতে অভিযানের সময় হানিবাল শিখেছিলেন এটা। একটা বাহিনীতে দশটা দল, প্রতি দলে ছয়শো সৈন্য। এদের সবার গায়ে চমড়ার বর্ম, মাথায় চোখা শিরস্ত্রাণ, হাতে গোলাকার চামড়ার ঢাল, যাতে ব্রোঞ্জের ফুলের নকশা করা। ওদের পায়েও চামড়ার বর্ম আর কাঁটাঅলা চপ্পল, গান গাইতে গাইতে কুচকাওয়াজ করে করে এগোতে লাগল ওরা।

সেনা কর্মকর্তারা অবশ্য তাদের আভিজাত্য অনুযায়ী আরও চমৎকারভাবে সজ্জিত, তাদের বর্ম তৈরি ব্রোঞ্জ দিয়ে; তাদের গায়ের পোশাক পাতলা

[৭১]ভারি অস্ত্রধারি পদাতিক সৈন্য

লিনেনের, সেটায় বেগুনি আর লাল রঙের নকশা করা, প্রত্যেকে বাহিনীর আগে আগে চলেছে।

সাথে কোনো অশ্বারোহী দল নেই। কারণ, বিগত ৫০০ বছরে উত্তরাঞ্চল থেকে ঘোড়া ধরে আনার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। বেশিরভাগ জানোয়ারই সমুদ্র যাত্রার সময় জাহাজেই মারা পড়তো, যারা বেঁচে যেত তারাও ওপেটে আসার পরেই এক রহস্যময় রোগে ভুগে মারা পড়েছে। এই রোগে ঘোড়াগুলোর গায়ের লোম সব ঝরে ও রক্ত জমে চোখটা পরিণত হতো লালরঙ্গা জেলিতে।

ঘোড়ার জায়গায় ছিল হাতি। প্রকাণ্ড, বদমেজাজী সব জানোয়ার, ওপেটের শত্রুদের মনে উপস্থিতি দিয়েই ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে এগুলো, বিশেষ করে যখন পিঠের পালকিতে তীরন্দাজদেরকে নিয়ে আক্রমণ করে শত্রুর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীরবৃষ্টি নিক্ষেপে সাহায্য করে। যুদ্ধের উন্মত্তায়, যেভাবেই হোক, ওরা শত্রুদের পাশাপাশি নিজেদের সৈন্যদের মাঝেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে, তাই ওগুলোর মাহুতকে একটা গদা আর একটা গজাল দেওয়া হয়েছে, ক্ষেপে গেলে এগুলোর মাথায় গেঁথে দেওয়ার জন্য। লানন এরকম পঁচিশটা জানোয়ার নিয়েছেন তার অভিযানে।

দলে আরও আছে তার প্রধান পুরোহিত ও ডজনখানেক অধস্তন পুরোহিত, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, অস্ত্রনির্মাতা, রাঁধুনি, দাস; আছে স্বেচ্ছায় আসা বিশাল একটা অনুসরণকারী দল: ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, জুয়াড়ি, ভবিষ্যৎবক্তা, মদ বিক্রেতা আর বেশ্যা। গরুর গাড়ির সারিতে চলছে তাঁবু খাটানোর জিনিস আর রসদপত্র, সাত মাইল লম্বা সেই সারি, এই বিচিত্র বহরের পুরোটার দৈর্ঘ্য পনেরো মাইল ছাড়িয়েছে। তবে দক্ষিণের বিশাল বিশাল সমতল এলাকার কোনো জনবসতি না থাকায় এবং অবারিত পানি আর পশুর খাদ্যের জোগান থাকার কারণে এটা কোনো সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করছে না কেউ। কিন্তু হুই বেন-আমন যখন তার রাজার পাশে একটা নিচু পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর থেকে ধীরপদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগিয়ে আসা মানুষের মিছিলটা দেখলেন, তখন ওনার মাথায় চিন্তা এল: যখন তারা বিশাল নদীর ধারের এলাকাগুলো পরিভ্রমণ শেষে আবার উত্তর দিকে ঘুরে জঙ্গলের ভেতরে দিয়ে বৃত্তাকারে ফিরে আসতে শুরু করবেন তখন কী হবে? যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সাথে থাকবে তাতে নদীর ওপারের অচেনা দেশের ডাকাত দলের দৃষ্টি যে আকর্ষিত হবে সেব্যাপারে সন্দেহ নেই মোটেও। লাননকে হুই ভয়ের কথা জানাতেই হেসে দিলেন রাজা, তারপর চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সূর্যের দিকে।

"তোমার চিন্তা ভাবনা পুরোহিতের মত না, সৈন্যদের মত একেবারে।"

"আমি দুটোই।"

"অবশ্যই," বলে লানন ওনার কাঁধে একটা হাত রাখলেন। "ষষ্ঠ বাহিনীর অধিনায়কের দায়িত্ব তো আর এমনি এমনি দেওয়া হয়নি–তাই না! হুই, আমি অনেক ভাবনা চিন্তা করেই এই অভিযানে বেরিয়েছি। অতীতে সবসময়েই দেখা গিয়েছে এতে শুধু কালক্ষেপণ হয়; ওপেটের কোষাগারের অর্থের অপচয় ছাড়া কিছুই হয় না। আমার অভিযান হবে আলাদা। আমি এটা থেকে লাভ করতে চাই।"

হুই জাদুময় শব্দটা শুনে হেসে দিলেন, ওপেটের সবাই এটার বড় সমঝদার, তা সে সম্ভ্রান্ত হোক আর সাধারণ হোক, রাজা হোক আর পুরোহিত।

"আমি অভিযানটা একটু অন্যরকম করে করতে চাই। দক্ষিণের রাজ্যে আমরা শিকার করবো–এমন শিকার করবো যা এযাবত কালের কেউ কল্পনাও করেনি কখনো, সেগুলোর মাংস সিদ্ধ করে শুকিয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার আর খনির মালিকদের কাছে বিক্রি করা হবে তাদের দাসদের খাওয়ানোর জন্য। আমরা হাতিও শিকার করবো। আশা করছি আরও এরকম দুইশো জানোয়ার ধরতে পারবো, তাহলে তুমি মাত্র যে হুমকির কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলে সেটা ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট হবে।"

"তাই তো আমি ভেবে মরছিলাম, এত এত খালি মালবাহী গাড়ি কেন আমাদের সাথে?"

"আমরা আবার উত্তরমুখো হওয়ার আগেই ওগুলো ভরে যাবে," নিশ্চিত সুরে বললেন লানন। "আর জেং-এর বাগান দিয়ে যাওয়ার সময়, ওখানকার সৈন্যদলকে অদল বদল করে দেব। ওদেরকে সাথে নিয়ে এদেরকে রেখে আসবো ওখানে। যেসব সৈন্য এক জায়গায় অনেকদিন থেকে যায় তারা অলস আর দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জেং-এই আমি দ্রাভ-এর দূতের সাথে দেখা করে আমাদের সাথে ওদের চুক্তিটাও নবায়ন করে নেব।"

"কিন্তু উত্তরে যখন যাবেন তখন?" হুই এবার আসল প্রসঙ্গে ফিরলেন।

"জেং থেকে আমরা যুদ্ধের সাজে এগোবো উত্তরের দিকে। মহিলা আর অন্যদেরকে ওপেট পাঠিয়ে দেব মাঝের রাজ্যের রাস্তা ধরে। দুটো পূর্ণাঙ্গ বাহিনী নিয়ে পৌঁছাবো আমরা নদীর ধারে, আগে থেকেই তো ওখানে দুটো আছেই। তারপর নদী পার হয়ে আমরা কড়াভাবে দাস সংগ্রহের অভিলক্ষ্যে এগিয়ে যাবো, এতে করে ওখানের যত গোত্র আছে তারা সবাই সতর্ক হয়ে যাবে যে ওপেটে নতুন এক রাজার রাজত্ব শুরু হয়েছে।"

লানন ঘুরে তাকিয়ে রইলেন উত্তর দিকে, সূর্যের আলোয় তার সোনালি আর লালে মেশানো কেশর চকমক করতে লাগল।

"প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি ওরা আমাদেরকে যন্ত্রণা দিয়েই যাচ্ছে, আমরা ওদের সাথে নরম আচরণ করে আসছি। প্রতি বছর ওদের সংখ্যা

যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ওদের দুঃসাহস। আমি ওদেরকে দেখাবো আমার মারের জোর কত, সূর্যের পাখি। আমি ওদেরকে দেখাতে চাই যে নদীর এই পাড় ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা দিয়ে বেড়া দেওয়া, যদি ওরা এর সাথে গা লাগাতে চায় তাহলে নিজ দায়িত্বে যেন লাগায়।"

"আমি ভাবি যে ওরা আসে কোত্থেকে, কতজনই বা আছে?" হুই জিজ্ঞেস করলেন।

"ওরা হচ্ছে অন্ধকারের বাহক, ওদের গায়ের রঙ কালো, কারণ ওরা আমাদের মত সূর্যদেব বাআলের অনুসারী না। উত্তরের চিরস্থায়ী রাত্রির যে বন আছে তার অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে জন্ম ওদের, যদি কোনোদিন লোভী পঙ্গপালের ঝাঁকে পোকার সংখ্যা গুণে শেষ করতে পারো, তাহলে এদের সংখ্যাও গুণতে পারবে।"

"আপনি কি ভয় পাচ্ছেন, লানন?" জিজ্ঞেস করলেন হুই, সাথে সাথে রাজা ক্রোধান্বিত চেহারায় চোখ লাল করে তাকালেন তার দিকে।

"তুমিই বলো দেখি, পুরোহিত," নাক সিটকালেন রাজা।

"আমাকে বন্ধু বলবেন, পুরোহিত না–আর হ্যাঁ, আমি এই অনুমান করেছি আপনাকে এটা মনে করিয়ে দিতে যে অযৌক্তিক ঘৃণা উৎপন্ন হয় ভয়ের উপর ভিত্তি করে।"

লাননের রাগ পড়ে গেল, উনি তরবারির হাতলটা ধরে নড়া-চড়া করতে লাগলেন, তারপর এদিক সেদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে আশপাশে শোনার মত কেউ নেই।

"ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণই আছে," অবশেষে বললেন উনি।

"আমি জানি," বললেন হুই।



ভোর বেলা হুইয়ের নেতৃত্বে বাআলের উদ্দেশে প্রার্থনা সঙ্গীত পরিচালনা করা হলো। তবে ওনারা যথেষ্ট নিচু গলাতেই সারলেন প্রার্থনা, যাতে আশপাশের পশুপাখিগুলো বিরক্ত না হয়; হুই দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন আজকের শিকারের উপর তাদের আনুকূল্য বর্ষিত হয়, বিনিময়ে তাদের জন্য শিকারের একটা অংশ তাদের জন্য রেখে দেওয়া হবে, সানবার্ডরা[৭২] সেটাকে নিয়ে যাবে আসমানে। তারপর হুই আর লানন একসাথে এক পেয়ালা ওয়াইন

---

[৭২]শকুন

আর একটা শুকনো ভুট্টার পিঠা খেয়ে শিকারের দল প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দক্ষিণের শিকার-সর্দার মুরসিল অনেক ভেবেচিন্তে আর যত্নের সাথে শিকারের জায়গাটা বাছাই করেছে। ওনারা এখন বসে আছেন একটা নিচু পাহাড়ের ঢালে, ওখান থেকেই দেখা যাচ্ছে সামনের চোঙ্গের মত দেখতে সমতল ভূমি, দুই পাশেই পাহাড় দিয়ে পরিবেষ্টিত জায়গাটা; ভোরবেলাতে পাহাড়ের চূড়াগুলোতে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া তৈরি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ওসব জায়গায় সৈন্যরা প্রস্তুত; যদি কোনো শিকার এই উপত্যকা পেরিয়ে পালাতে চায়, তাহলে ওরা ভয় দেখিয়ে আবার এদিকেই পাঠিয়ে দেবে।

অনেক দূরে, দৃষ্টি সীমানার ওপারে সৈন্য বাহিনী দুটো ছড়িয়ে পড়েছে সমতল জুড়ে। এর মাঝেই ওরা এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূরে, দশ হাজার লোক এমনভাবে তৃণভূমিটা ধরে এগোচ্ছে যেভাবে সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়ে। তাদের পায়ের আঘাতে যে ধূলি উড়ছে সেটা সকালের নীল আকাশের পটভূমিতে মলিন একটা পর্দা বলে মনে হচ্ছে, তার ভেতর দিয়ে শিরস্ত্রাণ বা বর্শার ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠছে থেকে থেকে।

"শুরু হয়ে গেছে," সন্তুষ্টির স্বরে বললেন লানন।

হুই সমতল জুড়ে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার চারণরত পশু পালের দিকে তাকালেন। পঞ্চাশ দিনের মাথায় এটা হলো পঞ্চম বিশাল আকারের শিকার, এত হানাহানি ভেতরে ভেতরে ওনাকে অসুস্থ করে দিচ্ছে।

একদম শেষ মাথায় তাকালেন হুই। ওখানে ভূমিটা সরু হয়ে ঘাড়ের মত তৈরি করেছে আরেকটা নদী প্রবাহিত হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে জায়গাটাকে। মাথার কাছেই, দুইপাশের পাহাড় চেপে এসে, গোঁজের মত দেখতে একটা পাঁচশো পেসের মত ফাঁকা জায়গা রয়েছে, যেখান দিয়ে পেছনের অসীম তৃণভূমিতে পালানো সম্ভব। পুরো সমতলটা জুড়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে ছিটিয়ে আছে লম্বা, ভোঁতা মাথার বাবলা গাছ।

ঠিক উপরে বসে থাকা সত্ত্বেও সামনে তিনসারি পরিখাগুলো ওনাদের নজরে আসছে না, ফাঁকের দুই পাশের পাহাড় বরাবর পুরোটা জুড়ে আছে ওগুলো। লাননের এক হাজার তীরন্দাজ ওখানে লুকিয়ে আছে আক্রমণের উদ্দেশ্যে, প্রত্যেকের সাথে আছে ৩০০ করে তীর আর অতিরিক্ত ধনুক।

ওদের পেছনে আছে দুই সারি জাল, মোটা সুতোয় বোনা জালগুলো খুবই দুর্বল করে পোতা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা। ভারি কোনো দেহ ওগুলোর সাথে লাগলেই পড়ে যাবে, জালটা সারা গায়ে পেঁচিয়ে আটকে গিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেবে জন্তুটাকে। তারপর হপলাইটদের একজন লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে, বর্শা হাতে দ্রুত ওটার দিকে দৌড়ে গিয়ে ওটার জীবনাবসান করে আবার জায়গায় বসিয়ে দেবে জালটা। এখানেও আরও ১,০০০ বর্শা ছোঁড়ার দল অপেক্ষা করছে।

“আমাদের এখন নামা উচিত নিচে,” লানন ওয়াইনে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, তারপর আলখাল্লা থেকে ঝেড়ে ফেললেন পিঠার গুঁড়ো।

“আর একটু পরে যাই,” হুই আবদার করলেন। “শুরুতে একটু দেখি।”

সমতলের পশুর পালগুলোর মাঝে একটা অস্থিরতা দেখা দিল, শুরু হলো ধাওয়াকারীদের সামনের সারির কাছের পশুগুলোর ভেতর থেকে। নিউ হরিণদের লম্বা সারিটা উদ্দেশ্যহীনভাবে বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করল। ওদের নাক প্রায় মাটিতে ঘষে ঘষে এগোচ্ছে। কালো শরীরের উপর লম্বা কেশর উড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকছে, বাতাস টানছে। জেব্রাদের প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ জন গায়ে গায়ে লাগিয়ে একটা নিবিড় দল তৈরি করে কৌতূহলী চোখে আগুয়ান ধাওয়াকারীদের দিকে তাকাতে লাগল। ওদের ঘনিষ্ট আত্মীয়, ওদের চাইতে একটু খাটো আর গাট্টাগোট্টা, কোয়াগ্যারা অবশ্য ছোট ছোট দল করে আছে; ছাইরঙা জেব্রাগুলোর চাইতে এরা এক পোচ বেশি কালো। ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আছে উজ্জ্বল হলুদ আর লাল রঙের হার্টিবিস্ট, বেগুনি সাসাবি, বিশাল এলান্ড মহিষের দল, সারা গায়ে ডোরা কাটা, মাথায় কেশর আর দেখতে রাজকীয়। এই বিশাল প্রাণীগুলোর মাঝে আলোড়ন উঠলো যেন, ওরা নড়তে শুরু করল, ধীরে স্বাভাবিকভাবেই ওরা আবার উপত্যকা ধরে ফিরে যেতে লাগল ওই ফাঁকটা দিয়ে–ধূলি উড়া শুরু হল ওদের চারপাশে।

“আহ,” বললেন লানন। “সেই শিকার হবে আজ।”

“শিকারের ইতিহাসে এত বড় শিকার আর কখনো হবে বলে মনে হয় না,” সম্মত হলেন হুইও।

“কতোগুলো হবে বলে মনে হয়?” জিজ্ঞেস করলেন লানন।

“জানি না–পঞ্চাশ...নাহ এক লক্ষ–গুণে শেষ করা সম্ভব না।”

এবার লম্বা গলার জিরাফও বাতাসে ভেসে বাড়ানো আশংকা টের পেল, ওরাও বাবলা গাছের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসে শামিল হলো উপত্যকা জুড়ে চলা গণমিছিলে, ওদের শাবকগুলোও এগোলো পিছু পিছু। জন্তুগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে গণ্ডার, বিশাল আর প্রকাণ্ড, শিং বাগিয়ে চিঁহিঁহিঁ করতে করতে এগোচ্ছে, তাগড়াই ক্ষুরগুলো দাপাতে দাপাতে দৌড়াচ্ছে।

দুর্দান্ত সুন্দর বাদামি স্প্রিংবকের পুরো পালটাই এগোচ্ছে একসাথে, যেন অদৃশ্য বাঁধন আটকে রেখেছে ওদেরকে। ওরা উপত্যকা ধরে নেমে এল, অন্যদের চাইতে দ্রুত ছুটছে, যেন বন্যার পানি, ধুলোর ঝড় পুরু হলো আরও, পাক খেতে খেতে আরও ঘন মেঘে পরিণত হচ্ছে। দুই পাশে পাহাড় থাকার কারণে পুরো পশুর দল আরও বেশি কাছিয়ে এসে আরও ঘিঞ্জি হয়ে গেল। হার্টিবিস্ট আর সাসাবিরা দুই দিকের পাহাড়ের সারি পার হওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু সাথে সাথে মুখোমুখি হলো চিৎকার করতে থাকা, অস্ত্র তাক করে ধরে

রাখা একদল মানুষের যারা ওদেরকে আবার নামিয়ে দিল পাহাড়ের গা থেকে। ওরা আবার ঢাল বেয়ে ধেয়ে নেমে এসে নিচের ঘন সন্নিবিষ্ট পশুর পালের মাঝে ছড়িয়ে দিল আতঙ্ক।

সবগুলো জানোয়ার এবার একযোগে সামনে ধেয়ে যেতে লাগল, তাদের ক্ষুরের আওয়াজে মনে হলো ঝড় উঠে গিয়েছে। কাঁপতে শুরু করল ভূমি। "চলো," লানন বললেন চিৎকার করে তারপর লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে নামতে শুরু করলেন ঢাল বেয়ে। হুই আরও এক মুহূর্ত ফাঁক বরাবর প্রচণ্ড গর্জনে ধাবমান জীবিত প্রাণীর অবিশ্বাস্য মিছিলটা দেখলেন, তারপর কুঠারটা কাঁধে নিয়ে ছুটলেন লাননের পেছনে পেছনে। ওনার লম্বা চুল' ঢেউ খেলিয়ে উড়তে লাগল, ছাগলের দক্ষতায় আর খরগোশের ক্ষিপ্রতায় নামতে লাগলেন উনি, লানন আর উনি একই সময়ে সমতলে এসে পৌঁছালেন, হুইই দেখা গেল ফাঁকের যেখানে তাদের জন্য পরিখা খুঁড়ে রাখা হয়েছে সেখানে আগে পৌঁছালেন। ওনাদের জন্য এক ডজন বর্শার গাঁটরি প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

লাননও ওনার পাশেই পরিখায় ঝাঁপিয়ে নামলেন। "দৌড়ে জিতে কোনো পুরষ্কার পাবে না," হাসতে হাসতে বললেন উনি।

"থাকা উচিত ছিল," বললেন হুই, তারপর পরিখার সামনের কিনারে এগিয়ে গিয়ে সামনের উপত্যকার দিকে তাকালেন। সামনের দৃশ্য ভয়ংকর। পুরো উপত্যকা দুই পাশে পর্যন্ত জ্যান্ত পশুর প্রকাণ্ড ঢেউতে বুজে আছে, তাদের ঠিক উপরে জমেছে বিশাল উঁচু একটা বাদামি ধুলোর দেওয়াল যার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে একদমই কম।

সামনের সারির পশুগুলোর মাথা আর কেশরের আন্দোলন আর ওঠানামা দেখে ঢেউয়ের উপরিভাগের কথাই মনে পড়ছে, ওদের উপর উঠে আছে উটপাখি আর জিরাফের কাঠির মত গলা। এদের সবাই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে, থর থর করে কাঁপতে শুরু করল পায়ের নিচের মাটি, ওনারা ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে।

সতর্কতার সাথে সময় নির্বাচন করলেন লানন, শিকারের প্রথম ঝাপটাটা ওনার পাহাড়ের সৈন্যদের পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, মুহূর্তটা পার হওয়া মাত্র উনি চট করে ইশারা করলেন ওনার শিঙ্গাবাদকের প্রতি। আক্রমণের একটামাত্র জরুরি সুর বেজে উঠলো। তারপর থেকে থেকে আরও জোর বাড়িয়ে বাজতে লাগল।

জীবন্ত প্রাণীগুলোর তৈরি আগুয়ান দেওয়ালের গোড়ার কাছ থেকে মাটির ভেতর থেকে উঠে দাঁড়ালো তীরন্দাজের দল। দেওয়ালটা তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে চারবার তীর ছোঁড়ার সুযোগ পেল তারা। মাত্র বিশ সেকেন্ডে চার হাজার তীর ছোঁড়া হলো, এরপরে যেগুলো গেল সেগুলো গিয়ে পড়ল মৃত প্রাণীর লাশের উপর, আছাড় খেয়ে ভাঙা হাড় আর তীর ঢুকে ছেঁড়া মাংসের যন্ত্রণায় ইতিমধ্যে ওরা মরণ আর্তনাদ শুরু করেছে।

নিজেদের ওজনের কারণে সৃষ্ট সম্মুখবাহী জড়তার কারণে শিকারগুলো সামনের দিকেই ধাবিত হতে লাগল, এদিকে সারি সারি তীর এসে কমিয়ে দিতে লাগল তাদের সংখ্যা, নিহত আর আহত প্রাণীরা স্তূপীকৃত হয়ে ছোট খাটো পাহাড় আর চওড়া ঢিপি হয়ে জমতে লাগল।

ছোট ছোট শিকারগুলোর প্রায় সবই তীরন্দাজরাই সাবড়ে দিল, তবে বড় বড় মোটা চামড়ার প্রাণীগুলো ওদের শরীরের বিদ্ধ তীর লোমের মত দোলাতে দোলাতে ছুটে আসতেই লাগল। বিশাল ধূসর গণ্ডার, টগবগ করতে করতে, উন্মাদের মত দৃষ্টিতে ছুটে গেল জালের সারির দিকে, নাকের লম্বা বাঁকা শিংগুলো ওঠানামা করছে। জিরাফগুলো লম্বা পা দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটছে আতংকিত হয়ে। কালো মহিষদের একটা পাল একসাথে জড়ো হয়ে দৌড়াচ্ছে, কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে যেন স্পান-এর কোনো দল।

ওগুলোর সবই জালে গিয়ে পড়ল, আটকে পড়ে ছোটানোর চেষ্টা করতে করতে আর্তনাদ করতে লাগল। জাল জড়িয়ে গড়িয়ে পড়তেই বর্শা এসে গেঁথে দিতে লাগল তাদের শরীর, ভারি জালের কঠিন প্যাঁচে আটকে গেল সব। লানন এবং তার লোকরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন মৃত প্রাণীগুলো জাল থেকে ছাড়িয়ে আবার জালগুলো দণ্ডের সাথে লাগাতে, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো পুরোপুরি। কারণ ততোক্ষণে একসাথে অনেকগুলো জানোয়ার এসে পড়েছে, গর্তের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে খোলা জায়গায় বের হওয়া মানেই হলো নিশ্চিত মরণ। তীর খেয়ে মাথা খারাপ হওয়া, আহত শিকারগুলো এখন যাকে দেখবে তাকেই আক্রমণ করে বসবে।

হুই দেখলেন একটা উন্মত্ত গণ্ডার গুঁতো মেরে উড়িয়ে দিল একজন সৈন্যকে। লোকটা বাতাসে পাক খেতে খেতে শক্ত মাটির উপর আছড়ে পড়ল। পেছন থেকে ধেয়ে আসা জানোয়ারগুলোর লাথি আর চাপা খেয়ে ধুলোর ভেতরে চ্যাপ্টা মণ্ডে পরিণত হলো সাথে সাথে।

গর্ত থেকে লানন অস্বাভাবিক দক্ষতা আর নিপুণতার সাথে বর্শা ছুঁড়তে লাগলেন, সামনে দিয়ে যাওয়া শিকারগুলোর কাঁধের পেছনের নরম পিঞ্জরাস্থি বরাবর নিশানা করছেন প্রতিটা বর্শা। ওনার গর্তের পাশে মৃত প্রাণীর স্তূপ জমলো, শিকারের প্রমত্ত উত্তেজনায় চিৎকার করে হাসতে লাগলেন উনি।

হুইয়ের উপরেও প্রভাব পড়ল তার। উনিও চিৎকার করতে করতে নাচের ভঙ্গিতে কুঠার চালাতে লাগলেন, লাননের পেছন দিক আর পাশটা পাহারা দিচ্ছেন, যখনই কোনো বিশাল জানোয়ার তাদের পরিখার উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে বলে মনে হলো, তখনই বর্শা মেরে সেগুলোকে শুইয়ে দিলেন।

উনি আর লানন দুজনেই ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেলেন, তার উপর ধুলোর পুরু আস্তরণে ঢেকে গেল পুরো শরীর; কারো ক্ষুরের আঘাতে উড়ে

আসা একটা পাথর লেগে হুইয়ের কপাল কেটে একেবারে খুলির হাড় বেরিয়ে গেল, উনি পরনের কাপড়ের এক প্রান্ত ছিড়ে দ্রুত ক্ষতটা বেঁধে ফেললেন, উত্তেজনার পারদ তাতে নামলো না এতটুকুও।

সামনেই দেখা গেল তীরন্দাজরা মৃত জন্তুগুলোর ভয়ানক চাপে বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। তীর শেষ হয়ে যাওয়ায় নিজেদের গর্তে জবুথবু মেরে বসে আছে তারা, মৃত পশুর লাশ জমছে তাদের পরিখার ভেতর।

হুই দেখতে পেলেন: আরও নতুন একটা পাল এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, উনি ওনার রক্তপিপাসু রাজাকে ধরে জোর করে গর্তের মেঝের সাথে চেপে রাখলেন; মাথার উপর দুই হাত দিয়ে ঢেকে উপুড় হয়ে শুয়ে রইলেন তারা, ধাবমান জানোয়ারগুলোর ক্ষুরের আঘাতে গর্তের কিনার থেকে মাটি খসে খসে পড়তে লাগল তাদের উপরে। খানিক পরেই মাটির চাপে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, ওনারা জামার হাতা দিয়ে মুখ চেপে ধরে বাতাসের জন্য আকুলি-বিকুলি করতে লাগলেন।

একটা কম বয়স্ক পুরুষ জেব্রা এসে পড়ল ওনাদের উপরে, আতঙ্কে চিঁহিঁহিঁ করতে করতে চার পা ছুঁড়তে লাগল ওটা, শক্তিশালী হলুদ দাঁত দিয়ে অন্ধের মত খটাস খটাস করে কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল, যে কোনো সময় ওনাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে সেটা।

হুই গড়ান দিয়ে ওটার উড়ন্ত ধারালো ক্ষুর থেকে দূরে সরে গেলেন। এক মুহূর্ত সময় নিয়ে নিশানা করে ওনার ডান হাত সজোরে চালালেন উপরের দিকে। কুঠারটার চোখা মাথা, সন্ত্রস্ত প্রাণীটার চোয়ালের নিচ দিয়ে ঢুকে গেল; সোজা গিয়ে বিঁধলো ওটার মস্তিষ্কে। সাথে সাথে স্থির হয়ে গেল ওটা, ওনাদের উপরেই ঝাঁকি দিতে লাগল সারা শরীর, এখন ওটার লাশই উপর দিয়ে প্রবল বেগে প্রবাহমান ক্ষুরের ঝড় থেকে রক্ষা করবে ওনাদেরকে।

ঝড়ের মাত্রা কমে এল, তারপর ওনাদেরকে ছাড়িয়ে সুদূরে গুড়গুড় শব্দ হিসেবে শোনা যেতে লাগল একসময়। এরপরেই নামলো নীরবতা, হুই গড়িয়ে গেলেন লাননের দিকে।

"ঠিক আছেন আপনি?" আর লানন মরা জেব্রাটার নিচ থেকে হাচড়ে পাচড়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর গর্ত থেকে নিজেদেরকে টেনে তুলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন চারদিকে।

সামনের প্রায় ৫০০ পেস জুড়ে, প্রায় সমান প্রস্থে পুরো ভূমি জুড়ে পুরু স্তূপ হয়ে ছিটিয়ে আছে আহত আর নিহত পশু। এই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের ভেতরে তীরন্দাজ আর বর্শাবাজরা নিজেদের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাতালের মত দৃষ্টিতে দেখতে লাগল সব।

ঝুলন্ত ধুলোর সরোবরের ভেতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ধাওয়াকারীদের দল, এমনকি আকাশ পর্যন্ত ধুলোর চোটে দেখা যাচ্ছে না, আহত এবং

মৃতপ্রায় পশুদের কান্নাভরা আর্তনাদ আর গোঙানি নীরবতাকে লজ্জায় ডুবিয়ে দিতে লাগল।

ধাওয়াকারীরা সারি বেঁধে রক্ত আর মাংসে ভরা প্রান্তরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এল, তাদের তরবারি ঝুপ ঝাঁপ উঠে আর নেমে আহত প্রাণীদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে লাগল। হুই তার কাপড়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে একটা চামড়ার মশকে ভরা জেং ওয়াইন বের করে আনলেন।

"আমার খেয়াল রাখার জন্য তোমার উপর সবসময়ই ভরসা করতে পারি।" চওড়া হাসি হেসে বললেন লানন, তারপর তৃষ্ণার্তের মত পান করতে লাগলেন। ওনার ধুলোমলিন দাড়িতে রক্তবিন্দুর মত ঝরতে লাগল ওয়াইনের ফোঁটা।

"জীবনে এরকম শিকার হয়েছে আগে কখনো?" হুইকে মশকটা ধরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন লানন।

হুই কয়েক ঢোক খেয়ে আশপাশের প্রান্তরের দিকে চাইলেন। "কখনো হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস," নরম গলায় বললেন উনি।

"আমরা এগুলোর মাংসকে সিদ্ধ করে শুকিয়ে নেব–তারপর আবার শিকার করবো," প্রতিজ্ঞা করলেন লানন। তারপর লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন চামড়া আর মাংস ছাড়ানো শুরু করার নির্দেশ দিতে।



সমতলের উপর কমলা আলোর বিশাল এক গম্বুজ ঝুলে আছে, প্রায় ১০,০০০ অগ্নিকুণ্ডলী থেকে উৎসরিত হচ্ছে এই আলো। সমস্ত বিকেল আর সারা রাত সৈন্যদল খেটেছে এই এলাহি কারবারের আঞ্জাম দিতে। চামড়া ছুঁলে, ফালি ফালি করে মাংস কেটে সেগুলোকে ঝুলিয়ে দিয়েছে জলন্ত আগুনের উপরে গাছের ডালের শিকে। কাঁচা মাংসের মিষ্টি ঘ্রাণ, পরিত্যক্ত নাড়ি-ভুঁড়ির বাসি দুর্গন্ধ, রান্নার সুবাস বাতাসে ভেসে শিবিরের দিকে আসছে, ওখানে নিজের চামড়ার তাঁবুর শামিয়ানার নিচে বসে একটা তেলের কুপির কম্পমান আলোয় কাজ করছেন হুই।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন লানন, এখনও রক্ত আর ধুলো মেখে নোংরা হয়ে আছেন।

"ওয়াইন! সূর্যের পাখি, বন্ধুকে ভালোবেসে থাকলে ওয়াইন দাও।" বলে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার অভিনয় করতে লাগলেন উনি, হুই ওয়াইনের জগ আর পেয়ালা দুটোই এগিয়ে দিলেন ওনার দিকে।

পেয়ালাটাকে ঠেলে সরিয়ে লানন সরাসরি জগ থেকেই ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিলেন, তারপর দাড়িতে লেগে থাকা ওয়াইন মুছে ফেললেন হাতের পেছন দিয়ে।

"খবর নিয়ে এসেছি আমি," দাঁত বের করে হাসলেন উনি। "সতেরশো মাথা জমেছে।"

"এর মধ্যে মানুষ কয়জন?"

"পনেরো জন মারা গিয়েছে, আহত হয়েছে বেশ কিছু–কিন্তু যা পেয়েছি সেটার তুলনায় কিছুই না।"

হুই জবাব দিলেন না, লানন বলেই চললেন।

"খবর আরও আছে। আমার আরও একটা জ্যাভেলিন জায়গামতো লেগেছে। অ্যানেল[৭৩]-এর এই চাঁদে ঋতু হয়নি।"

"দক্ষিণের হাওয়া তো দেখছি খুব কাজের। মাত্র দুই মাসেই চারজন গর্ভবতী।"

"এটা বাতাসের ব্যাপার না, বন্ধু," লানন হেসে আবার গলায় ঢেলে দিলেন ওয়াইন।

"আমি খুব খুশি," বললেন হুই। "ওপেটের জন্য আরও বেশি রাজকীয় রক্ত আসছে।"

"তুমি আবার রক্ত-মক্ত নিয়ে মাথা ঘামাও কবে থেকে, হুই বেন-আমন? তুমি তো আমার আরও কয়েকটা বাচ্চার মাথা বিগড়াতে পারলেই খুশি–আমি চিনি তোমাকে।" লানন এসে হুইয়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। "লেখালেখি করছো দেখি," নিরাসক্ত গলায় বললেন উনি। "কী লিখছো?"

"একটা কাব্য," লজ্জিত মুখে বললেন হুই।

"কীসের উপর?"

"শিকার নিয়ে–আজকে শিকার।"

"গেয়ে শোনাও দেখি," আদেশ দিয়ে হুইয়ের পশমের বিছানায় ধপ করে শুয়ে পড়লেন লানন, তখনও জগটা গলার কাছে ধরে আছেন।

লুটটা নিয়ে এসে নলখাগড়ার পাটিতে উবু হয়ে বসে গাইতে শুরু করলেন হুই, তবে গান শেষ হওয়ার পরেও কিছু না বলে বিছানায় শুয়ে তাঁবুর ঢোকার জায়গাটা দিয়ে বাইরের রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন লানন।

"আমি ব্যাপারটাকে এভাবে দেখি না," অবশেষে বললেন উনি। "আমার কাছে এটা শুধু গ্রহণ করা, মাংসের ফসল ঘরে তোলা।"

বলে আবার চুপ করে গেলেন উনি।

---

[৭৩]লাননের স্ত্রী

"আমার উপর রাগ করলেন?" জিজ্ঞেস করলেন হুই, মাথা নাড়লেন লানন।

"তোমার কি আসলেই মনে হয় যে আজকে আমরা যা করলাম সেটা এমন কিছুকে ধ্বংস করেছে যা আর কখনোই পূরণ হবে না?" জিজ্ঞেস করলেন উনি।

"জানি না আমি, হয়তো না–কিন্তু যদি আমরা এভাবে প্রতিদিন শিকার করতে থাকি, বা প্রতি দশ দিনে একবার, তাহলে কি শীঘ্রই এই জায়গাটা একটা মরুভূমিতে পরিণত হবে না?"

লানন দীর্ঘ সময় আধা-ভর্তি ওয়াইনের জগটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, শেষে হাসলেন হুইয়ের দিকে তাকিয়ে।

"পর্যাপ্ত মাংস পেয়ে গিয়েছি আমরা। এই বছর আর শিকার না করলেও চলবে–শুধু হাতির দাঁত সংগ্রহ করবো।"

"জাঁহাপনা, ওয়াইনের জগটা কি আপনার হাতে আটকে গিয়েছে?" হুই নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন, লানন তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে হেসে উঠলেন হো হো করে।

"এমনি এমনি দেব না। আরেকটা গান গাও, তাহলে ওয়াইন পাবে।"

"চমৎকার," সম্মত হলেন হুই।

জগটা খালি হয়ে গেলে হুই তার বুড়ি এক দাসীকে পাঠালেন আরও এক জগ আনতে।

"একবারে দুটো নিয়ে এসো," লানন প্রস্তাব দিলেন। "তাহলে সময় বাঁচবে অনেক।"

এই মাঝরাতে, হুই ওয়াইনের নেশায় লঘুচিত্ত হয়ে আছেন, ফলে নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেরই নিঃসঙ্গ লাগতে লাগল ওনার, নিজের গানে নিজেরই মন খারাপ হলো। হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করলেন উনি, ওনাকে কাঁদতে দেখে লাননও কাঁদতে লাগলেন সাথে।

"এমন সৌন্দর্য শুধু জানোয়ারদের চামড়ায় লিখে রাখলে হবে না," কাঁদতে কাঁদতে বললেন লানন, চোখের পানি ওনার গালের ময়লার মাঝে নালা তৈরি করে নেমে গিয়ে দাড়িতে গিয়ে পড়তে লাগল। "খাঁটি সোনা দিয়ে লিপি বানিয়ে দেব আমি, তার উপরে খোদাই করে লিখে রাখবে তোমার সব কাব্য, সূর্যের পাখি। ওগুলো আজীবন টিকে থেকে আমার সন্তানদের মোহিত করবে, তার সন্তানদেরও করবে।"

হুই কান্না থামিয়ে দিলেন। তার ভেতরের শিল্পী সত্তা জেগে উঠেছে, প্রস্তাবটা নিয়ে ওনার মনের ভেতর হিসাব নিকাশ চলছে, কারণ হুই নিশ্চিত যে সকাল বেলা লানন মোটেও কথাগুলো মনে রাখতে পারবেন না।

"আমি সত্যিই সম্মানিত, মহানুভব।" হুই এগিয়ে গিয়ে বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। "আপনি কি কোষগারের আদেশপত্রে কি এখনই সাক্ষর করবেন?"

"লিখে ফেলো, হুই, এখনি লিখে ফেলো," আদেশ দিলেন লানন। "সই দিয়ে দিচ্ছি আমি।"

হুই দৌড়ে গেলেন লেখার সরঞ্জাম আনতে।



দক্ষিণের তৃণভূমি দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিশাল একটা বৃত্ত তৈরি করে মন্থর গতিতে এগোতে লাগল সারিটা। এটা সীমা ছাড়া মাত্রার এমন এক দেশ যেখানে পনেরো মাইল লম্বা মানুষের সারি শিকারি পিপড়ার একটা মাত্র শ্রেণীর সমান। মাঝে মাঝে নদী আর পাহাড়ের শ্রেণী, শিকারে ভরা জঙ্গল আর সমতল। মানব প্রজাতির ভেতর শুধু দেখা হলো রাজার শিকার-চৌকির সৈন্যদের সাথে। এদের কাজ প্রাথমিকভাবে শুধু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দাসদের জন্য শুকনো মাংসের অবিরাম সরবরাহ চালিয়ে যাওয়া, যারা হচ্ছে জাতির উন্নতির মূল ভিত্তি।

ওপেট ছেড়ে আসার ছয় মাস পর ওনারা দক্ষিণের নদী পার হয়ে এলেন, ওখান থেকে আরও ১০০ মাইল পার হয়ে আসার পর পৌঁছালেন ঘন বন দিয়ে ভরা ব্লু মাউন্টেন পর্বতশ্রেণির কাছে, এটাই হচ্ছে দক্ষিণ সাম্রাজ্যের সীমানা।

একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিখাদের মুখে শিবির বসালেন ওনারা, খাদটা পাহাড়গুলোর ঠিক মাঝ বরাবর ছিদ্র করে এগিয়ে গিয়েছে। লানন আর হুই একদল পদাতিক সৈন্য আর তীরন্দাজ নিয়ে খাদের ভেতরের বন্ধুর রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন। জায়গাটা ভূতুড়ে। উঁচুতে তাকালে দেখা যায় পাহাড়ে গা থেকে কালো কালো চোখা মাথা বেরিয়ে এসে ঝুলছে, নিচে প্রবাহিত হচ্ছে নোংরা স্রোতে ভরা গর্জনশীল একটা নদী। এমন এক ঠান্ডা অন্ধকারময় জায়গা ওটা, যেখানে সূর্যের আলোর উষ্ণতা প্রবেশ করে না বললেই চলে। হুই কাঁপতে লাগলেন, তবে ঠান্ডায় না, কুঠারটায় আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল হাতের মুঠো। যে তিনদিন ওই পাহাড়ের ভেতরে দিয়ে এগোলেন, তার প্রতিটা মুহূর্ত প্রার্থনা করেই যাচ্ছিলেন উনি, কারণ ওটা ছিল এমন এক জায়গা যেখানে নিশ্চিত শয়তানের বসবাস।

পাহাড় সারির দক্ষিণ ঢালে তাঁবু ফেললেন ওনারা, তারপর সংকেত দিলেন আগুন জ্বেলে। মোটা মোটা ধোঁয়া উঠে এত উপরে মেঘের সৃষ্টি করল

যে পঞ্চাশ মাইল দূর থেকেও দেখা যাবে! দক্ষিণাচলও উত্তরাঞ্চলের মতই বিশাল একটা বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে অবস্থিত।

সামনের সোনালি রঙের তৃণভূমি আর ঘন সবুজ জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হুইয়ের ভেতরে একটা সমীহ জেগে উঠলো। "আমি ওখানে যেতে চাই," লাননকে বললেন উনি।

"তাহলে তুমিই প্রথম হবে যে ওখানে গেল," লানন সায় দিলেন। "ওখানে কী আছে সেটা আমারও দেখার ইচ্ছা। কী সম্পদ, কোন রহস্য?"

"এইটুক জানি যে, দক্ষিণে একটা অন্তরীপ আছে যার পাশে আছে একটা ভোঁতা মাথার পাহাড়, যেখানে নবম হাইকানাসের জাহাজ ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু সবই শোনা কথা।"

"আমার একটা ইচ্ছা হচ্ছে—ওই দৈববাণীকে কাঁচকলা দেখিয়ে আরও দক্ষিণে এই পাহাড়গুলোর পেছনে অভিযান চালানো—তুমি কী বলো, হুই?"

"আমি এর পক্ষে মত দেব না, হুজুর," যথারীতি জবাব দিলেন হুই। "দেবতাদের সাথে লাগতে গিয়ে কখনো ভালো ফল আসেনি, ওনাদের স্মরণশক্তি কিন্তু খুব বেশি ভালো।"

"তা জানি," লানন স্বীকার করলেন। "কিন্তু আমার খুবই ইচ্ছে করে।"

হুই এই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করলেন, ওনার এই সম্পর্কে কথা বলাই উচিত হয়নি।

"আমি ভাবছি যে ওরা কখন এসে পৌঁছাবে।" মধ্যদুপুরের শান্ত নীল আকাশ বরাবর উঠে যাওয়া আগুনের সংকেত থেকে বের হওয়া ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন উনি।

"ওদের প্রস্তুতি শেষ হলেই আসবে," লানন কাঁধ ঝাঁকালেন। "তবে আশা করছি যে তাড়াতাড়িই আসতে পারবে। এর মাঝে অপেক্ষায় বসে না থেকে চিতাবাঘ শিকার করবো আমরা।"

পরের দশ দিন ওনারা বড় বড় ফুটকিঅলা বিড়ালগুলো শিকার করলেন, যেগুলো এই ছায়াময় পাহাড়ের গা আর জঙ্গলে ভরা খাতগুলোর ভেতরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আর সিংহ বধের বর্শার সাহায্যে শিকার করলেন ওনারা। কুকুরের দলটা দিয়ে শিকারকে তাড়া করেন প্রথমে, তারপর যখন ওটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে বা অসহায় হয়ে ডাকতে শুরু করে তখন নিজেরা এগিয়ে গিয়ে ঘিরে ফেলে, আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতেন যতক্ষণ না ওটাকে আক্রমণের জন্য উসকে দেওয়া সম্ভব হতো।

তারপর চিতাবাঘটা আক্রমণ করার জন্য যে কোনো একজনকে বেছে নিয়ে তার দিকে ধেয়ে আসতেই সেই শিকারি বর্শার ডগায় গেঁথে ফেলতো সেটাকে। ওই দশ দিনে দুজন শিকারি মারা পড়ল—এর মাঝে একজন ছিল বৃদ্ধ বিশিষ্টজন আসমান-এর নাতি। খুবই চমৎকার আর সাহসী একটা ছেলে

ছিল সে, ওনাদের সবারই মন খারাপ হলো খুব, যদিও এটা ছিল একটা ভালো আর সম্মানের মৃত্যু। ওরা লাশটাকে পুড়িয়ে ফেলল, কারণ সে ঘরের বাইরে মারা গিয়েছে, হুই সূর্যের কাছে ওর আত্মার নিরাপদ পরিভ্রমণের জন্য বলি দান করলেন।

এগারোতম দিন ভোরবেলা, সূর্যদেব বাআলের আরাধনার পর, ওনারা সকালের নাস্তা সেরা শিকারের উদ্দেশ্যে কাপড় পরে অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, হঠাৎ হুই খেয়াল করলেন যে, বুশম্যান শিকার-সর্দার ঝাই কেমন অস্থির আর উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

"কী হয়েছে, কোন সমস্যা ঝাই?" হুই লোকটার ভাষাতেই জিজ্ঞেস করলেন, এখন উনি সাবলীলভাবে বলতে পারেন এটা।

"আমার গোত্রের লোকজন এসেছে আশপাশে," বুশম্যান বলল ওনাকে।

"তুমি কীভাবে জানো?" হুই জানতে চাইলেন।

"আমি জানি!" ঝাই সরলভাবে জবাব দিল, হুই দৌড়ে গেলেন লাননের তাঁবুর দিকে।

"ওরা চলে এসেছে, জাঁহাপনা," উনি বললেন রাজাকে।

"খুব ভালো," বললেন লানন। তারপর সিংহ বধের বর্শাটা একপাশে নামিয়ে রেখে শিকারের পোশাক খুলে ফেলা শুরু করলেন। "পাথর সংগ্রাহকেদের খবর দাও।" রাজকীয় ভূতত্ত্ববিদ আর ধাতুবিদ্যাবিশারদরা দৌড়ে এল খবর পেয়ে ।

একটা পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো হলো সবাই, যেখানে ঘন বন একটা বিশাল বনবীথির প্রান্তে এসে আচমকাই শেষ হয়ে গিয়েছে।

লানন পাহাড়ের ভেতরে দিয়ে সবাইকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বনবীথির প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়ালেন। তারপর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সবার সামনে তীরন্দাজদের একটা দলকে দাঁড় করানো হলো। বনবীথির ঠিক মাঝে, বনের ধারে বা পাহাড়ের ঢালে তীরন্দাজদের আওতার বাইরে, নরম মাটিতে একটা খুঁটি গেড়ে ওটার প্রান্তে রিড হরিণের লেজ বেঁধে এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন একটা পতাকা সেটা। এটা হচ্ছে সংকেত যে বিনিময় শুরু করা যেতে পারে।

লানন প্রবীণ পাথর সংগ্রাহক আজিরু এবং রিব-আড্ডির দিকে মাথা ঝাঁকালেন, এরা হচ্ছে রাজকীয় কোষাগারের রক্ষক। দুজন দাস সাথে নিয়ে, নিরস্ত্র অবস্থাতেই ওনারা দুজন খোলা প্রান্তরটার দিকে এগিয়ে গেলেন। দাস দুজনের হাতেই একটা করে চামড়ার থলে।

খুঁটির ঠিক গোঁড়ায় একটা শুকনো লাউয়ের খোল রাখা, যেটা ভর্তি উজ্জ্বল নুড়ি ও বিভিন্ন রঙের পাথর দিয়ে–কাঁচের মত স্বচ্ছ থেকে শুরু করে আগুন লাল পাথর পর্যন্ত আছে সেখানে।

প্রতিটা পাথর পরীক্ষা করে দেখলেন সংগ্রাহক দুজন, যেগুলো বাতিল সেগুলোকে গুছিয়ে রাখলেন মাটিতে, যেগুলো পছন্দ হলো সেগুলো আবার রেখে দিলেন লাউয়ের খোলে। তারপর চামড়ার থলেগুলো থেকে কাঁচের পুঁতি বের করে, হিসাব করে একটা মাটির পাত্রে নিয়ে সেটাকে রেখে দিলেন লাউয়ের খোলের পাশে। তারপর আবার ফিরে গেলেন পাহাড়ের ঢালে যেখানে লানন আর তার তীরন্দাজেরা বসে আছে।

ওনারা অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিছুক্ষণ পর কয়েকটা ছোট ছোট অবয়ব বনের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে খুঁটিটার দিকে এগিয়ে এল। ছোট্ট বুশম্যানদের দলটা লাউ আর মাটির পাত্রের পাশে উবু হয়ে বসে পরীক্ষা করে দেখলো সব। তারপর নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তপ্ত তর্ক বিতর্ক শেষে আবার ফিরে গেল বনে। সংগ্রাহক দুজন আবার প্রান্তরে ফিরে গিয়ে দেখুন যে খোল আর পাত্র দুটোই আগের মতই আছে। অর্থাৎ ওনাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ওনারা নতুন প্রস্তাব হিসেবে ডজনখানের লোহার তীরের মাথা যোগ করলেন সাথে।

তৃতীয়বারের বার গিয়ে রফা হলো দুই পক্ষের মাঝে। যখন বুশম্যানরা পুঁতি, তীরের মাথা আর তামার তৈরি বালা নিতে সম্মত হলো, ওরা ওগুলো নিয়ে পাথরগুলো রেখে গেল নিয়ে যাওয়ার জন্য।

তারপর আরও এক দফা পাথর এনে খুঁটির পাশে রেখে গেল ওরা দর কষাকষির জন্য। লেনদেনের এই প্রক্রিয়াটা খুবই বিরক্তিকর, পুরো চারটা দিনে লেগে গেল সব শেষ করতে, এর ফাঁকে হুই তার ভূতত্ত্বের জ্ঞান সমৃদ্ধ করে নিলেন বেশ ভালোভাবেই।

"এই সান-স্টোন গুলো কোত্থেকে আসে?" ওক ফলের সমান বড় একটা হলুদ রঙের হীরা হাতে নিয়ে আজিরুকে জিজ্ঞেস করলেন হুই। এক পাউন্ড ওজনের কাঁচের পুঁতির বিনিময়ে পাওয়া গিয়েছে এটা।

"যখন সূর্য আর চন্দ্র একই সাথে আকাশে দেখা যায়, তখন তাদের সম্মিলিত কিরণ একীভূত হয়ে প্রচণ্ড উত্তপ্ত এবং ভারি হয়ে পড়ে। এরপর সেগুলো পৃথিবীতে এসে পড়ে, যদি পানিতে পড়ে তাহলে তা ঠান্ডা হয়ে জমে এই সান-স্টোনে পরিণত হয়।" হুইয়ের কাছে খুবই মনঃপুত হলো ব্যাখ্যাটা।

"বাআল আর অ্যাসটার্টের ভালোবাসার নির্যাস," শ্রদ্ধা ভরে ফিসফিস করে বললেন উনি। "এগুলো যে এত সুন্দর তা এই কারণেই।" বলে আজিরুর দিকে তাকালেন। "পিগমিরা এসব পায় কোত্থেকে?"

"শুনেছি ওরা পাথরে ভরা নদীবক্ষে খুঁজে বেড়ায়, হ্রদের কিনারেও খোঁজে," ব্যাখ্যা করলেন আজিরু। "তবে ওরা আসল সান-স্টোন চেনার ব্যাপারে অতো দক্ষ না, যেসব পাথর আনে তার ভেতরে অনেক সাধারণ পাথরও থাকে।"

বুশম্যানদের হীরার সমস্ত সংগ্রহ লেনদেন শেষ হলে, গোত্রের অবাঞ্ছিত বাচ্চাদেরকে বিক্রি করার জন্য রেখে গেল ওরা। ছোট্ট ছোট্ট হলুদ ইঁদুরের মত দেখতে বাচ্চাগুলোকে একসাথে বেঁধে খুঁটির পাশে ফেলে রেখে যাওয়া হলো আর ওরা তারস্বরে কান্না করতে লাগল ভয়ে। দাস-সর্দার, যারা মানুষের মাংসের কদর করতে জানে, ওরা এবার এগিয়ে গেল এগুলোকে পরীক্ষা করে দাম মেটাতে। দাস হিসেবে পিগমিদের চাহিদা প্রচুর, কারণ এরা খুবই বাধ্যগত, বিশ্বস্ত আর কষ্টসহিষ্ণু। এরা চমৎকার শিকারি, পথপ্রদর্শক, বিনোদনদায়ক আর অদ্ভুত কোনো কারণে বাচ্চারা এদেরকে খুব পছন্দ করে।

ঝাই ওর লম্বা হলুদ চুলের রাজার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো বিনিময়টা দেখলো, ছোটবেলাতে ওকেও ঠিক এভাবেই কিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

চতুর্থ দিনের শেষে দেখে গেল ওপেটের কোষাগারে জমা হয়েছে আরও পাঁচটা মাটির পাত্র ভরা খাঁটি হীরা। এই পাথরগুলোর ব্যবসা আসলে বার্কা পরিবারের একচেটিয়া, অন্য পরিবারগুলো এতে খুবই ঈর্ষান্বিত। এর সাথে পাঁচ থেকে পনেরো বছরের মাঝের আঁটষট্টিটা বুশম্যান বাচ্চাও কেনা হলো। এরা সবাই বন্য দাস, বশে আসার আগ পর্যন্ত বেঁধে রাখতে হবে।

পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে আবার ফেরার পথে হুই এদের জন্য কিছু করতে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করে দিলেন। ঝাই আর অন্যান্য বশ মানা বুশম্যানদের সহযোগিতায় বেশিরভাগকেই বাঁচাতে সক্ষম হলেন উনি। মূল শিবিরের দাসী মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে শুধু কয়েকজন ছোট বাচ্চা মারা গেল—আতংক আর বাবা-মা ছেড়ে আসার বেদনায়।

দক্ষিণের পাহাড়ের ঢালে বসানো তাঁবু গুটিয়ে ফেলার আদেশ দিলেন লানন, ওনাদের পরের গন্তব্য উত্তর পূর্ব দিকে। আবার নদী পেরিয়ে দিগন্তে দৃশ্যমান বার-জেং[৭৪]-এর পর্বতমালা বরাবর এগোতে লাগলেন। জনবহুল পূর্ব সাম্রাজ্য দিয়ে এগোতে লাগলেন ওনারা, এখানে ইয়ুয়ি প্রজারা লায়ন[৭৫] নদীর পাড় জুড়ে ভুট্টার চাষ করে।

প্রতিটা বসতিতেই মুক্ত মানুষরা ওনাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে এসে নতুন রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। এরা সবাই-ই বেশ হাসিখুশি মানুষ, মাটির দেওয়ালে ভরা গ্রামগুলো খুব পরিষ্কার আর উন্নয়নমুখী। এমনকি মাঠে কাজ করতে থাকা দাসগুলোর পর্যন্ত বেশ ভালো যত্ন নেওয়া হয়, শুধু একটা বেকুবই এই দামী সম্পদের অযত্ন করবে। দাসদের বেশিরভাগই কৃষ্ণাঙ্গ, উত্তর থেকে আনা, কিন্তু এদের মাঝে কিছু মিশ্র রক্তও আছে; ওদের মালিকই ওদের জন্মদাতা, বা দাস প্রজননে নিয়োজিত অন্য কোনো দাস। এদের কাউকেই বেঁধে রাখা হয়নি, ওদের মালিকদের চাইতে পোশাক আশাক বা অলংকরণেও পার্থক্য খুবই কম।

---

[৭৪]বর্তমান নাম চিমানিমানি

[৭৫]বর্তমান নাম সাবিই

যাওয়ার পথে, যেসব সৈন্য তাদের চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করেছে তারা দল ত্যাগ করে নিজেদের গ্রামে ফিরে গেল। নতুন নিয়োগ দিয়ে ভরে দেওয়া হলো তাদের শূন্যস্থান ।

প্রতি রাতে, জেং পাহাড়ে যাওয়ার পথ জুড়ে স্থাপিত সশস্ত্র আর পুরু দেওয়াল তোলা সামরিক চৌকিগুলোর কোনো একটায় তাঁবু ফেলতে লাগলেন ওনারা। এই জায়গাটা স্বর্ণের খনি বেষ্টিত একটা এলাকা, যেটা মধ্য সাম্রাজ্যের ভেতর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। এটাই হচ্ছে সেই এলাকা যেটার উপর ওপেটের সম্পদের মূল ভিত্তি অবস্থিত, রাজার ধাতুবিদ্যাবিশারদরা, কোন পাহাড়ের কোন লুকানো কোণে স্বর্ণ আছে সেটা খুঁজে বের করার ব্যাপারে প্রায় এক আধ্যাত্মিক সক্ষমতা তৈরি করে ফেলেছেন। তাদের প্রচেষ্টার ফসল হিসেবেই অসংখ্য খনি স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা উলঙ্গ অবস্থায় সরু, শ্বাসরুদ্ধকর ঢালে কাজ করে করে আকরিক সংগ্রহ করে। উপরে তুলে এনে পাথরগুলোকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে তারপর সেটাকে বিশেষ ভাবে নকশাকৃত তামার গামলায় ধুয়ে স্বর্ণের কণা আলাদা করা হয়।

লানন জায়গায় জায়গায় থেমে খনিগুলো পরিদর্শন করলেন, প্রকৌশলীদের উদ্ভাবনী দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন হুই, প্রতিটা খনিতেই আকরিক আহরণের যে কোনো সমস্যা ওনারা দারুণভাবে সমাধান করে ফেলেছেন।

যেখানে স্বর্ণ থাকা পাহাড়ের খাদগুলো বেশি চাপা, সেখানে তারা সিঁড়ির ধাপগুলো এমনভাবে কেটেছেন যেন বেশি জায়গা না লাগে এবং ওখানে শুধু মহিলা আর বাচ্চাদেরকে দিয়ে কাজ করানো হয়।

খনি থেকে আকরিক ভরা ঝুড়ি উপরে তোলার জন্য রাখা হয়েছে হাতি, শুকনো এলাকায় অবস্থিত খনিগুলোতে পানি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাও এরাই করে।

বিশাল বিশাল আকরিকের চাঁই খুঁড়ে বের করার একটা পদ্ধতি বের করেছে প্রকৌশলীরা, এরপর নিজের ওজন ব্যবহার করেই ভেঙে ফেলা হচ্ছে সেগুলোকে। খুবই বিপজ্জনক প্রক্রিয়া সেটা। মাত্রই এই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করা হয়েছে, এরকম একটা খনিতে রাত কাটাতে গিয়ে হুই আর লানন সারা রাত জেগে থাকলেন দাসদের থাকার জায়গা থেকে ভেসে আর শোকাভিভূত দাসদের কান্নার আওয়াজের কারণে। দিনের বেলা একটা আকরিকের চাঁই নির্দিষ্ট সময়ের আগে ভেঙে পড়ে প্রায় শ'খানেক দাস, তাদের দাস-সর্দারসহ এর নিচে চাপা পড়ে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। হুই ভাবলেন এই বীভৎস কান্নার এক ফোঁটাও কি কেউ ওদের মৃত দাস-সর্দারদের জন্য কাঁদছে কিনা।

কৌতূহল দমাতে না পেরে, হুই একটা আকরিকের ঝুড়িতে করে খনির একদম নিচের স্তরে নেমে এলেন দেখার জন্য। দূষিত বায়ু, উত্তাপ আর ঘাম,

সাথে টিমটিমে কুপির বাতি মিলে পুরো নারকীয় একটা জায়গা। পাথর কেটে তৈরি করা আবদ্ধ আর ঝুঁকিপূর্ণ সব কুঠুরির ভেতর কাজ করছে উলঙ্গ দাসরা। হুই দেখলেন বেখাপ্পাভাবে বেরিয়ে থাকা অনমনীয় পাথরের একটা টুকরোকে কীভাবে হানিবালের উদ্ভাবিত একটা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গুঁড়িয়ে দেয়া হলো, আল্পস-এর ভেতর দিয়ে যেতে গিয়ে রাস্তা বের করার জন্য কয়েকশো বছর আগে উনি এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করেছিলেন। পাথরের উপর অনেকক্ষণ ধরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়, যতক্ষণ না পাথরটা নিজেই ফ্যাঁকাসে আভায় জ্বলতে শুরু করে। তারপর পানি আর টক ওয়াইনের একটা মিশ্রণ ছিটিয়ে ঠান্ডা করা হয় ওটাকে, সেটা তখন গলগল করে বের হতে থাকা ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি করে বিস্ফোরিত হয়, পাথরটা ভেঙে পরিণত হয় ছোট ছোট চাঙড়ে, যেগুলো দাসরা পরে কেটে ফেলে বা সরিয়ে নিয়ে যায়। একটা মূল ধাতুনালী থেকে বেরিয়ে আসা অশোধিত স্বর্ণ ঝিলিক দিয়ে উঠতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলেন হুই, ঝকঝকে আর হলুদ, উনি অবাক হলেন এই ভেবে যে এর উত্তোলনের বিনিময়ে কতটা মূল্য দিতে হতে পারে!

হুইকে যখন আবার উপরে তুলে আনা হলো তখন উনি ঘামে ভিজে একাকার, ময়লা কালি লেগে নোংরা হয়ে আছে সারা গা।

লানন মাথা নাড়লেন ওনাকে দেখে। "এই কাজ করতে গেলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি যে মাটির ভেতরে ঘুরে বেড়াতে হবে?"

একটা খনিতে পৌঁছে দেখুন ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যন্ত স্বর্ণের মজুদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এর নিচে আর যাওয়া অসম্ভব, কারণ খনি থেকে পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়নি। দাসরা মাঝে মাঝে বালতি ভরে পানি ফেলে ফেলে কয়েক ইঞ্চি মাত্র কমাতে পারে পানির উচ্চতা। খনিটা এখন আবার মাটি আর চাঁদের দেবি অ্যাসটার্টেকে ফেরত দিতে হবে। এখানে ওনার অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন, এখন প্রাপ্য দিতে হবে ওনাকেও।

নিজ অধিকার বলে লানন নিজেই বাছাই করলেন দূত, দাস-সর্দারদের সাথে কথা বলে পনেরোজন দাসকে বাছাই করা হলো যারা না থাকলে কর্মী বাহিনীর সবচেয়ে কম শক্তিক্ষয় হবে। ভাগ্য ভালো যে দেবতারা বলি দানের মান সম্পর্কে খুব একটা মাথা ঘামান না। ওনাদের কাছে জীবন হচ্ছে জীবন, সেটা হলেই গ্রহণযোগ্য।

দাসগুলোকে শেষবারের মত খনিতে নামিয়ে নেওয়ার সময় হুইয়ের মনটা ভেঙে গেল। বলিদানের প্রতীকী শেকল পরে আছে সবাই, ওরা এগোতে গিয়ে টলতে লাগল, হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তেও পড়ল না, প্রায় সবাই খনি-শ্রমিকদের ফুসফুস রোগে খক খক করে কাশছে।

হুই ওনার অধস্তন একজন পুরোহিতকে কাজের ভার অর্পণ করে নিচে পাঠালেন, সে যখন ওই অশুভ অন্ধকার গুহা থেকে আবার প্রত্যাবর্তন করল

তখন অ্যাসটার্টের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন উনি, খনি আবার ভরাট করে দেওয়ার কাজ শুরু করা হলো। এই কাজেও অনেক সপ্তাহ সময় লেগে যায়, কারণ যেসব পাথর খুঁড়ে বের করা হয়েছিল তার সবগুলো আবার খনির ভেতর আগের জায়গায় রেখে দিতে হয়।

এই আবার ভরাট করার কাজটা জরুরি, কারণ এতে ভূমি দেবী শান্ত থাকেন, আবার নতুন করে স্বর্ণ জন্মায়।

আজিরু এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। "এটা হচ্ছে কল্যাণময় ভূমি, স্বর্ণ জন্মানোর জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আমরা মাটির ভেতরের পাথরগুলো আবার আগের মত করে দেই, তাই যখন এর উপর সূর্য কিরণ পড়বে, তখন কালে কালে আবার এই দামী ধাতুটার তরতাজা ফলন হবে।"

"সব জীবনই বাআল থেকে উৎসরিত," সঙ্গতি রেখে বললেন হুই।

"আমাদের সন্তানদের সন্তানেরা একসময় এই বীজ বুনে রাখার জন্য আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবে," আত্মতুষ্টির স্বরে বললেন আজিরু, ওনার এই দূরচিন্তায় মুগ্ধ হলেন হুই–এই ভ্রমণের সবকিছুরই বিশদ বিবরণ ওনার ধারাবাহিকভাবে লিখে চলা লিপিতে টুকে রাখলেন উনি।



ওপেট ছাড়ার তিনশো দিন পরে, জেং[৭৬] পর্বতমালার গোঁড়ার ছোট ছোট পাহাড় বেয়ে উঠে এল মিছিলটা। নিচের অঞ্চলটা উষ্ণ হলেও, উপরের বাতাস ঠান্ডা আর তাজা, রাতের বেলায় ঢাল জুড়ে ভারি কুয়াশা পড়ে ঠান্ডায় একেবারে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। আগুন জ্বেলে চারপাশে জড়ো হয়ে নিজের আলখাল্লার ভেতর গুঁটিসুটি মেরে বসে রইলো সবাই।

এই পাহাড়গুলো হচ্ছে ওপেটের বাগান, এখানে হাজার হাজার একর জায়গা কুপিয়ে ঢালু করে চাষবাস করা হয়, হাজার হাজার দাস জলপাই আর আঙুর বাগানের যত্ন নেয়। এই বাগানগুলোর কেন্দ্র আর পাহারাদার হচ্ছে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত একটা সুরক্ষিত শহর, যেটার নাম রাখা হয়েছে ওপেটের বারোতম গ্রাই-লায়ন জেং-হান্নোর নামে। পূর্ব সাম্রাজ্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কেন্দ্র এটা, বাআল আর অ্যাসটার্টে দুজনেরই মন্দির আছে, হুই পুরো বিশদিন ওনার পুরোহিতদের সাথে নানান আলোচনা সভা করে কাটালেন। হুই ওনার নিজের বাহিনী ষষ্ঠ বেন-আমন-এর অবস্থা যাচাই করে

[৭৬]বর্তমান নাম ইনিয়াঙ্গা

তাদের নিয়ে অনুশীলন করলেন, এটা হচ্ছে ওপেটের আটটা বাহিনীর মধ্যে একমাত্র বাহিনী যেটার সকল সৈন্যই খাঁটি ওপেটের রক্তের। এদের প্রতীক হচ্ছে পালিশ করা আবলুশ কাঠের উপর একটা সোনালি শকুন।

পূর্ব দিকে একটা সংক্ষিপ্ত সফরে সঙ্গ দেওয়ার জন্য হুইকে ডেকে পাঠালেন লানন, ফলে ছেদ পড়ল সব ধর্মীয় কার্যকলাপে। খবর এসেছে যে ড্রাভরা নাকি ওখানে অপেক্ষা করছে নতুন করে পাঁচ বছরের চুক্তি নবায়ন করার জন্য।

জেং পর্বতমালা থেকে নেমে পূর্বের সমুদ্রের দিকে এগোনোর পরে ড্রাভদের তিনজন শেখ দেখা করলেন ওনাদের সাথে। এদের সবাই লম্বা, বাদামি চামড়ার লোক। কালো জ্বলজ্বলে চোখের কারণে চেহারা দেখে রাগী ঈগলের মত লাগে। লম্বা কালো চুলের উপর সাদা পাগড়ি পরে আছে, গায়ে আপাদমস্তক লম্বা জোব্বা, কোমরের কাছে দামী পাথর বসানো কোমরবন্ধনী দিয়ে বাঁধা। কোমরে আরও আছে দুর্দান্ত দেখতে বাঁকানো একটা ছুরি, পায়ে চপ্পল–সেগুলোর গোড়ালি লম্বা আর সূচালো।

সাথের সৈন্যদের পোশাক অবশ্য আলাদা, পরনে ঢোলা পায়জামা, মাথায় পেয়াজের মত দেখতে শিরস্ত্রাণ, গায়ের বর্মে রূপার তৈরি; আর অস্ত্র হিসেবে আছে গোলাকার লোহার ঢাল আর লম্বা বাঁকানো তরবারি, বর্শা আর প্রাচ্যদেশীয় খাটো ধনুক। সৈন্যদের বেশিরভাগই কৃষ্ণাঙ্গ, কিন্তু ওরা বেশ ভালোভাবেই ড্রাভদের ভাষা আর পোশাক পরার রীতিনীতি আয়ত্ব করে ফেলেছে। ড্রাভ আর ওপেটদের রাজাদের মধ্যে শান্তিচুক্তির আগে প্রায় দুইশো বছর অবিরাম যুদ্ধ চলেছে এদের মাঝে।

একটা বিশাল উপত্যকার দুই পাশে অবস্থান নিল সেনাবাহিনী দুটো, দুই দলের মাঝে বয়ে যাচ্ছে একটা পরিষ্কার পানির প্রবাহ, সবুজ গাছে ছেয়ে আছে ওটার দুই পাড়।

এই গাছগুলোর মাঝেই পাতা হয়েছে আলাপ আলোচনার তাঁবু, এখানেই পাঁচদিন যাবত অতিথিরা পান-ভোজনের ফাঁকে ফাঁকে আলাপ আলোচনা করতে করতে কূটনৈতিকভাবে নানান কৌশল খাটানোর চেষ্টা করে গেলেন।

হুই ড্রাভদের ভাষা জানেন আর উনিই লাননের পক্ষে কথা বলে একটা বারিত বাণিজ্য আর সামরিক সহযোগিতার চুক্তির চেষ্টা করে গেলেন।

"জাঁহাপনা, আমাদের দুই জাতির উপর সম্মিলিত হুমকি আসলে ওপেট কতজন সৈন্যকে যুদ্ধে পাঠাতে পারবে সেই সংখ্যার ব্যাপারে রাজপুত্র হাসান জানতে চাচ্ছেন।"

ওনারা বসে ছিলেন রেশমের গদি আর চমৎকার করে বোনা বিচিত্র রঙ আর নকশার উলের কম্বলের উপরে। শরবত পান করছিলেন সবাই, কারণ ড্রাভরা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ওয়াইনও ছুঁয়ে দেখে না; সাথে খেলেন মশলা দিয়ে

রান্না করা খাসীর মাংস আর মাছ, পরস্পরের প্রতি হেসে হেসে কথা বললেও চোখ বন্ধ করলেও একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করেন না।

"রাজপুত্র হাসান," জবাবে বললেন লানন, ওনার দিকে তাকিয়ে হাসছেন আর মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, "আসলে জানতে চাচ্ছে যে কেউ যদি ওরা জেং পর্বতের বাগান আর মধ্য সাম্রাজ্যের স্বর্ণের খনিগুলো দখলে নেওয়ার চেষ্টা চালায় তাহলে আমরা তার প্রতিরোধে কতগুলো সৈন্য পাঠাতে পারবো।"

"তা তো বটেই," হুইও সায় দিলেন। "কী বলবো আমি ওনাকে?"

"বলো যে আমি চোদ্দটা সামরিক বাহিনী নামাতে পারবো, সমান পরিমাণ সহযোগী দল, চারশো হাতি।"

"সংখ্যাটা উনি বিশ্বাস করবেন না, হুজুর।"

"কখনোই না, আমি নিজেও কখনো করতাম না। বলতে বলেছি বলো।" আর এভাবেই পারস্পরিক অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল আলোচনা।

একে-অন্যের রাজ্যের সীমানার নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হলেন তারা, এছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ গোত্রগুলো যাতে উত্তর দিক থেকে বিশাল নদীটা পেরিয়ে এদিকে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থা জোরদার করা হবে, যদি দেশের সীমানা আক্রান্ত হয় তাহলে একজন আরেকজনের সহযোগিতা করার ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছালেন।

"রাজপুত্র নতুন করে বাণিজ্যের একক নির্ধারণ করতে চাচ্ছেন, জাঁহাপনা। উনি প্রস্তাব দিচ্ছেন ওপেটের একটা স্বর্ণের আঙুলের সমতুল্য হিসেবে পাঁচশো মিখতালকে নির্ধারণ করতে।"

"ওনাকে ভদ্রভাষায় নিজের বিচি খুলে ডুগডুগি বাজাতে বলে দাও," রাজপুত্রের দিকে হাসিটা ধরে রেখেই জবাব দিলেন লানন, রাজপুত্রও প্রত্যুত্তরে তার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন, ওনার আঙুলের রত্নপাথরগুলো থেকে থেকে ঝিলিক দিচ্ছে আর জ্বলজ্বল করছে।

শেষে প্রতিটা স্বর্ণের আঙুলের জন্য ৫৯০ মিখতাল বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হলো, এরপর শুরু হলো দাসের ব্যাপারে আলোচনা, সাথে তুলা আর রেশমের চুক্তির ব্যাপারে কথা। পঞ্চম দিনে একত্রে লবণ খেয়ে একদল আরেকদলকে উপর্যপুরি উপহার বিনিময় করলেন, সৈন্যদল তীর আর তরবারি চালনাসহ নানান কসরত প্রদর্শন করল। এর সবই ছিল এক পক্ষ অন্য পক্ষকে মুগ্ধ করার প্রচেষ্টা।

"এদের তীরন্দাজরা তো কোনো কাজের না," মন্তব্য করলেন লানন।

"ওদের ধনুকগুলো বেশি খাটো, ছিলা থুতনি বরাবর না টেনে কোমর বরাবর টানে," হুইও সম্মত হলেন। "এজন্যই ওদের পাল্লা আর নিশানা দুটোই কমে যায়।"

এরপর পদাতিক বাহিনী এল কসরত দেখাতে।

"এদের সৈন্যদের অস্ত্র আর বর্ম দুটোই হালকা, জাঁহাপনা। ওদের কোনো কুঠারবাজও নেই, আমার মনে হয় না যে ওই পাতলা বর্ম তীরের আঘাত আটকাতে পারবে।"

"কিন্তু ওরা খুব দ্রুত নড়া-চড়া করতে পারে, মনোবল আগুনের মত–ওদেরকে এতটা খেলো মনে কোরো না, সূর্যের পাখি।"

"না, হুজুর। সেটা করছি না।"

এরপর পিঠের পালকিতে তীরন্দাজ নিয়ে খোলা চত্বরে ধেয়ে এল হাতির পাল। ড্রাভ সৈন্যদের সারির সামনে বয়ে গেল তীরের বৃষ্টি। সামনে বসানো খড়ের কুশপুত্তলিকাগুলোকে উড়িয়ে আর মাড়িয়ে ছুটে গেল বিশাল ধূসর জানোয়ারগুলো আর ওদের চিৎকার আর ডঙ্কার আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

"ওদের চেহারাটা দেখো একবার," বিড়বিড় করে বললেন লানন। "রাজপুত্রকে দেখে তো মনে হচ্ছে চোখে সরষে ফুল দেখছে!" কথাটা সত্যি, ড্রাভরা চুপ মেরে পরাজয় মেনে নিল, কারণ ওদের কোনো হাতি নেই, ওরা এগুলোকে লালন-পালনের বিদ্যা আয়ত্ব করেনি।

বিদায় নিল উভয় পক্ষই, যখন হুই আর লানন উপত্যকাটার দিকে ফিরে তাকালেন, দেখতে পেলেন ড্রাভদের সেনাদল সারবেঁধে পূর্ব দিকে চলে যাচ্ছে, ওদের শিরস্ত্রাণ আর বর্শার ফলায় লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যের আলো।

"আমাদের পূর্ব সীমানা আরও পাঁচ বছরের জন্য সুরক্ষিত হলো," সন্তুষ্ট স্বরে ঘোষণা দিলেন লানন।

"অথবা যতদিন না রাজপুত্ররা তাদের মন পরিবর্তন করেন," হুইও মন্তব্য করলেন।

"না, সূর্যের পাখি, ওরা অবশ্যই চুক্তিটার দাম দেবে–সেটা ওদের নিজেদের ভালোর জন্যই। আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো, বন্ধু।"

"তা তো অবশ্যই," বললেন হুই।



জেং-হান্নোতে পৌঁছে আবার সমবেত হলো সেনাদল, শুরু হলো বিশাল নদীটা পার হয়ে লানন যে ধ্বংসাত্মক অভিযানটার পরিকল্পনা করেছিলেন সেটার প্রস্তুতি।

হুইয়ের দলটাকেও বেছে নেওয়া হলো, উনি ওনার পুরোহিত সেনাদেরকে প্রচুর সময় দিলেন। বাআলের মন্দিরের চত্বরের ভেতরেই ওনার জন্য

আলাদাভাবে বানানো থাকার জায়গায় রাতের খাবার খেলেন ওদের সাথে। অ্যাসটার্টের মন্দিরের সম্মানিত প্রধান যাজিকাকেও আমন্ত্রণ জানালেন হুই। চমৎকারভাবে আপ্যায়ন করা হলো তাকে, কারণ একদিন আগেই হুই শিকারে বেরিয়েছিলেন আর ড্রাভদের কাছে থেকে আনা মশলা মাখানো গরু আর মাছের বাইরেও আরও অনেক কিছুই ছিল খাওয়ার তালিকায়, সব শেষে এল জেং-এর বাগানের সেরা ফল আর ওয়াইন।

লানন ছিলেন প্রধান অতিথি, সবাইকেই ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো, ওয়াইন খেয়ে খুব হৈ-হল্লা করলেন সবাই।

"শ্রদ্ধেয় আম্মা," হুইয়ের একজন পুরোহিত–সুপুরুষ যুবক–নাম বাকমোর, টেবিলের আরেক প্রান্ত থেকে অ্যাসটার্টের প্রধান যাজিকাকে ডেকে উঠলো। "এটা কি সত্যি যে আপনারা শিক্ষানবিসদের ভেতর থেকে নতুন একজন দৈবদ্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছেন, যে কিনা দুই বছর আগে কাঁপুনি রোগে মারা যাওয়া মাননীয়া ইমিলচির জায়গা নিতে পারবে?"

প্রধান যাজিকা ওনার বড়বড় জ্ঞানী চোখজোড়া ফেরালেন যুবক সেনা কর্মকর্তার দিকে। ওনার চামড়া কেমন ফ্যাকাসে, কোঁচকানো লাগে দেখতে, ওনার মাথা ভরা চুল, ফোলা ফোলা সাদা। বাহুজোড়াও ফ্যাকাসে আর সরু, হাড্ডিসার হাতে ফুটে আছে নীল শিরা। এতক্ষণ পর্যন্ত উনি এই হট্টগোলে অংশ নেননি একটুও।

"এটা সত্যি যে মন্দিরের একটা মেয়ে তার বয়স বা প্রশিক্ষণের তুলনায় অনেক বেশি জ্ঞান আর প্রজ্ঞার পরিচয় দিচ্ছে, এটাও সত্যি যে সে পর্দার ওপারেও দেখে ভবিষৎবাণী করেছে, কিন্তু ভগিনীসংঘ এখনও তাকে সর্বোচ্চ পুরোহিতের কাছে নিরীক্ষার জন্য পাঠাবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়নি।"

"তাহলে কি ওর সক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে, আম্মাজান?" বাকমোর হাল ছাড়লো না।

"সন্দেহ তো সবসময়ই থাকে, বেটা," যাজিকা জবাব দিলেন, সেটা এমন এক স্বরে যা পরিষ্কারভাবে ওর পূর্বানুমানের উপর পানি ঢেলে দিল আর ছোকরা নাস্তানাবুদ হয়ে বসে পড়ল আবার।

"আমি তো এ ব্যাপারে কিছুই শুনিনি," হুই বেশ আগ্রহ নিয়ে মন্তব্য করলেন, ওনার গলায় কিছুটা অভিযোগের সুর। প্রায় দুই বছর হতে চললো ওপেট কোনো দৈবদ্রষ্টার সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিরন্তর খোঁজাখুঁজি চলছেই। দৈববাণী আর ভবিষ্যৎ বলার পারিশ্রমিক মন্দিরের আয়ের একটা বড় উৎস। এর বাইরেও রাজনৈতিক কারণও ছিল যেটার জন্য ইমিলচির একজন উত্তরাধিকারী খুঁজে বের করার ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন হুই।

"মাফ করবেন, মহানুভব। আমি চাচ্ছিলাম আপনার সাথে একান্তে এ ব্যাপারে আলাপ করতে।" প্রধান যাজিকা শুধু ওনাকেই বললেন কথাগুলো, কিন্তু হুইয়ের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে লাননও অংশ নিলেন আলোচনায়।

"মাগীটাকে ডেকে আনান দেখি," বললেন লানন, ওয়াইনের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। ওনার শব্দ চয়নে তব্দা খেয়ে গেলেন যাজিকা। "ডেকে আনেন দেখি মেয়েটাকে, আমাদেরকে একটা দুটা দৈববাণী শোনাক।"

"জাঁহাপনা," হুই বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু লানন ওনাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডাকা শুরু করলেন গলা চড়িয়ে।

"দৈবদ্রষ্টাকে ডেকে আনেন–উত্তরে অভিযানের ফলাফল কী হবে সেটা বলতে বলেন ওকে।"

হুই ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে ফিরে চাইলেন যাজিকার দিকে।

"রাজার আদেশ," বললেন উনি, যাজিকা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে, ওনার সাথে আসা দাসটার কানে কানে বললেন কিছু একটা। দাসটা দৌড়ে চলে গেল আদেশ পালন করতে।

মেয়েটা ঘরে ঢোকা মাত্র উচ্চ স্বরের কলরব আর হাসি ঠাট্টা থেমে গেল, সবাই চরম কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। মেয়েটা লম্বা, হাতের কবজি আর গোড়ালির হাড় বেশ গাট্টাগোট্টা। মন্দিরের শিক্ষানবিসদের লম্বা সবুজ আলখাল্লা পরে আছে। দুই হাতই নগ্ন ওর, চামড়ার এমন একটা দীপ্তি আর কমনীয়তা আছে যে বাতির আলোয় তা থেকে আভা বের হচ্ছে বলে মনে হলো। মেয়েটার চুল কালো আর নরম, কাঁধের উপর মেঘের মত ভাসছে। বের হয়ে থাকা কপালের উপর অ্যাসটার্টের প্রতীক হিসেবে স্বর্ণের চাঁদ পরে আছে, কানের দুল হচ্ছে দুটো ছোট্ট সান-স্টোন যেটা ঝিকমিক করছে স্বর্গের তারার মত।

চোখজোড়া সবুজ মেয়েটার, রঙটা হুইকে ওপেটের মন্দিরের গুহার অ্যাসটার্টের দীঘিটার কথা মনে করিয়ে দিল। ঠোঁটজোড়া পুরু এবং মৃদু কাঁপছে, এই অপ্রত্যাশিত তলবের উদ্বিগ্নতা চেপে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে ও, গালে দেখা যাচ্ছে রঙের ছিটে। তবে ওর আচরণ শান্ত আর নিয়ন্ত্রিত, মাথা উঁচু করেই হুই যেখানে বসে ছিলেন সেদিকে এগিয়ে গেল। কাছে আসতে হুই দেখতে পেলেন মেয়েটার বয়স নিতান্তই কম।

"আমার জন্য প্রার্থনা করুন, মহানুভব," মেয়েটা মাথা নিচু করে ওনাকে অভিবাদন জানালো। হুই উৎসুক চোখে নিরীক্ষা করলেন ওকে, মেয়েটার অকপট বিনয় আর মর্যাদাকর চলাচল খুব ভালো লেগেছে ওনার।

"রাজাকে অভিবাদন জানাও, বেটা," বিড়বিড় করে বললেন উনি আর মেয়েটা লাননের দিকে ফিরলো। সেখানে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন জানানোর সময়ও হুই তাকে পরখ করেই চললেন।

"তোমার নাম কী?" জিজ্ঞেস করলেন উনি, মেয়েটা আবার হুইয়ের দিকে ফিরে ওর বিষণ্ণ সবুজ চোখজোড়া স্থির করল তার উপর।

"তানিথ," জবাব দিল মেয়েটা। এটা হচ্ছে অ্যাসটার্টে দেবীর প্রাচীন নাম, কার্থেজের পুরনো শহরে এই নামে ডাকা হতো তাকে।

"সুন্দর নাম," হুই মাথা ঝাঁকালেন। "সবসময়ই ভালো লাগে নামটা আমার।" মেয়েটা ওনার দিকে চেয়ে হাসলো। হাসিটা দেখে থতমত খেয়ে গেলেন হুই, কারণ সেটা ছিল ভোরবেলা বাআলের উড্ডয়নের মতই উষ্ণ।

"আপনার অনেক দয়া, মহানুভব," বলল মেয়েটা, তখনও হসছে সে, সেই মুহূর্তে প্রেমে পড়লেন হুই বেন-আমন। ওনার মনে হতে লাগল কেউ ওনার পেটের ভেতর খামচে ধরেছে, সমগ্র দেহ যেন গভীর কোনো কিছুর ভেতর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে এমন অনুভূতি হতে লাগল। উনি তানিথের দিকে তাকিয়েই থাকলেন, মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন, টের পেলেন যে ওনার গালে রক্ত জমছে, মরিয়া হয়ে খুঁজতে লাগলেন যে কী বলা যায় কিন্তু বারবার ব্যর্থ হলেন।

লানন একজন দাসের প্রতি চিৎকার করে ঘোরটা ভেঙে দিলেন। "বসার কিছু আনো।" আর ওরা রাজা আর যাজকদের সামনে তানিথকে বসার ব্যবস্থা করে দিল।

"একটা ভবিষৎবাণী করো দেখি," তানিথের দিকে ঝুঁকে এসে আদেশ দিলেন লানন, ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন আর মদের নেশায় লাল হয়ে আছে চেহারা। তানিথ শান্ত চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে, ঠোঁটে খুবই সামান্য এক চিলতে হাসি।

"ব্যাপারটা যদি আমার ক্ষমতার ভেতরে থাকত, তাহলে আমি আপনাকে নিয়ে ভবিষৎবাণী করতাম, মহামান্য, কিন্তু আমার পারিশ্রমিক আর কয়টা প্রশ্ন করতে পারবেন সেসব নির্ধারণ করতে হবে আগে।"

"পারিশ্রমিক কত?" জানতে চাইলেন লানন; রাগের প্রথম ঝাপটায় উনি আরও খানিকটাগাঢ় লাল হয়ে গিয়েছেন। এ ধরনের আচরণের সাথে উনি অভ্যস্ত না মোটেও।

"মহানুভব, আপনি কি পারিশ্রমিকটা নির্ধারণ করে দেবেন?" তানিথ হুইকে জিজ্ঞেস করল–আর হুইকেও পেয়ে বসল শয়তানিতে।

"একশো খাঁটি সোনার আঙুল," বলা মাত্র হুই বুঝলেন যে কী করে বসেছেন। এটা একটা মোটা অংকের পারিশ্রমিক, এর মাধ্যমে আসলে লাননের অহংকেই উসকে দেওয়া হলো, এখন হয় লাননকে পিছিয়ে যেতে হবে নয়তো পারিশ্রমিক দিতে হবে। তানিথের মুখে হাসি ফিরলো আবার, একটা উত্তেজক টোল দেখা গিলো ওর গালে আর লাননের চোখ রাঙ্গানির জবাবে একটা ঠান্ডা আমোদিত হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। হুই

আচমকা টের পেলেন যে উনি আসলে মেয়েটাকেই বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। লানন এত সহজে হার মানবেন না, তাই দ্রুত লাননকে একটা সম্মানজনক অব্যাহতির জন্য চেষ্টা চালালেন উনি।

"এই পারিশ্রমিক দিলে গ্রাই-লায়ন ওনার তরবারি ধরার হাতে যে কয়টা আঙুল আছে সে কয়টা প্রশ্ন করতে পারবেন।"

লানন ইতস্তত করতে লাগলেন, এখনও রেগে আছেন উনি, তবে হুইয়ের পরবর্তী প্রস্তাবে শান্ত হয়েছেন কিছুটা।

"একটা বাচ্চার প্রজ্ঞার দাম এত বেশি হবে বলে মনে করি না আমি, তবে এই মাগীটাকে পরীক্ষা করে মজা নেওয়ার দেখার লোভ সামলাতে পারছি না," জড়ানো কণ্ঠে বললেন লানন, ওনাকে দেখে আর যাই হোক মজা পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। ওয়াইনের পেয়ালাটা থেকে ঢক ঢক করে অনেকখানি পান করে তানিথের দিকে তাকালেন উনি।

"আমি উত্তর দিকে একটা অভিযানে যাবো। ফলাফল কী হবে বলো দেখি," আদেশ দিলেন লানন। তানিথ নিজেকে চামড়ার গদিটায় নড়েচড়ে বসল, সবুজ আলখাল্লাটা ছড়িয়ে দিল নিজের চারপাশে। মাথাটা সামান্য নিচু করে রাখলো ও, ওর সবুজ চোখজোড়া দেখে মনে হলো ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই সকল অতিথি চুপ হয়ে গেলেন এখন, সবাই উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছেন মেয়েটার দিকে। হুই খেয়াল করলেন যে ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল মেয়েটার গাল, সাদাটে দেখাতে লাগল ঠোঁটের প্রান্তভাগ।

"অগণিত ফসল পাওয়া যাবে," তানিথ কর্কশ স্বরে এক অদ্ভুত জঘন্য একঘেয়ে কণ্ঠে বলে উঠলো, "গ্রাই-লায়নের প্রত্যাশা বা ধারণার চাইতেও অনেক বেশি।"

অতিথিরা নড়ে উঠলো এতক্ষণে, একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে, ফিসফাস করছে, উত্তরের ব্যাপারে বিবেচনা করছে। লানন উত্তর শুনে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে।

"তুমি কি মানুষের মৃত্যুর বলছো?" লানন জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি মৃত্যুকে সাথে নিয়েই যাবেন, কিন্তু মৃত্যু আপনার সাথে অজানা গোপন ভাবে ফিরে আসবে আবার," জবাব দিল তানিথ। এটা একটা অসন্তোষজনক ভবিষৎবাণী, যুবক সেনা কর্মকর্তারা অস্থির হয়ে গেল, ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগল পানীয়ে। হুই বাগড়া দিলেন মাঝে–পুরো ব্যাপারটার জন্যই এখন আফসোস হচ্ছে প্রচুর। উনি ওনার রাজাকে চেনেন, উনি জানেন যে রাজা সহজে কিছু ভোলেন না বা মাফও করেন না।

"কোন জিনিসকে ভয় পেতে হবে আমাকে?"

"কৃষ্ণবর্ণকে," সাথে সাথে জবাব দিল তানিথ।

"আমি কীভাবে মারা যাবো?" লানন এখন রাগের চোটে কাঁপছেন, কণ্ঠ খাদে নেমে গিয়েছে আর ভয়ানক দেখাচ্ছে ফ্যাঁকাসে নীল চোখজোড়া।

"এক বন্ধুর হাতের উপর।"

"আমার পরে ওপেটে রাজত্ব করবে কে?"

"গ্রাই-লায়নকে বধ করবে যে," জবাব দিল তানিথ, লানন ওয়াইনের পেয়ালাটা হাতের থাবায় একদিকে ছুঁড়ে দিতেই সেটা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, লাল ওয়াইন ছিটকে পড়ল পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা একজন দাসের পায়ে।

"গ্রাই-লায়ন আর নেই," চিৎকার করে উঠলেন উনি। "ওদের শেষটাকে নিজ হাতে শিকার করেছি আমি–তোর এত বড় আস্পর্ধা, তুই কি বার্কা পরিবারের ধ্বংসের ভবিষ্যৎবাণী করছিস?"

"এটা আপনার ষষ্ঠ প্রশ্ন, হুজুর," তানিথ মাথা তুললো। "আমি এর উত্তর খুঁজে দেখতে পারছি না।"

"দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে," গর্জে উঠলেন লানন। "এই ডাইনীকে নিয়ে যা কেউ।"

হুই সাথে সাথে প্রধান যাজিকাকে ইশারা করলেন তানিথকে সরিয়ে ফেলতে, একজন দাসকে বললেন লাননকে ওয়াইন এনে দিতে আরেক পেয়ালা, আরও একটাকে পাঠালেন ওনার লুটটা আনতে।

তিনটা গান গাওয়ার পরে লানন হাসলেন আবার।



জেং-হান্নো থেকে সৈন্যদলের বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে, হুই প্রধান যাজিকা আর শিক্ষানবিস তানিথকে ডেকে পাঠালেন। লানন হাইকানাসকে ওই সর্বনাশা ভবিষ্যৎবাণী করার পর, পাঁচদিন পার হয়ে গিয়েছে, তানিথকে আরও আগেই ডেকে না পাঠানোর জন্য প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি খরচ করতে হয়েছে হুইকে।

যখন ও এল তখন ওকে আগের চাইতেও বেশি তরতাজা আর সুন্দর লাগছিল। যাজিকা ছায়ায় বসলেন আর তানিথকে নিয়ে মন্দিরের দেওয়াল ধরে হাঁটতে লাগলেন হুই, নিচের রাস্তা আর চত্বর জুড়ে সৈন্যরা শশব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে অভিযানে বের হওয়ার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য, অন্যপাশে দেখা যাচ্ছে জঙ্গলে ভরা পাহাড় আর বাগান, যেখানে সুন্দরভাবে পরিকল্পিত জলপাই আর আঙুর বাগানের পরিচর্যা করছে দাসরা।

"আমি মাননীয়া যাজিকাকে জানিয়েছি, মধ্য সাম্রাজ্য দিয়ে যে দলটা ওপেট ফিরবে তোমাকে যেন তাদের সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজার স্ত্রীদের সাথে যাবে তুমি, ওপেটে অ্যাসটার্টের ভগিনীসংঘে যোগ দেবে–আর আমি ফিরে আসা পর্যন্ত কিছুই করবে না নিজে থেকে।"

"আচ্ছা, মহানুভব।" তানিথের বিনীত কণ্ঠ, ওর উদ্ধত মুখভঙ্গির সাথে মিলছিল না মোটেও। হুই থেমে দাঁড়িয়ে ওর সবুজ চোখজোড়ার দিকে চাইলেন, মেয়েটা চোখ নামিয়ে নিল না, সামান্য হাসলো বরং।

"তোমার কি আসলেই দৈব দেখার দৃষ্টি আছেন, তানিথ?"

"জানি না, হুজুর।"

"তুমি রাজাকে যে কথাগুলো বললে, সেসবের মানে কী?"

"আমি জানি না। কথাগুলো আমার মাথায় আসতে থাকে আপনাআপনি। আমি আসলে বোঝাতে পারবো না।"

হুই মাথা ঝাঁকিয়ে চুপচাপ এগিয়ে যেতে লাগলেন। মেয়েটার ভেতর কেমন একটা নিষ্পাপ আবেদনময় ব্যাপার আছে, সেই সাথে উজ্জ্বল মনন আর হাসিখুশি মেজাজ মিলিয়ে ওর প্রতি আকর্ষিত না হওয়াটা এককথায় অসম্ভব। হুই আবার থেমে দাঁড়ালেন, মেয়েটা ওনার কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

"তুমি দেবতাদেরকে ভালোবাসো তানিথ?"

"জি।"

"তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমি ওনাদের বাছাইকৃত প্রতিনিধি?"

"জি, মহানুভব," মেয়েটা এতটা প্রত্যয় নিয়ে জবাব দিল, এতটা স্বচ্ছ সততা আর সম্মানের সাথে যে, হুইয়ের সকল বাঁধ ভেঙে গেল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মেয়েটা একটা সরঞ্জাম যেটা থেকে উপকার পাওয়া যেতে পারে, তবে যতক্ষণ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয় ততোক্ষণই।

"তোমার নিয়তি কী, তানিথ?" আচমকাই জিজ্ঞেস করে বসলেন হুই।

"আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি না," জবাব দিল তানিথ, কিন্তু এরপর ইতস্তত করতে লাগল, প্রথমবারের মত হুই বুঝতে পারলেন যে মেয়েটা কোনো একটা ব্যাপারে অনিশ্চিত। "তবে এটা জানি, এই যে–আমাদের মাঝের এই দেখা হওয়াটা সেই নিয়তিরই একটা অংশ।"

হুইয়ের মনে হলো ওনার হৃৎপিণ্ড গলে যাচ্ছে, তবে কথা বলার সময় কণ্ঠে বেশ অসন্তোষের ভাব ফুটিয়ে বললেন, "সাবধানে, মেয়ে। তুমি একজন যাজিকা, দেবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত। তুমি খুব ভালো করেই জানো একজন পুরুষের সাথে কীভাবে কথা বলা উচিত।"

মাথা নিচু করে ফেলল তানিথ, ওর গায়ের রঙ হয়ে গেল বিষণ্ণ গোলাপি। চুলের নরম একটা গোছা এসে বাড়ি খেলো ওর গালে, হাত দিয়ে সেটাকে ঠেলে দিল কানের পেছনে। দেখে হুইয়ের মনে হলো হতাশায় কেউ তার হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরেছে। মেয়েটার উপস্থিতিই ছিল একটা শারীরিক যন্ত্রণার শামিল, মেয়েটাকে ওনার যত প্রয়োজনই হোক না কেন, সেটা কখনোই পূরণ হবার নয়। দেবতারা ওর মালিক, ও হলো নিষিদ্ধ, অস্পৃশ্য।

"একটা কথা মনে রাখবে," কড়া গলায় ওকে ১.তর্ক করলেন হুই। "দেবতাদেরকে হেলা ফেলা করবে না।"

হুইয়ের দিকে নম্র দৃষ্টিতে তাকালো তানিথ, তবে হুই কসম কেটে বলতে পারবেন যে ওই সবুজ চোখজোড়ায় হাসি আর উপহাসের আভাস ছিল।

"মাননীয়, আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বোঝাইনি।"

"কী বুঝিয়েছ তাহলে?" হতাশ হয়ে জানতে চাইলেন হুই, প্রত্যাখ্যানের কারণে ওনার বুকের ভেতরটা বেশ হু হু করে উঠছে এখন।

"ওপেটে যখন আবার আমাদের দেখা হবে, তখন এর উত্তর জানতে পারবো, হুজুর," নিচু স্বরে বলল তানিথ আর হুই তখনই বুঝে গেলেন যে সামনের মাসগুলো খুবই ধীরে ধীরে যাবে।



লানন ঝুঁকে আছেন একটা মাটির ছকের উপর, যেটার উপরে বিশাল নদীটার তীরবর্তী এলাকার খসড়া মানচিত্র বানিয়ে বসানো হয়েছে। পূর্ব দিকে দেখা যাচ্ছে 'বাআলের মেঘপুঞ্জ'—একটা বিশাল জলপ্রপাত যেখানে প্রবাহটা কয়েকশো ফুট নিচে আছড়ে পড়ে একটা অন্ধকার গুহার ভেতর হারিয়ে গিয়েছে আর স্রোতের ধাক্কায় পানি ছিটকে উঠে পৌঁছে যায় আকাশ পর্যন্ত, ফলে দেখা যায় ওখানকার ভুমির উপর একটা চিরস্থায়ী মেঘ সবসময়ই ঝুলছে[৭৭]। ওখান থেকে নদীটা একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে চলে গিয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা উষ্ণ অস্বাস্থ্যকর জায়গা—যেখানে নদীর দুই পাড় বাঁকে বাঁকে এবড়ো-থেবড়ো আর পাথুরে ঢিবি দিয়ে ভরা, সেগুলো ভর্তি আবার ঘন জঙ্গলে, যেখানে বাস করে বড় বড় দাঁতবিশিষ্ট হাতির পাল। ছয়শো মাইল পূর্বে গিয়ে নদীটা দ্রাভদের সীমানায় প্রবেশ করেছে, তারপর একটা চওড়া পলি মাটি সমৃদ্ধ এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে, বর্ষাকালে ওখানে দুই কূলেই বন্যা হয়। শেষে গিয়ে নদীটা ডজনখানেক পাখার মত দেখতে মোহনা তৈরি করে পূর্বের সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

লানন মানচিত্রটায় উপর এই এলাকার নানান বৈশিষ্টের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ওনার সেনাপতিদের। মাঝে মাঝে মাথা তুলে সম্মতির জন্য ওসব এলাকায় ওনার কেল্লার অধিনায়কদের দিকে তাকাচ্ছেন, যারা বিগত বছরগুলো ধরে পাহারা দিচ্ছেন এই এলাকা। বিশাল চামড়ার তাঁবুটায়

---

[৭৭]ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

বিশজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, পাশের দিকটা খুলে রাখা হয়েছে যাতে শুকনো বাতাস প্রবেশ করতে পারে ভেতরে–শিবিরের নিচের বিস্তীর্ণ উপত্যকাটার দৃশ্যও দেখা যায় এদিক দিয়ে। পাড়ের জঙ্গলের বিশাল বিশাল সবুজ গাছগুলোর কারণে বিশাল নদীটাই দৃষ্টির আড়ালে ঢেকে যাচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ-সঠাৎ ঝিলিক দিচ্ছে পানিতে প্রতিফলিত সূর্যের আলো। দূর উত্তরের দিকে উপত্যকার বিপরীতে পাহাড়ের সারি উঠে গিয়েছে ধোঁয়াটে নীল সারি তৈরি করে।

"আমাদের গুপ্তচরেরা মূল গ্রামগুলো চিহ্নিত করেছে যেখানে ওই গোত্রগুলো বাস করে। ওগুলো বেশিরভাগই উচ্চভূমিতে, নদী পার হয়ে একদিন লাগবে হেঁটে যেতে, সবচে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রতিটা গোত্রেই একই দিনে আক্রমণ চালাতে হবে।"

তারপর ওনার সেনাপতিদেরকে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিলেন লানন, কোথা দিয়ে নদী পার হবে, কোন রাস্তায় ফিরবে আবার–ঠিক করে নেওয়া হলো সেটাও।

"ফিরে আসার পথে প্রতি আক্রমণের কোনো ভয় থাকবে না, যদি আপনারা প্রথম দিনেই ওদের মাজা ভেঙে দিতে পারেন। প্রতিটা গোত্রই একটা আরেকটার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, ওরা তাই কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসবে না মোটেও। আমরা ব্যর্থ হতে পারি একটা ঘটনা ঘটলেই, সেটা হচ্ছে যদি ওরা কোনোভাবে আমাদের আগমনের খবর টের পেয়ে আক্রমণের আগেই পালিয়ে যেতে পারে।"

তারপর উনি বিশদভাবে ওনার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করলেন, রসদ সরবরাহ আর অভিযানে যাওয়ার রাস্তা নিয়েও আলোচনা হলো, সব শেষে লানন আক্রমণের একটা তারিখ নির্ধারণ করলেন।

"আজ থেকে বারো দিন পরে। এতে করে আপনারা প্রত্যেকেই যথেষ্ট সময় পাবেন বাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে ওই বর্বরদের গ্রামে পৌঁছে যেতে।"

হুইও ওনার ষষ্ঠ বেন-আমন বাহিনীকে নিয়ে রওনা হলেন সেট-এর কাছে বিশাল নদীটার পাড়ের কেল্লার দিকে। ওখানে পৌঁছে মোপানে গাছের একটা বনের ভেতরে তাঁবু খাটালেন ওনারা, গাছের সারির কারণে অপর পাড়ের কেউ দেখতে পাবে না তাদেরকে। দিনের বেলা আগুন জ্বালাতে নিষেধ করে দেওয়া হলো আর রাতের বেলাও খুব সাবধানতার সাথে ঢেকে রাখা হতো, সৈন্যরা নদী পার হওয়ার ভেলা তৈরির জন্য খাটতে লাগল সারা রাত। পশ্চিমে ভারি বর্ষণের কারণে পানি বেড়ে গিয়ে পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

মাগো তেলেমা, চৌকির অধিনায়ক, একজন লম্বা, টাক মাথার নিরাসক্ত মানুষ, গায়ের চামড়া হলুদ আর চোখে কাঁপুনি অসুখটার লক্ষণযুক্ত, যা এই

নদীর পাড়ে যারা থাকে তাদেরই হয় শুধু। অপেক্ষা করার দিনগুলোতে হুইয়ের সঙ্গ পেয়ে বেচারা যারপরনাই খুশি হলো, ওর দেওয়া তথ্যগুলো হুইয়েরও কাজে লাগল খুব। তারা দুজনেই প্রতি সন্ধ্যায় একই সাথে খাবার খেতেন–জেং থেকে ওয়াইনের যে অবারিত ভাণ্ডার নিয়ে এসেছেন সেখান থেকে ওয়াইন সরবরাহ করতেন হুই।

"আমি আমার পাহারাদারদেরকে আগের মতই রেখেছি, যেভাবে বলেছিলেন আপনি।"

"খুব ভালো।" হুই এক বাটি সিদ্ধ করা নদীর মাছ আর বুনো চালের ভাত খেতে খেতে বললেন। "আমরা আসার পরে ওরা কোনো ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ড খেয়াল করেছে নাকি?"

"না, মহানুভব। কয়েকশো জনের একটা দলে কাল রাতে নদী পেরিয়ে এসে আমার একটা চৌকিতে আক্রমণ করেছিল। আমরা সাথে সাথেই প্রতিহত করেছি, পঞ্চাশজনের মত মারা পড়েছে ওদের।"

"এই আক্রমণ করে ওদের ফায়দা কী?"

"অস্ত্র, আমাদের সামর্থ্যেরও একটা ধারণা পায় তাতে।"

"পুরো পাড় ধরেই কি এরকম হয়?"

"না, হুজুর। কিন্তু এখানে, এই সেট-এ যুদ্ধপ্রিয় গোত্র তুলনামূলক একটু বেশি, একটা আছে ভেন্ডি গোত্র–এরা একদমই আলাদা। মনে আছে কিনা যে চার বছর আগে ওরা শক্তি সামর্থ্যে কেমন সমৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল, ওদের প্রায় বিশ হাজার সৈন্য এখানের কেল্লাটায় আক্রমণ করে বসে আর পুরো উপত্যকাটা–"

"হ্যাঁ," হুই বাগড়া দিলেন। "ভোর-এ ওদের সাথে যে যুদ্ধ হয় সেই সেনাদলে ছিলাম আমি।"

"আহ! অবশ্যই। আমার এখন মনে পড়ল যে আপনার বাহিনীর নামটাও সম্মানের তালিকায় ছিল।" অধিনায়ক মুচকি হাসলেন। "সেই বিশ হাজারের কেউই আর নদী পার হয়ে অপর পাড়ে যেতে পারেনি।"

"বর্বর হওয়ার পরেও, ওরা কিন্তু ভালোই লড়াই করেছিল," মন্তব্য করলেন হুই।

"তা তো বটেই, হুজুর, সেই জন্যেই তো ওদেরকে আলাদা বললাম, পরের বছরগুলোয় এখন ওরা আরও বেশি ভয়ানক হয়ে পড়েছে।"

"আপনি ওদের গ্রামটা দেখেছেন?"

"না, হুজুর, তবে আমার বেশ কয়েকজন গুপ্তচর আছে। উত্তরের ঢালের প্রথম ধাপে ওদের গ্রাম, যেখানে মালভূমিটা থেকে কাল নদীটা নেমে এসেছে।"

"লোকজন কেমন ওদের?"

“আমার ধারণা পঞ্চাশ হাজার।”

“অনেক বেশি!” হুই মুখভর্তি মাছ নিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে অধিনায়কের দিকে চেয়ে রইলেন।

“ওরা অনেক সমৃদ্ধ একটা গোত্র–আর ওদের সবাই গ্রামে থাকেও না। গবাদি পশুর বড় বড় পাল পালন করে, তাই বিশাল একটা এলাকার প্রয়োজন পড়ে ওদের।”

“গ্রামটা কি খুব সুরক্ষিত?”

“বড় বড় এলোমেলোভাবে গাদাগাদি করে বানানো বাড়িঘর দিয়ে ভরা, হুজুর। কোনো কোনো ঘর আদিম আমলের মত লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা, তবে সেটা শুধু বুনো জন্তু থেকে বাঁচার জন্য।”

একজন দাস এগিয়ে এসে হুইয়ের ওয়াইনের পেয়ালাটা ভরে দিয়ে, ওনার খালি বাসনগুলো নিয়ে গেল। হুই পেয়ালাটা দুই হাতে ধরে হতাশ হয়ে লাল তরলটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওনার নীরবতা অস্বস্তিতে ফেলে দিল অধিনায়ককে। সে অবশেষে কোনোমতে বলল, “কাল নাকি রাজা এসে পৌঁছাবেন এখানে?”

“হ্যাঁ। লানন হাইকানাস আমার সাথে এই অভিযানে যাবেন।”

“আমাকে কেউ কখনো তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়নি,” বিড়বিড় করে বলল লোকটা, হুই উপলব্ধি করলেন যে একজন বর্ষীয়ান কর্মকর্তার এরকম বিজন প্রান্তরের একটা ছোটখাটো কেল্লায় কোনো অভিভাবক বা প্রত্যাশা ছাড়াই আটকে থাকার ব্যাপারটা কেমন মর্মন্তুদ হতে পারে।

“আপনার ব্যাপারে সুপারিশ করবো আমি,” কথা দিলেন হুই, লোকটার চোখে এক করুণ কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠতে দেখতে পেলেন।



সেই রাতে নদী পাহারা দেওয়ার ছোট জাহাজগুলোর একটায় করে প্রায় একশো জন কুঠারবাহক আর তীরন্দাজ নামিয়ে দিয়ে আসা হলো নদীর দূর প্রান্তে, ভোরের আগেই ওরা নদীর দুই পাড়ে রশি বসিয়ে ফেলল।

এই জায়গাটায় নদী প্রায় ৩০০ পেস চওড়া, ঘন জঙ্গল আর নানান পদের আগাছা আর নলখাগড়ায় ভরা খাড়া দুই পাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নোংরা সবুজ পানি। ভেলাগুলো নদীর ধারে বয়ে নিয়ে গিয়ে ফাঁস দিয়ে রাখা রশির সাথে আটকে দেওয়া হলো। সৈন্যদের পঞ্চাশজন করে করে পার হলো সেটায় করে, হাতিগুলোর কাঁধে রশি বেঁধে দিতেই মসৃণভাবে ভেলাগুলো টেনে নিয়ে গেল অপর পাড়ে।

পার হওয়ার ব্যাপারটা সম্পন্ন হলো বহুল প্রশিক্ষিত দক্ষতার মাধ্যমে–এমন না যে এবারই প্রথম কোনো সেনাদল বিশাল নদীটা পার হচ্ছে। টুকটাক ছোটখাটো একটা-দুটো ঘটনা অবশ্য ঘটলো–ভেলা থেকে পড়ে গেল দুজন হপলাইট এবং ওদের বর্মের ওজনের কারণে ডুবে গেল টুপ করে, একটা ভেলা ওটার উপরের লোকজন আর সরঞ্জামসহ উল্টে গেল পাড়ের কাছেই অগভীর পানিতে, তবে নিরাপদেই উঠে আসতে পারলো সবাই, একজন সৈনিকের হাত পেঁচিয়ে গেল রশিতে, কনুইয়ের নিচ থেকে বাকিটা নিখুঁতভাবে কাটা পড়ল তার। তবে মধ্য বিকেলের আগেই পুরো পারাপার সম্পন্ন হয়ে গেল আর লানন হুইয়ের দিকে ফিরে বললেন:

"সাবাস, সূর্যের পাখি। এখন বলো দেখি অভিযানের ব্যাপারে কী পরিকল্পনা করলে?"

হুই একদল সৈন্য রেখে গেলেন পার হওয়ার জায়গাটা সুরক্ষিত রাখতে, এরাই পরবর্তীতে রসদপত্রের যোগানদার হিসেবে কাজ করবে, চামড়ার ঝোলায় ভরা এক গাদা শুকনো মাংস আর ভুট্টা রাখা আছে ওদের কাছে। ওনার সেনাদল যখন ফিরে আসবে তখন তারা থাকবে প্রচণ্ড ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত আর সম্ভবত প্রচণ্ড বিধ্বস্ত, সব যদি পরিকল্পনামতো আগায়, তাহলে খাওয়ার জন্য আরও কয়েক হাজার মুখ থাকবে সাথে।

তারপর হালকা পদাতিক বাহিনী আর তীরন্দাজদের আবডালে উনি বর্বরদের শহর কাল-এ অভিযান শুরু করলেন। জেং-হান্নোয় বিগত কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল এবার। যদিও মাটি খুবই এবড়ো-থেবড়ো আর গাছ গাছলায় ভরা, তবুও পুরো দলটাই দ্রুততার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। এমন গতিতে এগোতে লাগল যে প্রতি ঘণ্টায় পাক্কা পাঁচ মাইল করে পার হয়ে গেল। ওদের ঠিক সামনেই অনুসন্ধানী দল নিশ্চিত করল যে, কেউ ওদের আগমনের সতর্কবার্তা নিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছে না। যে কয়েকশো পশুপালক, শিকারি আর বনজ গাছের শেকড় সংগ্রাহকের সাথে দেখা হলো অনুসন্ধানী দলটার, তাদেরকে নীরবে তীর মেরে বা কুঠারের এক কোপে ঠান্ডা করে দেওয়া হলো। ওখানেই, চলার পথের পাশেই পড়ে থাকলো লোকগুলোর লাশ। সৈন্যদের সারিটা যখন লাশগুলো পেরিয়ে গেল, অবসন্নতার চোটে এমনকি কেউ একবার পাশে আড়চোখে তাকিয়েও দেখলো না। হুই খেয়াল করলেন যেসবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারি নারী আর পুরুষ, পরনে পশুর চামড়ার পোশাক আর গাল আর স্তনে গোত্রের প্রতীকী কাঁটা চিহ্ন। উত্তরের বেশিরভাগ গোত্রের মতই এদের গায়ের চামড়া ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের নীলচে কালো। এদের কেউ কেউ নিজের দাঁতে কারিগরি ফলিয়ে কিছু একটা ভরে হাঙরের দাঁতের মত চোখা বানিয়ে নিয়েছে, পুরুষদের দেখা গেল বর্শা আর হালকা কুঠারের অস্ত্র সজ্জিত, যেগুলোর ফলা অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি।

সন্ধ্যা নামার পর থেমে দাঁড়ালো সৈন্যদল, তারপর যার যার ঝোলা থেকে রান্না করা ঠান্ডা মাংস আর ভুট্টার পিঠা বের করে খেয়ে নিল, ওয়াইন বাহকরা ঘুরে ঘুরে ভরে দিতে লাগল ওদের পেয়ালাগুলো।

"দেখুন," লাননের কাঁধ স্পর্শ করে উত্তরের পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন হুই। আকাশ থেকে আভা ছড়াচ্ছে–চাঁদ যেন আজকে উল্টোদিকে উদিত হয়েছে। এটা হচ্ছে হাজার হাজার রান্নার চুলা থেকে উৎসরিত আলো।

"অগণিত ফসল," লানন মাথা ঝাঁকালেন। "ঠিক যেমন ওই ডাইনী বলেছিল।"

তানিথের প্রসঙ্গ ওঠায় হুই অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে উঠলেন কিছুটা, তবে বললেন না কিছু।

"মেয়েটার কথাগুলো আমি ভুলতে পারছি না–অনেকগুলো রাত নির্ঘুম কেটেছে ওটার অর্থ কী হতে পারে তা ভেবে।" লানন ওনার ঝোলে চিটচিটে আঙুল আর ঠোঁট মুছতে মুছতে বললেন। তারপর হাত বাড়ালেন ওয়াইনের পেয়ালার দিকে। "ও বলে বেড়াচ্ছে মৃত্যু, অন্ধকার আর এক বন্ধুর বেঈমানির কথা।" মুখ ভরে ওয়াইন ঢেলে বললেন উনি, তারপর সেটা পান না করে থু করে ফেলে দিলেন মাটিতে।

হুই বিড়বিড় করে বললেন, "ও বলে বেড়াচ্ছে না, মহামান্য–ও শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে মাত্র।"

কিন্তু লানন বললেন, "আমার ধারণা ও একটা শয়তান।"

"হুজুর!" হুই প্রতিবাদ করলেন সাথে সাথে।

"সুন্দর চেহারা দেখেই বিভ্রান্ত হয়ে যেয়ো না, হুই।"

"মেয়েটার বয়স কম, নিষ্পাপ," হুই বলা শুরু করলেন কিন্তু লানন ওনার দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে সোজা চেহারা বরাবর এসে থামলেন।

"এই ডাইনীটা তোমার কাছে কী, সূর্যের পাখি?"

"মেয়ে হিসেবে কিছুই না। কীভাবে হবে, সে তো দেবীর জন্য উৎসর্গীকৃত।" হুই নিজের ভালোবাসাকে অস্বীকার করলেন, লানন আবার সোজা হয়ে হেসে উঠলেন সন্দিহানভাবে।

"বরাবরের মত–তুমি সর্ববিদ্যায় পটু হলেও মেয়েদের ব্যাপারে কিছু জানো না, বন্ধু। আমি বুদ্ধি দিচ্ছি তোমাকে।"

"আপনি বরাবরই দয়ালু," গজগজ করে বললেন হুই।

"এর থেকে দূরে থেকো, হুই। তোমাকে ভালোবাসে এরকম একজনই সতর্ক করছে তোমাকে, মেয়েটা দুঃখ বাদে তোমার জীবনে আর কিছুই আনবে না।"

"যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে।" হুই উঠে দাঁড়িয়ে কুঠারের ফিতেটা ওনার কবজিতে ঠিকমতো সোজা করলেন আবার। "বের হওয়া উচিত আমাদের।"

মাঝরাতের পরে ওনারা সবাই ঢালের প্রথম ধাপের ছোট ছোট পাহাড়ের সারির উপরে উঠে এলেন। ঠিক সামনেই দেখা গেল বিশাল খোলা একটা উপত্যকা, যার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অন্ধকার কাল নদী। পুরো প্রান্তরটা চাঁদের রূপালি আর নীলচে আলোয় ভেসে যাচ্ছে, প্রায় ১০,০০০ রান্নার অগ্নিকুণ্ডলী থেকে ধোঁয়া বের হয়ে, রাতের স্থির বাতাসে তখনও এমনভাবে ঝুলে আছে, যেন কোনো নদীর উপরের ফ্যাঁকাসে কুয়াশা।

আগুন নিভে মলিন লাল লাল ফুটকিতে পরিণত হয়েছে এখন, যা পুরো গ্রাম জুড়েই ফুটে আছে, কুঁড়েগুলো দেখাচ্ছে অন্ধকার অবয়বহীন, কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা নকশা ছাড়াই গাদাগাদি মেরে ছড়িয়ে আছে, প্রাচীন বসতির এক বিপুল সমাহার।

"ও অনুমান করেছিল পঞ্চাশ হাজার–আর খুব একটা ভুল বলেনি।" উপত্যকার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন হুই।

লানন জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে আগাবে কীভাবে?"

চাঁদের আলোয় হাসলেন হুই।"কীভাবে শিকার করতে হয় সেটা আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন, হুজুর।"

ওনার দলের সেনাধ্যক্ষেরা এগিয়ে এল নির্দেশের আশায়, সবাই পোশাক আর শিরস্ত্রাণ পরা, চেহারা থমথমে। হুই পদাতিক সেনাদের একটা পাতলা সারি আর তাদেরকে সাহায্য করতে তীরন্দাজদের আদেশ দিলেন পূর্ব দিকে অবস্থান নিতে। দিনের বেলায় অনুসন্ধানী দল ভেন্ডিদের পালা প্রায় ৪,০০০ ছোট আকৃতির গরুর পাল ধরে নিয়ে এসেছে।

"গরুগুলো নিয়ে যাও তোমাদের সাথে। ইতালিতে হানিবালের কৌশলটা জানা আছে নিশ্চয়ই, বিশাল নদীটা পর্যন্ত এগুলো কাজে লাগবে আমাদের।"

লালন আনন্দিত হয়ে হেসে দিলেন, হুইয়ের পরিকল্পনা শুনে কাঁধ চাপড়ে দিলেন তার। "উড়ে যাও, সূর্যের পাখি।"

"গর্জে উঠুন, গ্রাই-লায়ন," হুইও প্রত্যুত্তরে হেসে জবাব দিয়ে, আবার সোজা হয়ে নিজের শিরস্ত্রাণ বেঁধে নিলেন জায়গামতো।

নীরবে প্রায় ৪,৫০০ জনের বিশাল পদাতিক বাহিনী আর কুঠারবাজদেরকে নিয়ে পশ্চিম দিকে এগোতে লাগলেন হুই, তারপর গ্রামের পেছনের বনের ধারে পৌঁছে, বাঁকা চাঁদের মত ওনার বাহিনীকে সজ্জিত করে বিশ্রাম নিতে বললেন। নিজেও ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলেন হুই, যখন এক সেনাপতি এসে ওনাকে ডেকে তুললো তখন উনি রাতের কুয়াশায় ঠান্ডা আর অসাড় হয়ে আছেন।

"সবাই জায়গায় চলে যাও!" ঠান্ডা স্বরেই আদেশ দিলেন উনি। আর মুখে মুখে আদেশটা পৌঁছে গেল সবার কাছে। বনের ধারে অন্ধকারের ভেতরে নড়া-চড়া শুরু হয়ে গেল। সৈনিকেরা তাদের কুঠার, তরবারি আর ধনুক নামিয়ে রেখে দাস ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত কাঠের গদা তুলে নিল হাতে।

হুই আর লানন দ্রুত সারির অগ্রভাগে চলে গেলেন, গায়ের আলখাল্লা থেকে ধুলো ঝেড়ে আর হাত-পা ছুঁড়ে অবশ পেশীগুলো সচল করে তুলছেন আবার।

ঘুমন্ত গ্রামটার দিকে তাকালেন হুই, ওটা থেকে কাঠের ধোঁয়া, রান্না করা খাবার আর মানব বর্জ্যের দুর্গন্ধ ভেসে আসছে, মনুষ্যত্বের এক চরম ঝাঁঝালো গন্ধ যা তার নাকে এসে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। গ্রামটা নিঝুম হয়ে আছে, শুধু একটা খেঁকি কুকুর ডাকছে থেকে থেকে, মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠছে বাচ্চারা।

হুই ঠান্ডা গলায় বললেন, "সময় হয়ে গিয়েছে।" লানন মাথা ঝাঁকালেন। হুই ঘুরে ওনার একজন সেনাপতিকে আদেশ দিতেই লোকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে একটা কাদার তৈরি আগুনের পাত্রে অগ্নি সংযোগ করল, সংকেত সূচক তীরের মাথায় তেলে চোবানো ছেঁড়া ন্যাকড়া বেঁধে রাখা হয়েছিল ওটার ভেতরে। আগুন ভালোভাবে ধরে দাউদাউ করে উঠতেই সে তীরটা তুলে নিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল, বিশাল একটা পরাবৃত্ত তৈরি করে তীরটা উড়ে গেল সামনের দিকে। একই রেখা বরাবর আরও তীর ছোঁড়া হতে লাগল, কমলা আলো বেশ কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাতে কেউ চিৎকার বা ডাক দিয়ে উঠলো না, গ্রামটাও ঘুমিয়েই থাকলো।

"ওরা দেখি কোনো রক্ষীই রাখেনি, না রেখেছে পাহারাদার।" তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন লানন।

"এরা সবাই অসভ্য," হুই মৃদু স্বরে ধরিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।

"দাসত্বই ঠিক আছে এদের জন্য," বললেন লানন।

"মুক্ত মানুষের চাইতে দাস হিসেবেই এরা ভালো কাজে দেবে," আবারও মৃদু স্বরে বললেন হুই। "আমরা ওদেরকে খাবার দেব, কাপড় দেব আর দেখাবো যে আসল দেবতা মূলত কারা।"

মাথা ঝাঁকালেন লানন। "আমরা এসেছি ওদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে, সূর্যের পথে আনতে।" বলে উনি ভারি দাস পেটানো গদাটা হাতবদল করলেন।

পূর্ব দিক থেকে বনের ধারে আবির্ভূত হলো একটা গরুর পাল, তারপর আচমকাই সেগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে, হাম্বা রব ছেড়ে উন্মত্তের মত ছোটা শুরু করল। ওদের শিং-এ ঘাস আর আলকাতরা মেখে তৈরি মশাল বেঁধে দেওয়া, লেজে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আগুন লাগানো শুকনো ডাল। পেছনে সার বেঁধে চিৎকার করতে থাকা সৈন্যদের তাড়ায় আর নিজেদের আতংকেই দৌড়াতে শুরু করল ওরা। ধুলো, ধোঁয়া আর আগুন মিলে নারকীয় হয়ে দাঁড়ালো পুরো চিত্রটাই। গরুর পালটা গ্রামের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ল, পলকা ঘাসের তৈরি কুঁড়েগুলো গুঁড়িয়ে গেল সাথে সাথে, দাউ দাউ করে

সেখানে লেগে গেল আগুন, দৌড়াদৌড়ির চোটে আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল গরুগুলো, সামনে যেসব ঘুমন্ত উলঙ্গ ভেন্ডি পড়ল, তাদেরকে পায়ের নিচে পিষ্ট করতে লাগল। ওদের পাশেই দৌড়াতে লাগল সৈন্যরা, যারা বেঁচে থাকছে তাদেরকে গদা মেরে অজ্ঞান করে, ক্ষুরে দলিত ধুলোর মাঝে ফেলে রেখে যাচ্ছে।

হুই শুনতে পেলেন শহরটা থেকে আসা ক্রমবর্ধমান ক্রন্দন ধ্বনি ধীরে ধীরে বাড়ছে। হাজার হাজার আতংকিত কণ্ঠের আওয়াজ। ছুটন্ত ক্ষুরের ধুপ ধাপ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল আর শুকনো কুঁড়েগুলোতে আগুন লাগতেই রাতের আকাশ হলুদ শিখায় বিস্ফোরিত হয়ে উড়ে যেতে লাগল স্ফুলিঙ্গ।

"সবাই একজোট," উনি ওনার চারপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে নির্দেশ দিলেন। "জালের মাঝে যেন কোনো ফাঁক না থাকে যেদিক দিয়ে মাছে পালাতে পারে।"

পুরো রাতটা ভরে গেল দৌড়াদৌড়ি, আওয়াজ আর আগুনে। অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত, পুরো এলাকাটা পরিণত হলো গনগনে কমলা রঙের বিশাল এক আলোয়, ডাকাতদের নির্মম দলটা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই ভেন্ডিরা চিৎকার করতে করতে দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে দৌড়াতে শুরু করল। একবার উঠতে আবার নামতে লাগল হাতের গদাগুলো, হাড়ের উপর আঘাতের শব্দ লাগতে লাগল ঠিক বনের ভেতর কাঠুরের আওয়াজের মত। ওদের কালো, উলঙ্গ শরীরগুলো পড়ে গিয়ে তীব্র আগুনের আলোয় শুয়ে রইলো ওখানেই, যাদের চেতনা আছে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হাচড়ে পাচড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে করতে আর্তনাদ করতে লাগল।

বাচ্চাকে স্তন্যদানরত এক মহিলা দেখতে পেল: নির্দয় দলটা এগিয়ে আসছে তার দিকে, সে একটা ভীত হরিণীর মতই পাক খেয়ে ঘুরে দৌড় দিল জ্বলন্ত ঘাসের ছাউনিগুলোর প্রোজ্জ্বল শিখার দিকে। একটা মশালের মত আগুন ধরে গেল তার গায়ে, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো চুল আর একটামাত্র চিৎকার দিয়ে আগুনে ঝলসে পড়ে গেল মাটিতে। অগ্নি শিখায় ওকে আর চেনার উপায় রইলো না। হুই দেখতে পেলেন ব্যাপারটা, ওনার রক্তের উন্মত্ততা কমে এল তাতে, এতক্ষণের খুনে মানসিকতার প্রতি জন্ম নিল চরম বিতৃষ্ণা।

"থামো!" চিৎকার করে আদেশ দিলেন উনি। "আস্তে পিটাও!" আর আস্তে আস্তে এই ভয়ানক হট্টগোলের ভেতরেও নানান আদেশ ভাসতে লাগল বাতাসে। দাস-সর্দাররা বেরিয়ে এসে বন্দীদেরকে উবু করে সার বেঁধে বসিয়ে রাখার নির্দেশ দিতে লাগল, পদাতিক দল চষে ফেলল পুরো গ্রামটা, আগুনো জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল একসময়, শুধু পড়ে রইলো ধোঁয়া ওঠা ছাইয়ের কালো স্তূপ।

ভোর হয়ে এল একসময়, রক্তাক্ত আর রাগত ভোর–যার উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল কালো ধোঁয়ার স্রোত। হুই বাআলের গুণকীর্তন শেষ করলে পরে, সেনাবাহিনীর কণ্ঠের তীব্রতার সাথে সাথে বন্দীদের কান্না আর আর্তনাদের মাত্রাও বাড়তে লাগল।

হুই ধ্বংসযজ্ঞের ভেতর দিয়ে ছোটাছুটি করে নানান নির্দেশনা দিয়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি সংগঠিত করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বাকমোরের নেতৃত্বে দুটো দল বিশাল নদীটার দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছে। ওরা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আটক করা অগণিত গরুর পালটাকে। হুই অনুমান করলেন যে ওখানে ছোট ছোট জানোয়ারগুলোর কমপক্ষে ২০,০০০ মাথা দেখতে পেয়েছেন। বাকমোরকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে যে গরুগুলোকে সাঁতরে নদী পার করেই আবার সাথে সাথে ফিরে এসে এখানে যোগ দেওয়ার জন্য।

এখন ওনার চিন্তা জুড়ে আছে দাসদের এই বিশাল কিন্তু অতিরিক্ত ধীর সারিটাকে নাড়ানো। আসার পথে ওনার সেনাদল যে রাস্তা আধা দিন আর এক রাতে পাড়ি দিয়েছে, সেই রাস্তা ধরে ফিরে যেতে এখন কমপক্ষে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে। নতুন ধৃত দাসদেরকে অবশ্যই বেঁধে রাখতে হবে, এভাবে বাঁধা অবস্থার সাথে অভ্যস্ত না থাকায় ওরা নড়বে খুবই মন্থর গতিতে, তাতে এগোনোর হার যাবে কমে। প্রতি ঘণ্টা দেরি হওয়া মানেই বিপদের সম্ভাবনা বাড়া, তখন কেউ আক্রমণ করে বসলে বা এরা বিদ্রোহ করলে এই ক্লান্ত অবসন্ন সৈনিকরা খুব একটা বাঁধা দিতে পারবে না।

একজন সেনাপতি ডাকলেন ওনাকে, ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে তার আলখাল্লা আর দাঁড়িও পুড়ে কুঁচকে গিয়েছে। "মহানুভব!"

"দাসগুলো–এদের ভেতর যুবকদের সংখ্যা মাত্র কয়েকজন।"

হুই উবু হয়ে বসে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোকে দেখার জন্য এগিয়ে গেলেন। সবাইকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযোগী হালকা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আর গলায় শিকারি কুকুরের মত করে বেড়ি পরানো।

"তাইতো।" এবার খেয়াল হলো হুইয়ের, এদের বেশিরভাগই মহিলা আর নাদান বাচ্চা। দাস-সর্দাররা বৃদ্ধ আর অথর্বদের আলাদা করে ফেলেছে, কিন্তু যোদ্ধার বয়সী বা সামর্থবান তেমন কেউই নেই। হুই দাসদের সারি থেকে বুদ্ধিমান দেখতে এক ছোকরাকে উঠিয়ে নিয়ে এসে ওর মাতৃভাষাতেই প্রশ্ন করলেন তাকে।

"যোদ্ধারা কোথায় সব?" নিজের ভাষায় প্রশ্ন শুনে কিছুটা হতচকিত হয়ে গেল ছেলেটা, কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে রইলো চোখ নামিয়ে, কোনো জবাব দিল না। একজন সৈন্য তার তরবারি খাপ থেক অর্ধেক বের করল, খাপের সাথে তরবারির ইস্পাতের ঘর্ষণের সরসর শব্দে ছেলেটা ভীত চোখে তাকালো সেদিকে।

"আরেকজন মরলে আমাদের কিন্তু কোনো ক্ষতিই হবে না," হুই সাবধান করলেন ছেলেটাকে, তবুও জবাব দেওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করল সে।

"ওরা সবাই উত্তর দিকে গিয়েছে, মহিষ শিকার করতে।"

"ফিরবে কখন?" জানতে চাইলেন হুই।

"জানি না," দাস ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকালো, হুই এখন তড়িঘড়ি করার জন্য আরও একটা কারণ পেয়ে গেলেন। ভেড্ডিদের যোদ্ধা জনবলের পুরোটাই অক্ষত রয়ে গিয়েছে, এই ধোঁয়ার সঙ্কেতে, ঠিক শকুন যেমন মাংসের লোভে ছুটে আসে, সেভাবেই দৌড়ে আসবে ওরা।

"ওদেরকে দাঁড় করাও, এগোতে শুরু করো," হুই সেনাপতিটাকে আদেশ দিয়ে ছুটে গেলেন আরেকদিকে। লানন ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, সাথে ওনার বর্ম আর অস্ত্র বাহকের দল। লাননের চেহারার দিকে এক নজর দেখেই হুই বুঝলেন যে গড়বড় হয়েছে একটা, কারণ ওনার চেহারা আর চোখ দুটোই লালা হয়ে আছে।

"তুমি নাকি দাস-সর্দারদেরকে বলেছো যাদেরকে দাস হিসেবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ওদেরকে ছেড়ে দিতে?"

"জি, হুজুর।" আচমকাই হুই রাজার আচমকা ক্রোধ আর বদমেজাজের উপর খুব বিরক্ত হয়ে পড়লেন, এখন এসবের চাইতে অনেক জরুরি বিষয় আছে ওনার ভাবনার জন্য।

"কোন ক্ষমতা বলে?" জানতে চাইলেন লানন।

"যুদ্ধক্ষেত্রে রাজকীয় সেনাবাহিনীর একজন অধিনায়কের ক্ষমতা বলে," হুই জবাব দিলেন ওনাকে।

"আমি হুকুম দিয়েছিলাম সব কিছু জ্বালিয়ে দিতে।"

"এসব বৃদ্ধ আর অথর্বদেরকে পুড়িয়ে মারতে না।"

"আমি এই গোত্রগুলোকে জানান দিয়ে যেতে যাই যে লানন হাইকানাস এই এলাকা দিয়ে গিয়েছেন।"

"আমি সেটার সাক্ষীই রেখে যাচ্ছি," হুই ছোট করে বললেন। "এই বৃদ্ধগুলো যদি আমাদের জন্য বোঝা হয়, তাহলে কি ওদের নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছেও হবে না?" লানন এগিয়ে এলেন কাছে, হুই দেখলেন ওনার রাগ উথলে উঠছে আরও–আর উনি হুট করেই লাননের একটা হাত ধরে টান দিয়ে ষড়যন্ত্রীদের মত করে নিচু গলায় কথা বলতে লাগলেন।

"মহামান্য, এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আপনার জানা দরকার।" আর লানন ওনার রাগ দেখানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই হুই ওনাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন। "ভেড্ডিদের যোদ্ধারা আমাদের

হাত ফসকে গিয়েছে, ওরা এখন পুরো অস্ত্রসজ্জিত অবস্থাতেই বনের ভেতরে রয়ে গিয়েছে।"

লাননের রাগ উড়ে গেল মুহূর্তেই। "কতো কাছে আছে ওরা?"

"জানি না–তবে এটা বলতে পারি যে, কথা বলে যত সময় নষ্ট করবো ততো কাছে ওরা এসে পড়বে।"



আহত দাসদের বিশাল লম্বা সারিটাকে সোজা করে হাঁটানো শুরু করতে করতে দুপুর পেরিয়ে গেল। দাস-সর্দাররা হুইয়ের কাছে এসে হিসাব দিল, চূড়ান্ত হিসাবে পাওয়া গেল মানব সম্প্রদায়ের প্রায় ২২,০০০ সদস্য।

সারিটাকে একসাথে আর কড়া নিয়ন্ত্রণে হাঁটিয়ে নেওয়ার জন্য হুই বারবার করে বলে দিলেও, রশিতে বাঁধা ভেন্ডিদের সারিটা প্রায় চার মাইলেরও বেশি দীর্ঘ হয়ে গেল, ওদের চলার গতিটা ছিল চরম মন্থর। ঠ্যাং ভাঙা শতপদীর মত পা টেনে টেনে এগোতে লাগল ওরা, একপা একপা করে পাহাড় পেরিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে এল নিচের উপত্যকার বন্ধুর ভূমিতে।

প্রথম রাতেই আক্রমণ হলো ওনাদের উপর, মাঝরাতের সামান্য পরে। হুই বেশ হতভম্ব হয়ে গেলেন ব্যাপারটায়, কারণ উনি শত্রু এলাকায় নিরাপত্তার যতটা ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব তার সবই নিয়েছিলেন, এরপরেও এই বর্বর গোত্রের কাছ থেকে এরকম কিছু একদমই ছিল ওনার ধারণার বাইরে। ভেবেছিলেন সর্বোচ্চ কয়েকজন রক্ষীর গলায় পোঁচ পড়বে, লুকানো জায়গা থেকে তীরের ঝাঁক, সারির কিছু দুর্বল জায়গায় ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে কয়কজনকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে হয়তো, তবে কোনো পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ না–যেটায় থাকবে পরিকল্পনা আর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, যে আক্রমণটা করা হবে পুরোপুরি যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে।

শুধুমাত্র নিবিড় প্রশিক্ষণ আর সুশৃঙ্খলতার কারণেই অন্ধকার থেকে ধেয়ে আসা হুঙ্কার ছাড়া আক্রমণটাকে সামলাতে পারলো সৈন্যদলটা। প্রায় দুই ঘণ্টা মুখোমুখি লড়াই করল ওরা, সাহসদায়ী ডঙ্কার বাজনা আর সেনাপতিদের আক্রমণের নির্দেশ মিলে মিশে একাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল আঁধারের ভেতর।

"আমার দিকে, ষষ্ঠ বাহিনী।"

"শক্ত হাতে, ষষ্ঠ বাহিনী।"

"আরও জোরে, ষষ্ঠ বাহিনী।"

চাঁদ উঠে প্রান্তর আলোয় ভাসিয়ে দেওয়ার পর, আক্রমণকারীরা মিলিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরে, হুই তখন ওনার দলবলের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নিতে পারলেন।

সৈন্যদল বর্গাকারে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করেছিল যেখানে, তার চারপাশে প্রায় বুক সমান উঁচু হয়ে আদিবাসী যোদ্ধাদের লাশ জমেছে। মশালের আলোয় এখন আহতদেরকে তরবারির এক কোপে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছে, বাকিরা নিজেদের আহতদের শুশ্রূষা করছে আর মৃতদের একসাথে জড়ো করছে সৎকারের জন্য। শত্রুরা ওনার রক্ষীদের রক্ষণবুহ্যর খুব একটা বেশি ক্ষতি করতে পারেনি কিন্তু ওদেরকে কতটা চড়া মূল্য দিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে তা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একটা।

লড়াইয়ের হট্টগোলের মাঝে দাসদের অনেকগুলো সারি-ই আক্রমণকারীদের ডাকে সাড়া দিয়ে, সম্মিলিতভাবে ছুট দিয়ে রক্ষীদের বাঁধা পেরিয়ে ওভাবে বাঁধা অবস্থাতেই রাতের আঁধারে পালিয়ে গিয়েছে। তবে এখনও আতংক, ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় ডাক ছেড়ে কাঁদছে ওদের ১৬,০০০ জন।

লাশ পোড়ানোর জন্য আগুন জ্বালা হলো আর ফিরে যাওয়ার সময় বাআলের অনুগ্রহের জন্য স্তব সঙ্গীত গাইতে লাগল সবাই। সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে, এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সেই দিনটার জন্য ভেন্ডিরা কোন কৌশল অনুসরণ করবে বলে ঠিক করেছে। রাস্তার দুই ধারের প্রতিটা ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে ছিল ভেন্ডি তীরন্দাজ আর বর্শাবাজের দল। ওদেরকে ওখান থেকে হটাতে কষ্ট করতে হলো বেশ। যখনই হুইয়ের কুঠারবাজরা আক্রমণ করতে যেত তখনই ওরা ঢালের আড়ালে নেমে পড়তে লাগল, এদিকে একই সময়ে সারির দুই পাশ আর পেছনদিকটাতেও ক্রমাগত জোরদার আক্রমণ চলতেই থাকলো বারবার।

"আমি জীবনেও একরকম কিছু ঘটার কথা শুনিনি আগে," পরিস্থিতি সাময়িকভাবে একটু ঠাণ্ডা হলে শিরস্ত্রাণ খুলে ঘামে ভেজা চুলগুলোতে একটু বাতাস লাগাতে লাগাতে বললেন লানন, তারপর ওয়াইন দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। "এরা তো পুরো প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর মত আক্রমণ করছে।"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা নতুন," হুইও সম্মত হলেন। ওনার বর্মবাহক একটা কাপড় ভিজিয়ে এনে দিল ওনাকে। ছিটকে আসা রক্তের বিন্দুতে ভরে আছে হুইয়ের বাহু আর চেহারা, শকুন কুঠারটার হাতল আর ফলায় রক্ত জমে শুকিয়ে কালো আর চটচটে হয়ে আছে।

"ওদের আক্রমণের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আছে–আমি জীবনেও শুনিনি একবার আক্রমণ করে ভেঙে দেওয়ার পরে আদিবাসী যোদ্ধারা এভাবে ফিরে এসে আক্রমণ করতে পারে। একবার রামপিটুনি খাওয়ার পর আবার আক্রমণের সাহস যে ওরা করবে–চিন্তাই করিনি।"

থু মেরে রেড ওয়াইন মাটিতে ফেললেন লানন। "আজকের দিন শেষ হওয়ার আগেই আমরা হয়তো যতটা ভেবেছিলাম তার চাইতে বেশি বেকায়দায় পড়ে যাবো," বলে কাষ্ঠ হাসি হাসলেন একটা আর ওয়াইনের পেয়ালাটা ধরিয়ে দিলেন হুইকে।

একটা জায়গা আছে যেখানে রাস্তাটা একটা সরু খাঁড়ি পেরিয়ে, যুবতীর স্তনের মত দেখতে দুটো একই রকম পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গিয়েছে। খাঁড়িটায় এমনিতে হাঁটুজল, ওটার কাছ পৌঁছে ওরা দেখতে পেলেন মাটিতে ষোলোটা বর্শা গেঁথে রাখা আর ওগুলো মাথায় বসানো ষোলোটা কাটা মুণ্ডু, গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসা বাকমোরের অগ্রবর্তী দলে ছিল এই সৈনিকগুলো।

"বাকমোরও অক্ষত অবস্থায় পার হতে পারেনি দেখছি," হুই মন্তব্য করলেন। দ্রুত মাথাগুলো নামিয়ে চামড়ার আলখাল্লা দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হলো।

"বারোশোর মধ্য ষোলোজন মাত্র, ট্রেসিমিনি হ্রদের ঘটনার তুলনায় এটা তো কিছুই না," সহজ গলায় বললেন লানন। "এরকম ভয়ানক একটা প্রদর্শনীর মাধ্যমে ওরা বোঝাতে চাচ্ছে যে খাঁড়িটা ওরা দখলে রাখতে চায়–দুর্বল কৌশল, সূর্যের পাখি।"

"হতে পারে, জাঁহাপনা," হুই তর্ক করতে গেলেন না, তবে যারা ওই কাটা মুণ্ডুগুলোর ছিন্ন লাল গলা আর নিষ্প্রাণ অপলক দৃষ্টি দেখেছে তাদের চেহারার কী দশা হয়েছে তা দেখেছেন উনি।

লাননের ধারণা মত, আসলেই দেখা গেল খাঁড়িটা পাহারা দিচ্ছে ওরা। আর ওখানে যে বাহিনীটা আছে সেটা দেখে হুই ধারণা করলেন যে ওনার লোকের চাইতে দ্বিগুণ হবে সংখ্যাটা। যখন ওনারা এদের মাঝ দিয়ে রাস্তা করে এগোনোর চেষ্টা করছিলেন, তখনও কিন্তু পাশের আর পেছনের আক্রমণে কোনো ভাটা পড়ল না। দুই দুইবার হুই তার কুঠারবাজ আর পদাতিকদেরকে খাঁড়ির ধারের নলখাগড়ায় ছাওয়া কাদার ভেতর থেকে পিছু হটিয়ে নিয়ে এসে বিশ্রাম করিয়ে আবার সংঘটিত করলেন। এদিকে সূর্য উত্তাপ ছড়াচ্ছে প্রচণ্ড, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল সৈন্যরা।

একটা বর্শা এসে আঘাত করল লাননের মুখে, গালের চামড়া কেটে হাড্ডি পর্যন্ত বেরিয়ে গেল ওনার, স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি জঘন্য দেখাতে লাগল ক্ষতটা, দাড়ি ভরে গেল রক্ত আর ধুলোয়। একজন চিকিৎসক এগিয়ে এসে ক্ষতটার রক্তে ভেজা ঠোঁট সেলাই করে দিতে লাগল আর হুই দৌড়ে এলেন রাজাকে ঘিরে রাখা সৈন্যদের কাছে। লানন ওনার উদ্বিগ্ন অনুসন্ধানের জবাব দিলেন মুখ টিপে হেসে।

"দগদগে একটা কাটা দাগ হয়ে যাবে।" তারপর মাথা না ঘুরিয়েই হুইকে বললেন, "আমি এই রহস্যের সমাধান বের করে ফেলেছি হুই, ওই তো সেটা!" দুই পাহাড়ের সবচেয়ে কাছে পানির প্রবাহের দিকে ইঙ্গিত করলেন লানন। ওটার চূড়াটা তীরন্দাজদের আওতার বাইরে, সম্ভবত ৫০০ পেস দূরে। যদিও পাহাড়ের ঢাল জঙ্গলে ভরা, কিন্তু চূড়াটা গোলাকৃতির, দেখতে একটা ফাঁকা গ্রানাইটের গম্বুজের মত। ওই গম্বুজের উপরে দাঁড়িয়ে আছে গুটিকয়েক মানুষের একটা দল। ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে একটা লোককে ঘিরে।

হুই আজীবন লোকটাকে মনে রাখবেন, খাঁড়ির ধারের পাহাড় চূড়ায় সেদিনের সেই ভাগ্য নির্ধারণী দুপুরটায় যেমনটা দেখেছিলেন তাকে। এত দূরে থাকার পরেও লোকটাকে মোটেও খাটো মনে হচ্ছিল না, কিন্তু ওনার আশপাশের লোকগুলোকে লাগছিল। কোনো একটা অদ্ভুত কারণে এটা তার শারীরিক উপস্থিতিকে করে তুলছিল আরও বেশি জবরদস্ত। বিশাল বপু লোকটার, পাশের লোকগুলোর চাইতে ঘাড় আর মাথা দুটোই উপরে। তেল চিকচিকে পিঠ আর বাহুর পেশীর উপর সূর্যের আলো পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। নীল হেরন পাখির পালকের তৈরি একটা লম্বা পাগড়ি তার মাথায়। পালকগুলো বাতাসের ঝাপটা সহ্য করেই টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাগড়ির উপরে। লোকটার কোমরে কালো চিতার লেজের তৈরি ছোট একটা কোমরবন্ধনী; তবে সে যে রাজা, তা জানার জন্য হুইয়ের সেটা দেখার প্রয়োজন ছিল না।

"আহ!" নরম গলায় বললেন উনি, মনে হলো ওনার ভেতরে নাড়া খেয়ে গেল কিছু একটা, একটা কুণ্ডলী খুলতে থাকা সাপের মত। পাহাড়ের উপর থেকে ভেন্ডি রাজা ঝাড়ু দেওয়ার মত করে ইশারা করল একটা, তারপর খাঁড়ির পানির দিকে আঘাত করার ভঙ্গি করল ভারি বর্শাটা দিয়ে। পরিষ্কার বোঝা গেল যে এটা একটা নির্দেশনা, ওনার চারপাশের লোকগুলোর ভেতর থেকে একজন দূত বেরিয়ে এসে ছুট দিল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

"অবশেষে আদিবাসীরা একজন যোগ্য রাজা খুঁজে পেয়েছে," বললেন হুই। "আগেই বোঝা উচিত ছিল।"

"ওকে শেষ করে দাও," আদেশ করলেন লানন। "ওকে আমার চাই। আর কোনো কিছুই গুরুত্বপূর্ণ না। ওই লোকটাকে শেষ করো শুধু।" হুই লাননের কণ্ঠে একটা নতুন সুর শুনতে পেলেন যেন। শুনে বিভ্রান্ত হয়ে রাজার চেহারার দিকে তাকালেন উনি। তখনই ধরতে পারলেন ব্যাপারটা। কাঁটা গালে জোর করে করা সেলাইয়ের বেদনায় কণ্ঠের এহেন পরিবর্তন না, যার কারণে তার ফ্যাকাসে নীল চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছেন উনি। পরিচয়ের এত বছর পরে এই প্রথম হুই টের পেলেন যে লানন ভয় পাচ্ছেন।



অনেক ভেবে-চিন্তে, সন্ধ্যা নামার আগের শেষ প্রহরে সময়টা নির্ধারণ করলেন হুই–দিনের শেষ সময়ে যখন লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে আর চলতে থাকে আলো-আঁধারির খেলা। পুরো বিকেল জুড়ে উনি ওনার দলের অর্ধেক সদস্যকে ব্যবহার করে খাঁড়ি জুড়ে লড়াই চালিয়ে গেলেন, কিন্তু পাড়ের ঘন জঙ্গলের

ভেতরে লুকিয়ে রাখলেন ওনার মূল শক্তিকে। বিকেলের গরমে না খাটিয়ে, ওদেরকে বিশ্রাম নিতে দিলেন হুই, খেয়ে দেয়ে নিজেদের অস্ত্রে শান দিয়ে রাখতে বললেন ওদেরকে, এর ফাঁকে চালিয়ে গেলেন নিজের প্রস্তুতি। দলের সেরা পঞ্চাশজনকে বাছাই করে নিলেন উনি, তারপর সবাইকে নাম ধরে ডেকে আলাদা করে, নিয়ে গেলেন জঙ্গলের আরও গভীরে–যেখানে ওই খাঁড়ির পেছনের পাহাড়টার সবার শকুনে দৃষ্টির অন্তরালে থাকা যাবে।

রান্নার পাতিলের তলা থেকে ঘন কালো ছাই চেঁছে নিয়ে তেলের সাথে মিশিয়ে একটা ঘন কালি বানিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু পঞ্চাশ জনের পুরো শরীর ঢাকার মত কালি হলো না তাতে, তাই হাত আর পায়ে মাখানো হলো নদীর কালো কাদা। কাপড়-চোপড় খুলে পুরোপুরি নগ্ন করে, গলায় পরিয়ে দেওয়া হলো দাসদের বাঁধার বেড়ি। তবে লোহার কাটার বদলে বেড়ির মাঝের ফাঁকজোড়া দিতে ব্যবহার করা হলো শুকনো ডাল। ওরা সাথে ঢাল নিতে পারবে না, ওদের অস্ত্রের উপরেও পুরু করে কাদার প্রলেপ মেখে নিল যাতে নগ্ন ধাতু থেকে কোনো ঝলকানি না বের হয়, শেষে ওগুলোকে বেঁধে নিল নিজেদের পিঠে–যাতে দৌড়াতে পারে খালি হাতেই।

"তোমরা এখন দাস, সৈন্য না," হুই বললেন ওদেরকে। "দাসদের মত করেই দৌড়াবে, মার খাওয়া কুত্তার মত পালিয়ে যাও।"

ঊর্ধ্বশ্বাসে জঙ্গলের সীমানা ছাড়িয়ে খাঁড়ির দিকে দৌড় দিল ওরা, ওদেরকে তাড়া করল প্রায় পঞ্চাশজন সৈনিক। আর্তচিৎকার করতে লাগল কাদামাখা সৈনিকরা, ওদের দিকে সাবধানে নিশানা করে ছোঁড়া তীরগুলো আশপাশে গিয়ে বিঁধতে লাগল। হাঁটুজলের জায়গাটা থেকে ৫০০ পেস মত দূরের একটা জায়গায় খাঁড়ির ধারে পৌঁছালো ওরা। তারপর সাত-পাঁচ না ভেবেই, ওভাবে একসাথে বাঁধা দাসদের বেড়ি পরা অবস্থাতেই যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে, তখন ভেন্ডিদের রাজা-ও নিজের জায়গা থেকে ওদের এই পলায়নের প্রচেষ্টা দেখতে পেয়ে তীরন্দাজ এবং কুঠারবাজের দুটো বড় দল পাঠিয়ে দিলেন ওদেরকে নদী পার হওয়ায় সাহায্য করতে।

নদীর তীরে একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু রক্তাক্ত লড়াই হয়ে গেল, হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে হুই ওনার ছদ্মবেশী দলটাকে নিয়ে নদী পার হয়ে পৌঁছে গেলেন দূরের পাড়ের জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ে। এপাড়ের জঙ্গলের ভেতর আদিবাসী সৈন্যরা এতক্ষণ যে মজবুত অবস্থানে ছিল সেটায় এখন সামান্য হলেও চিড় ধরলো। কিন্তু যতক্ষণে তারা হুইয়ের দলের চাতুরি ধরতে পারলো, ততোক্ষণে হুইয়ের দল নিজেদের গলার বেড়ি ছুটিয়ে ফেলে চুপচাপ ওদেরকে দ্রুত হাতে সাবড়ে দিল।

তারপরেই ওনারা বিনা বাঁধায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাহাড়টার গোঁড়ায় গিয়ে পৌঁছালেন। সবাই একজোট হয়ে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে হুই ওদেরকে নিয়ে ছুটে গেলেন পাহাড়টার পেছনের দিকে। যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটে গেলেন ওনারা, ওখানে পৌঁছে বিশ্রাম নিলেন কিছুক্ষণ। নদী পার হওয়ার সময় ধুয়ে গিয়েছে হাত আর পায়ের কাদা, ঘামের কারণে চেহারার কালিটা বয়ে নেমে এসে একটা বুনো আর মরিয়া চেহারা এনে দিয়েছে সবার।

নদীর ধারের যুদ্ধের শোরগোল থেমে গিয়েছে ততোক্ষণে, জঙ্গল এখন নীরব আর নিস্তব্ধ, হুই তার দলবল নিয়ে পাহাড়টার পেছন দিকের ঢাল বেয়ে ওঠা শুরু করলেন। এদিকে প্রহরী আছে, কিন্তু ওদের কারো-ই নিজের কাজে মনোযোগ ছিল না, তাই জঙ্গলের আবছায়ার ভেতর দিয়ে ওই অদ্ভুত কালচে অবয়বগুলোর আগমন টের পেতে পেতে অনেক দেরি হয়ে গেল ওদের।

গ্রানাইটের ফাঁকা গম্বুজটার ঠিক নিচে পৌঁছে থেমে দাঁড়ালেন হুই, লানন যে গোলযোগ সৃষ্টি করবেন বলে ঠিক করা আছে সেটার অপেক্ষা করছেন। হাঁটুজলের কাছ থেকে ভাসা ভাসা চিৎকার আর ধাতুর ঝনঝনানি ভেসে এল, তবে দূরত্ব আর মাঝের পাহাড়ের বিশাল বপুর কারণে খুবই ক্ষীণ শোনাচ্ছে সেটা।

নরম গলায় আদেশ দিলেন হুই, "এখন! সবাই একসাথে।" সঙ্গে সঙ্গে সবাই জঙ্গলের ধার থেকে বেরিয়ে গ্রানাইটের গম্বুজ বরাবর দৌড়ে উঠতে শুরু করল। হুই বিনা বাঁধায় ওদের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন, একটা বুড়ো পুরুষ বেবুনের মত দুই হাত বাড়িয়ে লাফাতে লাফাতে এগোচ্ছেন সামনে।

চূড়া থেকে বিশ পেস মত দূরে থাকতে, ভেন্ডি রাজা টের পেল ওনার উপস্থিতি, ঘুরে দাঁড়ালো হুইয়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। চিৎকার করে সাথের লোকজনকে সাবধান করে দিল সে, হুই তার দিকে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যেন একটা টেরিয়ার কুকুর ঝাঁপ দিল সিংহের গলায়। রাজার দুজন দেহরক্ষী এগিয়ে এল তাকে বাঁধা দিতে, কিন্তু হুই চট করে কুঠার দিয়ে দুটো কোপ দিলেন ওদের দিকে, কোপের মাঝামাঝি হাতের কবজি মোচড় খেলো, ফলে দিক পরিবর্তনের সময় ঘ্যাচ করে উঠলো ফলাটা, একজন রক্ষী মারা গেল সাথে সাথে; অন্যজনের বর্শা ধরা হাতটা নিখুঁতভাবে কাটা পড়ল কনুইয়ের উপর থেকে। ওরা দুজন পড়ে গেল দুদিকে আর হুই দৌড়ে গেলেন রাজার মোকাবেলা করতে।

লোকটা আকারে বিশাল, সম্ভবত হুই এযাবত যত লোকের মোকাবেলা করেছেন তাদের মধ্যে সবচে বড়, ওর চামড়া হচ্ছে চকচকে বেগুনি কালো। কাঁধ ও বাহুর পেশী শক্ত আর পাকানো। ঘাড়ের পেশীতন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, চোয়ালের শক্ত অস্থি পর্যন্ত পেঁচিয়ে উঠে গিয়েছে সেটা। লোকটার

মাথাটা নদীর পানিতে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের চাঁই-এর মতই মসৃণ, পাগড়ি না থাকায় তালুটা টাক আর চকচকে কালো দেখাচ্ছে।

সে-ও এগিয়ে এল হুইয়ের মোকাবেলা করার জন্য, ওর দীর্ঘ শক্তিশালী কালো পাগুলো সরে গেল একপাশে আর কোমরের চিতাবাঘের চামড়ার কোমরবন্ধনীটা দুলে উঠলো তাতে। হাতের নিচে একটা বর্শা ধরে সামান্য ঝুঁকে আছে সে সামনের দিকে, বর্শার ফলাটা ক্ষুধার্ত মুখে ঝলকাচ্ছে হুইয়ের পেটের নরম জায়গাটার লোভে। চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায়ই এগিয়ে এল রাজা, হুইয়ের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিল সাথে সাথেই; লোকটার হাবভাবে এমন একটা নির্মম শক্তি আর ক্ষমতার ছটা ছিল যে, হুই নিজের আক্রমণের গতি কমিয়ে কী মনে করে এক পাশে সরে গেলেন নিজ থেকেই, সাথে সাথেই শূন্য ফুঁড়ে এসে যেন বর্শার মাথাটা উপরের দিকে উঠে গেল, ঠিক একটু আগেই হুইয়ের পেটটা ছিল ওখানে।

আক্রমণ ব্যর্থ হতেই বিশালদেহী কালো লোকটা বিরক্তিতে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো, তার তামাটে হলুদ চোখজোড়া আবার স্থির হলো হুইয়ের উপরে। সে আবার আঘাত করতেই, হুই লাফিয়ে সরে গেলেন একপাশে, ফলাটা হিসহিস করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হুই লাফিয়ে উঠে ওনার কুঠারের চোখা মাথাটা রাজার উন্মুক্ত বুকের দিকে নিশানা করে সামনে বাড়লেন। বেগুনি কালো চামড়া কেটে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য দানবটার পাঁজরের হাড় বেরিয়ে গিয়ে ক্ষতটার গভীরতা বোঝা গেল, তবে পরমুহূর্তেই রক্ত বেরিয়ে এসে ঢেকে দিল সেটা। খোঁচা খেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো রাজা, ওর সামনে নাচতে থাকা ডাঁশপোকাটার দিকে আঘাত করতে লাগল সমানে, দিগ্বিদিক কুপিয়ে কেটে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল হুইকে, প্রতিটা কোপে বাড়ছে উন্মত্ততা। হুই যেই তাকে ফাঁকি দিয়ে দিয়ে সরে যেতে লাগলেন, রাজার ক্ষিপ্ত অস্ত্র চালনাও বাড়তে লাগল সমান তালে। হুই অপেক্ষায় রইলেন আরও একটা সুযোগের। সেই সুযোগ এল, দেখা গেল আচমকাই বর্শা ঘোরানোর বৃত্তের ভেতর চলে এসেছেন হুই। দানবটার উরুর ধমনী বরাবর কুঠারের চোখা মাথা দিয়ে খোঁচা মারলেন উনি। কিন্তু দৌড়াতে থাকার কারণে ধমনীর আধা ইঞ্চি পাশে উরুর মাংসে গিয়ে গাঁথলো প্রান্তটা; ধমনী না কাটলেও, একটা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল রাজা। হুই দ্রুত সরে এলেন ওর কাছ থেকে। তারপর আবার উঠে এল কুঠার আর হুই মরণ আঘাত করার জন্য নিশানা করলেন হাঁটু ভেঙে বসে থাকা রাজার গোল চকচকে কালো খুলিটাকে, এক কোপেই ওর বুক পর্যন্ত চিরে যাবে।

"জয় বাআল!" চিৎকার করে উঠে হুই কুঠারটা নামিয়ে আনলেন নিচে। তারপর ওই অবস্থাতেই ঘুরিয়ে ফেললেন কুঠারের মাথা। উনি বলতে পারবেন না যে ঠিক কী চিন্তা করে রাজাকে মারতে গিয়েও থেমে গেলেন, কুঠারের

ফলার ধারালো প্রান্তের বদলে বাড়ি দিলেন পাশের অংশটা দিয়ে, মারলেনও অনেক কম জোর দিয়ে, তবে সেটাও যথেষ্ট জোরে রাজার খুলিতে আছড়ে পড়ে অজ্ঞান করে মুখ থুবড়ে ফেলে দিল তাকে। তবে ওই বিশাল গোল মাথাটার হাড়ের কোনো ক্ষতি হলো না।

হুই লাফিয়ে পিছিয়ে গেলেন, এক ঝলক চারপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে ভেন্ডি রাজার সাঙ্গ পাঙ্গরা সবাই প্রাণহীন অবস্থায় গ্রানাইটের গম্বুজটার উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ওনার সৈন্যদল ওদের রক্তাক্ত তরবারি হাতে এসে জড়ো হলো ওনার চারপাশে। এদেরকে চমকে দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল একদমই অপ্রতিরোধ্য।

হুই ঘুরে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। নগ্ন আর সারা গায়ে ধুলো কালি মাখা অবস্থাতেই নিজের মাথার উপরে তুলে ধরলেন কুঠারটা, ওনার সাথের সৈন্যরাও উল্লাস ধ্বনি করে উঠে তাদের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলো। হাঁটুজলের কাছটায় ডঙ্কা বাজিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সংকেত দেওয়া হলো, সাথে সাথেই খবরটা নিয়ে একের পরে এক ডঙ্কা বেজে বেজে পৌছে গেল এক দল থেকে অন্য দলে।

হুই দেখলেনঃ লাননই প্রথম দলটাকে হাঁটুজল পেরিয়ে নিয়ে গেলেন। আদিবাসী সৈন্যরা বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই কচুকাটা হলো, সামান্য প্রতিরোধও গড়তে পারলো না, বিশৃঙ্খল হয়ে পড়িমড়ি করে ছুটলো পেছনের পাহাড়ের দিকে। নিজের চোখেই ওদের রাজাকে মরতে দেখেছে, এখন কারো মাঝে এক ফোঁটা উদ্দীপনাও অবশিষ্ট নেই।

পাহাড়ের উপর থেকে হুই দেখতে পেলেন, লানন একেবারে ঠিক সময় মত ওনার রেখে দেওয়া দল দুটোকে কাজে লাগালেন। আদিবাসীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে দিগ্বিদিক দৌড়াতে লাগল। হাতের অস্ত্রপাতি ছুঁড়ে ফেলে চিৎকার করতে করতে আতংকিত জনতার মত আবার ওরা ফিরে এল পাহাড় দুটোর চিপার মধ্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুদর্শন যুবক বাকমোর, গরু তাড়িয়ে বিশাল নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিল যে দল দুটো, তাদেরকে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। নিখুঁতভাবে আদিবাসীদের পালানোর একটা মাত্র খোলা পথে দাঁড় করিয়ে দিল সৈন্যদেরকে। বাকমোরের ফিরে আসাটাও একেবারে কাটায় কাটায় হয়েছে বলা যায়, হুইও ওর দক্ষ সৈন্য পরিচালনা ঈর্ষান্বিত পেশাদার মুগ্ধতা নিয়ে দেখতে লাগলেন। জমকালো লাল আর বেগুনি আভায় যখন সূর্য দিগন্ত রেখা ছুলো, আবারও ডঙ্কা বাজিয়ে সামনে বাড়ার সংকেত দেওয়া হলো, গণহত্যা আর দাস সংগ্রহ চললো সেদিন মাঝরাত পর্যন্ত।



সেট-এর কাছে পৌঁছে হাতি টানা ভেলায় করে, সেনাদল আর বর্বর দাসদের নদী পার করলেন হুই। খাঁড়ির কাছের ওই লড়াইয়ের পরে ফিরে আসার সময় আর কোনো বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়নি। ভেন্ডির সকল প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ওদের সব সর্দারকে হত্যা বা আটক করা হয়েছে; লানন খুবই উৎফুল্ল।

তিনি হুইকে ডেকে বললেন, "আমার সূর্যের পাখি! প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি করেছো তুমি। আমি তো কল্পনাও করিনি যে আমার সীমান্তে এত ভয়ানক এক শত্রু বেড়ে উঠেছে। আর যদি একটা বছর সময় পেতো, তাহলে শুধু দেবতারাই জানেন কী ভয়ংকর দানবে পরিণত হতো সে।"

"বাআল অনুগ্রহ করেছেন আমাদের উপর," হুই বিনয়ের সাথে নিজের বড়ত্ব ত্যাগ করলেন।

"সেই সাথে লানন হাইকানাসও," লানন আশ্বাস দিলেন তাকে। "কী কী পেলাম আমরা? বুড়ো রিব-আড্ডি হিসাব শেষ করতে পেরেছেন?"

"এতোক্ষণে তো হয়ে যাওয়ার কথা, হুজুর।"

"ওনাকে ডেকে আনো," লানন আদেশ দিলেন, রিব-আড্ডি ওনার লিপি আর কালিতে ভেজা আঙুল এবং ওনার অবিশ্বাসে ভরা হিসাবরক্ষকের কুঁতকুঁতে চোখ নিয়ে ছুটে এলেন। গবাদি পশু আর দাসদের নানান শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ করে করে তালিকা বলে গেলেন উনি, দাস-সর্দাররা যত্নের সাথে এগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছে।

"তবে এগুলোর দাম খুব বেশি উঠবে না, হুজুর," রিব-আড্ডি হতাশার সুরে উল্লেখ করলেন। "আমাদের অন্য দলগুলোও নদীর ওপারের সব গোত্র থেকে বিপুল জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছে। ওপেটের বাজারে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ হাতবদল হতে দুই থেকে তিন বছর লেগে যাবে কমপক্ষে।"

"সে যাই হোক, ষষ্ঠ বেন-আমনের পুরস্কারের পরিমাণ যেন সবার চাইতে বেশি হয়, রিব-আড্ডি।"

"আপনার যা আদেশ।"

"মোট দাম কত হতে পারে?" লানন জানতে চাইলেন।

রিব-আড্ডিকে সতর্ক হয়ে গেলেন। "আমি শুধু অনুমান করে একটা পরিমাণ বলতে পারি, মহামান্য।"

"অনুমানই করেন, তাহলে," লানন আহ্বান করলেন।

"মোটামুটি সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার স্বর্ণের আঙুল–আর কমের হলে–"

"আপনাকে সুগন্ধির আলাবাস্টারের পাত্রে চুবালেও গা থেকে গোবরের দুর্গন্ধ আসবে," লানন তিরস্কার করলেন বুড়ো লোকটাকে। "কমের কত সেটা শুনতে চাচ্ছি না আমি।"

"আপনি যা বলেন হুজুর," রিব-আড্ডি কুর্নিশ করলেন, লানন হুইয়ের দিকে ফিরে ওনার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

"তুমি পাবে একশো ভাগের এক ভাগ, সূর্যের পাখি। দুইশো পঞ্চাশটা আঙুল–অবশেষে বড়লোক হয়ে গেলে তুমি! কেমন লাগছে?"

"খারাপ লাগছে না," হুই ওনার দিকে চেয়ে হাসলেন, লাননও হো হো করে হেসে আবার ফিরলেন রিব-আড্ডির দিকে।

"আপনার খাতায় লিখে রাখেন। লেখেন যে লানন হাইকানাস ওনার ভাগের অর্ধেক পুরস্কার হিসেবে দান করবেন। আর এই পুরস্কারটা পাবে সেনাদলের অধিনায়ক, হুই বেন-আমন, এই পুরো অভিযানে ওনার অবদানের জন্য।"

"জাঁহাপনা! এটা তো পুরো বিশ ভাগের এক ভাগ," রিব-আড্ডি উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বসলেন। "পুরো এক হাজার ফিঙ্গারের উপরের পুরস্কার।"

"আমি গুনতে জানি," লানন আশ্বস্ত করলেন তাকে, হিসাবরক্ষক হয়তো এরপরেও প্রতিবাদ করতেন, কিন্তু লাননের মুখভঙ্গি চোখে পড়ল তার।

"লিখে নিচ্ছি," বিড়বিড় করে বললেন উনি, হুই ওনার রাজার সামনে এসে কৃতজ্ঞতাবশত হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন।

"ওঠো," আদেশ দিলেন লানন, মুখে হাসি। "আমার জন্য এত আনুষ্ঠানিকতা করা লাগবে না, বন্ধু।" হুই আবার লাননের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, লানন একে একে সব সেনা কর্মকর্তাদেরকে ডেকে আনলেন যারা সম্মানের সাথে কাজ করে পুরস্কারের যোগ্য হয়েছেন।

আচমকা এত বিশাল অর্থপ্রাপ্তিতে হুই কেমন যেন ঘোরের মাঝে চলে গেলেন, ভাগ্যকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবেন বুঝতে পারছেন না। উনি বড়লোক হয়ে গিয়েছেন–ধনী! আজকেই ওনাকে দেবতাদের উদ্দেশ্য বলি দিতে হবে। একটা সাদা ষাঁড়, অন্তত। রিব-আড্ডি একটু আগেই বললেন যেবাজার এখন ভরপুর, তাই সস্তাতেই একটা পেয়ে যাওয়ার কথা। আবার তখনই মনে পড়ল ওনাকে আর এসব দাম নিয়ে না ভাবলেও চলবে। নির্ভয়ে খরচ করতে পারবেন।

এখন উনি চাইলেই আজীবন যেসব বিলাসিতার স্বপ্ন দেখেছেন সেসব লাভ করতে পারবেন, তারপরেও প্রচুর থেকে যাবে জেং-এর ঢালে একটা বাগানবাড়ি কেনার জন্য, হাব্বাকুক লাল-এর একটা বাণিজ্য জাহাজেও

বিনিয়োগ করতে পারবেন। স্বর্ণ-খনিকারকদের সমিতিতে একটা জায়গা পাবেন–মানে আজীবনের জন্য মোটা অংকের আয় নিশ্চিত। গায়ের কাপড়ে তালি মারতে হবে না আর, ঘরে মাংস খাওয়া কমানোর জন্য চেঁচানো লাগবে না, বন্দরের সরাইখানা থেকে সস্তা টক ওয়াইন কিনে খেতে হবে না। আর তখনই ওনার বুকটা লাফ দিয়ে উঠলো, তাকে লাননের আতিথেয়তা আর তার কচি দাসী মেয়েগুলোর শুভাকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে না। চাইলে নিজেই একটার মালিক হতে পারবেন–আরে ধুরো, দুইটা–তিনটা! কচি, সুন্দরি আর ভদ্র। টের পেলেন সারা শরীর শিরশির করছে ওনার। উনি চাইলে এখন বিয়েও করতে পারবেন। এমনকি শহরের বিশিষ্ট পরিবারগুলোও এখন হয়তো এই স্বর্ণের বিশাল গাদার ঝলকানিতে অন্ধ হয়ে তার কুঁজটাকে আর চোখে দেখবে না আর নিজেদের মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দেবে।

তখনই ওনার তানিথের কথা মনে এল, এতক্ষণের ভাবনার দাসী মেয়ে আর বৌ–সবই হারিয়ে গেল তার কল্পনার কুয়াশাঘেরা অন্তরালে। মিইয়ে গেল সকল উদ্দীপনা। অ্যাসটার্টের যাজিকারা দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, ওরা কখনোই বিয়ে করতে পারে না। হঠাৎ করেই হুইয়ের নিজেকে আর একটু আগের মত বড়লোক মনে হতে লাগল না।

"তোমার রাজা কী বলছে সেটা কি তোমার কানে যাচ্ছে না?" লানন জানতে চাইলেন, হুই অপরাধী চেহারা নিয়ে চাইলেন তার দিকে।

"জাঁহাপনা, আমি আসলে স্বপ্নের ঘোরে হারিয়ে গিয়েছিলাম। মাফ করবেন।"

"আর শুধু স্বপ্ন দেখতে হবে না," লানন বললেন ওনাকে।

"গ্রাই-লায়ন কী বলেছিলেন আমাকে?"

"বলেছি যে আমাদের উচিত ওই বর্বরটাকে ধরে নিয়ে আসা–সব সৈন্য আবার একত্রিত হওয়ার আগেই ওর ব্যাপারটা সেরে ফেলা যাক।"

হুই ওনার সেনাদলের দিকে তাকালেন, লানন যে চামড়ার তাঁবুটার নিচে বসে আছেন সেটার সামনে একটা বর্গ তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সূর্যের আলোয় চকচক করছে দলটার প্রতীক, কর্মকর্তারা তাদের সৈন্যদের সামনে আরামে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সবাই মনে আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হুই নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

"গ্রাই-লায়নের যা ইচ্ছে।"

"আনতে বলো তাহলে," লানন আদেশ দিলেন।

কবজি আর গোড়ালিতে শেকলে বেঁধে আটকে রাখা হয়েছে রাজাকে, গলাতেও বেড়ি বাঁধা। দাস-সর্দাররা এক নজর তাকিয়েই কে বিপজ্জনক সেটা বুঝতে পারে, তাদের দুজন দাস রাজার গলার বেড়িতে বাঁধা রশি ধরে টেনে নিয়ে এল।

হুই প্রথম দেখায় ওকে যত বড় দেখেছিলেন এখনও ততোটাই দেখাচ্ছে, তবে এখন আরও বেশি কালো লাগছে গায়ের রঙ। লোকটার বয়স কম। সেটা দেখে বেশ অবাক হলেন হুই, আগের রাতে মনে হয়েছিল জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া কেউ, কিন্তু সেটা ছিল একটা বিভ্রম। লোকটার শারীরিক বিশালতা আর নেতাসুলভ উপস্থিতি তাকে তার মূল বয়সের চাইতে বেশি দেখায়।

হুই খেয়াল করলেন বাঁধন ছেড়ার জন্য কতটা চেষ্টা করেছে সে, নিজের মাংস কেটে ফেলেছে, বেঁধে রাখা লোহার শেকলের গায়ে লেগে আছে ছিলে যাওয়া চামড়া, উরুর ক্ষতটাকেও কোনোমতে ঢেকে রাখা হয়েছে পাতা আর গাছের ছাল দিয়ে। কিন্তু পুরো ক্ষত ঘিরে আছে পচা মাংস থেকে বের হওয়া হলুদ তরল দিয়ে, চারপাশের মাংস দেখে মনে হচ্ছে ফুলে শক্ত হয়ে আছে। যদিও সে ল্যাংচাচ্ছে, যদিও প্রতি পদক্ষেপেই বিদ্রূপাত্মকভাবে ঝনঝন করে উঠছে শেকল; দাস-সর্দাররা তাকে একটা ফাঁদে পড়া জানোয়ারের মতই টেনে নিয়ে আসছে, তবুও তাকে দেখে এটা না মানার কোনো উপায় নেই যে, সে একজন রাজা। লাননের সামনে এসে দাঁড়িয়ে মোটা পেশীবহুল ঘাড়টা সামান্য নোয়ালো সে। চোখে জ্বলছে আগুন, এমনকি সাদা অংশটুকুও ধোঁয়াটে হলুদ হয়ে আছে, তার মাঝে ফুটে আছে রক্ত নালিকার সূক্ষ্ম জাল, সে তার বন্দীকারীদের দিকে এমন ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইলো যে ওখানকার সবাই অনুভব করতে পারলো সেটা।

"তুমি এটাকে–এই বিশাল কালো জানোয়ারটাকে আটক করেছো, হুই?" লানন দানবটার চোখে চোখ রেখে বললেন। "কারো সাহায্য ছাড়াই? তুমি একা?" লানন বিস্ময়াভিভূত হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে হুইয়ের দিকে ফিরলেন, কিন্তু হুই তাকিয়ে আছেন ভেন্ডি রাজার দিকে।

"নাম কী তোমার?" হুই নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, বিশাল গোল মাথাটা এবার হেলে গেল ওনার দিকে, দাস-রাজার অগ্নি দৃষ্টি স্থির হলো হুইয়ের চোখে।

"আপনি ভেন্ডিদের ভাষা জানেন?"

"আমি অনেক ভাষা জানি?" হুই আশ্বস্ত করলেন তাকে। "তুমি কে?"

"মানাতাসসি, ভেন্ডিদের রাজা," আর হুই লাননের জন্য সেটা অনুবাদ করে শোনালেন।

"ওকে বলো যে ও আর রাজা নেই," লানন গজগজ করে বললেন, তা শুনে মানাতাসসি কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলো। ওর হাসিটা ছিল একটা ভীতিকর দৃশ্য, যদিও পুরু বেগুনি ঠোঁট সরে গিয়ে ভেতরের শক্ত সাদা দাঁত বেরিয়ে এল, কিন্তু ওর চোখ থেকে ঠিকরে বের হতে লাগল ঘৃণার আগুন।

"পঞ্চাশ হাজার ভেন্ডি যোদ্ধা এখনও আমাকে রাজা বলে," জবাব দিল সে।

"দাসদের জন্য দাস-রাজা," হেসে বললেন লানন, তারপর হুইয়ের দিকে ফিরে বললেন, "একে কী করা যায় হুই? এ কি ভয়ানক শত্রু না? ওকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে?"

হুই তার দৃষ্টি দাস-রাজার দিক থেকে সরিয়ে প্রশ্নটা নিয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ, যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন কিন্তু দেখলেন কাজটা সহজ হচ্ছে না। কেন যেন হুই আচমকা কিন্তু খুব শক্তিশালী একটা আগ্রহ অনুভব করছেন মানাতাসসির প্রতি। লোকটার ক্ষমতা আর উপস্থিতিতে উনি মুগ্ধ, সাথে যে সামরিক নৈপুণ্য সে প্রদর্শন করেছে, যে চতুরতা আর চালাকি সে দেখিয়েছে এবং তার রহস্যে ঘেরা ব্যক্তিত্ব–সবকিছুই আকর্ষণ করছে তাকে। হুই পরাজিত করেছেন একে, চাইলে একে নিজের হিসেবে দাবী করতে পারেন, এমনকি লাননের কাছ থেকেও; এখন তার খুবই ইচ্ছে করছে কাজটা করতে, কারণ ওনার মনে হচ্ছিল এটা হবে একটা অসাধারণ সুযোগ। এই লোকটাকে নিজের অধীনে নিয়ে শিক্ষা দিয়ে, সভ্য বানাতে পারলে! তাহলে এ কতদূরই না যেতে পারবে! মনের ভেতর নতুন একটা বুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা চালাতেই ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলেন হুই।

"আমার তা মনে হয় না," লানন নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। "একেবারে প্রথম যখন তাকে দেখলাম, খাঁড়ির ওখানে পাহাড়ের উপর, তখনই বুঝেছিলাম যে এ বিপজ্জনক। সাংঘাতিক বিপজ্জনক। আমার মনে হয় না ওকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে, হুই। দেবতাদের জন্য চমৎকার একটা দূত হবে সে। আমরা ওকে বাআলের কাছে উৎসর্গ করবো, এই অভিযানের ফলাফলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দূত হিসেবে পাঠাবো একে।"

"জাঁহাপনা," হুই কণ্ঠ খাদে নামিয়ে ফেললেন, যাতে শুধু রাজাই শুনতে পান কথা, "আমার এই লোকটার ব্যাপারে ভিন্ন একটা চিন্তা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে একে আমি আলোর পথে আনতে পারবো, সত্য দেবতাদের সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারবো। এর বয়স কম, হুজুর, আমি একে শিখিয়ে পড়িয়ে সভ্য বানিয়ে নিতে পারবো, তারপর যখন সব শিখে ফেলবে তখন আবার এদের লোকদের কাছে ফেরত পাঠাবো।"

"পাখিরা কি তোমার ঘিলু চুরি করে নিয়ে গিয়েছে?" লালন আশ্চর্য হয়ে তাকালেন হুইয়ের দিকে। "আবার যদি ওর লোকদের কাছে ফেরতই পাঠাবো, তাহলে ধরার জন্য এত কষ্ট করতে গেলাম কেন?"

"আমরা একে ব্যবহার করে ওদের সাথে মিত্রতা করতে পারবো," হুই মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন চিন্তাটা লাননের মাথায় ঢোকাতে। "একে দিয়ে আমরা আদিবাসীদের সাথে একটা শান্তিচুক্তি করতে পারবো, সুরক্ষিত করতে পারবো আমাদের উত্তর দিকের সীমানা।"

"বর্বরদের সাথে শান্তিচুক্তি!" রেগে গেলেন লানন। "এসব কী আবোল-তাবোল কথা? উত্তর সীমানা সুরক্ষিত করেতে চাও তো? একটা কাজ, শুধু একটা কাজ করলেই উত্তরের সীমানা সুরক্ষিত হবে, তা হচ্ছে শক্ত হাতে ধারালো তরবারি ধরে।"

"জাঁহাপনা, আমার কথাটা শোনেন আগে।"

"না, হুই। আর কোনো কথা শুনতে চাই না। একে মরতেই হবে–আর খুব দ্রুত।" উঠে দাঁড়ালেন লানন। "আজ সূর্যাস্তের সময় একে দেবতাদের কাছে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করো।" তারপর লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন।

"সৈন্যদেরকে ফিরে যেতে বলো।" হুই ওনার সেনাপতিদেরকে বললেন। দাস-সর্দারদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করলেন বন্দীকে নিয়ে যেতে। কিন্তু মানাতাসসি এগিয়ে এল এক পা, শেকল ধরে রাখা দাস-সর্দাররাও তাতে ছিটকে এল সামনে।

"জনাব!" হুইকে ডাক দিল মানাতাসসি, হুই অবাক হয়ে ঘুরে তাকালেন ওর দিকে। এর কাছ থেকে সম্মানসূচক কোনো ডাক আশা করেননি উনি।

"বলো?" হুই তাকালেন ওর দিকে।

"এর মানে কি মৃত্যু?" মানাতাসসি জিজ্ঞেস করল, মাথা ঝাঁকালেন হুই।

"হ্যাঁ, মৃত্যু।" নিশ্চিত করলেন উনি।

"কিন্তু আপনি আমাকে বাঁচানোর জন্য তর্ক করছিলেন?" মানাতসসি জানতে চাইলো জোর দিয়ে, আবার মাথা ঝাঁকালেন হুই।

"কেন?" জানতে চাইলো দাস-রাজা। হুই কোনো জবাব দিতে পারলেন না, শুধু দুই হাত ছড়িয়ে ক্লান্তি আর অনুপলব্ধির একটা ভঙ্গি করলেন।

"তাও দুইবার," আবার বলল দাস-রাজা। "প্রথমে আপনি আমাকে না মেরে কুঠারের ফলা ঘুরিয়ে দিলেন, এখন আবার আমার পক্ষে কথা বলছেন। কেন?"

"জানি না। বোঝাতে পারবো না।"

"আপনিও টানটা অনুভব করতে পারছেন–আমাদের দুজনের মাঝের টান," মানাতাসসি ঘোষণা দিল, বলতে বলতে খাদে নেমে গেল ওর কণ্ঠ, নরম কিন্তু কর্কশ। "আত্মার বন্ধন। আপনিও বুঝতে পারছেন সেটা।"

"না।" হুই মাথা নাড়লেন, তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেলেন নিজের তাঁবুতে। সেদিন বিকেলের প্রায় পুরোটাই উনি কাটালেন নিজের লিপি লিখে লিখে, এই অভিযানের সব লিখে রাখলেন, গ্রামে আগুন লাগানো আর খাঁড়ির যুদ্ধের বিবরণ লিখলেন, যুদ্ধে কী কী লাভ হলো আর কয়জন দাস পাওয়া গেল সেগুলোর তালিকাও টুকে রাখলেন, লুটপাট আর সম্মান দুটোই–কিন্তু উনি চেষ্টা করেও মানাতাসসির কথা লিখতে পারলেন না। লোকটা একটু পরেই মারা পড়বে, তার স্মৃতিও তার সাথেই মারা পড়ুক, সেটা বেঁচে থেকে

জীবিতদেরকে তাড়া করে না বেড়াক। লাননের একটা কথা ওনার মনের মধ্যে গেঁথে আছে, "কালো জানোয়ার", তাই উনি নিজের লেখায় দুর্ভাগা দাস রাজার বর্ণনায় শুধু সেটাই লিখলেন।

হুই দুপুরের খাবার খেলেন বাকমোর আর ওনার আরও কয়েকজন যুবক সেনাপতিদের সাথে, কিন্তু ওনার মন খারাপ ভাব ছড়িয়ে পড়ল ওদের মাঝেও আর খাবারটা হলো একদমই নিরানন্দ, কেউ তেমন একটা কথাবার্তা বলল না বললেই চলে। খাওয়া শেষে প্রায় ঘণ্টাখানেক ওনার সহকারিদের সঙ্গে সেনাদলের নানা প্রয়োজন নিয়ে আলাপ করলেন। এরপর শুরু করলেন কুঠার চালনা অনুশীলন, ক্ষান্ত দিলেন সারা গায়ে দরদর করে ঘাম নামার পর। সব শেষে ঘাম মুছে গায়ে তেল মেখে নতুন আলখাল্লা পরে, বলিদানের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন লাননের তাঁবুতে। লানন একটা সভার মাঝে ছিলেন, ওনার উপদেষ্টা আর কর্মকর্তাদের একটা দল ওনাকে ঘিরে অর্ধ চন্দ্রাকারে বসে আছেন, কেউ চামড়ার উপর কেউ বা গদিতে। লানন মুখ তুলে হুইকে দেখে হেসে ডাক দিলেন ওনার কাছে।

"আমার পাশে বসো, সূর্যের পাখি। একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি আমরা, তোমার কী মতামত সেটাও শুনি।" হুই বসে চুপচাপ শুনতে লাগলেন আর চার সাম্রাজ্যের নানান দিক সম্পর্কে দ্রুত আর আত্মবিশ্বাসী নানান যুক্তিতে একেকটা নির্দেশনা দিয়ে যেতে লাগলেন লানন। উনি এমন সব সিদ্ধান্ত দিতে লাগলেন, যেগুলোর কথা ভাবলেও কয়েক রাত ঘুম হবে না হুইয়ের, লানন সেগুলো বিনা দ্বিধায় বা সন্দেহে একের পর এক বলে যেতে লাগলেন। তারপর উনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে হুইয়ের দিকে ফিরলেন।

"আমার সাথে একটু ওয়াইন খাও, হুই। আবার এরকম সুযোগ কবে পাবো কে জানে। কারণ সকালেই চলে যাবো আমি।"

"কোথায় যাবেন, হুজুর?"

"ওপেটে ফিরবো, তবে খুব দ্রুত। আমি তোমাকে আর তোমার দাসদেরকে রেখে যাবো বাকি কাজ সারতে।"

একসাথে পান করতে লাগলেন ওনারা, পুরনো বন্ধুদের মত সহজ স্বাভাবিক এলোমেলো বকবক করে গেলেন দুজন। কিন্তু হুই সুযোগ খুঁজছিলেন মানাতাসসির ব্যাপারটা কোনোভাবে পাড়া যায় কিনা, লাননও সুনিপুণভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন ওনাকে বারবার। অবশেষে হুই মরিয়া হয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলেন।

"ভেন্ডি রাজার ব্যাপারটা, হুজুর..." আর কিছু বলার সুযোগ পেলেন না হুই, লানন নিজের ওয়াইনের পেয়ালাটা তুলে দিলেন আছাড়, ওটা ভেঙে চুরচুর হয়ে লাল রঙা তরল ছিটকে পড়ল ওনাদের বসে থাকা পশমি গদির উপর।

"শুধু তুমি আমার বন্ধু বলে কিছু বলছি না। আমি ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। এখন কুঠারের কোপটা দেওয়া ছাড়া আর কিছু বাকি নেই।"

"কাজটা ভুল হবে।"

"ওকে বাঁচতে দেওয়াটা হবে আরও বড় ভুল।"

"জাঁহাপনা–"

"যথেষ্ট হয়েছে, হুই! আর না। এখন গিয়ে ওকে বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

সূর্যাস্তের সময় ওরা ভেন্ডি রাজাকে নদীর ধারে সেট-এর কেল্লার দেওয়ালের বাইরের একটা খোলা জায়গায় নিয়ে এল। একটা চামড়ার আলখাল্লা পরানো হয়েছে তাকে, তাতে বাআলের প্রতীকের নকশা করা, আরও পরানো হয়েছে বলিদানের প্রতীকী শৃঙ্খল। হুই দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্যান্য পুরোহিত আর বিশিষ্টজনদের সাথে, যখন ওরা দুর্ভাগা রাজাকে সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিল, তখন সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো হুইয়ের দিকে। ওই ভয়ানক হলুদ চোখগুলো দেখে মনে হলো যেন ওনার মাংসের ভেতরে গেঁথে যাচ্ছে, হুইয়ের আত্মাকে তার চোখের কোটর দিয়ে টেনে বের করে নিয়ে আসবে।

হুই অনুষ্ঠান শুরু করলেন, মন্ত্র পাঠ শুরু হলো, পশ্চিমাকাশের জাজ্বল্যমান দেবতার প্রতীকের দিকে সেজদা করলেন একবার আর এর প্রতি মুহূর্তে টের পেলেন যে ওই চোখজোড়া ওনার অস্তিত্বের ভীত ধরে টান দিয়ে যাচ্ছে।

হুইয়ের সহকারি ওনাকে শকুন কুঠারটা এগিয়ে দিল, ঘষে মেজে চকচকে করে নেওয়া হয়েছে ওটাকে, অস্তমিত সূর্যের আলো পড়ে লাল আর সোনালি রঙে ঝলক দিচ্ছে। হুই এগিয়ে গেলেন যেখানে মানাতাসসি দাঁড়িয়ে আছে, ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

দাস-সর্দাররা সামনে এগিয়ে এসে বলির গা থেকে আলখাল্লাটা খুলে নিল। সোনার শিকল বাদে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেল সে, দারুণ সুন্দর শারীরিক গঠন তার। ওরা ওর পা থেকে কাঁচা চামড়ার চপ্পলটাও খুলে নিল। তারপর দাস-সর্দাররা শেকল ধরে অপেক্ষা করতে লাগল, হুই সংকেত দিলেই ওরা ধাক্কা মেরে বলিকে হাঁটু ভেঙে বসিয়ে দিয়ে মাটির উপর টানটান করে চেপে ধরবে। ঘাড় বের করা থাকবে কুঠার দিয়ে কোপ দেওয়ার জন্য।

হুই ইতস্তত করলেন একটু, জোর করেও আদেশটা দিতে পারছেন না, ওই ক্রুদ্ধ হলুদ চোখটা যেন তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। তারপরেও উনি নিজেকে সামলে ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিচের দিকে তাকালেন। উনি সংকেত দেওয়ার জন্য হাত তুললেন কিন্তু শেষ করা হলো না, হাত যেন জমে গিয়েছে। মানাতাসসির নগ্ন পায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন উনি।

ওনার আশপাশের দর্শকরা অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠলো, বারবার দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে যেখানে সূর্য দ্রুত ডুবে যাচ্ছে গাছপালার আড়ালে। একটু পর দেরি হয়ে যাবে।

কিন্তু হুই মানাতাসসির পায়ের দিকে তাকিয়েই রইলেন।

"সূর্য ডুবে যাচ্ছে, পুরোহিত, বলি দিয়ে ফেলো!" আচমকা লানন ডেকে উঠলেন, কণ্ঠে রাগের আভাস, তার ডাকে যেন হুই ঘোর ভেঙে জেগে উঠলেন। লাননের দিকে ফিরলেন উনি।

"জাঁহাপনা, একটা জিনিস আপনার দেখা দরকার।"

"সূর্য ডুবে যাচ্ছে," অধৈর্য কণ্ঠে বললেন লানন।

"আপনার না দেখলে হবে না," হুই জোর করলেন, লানন সামনে এগিয়ে এসে ওনার পাশে দাঁড়ালেন।

"দেখুন!" হুই ভেন্ডি রাজার পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন, লানন ভ্রূকুটি করে সেদিকে তাকাতেই দম আটকে ফেললেন।

মানাতাসসির পা ভয়ানকরমভাবে বিকৃত, বুড়ো আঙুল থেকে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, ফলে সেটা দেখতে এখন হয়ে গিয়েছে অতিপ্রাকৃত কোনো পাখির নখরের মত। অবচেতন মনেই লানন পিছিয়ে গেলেন এক পা, দুই হাত দিয়ে সূর্যের প্রতীক বানিয়ে রেখেছেন যাতে অকল্যাণ দূরীভূত হয়।

"এ তো পাখির পাওয়ালা," হুই বললেন, "বাআলের পবিত্র পাখি শকুনের পা আছে এর!" আর দর্শকদের ভেতর চাপা কথাবার্তার গুঞ্জন উঠলো। সন্দিহান আর কুসংস্কারচ্ছন্ন দৃষ্টিতে গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল সবাই।

হুই তার গলার জোর বাড়ালেন। "আমি এই লোকটাকে দেবতার চিহ্নযুক্ত ঘোষণা দিচ্ছি। বাআলের কৃপা আছে এর উপর–একে আর দূত হিসেবে পাঠানো যাবে না।"

কথা শেষ হওয়া মাত্রই সূর্যটা টুপ করে ডুবে গেল পৃথিবীর কিনারের ওপারে আর বাতাসে মনে হলো ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা একটু বেশি।



লাননের রাগ বেড়েই যাচ্ছে, রাগের চোটে কাঁপছেন, তার ঠোঁট আর চেহারা এতটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে যে গালের ক্ষতটার উপর জমাট বাঁধা রক্তটা দগদগে হয়ে ফুটে উঠলো।

"আমার আদেশ অমান্য করো তুমি!" ঠান্ডা গলায় বললেন উনি, কিন্তু স্পষ্টতই স্বরটা রাগের চোটে কাঁপছে।

“লোকটা দেবতার চিহ্নযুক্ত!” হুই প্রতিবাদ করলেন।

“এসব দেবতাদের অজুহাত দিতে এসো না, পুরোহিত। তুমি আর আমি দুজনেই খুব ভালো করেই জানি যে বাআলের সব সিদ্ধান্ত তৈরি করে হুই বেন-আমন, সেটা হুই বেন-আমনের জন্যই।”

“হুজুর!” হুই এই অভিযোগের জবাবে শব্দ করে দম আটকে ফেললেন, এ এক ভয়ংকর অধার্মিক অপবাদ।

“আমার আদেশ অমান্য করেছো তুমি,” আবার বললেন লানন। “তুমি ভাবছো ওই অসভ্য বর্বরটাকে আমার আয়ত্বের বাইরে নিয়ে যাবে, তুমি আমার সাথে ক্ষমতা আর রাজনীতির খেলা খেলার দুঃসাহস দেখাও!”

“এটা মোটেও সত্য না, হুজুর। আমি কখনোই সেই সাহস করবো না।”

“সাহস তো তুমি করবেই, পুরোহিত। যদি মন চায়, তাহলে তুমি জ্যান্ত গ্রাই-লায়নের মুখের ভেতর থেকে দাঁতও চুরি করার সাহস দেখাতে পারো।”

“জাঁহাপনা, আমি আপনার সত্যিকার, আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত–”

“লাফালাফি কম করো, পুরোহিত। সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি চার সাম্রাজ্যের যেখানে খুশি সেখানে উড়ে বেড়াও, কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে, সেটা করতে পারো শুধুমাত্র আমার অনুগ্রহে।”

“আমি সেটা খুব ভালো করেই জানি।”

“তোমাকে মান-সম্মান দিয়ে উঁচু জায়গায় আমিই বসিয়েছি, চাইলেই এই মুহূর্তে সেখান থেকে টেনে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে পারবো।”

“সেটাও আমার ভালোই জানা আছে, হুজুর,” বিনয়ের সাথে বললেন হুই।

“তাহলে এই বর্বরটাকে দিয়ে দাও আমাকে,” দাবী করে বসলেন লানন, ওনার দিকে তীব্র অনুশোচনাময় এক দৃষ্টিতে তাকালেন হুই।

“ওকে দিয়ে দেওয়া আর আমার হাতে নেই, জাঁহাপনা। ও এখন দেবতাদের করায়ত্তে।”

লানন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে ওয়াইনের একটা ভারি জগ তুলে নিলেন হাতে। তারপর সেটাকে হুইয়ের মাথার দিকে ছুঁড়ে দিলেন সজোরে, হুই চট করে মাথা সরিয়ে ফেললেন। জগটা তাঁবুর চামড়া দেওয়া অংশটায় গিয়ে আঘাত করল, নরম জায়গা হওয়ায় প্রতিঘাত বেশি হলো না, না ভেঙ্গেই গড়িয়ে পড়ল মাটিতে, মুখ থেকে গলগল করে ওয়াইন পড়তে লাগল, শুকনো মাটি চুষে নিল তা সাথে সাথে।

উঠে দাঁড়ালেন লানন, হুইয়ের মাথার উপর ঝুঁকে আছেন, হাত মুঠি করে ধরা, হাতের পেশীগুলো গিট পাকিয়ে থাক থাক হয়ে আছে রাগের চোটে। মুঠিটা উনি হুইয়ের ঠিক নাকের নিচে ধরলেন, ফ্যাকাসে নীল দ্যুতি

বের হচ্ছে ওনার মায়াহীন চোখ থেকে, প্রচণ্ড রাগের উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠতেই ওনার ঘন লালচে-সোনালি কোকড়ানো চুলগুলো কাঁধের উপর নাচতে লাগল।

"বেরিয়ে যাও!" চাপা হিসহিসে গলায় বললেন উনি। "এক্ষুনি বেরিয়ে যাও–নইলে–নইলে আমি–"

হুই বাক্যটা শেষ হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করার সাহস করলেন না।



লানন হাইকানাস ২০০ সৈন্যের একটা দল নিয়ে রওনা করলেন সেট থেকে, কেল্লার দেওয়াল থেকে ওনার চলে যাওয়া অবলোকন করলেন হুই। রাজার অনুগ্রহ ছাড়া এখন ওনার নিজেকে বেশ অসহায় আর একাকী লাগতে লাগল, ভেতরে ভেতরে অজানা শংকা দানা বেঁধে উঠলো একটা।

হুই গমনরত ছোট্ট দলটাকে সেনাদলের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখলেন, লানন শুধু একটা হালকা কাপড় পরে আছেন, মাথাতেও পরেননি কিছু, এই ভোরের রোদে তার চুলগুলো বাতিঘরের আলোর মতই জ্বলজ্বল করছে। শিরস্ত্রাণ, বর্ম এবং তীর-ধনুক, তরবারি আর বর্শা হাতে তার বর্ম-বাহকরা যাচ্ছে পেছন পেছন। লাননের গোড়ালি ধরে এগোচ্ছে তার পিগমি শিকার-সর্দার, বুশম্যান ঝাই; একেবারে ছায়ার মত সেটে আছে রাজার সাথে।

সেনাদল জয়ধ্বনি করে বিদায় দিল লাননকে, উপত্যকা থেকে পাহাড়ের ঢাল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল তাদের কণ্ঠ, লানন কেল্লার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আশপাশের যারা আছে তাদের সবার চাইতে লম্বা উনি, হাসছেন, উদ্ধত কিন্তু সুন্দর লাগছে তাকে।

মুখ তুলে তাকাতেই দেওয়ালের উপর দাঁড়ানো হুইকে দেখতে পেলেন লানন, মুহূর্তেই হাসিটা বদলে হয়ে গেল অগ্নিশর্মা ভ্রূকুটি; হুইয়ের দ্বিধাগ্রস্ত অভিবাদনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উনি দরজা পেরিয়ে, পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে সেদিকে এগিয়ে গেলেন, ওখান থেকে পাহাড় পেরিয়ে মধ্য সাম্রাজ্যে পৌঁছাবেন।

জঙ্গলের আবডালে রাজার দলটা হারিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেদিকেই তাকিয়ে রইলেন হুই, খুব একা লাগছে নিজেকে। ওখান থেকে ফিরে গেলেন নিজের তাঁবুতে। তাঁবুর এক কোণে দাস-রাজাকে মুমূর্ষু অবস্থায় একটা খড়ের বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছে।

সকালের বাড়ন্ত উষ্ণতায় চরমে পৌঁছেছে ক্ষতের দুর্গন্ধ, মজা পুকুরের ভেতর কিছু একটা মরা পচে যে পূতিগন্ধ ছড়ায় সেরকম লাগছে এখন।

একজন বুড়ি দাসী ভেজা কাপড়ে মুছে তাপমাত্রা কমানোর চেষ্টা করছে শরীরের। হুই ঢুকতেই সে মুখ তুলে তাকালো, তার অনুসন্ধানের জবাবে মাথা নাড়লো শুধু। খড়ের গদিটার পাশে বসে দাস-রাজার গায়ে হাত দিলেন তিনি। তাপে পুড়ে যাচ্ছে শুষ্ক শরীর, জ্বরের ঘোরে গোঙ্গাচ্ছে মানাতাসসি।

"দাস-সর্দারকে ডেকে আনো," বিরক্ত হয়ে আদেশ দিলেন হুই। "এই শেকলগুলোকে খুলে দিতে বলো।"

জ্বরটা যেভাবে এই বিশাল কালো কাঠামোটা থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। চামড়ার নিচে হাড্ডি দেখা যাচ্ছে এর মধ্যেই, গাল ভেঙে গিয়েছে আর চামড়ার রঙ উজ্জ্বল বেগুনি কালো থেকে পাল্টে এখন শুকনো পাংশু ধূসর।

উরুর কাছের ক্ষতটা এখন ফুলে গরম আর শক্ত হয়ে আছে, তার উপর বাজে গন্ধযুক্ত একটা চচ্চরে মামড়ি জমে আছে সেখানে, যা থেকে একটা পানি পানি সবুজাভ হলুদ তরল ঝরছে একটু একটু করে। এখানে এই বিশাল নদীটার উপত্যকায় সূর্যদেবের উপস্থিতি আজ মনে হচ্ছে সর্বগ্রাসী আর তার সাধারণ হিতৈষী উষ্ণ মুখটাকে অত্যাচারী লাগছে। আজ যেন আকাশের পুরোটাই সূর্য দখল করে রেখেছে, ঠিক একটা নেহাইয়ের উপর পড়া হাতুড়ির মতই দুনিয়ার উপরে আছড়ে পড়ছে উত্তাপ।

হুই মুমূর্ষু রাজার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন, তবে বেশ ভাসা ভাসা ভাবে, আধা আধা উচ্চারণ করলেন শেষ লাইনগুলো, কারণ দেবতাদের উপরে খুবই ক্ষেপে আছেন, চাচ্ছেন যে তারা তার এই অসন্তুষ্টি সম্পর্কে জানুক।

"মহান বাআল," বলে উনি সচরাচর যেসব প্রশংসাসূচক উপমা ব্যবহার করেন সেসব বাদ দিয়ে সোজা চলে এলেন ওনার মূল প্রতিবাদের ভাষায়, "আপনার প্রত্যক্ষ ইচ্ছা অনুসরণ করেই আমি একে রক্ষা করেছি, কারণ এ আপনার চিহ্ন বহন করে। আমি কোনো অভিযোগ করতে চাই না, বা আপনার ইচ্ছার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নও তুলতে চাই না, তবে আপনাকে জানাতে চাই যে কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। চরম মাত্রার ত্যাগ করতে হয়েছে আমকে এজন্য। বাআলের সর্বোচ্চ পুরোহিত হিসেবে রাজার যেঅনুগ্রহ পেতাম সেটাকে হারিয়েছি–নিজের কথা ভাবিনি, স্বাভাবিকভাবেই, শুধু আপনার প্রতিনিধি এবং সেবক হিসেবে আমার প্রভাব খাটিয়েছি। আমি যদি দুর্বল হই, তাহলে দেবতাদের আরাধনাও দুর্বল হয়ে পড়বে।" হুই চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন কথাগুলো, এটা নিশ্চিতভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করবে তাদের, ভেবে খুশি হয়ে উঠলেন হুই। ওনার মনে হতে লাগল যে কথাটা যথার্থই হয়েছে, কিছু কিছু ব্যাপার সাহস করে মুখ ফুটে বলে ফেলার আর আনুগত্যের যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সেটা সেরে নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়।

"আপনিই সবার চাইতে ভালো জানেন যে, আপনার কোনো আদেশ মান্য করা খুব বেশি কষ্টের কিছু না, আপনি আমার উপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেননি কিন্তু আমি নিজেই খুশি মনে কাঁধে তুলে নিয়েছি সেটাকে, কারণ এতে আমি সবসময়ই আপনার জ্ঞান আর নিষ্ঠার নিশ্চয়তার চাদরে সুরক্ষিত থাকতে পারবো।"

হুই দম নেওয়ার জন্য একবার থেমে, ভেবে নিলেন একটু। উনি রেগে আছেন, কিন্তু সেই রাগকে ওনার জিহ্বা দিয়ে প্রবাহিত হতে দেওয়া যাবে না। উনি রাজাকে অসন্তুষ্ট করেছেন, এখন দেবতাদেরকেও অসন্তুষ্ট না করাই ভালো হবে। তাই দ্রুত এগিয়ে গেলেন উপসংহারের দিকে।

"যাই হোক, আপনার চিহ্নযুক্ত বর্বরটার ব্যাপারে আমার সেরকম কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাকে অনেক চড়া মূল্য দিয়ে বাঁচিয়েছি আমি—কিন্তু কীসের জন্য? আপনার কি ইচ্ছে যে এখনই মারা যেতে হবে?" হুই আবার বিরতি নিলেন, ওনার বক্তব্যটাকে দেবতাদের মর্মমূলে পৌঁছাতে দিচ্ছেন।

"আমি আপনার কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি," হুই এক ফোঁটা মধু ঢাললেন যেন, "সবচেয়ে বিনীতভাবে, আপনার সবসময়ের মনযোগী ও বাধ্যগত সেবকের প্রতি আপনার উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার করে দিন।"

হুই আরও একবার থামলেন, উনি কি সাহস করে আরও শক্ত কোনো শব্দ ব্যবহার করবেন? ভেবে বাদ দিলেন সেই ইচ্ছা, বরং দুই হাত ছড়িয়ে সূর্যের প্রতীক তৈরি করে ওনার সকল দক্ষতা আর সৌন্দর্য ব্যবহার করে শুরু করলেন বাআলের স্তব সঙ্গীত গাওয়া। ওনার কণ্ঠ এই বিজনভূমির নিস্তরঙ্গ উত্তাপ প্রবাহের ভেতর এমন এক মধুর বেদনার সৃষ্টি করল যে দেবতারা পর্যন্ত চোখের পানি ফেলতে লাগলেন। ওনার শেষ সুরের ধ্বনিটাও গরম বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার পর হুই নিজের তাঁবুতে ফিরে গেলেন আবার। তারপর একটা ব্রোঞ্জের ক্ষুর দিয়ে দাস রাজার উরুর সৃষ্টিছাড়া ফোলা জায়গাটা পোচ দিয়ে ফাঁক করে ফেললেন। মানাতাসসি এই ঘোরের ভেতরেও ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো, ভেতরের হলুদ রঙা বিষ গলগল করে বেরিয়ে এসে দুর্গন্ধে ভরে দিল আশপাশ। হুই একটা লিলেনের কাপড়ে সিদ্ধ ভুট্টা নিয়ে ক্ষতটায় চেপে ধরলেন, বাষ্পের উত্তাপে যাতে বের হয়ে যায় ভেতরের জমে থাকা বিষ।

সন্ধ্যার দিকে জ্বর পড়ে গেল, প্রচণ্ড অবসন্ন কিন্তু স্বাভাবিক একটা ঘুম দিল মানাতাসসি। হুই মুখে হাসি নিয়ে খুশি মনে মাথা নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে রইলেন পাশে। ওনার মনে হতে লাগল যে উনি এই বর্বর দানবটাকে জিতে নিয়েছেন, প্রার্থনা আর প্রচেষ্টা দিয়ে মৃত্যুর কালো থাবা থেকে ছিনিয়ে এনেছেন ওকে। নিজের ভেতরে অধিকারের এক সগর্ব উষ্ণতা অনুভব করতে

লাগলেন উনি, যখন থুত্থুড়ে বুড়ি দাসীটা কানায় কানায় পূর্ণ এক পাত্র জেং ওয়াইন এনে দিল, ঘুমন্ত দানবটার প্রতি অভিবাদন জানিয়ে সেটাকে পান করলেন হুই।

"দেবতারা তোমাকে আমার কাছে দিয়েছেন। তুমি আমার। এখন থেকে আমার সুরক্ষার কব্জায় থাকবে তুমি, এটা আমার ওয়াদা।" তারপর উনি পুরো পাত্রটা খালি করে ফেললেন।



শারীরিক দুর্বলতা কাবু করে ফেলল মানাতাসসিকে, খড়ের গদি ছেড়ে ওঠার শক্তিটাও রইলো না আর তার। হাত বা মাথাটাও উঁচু করতে পারছে না ও, সেজন্য বিতৃষ্ণা ধরে যাচ্ছিল নিজের শরীরটার প্রতি। ও মাথাটা খুব আস্তে ঘুরিয়ে চোখটা খুলল।

তাঁবুর অন্যপাশে, নলখাগড়ার বোনা পাটিতে বসে আছে এক অদ্ভুত ছোট মানুষ। মানাতাসসি হঠাৎ করেই খুব কৌতূহল অনুভব করল লোকটার প্রতি। অদ্ভুত আভা ছড়ানো একটা ধাতুর লিপির উপর ঝুঁকে আছেন উনি, লিপিটাকে পিটিয়ে পাতলা নরম করে ফেলা হয়েছে, একটা সূচালো ছুরি দিয়ে উনি নরম উপরিভাগে আঁচড় কাটছেন। লোকটা দিনের বিশাল একটা অংশ ব্যয় করেন এই কেমনতর কাজের পেছনে। মানাতাসসি তাকিয়ে থাকে তার দিকে, কাজের সময় তার মাথা আর হাতের এদিক সেদিক নড়া-চড়া দেখতে পাখির ছোটাছুটির মত লাগে, তার কানের সোনার দুল দুলতে শুরু করে আর ঘন কালো চুলের বেণী পিঠ বেয়ে ঝুলতে থাকে আলগাভাবে।

বেঢপভাবে কুঁজো হয়ে থাকা শরীরটার জন্যে মাথাটা একটু বেশি বড় মনে হয়, হাত এবং পাগুলো লম্বা, মোটা আর ভয়ংকর-দর্শন, ওনার লম্বা থামের মত বাহুর সামনে পেছনে দুই দিকেই কালো কালো চুলে ভরা–আর লড়াইয়ের সময় ওই শরীরটার গতি আর শক্তির কথা মনে আছে মানাতাসসির। ও নিজের মাথাটা সামান্য তুলে লিনেনের বাঁধনগুলোর দিকে তাকালো, ওর শরীরের নিম্নাংশ ভরে আছে এই জিনিসে।

মানাতাসসির নড়া-চড়া দেখতে পেয়ে সাথে সাথে সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন হুই, তারপর এগিয়ে এসে খড়ের গাদার উপর ঝুঁকে বসলেন, মুখে হাসি।

হুই বললেন, "তুমি তো দেখি দুধের বাচ্চার মত ঘুমাও।" আর মানাতাসসি তাকিয়ে রইলো ওনার দিকে, মনে মনে ভাবছে কারো পক্ষে ভেডির সর্বময় ক্ষমতাধর রাজাকে হাসিমুখে এরকম ভয়ানক একটা খোঁচা মারাও সম্ভব!

"আইয়া, খাবার নিয়ে আসো," হুই বৃদ্ধা দাসীটাকে ডাকলেন, মানাতাসসির গদির পাশে আসন গেড়ে বসে পড়লেন নিজেও। মানাতাসসি বুভুক্ষের মত করে খেতে লাগল, এদিকে হুই পাশে বসে চাঁদকে একটা ফর্সা চেহারার মহিলার সাথে তুলনা করে আজগুবি এক কাহিনি বলে গেলেন, কিন্তু ওর কানে সেসব তেমন একটা ঢুকলো না। ও ভেবে পেল না এরকম পরাক্রমশালী একজন যোদ্ধা কীভাবে এরকম সহজ-সরল হয়। চাঁদের দিকে একবার তাকালেই তো বোঝা যায় যে এটা হলো মিষ্টি আলুর বানানো একটা গোল পিঠা, একমাত্র পরম দেবতা মিতাসি-মিতাসি ওটাকে কামড়ে কামড়ে খান, গোল পিঠার ভেতরে তার কামড়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যায়।

"তুমি কি বুঝতে পারছো?" হুই গভীর চিন্তিত মুখ জিজ্ঞেস করলেন, মানাতাসসিও সাথে সাথেই জবাব দিল।

"বুঝেছি, জনাব।"

"বিশ্বাস হয়েছে?" জোর দিয়ে বললেন হুই।

"বিশ্বাস হয়েছে আমার।" মানাতাসসি সেই উত্তরটাই দিল যেটা দিলে লোকটা সন্তুষ্ট হবে বলে জানতো ও, হুইও খুশি মনে মাথা ঝাঁকালেন। দাস-রাজাকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ওনার প্রচেষ্টা দারুণ কাজে দিচ্ছে। উনি প্রতীকী উপস্থাপনার ব্যাপারটা খুবই যত্নের সাথে ব্যাখ্যা করেছেন, মানাতাসসিকে বোঝাতে পেরেছেন যে চাঁদটা অ্যাসটার্টে না বরং তার প্রতীক, তার মুদ্রা, তার চিহ্ন আর প্রতিশ্রুতি। উনি চাঁদের বাড়া কমার ব্যাপারটাও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন–এটা আসলে পুরুষের প্রতি নারীর অধীনতার প্রতীক, মানব নারীর মাঝেও নিয়মিত চন্দ্র রোগের মাধ্যমে তা দেখা যায়।

"এবার তাহলে মহান দেবতা বাআলের কথা শোনো," বললেন হুই, মানাতাসসি ভেতরে ভেতরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। ও জানতো যে এরপরে কী আসছে। এই আজব লোকটা এখন আকাশের গায়ের ওই ফুটোটা নিয়ে কথা বলবে, যেটা দিয়ে মিতাসি-মিতাসি আসা যাওয়া করেন। লোকটা মানাতাসসিকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করবে যে ওটা আসলে লম্বা লাল দাড়িঅলা একটা লোক। এই ফ্যাকাসে ভূতের মত জীবগুলো যে কি পরস্পরবিরোধী কথা বলে! অথচ এদের আছে অস্ত্র, কাপড়চোপড় আর চমৎকার সব সম্পদ এবং জনপ্রশাসন আর সামরিক ব্যাপার-স্যাপারে জাদুকরি দক্ষতা। ও এদেরকে একই সাথে যুদ্ধ আর কাজ দুটোই চালিয়ে যেতে দেখেছে, চরম বিস্মিত হয়েছে তাতে। আবার এই লোকগুলোই এমন সব সত্য চোখে দেখতে পায় না যা ওদের গোত্রের দুগ্ধপোষ্য শিশুরা পর্যন্ত পুরোপুরি বুঝতে পারে।

জ্বরের উত্তপ্ত ঘোর থেকে নিস্তার পাওয়ার পর, মানাতাসসির সুস্থ মস্তিষ্কের প্রথম চিন্তা ছিল কীভাবে পালানো যায় সেটা। কিন্তু এখন, দুর্বলতার

কারণে চুপচাপ এখানেই থেকে যেতে বাধ্য হওয়ার কারণে, নিজের পরিকল্পনা নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার প্রচুর সময় পেয়ে গেল। এখানেই নিরাপদে আছে ও, এই কুঁজো বামনটার কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, এখন ও আছে তার অধীনে। মানাতাসসি এখন জানে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই নতুন প্রভু ওর উপর ঢাল ধরে রাখবে ততোক্ষণ কেউ ওকে স্পর্শও করবে না।

অন্য যে ব্যাপারটা ও খেয়াল করল সেটা হচ্ছে এখানে আছে শেখার অবারিত সুযোগ। ও যদি এই লোকগুলোর জ্ঞান আর দক্ষতা হাসিল করতে পারে, তাহলে বর্তমানের চাইতে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে যাবে। ও হবে আদিবাসীদের ইতিহাসের সর্বকালের সেরা সেনাপতি। এরা যে কৌশল খাটিয়ে ওদেরকে পরাজিত করেছে, ও এখান থেকে সেই একই কৌশল শিখে নিয়ে এদেরকে হারাবে।

"বুঝতে পেরেছো?" আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন হুই। "বাআল যে সমগ্র পৃথিবী আর স্বর্গের অধিকর্তা সেটা কি ধরতে পেরেছো?"

"বুঝতে পেরেছি," মানাতাসসি বলল।

"তুমি কি অ্যাসটার্টে আর মহান বাআলকে দেবতা হিসেবে মেনে নিচ্ছো?"

"মেনে নিচ্ছি," সায় দিল মানাতাসসি, হুই খুশি হয়ে গেলেন।

"ওনারা তোমার ভেতরে তাদের চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছেন। তাই তোমাকে তাদের সেবায় উৎসর্গ করাটাই হবে সঠিক কাজ। শহরে পৌঁছার পর, মহান বাআলের মন্দিরে আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেব আমি। আমি তোমার জন্য একটা দেবতা-নাম ঠিক করেছি–তুমি আর তোমার পুরনো নাম ব্যবহার করবে না।"

"আপনি যা বলেন, জনাব।"

"এখন থেকে তোমার নাম হবে টিমন।"

"টিমন," দাস-রাজা নামটা উচ্চারণ করে দেখলো যে শুনতে কেমন লাগে।

"পঞ্চম গ্রাই-লায়নের আমলে ইনি ছিলেন পুরোহিত-যোদ্ধা। খুবই মহৎ একজন মানুষ।"

মাথা ঝাঁকালো টিমন, ব্যাপারটা কী তা বুঝলো না এখন, তবে অপেক্ষা করে করে দেখে দেখে শেখার জন্য প্রস্তুত।

"জনাব," নরম গলায় জিজ্ঞেস করল টিমন, "ওই হলুদ ধাতুর উপর যে চিহ্নগুলো আঁচড় কাটেন–সেসব কী?"

হুই লাফিয়ে উঠে গিয়ে স্বর্ণের লিপিটা নিয়ে এলেন গদিতে।

"এভাবে হচ্ছে আমরা শব্দ আর গল্প আর চিন্তাভাবনাগুলো সংরক্ষণ করি।" উনি লেখার পদ্ধতি নিয়ে ব্যাখ্যা করতে লেগে গেলেন, টিমনও ঝটপট লেখালেখির মূলনীতিটা ধরে ফেলে আবারও খুশি করে দিল তাকে।

এক টুকরো ছেঁড়া চামড়ায় হুই ভুষো কালিতে টিমনের নামটা লিখলেন, তারপর দুজন একসাথে জোরে জোরে উচ্চারণ করতে লাগলেন সেটা, নিজের প্রথম সাফল্যে খিলখিল করে হেসে উঠলো টিমন।

"হ্যাঁ," ভাবলো টিমন, "অনেক কিছু শেখার আছে এখানে–কিন্তু সময় এত কম।"



মাটির তৈরি ছকটার উপর রোমের সেনাপতি কাইয়ুস টেরেন্টিয়াস ভারেরো আবারও শুরু করলেন লড়াই, হানিবাল-এর প্রতিরক্ষা ব্যূহর নরম জায়গাটায় চাপ দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তুলতুলে খামিরের মত করে নরম জায়গাটা হার মানলো একসময়, হানিবালের পরিকল্পনা মতই, স্প্যানিয়ার্ড আর গলরা সেখান দিয়ে সৈন্য পাঠাতে নিতে শুরু করল।

"ব্যাপারটা খেয়াল করেছো, টিমন? ব্যাপারটার সৌন্দর্য, ব্যাপারটার পেছনের অনবদ্য প্রতিভা!" উত্তেজিত কণ্ঠে গুঁটিগুলোকে নড়া-চড়া করতে করতে বললেন হুই, পিউনিক ভাষায় কথা বলছেন এখন।

"আর মারহাবাল তখন কোথায় ছিলেন?" টিমনও উত্তেজিত কণ্ঠে একই ভাষায় জানতে চাইলো। প্রায় দুই বছর হয় হুইয়ের তত্ত্বাবধানে আছে ও। এখন অনর্গল পিউনিক বলতে পারে, শুধু স্বরবর্ণ উচ্চারণে একটু টান রয়ে গিয়েছে।

"এইতো এখানে," হুই অশ্বারোহী বাহিনীর গুটিগুলো স্পর্শ করলেন। "ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।" টিমন ঘোড়া বলতে বুঝে নিল যে জেব্রার মত দ্রুতগামী কোনো জানোয়ার, যার পিঠে অস্ত্রধারী মানুষ চড়ে বেড়ায়।

"তার মানে ভাররো এখন ফাঁদে আটকে গেলেন?" টিমন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ! হ্যাঁ! হানিবাল ওনার সামনের দিকটা গুঁড়িয়ে দিয়ে ঘিরে ফেললেন চারদিক থেকে–এরপর কী করলেন বলো তো, টিমন?"

"সংরক্ষিত সৈন্যদলকে কাজে লাগালেন?"

"হ্যাঁ! এই তো ধরতে পেরেছো! নুমিডিয়ান আর আফ্রিকান সৈন্যদল।" উত্তেজনায় উপর নিচে লাফাতে লাগলেন হুই। "একজন কৌশলী সেনানায়কের দক্ষতায় ওদেরকে লেলিয়ে দিয়ে, দুই দিক থেকে চেপে ধরেন ভাররোকে, সাঁড়াশির মত আটকে ফেলেন, ওনার সৈন্যদেরকেও এমনভাবে ঠেসে ধরেন যে ওরা না পারছিল নড়া-চড়া করতে, না পারছিল অস্ত্র সমর্পন করতে। তারপর কী, টিমন, কী হলো এরপর?"

"অশ্বারোহী দল আক্রমণে এল?"

"আহ! অশ্বারোহী দল–মারহাবাল! ঘোড়ার বাজিকর, যিনি সারাটা দিন ছিলেন অপেক্ষায়। আক্রমণ! চিৎকার করে আদেশ দিলেন হানিবাল।" হুই ওনার দুই হাত ছড়িয়ে ভঙ্গি করে দেখালেন। "যাও! আমার ভাই, তোমার বুনো আইবেরিয়ানদের সাথে নিয়ে যাও! ওরা রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, টিমন। একেবারে সঠিক মুহূর্তে। পাঁচ মিনিট আগে হলে বেশি আগে হয়ে যেত, পাঁচ মিনিট পরে হলে বেশি দেরি হয়ে যেত। সময়জ্ঞান! সময়জ্ঞান! মহান সেনানায়কের অসামান্য মেধা, সময়জ্ঞান! একজন রাষ্ট্রনায়ক, প্রেমিক, ব্যবসায়ী, বণিকের সময়জ্ঞান–উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ।"

"তারপর জনাব? ফলাফল কী হলো?" টিমন অনুনয় করল জানার জন্য, টানটান উত্তেজনার অধীর হয়ে আছে ও। "ওনারা কি জিতেছিলেন?"

"জয়?" জিজ্ঞেস করেলেন হুই। "হ্যাঁ, টিমন। জয় তো হয়েছিলই। জয় আর গণহত্যা। দাম্ভিক রোমের আটটা সেনাদল দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যায়, সেনাপতির সাথে আসা পুরো দুটো বাহিনী।"

"আটটা সেনাদল, জনাব!" বিস্মিত কণ্ঠে বলল টিমন। "আটচল্লিশ হাজার লোক, একটা মাত্র যুদ্ধে?"

"তার চাইতেও বেশি, টিমন। সহযোগী বাহিনীকেও ছাড়া হয়নি। ষাট হাজার মানুষ!" হুই ছকটার উপর হাত চালিয়ে রোমান সৈন্যদের ঝড় ফেললেন ওখান থেকে। "আমরা সেদিনের লড়াইতে জিতেছিলাম, টিমন, কিন্তু যুদ্ধ ওরাই জিতেছিল। তিনটাতে। তিনটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যা আমাদেরকে শেষ করে দেয়–" বলতে বলতে থেমে গেলেন হুই। গলার স্বর আটকে গিয়েছে। পানির জগটার দিকে এগিয়ে গেলেন উনি। টিমন ছুটে গিয়ে হাত ধোঁয়ার বাটিটা আগলে ধরলো আর হুই হাত ধুয়ে নিজের দাড়ি আচড়ে নিলেন। "তাহলে হানিবালের অভিযান নিয়ে পড়াশোনা এই পর্যন্তই শেষ, টিমন। কানাই-এর লড়াইটা সবার শেষে পড়ার জন্যই রেখে দিয়েছিলাম আমি।"

"এরপর আমরা কাকে নিয়ে পড়বো, জনাব?"

"এমন একজনকে নিয়ে, যাকে হানিবাল নিজে বলেছিলেন যে সমগ্র ইতিহাসের সেরা কৌশলী সেনাপতি।"

"কে উনি?"

"তৃতীয় আলেকজান্ডার," বললেন হুই, "মেসিডোনিয়ার রাজা, যিনি পুরো পার্সিয়ান সাম্রাজ্যকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন–যাকে ডেলফির দৈবদ্রষ্টা ঘোষণা দিয়েছিলেন অজেয় হিসেবে।"

টিমন হুইকে ওনার আলখাল্লাটা এগিয়ে দিল, হুই কোমরবন্ধটা বেঁধে মন্দিরের বিদ্যালয়ের ভবনটা থেকে দেওয়ালের ছোট্ট দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে

এলেন। টিমনও এক পেস পেছনে পেছনে অনুসরণ করল ওনাকে, ওর পরনে হুইয়ের গৃহকর্মীদের ছোট নীল পোশাক সাথে কোমরে একটা হালকা স্বর্ণের কোমরবন্ধ, একটা ছোরা আর একটা থলে আটকানো তাতে। এসব হচ্ছে একজন দেহরক্ষী হিসেবে উচ্চ মানের বিশ্বস্ততার প্রতীক। হুইয়ের বাম কাঁধ থেকে এক পেস পেছনে হাঁটছে সে, এতে করে ওর মালিকের অস্ত্র ধরার হাতটা আটকে যাচ্ছে না, ওর নিজের হাত সবসময় থাকে ছোরার হাতলে।

"জনাব, হানিবাল যে কৌশলে ভাররোকে ঘিরে ধরেছিলেন। সে ব্যাপারে একটা কথা ছিল?"

"বলো?" হুই উৎসাহ দিলেন ওকে।

"উনি কি ওনার পাশের সৈন্যদেরকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মধ্যখানটাকে শক্ত হাতে সামলাতে পারতেন না?"

"এটাই হচ্ছে আক্রমণ আর রক্ষণের পার্থক্য," ব্যাখ্যা করলেন হুই, ওনারা মন্দিরের মূল ফটক পার হওয়ার আগ পর্যন্ত রণকৌশল আর সমরবিধ্যার নানান আলোচনাতেই মগ্ন হয়ে রইলেন। তবে এরপর আর আলাপ সম্ভব হলো না, কারণ লোকজনের চোখে পড়ে গেল এই অদ্ভুতজোড়াটা। বিশাল কৃষ্ণাঙ্গ দাস আর বামন ভূতের মত প্রভু। হুইকে দেখে উল্লাসধ্বনি করে উঠলো লোকজন, চারপাশে জড়ো হতে লাগল করমর্দন করে দুটো কথা শোনার জন্য, যদি ওনার দয়া হয় তাহলে টিমনের কোমরবন্ধে ওনার থলে থেকে একটা পয়সা পাওয়ার প্রত্যাশায়।

হুই নিজের এই জনপ্রিয়তাকে খুবই উপভোগ করেন। উনি হেসে দুয়েকটা রসিকতা করে, জনতার ভীড় এড়িয়ে ভদ্রভাবে এগিয়ে যেতে লাগলেন। একজন সফল সেনাপতি–সেই বিপুল দাস সংগ্রহের অভিযানের পর আরও দুটো অভিযান পরিচালিত হয়েছে–একজন পরম পূজনীয় পুরোহিত, একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আর গীতিকার, একজন ধনী দানশীল[৭৮], পুরো শহর জুড়ে উনি এখন জনতার সমাদরের পাত্র।

ওনারা বাজারটা পার হলেন মানুষ, মশলা আর খোলা পয়নিস্কাশনের মনোহর সব ঘ্রাণ আর দৃশ্য আর শব্দ পার হয়ে। দাস বিক্রির জায়গাগুলোর একটায় একটা ফর্সা মেয়ে তোলা হয়েছে–মিশ্র ইয়ুয়ি রক্তের, নিলামকারি হুইকে ভিড়ের মাঝে দেখতে পেয়ে ডাক দিল ওনাকে।

"হুজুর, আপনার জন্যে এ যেন এক শিল্পকর্ম, সাক্ষাৎ হলুদ হাতির দাঁতের ভাস্কর্য," বলতে বলতে মেয়েটার গায়ের কাপড় খুলে ফেলল দেখানোর জন্য।

হুই হেসে হাত নেড়ে নাকচ করে দিলেন। হ্রদের পাশের পাথরে জেটি ধরে এগিয়ে গেলেন ওনারা, ওখানে জাহাজগুলো জেটির সাথে নোঙ্গর করে

---

[৭৮]হুই-এর সব বিনিয়োগ বিগত দুই বছর ধরে শনৈ শনৈ উন্নতি করেছে

রাখা, প্রান্তভাগ প্রায় স্পর্শ করে আছে জেটি। দরজাগুলো খোলা আর জাহাজঘাটার কুলিরা দৌড়ে বেড়াচ্ছে ওগুলোর উপর দিয়ে, নানান মালপত্র ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে। জেটির আড়াআড়ি করে থাকা শুঁড়িখানা আর মদের দোকানগুলো থেকে আসছে সস্তা ওয়াইনের ঝাঁজালো গন্ধ আর মাতাল হাসির হল্লা। রাস্তার মেয়েরা দোকানের ফাঁকের সরু গলির মাঝ থেকে ইশারা করে ডাকছে। গোধূলির ছায়াময় আলো ওদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য আর উগ্রভাবে রঙ করা গাল আর ঠোঁটকে নরম করে দিয়েছে–হুই ভেবে পান না একজন পুরুষ এদের মাঝে কি আরাম খুঁজে পায়!

বন্দর এলাকার হট্টগোলের পেছনেই হচ্ছে সম্ভ্রান্ত পরিবার আর ধনী ব্যবসায়ীদের বাড়িঘর, প্রতিটা ঘরই উঁচু মাটির তৈরি দেওয়াল আর পুরু কাঠের অলংকৃত দরজা দিয়ে সুরক্ষিত। হুইয়ের নতুন বাসস্থানও এগুলোর মাঝের সবচেয়ে কম জাঁকজমকপূর্ণগুলোর একটা, প্রবেশ পথটা হচ্ছে দুপাশে দেওয়াল তোলা একটা সরু গলির মাথায়, উপরের সমতল ছাদ থেকে হ্রদের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়।

দরজা দিয়ে ঢুকেই হুই নিজের তরবারি আর আলখাল্লাটা খুলে টিমনকে ধরিয়ে দিলেন, ঘরে ফেরার সন্তুষ্টিতে লম্বা করে দম ফেললেন একটা, তারপর নুড়ি বেছানো উঠোন ধরে এগিয়ে গেলেন ভেতরবাড়ির দিকে।

রাজপুত্র আর রাজকন্যারা অপেক্ষা করছিল তার জন্য–মোট চোদ্দজন, এদের সর্দার হচ্ছে জমজ দুইজন, হেলাঙ্কা আর ইমিলচি। এই দুজন গত দুই বছরে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, বয়ঃসন্ধির অদ্ভুত সময়টাতে আটকা পড়ে আছে এখন। চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকার বয়সও হয়নি এখনও, আবার দৌড়ে হুইকে একটা চুমু দেওয়ার মত বয়সও নেই আর।

তবে বার্কা পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যদের উপর কোনো বিধি-নিষেধ নেই, ওরা ঝাঁক বেঁধে দৌড়ে এল হুইকে জড়িয়ে ধরতে। রাজকীয় পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বটা হুই নিজেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন; রাজা আর পুরোহিতের মাঝের মন কষাকষির পরেও, লানন এই ব্যাপারটায় কোনো হস্তক্ষেপ করেননি। এটায় ওনার অনুমোদন নেই, কিন্তু আবার নিষেধাজ্ঞাও দেননি। হুই ওনার ছাত্রদেরকে ধরে বাড়ির বিশাল বসার ঘরটায় নিয়ে গেলেন।

উঠোনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল রাজার আয়াদের একজন, বাচ্চারা সব পুরোহিতকে অনুসরণ করে ঘরে ঢোকার পর, যাওয়ার জন্য ঘুরতেই তার চোখ পড়ল টিমনের চোখে। মেয়েটা লম্বা, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর আর ভারি নিতম্ব তার। পাজোড়া-ও সোজা আর শক্তিশালী, কিন্তু হাতজোড়া আবার সরু আর হাতের তালু গোলাপি আর নাজুক দেখতে। চুলে পরিপাটি করে তেল দেওয়া তার আর পরনে ভেন্ডিদের রীতিতে পরা পোশাক, কারণ

মেয়েটা টিমনের গোত্রের। মেয়েটাকে উত্তরে অভিযানের সময় ধরে আনা হয়েছিল, জন্মগতভাবে দাসী নয়, এ মোটেও ওই নরমসরম নির্ভরশীল জাত না, যারা আজীবন বন্দীত্ব ছাড়া আর কিছু জানে না। মেয়েটার মাঝে একটা আগুনে চেতনা আছে যা টিমনের সাথে বেশ মেলে। গায়ের রঙ টিমনের চাইতে এক পোচ হালকা, চেহারা গোলগাল, চাঁদের মত, নাক থ্যাবড়া আর চওড়া, ঠোঁট পুরু আর ফাঁক হয়ে থাকে, কিন্তু দাঁত ছোট আর সমান। যখন টিমনের দিকে তাকিয়ে হাসলো তখন দাঁতগুলো ধবধবে সাদা লাগল দেখতে।

টিমন ঝটিতে মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ দিল একটা, সেলিনি নামের দাসী মেয়েটাও মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝতে পারার ইঙ্গিত দিল। উঠোন ছেড়ে রান্না ঘরের ভেতর দিয়ে দাসদের থাকার জায়গার দিকে এগোলো টিমন, দাসী মেয়েটাও অনুসরণ করল ওকে।

টিমন নিজের ছোট্ট ঘরটায় অপেক্ষা করছিল সেলিনির, ভেতরে শুধু একজনের শোয়ার মত নলখাগড়ার পাটি আর পশমের কম্বল। মেয়েটা কোন দ্বিধা ছাড়াই টিমনকে জড়িয়ে ধরে ওর বুক, পেট আর উরুর চওড়া শক্তিশালী পেশীর উপর ঠেস দিয়ে রইলো। বার্কা পরিবারের বেগুনি জামার ভেতর দিয়ে ওর উদ্ধত গোলাকার স্তন টিমনের শরীর উপরে চাপ দিতে লাগল।

ওরা নিজেদের চেহারা চেপে ধরে রাখলো একসাথে, মৃদু কিন্তু আগ্রহ সহকারে চোখ, মুখ আর নাকের ঘ্রাণ নিচ্ছে, নিজেদের কামনা আর অপেক্ষার আবেশে জড়িয়ে ধরে রইলো একজন আরেকজনকে।

"তোমাকে জড়িয়ে ধরলেই আবার নিজেকে ভেন্ডির রাজা মনে হয়, কোনো দাস কুত্তা না," ফিসফিসিয়ে বলল টিমন, মেয়েটা ভালোবাসার অস্ফুট ধ্বনি করে জবাব দিল তার।

যে হাত দিয়ে খালি হাতে কোনো পুরুষের খুলি গুঁড়িয়ে দিতে পারবে, তা দিয়ে আলতো করে সেলিনির পোশাক খুলে দিয়ে টিমন ওকে বয়ে নিয়ে গেল ওর খড়ের বিছানায়। মেয়েটাকে বিছানায় শুইয়ে দিল ও, তারপর ওর উপরে উঠতে উঠতে বলল, "তুমি হবে আমার প্রথম স্ত্রী। তুমি হবে আমার রাণী, আমার বাচ্চাদের মা।"

"কখন হবে সেটা?" জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, ওর ভেতরের প্রচণ্ড আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল গলার স্বর।

"শীঘ্রই," কথা দিল টিমন। "খুবই শীঘ্রই। যার জন্যে এখানে এসেছিলাম পেয়ে গিয়েছি সেটা, তোমাকে নিয়ে ওই নদী পেরিয়ে চলে যাবো। আমি হবো আদিবাসীদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাজা, তুমি হবে আমার রাণী।"

"তোমার উপর সেই ভরসা আমার আছে," ফিসফিসিয়ে বলল সেলিনি।



"সম্মানিত ভদ্রলোক এবং সুন্দরি মহিলারা।" শুনে বাচ্চারা খুশিতে খলবল করে উঠলো, হুই ওদেরকে এভাবে সম্বোধন করাটা আসলে তার রসিকতারই একটা অংশ। "আজ আপনাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে বিশেষ একটা জিনিস আছে!" আবারও নরক ভেঙে পড়ল। হুইয়ের উপহার মানেই হচ্ছে সাধারণত বিশেষ কিছুই হয় সবসময়।

"কী?" ইমিলচি দম বন্ধ করে জানতে চাইলো।

"আজকে সন্ধ্যায় ওপেটের দৈবদ্রষ্টা দেখা করতে আসবে আপনাদের সাথে," ঘোষণা দিলেন হুই, সমবেত উল্লাস ধ্বনি মিলিয়ে গেল সাথে সাথেই। বেশি ছোটরা বুঝলো না কিছুই, কিন্তু বড়দের নীরবতা ওদের মাঝেও সঞ্চারিত হলো। বেশি বড় বাচ্চারা দৈবদ্রষ্টার কথা শুনেছে, ওদের আয়ারা মাঝে মাঝে তার ভয় দেখিয়ে ওদেরকে কথা শুনতে বাধ্য করে। আর এখন এই পৌরণিক জীবটার মুখোমুখি হওয়ার কথা শুনে টানটান হয়ে গেল পুরো পরিবেশটাই। গা ছম ছম করা শুরু হলো ওদের কয়েকজনের।

আন্না ওদের সবার পক্ষ থেকে কথা বলল, বলার সময় অনাবশ্যক নিচু হয়ে গেল ওর গলার স্বর, "উনি তো আমাদেরকে খেয়ে ফেলবেন না, তাই না?"

তানিথ এসে বসল ওদের মাঝখানেই, তারপর চেহারার উপর থেকে আলখাল্লার ঘোমটাটা ঠেলে দিল পেছনে। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে হাসলো ও, নরম স্বরে বলল, "তোমাদেরকে একটা গল্প বলবো আমি।" হাসি আর গল্প বলার প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট ছিল ভয় কাটিয়ে বাচ্চাদেরকে ওর কাছাকাছি নিয়ে আসতে। "এটা হলো মহান দেবতা বাআল আর আমাদের দেবী অ্যাসটার্টের বিয়ের ঘটনা।"

এরপর তানিথ ওদেরকে পুরাণশাস্ত্রের সেই ঘটনাটা বলল যেটা হচ্ছে ফলবতী বসুন্ধরা উৎসবের মূল ভিত্তি, পাঁচ বছর পর পর উদযাপন করা হয় উৎসবটা। এবছরের ওপেট ৫৩৮ বর্ষ হচ্ছে শহরটা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১০৬তম বার্ষিকী, পরের দিনই শুরু হবে উৎসব, যা চলবে প্রায় ১০ দিন যাবত।

তানিথ মোহাবিষ্ট করে রাখলো ওর শিশু শ্রোতাদের, এমন একটা মোহনীয় স্বরে কথা বলতে লাগল যেটার জন্য হুই ওকে যত্নের সাথে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সাথে গল্পের সাথে সঙ্গতি রেখে নানান ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়তে

লাগল, সেটা-ও হুইয়ের শেখানো। আর হুই ওর দিকে একই সাথে পেশাদার প্রশংসা আর প্রেমে বুঁদ হয়ে থাকা প্রেমিকের লোলুপ দৃষ্টির এক অযাচিত সম্মিলনের সাথে তাকিয়ে রইলেন।

দুই বছরে তানিথ নিজের ভেতরের সকল অনিশ্চয়তা আর জড়তার শেষ চিহ্নটুকুও ঝেড়ে ফেলেছে, যদিও বয়স এখনও বিশ পোরেনি, কিন্তু ওর ভেতর আছে আলাদা একটা অন্তরের প্রশান্তি, মনের আর অভিব্যক্তির নির্মলতা, এই সবই জাতির দৈবদ্রষ্টা আর অতিপ্রাকৃত পরামর্শক হিসেবে ওর ভূমিকাকে পোক্ত করেছে। যতই ওর মতামতগুলো হুই বেন-আমন যত্নের সাথে প্রশিক্ষণ আর অনুশীলন করিয়ে দেন না কেন, শেষ পর্যন্ত তানিথকেই মূল কাজটা করতে হয়। আর কাজটাকে করতে হয় প্রত্যয়জনকভাবে। বৈষয়িক দিক দিয়ে বিগত দুই বছরে হুইয়ের এই বিপুল সাফল্যের মূল কারিগর হচ্ছে ধনী ব্যবসায়ী আর ওপেটের বণিক সমিতি কর্তৃক তানিথের প্রতি করা নানান প্রশ্ন আর নির্দেশনার অনুরোধ–আর সেগুলোর প্রতি তানিথের জবাব। নিবেদকরা সাধারণত তানিথের উপদেশ পেয়ে খুবই খুশি হতো, যদিও কথাগুলো অস্পষ্টতার চাদরে মুড়ে রাখা হতো সবসময়, যাতে কেউ অভিযোগ করলে পালটা জবাব দেওয়া যায়। আর তাতে যদি হুই বেন-আমনেরও দুই পয়সা লাভ হয়, তাহলে কী-ইবা এমন আসে যায়?

একইভাবে, রাজার মন্ত্রণাদাতার জায়গাটা হারানোর পরেও, তানিথের মাধ্যমে, রাষ্ট্র নামের জাহাজের হালে একজন নির্দেশক হিসেবে নিজের শক্ত হাত দিয়ে রেখেছেন হুই। উনি নিশ্চিত যে লানন হাইকানাস ব্যাপারটা স্পষ্ট জানেন যে তানিথের কাছ থেকে যে পরামর্শ আর নির্দেশনা পান সেটার আসল উৎস আসলে কে। যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লানন নিয়মিত অ্যাসটার্টের নীরব সবুজ দীঘির পাশের গুহায়, দৈবদ্রষ্টার দরবারে এসে ঘুরে যেতেন।

পরের দিনও লাননের দৈবদ্রষ্টার কাছে আগমনের মাধ্যমেই ফলবতী বসুন্ধরা উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সূচনা হবে। এটাই আসলে তানিথকে হুইয়ের বাসায় ডেকে আনার মূল কারণ। রাজার প্রশ্নের জবাবে কী কী উত্তর দেবে সেই ব্যাপারে ভালোভাবে শিখিয়ে দিতে হবে ওকে। হুই খুবই নিশ্চিতভাবে জানেন যে প্রশ্নগুলো কি হবে, কারণ ওনার তথ্যদাতারা রাজার খুব কাছের লোক, হুইয়ের ধারণা লানন ইচ্ছে করেই প্রশ্নগুলো আগেভাগে ফাঁস করে দেন, কারণ উনি নিশ্চিত যে এগুলো হুইয়ের কানে পৌছাবে আর দৈবদ্রষ্টার মাধ্যমে উত্তরগুলো পৌঁছে দেবেন হুই।

লাননের কথা মনে পড়লেই এক গভীর দুঃখবোধে ভরে যায় ওনার মন। দুই বছর হতে চললো লাননের হাসি, হাত তালি আর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত উনি এবং সময়ের সাথে সাথে ওনাকে হারানোর বেদনার তীক্ষ্ণ ক্ষতটা মোটেও ভোঁতা হয়নি বরং দগদগে হয়েছে আরও। পুরনো বন্ধুকে এক ঝলক শুধু

দেখার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেছেন রাস্তার ধারে, রাজবাড়ির নানান ভোজউৎসবের কাহিনি শোনানোর জন্য অন্যদেরকে বিরক্ত করে মারতেন, কারণ সেসবে আর তিনি নিমন্ত্রিত হতেন না। রাজার জন্মদিনের উৎসবে, বা সিংহাসনে বসার বার্ষিকীতে হুই একটা সনেট লিখে সেটাকে দামী কোনো উপহারসহ রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। যতদূর জানেন উপহারগুলো কেউ ছুঁয়েও দেখতো না, সনেটগুলো পড়ার তো প্রশ্নই আসে না।

হুই জোর করে মন খারাপ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে নিজের ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বাচ্চারা এখন ঘিরে রেখেছে ওকে, সবাই চুপচাপ চোখ বড় বড় করে মনযোগ দিয়ে শুনছে গল্প। চার বছর বয়স্ক হানিবাল–যার নাম রাখা হয়েছে তার কীর্তিমান পূর্বপুরুষের নামানুসারে–তানিথের কোলে বসে বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে মাথা তুলে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

তানিথের গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়েছে কিছুটা, বাচ্চাদের সাথে থাকার কারণে নিজেও বাচ্চাদের মত হয়ে গিয়েছে যেন, ওর মুখভঙ্গি অনেক প্রাণবন্ত আর কণ্ঠ উত্তেজিত লাগছে। ওকে এভাবে দেখে ওর প্রতি হুইয়ের অনুভূতির নতুন একটা মাত্রা যুক্ত হলো, মনে হতে লাগল বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা ফুলতে ফুলতে বুকটা ফেটেই যাবে একসময়। আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে তাকে, ভাবতে লাগলেন উনি, কীসের জন্য? তানিথের আত্মবিশ্বাস জেতার জন্য যদি দুই দুটো সযত্নে পরিকল্পিত বছর লেগে যায়, তাহলে ওর হৃদয় জিততে কত বছর লাগতে পারে, সেটা জেতা সম্ভব হলেও কি ওনার কোনো আশা থাকবে? ও তো দেবতাদের প্রতি উৎসর্গকৃত, কখনোই কোনো মরণশীল মানুষ ওকে অধিকার করতে পারবে না।

গল্প বলা শেষ হলো তানিথের, বাচ্চারা চিৎকার চেঁচামেচি করে আরও গল্প বলার জন্য হল্লা করতে লাগল। ওকে ঘিরে ধরে সনির্বন্ধ অনুরোধের পাশাপাশি ঘুষ হিসেবে দিতে লাগল চুমু–তা দেখে হুই কপট রাগের ভান করে তিরস্কার করলেন ওদেরকে, তা দেখে ওরা আরও বেশি হাসতে হাসতে হাততালি দিতে লাগল খুশিতে। উনি চিৎকার করে আয়াদেরকে ডাকলে দৌড়ে এল তারা–এদের মাঝে আছে লম্বা একজন তেজস্বিনী, যে তার গহীন চোখজোড়া দিয়ে হুইয়ের দিকে তাকালেই ওনার বুকের ভেতরে ধ্বক করে ওঠে।

উনি মেয়েটাকে বললেন, "সেলিনি, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, টিমনকে বলো একটা বাতি সাথে নিয়ে তোমাদেরকে রাজবাড়ির দরজা পর্যন্ত দিয়ে আসতে।" মেয়েটা শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল যে নির্দেশটা বুঝতে পেরেছে ও, কিন্তু এর কারণে কোনো কৃতজ্ঞতা বা বিরক্তিভাব কোনো কিছুই প্রকাশ পেল না তাতে।

বাচ্চারা চলে যাওয়ার পরে সন্ধ্যার নাস্তা করলেন ওনারা–ওনারা তিনজন, তানিথ, হুই আর আইনা নামের বুড়ী এক যাজিকা যে তানিথের সার্বক্ষণিক

সঙ্গী। হুই দুটো চমৎকার কারণে বেছে নিয়েছেন একে। মহিলা অর্ধেক কানা, পুরোপুরি কালা। হুই বিশ পেস দূর থেকে নানান আজেবাজে অঙ্গভঙ্গি করে পরীক্ষা করে দেখেছেন ওকে। আইনার কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা যায়নি, অথবা হুই পেছনে লুকিয়ে থেকে আইনার কানের সামনে ওকে ডাক দিয়েছেন তখনও কিছুই শোনেনি ও। মানে একেবারে হুইয়ের মনের মত একজন।

বাতি একদম টিমটিমে করে দিয়ে খাবার খেলেন ওনারা, খাবার পরিবেশন করল বৃদ্ধা একজন দাসী। খাবার শেষে হুই তানিথকে নিয়ে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে এলেন আর নলখাগড়ার পাটির ছাউনির নিচে পাতা গদিতে বসে রইলেন দুজনে। হ্রদ থেকে ভেসে এল রাতের ঠান্ডা বাতাস, আকাশের তারাগুলোও পরিস্কার বাতাসে খুব বেশি হলুদ আর উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। হুই ওনার লুট-টার উপর ঝুঁকে বসে একটা ঢেউ ওঠা তরঙ্গের মত করে সুর তুলতে শুরু করলেন। এই সুরটাকে উনি তানিথের অবচেতন মনের কাছে সম্মোহনী সংকেত হিসেবে পরিচিত করে তুলেছেন। সুরটার সর্বশেষ টানটা দেওয়ার আগেই তানিথের শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর এবং ছন্দবদ্ধ হয়ে এল, শরীর স্থির আর গাঢ় সবুজ চোখজোড়া খোলা থাকলেও, মনে হতে লাগল ও কোনো দিকেই তাকিয়ে নেই।

তবে হুইয়ের আঙুলগুলো যন্ত্রটার তারের উপর দিয়ে ছুটে চলা থামালো না, বারবার একই সুর তুলতে তুলতে উনি বলতে শুরু করলেন। একঘেয়ে আবৃত্তির সুরে চলতে লাগল কথা, বলছেন নরম স্বরে কিন্তু সেটা তানিথের কানে না, অন্তরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন আর তানিথও তারার আলোর নিচে বসে বসে ওর অন্তরের কান দিয়েই শুনে নিতে লাগল সব।



১০৬তম ফলবতী বসুন্ধরা উৎসবের প্রথম দিনে, ওপেটের সাতচল্লিশতম গ্রাই-লায়ন লানন হাইকানাস শোভাযাত্রা সহকারে অ্যাসটার্টের মন্দিরে গেলেন দৈবদ্রষ্টার সাথে কথা বলার জন্য।

বাআলের মন্দিরের চত্বর পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন উনি, যেখানে সূর্যের দিকে তাক করা পবিত্র মিনার বসানো আছে, কালো পাথরের তৈরি শকুনের বাঁকানো ভাস্কর্য দিয়ে ঘেরা। শহরের জনগণ নীরবে অপেক্ষা করছে এখানে। লাল পাহাড়ের গায়ের পবিত্র গুহার প্রবেশপথটায় পৌঁছে উনি কোমর থেকে তরবারিটা খুলে ছোট্ট পিগমি শিকার-সর্দারের হাতে তুলে দিলেন, শিরস্ত্রাণ আর ঢাল তুলে দিলেন অস্ত্রবাহকের হাতে। তারপর খালি মাথায়, নিরস্ত্র অবস্থায় ঢুকে গেলেন পাহাড়ের গায়ের খোলা জায়গাটা দিয়ে।

নুড়ি বসানো সুড়ঙ্গটা দিয়ে উনি প্রবেশ করলেন গুহার নীরব সৌন্দর্যের ভেতরে। দীঘির পাড়টা বৃত্তাকারে কাটা বেলেপাথরের খণ্ড দিয়ে বাঁধানো। বিশাল দেওয়ালগুলোর সামনে পাথরের বেঞ্চের সারি, সবচে ভেতরের দেওয়ালে স্থাপন করা হয়েছে অ্যাসটার্টের মঠ, যার অর্ধেক গুহার পাথর কেটে বানানো। ওটার প্রবেশপথটা হেলেনিক রীতিতে[৭৯] বানানো, এর ভেতরে আছে যাজিকাদের থাকার জায়গা আর দৈবদ্রষ্টার কক্ষ।

দৈবদ্রষ্টার পাথরের সিংহাসনের পেছনেই আছে শহরের দলিল দস্তাবেজের সংরক্ষণাগার, পাথর কেটে বানানো হয়েছে সেটা, সেটারও পেছনে, একটা প্রকাণ্ড পাথরের দরজা আর দেবতাদের অভিশাপের মাধ্যমে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে কোষাগার আর রাজাদের সমাধি।

লানন দীঘির পাশে থেমে দাঁড়ালেন, যাজিকারা এগিয়ে এল ওনার সাথে দেখা করার জন্য। তারপর ওরাই রাজাকে দীঘির কিনারে নিয়ে গিয়ে শরীরের বর্ম আর অন্তর্বাস খুলতে সাহায্য করল।

সবুজ পানিতে নেমে যাওয়ার সিঁড়ির ঠিক মাথায়, নগ্ন হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন লানন। মাথাভরা সোনালি চুল, সারা দেহে একজন পেশাদার খেলোয়াড়ের মত সুগঠিত পেশী ওনার, তবে ঘাড় আর কাঁধে মোটা মোটা পেশীর জট, যেটা একজন অসিযোদ্ধার বৈশিষ্ট্য। পেট আর পেটের দুই পাশ অবশ্য সরু এবং চামড়ার নিচের পেশীর আদলে গঠিত কিন্তু সেটা অতোটা বোঝা যায় না। সমতল পেট বেয়ে নাভী পর্যন্ত চলে গিয়েছে লালচে সোনালি লোমের হালকা আবরণ, সেখান থেকে দুই পায়ের সংযোগস্থল পর্যন্ত সেটা সূর্যকিরণের মত উদ্ভাসিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পাজোড়াও সুগঠিত, লম্বা আর পেটানো, ওনার রাজকীয় বপুটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে খুব সহজেই।

প্রধান যাজিকা আশীর্বাদ করলেন ওনাকে, তারপর দেবীর আনুকূল্য প্রার্থনা করলেন উৎসবের জন্য। আর লানন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এই পবিত্র, জীবনদায়ী পানিতে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন।

দুজন কম বয়স্ক নবিস ওনার শরীর মুছিয়ে নূতন লিনেনের কাপড় পরিয়ে দিল, একই সাথে হুই বেন-আমন দেবীর প্রশংসা সঙ্গীত গাইতে লাগলেন। গাওয়া শেষ হতেই, সবাই দীঘির উপরে, গুহার ছাদের খোলা জায়গাটা দিয়ে তাকিয়ে রইলো।

লানন উচ্চ স্বরে ডেকে উঠলেন, "অ্যাসটার্টে, চাঁদ আর পৃথিবীর জননী, আমরা যে দূত পাঠাচ্ছি তাকে গ্রহণ করুন–আর আমাদের প্রার্থনাকে আপনার আনুকূল্য দিয়ে মঞ্জুর করে নিন।"

দীঘির চারপাশে জড়ো হওয়া সবাই তাদের হাত উপরে তুলে সূর্যের প্রতীক তৈরি করল, সংকেত পাওয়ামাত্র, বলিকে গুহার ছাদের ফাঁকা জায়গাটা

---

[৭৯]ভাস্কর্যগুলো স্বাভাবিক মানুষের মতো করেই বানানো হতো যে আমলে

থেকে বেরিয়ে থাকা পাথরের খণ্ডটা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো নিচে। দুর্ভাগা আত্মাটার মরণ আর্তনাদ কিছু সময়ের জন্য প্রতিধ্বনিত হলো গুহার দেওয়ালে, তারপরেই দেহটা আছড়ে পড়ল পানিতে আর শরীরে বাঁধা শেকলের ওজনের কারণে দ্রুত তলিয়ে গেল ওই সবুজ গভীরতার ভেতরে।

লানন দীঘিটা থেকে ঘুরে, সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা যাজিকাদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেলেন মঠের প্রবেশদ্বারের দিকে। দৈবদ্রষ্টার দর্শন কক্ষটা একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বসার ঘরের চাইতে সামান্য বড়। বাতিগুলোয় নিষ্কম্প আলো জ্বলছে। একটা অতিপ্রাকৃত সবুজাভ রঙ বের হচ্ছে শিখা থেকে। ধুপ ধুনোর ঘ্রাণে ভরে আছে পুরো ঘরটা, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায় তাতে। দৈবদ্রষ্টার আসনের পেছনে ছাদ থেকে নকশাকাটা ঝালর মেঝে পর্যন্ত ঝোলানো।

দৈবদ্রষ্টা বসে আছে আসনে, সাদা আলখাল্লার ভেতর ছোট্ট অবয়বটা প্রায় হারিয়েই গিয়েছে, চেহারা ঘোমটার ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে পুরোপুরি।

প্রশ্ন করার আগে, লানন ঘরটার মাঝখানে একটু থেমে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে ঘরের বন্দোবস্ত একটু দেখে নিলেন, এখানকার পরিবেশে প্রশ্নকারী অস্বস্তিতে পড়ে যাবে নিশ্চিত। খালি পায়ে, দীঘি থেকে ভিজে এসে, সকল অস্ত্র আর অলংকার খুলে রেখে এক আজব পোশাক পরিহিত অবস্থায় সামনের সিংহাসনে উপবিষ্ট অবয়বটার দিকে তাকিয়ে থেকে, বুক ভরে মাদকতা পূর্ণ বাতাস টেনে নিতে থাকা–যে কারো-ই অস্থিতিশীল হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

লানন টের পেলেন ভেতরে ভেতরে রাগ ফণা তুলছে, ফলে আনুষ্ঠানিক অভিবাদনের পর প্রথম প্রশ্নটা করার সময় ওনার কণ্ঠ বেশ কর্কশ শোনালো।

ঝালরের পেছনে, নিজের লুকিয়ে থাকার জায়গাটা থেকে লাননের দিকে চোখ রাখছেন হুই, এত কাছে বন্ধুর শারীরিক উপস্থিতির কারণে বেশ ফুর্তিতে আছেন উনি। লাননের আচরণ আর গলার স্বর, সেই সুপরিচিত আর ভালোবাসার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন আবার, মুখভঙ্গির প্রত্যাশিত পরিবর্তনে হেসে দিলেন–ফ্যাকাসে নীল চোখজোড়ায় আচমকা রাগের আভাস, কোনো সতর্কবার্তা শুনলে দ্রুত আগ্রহ চড়ে যাওয়া, কোনো ভালো উপদেশ পেলে মিটিমিটি হাসি।

হুইয়ের মতই একঘেয়ে গলায় উত্তর দিয়ে গেল তানিথ, হুই ওকে একগাদা উত্তরের সমৃদ্ধ যে ভান্ডার দিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলোর ভেতর থেকে বাছাই করে করে উত্তর দিয়ে গেল ও।

প্রশ্নোত্তর শেষ করে লানন উঠে যেতে গেলে, তানিথ ওনাকে ডেকে বসালো আবার।

"আরও কিছু কথা আছে।"

লানন অবাক হয়ে ঘুরে তাকালেন আবার, কারণ উনি দৈবদ্রষ্টার কাছ থেকে কখনো এরকম অযাচিত–বিশেষ করে বিনা পয়সায়–কোনো উপদেশ

আগে পাননি। কিন্তু তানিথ বলেই চললো, "সিংহের একটা বিশ্বস্ত শেয়াল ছিল যে কিনা তাকে শিকারির গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক করতো, কিন্তু সিংহ শেয়ালকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

"সূর্যের একটা পাখি ছিল যে তার বলিকে আসমানে পৌঁছে দিতো, কিন্তু সেই পাখির দিক থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

"তার হাতে ছিল এক প্রতিরোধী কুঠার, কিন্তু তিনি তা ফেলে দিয়েছেন।

"ওহ, উদ্ধত সিংহ! ওহ, অবিশ্বাসী সূর্য! ওহ উদাসী হাত!"

ঝালরের পেছনে দম আটকে বসে রইলেন হুই। যখন কথাগুলো সাজিয়েছিলেন তখন বেশ চালাকি বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু এই পাথরের কক্ষে তানিথ মুখে বলার পর উনি নিজে পর্যন্ত ভড়কে গিয়েছেন।

ধাঁধাটার সমাধানে পৌঁছাতেই লাননের ফ্যাকাসে চোখজোড়া যেন চকচক করে উঠলো, পুরো ব্যাপারটা ধরতে পারা মাত্র ওনার চোখ পরিষ্কার হয়ে নীলকান্তমণির শীতলতায় ঝিলিক দিতে লাগল আর রক্ত জমে গেল তার চেহারা আর ঘাড়ে।

"গোল্লায় যা, ডাইনী," চিৎকার করে বললেন লানন। "তোর কাছ থেকেও আমাকে এই কথা শুনতে হলো? ওই শয়তান পুরোহিত আমাকে প্রতি পদক্ষেপে জ্বালিয়ে মারে। আমি আমার শহরের রাস্তা ঘাটে হাঁটতে পারি না, শুনি লোকজন ওর লেখা ফালতু গানগুলো গাচ্ছে। আমি আমার নিজের খাওয়ার ঘরে বসে খেতে পারি না কারণ অতিথিরা এসে ওর মুখভঙ্গি নকল করে করে দেখাবে। আমি লড়াই করতে পারি না, এক পেয়ালা ওয়াইন খেতে পারি না, একটা পাশার গুঁটি পর্যন্ত ফেলতে পারি না, কারণ ওর ছায়া এসে আমার কাঁধের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।" রাগের চোটে হাফাতে শুরু করেছেন লানন, বলতে বলতে উনি দুদ্দাড় পায়ে এগিয়ে গিয়ে দৈবদ্রষ্টার হতচকিত চেহারার সামনে নিজের উদ্ধত মুষ্ঠি নাড়াতে নাড়াতে লাগলেন। "এমনকি আমার বাচ্চাদেরকেও–ও জাদু করেছে।"

ঝালরের পেছনে হুইয়ের মনে হলো ওনার আত্মা বুঝি উজ্জ্বল পাখায় ভর করে সাত আসমান পেরিয়ে গিয়েছে, কারণ কোনো শত্রুর গলার আওয়াজ না এটা।

"ও বুক ফুলিয়ে আমার শহরের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আমার সাম্রাজ্যে ওর নাম প্রতিধ্বনিত হয়।"

লাননের রাগ পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হলো নির্দোষ ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে।

"ও হেঁটে গেলে সবাই উল্লাস ধ্বনি করে, আমি নিজে শুনেছি তা। বাআলের কসম, সবাই ওর জন্য রাজার চাইতেও বেশি উচ্চস্বরে উল্লাস করে।"

লানন সিংহাসনের সামনে থেকে ঘুরে গেলেন, অস্থিরতা সামলাতে পারছেন না। ঝালরের উপর দিয়ে ঘুরে এল ওনার চোখ, এক মুহূর্তের জন্য

মনে হলো হুইয়ের আত্মার দিকে যেন তাকিয়ে আছেন। হুই দ্রুত একবার দম নিয়ে পিছিয়ে আসলেন ওখান থেকে, কিন্তু লানন ঘরময় একবার পায়চারি করে আবার ঘুরে এগিয়ে এলেন দৈবদ্রষ্টার দিকে।

"ও এইসব করে বেড়ায়, আমার কোনো সাহায্য ছাড়াই। ওর হওয়া উচিত ছিল একঘরে, উচিত ছিল–" উনি থেমে গিয়ে আবার শুরু করলেন পায়চারি। পরের কথাটা বলার সময় কণ্ঠ পরিবর্তিত হয়ে গেল ওনার, যে ধার ছিল এতক্ষণ মিইয়ে গেল সেটা, এত আস্তে কথা বললেন যে শোনাই গেল না প্রায়, "কী যে মনে পড়ে ওই বদমাইশ ছোট্ট ব্যাটাকে।"

হুইয়ের সন্দেহ হতে লাগল যে আসলেই কথাগুলো বলা হলো কিনা, কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই লাননের কণ্ঠ গর্জে উঠলো আবার।

"কিন্তু আমাকে ধোঁকা দিয়েছে ও। আমার জিনিস কেড়ে নিয়েছে আমার কাছে থেকে, সেটাকে আমি মাফ করতে পারি না।"

লানন ঘুরে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে। সাথে আসা পরিষদবর্গ আর শিকার-সর্দাররা ওনার মুখের অভিব্যক্তি দেখেই বুঝে নিল যা বোঝার, সাথে সাথে ওরা সামনের দিকে সংকেত পাঠিয়ে দিল যাতে রাজবাড়িতে ফেরার পথে রাজার অগ্নিমূর্তির কোপানলে কারো পড়তে না হয়।



উৎসবের শেষ দিনে লানন হাইকানাস মহান বাআলের মন্দিরে গেলেন প্রার্থনা করতে, একাকী, ওই পবিত্র উপবনের ভেতরে মিনার আর শকুনের ভাস্কর্যের মাঝে। তারপর বেরিয়ে এলেন ওনার প্রজাদের কাছ থেকে নতুন করে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে। নয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিনিধি থাকবে, সেই সাথে থাকবে পুরোহিতবর্গ, কারিগর আর রাজ্যের শক্তিশালী বণিক সমিতির সদস্যরা। এরা সবাই আবার নতুন করে রাজার প্রতি তাদের সহযোগিতার শপথ পাঠ করবে, গ্রাই-লায়নকে উপহার দেবে।

হুই বেন-আমন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। তাই বাকমোর পুরোহিতদের পক্ষ থেকে শপথ পাঠ করে উপহার প্রদান করল। যুবক যোদ্ধা-পুরোহিত লাননের সামনে ঝুঁকে সম্মান প্রদর্শন করতেই উনি মৃদু গরগর করে উঠলেন।

"মাননীয় বেন-আমন কোথায়?"

"জাঁহাপনা, আমি ওনার এবং মহান বাআলের সকল পুরোহিতদের পক্ষে বলছি।" বাকমোর হুইয়ের শেখানো পদ্ধতিতে এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা, সমবেত সুধীদের উপস্থিতিতে লাননের পক্ষে আর চাপাচাপি করা সম্ভবপর হলো না।

এই আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে শেষ হলো উৎসব। লানন ওনার পরিষদবর্গকে সাথে নিয়ে বিশাল ভোজে অংশ নিলেন আর সাধারণ জনগণ রাস্তা জুড়ে ভিড় করে নেচে গেয়ে বেড়াতে লাগল। ওয়াইন ব্যবসায়ীরা ঘুরে বেড়াতে লাগল ভিড়ের মধ্য দিয়ে, তবে দিনের বেলায় নানান প্রথা আর আইনের বিধি নিষেধের কারণে লাগাম রইলো লোকজনের আচার ব্যবহারে। অন্ধকার নেমে আসতেই বেরিয়ে এল সবার চরিত্রের কামুক আর উচ্ছৃঙ্খল রূপটা, এটাই হচ্ছে এই উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য। রাতের বেলা সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী আর মেয়েরা চুপি চুপি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে, আপাদমস্তক আলখাল্লা আর মাথায় ঘোমটা টেনে, রাস্তার এই বেলেল্লাপানায় অংশ নেয় তারাও–বা অন্তত সবকিছু লোভাতুর চোখ আর দমবন্ধ উত্তেজনায় দেখতে থাকে। পুরো একটা দিন আর রাতের জন্য সামাজিক সকল রীতিনীতির বেড়াজাল তুলে দেওয়া হয়, কোনো স্বামী বা স্ত্রী তাদের সঙ্গীর কাছ থেকে কোনো ব্যাখ্যা বা বর্ণনা শোনার দাবী করতে পারবে না। প্রতি পাঁচ বছরে একবার মাত্র ঘটে ব্যাপারটা, উৎসব শেষ হতেই দেখা যায় সবার বেহেড মাতাল মাথা, রক্তশূন্য চেহারা আর কাঁপতে থাকা হাত, সেই সাথে আত্মতুষ্ট আর গোপন হাসি।

বিকেলের মাঝামাঝি লানন মাতাল হয়ে গেলেন, প্রকাশ্যে এবং খুশিমনেই মাতাল, ওনার অতিথিদেরও দেখা গেল একই অবস্থা। রাজবাড়ির খাবারের ঘরের সবাই গরমে হাঁসফাঁস শুরু করল। কাদার তৈরি সমতল ছাদের উপর ভীষণভাবে তাপ বর্ষণ করছে সূর্য, সেই সাথে যোগ হয়েছে প্রায় ৫০০ উত্তেজিত অভিজাত লোকের দেহতাপ আর গরম খাবার পাত্র থেকে বের হওয়া ভাপ–সব মিলিয়ে জায়গাটা পুরো একটা উনুন হয়ে গিয়েছে।

লোকজনের চেঁচামেচিতে গায়কদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও ভেসে যাচ্ছে। আর নগ্ন নাচিয়েদের প্রতিভা প্রদর্শনী ভেস্তে যাচ্ছিল কয়েকজন যুবক অভিজাত আর যোদ্ধাদের এক গামলা পাকা আঙুর নিয়ে নিশানা প্রদর্শনীর খেলায়। মেয়েদের শরীরের নানান অংশে নিশানা করে লাগানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল, বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ বাজি ধরা হতে লাগল সেগুলো নিয়ে।

মদ খাওয়া আর আলাপচারিতায় মগ্ন থাকায় লানন টের পেলেন না যে হঠাৎ করে আসলে ঘটছেটা কী, তবে যখন পুরো ঘরটায় নীরবতা নেমে এল, তখন টের পেলেন যে গড়বড় হয়েছে কিছু একটা। মাথা তুললেন উনি, সাথে সাথেই কুঁচকে গেল ভ্রূ, তাকিয়ে দেখুন যে গায়কদের হাত তাদের বাদ্যযন্ত্রের উপর জমে গিয়েছে, নাচিয়েরা পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। আর হাঁ হয়ে তাকিয়ে আছে আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই।

হুই বেন-আমন ওনার দিকে এগিয়ে আসছেন সেটা দেখা মাত্র লাননের ভ্রূকুটি পরিণত হলো গোমড়া মুখে। হুই পরে আছেন পাড়ে সোনার সুতোর

কাজ করা একটা নীল জামা। কোমরে স্বর্ণের কোমরবন্ধ আরেকটা রত্নখচিত ছোরা। চুল আর দাড়িতে তেল মেখে আঁচড়ানো, স্বর্ণের কানের দুল ঝুলে পড়েছে তার কাঁধের উপর।

লাননের সামনে যখন হাঁটু ভেঙে বসে সম্মান দেখালেন তখন তার অভিব্যক্তি ছিল ভাবলেশহীন, ওনার কণ্ঠ ঘরের প্রতিটা কোনায় মধুর সুর তুলে ছড়িয়ে গেল।

"মহামান্য সম্রাট, আমি এসেছি আপনার প্রতি আমার আনুগত্যের শপথ নিতে। আমি সবাইকে জানাতে চাই যে, সবকিছুর উপরে আমি আপনাকে সম্মান করি, আমার আনুগত্য মৃত্যুর পরেও বলবত থাকবে।"

লানন হকচকিয়ে গেলেন, ঠিক যেমনটা হুই চাচ্ছিলেন। ওনার মস্তিষ্ক এখন মদের নেশা আর বিস্ময়ে তব্দা খেয়ে গিয়েছে। আমতা আমতা করতে লাগলেন উনি, কিন্তু কিছু বলতে পারার আগেই, হুই উঠে দাঁড়ালেন আবার।

"আর আমার বিশ্বস্ততার প্রতীক হিসেবে একটা উপহার দিতে চাই আপনাকে।" বলে উনি হাত দিয়ে পেছনের দিকে ইশারা করলেন, ঘরের ভেতরের সবগুলো মাথা ঘুরে গেল ঢোকার দরজাগুলোর দিকে।

টিমনের বিশাল বপুটা গটগট করে এসে ঢুকলো ঘরের ভেতর, তারপর ঘরটা পেরিয়ে হুইয়ের পাশে এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হিংস্র ধোঁয়াটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লাননের চেহারার দিকে।

হুই ফিসফিস করে বললেন, "নিচে!" আর কনুই দিয়ে গুঁতো দিলেন দানবাকার দাসটাকে। ধীরে ধীরে টিমন একটা হাঁটু ভেঙ্গে বসে, মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করল।

"কিন্তু ও তো দেবতাদের অধিকারে," লানন কর্কশ কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন। "তুমিই ওকে দেবতার চিহ্নযুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছিলে, পুরুত মশাই!"

হুই নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করলেন আবার, মিথ্যাটা বলার জন্য, এই অপবিত্র কাজটা করার জন্য শক্ত করে নিলেন নিজেকে। যদিও এরমধ্যেই টিমন এবং দেবতাদের কাছে ব্যাপারটা ব্যখ্যা করেছেন, তারপরেও অস্বস্তি লাগতে লাগল তার। পুনরায় রাজার অনুগ্রহ লাভ করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে, সেটা করার এই একটা বাদে আর কোনো উপায় নেই। লানন নিজের জেদ ছাড়বেন না, নিজে থেকে অচলাবস্থা ভাঙতে বা সরাতে পারবেন না কখনোই। হুইকেই এগিয়ে আসতে হবে। উনি মহান বাআলের কাছে অনুমতি চেয়েছেন দাসের পা থেকে পাখির নখরের চিহ্নটা সরিয়ে দিতে। উনি চিৎকার করে অনুমতি চেয়াছেন, দিনের বেলা দুপুরে ওনার বাড়ির ছাদে পায়চারি করতে করতে। দূরে কোথাও, গ্রীষ্মের দিনে বজ্রপাতের গুড়গুড় শব্দে হুই ওনার প্রার্থনার জবাব খুঁজে নিয়েছেন। দেবতারা জবাব দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু হুইয়ের

তবুও দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কারণ জবাবটা ছিল খুবই ক্ষীণ, অস্পষ্টতার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এখানে। তাছাড়া হুইয়ের জন্যেও নিজের দোষ স্বীকার করাটা খুবই কঠিন একটা কাজ–একেবারে ওনার আত্মার ভিত্তিমূল ধরে ঝাঁকি দিয়েছে কাজটা।

"জাঁহাপনা," বললেন হুই। "আমি ভুল করেছিলাম। দেবতারা আমাদের জানিয়েছেন যে চিহ্নগুলো পবিত্র নয়।"

লানন তাকিয়ে রইলেন হুইয়ের দিকে। তারপর সামান্য হেলিয়ে দিলেন মাথাটা, যেন নিজের কানে শোনা কথাটাও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

"মানে বোঝাতে চাচ্ছো–তুমি ওকে কোনো শর্ত ছাড়াই দিয়ে দিচ্ছো আমাকে? আমি চাইলেই এখন ওর গলা কাটতে পারি, যদি মন চায়?" উনি হুইয়ের দিকে তাকিয়ে থেকেই সামনে ঝুঁকে এলেন। "তুমি কি ওকে কোনো পিছুটান ছাড়াই দিয়ে দিচ্ছো আমাকে?"

"আমি রাজার প্রতি আমার ভালোবাসার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছি," বললেন হুই, এবার পায়ের সাহায্যে টিমনকে গুঁতো দিলেন উনি।

অত্যন্ত গুরুগম্ভীর গলায়, টিমন প্রায় নিখুঁত পিউনিকে কথা বলে উঠলো। "আমি আপনার কাছে এসেছি সেই ভালোবাসার জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে।"

লানন নিজের গদিতে হেলান দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন ব্যাপারটা নিয়ে, একটা জিনিস খেয়াল হতেই গোমড়া ভাবটা ফিরে এল আবার।

"তুমি তো আমাকে বেঁধে ফেলার মতলব করছো। এর মাঝে শর্ত ঠিকই আছে–দারুণভাবে লুকানো," ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন উনি।

"নাহ, জাঁহাপনা। কোনো শৃঙ্খল নেই, শুধু আছে বন্ধুত্বের রেশমি বন্ধন," নরম গলায় বললেন হুই। তারপর দুজন দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাগের চোটে রক্ত জমতে শুরু করল লাননের চেহারায়, তবে হুই শান্ত অচঞ্চলই রইলেন।

আচমকাই গম্ভীর ভাবটা খসে পড়ল হুইয়ের, ঝিলিক দিয়ে উঠলো ওনার কালো চোখজোড়ায়। গালের উপর এসে পড়া চুলের গোছা চেপে রাখা হাসির দমকে কাঁপতে শুরু করল। লানন মুখ খুললেন খুব কড়া কিছু বলে এই উপহার আর বন্ধুত্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য। কিন্তু তার বদলে গলা বেয়ে বেদম হাসি উঠে এসে বেরিয়ে গেল খোলা ঠোঁট দিয়ে। হেসে ফেললেন উনি, হাসতে হাসতে গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল, ফাঁকে ফাঁকে পেট চেপে ধরে পেটের পেশীর ব্যথার চোটে গোঙ্গাতে লাগলেন।

"উড়ে যাও, সূর্যের পাখি," ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন লানন, হুই ঝপ করে ওনার গদির পাশে উঠে বসে হাসির চোটে কেঁপে কেঁপে ঝাঁকি মেরে উঠতে লাগলেন।

“গর্জে ওঠেন, ওপেটের সিংহ,” উনিও কান্নার সুরেই বললেন, একজন দাসী এক পেয়ালা ওয়াইন ঢেলে নিয়ে এল ওনার কাছে। হুই এক চুমুকে অর্ধেক সাবড়ে দিয়ে পেয়ালাটা বাড়িয়ে দিলেন লাননের দিকে। উনি শেষ করে দিলেন বাকিটা। ঠোঁটের কোনা দিয়ে সামান্য ওয়াইন গড়িয়ে ওনার সোনালি দাড়িতে পড়ল। পেয়ালাটা পাথরের মেঝেতে আছড়ে ভাঙলেন লানন, তারপর হুইয়ের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

“আমরা প্রচুর সময় নষ্ট করে ফেলেছি, আমার সূর্যের পাখি। চলো পুষিয়ে দেই সেটা। প্রথমে কী করা যায়?”

“পান করা যায়,” বললেন হুই।

“আহ!” হুল্লোড় করে উঠলেন লানন। “আর তারপর?”

“শিকার,” প্রস্তাব দিলেন হুই, রাজার পছন্দের কাজগুলোই বেছে বেছে বলছেন।

“শিকার!” লাননও প্রতিধ্বনি করলেন কথাটা। “শিকার-সর্দারদেরকে ডেকে পাঠাও–কালকেই আমরা হাতি শিকারে বের হবো।”



“অ্যাসটার্টে, পৃথিবীর জননী, আপনার সৌন্দর্য আমার আত্মাকে প্লাবিত করে আরও কয়েকগুন বর্ধিত হয়ে গিয়েছে,” বিড়বিড় করে বললেন হুই, রাতের আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে ছন্দময়ভাবে দোল খাচ্ছেন। পেছনে হটলেন উনি, কিন্তু ধাক্কা খেলেন একটা দেওয়ালে। ওটায় হেলান দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন উনি, তারপর আকাশের জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খেয়াল করতে লাগলেন। রাতের উৎসবে মত্ত শহরের আকাশের উপর চারটা রূপালি চাঁদ ঝুলে আছে। হুই একটা চোখ বন্ধ করলেন, তিনটা চাঁদ গায়েব হয়ে গেল সাথে সাথে–খুলতেই আবার হাজির হলো সেগুলো।

“অ্যাসটার্টের, আপনার সেবকের পদক্ষেপের নির্দেশনা দিন,” সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন হুই, তারপর দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে সোজা হয়ে এগিয়ে গেলেন বন্দরের দিকের সরু গলির দিকে। অন্ধকারে পড়ে থাকা একটা দেহে হোঁচট খেয়ে পড়লেন উনি, টলতে টলতে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করলেন যে দেহটায় জীবনের আলামত আছে কি নেই।

দেহটা নাক ডেকে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠে চিত হয়ে শুলো, ওয়াইনের গন্ধযুক্ত উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এসে ঝাপটা মারলো হুইয়ের মুখে। একে দেখে ওনার মনে পড়ল রাজবাড়ির খাওয়ার ঘরে রেখে আসা ধরাশায়ী লোকগুলোর কথা। লানন ছিলের এদের মাঝে এক নাম্বার, হাসি মুখেই ঘুমিয়েছেন উনি।

"আজ রাতে তুমি ভালো সঙ্গ পাবে," হুই মুখ টিপে হাসলেন, গলি ধরে স্খলিত চরণে হেঁটে গেলেন সামনের দিকে। দেওয়ালের এক কোণ থেকে একটা অন্ধকার ছায়া নড়ে উঠলো। হুই চোখ কচলে সেটা কে বোঝার চেষ্টা করলেন কৌতূহলী হয়ে, একটা দেহ দেখতে পেলেন, কিন্তু মাথা দুটো, থেকে থেকে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসছে, নরম অস্ফুট কান্না সেই সাথে। নড়া-চড়া খুব মৃদু, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। হুই হাসলেন, হোঁচট খেয়ে পড়েই গিয়েছিলেন প্রায়। অন্ধকারের ভেতরেই দেখতে পেলেন হতচকিত মেয়েটার মুখ ঘুরে গেল ওনার দিকে। "সকল জিনিস ফলবতী হোক," ভাবলেশহীনভাবে মেয়েটাকে বলে এগিয়ে গেলেন হুই, এগিয়ে যেতেই অন্ধকার থেকে আরও একটা অবয়ব বেরিয়ে এসে ওনাকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। অবয়বটার পরনে কাঁচা হাতে সেলাই করা বাদামিআলখাল্লা, মাথায় ঘোমটা, তার নড়া-চড়া একদমই সুচিন্তিত এবং নিঃশব্দ।

বন্দরের পানির দিকটায় ফুর্তিবাজরা ভিড় করেছে, এখানে সেখানে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড। আগুনের শিখার প্রতিফলন, হ্রদের কালো পানির উপরে উজ্জ্বল আর রক্তাভ প্রলেপ তৈরি করেছে। আগুনের চারপাশে হাতে হাত ধরে বৃত্ত তৈরি করে সবাই নাচছে একসাথে। কিছুকিছু মহিলা সকল বিধি নিষেধের উর্ধ্বে চলে গিয়েছে, কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে আছে তারা, ফর্সা শরীরে ওয়াইন ঢেলে দিচ্ছে আর তা সাপের মত একে বেঁকে নেমে যাচ্ছে নিচে।

হুই একটু থেমে ওদেরকে দেখলেন, অনুসরণকারী অবয়বটা থমকে দাঁড়ালো, হট্টগোল করতে থাকা ভিড়ের সাথে মিশে রইলো দাঁড়িয়ে।

যখন হুই আবার সামনে বাড়লেন, আলখাল্লা পরা অবয়বটাও দ্রুত এগিয়ে এল সামনে। যে গলি ধরে হুইয়ের বাড়িতে যেতে হয় সেটা গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে, তবে দরজার উপরের কুলুঙ্গিতে একটা কুপি জ্বলছে মিটমিট করে। প্রভুকে ঘরে স্বাগত জানানোর জন্যেই ওখানে রাখা হয়েছে ওটাকে।

হুই হাতড়ে হাতড়ে বাতিটার দিকে যাওয়া শুরু করলেন, আগুয়ান অবয়বটাও নীরবে আর দ্রুততার সাথে পেছনে পেছনে আসতে লাগল। ওনার নিজের গমনের ধুপধাপ শব্দ পেছনের জনের কাপড়ের খসখস আর হালকা পদশব্দকে ঢেকে দিচ্ছে।

হুই দরজার কাছে পৌছে মিটিমিটি বাতির আলোয় দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ' ওনার ছোরাটা আলখাল্লার নিচে গোঁজা। আর অস্ত্র ধরার হাতটাই এগিয়ে দিলেন দরজার হুড়কোর দিকে। ঠিক ওই অপ্রস্তুত এবং বেখেয়াল মুহূর্তে, কালো অবয়বটা অন্ধকার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওনার দিকে। একটা হাত চেপে ধরলো ওনার কবজি, উনি ছিটকে পড়লেন দরজার পাশের

দেওয়ালে। ওয়াইন ওনার নড়া-চড়াকে ধীর করে দিয়েছে, চরম বিস্ময় আর বিপদাশংকায় চেহারা উপরের দিকে তোলার চেষ্টা করলেন উনি। কালো অবয়বটা চোখে পড়ল ওনার, মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢেকে রাখা, আবার সে এগিয়ে এল ওনার দিকে–আর চিৎকার করার আগেই নরম ঠোঁট চেপে ধরলো ওনার ঠোঁট, একটা চাপা হাসি এই ঠোঁটগুলো পেরিয়ে ওনার হতভম্ব মুখের ভেতর ঢুকে গেল–টের পেলেন যে ওনার শরীরের সাথে জড়াজড়ি করছে উত্তপ্ত স্তন আর উরু।

আচমকা বিস্ময়ের ধাক্কায় অবশ হয়ে গেলেন হুই। কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন একেবারে নিথর হয়ে আর ওই ঠোঁট এবং চতুর হাত ওনার সারা শরীর হাতড়ে হাতড়ে ওনাকে খোঁচাতে আর উত্তেজিত করতে লাগল। তারপর একটা দুর্বোধ্য শব্দ করেই উনি হাত বাড়িয়ে ওই সুডৌল মহিলা অবয়বটাকে ধরতে গেলেন, সাথে সাথেই সরে গেল সেটা, একেবারে ওনার নাগালের বাইরে।

হুই মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিলেন সেদিকে, ওনার মুঠি হামচে ধরলো বাতাস, অবয়বটা নাচতে নাচতে সরে গেল আবার, হুইয়ের বাড়িতে ঢোকার ফটক দিয়ে শরীর মুচড়ে ঢুকে গিয়ে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।

মনের সুখে গালাগাল দিতে দিতে, হুই দরজা ধরে যুঝতে লাগলেন, টানাটানি করে খুলতে পারলেন অবশেষে, তারপর দৌড়ে গেলেন কাছারি ঘরে।

কাছারি ঘর জুড়ে কালো আবছায়ার নড়া-চড়া দেখা যেতে লাগল, একটু পরেই ঘরের ভেতরে মিলিয়ে গেল সেটা, হুই দৌড়ে গেলেন ওটার পেছনে। একটা গদিতে পা বেঁধে দুম করে আছাড় খেয়ে পড়লেন উনি, একটা মোড়া উড়ে গেল তাতে। একজন দাস ওটার উপরেই একটা ওয়াইনের জগ আর পাত্র রেখেছিল, ওগুলো ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল, মাটির মেঝেতে চলকে পড়ল ওয়াইন। ভেংচি কেটে হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল একটা, ঘরের ভেতরের একটা ফাঁকা জায়গা থেকে, শুনে হুই হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটে গেলেন সেদিকে। আলখাল্লা পরা অবয়বটা আলো জ্বালা দরজার ওপারের আবছায়ায় মিশে গিয়ে ওনার ঘুমন্ত ঘরগুলোর দিকে চলে যেতে গেল।

"দাঁড়াও!" চেঁচিয়ে ডাকলেন উনি। "কে তুমি?" আর এই তর্জন গর্জনে ওনার ঘরের দাসেরা ঘুম ভেঙে ছুটে এল, তখনও আধো ঘুমে, আতঙ্কে কোনমতে হাতের কাছে যা পেয়েছে তা নিয়েই ছুটে এসেছে।

"সবগুলো ভাগ!" হুই প্রচণ্ড রেগে চিৎকার করে উঠলেন ওদের দিকে। "সবগুলো–সকালের আগে যেটাকে আমি ঘরের বাইরে দেখবো, সেটাকেই ঝেটিয়ে বিদায় করে দেব।" আর ওরা সবাই আবার ফিরে গেল নিজেদের

ঘরে, যদিও হুমকিটা শুনে খুব বেশি ভাবান্তর হয়নি কারো মাঝেই। ওদের সবগুলো চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত হুই নিজেকে সামলে রাখলেন। তারপর ছুটে গেলেন ওনার নিজের ঘুমানোর ঘরের দরজার দিকে।

এখানেও একটা কুপি জ্বলছে, ওনার বিছানার পাশে একটা নিচু মোড়ার উপর। সলতে একদমই নামিয়ে রাখা হয়েছে, শুধু দেখা যাচ্ছে নরম কমলা রঙের একটা আলোর দলা, যা কিনা অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বাতিটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আলখাল্লা পরা মহিলাটা। একদম অনড় দাঁড়িয়ে আছে সে, তখনও ঘোমটার আড়ালে চেহারা সম্পূর্ণ ঢাকা, যদিও হুইয়ের মনে হলো উনি বোধহয় ওনার দিকে তাকিয়ে থাকা একজোড়া চোখের প্রতিফলিত আলোর ছটা দেখতে পেলেন।

দৌড়ে আসার জড়তায় হুই ঘরের মাঝ বরাবর এসে থমকে দাঁড়ালেন, কিন্তু সেটা ভুল দিকে। উনি ঘুরে গেলেন মেয়েটার দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে সে ঝুঁকে গিয়ে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল বাতির আলো। ঘরটা ডুবে গেল পরম অন্ধকারে, হুই ছুটে যেতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন দেওয়ালে। নিজেকে সামলে নিলেন দ্রুত। নেশা কেটে যাচ্ছে এখন ওনার, দেওয়ালের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসে শোনার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন নড়া-চড়ার আওয়াজ।

কাপড়ের খসখস কানে এল ওনার, সাথে সাথে ঝাপিয়ে পড়লেন সেদিকে। মেয়েটার আলখাল্লার পাড়ের নাগাল পেল ওনার আঙুল। বিস্ময়ের অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেল, তবে কাপড়টা টান দিয়ে ছুটিয়ে নেওয়া হলো ওনার আঙুল থেকে। তিক্ত কণ্ঠে আবার গালি দিয়ে উঠলেন উনি, দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে অন্ধ মানুষের মত হাতড়ে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন সারা ঘরে।

পাশেই নড়া-চড়ার আভাস পেলেন হুই, নিঃশ্বাসের ক্ষীণতম আওয়াজ, অন্ধকারে মৃদুতম নড়া-চড়া। ঝট করে হাত বাড়ালেন উনি, আঙুল এবার ছুঁয়ে দিল মসৃণ চামড়া। নগ্ন পিঠের আকৃতি বুঝতে পারলেন, একটা নাদুস নুদুস নিতম্বের উষ্ণ স্ফীতিও টের পেলেন। একটা হালকা হাসির আওয়াজ, আবার গায়েব হয়ে গেল অবয়বটা। হুই নিস্তেজ দাঁড়িয়ে রইলেন, হৃৎপিণ্ড বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটা করছে, শারীরিক জাগরণ ওনাকে বিহ্বল করে দিল মুহূর্তের জন্য।

মেয়েটা যে-ই হোক, আলখাল্লা খুলে ফেলেছে। উনি এখন এমন একটা মেয়ের সাথে একা আছেন যে কিনা হ্রদের পিছলা বাইন মাছের মতই অধরা, সদ্যোজাত বাচ্চার মতই নগ্ন। অপেক্ষারত চিতাবাঘের মত উনি ধেয়ে গেলেন মেয়েটার দিকে, যাওয়ার পথে খুলে ফেললেন নিজের জামা আর অন্তর্বাস, মেঝের কোথায় পড়ল তা নিয়ে গা করলেন না, শুধু কানের সোনার দুলগুলোর রইলো দেহে, উনি এখন ওনার কামনার মতই বন্য।

অন্ধকারে মেয়েটা এখন ত্রস্ত হয়ে আছে, চেষ্টা করেও বিচলিত হাসি আর হাঁফানো আটকাতে পারছে না। হুই কান ব্যবহার করে শিকার করলেন তাকে,

একটু একটু করে এগিয়ে ওকে বিছানার পাশের কোনাটায় ঠেলে নিয়ে গেলেন।

এবারো প্রায় পালিয়েই গিয়েছিল সে, ওনার হাতড়াতে থাকা হাতের নিচ দিয়ে মাথা নিচু করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু ওনার লম্বা হাতগুলোর একটা মেয়েটার কোমরে চাবুকের দ্রুততায় গিয়ে আঁকড়ে ধরলো আর উনি আলগোছে তুলে ফেললেন তাকে। মেয়েটা এবার অভিযোগের স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে বন্দী পশুর মত লাথি ছুঁড়তে লাগল, হাতের মুঠি দিয়ে সমানে ওনার মুখ আর বুকে ঘুষি মারছে।

হুই ওকে কোলে করে পশমের কম্বলের যে পুরু গাদাটা ওনার বিছানার কাজ করে সেটার উপর নিয়ে গেলেন।



শান্তির একটা আবেশ নিয়ে জেগে উঠলেন হুই, গভীর আনন্দের একটা অনুভূতি সারা গায়ে।

শরীর ম'ন হচ্ছে নরম আর শক্তিহীন হয়ে আছে, ওনার মন দারুণ পরিষ্কার আর তীক্ষ্ণ মনযোগী। ভোরের নরম গোলাপি আলো ছেয়ে রেখেছে ওনার ঘরটা আর হ্রদের ধারে বাস করা পাখিগুলোর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও স্পষ্ট ভেসে আসছে কানে।

হুই কনুইতে ভর করে উঠে বসে, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বিছানায় পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকালেন। উষ্ণ বাসন্তী বাতাসের কারণে ও গায়ের চাদর সরিয়ে রেখেছে এককপাশে। কপালের পাশের চুল ঘামে ভেজা, হালকা খুলে থাকা উপরের ঠোঁটের উপরেও জমেছে চকচকে এক সারি ঘাম। চোখ বন্ধ মেয়েটার, এমন হালকাভাবে ঘুমাচ্ছে যে, নিঃশ্বাসের ওঠানামা-ও ওর গালের উপর ছড়িয়ে থাকা ঘন কালো চুলের গোছাকে নাড়াতে পারছে না।

একটা হাত ওর মাথার উপর তুলে রাখা, ফলে ওর বিস্ময়করভাবে অস্বাভাবিক বড় স্তনগুলোর আকৃতি নষ্ট করে দিয়েছে। স্তনজোড়া ওর একহারা সরু দেহের তুলনায় অনেক বেশি বড় আর ভরাট আর গোলাকার, স্তনের বোঁটা এখনও গত রাতের ভালোবাসার অত্যাচারে গাঢ় লাল হয়ে আছে। মেয়েটার চামড়া মসৃণ আর ফ্যাঁকাসে দুধ মেশানো জলপাই রঙের, সেই সাথে আছে বগল আর তলপেটের গোড়ার উদ্দাম রেশমি কালো কেশরাজি।

হুই ঘুম ভেঙে প্রথম দর্শনে খেয়াল করলেন এই সব কিছু, এরপর ওনার চোখ স্থির হলো মেয়েটার শান্ত ঘুমন্ত চেহারায়।

অবিশ্বাসী চোখে হুই তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে, সকল ভাষা গলায় এসে আটকে গিয়েছে। একই সাথে ভয়, বিস্ময় আর কুসংস্কারপূর্ণ আতংক অনুভব করতে লাগলেন উনি।

মেয়েটা চোখ খুলল তার, হুইকে ওভাবে দেখে হাসলো।

"বাআলের আশীর্বাদ পড়ুক আপনার উপর, মাননীয়," নরম সুরে বলল মেয়েটা।

"তানিথ!" দম বন্ধ হয়ে এল হুইয়ের।

"জি, মহানুভব।" এখনও হাসছে ও।

"এতো অশুচিকরণ," ফিসফিস করে বললেন হুই। "এতো সাক্ষাৎ দেবীর বিরুদ্ধাচরণ।"

"আপনার জন্য আমার ভালোবাসাকে অস্বীকার করাটা হতো সমগ্র প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।" তানিথ বিছানায় উঠে বসল, কোনো রকম বিবেকার দংশন ছাড়াই চুমু খেতে লাগল ওনাকে, ওর ভেতরে একটা ফোঁটা অপরাধবোধ নেই।

"ভালোবাসা?" হুই জিজ্ঞেস করলেন, ওনার আশঙ্কার কথা ভুলে গিয়েছেন আপাতত।

"হ্যাঁ, মহানুভব," মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ওনাকে চুমু খেলো তানিথ।

"কিন্তু–" হুই তোতলাতে শুরু করলেন, বলতে গিয়ে ওনার গাল দাবানলের মত লাল হয়ে গেল। "তুমি কীভাবে–তুমি কীভাবে আমাকে ভালোবাসতে পারো?"

"কীভাবে বাসতে পারি না, মহানুভব?"

"কিন্তু আমার শরীর–আমার কুঁজ?"

"আপনার কুঁজটাকেও আমি ভালোবাসি, কারণ ওটা আপনারই অংশ, আপনারই সচ্চরিত্র, দয়া আর জ্ঞানের অংশ।"

হুই তানিথের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর আলতোভাবে ওকে কোলে তুলে নিয়ে, ওর সুগন্ধে ভরা কালো চুলের মেঘের ভেতর ডুবিয়ে দিলেন নিজের মুখটা।

"ওহ, তানিথ," অস্ফুটে বললেন উনি। "কী করবো আমরা এখন?"



ভোরের আলো ফোঁটার আগেই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেবতার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন হুই। ওনার ঠিক নিচেই, শিবিরের লোকজন জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। দিনের আলোর উজ্জ্বলতায় মলিন হয়ে গিয়েছে রান্নার আগুনের তেজ। টুকরো টুকরো শব্দ ভেসে আসতে লাগল তার কানে,

৬,০০০-এর বেশি লোকের শিকারের জন্য প্রস্তুতির আওয়াজ। ওনাদের সাথে এসেছে হুইয়ের বাহিনী আর রাজার সাঙ্গপাঙ্গরা। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে পাহাড়ের ঢাল পর্যন্ত চলে যাওয়া ছোট্ট নদীটার দুই পাড়ের উপত্যকাই ভরে গিয়েছে তাঁবু দিয়ে। উত্তর দিকে তিরিশ মাইল গেলে পাওয়া যাবে বিশাল নদীটার সবুজ মন্থর ফিতার মত প্রবাহ, এঁকেবেঁকে ওই গরম আর রুক্ষ উপত্যকার ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে। লাননের একটা দল এর মধ্যেই ওখানে গিয়ে তাঁবু গেঁড়েছে, বিগত কয়েকদিন ধরে নদীতে পানি খেতে আসা হাতির পালকে বিরক্ত করে চলেছে ক্রমাগত। তীরন্দাজ, বর্শাবাজ আর যুদ্ধ হাতি দিয়ে ওরা আক্রমণ করেছে জানোয়ারগুলোকে।

এভাবে উত্যক্ত করতে থাকলে হাতির পাল উপত্যকা ছেড়ে চলে যাওয়া শুরু করবে, পাহাড়ার ঢাল দিয়ে ওদের ব্যবহৃত সুপ্রাচীন রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবে ওরা। লানন এখন তাঁবু ফেলেছেন এসব বহুল ব্যবহৃত রাস্তার ধারে, আগের দিন সন্ধ্যাতেই ওই উপত্যকার দলটা খবর পাঠিয়েছে যে হাতির পাল এর মধ্যেই রওনা দিয়ে দিয়েছে। জানোয়ারগুলো জনে জনে একত্র হয়ে, এগিয়ে আসছে ঢালের দিকে। পরের পাঁচদিনের ভেতর ওরা বিশাল একেকটা ঝাঁক ধরে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে আসবে। এই ক্রমাগত উপদ্রব করে যাওয়া শিকারিদের হাত থেকে বাঁচতে, বৃদ্ধ পুরুষ সদস্যরা চেষ্টা করবে নিজের দলটাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে।

হুই বেন-আমন ভোর বেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ওনার পরনে হালকা শিকারের বর্ম আর দৌড়ানোর উপযোগী চপ্পল, আরাম করে শকুন কুঠারটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উনি। বিশাল ফলাটা এখন নরম চামড়ার খাপে ভরা, যাতে নিখুঁতভাবে ঘষে মেজে রাখা প্রান্ত আর সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কোনো ক্ষতি না হয়। হুইয়ের কাছে মনে হচ্ছে দেবতারাও বোধহয় তাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্যেই আয়োজন করেছেন এই পরিস্থিতির।

ফলবতী বসুন্ধরা উৎসবের শেষ দিনের পর থেকে, দুই সপ্তাহ ধরে হুই ওনার জাগ্রত থাকার বেশিরভাগ মুহূর্তই ব্যয় করেছেন এই উভয়সংকট নিয়ে চিন্তা করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকের ভেতর মুখ গুঁজে, যাজক আর যাজিকাদের ভূমিকা বারবার করে খতিয়ে দেখেছেন, তাদের দায়িত্ব এবং দেবতাদের সাথে আর নিজেদের ভেতরের সম্পর্ক সম্পর্কে পড়েছেন। ভেবেছিলেন এত গবেষণা করে হয়তো নিজের কর্মের জন্য একটা উপযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে পারবেন। নিজের কর্মকাণ্ডকে মোটেও অশুচিকরণ বলতে রাজি না উনি। আর এখন এসেছেন মামলার আর্জি পেশ করে বিচারের রায় গ্রহণ করতে।

পাহাড়ের চূড়ায় প্রথম সোনালি কিরণ নিক্ষেপ করল সূর্য, হুই ওনার সমস্ত আবেগ জড়ো করে প্রশংসা সঙ্গীত গাওয়া শুরু করলেন। তারপর উপস্থাপন করলেন নিজের আর্জি। বেশ জটিল বক্তব্য পেশ করলেন উনি, নিজেকে দেবতাদের পার্থিব প্রতিনিধি উল্লেখ করে, যে যুক্তি উপস্থাপন করতে লাগলেন সেটার সারমর্ম হলো–যে আচরণ বাআল আর তার সঙ্গী অ্যাসটার্টের মাঝে পবিত্র বলে বিবেচিত, ঠিক একই আচরণ তাদের দুনিয়াবি প্রতিনিধিদের জন্যেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে–যদিও, অবশ্যই, একজন যাজিকা আর বাআলের সর্বোচ্চ পুরোহিত বাদে সেটা আরও কারো ভেতর হলে হবে না। হুই এই ক্ষেত্রে প্রামাণিকভাবে অধিকতর দুর্বল জায়গাগুলোর উপর জোর দিলেন।

উপসংহারে বললেন, "মহান বাআল আর স্বর্গীয় অ্যাসটার্টে, হতে পারে যে আমি হয়তো ভুল যুক্তি উপস্থাপন করছি। হয়তো হতে পারে যে আমি পাপ করেছি। আর যদি সেটাই হয়ে থাকে, তাহলে আজীবনের সেবা আর বিশ্বস্ত দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও আপনাদের ক্রোধ সম্পূর্ণ আমার প্রাপ্য, এর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তিও আমার পাওনা!"

হুই কথাটার ওজন বাড়াতে বিরতি দিলেন একটু। "আমি এখন হাতি শিকারে যাবো। আমার জীবনের কসম কেটে বলছি যেখানেই ধাওয়াটা সবচেয়ে শক্ত হবে, সেখানেই যাবো আমি। যেখানেই বিপদ হবে সবচেয়ে মারাত্মক, সেখানেই ছুটে যাবো আমি।

"যদি আমি পাপ করেই থাকি–তাহলে ওই দাঁতাল জন্তুগুলো যেন আমাকে পিষে মারে। আর যদি আপনাদের বিবেচনায় পাপ করে না থাকি তাহলে আমাকে বেঁচে থাকতে দেবেন আর আপনাদের যাজিকার সান্নিধ্যে ফিরতে দেবেন। যদি আমাকে ভালোবাসা আর জীবন দান করে ধন্য করেন–তাহলে কসম করে বলছি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার দায়িত্বপালন আর সেবা প্রদান অব্যাহত থাকবে, কোনো মানব বা মানবী জানতেও পারবে না যে আপনারা আমাকে এই বিশেষ অনুগ্রহ মঞ্জুর করেছেন।" আবারও কিছুক্ষণ চুপ থেকে, তারপর বললেন, "আপনিও তো ভালোবেসেছেন, আরও একজন প্রেমিকের প্রতি একটু দয়া করেন।"

পাহাড় থেকে নেমে এলেন হুই, ওনার যুক্তি তর্কে বেশ সন্তুষ্ট। দেবতাদের হাতেই তুলে দিয়েছেন বিচারের সম্পূর্ণ ভার। শিকারে অরুচি থাকা সত্ত্বেও, আজকের এই জীবহত্যা থেকে উনি দূরে সরে থাকবেন না, দেবতারা তাদের ক্রোধ প্রদর্শনের পূর্ণ সুযোগ পাবেন। এত কিছুর পরে, হুই স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে শুধুমাত্র মৃত্যুই পারবে ওনাকে তানিথের বাহু থেকে দূরে রাখতে। ওই ফলটার স্বাদ এতটাই মিষ্টি যে ওনার পক্ষে আর সেই স্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা সম্ভব না।

"হুই," হুই শিবিরে প্রবেশ করতেই চেঁচিয়ে উঠলেন লানন। "কোথায় ছিলে তুমি?" অস্ত্রসজ্জিত হয়ে নিজের তাঁবুর বাইরে অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছিলেন উনি, হুইকে দেখেই ছুটে গেলেন সেদিকে। "দিন তো শেষ হয়ে গেল প্রায়," অস্থির কণ্ঠে বললেন লানন। "পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের লোকেরা হাতির পালকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেয়েছে।"

যুদ্ধ-হাতিরা প্রস্তুত সব, ওদের ঘাড়ের উপর বসে আছে মাহুত আর পিঠে লম্বা সবা পালকি। লাননের শিকারী দল তাঁবুর সামনে জড়ো হয়ে আছে। হুই খেয়াল করলেন রাজার সবচেয়ে দক্ষ শিকার-সর্দাররা আছে সেখানে: নিজের বেগুলি মাতাল চেহারা নিয়ে আছে মুরসিল, চিকন আর গোমড়ামুখো জাডাল, বিশিষ্ট ধনুর্বিদ হুয়া, ছোটখাটো হলুদ ঝাই–বিগত কয়েক বছরে ছাপ অনুসন্ধানকারী হিসেবে খ্যাতি সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ওর। ওদের পেছনে দেহরক্ষী দাসদের মাঝে সবার মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে টিমনের বিশাল কৃষ্ণ বপু। হুই ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তারপর লাননের পাশে পাশে প্রায় দৌড়ে গেলেন হাতির সারিতে।

লানন ওনাকে বললেন, "তুমি আমার সাথে থাকবে, সূর্যের পাখি।" আর হুই জবাব দিলেন, "আমি সম্মানিত বোধ করছি, জাঁহাপনা।"

মুরসিল হুইকে একটা হাতির ধনুক ধরিয়ে দিলেন। খুব কম লোকই এই প্রকাণ্ড অস্ত্রটা চালাতে পারে। বুনো আবলুস কাঠের শক্ত ডাল বাকিয়ে বানানো এগুলো, মাঝের জায়গাটা একটা মানুষের কব্জির সমান মোটা আর সিংহের নাড়িভুঁড়ির পাকানো রশি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ছিলা। একেকটা পাঁচ-ফুটি তীর এই ধনুক থেকে ছুড়তে হলে বাহুতে আর বুকে অমানুষিক জোর থাকতে হবে, তীরগুলোর মাথায় শক্ত ইস্পাতের তৈরি, লেজে বুনো হাসের পালক বসানো। একবার সর্বোচ্চ পরিমাণ টেনে ছেড়ে দিতে পারলে এগুলো প্রায় ১০০ পেস পরিমাণ উড়ে গিয়ে একটা জ্যান্ত হাতির শরীরে একেবার লেজের পালকগুলো পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারে। হাতির পাঁজরের খাঁচার ভেতরের প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ডটাও এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে পারে এগুলো, বিশাল গোলাপি ফুসফুসও ছ্যাদা করে দিতে পারে। দক্ষ হাতে ছুড়তে পারলে, এগুলো কানের ফুটো দিয়ে ঢুকে হাতির শক্ত খুলি ভেদ করে মস্তিষ্কেও পৌঁছে যাবে।

"আমি জানি আপনি বর্শার চাইতে ধনুক ছুঁড়তেই বেশি পছন্দ করেন, মাননীয়," মুরসিল সম্মানের সাথে মৃদু কণ্ঠে বলল। "আমার বুড়ো হাড়ে এখন আর এই ধনুক টানার শক্তি নেই।"

"ধন্যবাদ, শিকার-সর্দার।"

"তূণীর তীর দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। আমি নিজে পরখ করে দেখে বাছাই করে নিয়েছি তীরগুলো," মুরসিল আশ্বস্ত করল ওনাকে, হুই লাননের পিছু পিছু যুদ্ধ-হাতিটা যেখানে হাঁটু ভেঙে বসে আছে সেদিকে এগিয়ে

গেলেন। এটা একটা বিশাল বড়ো মাদী হাতি, যুদ্ধের ডামাডোলে একটা মদ্দার চাইতে এগুলোই বেশি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে, বেশি আস্থাশীল আর শিকারের সময়েও মদ্দার চাইতে ঠান্ডা মেজাজের।

হুই লাননকে অনুসরণ করে পালকিতে উঠে এলেন। কাঠের বক্সটার ভেতরে তিনজন বসার মত জায়গা আছে। তীরভরা তূণীরগুলো বাইরে বসানো, তবে তীরের মাথা হাতের কাছেই সোজা হয়ে আছে। পালকির সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বর্শা, লানন একটা তুলে নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করে নিলেন।

"দারুণ ভারসাম্য," মতামত দিলেন উনি, তারপর নিচের দিকে তাকালেন যেখানে তার শিকার-সর্দাররা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকেই গ্রাই-লায়নের সাথে শিকারে যাওয়ার সম্মান পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। লানন ওদের উপর চোখ বোলালেন, কিন্তু ওনার চোখ আটকে গেল ঝাইয়ের উপর। উনি মাথা ঝাঁকাতেই, নিদারুণ কৃতজ্ঞতার সাথে পিগমিটা হাচড়ে পাচড়ে উঠে বসল হাতির এক পাশে।

মস্ত এক ঝটকা মেরে পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালো হাতিটা, ঝাঁকির চোটে পালকির একপাশে ছিটকে গেলেন হুই। প্রায় আঠারো ফুটের কাছাকাছি বিরাট উচ্চতা থেকে নিচের দিকে তাকালেন ওরা, মাহুত বুড়ো মাদী হাতিটাকে একটা ছন্দময় দুলকি চালে চালানো শুরু করল। উপত্যকার প্রান্তের দিকের ঢাল বরাবর রাস্তা ধরে এগোতে লাগলেন।

"দারুণ একটা জায়গা ঠিক করেছি," হুইকে বললেন লানন। "পাহাড় থেকে নেমে আসা খাড়া পথটা আচমকা ওখানে একটা সমতল পিরিচের মত জায়গায় পরিণত হয়েছে। ওখানেই হাতিগুলোর জন্য অপেক্ষা করবো আমরা।"

হুই পেছনে তাকিয়ে দেখুন বাকি হাতিগুলোও অনুসরণ করছে ওনাদেরকে। বিশটা হাতি এগোচ্ছে এক সারিতে, কান ঝাপটাচ্ছে, শুঁড় দুলছে, ঢুলুঢুলু মন্থর পায়ে এগোচ্ছে সবগুলো। উপরের পালকিতে বসা শিকারির দল তাদের অস্ত্রপাতি নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করতে করতে বকবক করছে উত্তেজিত কণ্ঠে।

"কী শিকার করবো আমরা, জাঁহাপনা?" জিজ্ঞেস করলেন হুই। "হাতির বাচ্চা নাকি দাঁত?"

"প্রথমে বাচ্চা। হাতির প্রশিক্ষকরা পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের দুই ডজন ছোকরা হাতি ধরে নিতে বলেছে। আজ সকালে ওগুলোকে ধরবো আগে, কারণ উপত্যকা থেকে প্রথমে বাচ্চাঅলা পালগুলোই আসবে প্রথম। পরে দাঁতের জন্য শিকার করবো। অনুসন্ধানী দল জানিয়েছে যে বিশাল নদীর ধারে এখন অনেকগুলো মদ্দা হাতি ঘোরাঘুরি করছে।"

যে গোলাকার খোলা জায়গাটা লানন নির্ধারণ করেছেন সেটার চারধারে ছাড়া ছাড়া খাড়া ভূমি দিয়ে ভরা। আকারের বৃত্তাকার, সম্ভবত আড়াআড়ি ৫০০ পেস-এর মত হবে। একটা পাথুরে গিরিপথের মাধ্যমে হাতির চলার পথ এসে মিশেছে এখানে, সমতলটাকে পার হয়ে ওটাকে ছাড়িয়ে উঠে গিয়েছে উপরের উচ্চভূমির খাঁড়া চূড়ার দিকে। পিরিচের চারপাশ ঘন জঙ্গলে ভরা, লানন এর ভেতরেই গুপ্ত আক্রমণের জন্য জায়গা নির্ধারণ করলেন, ঘন বনের আড়ালে পিরিচের পরিসীমার ধারেই লুকিয়ে রাখলেন হাতিগুলোকে। ভালোভাবে লুকিয়ে থাকার জন্য যুদ্ধ হাতিগুলোকে জোর করে হাঁটু ভেঙে বসিয়ে দেওয়া হলো। তারপর হাতির পালের জন্য অপেক্ষায় বসে, হুই আর লানন ঠান্ডা ভুট্টার পিঠা, পনির আর লবণ দেওয়া মাংসের কাবাব দিয়ে সকালের নাস্তাটা সেরে, জেং-এর ওয়াইন দিয়ে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেন সেগুলো। এগুলো হচ্ছে শিকারির খাবার, অবচেতন মনের ক্রমাগত চড়তে থাকা উত্তেজনা ওনাদের ক্ষুধাকে চাগিয়ে দিয়েছিল বেশ। খেতে খেতে বারবার তাকাতে লাগলেন গোল জায়গাটার উপরের উচ্চভূমিতে পাহারায় থাকা লোকগুলোর দিকে, যাদের কাজ হচ্ছে হাতির পালের আগমনের দিকে খেয়াল রাখা আর জায়গামতো আসলে সংকেত দেওয়া।

উপরের আকাশের সীমা থেকে পাহারাদারদের একজন যখন উন্মাদের মত হাত ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল, তখনও ঘাসের উপরের শিশির পুরো শুকায়নি। লানন সন্তুষ্টিসূচক শব্দ করে ওনার আঙুল আর ঠোঁটে লেগে থাকা ঝোল মুছে ফেললেন।

"চলো, সূর্যের পাখি," বললেন উনি, ওনারা হাঁটু ভেঙে বসে থাকা হাতিটায় চড়ে বসলেন আবার।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হলো তাদেরকে, স্নায়ু উত্তেজনায় টানটান হয়ে ছিড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, তারপর আচমকাই হুইয়ের পাশে বসে থাকা ছোট্ট ঝাই প্রত্যাশিতভাবেই কেঁপে উঠলো আর ধ্বক করে জ্বলে উঠলো ওরগাঢ় হলুদ চোখজোড়া।

"চলে এসেছে ওরা," ফিসফিস করে বলল ঝাই, প্রায় সাথে সাথেই একটা একাকী বুনো হাতি গিরিপথটার পাথরের প্রবেশপথ দিয়ে এগিয়ে এসে একদম পিরিচটার কিনারে থেমে দাঁড়ালো। মাদী সেটা; ধূসর, চিকন আর দন্তহীন। সন্দেহজনক চোখে সে পিরিচটার আশপাশে দেখতে লাগল, শুঁড় তুলে বাতাস টেনে নিয়ে মুখের ভেতর ছুঁড়ে দিল উপরের ঠোঁটের ঘ্রাণসংবেদী জায়গাগুলোতে লাগিয়ে ঘ্রাণ সনাক্ত করার জন্য। হাতিটার উল্টোদিকে বইছে বাতাস, অপেক্ষারত শিকারিদের গায়ের ঘ্রাণ তাই ওটার থেকে অনেক দূর দিয়েই ভেসে গেল, শেষমেশ হাতিটা শুঁড় নামিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

ওটার পেছনে, গিরিপথটা থেকে বেরিয়ে এল বিশাল ধূসর শরীরের এক প্রকাণ্ড পাল।

"বাচ্চাঅলা পাল," বিড়বিড় করে বললেন লানন, হুই বড়গুলোর হাঁটুর কাছে বাচ্চাগুলোকে দেখতে পেলেন। আকৃতিতে কিছু প্রায় বড়দের সমান যেমন আছে, তেমনি আছে শুকরের সমান আকারেরও। আকৃতি যত ছোট সেগুলো ততো বেশি হাউকাউ করছে আর দুষ্টুও বেশি–মায়ের পায়ের ফাঁক দিয়ে এদিক-সেদিক দৌড়ে যাচ্ছে, চিৎকার করে শব্দ করছে। একটা বাচ্চা ওর চলন্ত মায়ের স্তন থেকে দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে দেখে হেসে দিলেন হুই, মায়ের সামনের পায়ের ফাঁকের স্তনের বোটায় নিজের পিচ্চি শুঁড় দিয়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল বাচ্চাটা, শেষে মা-টা ত্যক্ত হয়ে মাটি থেকে একটা পড়া ডাল তুলে নিয়ে নির্দয়ভাবে পিটাতে লাগল বাচ্চাটার গায়ে। বাচ্চাটা মায়ের হাঁটুর কাছে চলে গেল আবার, একান্ত বাধ্যগত আর শান্তশিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

পুরো পিরিচটা এখন বুনো হাতিতে ভরে আছে, ওদের চলাচলের প্রাচীন আর সুরক্ষিত পথটা ধরে এগোনোর সময় ওগুলোর ধূসর ফোলা পিঠ দেখা যেতে লাগল ঘন ঝোপের উপর দিয়ে।

লানন সামনে ঝুঁকে মাহুতের কাঁধে টোকা দিলেন, যুদ্ধ-হাতিটা উঠে দাঁড়ালো ওনাদেরকে নিয়ে। এই হাতিটার উচ্চতা এত বেশি যে, আগুয়ান হাতির পালটাও ওদের পালকির নিচে চলে গেল। পিরিচের চারপাশ থেকে এবার লুকানোর জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এল যুদ্ধ-হাতিগুলো, পিঠে অস্ত্রধারী শিকারি। চুপচাপ পালটার কাছে এগিয়ে গেল ওরা, শাবকগুলোর চেঁচামেচি আর হাউকাউ-এর কারণে ঢাকা পড়ে গেল আগমনের শব্দ, আগুয়ান পালের মধ্যে একেবারে ঠিক জায়গায় পৌঁছানো পর্যন্ত কোনো সমস্যাই হবে না।

একটা মোটামুটি বড় শাবকসহ একটা কম বয়স্ক মাদীকে বাছাই করলেন লানন। তারপর পালকি থেকে বেরিয়ে, ঝুঁকে পড়ে ওটার ঘাড় বরাবর ছুঁড়ে দিলেন বর্শা, ওখানের বড় রগগুলো নিশানা করেছেন। মাদিটা ব্যথায় আর অন্যদের সতর্ক করতে আর্তনাদ করে উঠলো, শুঁড়ের মাথা থেকে ধমনীর লাল রক্ত বেরিয়ে এল গলগল করে। পেছনের দিকে উল্টে পড়ে গেল হাতিটা, মারাত্মকভাবে আহত, অন্যান্য পালকি থেকেও বর্শার বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো পুরো পালের ভেতরে। একশোরও বেশি অতিকায় শরীর একযোগে ছুট দিল আর তাদের আর্তনাদ এবং ক্ষিপ্ত পালানোর প্রচেষ্টায় কেঁপে উঠলো পুরো জঙ্গল।

দেবতাদেরকে কথা দেওয়া সত্ত্বেও হুই তার ধনুক তুললেন না, বীভৎস মোহগ্রস্ততা নিয়ে দেখতে লাগলেন এই ভীত জানোয়ারগুলোর ব্যাপক সংহার। একটা বুড়ো মাদীকে খেয়াল হলো তার, তীর আর বর্শা গেঁথে আছে সারা শরীরে, সেটা একটা যুদ্ধ হাতিকে গুঁতো মেরে হাঁটু ভেঙে বসিয়ে দিল;

উপরে বসা লোকজন পালকি থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল নিচের ছত্রভঙ্গ পায়ের তলায়, বুড়ো মাদীটা এক দুই পা স্খলিত পায়ে এগিয়ে এক দিকে কাত হয়ে পড়ে মারা গেল, তখনও ওটার যুদ্ধের উন্মাদনা কমেনি। একটা শাবক চোখে পড়ল হুইয়ের, ভুল করে আঘাত করা হয়েছে, চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজের পেট থেকে তীরটা খুলে ফেলতে কিন্তু তীরের কাটাগুলো কঠিনভাবে মাংসে গেঁথে থাকায় সকরুণ আর্তনাদ করছে। আরেকটা শাবককে চোখে পড়ল তার, মৃত মাকে ডেকে তোলার নিস্ফল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ছোট্ট শুঁড়টা দিয়ে টানাটানি করছে মায়ের লাশটাকে।

উত্তেজনায় চিৎকার করতে শুরু করেছেন লানন, নিখুঁত নিশানায় একের পর এক বর্শা মেরেই যাচ্ছেন হাতিগুলোর ঘাড় আর মেরুদণ্ড বরাবর, বিশাল ধূসর দেহগুলো ঝপ ঝপ করে পড়ে যাচ্ছে ওনাদের হাতিটার চারপাশে।

পালের ভেতরের একটা মা হাতি এক পাশ থেকে আক্রমণ করল ওনাদেরকে; এটা একটা বদ মেজাজি বয়স্ক সর্দারনি–আকারে আর শক্তিতে ওনাদের বাহনটারই সমান। ওনাদের দিকে ধেয়ে এল হাতিটা। লানন ঘুরে গেলেন ওটার মুখোমুখি হতে, শরীরকে সোজা করে ছুড়লেন বর্শা; কিন্তু বুড়ো সর্দারনি শেষ মুহূর্তে তার শুঁড় তুলে ফেলায় বর্শাটা বাড়ি খেলো তাতে, দিক বদলে তুলতুলে শরীরটার চোখের ঠিক নিচে গিয়ে বিদ্ধ হলো। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো হাতিটা, কিন্তু দৌড়ের গতি কমলো না মোটেও, হুই অনুতপ্ত মনে তার ধনুক তুলতে বাধ্য হলেন। কারণ উনি জানেন যে হাতিটা ওনাদেরকে ঢুঁশ মারবেই, শুধুমাত্র মৃত্যুই থামাতে পারবে ওটাকে।

বুড়ো সর্দারনিটা তার মাথা আর শুঁড় উপরে তুলে ধরলো, সংঘর্ষের পরবর্তী ফলাফলের জন্য প্রস্তুত করছে নিজেকে। চওড়া হয়ে খুলে আছে মুখটা, নিচের সূচালো ঠোঁটটা ঝুলছে, হুই ধনুকের ছিলায় টান দিলেন, হাতিটার গলার পেছনের দিকে নিশানা করে ছুঁড়ে দিলেন তীর। তীরের পুরো পাঁচ ফুট গায়েব হয়ে গেল ওটার হাঁ হয়ে থাকা মুখের ভেতরে, তীরের মাথা ওটার মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছে নিশ্চিত, কারণ হাতিটা উল্টে নিজের নিতম্বের উপর পড়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁকি দিয়ে উঠতে লাগল ওটার শরীর, একটা চাপা গোঙানির মত কান্না বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। চোখের পাতা তীব্রভাবে পিটপিট করল কয়েকবার, তারপর সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে স্থির হয়ে গেল।

মোট একচল্লিশটা মাদী শিকার করলেন ওনারা, এদের মাঝে তিরিশটা ছিল বাচ্চাঅলা। আবার, নয়টা শাবক দেখে প্রশিক্ষকরা ঘোষণা দিল যে এরা এতটাই ছোট যে মা ছাড়া বেঁচে থাকা মুশকিল; তাদেরকে একটা তীর মেরে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া হলো। বাকিদেরকে ধরে নিয়ে এসে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাদী ধাই হাতির কাছে তুলে দেওয়া হলো, ওরা বাচ্চাগুলোকে

মায়ের পর্বতপ্রতিম রক্তাক্ত লাশের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। দুপুর নাগাদ সব কাজ সম্পন্ন হতেই দাসরা ভেজে গেল মৃতদেহগুলো কাটাকুটির কাজে, তারপর মাংসের পিণ্ড নিয়ে চড়িয়ে দিল ধোঁয়া ওটা শিকগুলোর উপরে। পিরিচটা পরিণত হলো একটা পূঁতিগন্ধময় কসাইখানায়। মাথার উপরে কালো মেঘের মত জড়ো হতে লাগল শকুন, সূর্যই তাতে ঢেকে গেল প্রায়।

লানন তার সভাসদ আর শিকার-সর্দারদের সাথে দুপুরের খাবার খেলেন। মরিচের আচার দিয়ে মাখানো হাতির তরতাজা নাড়িভুঁড়ি, লাল ভাত আর জলপাই দিয়ে ভরা ঝলসানো হৃৎপিণ্ড, থালা ভর্তি সোনালি রঙের ভুট্টার পিঠা আর অপরিহার্যভাবে জেং ওয়াইনের মাটির জগ–একজন শিকারির ক্ষিদের সাথে এর চাইতে ভালো সঙ্গতি আর হয় না।

লানন খুবই ফুর্তিতে আছেন বোঝা গেল, লোকদের মাঝে ঘুরে ঘুরে হাসছেন, মজা করছেন, একে-ওকে ডেকে ডেকে বিশেষ প্রশংসা করছেন। তখনও শিকারের উত্তেজনায় টগবগ করছেন উনি। ঘুরে-ফিরে হুইয়ের পাশে এসে পড়তেই একটু খোঁচাতে ইচ্ছে হলো ওনাকে।

“আহারে আমার সূর্যের পাখি! পুরো শিকারে তোমার মাত্র একটা তীর খরচা হলো।” জবাবে হুইও হালকাভাবে বলতে যাচ্ছিলেন যে এক তীরে একটা হাতি ধরাশায়ী করতে পারাটা কোনো দিক দিয়েই খারাপ না মোটেও, কিন্তু তখন আচমকা মধ্য সাম্রাজ্যের শিকার-সর্দার জাডাল হো হো করে হেসে উঠলো।

“ধনুক কি আপনার জন্য খুব বেশি শক্ত ছিল, মহানুভব, নাকি শিকার দেখে ভয় পেয়েছিলেন?”

পুরো দলটার ভেতর আচমকা পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল, সবার চেহারা ঘুরে গেল বিদ্রূপাত্মক চেহারার আর উজ্জ্বল লোভাতুর চোখের, রোগা–কালো লোকটার দিকে।

নিস্তব্ধতার কয়েক সেকেন্ড কাটার পরে জাডাল টের পেল যে আসলে কী বলে ফেলেছে, তাকিয়ে থাকা চেহারাগুলোর দিকে একবার চোখ বুলালো ও। একটা শীতল অনুভূতির সাথে খেয়াল করল যে লোকজন যেভাবে বলিদানের জন্য নির্বাচিতদের দিকে তাকিয়ে থাকে, এখনও ঠিক একইরকম কৌতূহলী অভিব্যক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা একজন বিশিষ্টজন নরম স্বরে ওর ভবিতব্য ঘোষণা করলেন, “তুমি তো শেষ।”

সাথে সাথে সচকিত চোখে, হুই বেন-আমনের দিকে তাকালো জাডাল। পুরোহিতের সুনাম মনে পড়তে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে ওর। সবাই বলে যে, কেউ এখন পর্যন্ত তার পিঠ, উচ্চতা বা তার সাহস নিয়ে ব্যঙ্গ করে জীবন নিয়ে বাঁচতে পারেনি। তবে পুরোহিতকে মৃদু হাসতে দেখে জানে কিছুটা পানি পেল ও, বিশেষ কায়দায় নিজের জামার পাড়ে আঙুল বুলাচ্ছেন উনি।

"মহান বাআল, আপনাকে ধন্যবাদ," মনে মনে প্রার্থনা করলেন হুই, হাসছেন কিছুটা। "আপনি আমাকে আমার ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঠিকই করেছেন। আমি শিকার থেকে বিরত ছিলাম। আমাকে ক্ষমা করে দিন, মহান বাআল। আমি এবার আপনাকে আপনার সুযোগ দেব।"

জাডালের স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, কারণ হুই মাথা তুলে ওর দিকে তাকাতেই ও দেখতে পেল যে পুরোহিতের শুধু ঠোঁটজোড়াই হাসছে। ওনার চোখজোড়া উজ্জ্বল, কালো আর শীতল হয়ে আছে।

"জাডাল," নরম গলায় বললেন হুই, সবাই আরও কাছিয়ে এল ওনার কথা শোনার আশায়। "আমার সাথে ঝড়ের ডানায় করে উড়তে পারবে?"

কথাটা শুনে নড়েচড়ে উঠলো সবাই, মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো আর সবার দৃষ্টি গিয়ে স্থির হলো জাডালের উপর। ওর চেহারা এখন ভুসভুসে হলুদ হয়ে গিয়েছে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখায় সেটা এখন সাদা একটা রেখার মত দেখাচ্ছে।

"আমি নিষেধ করছি," চিৎকার করে বললেন লানন। "আমি তোমাকে এটা করেতে দেব না, হুই। এসব ফালতু কাজে নিজের জীবন নষ্ট করার চাইতে তোমার জীবন আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান–"

ঠান্ডা গলায় ওনার কথার মাঝে বাগড়া দিলেন হুই, "জাঁহাপনা, এটা আমার ইজ্জতের প্রশ্ন। এ আমাকে কাপুরুষ ডেকেছে।"

"কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে কেউ এখন পর্যন্ত এভাবে শিকার করেনি," লানন প্রতিবাদ করলেন।

"পঞ্চাশ বছর অনেক দীর্ঘ সময়," হেসে বললেন হুই, "তাই না, জাডাল? তুমি আর আমি আবার প্রচলন করবো এই রীতিটা।"

জাডাল তাকিয়ে রইলো হুইয়ের দিকে, নিজের অবাধ্য জিহ্বাটাকে প্রচণ্ড ঘৃণা লাগছে ওর।

হুই এখনও হাসছেন ওর দিকে চেয়ে। "নাকি এভাবে শিকার তোমার জন্য খুব বেশি ভয়ংকর হয়ে যাচ্ছে?" নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন উনি। দীর্ঘ একটা সময় মনে হলো যে জাডাল নাকচ করে দেবে প্রস্তাব, তারপর ও সামান্য মাথা ঝাঁকালো, ওর ঠোঁট তখনও সাদা।

"আপনি যা বলেন, মহানুভব।" আর বলার সময়েই ও জানতো যে বাকিদের কথাই ঠিক, ও আসলেই শেষ।

দুটো বিশাল ঝুড়িতে, দাসরা একটা হাতির মৃতদেহ থেকে ওটার অন্ত্রের ভেতরের জিনিসপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে এল। হুই এবং জাড্ডাল সকল কাপড় খুলে নগ্ন হয়ে, সারা দেহে মেখে নিতে লাগলেন এই হলুদ গোবর। মাখতে মাখতে শুনতে পেলেন যুবক বাকমোর শিকার-সর্দার মুরসিলের সাথে ওনাদের শিকার নিয়ে কথা বলছে।

"আমার বিশ্বাস হয় না যে একটা পূর্ণ বয়স্ক মদ্দা হাতিকে যুদ্ধ কুঠার দিয়ে মারা সম্ভব। আমার কাছে ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা করার বাজে একটা উপায় বলে মনে হচ্ছে।"

"সেজন্যই সবাই এটাকে বলে ঝড়ের ডানায় ভর করে উড়ে চলা।"

হাতির গোবরের একটা প্রচণ্ড বাজে দুর্গন্ধ আছে, মানুষের গায়ের ঘ্রাণ ঢেকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই একটা সুরক্ষাই শিকারিরা গ্রহণ করতে পারবে। এটাই তাদের একমাত্র উপায় ধরা না পড়ে বিশাল জানোয়ারগুলোর কাছাকাছি যাওয়ার। প্রখর ঘ্রাণশক্তিই হলো হাতির মূল প্রতিরক্ষার অস্ত্র, কারণ ওদের দৃষ্টিশক্তি খুবই দুর্বল, দূরে দেখতে পায় না জানোয়ারগুলো।

রাজার তাঁবুর বেষ্টনী থেকে থেকে টিমন এগিয়ে এসে হুইকে সাহায্য করতে লাগল, তার পিঠে লেপে দিল গোবর। দ্রুতই টিমন ধরে ফেলল যে কোন পদ্ধতিতে তারা শিকার করতে যাচ্ছে।

"জনাব, আপনার জন্য ভয় হচ্ছে আমার," নরম গলায় বলল ও।

"আমারও ভয় লাগছে," স্বীকার করলেন হুই। "পুরু করে গোবর লেপে দাও, টিমন। গায়ে গন্ধ হয় হোক, মরার চাইতে ভালো।"

হুই খাড়া ঢালটার দিকে তাকালেন যেটা পিরিচটা থেকে উপত্যকার দিকে নেমে গিয়েছে। এটার গায়ের পাতলা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে হাতি চলার পথ। পরবর্তী পালটাকে ওনারা ওখানে আটকাবেন, পিরিচের মৃতদেহগুলোর রক্তের ঘ্রাণে সতর্ক হয়ে যাওয়ার আগেই।

হুই ওনার চারদিকে নজর বুলালেন একবার, শিকারিরা শৈলশিরা ধরে ছড়িয়ে পড়েছে, শিকার দেখা জন্য সুবিধামতো জায়গা খুঁজে নিচ্ছে সবাই। জাডালের চোখে চোখ পড়ল ওনার। শিকার-সর্দারের আপাদমস্তক হলুদ বিষ্ঠা মেখে দেওয়া হয়েছে, নিজের কুঠারের হাতল অতিরিক্ত শক্ত করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর কালো চোখজোড়ায় ভয় খেলা করছে, যে টানটান ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে তাতেও ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। হুই ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, উপভোগ করছেন ওর অস্বস্তি। জাডাল চোখ ফিরিয়ে নিল। ওর ঠোঁট কাঁপছে।

"শিকার-সর্দার, প্রস্তুত?" জিজ্ঞেস করলেন হুই। আর জাডাল মাথা ঝাঁকালো। নিজের গলার স্বরকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না ও।

"চলো," বললেন হুই, তারপর ঢাল বেয়ে নামা শুরু করলেন, কিন্তু লানন এসে দাঁড়ালেন সামনে। ওনার চোখে যেতে না দেওয়ার আকুতি, হাসিটাও মোটেও বন্ধুসুলভ না।

"ওই বুদ্ধু জাডাল হড়বড় করে কী বলেছে সেটার মানে ধরতে যাওয়ার দরকার নেই। এখানে কেউই তোমার সাহস নিয়ে সন্দেহ করে না, হুই, শুধু তুমি বাদে। এসব করে সবার কাছে সেটা প্রমাণ করা লাগবে না। আমার সূর্যের পাখি না থাকলে জীবনে আমার আর কিছুই থাকবে না।"

“জাঁহাপনা,” হুইয়ের গলার স্বর ফ্যাসফেঁসে শোনাচ্ছে। লাননের দুশ্চিন্তা হৃদয় ছুঁয়ে দিয়েছে ওনার।

“প্রথম কোপটাই হচ্ছে সবচে বিপজ্জনক, হুই। হাতিটা যখন পড়ে যাবে তখন সাবধানে থাকবে, ওটা যেন তোমার উপরে না পড়ে।”

“মনে থাকবে।”

“আমার সাথে সন্ধ্যায় খেতে আসার আগে গোসল করার কথাটাও যেন মনে থাকে।” বলে হেসে সরে দাঁড়ালেন লানন।

সেদিন বিকেলে দুইবার হাতির ছোট ছোট পাল পার হয়ে গেল ওনাদের সামনে দিয়ে, জঙ্গলের ভেতরে খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে দ্রুত বেগে। প্রতিবারই হুই জাডালের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, কারণ এগুলো ছিল মাদী, সঙ্গে শাবক আর অল্প বয়সী মদ্দা।

দিনটা প্রায় শেষ হয়ে এল, হুই মুক্তি পাওয়ার কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি অনুভব করতে লাগলেন। সম্ভবত দেবতারা ওনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই পরীক্ষা নেওয়ার বিপদে আর ফেলতে চাচ্ছেন না।

দিনের আর এক ঘণ্টার মত আলো বাকি আছে। হুই আর জাডাল তখনও রাস্তার পাশের একটা গাছ থেকে নেমে আসা মাঙ্কি-আপেল লতার ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছেন চুপচাপ।

গায়ের গোবর শুকিয়ে এসেছে, চামড়া চড়চড় করে অস্বস্তিবোধ হচ্ছে এখন। হুই শকুন কুঠারটা কোলের উপর রেখে বসে বসে পথের দিকে চেয়ে আছেন, মনে মনে আশা করছেন যে দিনের আলো ফুরোবার আগে আর কিছু আসবে না পথ ধরে; উনি এই পাগলা অভিযান বাদ দিতে পারবেন, নিজের ইজ্জত বাঁচাতে বেশি তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বলে খারাপ লাগছে এখন। ব্যাপারটা অদ্ভুত যে, অলস বসে থাকলে কীভাবে সবচে রোমাঞ্চকর নেশাটাতেও ভাটা পড়ে, মনে মনে ভাবলেন হুই, কুঠারের হাতলটা নাড়তে চাড়তে একটা কাষ্ঠহাসি ফুটে উঠলো চেহারায়।

ঢালের একদম নিচে নড়া-চড়া দেখা গেল আবার, একটা ধূসর আগুয়ান অবয়ব–যেন গাছের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে, হুইয়ের মনে হলো ওনার চামড়ায় সুড়সুড়ি দিল কেউ। জাডালও দেখেছে সেটা, নিজের অস্থির ছটফটানি বন্ধ করে নিথর বসে রইলো হুইয়ের পাশে।

ওনারা অপেক্ষা করতে লাগলেন, আচমকাই দুটো হাতি বেরিয়ে এল গাছের ভেতর থেকে। দুটো বুড়ো মদ্দা, বিশাল ভারি দাঁত, হালকা পায়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে। হাতি দুটো একটা অন্যটা থেকে প্রায় একশো পেস দূরে, পথের পুরোটাই জুড়ে আছে বিশাল বপু আর ওদের পদক্ষেপে কেমন একটা সতর্কাবস্থা আর উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব হুইকে জানিয়ে দিল যে এদেরকে একটু আগেই বিরক্ত করেছে কেউ, সম্ভবত আহতও হয়েছে, নিচের উপত্যকার শিকারিরা হয়তো করেছে কাজটা।

"এই দুটোকে শিকার করবো আমরা,' ফিসফিসিয়ে বললেন হুই। "বেছে নাও কোনো একটাকে।"

জাডাল এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো, অভিজ্ঞ চোখে মদ্দা দুটোকে দেখছে। সামনের হাতিটার বয়স বেশি, ঠোঁটের কাছে ভেঙে আছে একটা দাঁত। দেখতে ওর সঙ্গীর চাইতে রোগা আর ভ্রমণ সহিষ্ণু মনে হচ্ছে, অগ্রগামী অবস্থানই বলে দিচ্ছে যে ওটা বেশি অভিজ্ঞ, বেশি সতর্ক, ভাঙা দাঁতের কারণে ওটা বেশি ক্ষিপ্ত থাকবে আর মেজাজ হবে বেশি অনিশ্চিত।

"দ্বিতীয়টা," ফিসফিসিয়ে বলল জাডাল, হুই মাথা ঝাঁকালেন। উনিও এটাই ভেবেছিলেন।

"আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। আমাদেরকে একই সাথে আক্রমণ করার চেষ্টা করতে হবে।" বলে উনি ঝুলন্ত লতার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, পথটা ধরে ছুট দিয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁছালেন যেখান থেকে ওনার আর জাডালের দূরত্ব ওই হাতি দুটোর দূরত্বের সমান হয়।

হুই রাস্তার পাশের একটা মোটা ঘাসের দঙ্গলের আড়ালে শুয়ে পড়ে পেছনে ফিরে তাকালেন। হাতি দুটো ধীরে সুস্থে উঠে আসছে ওনাদের দিকে। সামনের মদ্দাটা জাডালের লুকানোর জায়গাটা পেরিয়ে এল, এগোতেই থাকলো সামনে। হুই খেয়াল করলেন মদ্দা দুটোর মাঝের দূরত্ব কমে এসেছে। উনি যে ঘাসের চাপড়ার আড়ালে লুকিয়ে আছেন সেখানে সামনের হাতি পৌঁছার আগেই জাডালের হাতি পৌঁছে যাবে ওর সামনে।

দুজনের একজন যদি সময়ের আগেই আক্রমণ চালান, তাহলে অন্য হাতিটা সতর্ক হয়ে যাবে, বিপদ বেড়ে যাবে বহুগুণে। হুই জানেন যে ওনাকে জাডালের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করলে চলবে না। লোকটা শুধু নিজের ভালোটাই বুঝবে।

চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র উনি দেখলেন যে জাডাল লতার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় মদ্দাটার পেছনে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল নীরবে। হুইয়ের হাতিটা এখনও উনি যেখানে শুয়ে আছেন সেখান থেকে পঞ্চাশ পেস দূরে, এখন ওটা সোজা ওনার বরাবর আসছে।

নিজের হাতিটা অনুসরণ করছে জাডাল, গোড়ালির উপর ভর দিয়ে কাছাকাছি দৌড়াচ্ছে। এক মুহূর্ত লোকটার জন্য মনে মনে তারিফ করলেন হুই। সম্ভবত উনি ওকে ভুল বিচার করেছেন। সম্ভবত জাডাল দ্বিতীয় হাতিটাকে অনুসরণ করে করে হুইয়ের মদ্দাটা ওনার বরাবর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কিন্তু তারপরই হুই দেখলেন শিকার-সর্দারের কুঠার উঠে গেল উপরে আর সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠে নেমে এল কোপ দেবার লক্ষ্যে; কুঠারের ফলা নিচে নেমে আসতেই হুই তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন সামনের মদ্দাটার উপর।

জাডালের কুঠার আঘাত করতেই সতর্কবার্তা আর ব্যথাভরা আর্তনাদ শোনা গেল একটা, হুইয়ের মদ্দাটা পূর্ণ গতিতে ছোটা শুরু করল। সোজা ধেয়ে এল ওটা ওনার দিকে, হুইয়ের পুরো দৃষ্টি ক্ষেত্র দখল করে রেখেছে। যে দুনিয়া থেকে বেরিয়েছে ওটা, সেটার সমানই বড় জানোয়ারটা।

হুই নিজের লুকানোর জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার সময়েই জানতেন যে আঘাত করার জন্যে উনি কয়েকটা সেকেন্ডের বেশি পাবেন না। তারপরেই মদ্দাটা পালিয়ে যাবে।

উনিও মদ্দাটার পাশাপাশি দৌড়ানো শুরু করলেন, হাতিটা থেকে উচু জমিতে দৌড়াচ্ছেন, যাতে ওটা পড়ে যাওয়ার পরে ওনার থেকে দূরে গড়িয়ে যেতে পারে। গতি রাখতে হুইয়ের লম্বা পাগুলোর সর্বোচ্চ বিস্তৃতিতে দৌড়াতে হচ্ছে, তবে খুব দ্রুতই পিছিয়ে পড়তে লাগলেন, মদ্দাটার পশ্চাৎভাগের দিকে অবস্থান চলে এল ওনার।

প্রতি কদমে যখন ওই ধূসর শরীরটার পুরো ওজন গিয়ে পড়ছে হাতিটার পেছনের পায়ের উপর, তখন পায়ের পেছন দিকে, হাঁটু হয়ে গোড়ালি পর্যন্ত চলে যাওয়া পেশীর সন্ধিবন্ধনীটা, পুরু ক্ষয় হয়ে যাওয়া চামড়ার নিচে টানটান হয়ে যাচ্ছে। একটা মোটা দড়ির মত ভাঁজ হয়ে ফুলে উঠতে লাগল সন্ধিবন্ধনীটা, একটা মহিলার কবজির সমান চওড়া সেটা; প্রতি পদক্ষেপে ওগুলোই বহন করছে মদ্দার পুরো ওজনটা।

হুই দৌড়ের দিক বদলে ফেললেন, মদ্দাটার পেছনের দিক পার হওয়ার সময়, ওনার কাছের পায়ের সন্ধিবন্ধনীটা টানটান হতেই হাতের শকুন কুঠারটা ওটার বরাবর চালিয়ে দিলেন, একেবারে পুরোপুরি দুই ভাগ হয়ে গেল ওটা–একটা মাত্র তীক্ষ্ণ ধারালো শব্দ হলো তাতে, যেন একটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসে জাহাজের পাল ছিড়ে গেল।

পাভাঁজ হয়ে যেতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল মদ্দাটা, মরিয়া হয়ে টলতে টলতেই হাঁটার চেষ্টা করতে লাগল ওটা।

"জয় বাআল!" হুই উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, আবার কুঠারটা ওনার হাতের সাথে উঠে গেল উপরে। দ্বিতীয় সন্ধিবন্ধনীটাও নিখুঁতভাবে দুই ভাগ হয়ে যেতেই বিশাল ধূসর জন্তুটা দড়াম্ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ওটা পড়ে যাওয়ার শব্দ আশপাশের শৈলশিরার দর্শকদের কাছে পরিষ্কারভাবে পৌঁছে গেল, পতনের ধাক্কায় ধুলোর ঝড় উঠে গেল শুকনো মাটি থেকে। হুই নিজের শরীরকে বাকিয়ে, পড়ন্ত শরীর আর বিপজ্জনকভাবে নাড়াতে থাকা শুঁড় থেকে সরিয়ে নিলেন নিজেকে।

চূড়ান্ত আঘাতের জন্য নিজেকে স্থির করলেন হুই, অসহায়ভাবে পড়ে থাকা জানোয়ারটার পেছনে দিকে সরে যাওয়ার সময়েই উনি জানতেন যে ওটার বিমূঢ় দশা কাটার আগে কয়েকটা সেকেন্ড সময় পাবেন মাত্র, পঙ্গু

জানোয়ারটা নিজেকে সামলে ওনাকে দেখতে পেতে বেশি সময় লাগবে না, তাই মরিয়া হয়ে খুঁজতে লাগলেন আঘাত করার উপযুক্ত স্থান।

মদ্দাটা সামনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বিকলাঙ্গ পেছনের পা দুটো টেনে নিয়ে যাচ্ছে পেছনে। অযৌক্তিক ক্রোধে হাতিটা সামনে যে গাছই পেল সেটাকেই উপড়ে ফেলতে লাগল, বিপজ্জনক শুঁড়টাকে বাই বাই করে ঘোরাচ্ছে বৃত্তাকারে। মাটি খুবলে তুলে ফেলছে একটা দাঁত দিয়েই।

কিন্তু ওটার পিঠ ফেরানো ছিল হুইয়ের দিকে, এখনও নিজের আক্রমণকারীকে দেখতে পায়নি সে। হালকা পায়ে ছুটে গেলেন হুই, মাথা নিচু করে ওটার তপড়াতে থাকা শুঁড়টার পাশ কাটিয়ে লাফ দিয়ে উঠে গেলেন মদ্দাটার চওড়া পিঠে। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে শকুন কুঠারটা তুলে ধরলেন মাথার উপরে।

কোঁচকানো শুকনো চামড়ার ভাজের ভেতর জট পাকানো মেরুদণ্ড ঠেলে বেরিয়ে আছে হাতিটার। যেন হাড়ের বিশাল বিশাল গাঁট একজোট হয়ে আছে ফলার আঘাত খেতে। হুই কোপ দিলেন, মরণ আঘাত, খুলি ভেদ করে ফলাটা ঢুকে যেতেই মস্তিস্কের নরম হলুদ মজ্জা পর্যন্ত বেরিয়ে এল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো মদ্দাটা, পড়ে গেল ধপ করে, মরণ যন্ত্রণায় থেকে থেকে ওটার শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠে চার পায়ে লাথি হাঁকাতে লাগল।

হুই মুমূর্ষু জানোয়ারটার ঝাঁকাতে থাকা দেহটা থেকে লাফিয়ে নেমে এসে হাচড়ে পাচড়ে ওটার পা আর শুঁড় থেকে নিরাপদ দুরত্বে সরে গেলেন। নিজের ভেতরে বিজয় আর স্বস্তির এক তিক্ত অনুভূতি অনুভব করছেন উনি। অবশেষে শেষ হলো, ঝড়ের ডানায় ভর করে উড়ে বেড়িয়েছেন উনি–আর বেঁচে ফিরেছেন বহাল তবিয়তে।

অন্য মদ্দাটার ক্ষিপ্ত কর্কশ চিৎকার শুনতে পেয়ে সেদিকে ঘুরে গেলেন হুই। একটা ঝলকেই বুঝে ফেললেন কাজ এখনও শেষ হয়নি, দেবতারা ওনাকে নিয়ে খেলা থামাননি এখনও।

জাডাল ভুল করে বসেছে। ওর দ্বিতীয় কোপ সন্ধিবন্ধনীটায় লাগেনি, ফলে মদ্দাটা এখন তিন পায়ে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু তবুও প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতা আর দ্রুততার সাথে তাড়া করছে জাডালকে। জাডাল নিজের কুঠার একদিকে ছুঁড়ে ফেলে জান হাতে নিয়ে ছুটছে, মদ্দাটা কাছিয়ে এসেছে ওর, এঁকেবেঁকে ঢাল বেয়ে দৌড়াচ্ছে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে হাতিটা, শুঁড় বাড়িয়ে রেখেছে সামনের দিকে, পলায়নরত লোকটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

হুই সামনে এগিয়ে যেতেই ওটা জাডালকে ধরে ফেলল। শুঁড় দিয়ে জাডালের শরীর পেঁচিয়ে ছুঁড়ে দিল উপরের দিকে, সবচে লম্বা গাছগুলোরও উপরে উঠে গেল ও, ওর শরীর হালকা একটা জিনিসের মত ভেসে গেল বাতাসে।

পাথুরে মাটিতে আছড়ে পড়ল জাডাল, মদ্দাটা ওটার একটা পা ওর পিঠে চেপে রেখে শুঁড়টা দিয়ে ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলল–ঠিক যেভাবে একজন কৃষক মুরগি ধরে মারে–তারপর মাথাটাকে ছুঁড়ে দিল একপাশে। বাচ্চাদের খেলার বলের মত করে মাথাটা ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে গড়িয়ে নেমে গেল।

হুই দৌড় দিলেন মদ্দাটার দিকে, চার হাত-পা-ই ব্যবহার করে উঠে গেলেন ঢাল বেয়ে। মদ্দাটা জাডালের মুণ্ডুহীন ধড়ের উপর একটা হাঁটু গেঁড়ে, একটা দাঁত ঢুকিয়ে দিল বুকের ভেতর। জাডালের শরীর বিকৃত করার কাজে ওটা এতটাই বিভোর ছিল যে হুই সহজেই চলে এলেন ওটার পেছন পর্যন্ত।

মদ্দাটার হাঁটুর পেছনে বিশাল একটা হাঁ হয়ে আছে, যেখানে জাডালের কোপ ওটার সন্ধিবন্ধনী পর্যন্ত পৌঁছায়নি, শকুন কুঠারটা মৃদু গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল সেখানে। এবার আর কোনো ভুল হলো না।



"আমি তোমাকে নতুন একটা উপাধি দেব।" লানন নিজের ওয়াইনের পাত্র তুলে ধরলেন, প্রত্যাশিতভাবেই সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজন আর যোদ্ধাদের মাঝে নীরবতা নামলো। "যে লোকটা ঝড়ের ডানায় ভর করে উড়ে এসেছে, তাকে অবশ্যই একটা সামরিক খেতাব দেওয়া উচিত।"

হুই বিনীতভাবে নিজের চোখ নামিয়ে নিলেন, মশালের আলোয় দেখা গেল ওনার গালে হালকা রক্ত জমেছে। সবাই এখন বসে আছেন লাননের তাঁবুর চামড়ার ছাউনির নিচে।

"হুই সেন-আমন–দেবতাদের কুঠারবাহক!" লানন চিৎকার করে উপাধিটা ঘোষণা করলেন, সভাসদবৃন্দ পুনরাবৃত্তি করলেন সেটা, মুঠো করা হাত তুলে সম্মান জানালেন হুইকে।

"খাও, হুই, খাও, আমার সূর্যের পাখি!" লানন হুইকে ওনার নিজের ওয়াইনের পেয়ালা এগিয়ে দিলেন। হুই চুমুক দিলেন পেয়ালায়, সামনের সবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন। আজ রাতে উনি ওয়াইনের পেয়ালার দিকে খুব বেশি মন দেবেন না, কারণ বেসামাল হয়ে এই আনন্দের অনুভূতিকে ম্লান করতে চান না। দেবতারা তাদের জবাব দিয়েছেন ওনাকে। হুল্লোড়ের মাঝখানে উনি চুপচাপ বসে বসে হাসতে লাগলেন শুধু, চারপাশের হাসাহাসি বা খুনসুটির কিছু কানে ঢুকছে না, বরং ওনার মনের গভীর থেকে শুধু একটা গানই বেজে যাচ্ছে, "তানিথ! তানিথ!"

হুই চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ক্ষেপে গেলেন লানন, ওনার জামার পাড় ধরে টেনে আবার বসিয়ে দিলেন জায়গায়।

“আজ এখান থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না, কুঠারবাহক। মাতাল হয়ে অন্যের কাঁধে চড়ে যাওয়াটা আজ তোমার প্রাপ্য! চলো, কে কত পেয়ালা ওয়াইন খেতে পারে বাজি হয়ে যাক।”

হুই এড়িয়ে গেলেন আহ্বানটা, হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে লাগলেন।

“এক দিনে একটা বাজিই যথেষ্ট, জাঁহাপনা, মাফ করবেন আমাকে।”

বাইরে রাতটা যেন স্থির হয়ে আছে, আকাশে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে তারকারাজি। দিনের উত্তাপ কমে ঠান্ডা হয়ে আসছে পরিবেশ, ওনার চেহারায় রাতের ঝিরিঝিরি বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে মনে হলো যেন তানিথের রেশমি চুল ছুঁয়ে দিচ্ছে ওনার গাল।

“অ্যাসটার্টে!” উপত্যকা ছাড়িয়ে উঠে এলেন দেবী, ওনার মুখাবয়ববের প্রতীক ওই সোনালি চাকতিটা নরম দ্যুতিতে ভরিয়ে দিচ্ছে সমগ্র ভূমি। “পৃথিবীর জননী। ধন্যবাদ আপনাকে,” ফিসফিসিয়ে বললেন উনি, টের পেলেন চোখ জুড়ে আনন্দাশ্রুর বন্যা বইছে।

শিবিরের ভেতর দিয়ে উনি নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন সোজা, নিজের একান্ত গোপন ভালোবাসার উষ্ণ আদর গায়ে মেখে এগিয়ে যাচ্ছেন।

“তানিথ,” ফিসফিস করে বললেন উনি, “তানিথ।”

ছায়ার ভেতর দিয়ে চুপিসারে এগোতে এগোতে, আচমকা একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল তার, উনি থেমে দাঁড়ালেন। রান্নার জন্য জ্বালা আগুনের পাশে একটা অবয়ব উবু হয়ে আছে, একটা দাসী মহিলা যাতাকল নিয়ে কাজ করছে, ভুট্টার পিঠা বানানোর জন্য আটা পিষছে সে।

আগুনের আলোয় তার সুডৌল শরীরের ভাজ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, শক্তিশালী বাহুর কালো চামড়ার উপর প্রতিফলিত হচ্ছে আলো। হুই চিনতে পারলেন—আয়া সেলিনি।

এগিয়ে যেতে গিয়েও থেমে দাঁড়ালেন হুই, কারণ দাসী মেয়েটা অপেক্ষমাণ চোখে মুখ তুলে চাইলো। অন্ধকার ফুঁড়ে তার দিকে এগিয়ে এল একটা লোক, মেয়েটার মুখ পরম ভক্তি আর এমন নির্লজ্জ প্রেমের আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যে হুইয়ের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো ওর জন্য।

আগুনের আলোয় এসে দাঁড়ালো লোকটা, ওই বিশাল বপু আর গোল টাক মাথার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই টিমনকে চিনতে সমস্যা হলো না হুইয়ের।

সেলিনি উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল টিমনের দিকে, ওরা আলিঙ্গন করল পরস্পরকে। আদিবাসীদের ভালোবাসার অভিবাদনের অদ্ভুত রীতিতে ওরা একজন আরেকজনের চেহারা শুঁকতে লাগল, দুজন দুজনকে তখনও

কাছাকাছি চেপে ধরে রেখেছে। হুই স্নেহের চোখে হাসলেন, নিজে প্রেমিক বলে এখন অন্য সব প্রেমিকের জন্য উষ্ণ সহানুভূতি বোধ করছেন।

টিমন মেয়েটার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল, কিন্তু হাত ছাড়লো না, তারপর নরম গলায় কথা বলতে লাগল দুজন। হুই শুনতে পেলেন না কথা গুলো। শুধু টিমনের গলার মৃদু গমগম কানে এল, তা শুনে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগল মেয়েটা।

টিমন মেয়েটাকে রেখে তাঁবুগুলোর মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার। সেলিনিও যাতকলের কাছে ফিরে গিয়ে সাথের চামড়ার থলে ভরে ফেলল পেষা আটা দিয়ে, তারপর সতর্ক চোখে আশপাশে ইতিউতি একবার তাকিয়ে নিজেও অন্ধকারে এগিয়ে গেল টিমনের পিছু পিছু। হুই ওর যাওয়ার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন।

"লাননের সাথে কথা বলতে হবে," মনে মনে ভাবলেন উনি। "এই দুজনের মিল করার ব্যবস্থা করতে পারবো আমি।"

নিজের তাঁবুতে ফিরে, স্বর্ণের লিপিটা নিয়ে ওনার লেখার জায়গাটা মেললেন হুই। কুপির সলতে বাড়িয়ে আলোটা ঠিক করে নিলেন প্রথমে, তারপর খোদাই করার সরঞ্জাম হাতে নিয়ে শুরু করলেন তানিথকে নিয়ে লেখা কবিতাটা খোদাই করা।

"বিশাল হ্রদের ধারের প্যাপিরাসের দঙ্গলে আগুন লাগলে যে ধোঁয়া বের হয়, ওর চুলও ঠিক সেরকম কালো আর নরম," লিখলেন উনি, সেলিনি টিমনের ঘটনা মুছে গেল মন থেকে।

মাঝরাতের কিছু পরে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন হুই, ঘুমিয়ে গেলেন লেখার পিঁড়ির উপরেই মাথা দিয়ে, ওনার একটা গাল পড়ে থাকলো স্বর্ণের লিপির উপর লেখা তানিথের কবিতাটার উপরে। কুপির আগুন জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে, নিভে ধোঁয়া ছড়িয়ে মরে গেল একসময়।

ভোরবেলায় কঠিন হাতের ঝাঁকিতে ঘুম ভাঙলো ওনার, চোখ খুলে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলেন। শিকার-সর্দার মুরসিলকে দেখা গেল সামনে।

"গ্রাই-লায়ন ডেকে পাঠিয়েছেন আপনাকে, মহানুভব। রাজার দুজন দাস পালিয়েছে কাল রাতে, রাজা হুকুম পাঠিয়েছেন ওদেরকে ধাওয়া করতে আপনাকেও যেতে। কুকুরগুলোকে বের করা হয়েছে, সব দাস-সর্দারেরাও জড়ো হয়ে গিয়েছে।"

এমনকি এই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেও, হুই বুঝতে পারলেন যে পালানো দাস দুজন কারা, ওনার পেটের মাঝে মোচড় দিয়ে উঠলো যেন।

"বোকার হদ্দগুলো," অস্ফুটে বললেন উনি। "ওহ, শালার বেকুবের বাচ্চারা।" তারপর উনি মুরসিলের দিকে তাকালেন। "না," বললেন উনি। "আমি পারবো না–আমি ওদের সাথে যাবো না। আমার খুব খারাপ লাগছে, ওনাকে বলবেন যে আমি অসুস্থ।"



সেলিনি ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে রাজার তাঁবু থেকে ভেসে আসা মাতাল চিৎকার আর হাসির আওয়াজ শুনতে পেল। নিজের খাটো আলখাল্লাটার নিচে ও আটা ভরা চামড়ার থলেটা, সিদ্ধ মাংস শুকিয়ে বানানো কয়েকটা কালো কাঠি, একটা ছোট মাটির রান্নার পাত্র লুকিয়ে রেখেছে। এখানে ওদের দুজনের জন্য চারদিনের খাবার আছে, ততোদিনে ওরা বিশাল নদীটা পেরিয়ে চলে যেতে পারবে আশা করা যায়। ওর ভয় করছে খুব, আবার একই সাথে পরম উল্লাস-ও বোধ করছে। প্রায় দুই বছর ধরে এই মুহূর্তটার পরিকল্পনা করছে ওরা, এখন অপেক্ষা করতে করতে ওর গোলগাল নিরাসক্ত চেহারাটার পেছনে অনেক অনেক আবেগ ছোটাছুটি করতে লাগল।

অবশেষে এল টিমন; চুপে চুপে আচমকা ও এমনভাবে সেলিনির পাশে উদয় হলো যে সেলিনি আঁতকে উঠলো ভয়ে। টিমন ওর হাত ধরে টেনে শিবিরের পরিসীমার বাইরে নিয়ে গেল। সেলিনি খেয়াল করল টিমনের পরনেও আলখাল্লা, একটা ধনুক আর একটা তূণীর সোজা হয়ে আছে কাঁধের পেছনে আর কোমরে একটা ছোট লোহার তরবারি আটকানো। এই সব অস্ত্রই দাসদের জন্য নিষিদ্ধ, এসব সহ ধরা পড়লে মৃত্যুই একমাত্র দণ্ড।

শিবিরের বেষ্টনীর দরজায় পাহারা দিচ্ছে দুজন রক্ষী, সেলিনি একটা সাহায্য চাওয়ার ছলে কথা বলতে গেল ওদের সাথে, পেছন থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে এল টিমন। খালি হাতে রক্ষী দুজনের ঘাড় মটকে দিল ও। দুই হাতে দুজনকে ধরে এমনভাবে ঝাঁকানি দিল যেভাবে একটা কুকুর ইঁদুরকে ধরে আছাড় দেয়। টুঁ শব্দটাও হলো না কোনো, তারপর ওদের নিথর দেহ আলতো ভাবে বেষ্টনীর দরজার পাশে শুইয়ে রেখে বেরিয়ে গেল ওরা।

হাতি শিকার করা পিরিচটা পেরিয়ে এল ওরা, মড়াখেকোদের হাঁকডাক আর চেঁচামেচিতে বীভৎস হয়ে আছে জায়গাটা। মাংস বা হাড়ের টুকরো নিয়ে মারামারি করছে হায়েনা আর শিয়াল। তরবারিটা চেপে ধরে সেলিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল টিমন, পেট ঝোলা হায়েনার দল পিছু নিল ওদের, কুঁই কুঁই করছে আর নাক টানছে, তবে নিরাপদেই গিরিপথটা পেরিয়ে উপত্যকার হাতি চলার পথে উঠে এল ওরা। চাঁদ প্রচুর আলো দিয়ে সাহায্য করছে, ফলে দ্রুত এগোতে সমস্যা হচ্ছে না। সামান্য বিশ্রাম আর খাবার পানি ভরে নেওয়ার জন্যে একটা খাঁড়ির কাছে একটু থেমে আবার ছুটলো ওরা উত্তর দিকে।

রাস্তায় মাঝে সিংহ পড়ল একটা। বিশাল একটা পুরুষ সিংহ যার পুরো দেহটা চাঁদের আলোয় ভৌতিক ধূসর লাগছিল দেখতে, ঘাড় ভরা অন্ধকার কেশর। ওরা পরস্পরের দিকে লম্বা একটা সময় তকিয়ে রইলো, তারপর মৃদু গরগর করে পথের পাশের ঝোপের আড়ালে চলে গেল সিংহটা। একটু আগেই খেয়েছে ওটা, দুটো মানবাকৃতি ওর আগ্রহ জাগাতে পারলো না।

চাঁদটার বয়স পূর্ণিমার পরে চারদিন, তারায় ছাওয়া আকাশ জুড়ে ঘুরে এসে অন্ধকার দিগন্তের ওপারে টুপ করে ডুবে গেল ওটা। চাঁদ ডোবার পরে শুধু তারার অস্পষ্ট আলোই থাকলো ওদেরকে পথ দেখানোর জন্য, রাস্তার মাঝের একটা খাড়া আর ভাঙা জায়গায় পা হড়কে আছড়ে পড়ল সেলিনি।

টিমন ওর আর্তনাদ শুনতে পেয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো। একপাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে সেলিনি, নরম গোঙানির শব্দ করছে।

"ব্যথা পেয়েছো?" ওর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসতে বসতে বলল টিমন।

"গোড়ালিতে," কোনোমতে বলল সেলিনি, যন্ত্রণায় গলার স্বর ফ্যাসফেসে হয়ে গিয়েছে। টিমন ওর পায়ে হাত দিল অবস্থা বোঝার জন্য। স্পর্শ করেই টের পেল গোড়ালিটা গরম হয়ে আছে, আরও ভালো করে ধরে বুঝলো যে ফুলে গিয়েছে জায়গাটা, একটা শক্ত উত্তপ্ত পিণ্ডে পরিণত হয়েছে গোড়ালিটা।

তরবারি দিয়ে টিমন ওর আলখাল্লাটা থেকে খানিকটা কাপড় কেটে নিল, তারপর হুইয়ের শেখানো পদ্ধতিতে শক্ত করে বেঁধে দিল সেলিনির গোড়ালিটা। ক্ষেপে গিয়ে তড়িঘড়ি করে কাজ করতে লাগল ও, এর মধ্যেই অজানা আশংকায় পেটের ভেতর মোচড়াতে শুরু করেছে।

সেলিনিকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল টিমন, কিন্তু আক্রান্ত পায়ে ভর দিতেই আর্তনাদ করে উঠলো ও।

"হাঁটতে পারবে তুমি?" জিজ্ঞস করল টিমন, সেলিনি ব্যথা চেপে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কয়েক পা এগোনোর চেষ্টা করল। ব্যথার চোটে হাফাচ্ছে ও, নিঃশ্বাস আটকে শোঁ শোঁ আওয়াজ হতে লাগল গলার ভেতর। শেষে টিমনকে ধরে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত মাথা নাড়তে লাগল।

"আমি পারবো না যেতে। আমাকে এখানেই রেখে চলে যাও।" টিমন ওকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের অস্ত্রশস্ত্র সব ফেলে দিল, সরিয়ে নিল সেলিনির জিনিসপত্রও। শুধু ছোট তরবারিটা রাখলো সাথে। দুটো চামড়ার আলখাল্লাকে একসাথে ভাজ করে, গিঁট দিয়ে সেলিনির বসার মত একটা ডুলি তৈরি করল টিমন। তারপর সেলিনিকে পরিয়ে দিয়ে সেটার দুই প্রান্ত নিজের গলা আর ঘাড়ের উপর দিয়ে বেঁধে নিয়ে তুলে নিল। সেলিনি টিমনের দুই হাতের উপর থাকলো, ও নিজেও দুই হাতে জড়িয়ে থাকলো টিমনের গলা। সেলিনির অর্ধেক ওজন বহন করছে টিমনের গলায় ঝুলতে

থাকা ডুলি। টিমন সামনে বাড়লো, উপত্যকার দিকে যে পথটা গিয়েছে সেদিকে এগোতে লাগল লম্বা পা ফেলে।

পরদিন সকাল নাগাদ ডুলির ঘষায় টিমনের ঘাড়ের চামড়া ছড়ে গেল, কালো চামড়ার ভেতর দিয়ে দেখা যেতে লাগল দগদগে গোলাপি ক্ষত। তাপ অনেক বাড়তি এখন, উপত্যকার প্রচণ্ড দাবদাহ ওর সর্বশেষ শক্তিটুকুও শুষে নিচ্ছে। টিমনের পদক্ষেপ থেকে চপলতা বিদায় নিয়েছে অনেক আগেই, এখন ও আর শারীরিক সামর্থ্যের জোরে হাঁটছে না, বরং ভেতরের উদ্দীপনার জোরেই টেনে টেনে এগোচ্ছে শুধু।

একটা ঘাসে ভরা উন্মুক্ত প্রান্তরের কাছে এসে থেমে দাঁড়িয়ে, একটা হোবা-হোবা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসল টিমন। মেয়েটার শরীর মাটিতে নামিয়ে রাখার সাহস করতে পারলো না, কারণ আবার ওকে তুলতে পারবে কিনা সেটা জানে না ও। সেলিনির ঠোঁট সাদা হয়ে গিয়েছে, শুকনো থুথু জমে আছে ঠোঁটের কিনারে, চোখ ভরে গিয়েছে টকটকে লাল শিরায়। প্রতি নিঃশ্বাসে ওর বুক উপরে উঠে ঝাঁকি মারছে।

"আমাকে রেখে চলে যাও, টিমন," ফিসফিসিয়ে বলল সেলিনি। "এভাবে আমরা দুইজনই মারা যাবো।"

টিমন কোনো উত্তর দিল না। অধৈর্যভাবে মাথা নেড়ে ওকে চুপ করতে ইশারা করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে শোনার চেষ্টা করতে লাগল। সেলিনিও শুনতে পেল সেটা, কুকুরের দলের দূর থেকে ভেসে আসা মৃদু গর্জন।

টিমন বলল, "এখন আর লাভ নেই।" তারপর দ্রুত দাঁড়ানোর জন্য একটা জায়গা খুঁজতে লাগল আশপাশে তাকিয়ে। কুকুরগুলোকে দৌড়ে হারানোর দুঃসাহস ওর নেই।

"তুমি চাইলে এখনও পালাতে পারবে," অনুনয় করল সেলিনি। "নদী আর বেশি দূরে নেই।"

"তোমাকে না নিয়ে কোথাও পালাবো না আমি," বলল টিমন, সেলিনি আবার টিমনের গলা জড়িয়ে ধরতেই ওকে আগের মত বয়ে, ঘাসের প্রান্তরের মাঝের একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে পাথরের চাঁই। ভাঙ্গাচোরা গ্রানাইট এমনভাবে ছিটিয়ে আছে যে, দেখে মনে হচ্ছে প্রাচীন কোনো ভাঙা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বুঝি।

টিমন পাথরের ভেতরে আলতো করে সেলিনিকে নামিয়ে, একটা চাঁইয়ে ঠেকিয়ে বসিয়ে দিল। নিজের আলখাল্লাটা ভাজ করে বালিশের মত বানিয়ে দিল মাথার পেছনে, তারপর পাশে উবু হয়ে বসে সেলিনির ঘাড় আর চেহারায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিতে লাগল, ওর মত বিশাল মানুষের জন্য এত মোলায়েম স্পর্শ আসলেই অবাক করার মত।

"ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলবে," বলল সেলিনি। "যারা পালায় ওদেরকে সবসময়ই মেরে ফেলে।"

টিমন কোনো উত্তর দিল না, আঙুল দিয়ে আস্তে করে টোকা দিতে লাগল সেলিনির গালে।

"ওরা আমাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপায়ে মারবে," মাথা ঘুরিয়ে টিমনের দিকে তাকিয়ে বলল সেলিনি। "আমরা যদি এখনই মারা যেতাম সেটাই ভালো হতো মনে হয়, কুকুরগুলো আসার আগেই, তাই না?" কিন্তু টিমন তবুও উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেলিনি আবার বলা শুরু করল।

"তোমার কাছে তো একটা তরবারি আছে, টিমন। ওটা ব্যবহার করবে না?"

"যদি ওই বেঁটে পুরোহিত ওদের সাথে থাকে, তাহলে আমাদের বাঁচার সুযোগ আছে একটা। রাজা ওনার কথা শোনেন–আর ওনার আর আমার মাঝেও একটা ব্যাপার আছে। একটা টান। উনি বাঁচাবেন আমাদেরকে।"

কুকুরগুলো আরও কাছিয়ে এসেছে এখন, সম্ভবত টিমনদের গায়ের গন্ধ আরও তীব্র হওয়ায় ঘেউ ঘেউ-এর আওয়াজও বেড়ে গেল অনেকগুণ। টিমন উঠে দাঁড়িয়ে, খাপ থেকে তরবারিটা বের করে হাতে নিয়ে পাথরের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পেছনের ঢালের দিকে তাকালো। আধা মাইল দূরে দেখা গেল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘাসের দঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করল কুকুরের দলটা। মোট তিরিশটার মত লম্বা বলিষ্ঠ কুকুর, লম্বা লম্বা পা আর গায়ে আদা রঙের রুক্ষ বাদামি পশম আর মাথা এবং দাঁত দেখতে নেকড়ের মত। নিজের শিকারকে ধাওয়া করে পেড়ে ফেলার প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়ে বড় করা হয় এদেরকে।

ওগুলোকে ঘাসের দঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে আসতে দেখে শিউরে উঠলো টিমন, মনে হলো যেন আপনাআপনি টানটান হয়ে গেল ওর চামড়া। কুকুরগুলোর পেছনেই, দলটার সাথে তাল রেখে ছুটছে ওদের প্রশিক্ষকরা, পরনে প্রশিক্ষকের সবুজ জামা আর কাঁধের উপর কুকুরের চাবুক।

তাদের পেছনে আসছে যুদ্ধ-হাতিগুলো, মোট পাঁচটা, ওগুলোর পালকিতে বসে আছে সৈনিক আর দাস-সর্দাররা। হাতিগুলো কুকুরের দলটাকে অনুসরণ করে, সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিতে এগোচ্ছে, এভাবে করে দিনে পঞ্চাশ মাইল সহজেই পার হতে পারবে।

টিমন চোখের উপর হাত দিয়ে পালকির লোকগুলোর ভেতরে পুরোহিতের বিশিষ্ট অবয়বটা দেখা যায় কিনা সেই চেষ্টা করতে লাগল। ওরা এখনও অনেক দূরে যদিও, কিন্তু কুকুরগুলো কাছিয়ে আসছে দ্রুত।

বাম হাতে নিজের আলখাল্লাটা খুব ভালোভাবে পেঁচিয়ে নিল ও, তরবারিটাও চেপে ধরলো আরও জোরে। তারপর অস্ত্রটা হালকাভাবে নেড়ে চেড়ে একটু ঢিল দিয়ে নিল নিজের পেশীগুলোয়।

সামনের কুকুরগুলো পাথরের মাঝে দেখতে পেল টিমনকে, সাথে সাথে নিয়মিত ছন্দের ঘেউ ঘেউ পরিণত হলো উত্তেজিত গোঙানিতে। দৌড়ে সামনে বাড়ার সময় ওদের কান লেপ্টে গেল খুলির সাথে, চোয়ালের ফাঁকের

নেকড়ের মত দাঁতগুলোর উপর দিয়ে লকলক করে বেরিয়ে আছে গোলাপি জিহ্বাটা। টিমনের সামনে এসে ছড়িয়ে পড়ল পরস্পর থেকে দূরে।

টিমন পেছনের উন্মুক্ত জায়গায় সরে এল, যেখানে সেলিনিকে শুইয়ে রেখেছিল, ভয়ানক গর্জন করতে থাকা বাদামি শরীরগুলো থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে সেলিনিকে।

প্রথম কুকুরটা ছুটে এল ওর দিকে, চোয়াল খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। টিমনের চেহারা তাক করে লাফ দিল ওটা।

কুকুরটার জায়গামতো পোঁচ বসিয়ে দিল টিমন, গলার ঠিক গোঁড়ায়, সাথে সাথে মারা গেল কুকুরটা, কিন্তু গলা থেকে তরবারি বের করার আগেই লাফিয়ে এল আরেকটা। আলখাল্লায় মোড়া হাতটা কুকুরটার চোয়ালে চালিয়ে, অন্য হাতে ফুটো করে দিল ধেয়ে আসা তৃতীয় কুকুরটাকে।

ঝাঁকে ঝাঁকে টিমনের উপর আক্রমণ করতে লাগল কুকুরগুলো, ও একের পর এক কোপ, খোঁচা আর হাত দিয়ে বাড়ি দিয়ে কোনোমতে আটকাতে লাগল সেগুলো। হাত ধরে ঝুলে থাকা একটা কুকুরকে পাশের একটা পাথরে আছাড় দিল টিমন, পাঁজরের হাড় ভেঙে গেল ওটার, কিন্তু আরেকটা এসে পায়ে কামড় দিয়ে ধরে নিষ্ঠুরভাবে ওকে টেনে ভারসাম্যহীন করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। তরবারির মাথা কুকুরটার রোমশ পিঠে ঢুকিয়ে দিল ও, ওটা আর্তনাদ করে উঠে ছেড়ে দিল ওকে।

আরও একটা কুকুর টিমনের চেহারা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল আর ও তরবারির হাতল দিয়ে বাড়ি দিল ওটার মাথায়। বিশাল লোমশ একটা শরীর ধাক্কা খেলো ওর বুকে, সেই সাথে একটা দাঁত ছিড়ে দিল কাঁধের মাংসপেশীকে।

কুকুরগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি, টিমন পেরে উঠছিল না ওগুলোর সাথে, সারা দেহে কামড়ে-আচড়ে অস্থির করে দিতে লাগল ওকে, শক্তি আর ওজন দিয়ে ধাক্কা মেরে দম বের করে দিতে লাগল। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল টিমন, মুখ থেকে দুর্গন্ধময় লালা ঝরতে থাকা একটা কুকুরকে এক হাতে ধরে, নিজের গলা আর চেহারা থেকে দূরে রেখে গলা টিপে মারার চেষ্টা করছে—কিন্তু টের পেল যে পিঠ, পেট আর উরুতেও চেপে বসেছে আরও অনেকগুলো দাঁত।

হঠাৎ করেই হাজির হলো কুকুরের প্রশিক্ষকরা, চাবুক মেরে টিমনের উপর থেকে সরিয়ে দিল কুকুরের দলকে, তারপর চিৎকার করে নাম ধরে ধরে জানোয়ারগুলোকে ডেকে নিয়ে গলায় বেড়ি পরিয়ে দিল।

ধীরে ধীরে আবার নিজেকে নিজের পায়ে দাঁড় করালো টিমন। তরবারিটা হাতে নেই আর, ওর চকচকে কালো শরীরটা ভরা গভীর ক্ষত আর আচড় থেকে বেয়ে বেয়ে পড়ছে রক্ত।

মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকা যুদ্ধ-হাতিগুলোর দিকে তাকালো ও। শিকারিদের মাঝে বেন-আমনকে দেখতে না পেয়ে সর্বশেষ আশাটুকুও

মিলিয়ে গেল ওর–তবে লানন হাইকানাসকে দেখা গেল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

"ভালোই খেল দেখালি," হাসলেন লানন। "আমি তো ভেবেছিলাম নদী পার হয়ে গিয়েছিস বুঝি।" উনি লাননকে ছাড়িয়ে সেলিনি যেখানে শুয়ে আছে সেখানে তাকালেন। "শিকার-সর্দারদের কথাই ঠিক দেখছি। ওরা লক্ষণ দেখেই বলে দিয়েছিল যে মেয়েটা পায়ে ব্যথা পেয়েছে আর তুই ওকে বয়ে নিয়ে আসছিস। মহান একটা কাজ, একজন বর্বরের জন্য যেটা খুবই অস্বাভাবিক। তবে সবকিছুর জন্য তোকেই ভুগতে হবে।" বলে লানন ওনার একজন দাস-সর্দারের দিকে তাকালেন। "ওদেরকে সাথে নিয়ে গিয়ে খুব বেশি লাভ হবে না, এখানেই কাজ সেরে ফেলো।"

টিমন রাজার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত পরিষ্কার গলায় কথা বলা শুরু করল।

"আমি আপনার বন্ধুর ভালোবাসার জ্যান্ত প্রতীক," বলল ও, কথাগুলো মনে পড়তেই লানন মাথা নাড়তে লাগলেন। ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল ওনার, উনি তাকিয়ে থাকলেন রক্তাক্ত দাস-রাজার দিকে, সোজা ওর ধোঁয়াটে হলুদ চোখের দিকে। দীর্ঘ কয়েকটা সেকেন্ড জীবন মৃত্যুর দোলাচালে দুলতে লাগল টিমনের ভাগ্য, তারপর আচমকাই লাননের চোখ টিমনের চোখ থেকে নেমে গেল নিচে।

"ঠিক আছে," মাথা ঝাঁকালেন উনি। "আমার বন্ধুর প্রতি দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিলি তুই। আমি সেটাকে সম্মান করবো, কিন্তু কসম করে বলছি আজীবন এই কথাগুলো বলার মুহূর্তকে অভিশাপ দিয়ে বেঁচে থাকবি তুই। তুই বাঁচবি–কিন্তু সারাজীবন মৃত্যুর স্বাদকেই মধুর বলে মনে করবি।" লাননের চেহারা ঠান্ডা রাগে ভরে আছে, উনি ওনার দাস-সর্দারদের দিকে ফিরলেন। "এই লোকটাকে মারা যাবে না, কিন্তু এখন থেকে ও হলো সংশোধনাতীত। দুই ট্যালেন্ট ওজনের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখো ওকে।" এর মানে হলো, প্রায় দুইশো পাউন্ড ওজনের শেকল দিন রাত সর্বক্ষণ বয়ে বেড়াতে হবে, জেগে থাক আর ঘুমিয়ে থাক। "ওকে হুলয়ার খনিতে পাঠিয়ে দাও, ওখানের তত্ত্বাবধায়ককে বলে দেবে, একে যেন সবচে গভীর স্তরে কাজ করানো হয়।"

বলতে বলতে টিমনের চেহারার দিকে খেয়াল করতে লাগলেন লানন। "এই মেয়েটা আমার নিরাপত্তা আর পাবে না। তবে যাই হোক, আমরা ওকে আমাদের সাথেই নিয়ে যাবো। একটা যুদ্ধ-হাতির পালকির সাথে শেকলে বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে চলো।"

প্রথমবারের মত টিমনের মাঝে আবেগ দেখা গেল। এক পা এগিয়ে এসে একটা বাজেভাবে আহত হাত তুলে ধরলো অনুনয়ের ভঙ্গিতে, খুবলে আসা কালো মাংস ঝুলছে ওটা থেকে।

"জাঁহাপনা, মেয়েটার খুবই আহত। ও হাঁটতে পারবে না।"

"হাঁটবে হাঁটবে," বললেন লানন। "না পারলে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তুই হাতির উপর বসে বসে ওকে উৎসাহ দিবি। তখন ভাবার অনেক

সময় পাবি, যে আরামের মৃত্যু আমি তোকে দিতে চেয়াছিলাম সেটার চাইতে যে জীবন তুই চেয়ে নিলি সেটা আসলে কতটা বুদ্ধির কাজ হয়েছে।"

ওরা সেলিনির কবজিতে বিশ পেস লম্বা হালকা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। দড়ির অন্য প্রান্তটা বাঁধা হলো হাতির উপরের পালকির পেছনের দেওয়ালে।

গলায় আর গোড়ালিতে ওই প্রকাণ্ড শেকল পরিয়ে, টিমনকে বসানো হলো পালকিতে, মুখ ফিরিয়ে দেওয়া হলো যেদিকে সেলিনি এক পায়ে ভর দিয়ে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে বেঢপভাবে ফোলা গোড়ালিটাকে একটু আরাম দেওয়ার চেষ্টা করছে সেদিকে। সেলিনির চেহারা ব্যথায় মলিন হয়ে আছে, তবুও টিমনের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল ও।

হাতিটা সামনে বাড়া মাত্র দড়িতে ঝাঁকি লেগে টান খেয়ে শক্ত মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেলিনি, সেখানে আছে আবার ধারালো পাথর আর ক্ষুরের মত ধারালো ঘাসের রুক্ষ গোছা। প্রায় পঞ্চাশ পেস হেঁচড়ে টেনে নেওয়ার পর আবার ও কোনোমতে নিজের পায়ের উপর উঠে দাঁড়াতে পারলো, লম্বা পা ফেলে চলতে থাকা হাতিটার সাথে তাল রাখতে, লাফাতে লাফাতে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে এগোতে লাগল তারপর। ওর হাঁটু আর কনুই ছড়ে গিয়েছে, পেট আর স্তন জুড়েও দেখা যাচ্ছে আঁচড়ের দাগ।

প্রায় ডজনখানেক বার ও পড়ে গেল আবার উঠে দাঁড়ালো, প্রতিবার আরও বেশি ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল ওর দেহ। সূর্যাস্তের কিছু আগে শেষ বারের মত পড়ে গেল সেলিনি।

পালকিতে শেকলবন্দী অবস্থায় বসে, মনে মনে একটা শপথ নিল টিমন। সেলিনির নিথর দেহটা রুক্ষ মাটির উপর লাফিয়ে লাফিয়ে হেচড়ে আসতে আসতে আফ্রিকার লাল মাটির উপর একটা ভেজা বাদামি দাগ তৈরি করতে লাগল, তা দেখে রাগ, ক্ষোভ আর বেদনার ভেতরে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা শপথ নিল ও। তারপর কাঁদতে লাগল, জীবনে শেষবারের মত অশ্রু ঝরলো টিমনের চোখ দিয়ে। অশ্রুধারা চেহারা আর গাল বেয়ে নিচে পড়ে, মিশে যেতে লাগল ওর সারা দেহে আস্তরণ তৈরি করে রাখা রক্ত আর ধুলোর সাথে।



হুই নিজের পছন্দের একটা জগ থেকে ওয়াইনের পেয়ালাটা ভরে নিলেন, খুব বিশেষ কোনো উপলক্ষের জন্য আলাদা করে রেখেছিলেন সেটা। কাজ করতে করতে নিজের মনে গুনগুন করছেন উনি, হঠাৎ একটা মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার ঠোঁটে, ঝিলিক দিয়ে উঠলো কালো চোখজোড়া।

মাঝরাতে ওপেটে ফিরে এসেছেন উনি, পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন, তারপর গোসল করে সবচেয়ে ভালো পোশাকটা পরে, একজন দাসকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন ওপেটের দৈবদ্রষ্টাকে ওনার সাথে দেখা করতে আসতে বলার জন্য। বিশাল নদীটার ধারের পাহাড়ের ঢালে কাটানো গত কয়েক সপ্তাহের রক্ত আর শিকারের নেশা এখন তানিথের সাথে দেখা হওয়ার দুশ্চিন্তায় কেটে গিয়েছে পুরোপুরি। ভুলে যাওয়ার মাঝে আরও আছে যুদ্ধ-হাতির পেছনে হেঁচড়ে হেঁচড়ে ক্যাম্পে নিয়ে আসা সেলিনির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহের কথা, প্রকাণ্ড শেকল আর দুঃখের ভারে ন্যুজমান হয়ে পড়া টিমনের বিশাল দেহটা, দাস-সর্দাররা টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযোগ নিয়ে তাকিয়ে থাকা ওর ভয়ানক চোখজোড়া, হাতকড়া পরা কবজি দুটো তুলে করা ভঙ্গিটা–যেটা আসলে হুমকি নাকি ক্ষমা প্রার্থনা ধরতে পারার আগেই দাস-সর্দারদের চাবুক হিসহিস করে ওই বেগুনি কালো পিঠের উপর আছড়ে পড়ে মানুষের আঙুলের সমান মোটা একটা দাগ করে দিল, কিন্তু চামড়া কাটলো না। এসব দেখার পর এই প্রথম ছুই দৃশ্যটা মাথা থেকে সরাতে পারলেন, ভালোবাসার মানুষের সাথে দেখা হওয়ার খুশিতে ওনার সমগ্র সত্তা উচ্চকিত হয়ে আছে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে ধরে উনি ওয়াইনের পেয়ালায় নীল রঙা কাঁচের ছোট বোতলটা থেকে চার ফোঁটা পরিষ্কার তরল ঢেলে দিলেন। বোতলের মুখ বন্ধ করে তর্জনী দিয়ে ওয়াইনটা নেড়ে নিয়ে তারপর চুষে দেখলেন আঙুলটা। তাতে গাজার হালকা ঘ্রাণ পেয়ে কুচকে ফেললেন নাক। গন্ধটা ঢাকতে একটু বুনো মধু যোগ করলেন মিশ্রণে, আরও একবার চেখে দেখে, সন্তুষ্ট হয়ে একগাদা গদির পাশে রাখা একটা কাঠের টুলের উপর রেখে দিলেন পেয়ালাটা। ওখানে এক থালা পিঠা আর মিষ্টান্ন রাখা আছে আগেই। ছুই ওয়াইনের পেয়ালাটা একটা রেশমি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন, তারপর সন্তুষ্ট চোখে প্রস্তুতির দিকে নজর বুলালেন আবার। সব শেষে নিজের লুটটা নিয়ে ছাদে উঠে, বসায় জায়গাটায় গিয়ে বসলেন স্থির হয়ে। বাদ্যযন্ত্রটার তার টানটান করে এলোমেলো বাজাতে লাগলেন, গলা আর আঙুল দুটোই ঢিল দিয়েছেন, তাকিয়ে আছেন সদর দরজার সামনের সরু গলিটার দিকে।

সকালের উজ্জ্বল আলোয় হ্রদের পানি দেখতে চেরির মত নীল লাগছে, আকাশের নীলের চাইতে সামান্য একটু বেশি। বাতাসের ধাক্কায় ছোট ছোট ঢেউ উঠে পানির উপরিভাগকে নেড়ে দিচ্ছে, হাব্বাকুক লালের একটা বাণিজ্য জাহাজকে দেখা গেল দাঁড় বেয়ে ছুটে আসছে বন্দরের দিকে, ওটার বিশাল পালটা গুটিয়ে রাখা হয়েছে। সামুদ্রিক পাখিরা উড়ে আসছে পিছু পিছু, ওটার মাস্তুলের চারপাশে ঘুরছে, চড়ে বসছে।

হ্রদের অনেক উপরে, মধ্যদিনের মেঘ ধীরে ধীরে স্তম্ভ তৈরি করছে, তৈরি হচ্ছে কালো কালো ঝড়ের মাথা। সূর্যাস্তের আগে বৃষ্টি হবে আজ, অনুমান

করলেন হুই, চামড়ার উপরে কাপড়ের স্পর্শে আর দাঁড়ির বেণীতেও বাতসের আর্দ্রতা টের পাচ্ছেন।

গলিটায় দুটো অবয়ব দৃশ্যমান হলো, এগিয়ে আসছে দরজার দিকে, সাথে সাথে দম আটকে গেল ওনার, আঙুলগুলো-ও যেন অসাড় হয়ে থেমে গেল সুর তোলা। ওদের পরনে অ্যাসটার্টের যাজিকাদের বাইরের যাওয়ার জন্য নির্ধারিত গাঢ় বাদামি রঙের ঘোমটাঅলা আলখাল্লা। এত ভারি পোশাকও সামনের দ্রুত চলমান অবয়বটার চপল পদক্ষেপ আর উল্লসিত গমনভঙ্গি বা পেছনের কুঁজো হয়ে থাকা অবয়বটার বয়স অথবা সামনের জনের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে দুর্দশার কথা লুকাতে পারছে না। বুড়ি মহিলাটা হাফাতে হাফাতে গলায় যতটা সম্ভব জোর দিয়ে চেঁচাচ্ছে।

"আম্মা গো, আস্তে যান! দোহাই লাগে!" শুনে হুই মুখ টিপে হাসলেন। একজন দাস খুলে দিল দরজা, ওরা উঠোনটা পেরিয়ে আসতেই হুই লুট-এ একটা রাশভারি সুর তুললেন, জায়গায় জমে গেল তানিথ। বুড়ি সঙ্গী সেটা শুনতে পায়নি, সে বিড়বিড় করতে করতে বকতে বকতে ঢুকে গেল ভেতরে আর তানিথ তাকিয়ে রইলো ছাদের উপরে বসে থাকা হুইয়ের দিকে।

হুই গাইতে শুরু করলেন, নিচে দাঁড়ানো মেয়েটা চেহারার উপর থেকে ঘোমটা সরিয়ে কাঁধের উপর ফেলে, মাথা ঝাড়া দিয়ে চুলগুলো খুলে দিয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলো ওনার দিকে। ওর মুখভঙ্গি প্রশান্ত আর আবিষ্ট। ওই বিজন প্রান্তরে লেখা গানটাই গাইতে লাগলেন হুই, স্বর্ণের বইতে খোদাই করে তানিথকে নিয়ে লিখেছিলেন যে গানটা। এই মিষ্টি সকালে গানের সর্বশেষ টানটা দিয়ে শেষ করতেই পুরো লাল হয়ে গেল তানিথের গাল আর কাঁপতে লাগল ঠোঁটজোড়া।

হুই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে ওর কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন, তবে স্পর্শ করলেন না।

"তুমি আমার আত্মা," নরম সুরে বললেন উনি, তানিথ ওনাকে এমনভাবে শাসন করতে লাগল যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরের কোনো শক্তি প্রভাব বিস্তার করেছে ওর উপর।

"মহানুভব, যেখানে অন্য কারো আমাদেরকে দেখে ফেলার ভয় থাকে সেখানে এভাবে আমাকে গান গেয়ে স্বাগতম জানানো ঠিক হবে না। আমার ভয় হয় যে, ওদের শয়তানির কাছে না আমার ভালোবাসাকে বিসর্জন দিতে হয়। আর একটু ভেবে-চিন্তে কাজ করেন।"

হুই তানিথের কনুই স্পর্শ করে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। হুইয়ের ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে হুইকে ধরে সামলে নিল তানিথ, তবে তাকে ছাড়লো না।

"ওহ! আমার আর তর সইছে না," বলল ও, উত্তর দিতে গিয়ে হুইয়ের গলাও কেঁপে উঠলো।

"একটু পরেই, প্রিয়তমা। আর একটু পরে।"

বুড়ি যাজিকা এর মাঝেই গদির উপর বসে পড়েছে, দাঁতহীন মাড়ি দিয়ে পিঠা চিবুচ্ছে একটা, আলখাল্লা জুড়ে লেগে আছে পিঠার গুঁড়ো। থুথু ছিটাচ্ছে আর নিজের ব্যথা এবং দুর্দশা নিয়ে তিক্ত স্বরে বিলাপ করে যাচ্ছে।

হুই ওর পেছনে গিয়ে, আগে থেকে বানিয়ে রাখা ওয়াইনের পাত্রটা তুলে নিলেন দুই হাতে। বুড়ি যাজিকার কানে না শোনার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জিজ্ঞেস করলেন, "এর গায়ে শক্তি কেমন?"

"পুরুষ মানুষের সমান জোর," বলে হাসলো তানিথ। "যদিও স্বীকার করে না।"

"বুকে ব্যথা বার শ্বাসকষ্টের কথা কখনো বলেছে কিছু?"

"না তো," কৌতূহলী হয়ে উঠলো তানিথ। "কেন জিজ্ঞেস করছেন?"

"আমি ওর ওয়াইনে একটু চরস মিশিয়ে দিয়েছি," ব্যাখ্যা করলেন হুই। "তবে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ুক, সেটা চাই না।"

তানিথের মুখের হাসি চওড়া হলো আরও, ওর চোখের গভীর সবুজও প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো তাতে, এতক্ষণে দেখা গেল ঝকঝকে দাঁতের হাসি। "ওহ, মহানুভব, আপনার এত বুদ্ধি কেন!" হাতে তালি দিয়ে উঠলো ও, বাচ্চাদের মত একটা ভঙ্গি, যা সবসময়ই হুইয়ের অন্তরাত্মা পর্যন্ত স্পর্শ করে যায়।

"কয় ফোঁটা?" জানতে চাইলো তানিথ।

"চার," জানালেন হুই।

"আরও কয়েক ফোঁটা হলেও সমস্যা নেই," বলল তানিথ। "কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেল আপনার সাথে দেখা হয়নি। কত আলোচনা করা বাকি।"

পুরো কথোপকথন চলার সময় বৃদ্ধ যাজিকা এমন বুদ্ধিমান ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল যেন সে প্রতিটা শব্দ বুঝতে পারেছে। হুই এক মুহূর্ত পরখ করলেন ওকে, তারপর জোর করে দমন করলেন ইচ্ছাটা।

"না," বললেন উনি। "চার ফোঁটাই যথেষ্ট।" তারপর পেছন থেকে ঘুরে চলে এলেন যাজিকার সামনে। কোঁচকানো চামড়ায় ভরা বানরের মত মুখটা চওড়া একটা দাঁতহীন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। হাড় জিরজিরে হাতটা বাড়িয়ে পাত্রটা নিয়ে নিল সে, হাত ভরে বুড়োদের গায়ের জড়ুল আর নীলচে শিরা স্পষ্ট হয়ে আছে।

"আপনি অনেক দয়ালু, মাননীয়।" মন থেকেই বলল যাজিকা।

ওনারা দুজন ওর সামনেই বসলেন, কথা বলতে বলতে উদ্বিগ্ন চোখে নজর রাখতে লাগলেন ওর দিকে। বৃদ্ধা সেই সুখে আছে, ওয়াইনে চুমুক দিচ্ছে তারপর গড়গড় করে মুখের ভেতর কুলি করে গিলে ফেলে টাকরায় জিভ দিয়ে শব্দ করছে।

“গত কয়েকদিন, আমাদের ভেতর যা যা হয়েছে তা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছি,” বললেন হুই, তানিথের দিকে তাকাচ্ছেন না।

“আমিও এর বাইরে ভাবিনি কিছু।”

“দেবতাদের প্রতি জীবন উৎসর্গ করে দেওয়া একজন মানুষ হিসেবে, আমি আসলে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম যে আমরা ওনাদের আদেশের বিরুদ্ধে পাপ করে ফেলেছি কিনা,” হুই বললেন ওকে।

“যে জিনিসে এত সুখ আর আনন্দ, তাতে কোনো পাপ থাকতে পারে না।”

“আমি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম আমার জন্য একটা পরীক্ষার আয়োজন করতে, আমার পাপের একটা বিচার আরকি।” হুই এখনও তাকাননি তানিথের দিকে, কিন্তু তানিথ কড়া চোখে তাকালো ওনার দিকে, কথা বলার সময় কাটা কাটা হয়ে গেল ওর গলার স্বর।

“আপনি গাধার মত কোনো ঝুঁকি নিতে যাননি তো আবার?”

“বিচারটা ছিল পক্ষপাতহীন–দেবতারা কোনো প্রতারণার আশ্রয় নেননি।” হুই চাচ্ছিলেন তানিথ ব্যাপারটা বুঝুক, কিন্তু তানিথ একটু বেশিই বুঝে ফেলল।

“আমি আপনাকে বলেছিলাম এসব পুরুষ মানুষের পাগলামিগুলো না করতে। ওই জঙ্গলের ভেতরে আপনি কোনো পাগলামি করছেন এই চিন্তাটা আসতেই তো আমার হাত-পা কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যাচ্ছে।” রেগে গিয়েছে এখন তানিথ।

“এটার দরকার ছিল। ওনাদেরকে ওনাদের ক্রোধ প্রকাশের একটা সুযোগ দেওয়া দরকার ছিল।”

“ওনারা চাইলেই বজ্রপাত বা মাথার উপর গাছ ফেলে দিয়েই যে কোনো মুহূর্তে ক্রোধ প্রকাশ করতে পারেন! আমি চাই না আপনার ক্ষতি করার জন্য আপনি ওনাদেরকে খোঁচাখুঁচি করেন।”

“তানিথ, আমার কথাটা তো আগে–”

“বোঝা যাচ্ছে, মহানুভব, ভবিষ্যতে আপনাকে অনেক কড়া শাসনে রাখতে হবে। আমি একজন প্রেমিক চাই, বীর না।”

“কিন্তু তানিথ, দেবতাদের রায় আমার পক্ষেই ছিল। দেখতে কি পাচ্ছো না? এখন আর আমাদের কোনো অপরাধবোধ আসবে না।”

“আমার কখনোই কোনো অপরাধবোধ ছিল না। কিন্তু, মহানুভব, এরপরেও যদি অপ্রয়োজনে আপনি জীবনের ঝুঁকি নেন, তাহলে দেবতাদের পাশাপাশি আমার ক্রোধকেও কিন্তু আপনাকে সামলাতে হবে।”

হুই ওর দিকে ফিরে মিথ্যা দুঃখের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন।

“ওহ তানিথ, তুমি না থাকলে আমার যে কী হবে!” আর তানিথের শক্ত চেহারা নরম হলো একটু।

"মহানুভব, সেই প্রশ্ন কখনো উঠবে না।" ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ি যাজিকার আঙুল থেকে খসে পড়ল খালি ওয়াইনের পেয়ালা, তারপর একটা কানার উপর ভর করে মাটির মেঝেতে পাক খেতে লাগল সেটা। আস্তে আস্তে ওটার ঘোরার পরিধি কমতে কমতে, শেষে কেঁপে কেঁপে থেমে গেল একসময়। একটা পরিতুষ্ট ঢেকুর তুলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল যাজিকা। হুই আলতো করে তাকে ধরে ফেলে আবার পেছন দিকে হেলিয়ে শুইয়ে দিলেন গদিতে। সোজা করে শুইয়ে গায়ের আলখাল্লা টেনে ঠিক করে দিলেন। মহিলা ঘুমের মাঝেই হাসছে, বিড়বিড় করছে আবার শিস-ও দিচ্ছে।

হুই সোজা হয়ে দাঁড়াতেই, তানিথ ওনার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। দুজন দুজনের দিকে ফিরে জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে, ধীরে ধীরে সতর্কতার সাথে তানিথের ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেন হুই। ওর ঠোঁটজোড়া কেমন চটচটে লাগল, ঠান্ডা আর শক্ত হয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। তানিথের একগোছা নরম চুল এসে পড়ল হুইয়ের গালে, আস্তে আস্তে ওর শরীর শক্ত করে চেপে বসল ওনার শরীরে।

"তানিথ," অস্ফুটে বললেন উনি। "ওহ তানিথ, তোমাকে যে কত কথা বলতে ইচ্ছে করে।"

"মহানুভব, আপনার গলার চাইতে সুন্দর কণ্ঠ আমি আর কারো শুনিনি। পুরো চার সাম্রাজ্য জুড়ে আপনার জ্ঞান আর পাণ্ডিত্যের কথা বলে বেড়ায় সবাই–কিন্তু দয়া করে এখন কোনো কথা বলবেন না।"

তানিথ আলতো করে নিজেকে ওনার আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল, তারপর হাত ধরে আস্তে করে টেনে নিয়ে গেল ঘর থেকে।



পরবর্তী কয়েক মাসে, তানিথের পরিচারিকার হুইয়ের ওয়াইনের প্রতি এক আজব আসক্তি গড়ে উঠলো। মন্দিরের ভোজনোৎসবের সময় যে পানীয় খেতে দেওয়া হতো, সেটার বাজে মান সম্পর্কে প্রকাশ্যে বলা শুরু করল, এটার সাথে হুইয়ের ঘরের ওয়াইনের সবচেয়ে জঘন্যভাবে তুলনা করতে লাগল, তবে কথার শেষে সবসময় শ্রদ্ধেয় পুরোহিতকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে ভুলতো না।

"এ যেন এক স্বপ্ন," শ্রোতাদেরকে বলত ও। "অন্যরা যেরকম আবোলতাবোল করে বেড়ায় উনি মোটেও সেরকম না। রাস্তাফা বেন-আমন সম্পর্কে কি বলেছি নাকি তোমাদেরকে? চুয়াল্লিশতম গ্রাই-লায়নের আমলে

আমি যখন নবিস ছিলাম তখনকার সময়ের প্রধান পুরোহিত। কি যে করতেন উনি!” ওর বৃদ্ধ চোখ আরও খানিকটা ঘোলা হয়ে যেত, ঠোঁটের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়তো লালা।

“ওনার কথা ছিল, পান করো!” ক্ষিপ্ত কণ্ঠে রাস্তাফা নকল করার চেষ্টা করল বুড়ি। “লড়াই করো! আরও যত আকাজ আছে সব।” তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলল। “ভয়ানক মানুষ ছিল উনি, বাবা!” তারপর নিজের পুরনো স্মৃতিকাতরতায় হেসে ফেলল স্নেহময় ভঙ্গিতে।



গলিত আলকাতরা দিয়ে চামড়ার নলগুলো একটার সাথে আরেকটা আটকানো, তার ভেতর থেকে হালকা দমকে বেরিয়ে আসছে বাতাস, যেন কোনো মুমূর্ষু ডাইনোসর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। মাটির উপরের বিশাল বিশাল হাপর থাকার পরেও সত্তর ফুট নিচের জায়গাটায় স্বাভাবিক বাতাস চলাচলের সম্পূর্ণ গতিই হারিয়ে গিয়েছে।

টিমন ঘর্মাক্ত পাথরের উপর হেলান দিয়ে বসে, নলটার মুখে নিজের চেহারা চেপে ধরে আছে। মাটির নিচের কর্মশালার এই নারকীয় উত্তাপ আর গন্ধকময় পরিবেশের ভেতরেই, চেষ্টা করে যাচ্ছে বাতাসের এই ক্ষীণ ধারা থেকে হাঁ করে যতটা সম্ভব গ্রহণ করার। শুকিয়ে কাঠি হয়ে গিয়েছে ও, কালো চামড়ার নিচে পাঁজরের প্রতিটা হাড় স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রতিটা পেশী তন্তু ফুটে বেরিয়ে আছে। মাথাটা দেখতে এখন হয়ে গিয়েছে কংকালের মাথার মত, চোয়ালের হাড্ডি বেরিয়ে আছে বিকটভাবে, চোখের কোটর ঢুকে গিয়েছে অনেক ভেতরে, তবে সেখানে ওর অদম্য প্রাণশক্তির গনগনে আভা তখনও জ্বলজ্বল করছে।

নিরলস পরিশ্রম আর তাপের কারণে ওর সব অতিরিক্ত মাংস আর চর্বি পুড়ে ঝরে গিয়েছে গা থেকে। এখনও ওর চামড়ার ছিদ্র থেকে ঘামের সারি বেরিয়ে এসে পিঠ আর পাঁজর জুড়ে দগদগে হয়ে থাকা ক্ষতের দাগগুলোকে ফুটিয়ে তুলছে–হাত আর পা জুড়েও এরকম অসংখ্য নকশা, কিছু ক্ষত অনেক আগেই পুরু হয়ে ফুলে উঠেছে বা দগদগে ঘায়ে পরিণত হয়েছে, কিছু ক্ষত একদম তরতাজা আর গোলাপি, কিছু কিছুতে এখনও মামড়ি হয়ে আছে, কলতানি ঝরছে তা থেকে। ঘাড়, কবজি আর গোড়ালি থেকে ঢিলেঢালাভাবে ঝুলছে শেকলের গোছা। ওগুলোর ঘষায় ওর ঘাড় আর হাতে পায়ে কালো কালো গোল আর শক্ত কড়া পড়ে গিয়েছে, দাসত্বের এই চিহ্ন কবর পর্যন্ত বয়ে বেড়াতে হবে ওকে।

টান দিয়ে বাতাসটা চুষে নেওয়ার চেষ্টা করল টিমন, ধড়াস ধড়াস করছে ওর বুক, বিশাল হয়ে ফুলে উঠছে, আবার নেমে আসছে, চামড়ার নিচের পাঁজরের হাড় ওঠা নামা করছে পাখার মত করে। মনে হচ্ছে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে তাপ, ওর চেহারার কাছের পাথর তখনও গনগনে হয়ে আছে, যদিও বহু আগেই আগুন নিভে গিয়ে পুরু ছাই-এর আস্তরণে পরিণত হয়েছে।

গত পাঁচ দিন ধরে, স্বর্ণের শৈলশিরার মুখ আটকে রাখা, এই শক্ত আঁকাবাঁকা সবুজ পাথরের বেরিয়ে থাকা অংশটাকে ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। এখন পর্যন্ত ষোলোজন মারা গিয়েছে এই প্রচেষ্টায়। কেউ মরেছে ধোঁয়া আর বাষ্পে দম বন্ধ হয়ে, কেউবা বিস্ফোরিত পাথরের উড়ন্ত টুকরোর আঘাতে অথবা অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে গনগনে মেঝেতে পড়ে গিয়েছে, তাদের মাংস উত্তপ্ত পাথরের সাথে লেগে হিসহিস শব্দ করে আটকে গিয়েছে মেঝের সাথেই, তারপর টান লাগতেই ওদের হাড় থেকে পোড়া গন্ধযুক্ত তাল হয়ে উঠে এসেছে।

মাথার উপরের খোলা জায়গাটা থেকে, পাকানো নলখাগড়ার রশিতে ঝুলিয়ে বিশাল একটা পানির থলে নামিয়ে দেওয়া হলো ওর দিকে। একটা ষাঁড়ের গোটা চামড়াটা দিয়ে বানানো সেটা, সাবধানে জোড়াগুলো সেলাই করে, সেখানে আলকাতরা ঢেলে পানিরোধী করে দেওয়া হয়েছে। এর একটাতে চল্লিশ গ্যালন তরল আঁটে, তরলটা হলো টক ওয়াইন আর পানির মিশ্রণ।

পাশে রাখা কাঠের পাত্রের নোংরা গরম পানিতে নিজের চামড়ার আলখাল্লাটা ভিজিয়ে নিল টিমন, তারপর একটা একটা করে নিজের পা-ও তুলে চুবিয়ে নিল পাত্রের ভেতর, ওর চামড়ার পায়জামা আর চপ্পলটাও ভিজিয়ে নিল তাতে। ওর চপ্পলের তলাটা স্বাভাবিকের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি চামড়া দিয়ে পুরু করে দেওয়া হয়েছে যাতে পাথরের মেঝের উত্তাপ সহ্য করতে পারে। টিমন আলখাল্লাটা কাঁধে চড়ালো, তারপর মুখ আর নাকের উপর লিনেনের কাপড়টা বেঁধে নিয়ে বাতাসের নল থেকে আরও একবার দম নিয়ে বুকের ভেতরে আটকে রাখলো সেটাকে। সব শেষে ল্যাগবেগে পানির থলেটার নিচে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে তুলে নিল কাঁধে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ওটাকে বেঁধে রাখা রশিটার শেষ প্রান্তের গিঁট খুলে দিল, তরলের ওজনের কারণে ঘাড় নিচু করেই টলতে টলতে এগোতে লাগল সুড়ঙ্গ ধরে।

সুড়ঙ্গের মুখের কাছে পৌঁছাতেই, ওর চপ্পলের ভেজা তলা আলগা হয়ে গন্ধ বের হতে শুরু করল। এই পুরু চামড়ার ভেতর দিয়েও মেঝের তাপ অনুভব করতে পারলো ও। পাথরের দেওয়াল থেকে গরম বাতাস এসে ঝাপটা দিতে লাগল গায়ে, সামনে এগোনোর প্রতিটা মুহূর্তে এই ভৌত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওকে।

কাজটা করার জন্য হাতে সময় খুবই কম। এর মধ্যেই ওর ক্ষত বিক্ষত ফুসফুস দম নেওয়ার জন্য ব্যথা করা শুরু করেছে, কিন্তু তবুও ও এই বিষাক্ত বদ্ধ বাতাসে শ্বাস নেওয়ার সাহস করল না। উত্তাপে ওর বাহু আর চেহারার উন্মুক্ত অংশগুলো পুড়ে যাতে লাগল, পায়েও যন্ত্রণা হচ্ছিল কারণ পাথর ওর চপ্পলের সুরক্ষিত তলাকেও পুড়িয়ে দিচ্ছে।

সুড়ঙ্গের একদম মুখে ও কাঁধ থেকে নামালো থলেটা। বেখেয়ালে একটা কনুই পাথরে খোঁচা খেতেই ব্যথায় কাতরে উঠলো ও, প্রায় ইঞ্চিখানেক চামড়া উঠে গেল জায়গাটা থেকে আর গোলাপি দগদগে মাংস উন্মুক্ত হয়ে পড়ল সেখানে।

থলেটা মেঝেতে নামিয়ে রেখেই, টিমন ঘুরে আবার দৌড়ে ফিরে গেল পাক দিয়ে ওঠা ধোঁয়া আর উত্তাপ ভরা সুড়ঙ্গটা দিয়ে, ঝনঝন করে উঠলো ওর আলখাল্লার নিচে ঢিল হয়ে থাকা শেকলগুলো। কাজের এই অংশটাতেই মূলত মানুষ মারা পড়ে–যখন থলের বাহক বিপজ্জক এলাকা পার হওয়ার আগেই, উত্তপ্ত পাথর থলেটাকে ফুটো করে ফেলে।

টিমনের পেছনেই থলেটা ফেটে গেল, চল্লিশ গ্যালন তরল ভাসিয়ে দিল উত্তপ্ত পাথরটাকে। শীতল তরলের আচমকা স্পর্শে, পাথরের উপরে স্তরের আচমকা সংকোঁচন ঘটে ফাটিয়ে দিল স্তরটাকে, বিস্ফোরণের মত করে ফেটে পড়ল পাথরটা আর সেখান থেকে একটা ধারালো টুকরো এসে আঘাত করল টিমনের মাথার পেছনে, মনে হলো যেন সাঁ করে একটা ক্ষুরের পোচ দিয়ে ওর খুলির হাড় পর্যন্ত চামড়া ফাঁক করে দিল কেউ। টলতে টলতে এগোতে লাগল ও, খুব ভালোই জানে যে এই উতপ্ত মেঝেতে পড়ে যাওয়া মানেই হলো ভয়ংকর এক মৃত্যুকে বরণ করা। মাথার ভেতরের দপদপানি সামলে কোনোমতে পায়ের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকলো তাই, ওভাবেই পানির পাত্রটার কাছে পৌঁছাতেই, ওই নোংরা গাঁজলা ওঠা পানিতেই মাথাটা চুবিয়ে দিল সাথে সাথে। তারপর পিঠে নোংরা পানি আর তাজা রক্ত বহমান অবস্থাতেই, দুই হাত দিয়ে বাতাসের নলটা ধরে ওটার সামনে হাফাতে লাগল জিভ বের করে। বেদমভাবে কাশতে কাশতে বমির উপক্রম হলো, সেই সাথে প্রচণ্ড কষ্টে চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে এসে অন্ধ করে দিল ওকে।

বেশ কয়েক মিনিট পরে সামান্য একটু শক্তি ফিরে পেল ও, টলতে টলতে এগিয়ে গেল উপরের ধাপে ওঠার সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই, পরের পানির থলেটা নামিয়ে দেওয়া হলো, ও সরু সুড়ঙ্গটার একপাশে সেঁটে গিয়ে পাশ কাটালো ওটাকে। অন্ধকারে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঠে এসে তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে একটা খাটো ছাদের স্বল্প আলোকিত গুহায় এসে পৌঁছালো ও।

ওকে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে জড়োসড়ো হয় বসে থাকতে দেখতে পেল দাস-সর্দার।

"নিজের জায়গা ছেড়ে এসেছিস কেন?" প্রশ্নের সাথে সাথে জলহস্তীর চামড়ার লম্বা চাবুক ভয়ানকভাবে আছড়ে পড়ল টিমনের পাঁজরে। ওটার কামড়ে কুঁকড়ে গেল ও।

"মাথায় ব্যথা পেয়েছি আমি," কোনো মতে বলল টিমন। আর ওর দিকে এগিয়ে গেল দাস-সর্দার, ঝুঁকে পড়ে টিমনের মাথার পেছনের কাটা জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখলো সে, রক্ত জমাট বাঁধলেও এখনো কালো রক্ত চুইয়ে পড়ছে সেখান থেকে। লোকটা অধৈর্য কণ্ঠে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো।

"একটু জিরিয়ে নে ,তাহলে।" তারপর ঘুরলো মাথা নিচু করে সার বেধে বসে থাকা বাকি দাসগুলোর দিকে। এরা সবাই সংশোধনাতীত দোষে দোষী, টিমনের মতই একই রকম ভারি শেকলে বাঁধা, এদের সারা দেহ জুড়ে-ও অসংখ্য ক্ষত আর মারের চিহ্ন। দাস-সর্দার এদের মাঝে একজনকে নির্ধারণ করল, চাবুকের সূচালো প্রান্তটা দিয়ে খোঁচা দিল ওকে সে।

"এরপর তুই। তাড়াতাড়ি।" দাসটা উঠে দাঁড়ালো, তারপর এলোমেলো পায়ে হেঁটে গেল সুড়ঙ্গের মুখের দিকে, টেনে টেনে হাঁটছে, কারণ গায়ের শেকলের চাপ খেয়ে নিচ্ছে সারা শরীরের প্রায় পুরো শক্তিকেই। সুড়ঙ্গের ধারে এসে দাসটা থেমে দাঁড়িয়ে সামনের ধোঁয়া ওঠা ভয়ানক গর্তটার দিকে ভীত চোখে তাকাতে লাগল।

"আগা!" ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো দাস সর্দার আর বাতাসে শিস কেটে ওর মাংসে আছড়ে পড়ল চাবুক। সিড়ি বেয়ে নেমে গেল দাসটা।

টিমন নিজেকে কোনোমতে টেনে নিয়ে দেওয়ালের পাশের নিচু বেঞ্চের উপর উঠে, হাঁটুর উপর কনুই রেখে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলো। ধোঁয়ার কারণে ভয়ানকভাবে জ্বলছে ওর ফুসফুস, মাথার কাটাটা পুড়ছে আর কামড় দিচ্ছে। বাকি দাসদের কেউ ওর দিকে ফিরেও দেখলো না। প্রতিজনই নিজস্ব নারকীয় দুর্দশার মাঝে ডুবে আছে, কোনো দিক ভ্রূক্ষেপ নেই, সবাই চুপচাপ। টিমনের পাশেই, একঘেয়ে বিরক্তিকর শব্দে কাশতে শুরু করল একজন, সামান্য রক্তাক্ত লালা এসে ওর ঠোঁটে জমে, জ্বলজ্বল করতে লাগল বাতির আলোয়। পাথরের গুঁড়ো দিয়ে ভরে গিয়েছে দাসটার ফুসফুস, ওগুলো জমে জমে নরম ফুসফুসকে শক্ত করে, এখন একটা পাথরে পরিণত করছে। দুজনের কেউই কথা বলল না, কেউই নড়লো না জায়গা থেকে।

কম বয়স্ক দাস-সর্দারটা ওদের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। গালে কালো দাড়ি, অর্ধেক ইয়ুয়ি, মানে একজন মুক্ত মানুষ আবার মুক্ত না। পরনে একটা লিলেনের ঢোলা জামা আর হালকা বর্ম–তবে সেটা তরবারির মাথাকে ঠেকিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ–সুড়ঙ্গের বন্ধুর ছাদ থেকে মাথাকে রক্ষা করার জন্য। কোমরে আটকানো আছে ছোট একটা লোহার তরবারি, আছে দাসদের পেটানোর জন্য লোহার কাটা বসানো একটা

গদা। লোকটা লম্বা, কঠোর চেহারা। হাতে আর পায়ে চ্যাপ্টা পেশী ফুলে ফুলে আছে। একজন নিষ্ঠুর মানুষ, তার অমানবিকতার জন্যই মূলত সংশোধনাতীতদের সাথে কাজ করার জন্য বাছাই করা হয়েছে। এরকম দুইজনই আছে। অন্য দাস-সর্দারটা বয়স্ক, দাড়িতে পাক ধরেছে আর চেহারাও ফ্যাকাসে জরাগ্রস্ত লাগে দেখতে। তবে সে আরও বেশি দশাসই আর বিপজ্জনক, এই কম বয়স্কটার মতই নিষ্ঠুর, কিন্তু অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। উপর থেকে সুড়ঙ্গে পাঁচটা পানির থলে নামিয়ে দেওয়া হলো, পাঁচবার ভকভক করে বাষ্পের মোটা ধারা বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের কালো মুখটা দিয়ে, কারণ পানি উত্তপ্ত পাথর থেকে তাপ চুষে নিয়ে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে।

"হয়েছে!" কম বয়স্ক দাস-সর্দার নিচের দিকে হাঁক ছাড়লো, দাসটা আবার গুহার ভেতর হাচড়ে পাচড়ে উঠে এসে কিনারে বসেই কাশতে কাশতে ওয়াক ওয়াক করতে লাগল। ছাই, ঘাম আর কাদায় সারা গা নোংরা হয়ে আছে ওর, মাটিতে হলুদ রঙের একটু পিত্ত উগরে দিল সে।

"নিয়ে যা একে," আদেশ দিল দাস-সর্দার আর দাসদের দুজন টেনে টেনে সামনে এগিয়ে এসে ওকে টেনে বেঞ্চের কাছে নিয়ে গেল।

তরুণ দাস সর্দারের চোখ ঘুরে এল সারিটার উপরে, বাকি সবাই সজাগ হয়ে টানটান হয়ে আছে, প্রত্যেকেই মনে মনে চাচ্ছে তাকে যেন বাছাই করা না হয়।

"তুই," চাবুকের তীক্ষ্ণ ডগা টিমনের পাঁজরে ছোবল দিয়ে কামড় বসালো। "তুই আগেরবার কাজ পুরো শেষ করিসনি।"

আবেদনের কোনো সুযোগ নেই, প্রতিরোধ করেও কোনো লাভ হবে না–টিমন সেটা অনেক আগেই বুঝে ফেলেছে। ও উঠে দাঁড়িয়ে, এলোমেলো পায়ে এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গের দিকে। নামার জায়গাটায় থেমে নিজেকে স্থির করল টিমন, কিন্তু দেরি হয়ে গেল তারপরেও, মুহূর্তেই ওর বগলের নিচের নরম মাংসে কয়ক ঝলক যন্ত্রণার সাদা ছাপ ফেলে দিল জলহস্তীর চামড়ার চাবুকটা।

ব্যাপারটা শুরু হলো ব্যথার একটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে, টিমন নিজেকে বাঁচানোর জন্য হাত উপরে উঠাতেই ওর গায়ের শেকলগুলো দুলে উঠলো। রাগ আর ব্যথার সম্মিলিত উত্তেজনায়, ওই ভারি শেকলগুলোকেই ঝাঁকি দিয়ে বসল টিমন, দাস-সর্দারও ঠিক সেই মুহূর্তে আবার চাবুকটা ছুঁড়লো। শেকলের একটা ফাঁস গিয়ে পেঁচিয়ে গেল দাস-সর্দারের কবজিতে, মট করে একটা শব্দ করে ওখানকার হাড়টা ভেঙে গেল জায়গায়।

আঁতকে উঠে ব্যথায় আর্তনাদ করে পিছু হটে গেল সে, ভাঙা হাত একপাশে আলগা হয়ে ঝুলছে। ওর পেছনেই বৃদ্ধ দাস-সর্দারটা নিজের তরবারি বের করে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল বসে থাকার কুলুঙ্গিটার ভেতর থেকে। সুড়ঙ্গমুখ থেকে পঞ্চাশ পেস দূরে আছে সে।

ওরা দুজন এখন, কারণ কম বয়স্কটা বাম হাতে দিয়ে তরবারি তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। টিমনের ভোঁতা দাস প্রবৃত্তির গভীর থেকে, ওর জানোয়ারের মত দাস মনের অন্ধকারের গহীন থেকে, একটা স্ফুলিঙ্গ ঝিলিক দিল যেন। হুই বেন-আমনের প্রশিক্ষণ ফিরে এল ওর কাছে: শত্রু দুজন হলে—দুজনকে আলাদা করে ফেলে অপেক্ষাকৃত দুর্বলটাকে আক্রমণ করো।

শেকল দোলাতে দোলাতে টিমন কম বয়স্ক দাস-সর্দারটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, লোকটা পড়ে গেল মাটিতে।

টিমন লাফিয়ে পেরিয়ে গেল তাকে, তারপর কবজির লোহার শেকল দিয়ে আটকে দিল দ্বিতীয় লোকটার তরবারির আঘাত। ঠেকাতে পারলেও, ওর কাঁধ পর্যন্ত নড়ে গেল আঘাতে, পুরো বাহুটাই গেল অবশ হয়ে। আবার তরবারি চালালো লোকটা, কিন্তু টিমন মাথা নিচু করে আঘাতটা এড়িয়ে গিয়ে লোকটার গলা পেঁচিয়ে ধরলো শেকল দিয়ে। তারপর সর্ব শক্তি দিয়ে ফাঁসটাকে চেপে ধরলো টানটান করে।

বৃদ্ধ লোকটা তরবারি ফেলে দিয়ে মরিয়া হয়ে টিমনের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল, না পেরে লোহার যে শেকল তার দম আটকে দিচ্ছিল সেটা ধরে টানার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ।

টিমন খেয়াল করল ও শেকলটা যতই ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে আরও জোরে পেঁচিয়ে ধরছে ততোই জোরে জোরে কুকুরের মত গরগর করে উঠছে। আচমকাই ঝুলে পড়ল দাস-সর্দারের হাত, জিহ্বা বেরিয়ে এল ফোলা ঠোঁট আর দাঁতের পাটির ফাঁক দিয়ে, তার পায়ু-পথের পেশী আলগা হয়ে যেতেই পায়খানার তীব্র ঝাঁঝালো দুর্গন্ধে ভরে গেল আশপাশ। টিমন তাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে মাটি থেকে তুলে নিল তরবারিটা।

তরুণ দাস সর্দারের দিকে ফিরলো ও, সে হাঁটুর উপর উঠে বসেছে, হতভম্ব হয়ে আছে এখনও। মাথার শিরস্ত্রাণ খসে পড়েছে তার, বুকের সাথে চেপে ধরে রেখেছে ভাঙা হাতটা।

টিমন লোকটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে, ছোট তরবারিটা দিয়ে এক কোপে খুলি দুই ভাগ করে দিল তার। দাস-সর্দার মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

পেছনে সরে এসে, টিমন দ্রুত চোখ বুলালো একবার চারদিকে। প্রথম আঘাত থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মাত্র দশ সেকেন্ডের মত সময় পার হয়েছে, এর মাঝে কেউ কোনো চেঁচামেচি করার সুযোগ পায়নি।

টিমন হাতের তরবারিটার দিকে তাকালো, ফলাটা কাদা আর রক্তে মেখে আছে, কিন্তু ও বুঝলো যে দাসবৃত্তির করুণ হতাশা কেটে গিয়েছে ওর। টের পেল ভেতরের ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটা এখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, আবার একজন মরদ বলে মনে হচ্ছে নিজেকে।

ও বেঞ্চে বসা বাকি দাসদের দিকে তাকালো। ওদের একজনও এক চুলও নড়েনি। ওদের চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, কৌতূহলহীন। এরা কেউই মরদ না।

ওদের দিকে তাকাতেই টিমনের কেমন একটা শীতল অনুভূতি হলো যেন। ওর মরদ লোক প্রয়োজন। ওকে অবশ্যই মরদ জোগাড় করতে হবে।

ওদের মাঝে একজন অবশ্য মরদ আছে। ওর নাম হলো যামা। টিমনেরই সমবয়সী। একজন দুর্বিনীত দাস, নদীর ওপার থেকে ধরে আনা হয়েছে। শেকল পরানোর এখনও এক বছর হয়নি। টিমন তাকিয়ে রইলো যামার দিকে আর খেয়াল করল ছেলেটার চোখের দৃষ্টি ফিরে আসছে, ধীরে ধীরে চেহারা তুললো সে, সব দেখে চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে গেল তার।

"হাতুড়ি!" আদেশ দিল টিমন। "হাতুড়ি আনো একটা!" নড়ে উঠলো যামা। দাসবৃত্তির নিয়মিত কাজের বাইরে কিছু করার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি খাটাতে হলো ওকে।

"তাড়াতাড়ি," বলল টিমন। "সময় নেই বেশি।" যামা খনিতে ব্যবহার্য একটা ছোট হাতলের লোহার মাথার বাটালি তুলে নিল, তারপর উঠে দাঁড়ালো বেঞ্চ থেকে।

টিমনের মনে হলো ওর বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা ব্যথা করে উঠলো। ও একজন মরদ খুঁজে পেয়েছে। নিজের কবজি বাড়িয়ে ধরলো ও, রক্তাক্ত তরবারিটা তখনও ধরে আছে হাতে।

"শেকল কেটে ফেলো," বলল ও।



লানন হাইকানাস খুবই সন্তুষ্ট, তবে চেষ্টা করছেন সেটাকে প্রকাশ না করার। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, বন্দরের পাথরের জেটির গায়ে ভেড়ানো পাঁচটা বাণিজ্য জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছেন উনি। একটা আঙুলে নিজের এক গোছা দাড়ি নিয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে মনে মনে হাসতে লাগলেন লানন।

পেছনেই, ঘরের ভেতর রিব-আড্ডি তার গম্ভীর আর চাঁছাছোলা কণ্ঠে লেনদেনের হিসাব পড়ে যাচ্ছেন, পাতলা ধূসর দাঁড়ির ভেতর আঙুল চালাচ্ছেন চিরুনির মত।

"দক্ষিণের তৃণভূমি থেকে আজকেই ওপেটে এসে পৌঁছেছে আটান্নটা বিশাল হাতির দাঁত, মোটমাট ঊনষাট ট্যালেন্ট ওজন।"

লানন ঘুরে গেলেন সাথে সাথে, ভ্রূজোড়া কুঁচকে নিজের সন্তুষ্ট ভাব আড়াল করে রেখেছেন।

"ওজন করার সময় ছিলেন আপনি?" জানতে চাইলেন উনি।

"সব সময়ই থাকি, জাঁহাপনা," রিব-আড্ডি আশ্বস্ত করলেন ওনাকে। আর কেরানিরা সব লেখা থামিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেল গ্রাই-

লায়নের মুখভঙ্গি নরম হয়ে এসেছে। তারা সবাই মুখ টিপে হেসে তোষামোদি ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে লাগল।

"আহ!" লানন সন্তুষ্টির শব্দ করে আবার ঘুরে গেলেন জানালার দিকে, রিব-আড্ডি আবার শুরু করলেন পড়া। ওনার কণ্ঠ খুবই একঘেয়ে, লানন টের পেলেন যে ওনার মনোযোগ ছুটে যাচ্ছে, যদিও অবচেতন মন পূর্ণ সজাগ–হিসাবকর্তার কণ্ঠে কোনো রকম ভুলের আভাস পেলেই ধরে ফেলার জন্য। রিব-আড্ডির একটা অভ্যাস হচ্ছে যখনই উনি হিসাবের এমন কোনো অংশে পৌঁছান যেটা গ্রাই-লায়নের মেজাজ খারাপ করে দিতে পারে, যেমন–হয়তো কোথাও থেকে ঠিকমতো ভেট আসেনি, বা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ পাওয়া যায়নি-তখনই ওনার গলার স্বর বেড়ে যায় খানিকটা আর সাথে সাথেই লানন চেপে ধরেন ওনাকে। এই কারণে রিব-আড্ডির ধারণা হয়েছে যে, গ্রাই-লায়ন আসলে অর্থনীতির গুরু, ওনার কাছ থেকে কিছু লুকানো সম্ভব না।

লাননের মন ছুটে গেল, অলসভাবে ভাবতে লাগলেন এটা সেটা, বিভিন্ন মানসিক পাথর উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলেন যে নিচ থেকে কী বের হয়ে আসে। হুইয়ের কথা মনে এল ওনার, সাথে সাথে সন্তুষ্ট অনুভূতির উপর ঠান্ডা একটা বাতাস বয়ে গেল যেন। ওনাদের বন্ধুত্ব আর আগের মত নেই। হুই এখন লাননের সাথে আগের মত মেশেন না। কারণটা খুঁজতে লাগলেন লানন। একবার ভাবলেন যে, সম্ভবত এই সবই ওনাদের মাঝের দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণে ঘটেছে। তবে বাতিল করে দিলেন চিন্তাটা, আসল ব্যাপার এটা না। হুই কেমন যেন আলগা আচরণ করেন এখন, কিছু যেন লুকাচ্ছেন। রাজার প্রাসাদে এখন রাত কাটান না বললেই চলে, আগের মত লাননের সাথে পাশা খেলা, বা মদ খাওয়া, ঠাট্টা-তামাশা করেন না তেমন একটা। মাঝে মাঝে রাতের বেলা যখন উনি হুই-কে ডাকতে পাঠান, তখন নিজের লুটটা কাঁধে করে ছুটে এসে নতুন কোনো গান শোনানোর বদলে দেখা যায় দাস ফিরে এসে জানায় যে হুই অসুস্থ বা ঘুমাচ্ছেন বা লিখছেন।

লানন এবার আসলেই ভ্রূ কুঁচকে ফেললেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলেন রিব-আড্ডির গলার স্বর বেড়ে গেল এক সুতা। সাথে সাথে উনি সেদিকে ঘুরে গিয়ে তাকিয়ে রইলেন হিসাবরক্ষীর দিকে।

"কী?" গর্জে উঠলেন লানন, ভয়ে হলুদ-সাদা হয়ে গেল বাকি সবার চেহারা। কেরানিরা পারলে মাথা নিচু করতে করতে ওদের লেখার লিপির ভেতরে ঢুকেই যায়।

"জাঁহাপনা, খনির দক্ষিণ প্রান্তে বিশাল একটা ধ্বস হয়েছিল।" রিব-আড্ডি থতমত খেয়ে গেলেন। ওনার বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না যে, কীভাবে লানন এত বিশাল বিশাল অঙ্কের সম্পদের হিসাবের ভেতরেও মধ্য সাম্রাজ্যের কয়েক ডজন ক্ষুদ্র খনির একটার মাত্র দশ ভাগ উৎপাদন কমে যাওয়ার ব্যাপারটাও সাথে সাথে ধরে ফেললেন।

"ওখানকার তত্ত্বাবধায়ক কে?" জানতে চাইলেন লানন, আদেশ দিলেন তাকে বদলে দিতে।

"এটা পুরোপুরি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, আমি মোটেও বরদাশত করবো না এসব," লানন বললেন ওনাকে। "পুরো উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, মূল্যবান দাসগুলোর অপচয় হয়েছে। এর চাইতে কাঠের তক্তার পেছনে টাকা ঢালবো আমি, এটাতেই শেষমেশ খরচা পড়বে না বেশি।"

রিব-আড্ডি ওনার একজন কেরানিকে আদেশটা বুঝিয়ে দিলেন, লানন আবার ফিরে গেলেন জানালার দিকে আর হুইকে নিয়ে ওনার চিন্তায়। আগে ওনাদের বন্ধুত্বটা কেমন ছিল সেটা মনে পড়তে লাগল ওনার, কীভাবে হুইয়ের উপস্থিতি আলাদা একটা মহিমা দান করে, প্রতিটা বিজয়কে আরও বেশি মূল্যবান করে তুলতো, প্রতিটা হতাশা আর দুর্যোগ মোকাবেলাকে করে তুলতো আরও বেশি সহনীয়। হুই যখন ছিলেন, তখনই সব ভালো ভালো জিনিসগুলো ঘটেছে।

নিজের কাছে সৎ থাকার এক বিরল মুহূর্তে লানন অনুধাবন করতে পারলেন যে হুই বেন-আমনই হচ্ছেন মানুষ জাতির ভেতরে একমাত্র ব্যক্তি, যাকে উনি নিজের বন্ধু বলে ডাকতে পারেন।

রাজার পদাধিকারই ওনাকে আলাদা করে ফেলেছে অন্যদের থেকে। একজন রাজারও তো উষ্ণ আলিঙ্গন আর সান্ত্বনার দরকার হয়–আর সেটা চাওয়ার জন্য উনি কারো কাছেই যেতে পারেন না। স্ত্রী আর বাচ্চারা ভয় পায় তাকে। সারাক্ষণই অস্বস্তিতে ভোগে ওনার সামনে, উনি চলে গেলেই বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচে তারা।

পুরো চার সাম্রাজ্যে একজনমাত্র মানুষই আছে যার ভেতর আছে ফলাফলের প্রতি তোয়াক্কা না করে চলার সাহস আর সততা, সে কারণেই রাজার উপস্থিতিতেও পা কাঁপাকাঁপি না করেও চলতে পারেন উনি।

"আমার ওকে দরকার," ভাবলেন লানন। "ওর আমাকে যা দরকার, তার চাইতে আমার ওকে অনেক বেশি দরকার। সবাই ভালোবাসে ওকে, কিন্তু ও-ই একমাত্র আছে যে আমাকে সত্যিকার ভালোবাসে।" তবে হুই তার উপর কেমন স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন সেটা মনে পড়তেই, মুখ বেজার হয়ে গেল ওনার। তবে ওনাদের বিরহকালে, উনিই, ওপেটের সাতচল্লিশতম গ্রাই-লায়ন লানন হাইকানাসই সবচেয়ে বেশি দুর্দশায় দিন কাটিয়েছেন।

"আমি ওকে আবার হারিয়ে যেতে দেব না," শপথ নিলেন উনি। "আমি ওকে এভাবে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে দেব না।" ওনার নিজের কাছে সৎ ভাবটা বজায় ছিল তখনও। টের পেলেন যে, উনি ওনার পুরোহিতের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করছেন। "আমাদের মাঝে যা-ই আসবে তাকে ধ্বংস করে দেব আমি। আমার ওকে প্রয়োজন।"

হুই বেন-আমনের সাম্প্রতিক ভ্রমণের কথা মনে পড়ল ওনার। আসলেই কি ব্যাপারটা এতটা জরুরি ছিল যে, রাজ্যের প্রধান পুরোহিতকে সেনাবাহিনীর দুটো দল আর ওপেটের দৈবদ্রষ্টাসহ যাজিকাদের একটা দলকে নিয়ে, ৪০০ মাইল ভ্রমণ করে, সেই উত্তর সাম্রাজ্যের একটা জনশূন্য কেল্লার চৌকিতে অ্যাসটার্টে দেবীর সামান্য একটা মন্দির উদ্বোধন করতে যেতে হবে? লানন যতই ভাবলেন ততোই মনে হতে লাগল যে, হুই ওপেট ছেড়ে গিয়েছেন তার নিজস্ব কোনো বদ মতলবে, সেই কারণেই লানন এখন বিরক্ত, একাকী এবং খিটখিটে হয়ে আছেন। হুই নিশ্চয়ই জানতেন যে লানন ওনার নামকরণের দিন উপলক্ষে একটা ভোজনোৎসবের আয়োজনের পরিকল্পনা করে রেখেছেন।

দ্রুত ধেয়ে আসা পায়ের আওয়াজে ছেদ পড়ল লাননের চিন্তায়। জানালা থেকে ফিরে দেখলেন ওনার সেনাবাহিনীর তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দুদ্দাড় করে প্রবেশ করল ঘরের ভেতর। ওনাদের সাথে একজন সৈনিক, পরনে ধূলোময় আলখাল্লা আর মলিন হয়ে আসা বর্ম। তার দাড়ি, চপ্পল আর হাঁটুর নিচের বর্মেও জমে আছে ধুলোর আস্তরণ। বোঝাই যাচ্ছে কোথাও থেকে ঝড়ের বেগে ছুটে এসেছে সে।

"জাঁহাপনা। খুবই বড় মাপের দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।"

"কী হয়েছে?"

"দাস বিদ্রোহ।"

"কোথায়?"

"হুলয়াতে।"

"কতোজন ছিল?"

"অনেক বেশি। ঠিক জানা যায়নি। এই লোকটা নাকি দেখেছে।" বলে সৈনিকটাকে দেখালো ওরা।

লানন দুশ্চিন্তিত সেনা অধিনায়কের দিকে ফিরলেন। "খুলে বলো!" আদেশ দিলেন উনি।

"আমি পাহারায় ছিলাম, হুজুর। পঞ্চাশজন লোক নিয়ে উত্তর দিকে রেকি করে আগাচ্ছিলাম আমরা। হঠাৎ করে খনি থেকে ধোঁয়ার সংকেত দেখতে পাই, কিন্তু কেল্লায় ফিরে আসতে আসতে দেখি সব শেষ। ওরা দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েছিল ভেতরে, পুরো কেল্লার সবাইকেই মেরে ফেলেছে।" বলে থামলো সে, পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে থাকা লাশগুলোর কথা মনে পড়ল তার, সবার অন্ডকোষ টেনে ছিড়ে ফেলায়, দুই পায়ের ফাঁকে রক্তাক্ত পিণ্ড হয়ে ছিল। "ওখানকার দাসদের সবাইকে নিয়ে গিয়েছে ওরা, শুধু অসুস্থ আর প্রতিবন্ধীদের ছাড়া। ওদেরকে ফেলে রেখে গিয়েছে।"

"কতোজন?"

"দুইশো জনের মত।"

"ওদেরকে কী করেছো তোমরা?"

"মেরে ফেলেছি।"

"ভালো করেছো!" মাথা ঝাঁকালেন লানন। "তারপর?"

"আমরা দাসদের মূল দলটার খোঁজে বের হই এরপর। হুলয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় সংখ্যায় ওরা ছিল পাঁচ হাজার, এখন উত্তর দিকে আগাচ্ছে।"

"উত্তর দিকে," গর্জে উঠলেন লানন। "নদীর দিকেই তো যাবে।"

"খুব ধীরে সুস্থে আগাচ্ছে ওরা, খুবই ধীরে। আর যাওয়ার পথে লুটপাট আর অগ্নি সংযোগ চালাচ্ছে। ধোঁয়া আর শকুনের পাল দেখে সহজেই অনুসরণ করা যাচ্ছে ওদেরকে। সামনে যারা পড়ছে তারা সবাই পালাচ্ছে, ওদের হাতে তুলে দিচ্ছে সব। পঙ্গপালের মত সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে ওরা।"

"কতোজন? কতজন?" জানতে চাইলেন লানন। "এটা জানাটা জরুরি!"

"হুলয়া আর টুয়ে আর আরও ডজনখানেক খনির অবকাঠামো ভেঙে ফেলেছে ওরা–আর মাঠে কাজ করা সব দাস দলে দলে যোগ দিচ্ছে ওদের সাথে," জবাব দিল অধিনায়ক।

কর্মকর্তাদের একজন আনুমানিক হিসাব দিল একটা, "কমপক্ষে তিরিশ হাজার তো হবেই, তাহলে?"

"কমপক্ষে, হুজুর," অধিনায়ক সায় দিল।

"তিরিশ হাজার, বাআলের পবিত্র নামের কসম," বিড়বিড় করে বললেন লানন। "এতো বেশি!" তারপরেই রেগে গিয়ে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলা শুরু করলেন। "এই দলকে ঠেকানোর জন্যে আমাদের হাতে কীরকম শক্তি আছে? কোন কোন বাহিনী প্রস্তুত আছে এখন?"

"জেং-এ আছে দুটো বাহিনী," আরেকজন সেনা কর্মকর্তা জানালেন।

"সময়মতো পৌঁছাবে না ওগুলো," জবাব দিলেন লানন।

"ওপেটে এখানে আছে একটা বাহিনী।"

"অনেক দূর, অনেক দূর," বিরক্তি ঝাড়লেন লানন।

"বিশাল নদীটার দক্ষিণ উপকূল ধরে আছে আরও দুটো।"

"কিন্তু ওরা সবাই আছে পাঁচশো মাইল দূরে দূরের একেকটা কেল্লায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাকি সবগুলো এখানে-সেখানে ছড়ানো নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন লানন। "ওদেরকে জড়ো করতে কত সময় লাগবে?"

"দশ দিনের মত।"

"অনেক বেশি," ধমকে বললেন লানন। "আমাদেরকে সর্বোচ্চ কঠোরতার সাথে দমন করতে হবে ব্যাপারটাকে। বিদ্রোহ হচ্ছে মহামারীর মত, শুকনো প্যাপিরাসের দঙ্গল পেলেই আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদেরকে ওটাকে ছড়াতে দেওয়া যাবে না, নিভিয়ে ফেলতে হবে। ওটার শেষ স্ফুলিঙ্গ পর্যন্ত। আর কী কী বাহিনী আছে আমাদের?"

"মাননীয় পুরোহিতের বাহিনীটা আছে," দ্বিধান্বিত গলায় বিড়বিড় করে বললেন একজন কর্মকর্তা, লানন তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। হুইয়ের কথা খেয়াল ছিল না ওনার। "উনি আছেন সিনাল-এ, দাসদের উত্তর দিকে অভিযানের একেবারে মুখ বরাবর।"

"হুই!" নরম গলায় একবার বলেই চুপ করে গেলেন লানন, ওনার কর্মকর্তারা হাত-পা নেড়ে নেড়ে এ ব্যাপারে আলাপ শুরু করল।

"ওনার সাথে আছে মাত্র দুটো দল–বারোশো সৈন্য–তিরিশ হাজারের একটা সেনাদলের বিরুদ্ধে লাগতে যাবেন না উনি।"

"আরে কোনো সেনাদল না এরা, ছোটলোক দাস কতগুলো।"

"তিরিশ হাজার, এর কম না।"

"আমরা সময়মতো ওনার জন্য সাহায্য নিয়ে পৌঁছাতে পারবো না।"

"এরকম ঝুঁকি নেওয়াটা বোকামো ছাড়া আর কিছু না–আর, আমাদের হুজুর, বেন-আমন মোটেও বোকা নন।"

"সবচে কাছের সৈন্য জমায়েতটাও নদীর ধারের সেট-এ।"

"বেন-আমন লড়াই করবেন না," ওদের মাঝের একজন ঘোষণা দিল, তারপর লাননের দিকে ফিরলো তার মতামতের আশায়।

লানন হাসলেন। "চিন্তার কিছু নেই। বেন-আমন লড়াই করবেন। ওনার নিজের পছন্দসই সময় আর জায়গায়। শ্রদ্ধেয় পুরোহিত অবশ্যই লড়াই করবেন।" তারপরেই মিলিয়ে গেল হাসিটা। "যতটা সম্ভব সৈন্য আর রসদ নিয়ে চার ঘণ্টার মাঝে রওনা দেব আমি, বেন-আমনকে সাহায্য করতে। সকল ছড়িয়ে থাকা সেনাদলকে এদিকে চলে আসার আদেশ পাঠিয়ে দাও, জেং-এ খবর দিয়ে লোক পাঠাও।"



"যুদ্ধ নাকি হবে?" জিজ্ঞেস করল তানিথ। আগ্রহে ওর সবুজ চোখজোড়া চিকচিক করছে, ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে প্রত্যাশী ভঙ্গিতে। "মানে, আপনি যেসব যুদ্ধ নিয়ে গান-টান করেন সেসবের মত সত্যিকার যুদ্ধ?"

হুই ওনার লেখার লিপি থেকে চোখ না তুলেই অসন্তুষ্টির আওয়াজ করলেন, সেট-এর কেল্লার অধিনায়কের জন্য আদেশনামা লিখছিলেন উনি।

"আপনার এলাকার ভেতরে যত সৈন্য পাবেন, জড়ো করে তাদের কেল্লার দেওয়ালের ভেতরে জমা করে রাখেন। আর আপনার কাছে কী

পরিমাণ বর্শা, তীর আর অন্যান্য অস্ত্র মজুদ আছে, তার একটা হিসাব পাঠান আমাকে। হাতির কোন ধরনের বাহিনী আছে আপনার অধীনে? নদীতে পাহারাদার জাহাজগুলোকেও এনে আপনার দেওয়ালের ভেতরে নোঙর করে রাখবেন, আমার আদেশ বাদে কেউ কোথাও নড়বেন না। নদীর পানির উচ্চতা কেমন সেটা জানান আমাকে। কোনে কোন খাঁড়ি পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়?

"ছয় দিনের ভেতর সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিতে ওখানে পৌঁছাবো আমি। আমার ইচ্ছা শত্রুদের অভিযাত্রাকে বাঁধা দেব নদীর-"

তানিথ গদি থেকে নেমে, তাঁবুর অপর প্রান্তে বসে থাকা হুইয়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওনার কানে একটা আঙুল গুঁজে দিল।

"হুজুর।"

"তানিথ, আমি কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত এখন। খুব জরুরি ব্যাপারটা।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চাইতে জরুরি আর কিছুই নেই-যুদ্ধ হবে কিনা বলেন?"

"হ্যাঁ," খিটিমিট করে বললেন হুই। "হ্যাঁ, যুদ্ধই হবে।"

"ওহ, দারুণ!" তানিথ হাতে তালি দিয়ে উঠলো। "আমি জীবনেও সত্যিকার যুদ্ধ দেখিনি কখনো।"

"এবারেও হবে না দেখা!" গোমড়া মুখে কথাটা বলে হুই আবার মনযোগ দিলেন নিজের লেখায়। "আগামীকাল সকালে একটা যুদ্ধ-হাতিতে চড়ে ফিরে যাবে তুমি। পঞ্চাশজন লোক সাথে যাবে তোমার। এই ঝামেলা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ওপেটে থাকবে।"

তানিথ গদিতে ফিরে গিয়ে ধপ করে ওটার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই, ওর আলখাল্লার পাড়টা যেন আপনাআপনিই ওর মসৃণ উরু ধরে উঠে এল উপরে। হুইয়ের মাথার পেছন দিকে তাকিয়ে রইলো ও, ঠোঁট চেপে জেদি একটা ভঙ্গি ফুটে উঠেছে চেহারায়।

"হুম, শ্রদ্ধেয় পুরুত মশাই," নিঃশব্দে ফিসফিস করল ও, "সেটা হতে পারে আপনার পরিকল্পনা।"

রাতে না ঘুমিয়েই শুয়ে রইলো তানিথ, হুই এবং ওনার কর্মকর্তাদের মধ্যকার অভিযাত্রার পরিকল্পনার কথোপকথন শুনতে লাগল মন দিয়ে। ওর তাঁবুটা ইচ্ছা করেই প্রধান পুরোহিতের তাঁবুর খুবই কাছে সুবিধামতো বসানো হয়েছে, দুটোর মাঝের জায়গাটা প্রহরীদের চোখে না পড়েই পার হয়ে যাওয়া যায়। সিনাল-এর এই ভ্রমণটার মূল পরিকল্পক হুই, এটা আসলে একটা ভালোবাসার তীর্থযাত্রা, ওপেটের নিয়ম নীতির বেড়াজাল থেকে পলায়নের একটা ব্যবস্থা।

তাঁবুর অপর পাশে আইনা নামের বুড়ি যাজিকাটা ঘুমের ঘোরে হাত-পা ছুঁড়ে বিড়বিড় করে কথা বলতে শুরু করল। তানিথ গদির পাশ থেকে একটা

চপ্পল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সেদিকে। একবার হিক্কা তুলে চুপ করে গেল আইনা।

তানিথের চারপাশে এখন এত সবকিছু ঘটছে, সবদিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে ও এতটাই উত্তেজিত হয়ে আছে যে, ঘুমানোর কথা মাথায় পর্যন্ত আসছে না। একদল বর্বর দাস সৈন্যদল ওদের দিকে এগিয়ে আসছে, হাজার হাজার হিংস্র মানুষ, যেখান দিয়েই যাচ্ছে সেখানে রেখে যাচ্ছে খুন, ধর্ষণ আর আগুনে পোড়ানো ঘরবাড়ির দীর্ঘ সারি।

সারাটা দিন ধরেই উদ্বাস্তুর ঢল নেমেছে ওদের শিবিরে, প্রত্যেকেই মৃত্যু আর ভয়াবহতার নতুন নতুন গল্প শোনাচ্ছে এসে। আর এই বর্বরগুলোকে থামানোর মত আছে শুধু হুই বেন-আমন আর তার ছোট্ট বীরের দলটা, সংখ্যায় বিশজনের বিপরীতে একজন করে ওরা। একেবারে কিংবদন্তীর আখ্যান হতে যাচ্ছে ব্যাপারটা, তানিথ কোনোভাবেই এখান থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও যেতে রাজি না। যুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা নিয়ে ওর কোনো দুশ্চিন্তা নেই, নায়কদের নিয়ে রচিত গীতিকাব্যে নায়কদেরই জিত হয় সবসময়। আর হুই দেবতাদের প্রিয়ভাজন, এর মানে হচ্ছে উনি অজেয়। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে দেবতাদের পছন্দের লোকদের সেই চিরচারিত পুরুষালী ঢঙের বিজয় কাহিনিতে অরুচি ধরে গিয়েছে তানিথের, তবে ওর নিজস্ব পরিকল্পনা কাটা হয়ে গিয়েছে।

মাঝরাতেরও অনেক পরে তানিথ শুনতে পেল যে কর্মকর্তারা তাদের জোর গলার আলোচনা শেষ করে হুইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঠকাস ঠকাস করে ফিরে গেল নিজের তাঁবুতে। তানিথ বিছানায় উঠে বসে, ইচ্ছা করে চোখ ভরে অশ্রু জমানো শুরু করল। কাজটা ও সহজেই করতে পারে, ছোট বেলায় ওর একটা কুকুর ছানা ছিল, সেটার কথা মনে করলেই চোখে পানি এসে যায় ওর। একটা চিতাবাঘ খেয়ে ফেলেছিল কুকুরটাকে। কিন্তু আজ রাতে বুদ্ধিটা কাজে দিল না, তাই ও হাতের গিঁট দিয়ে চোখে ঘষতে লাগল জোরে জোরে।

হুই শুয়ে ছিলেন নিজের গদিতে, কুপির সলতে একদমই কমিয়ে রাখা যাতে করে তাঁবুর কোনাগুলো অন্ধকারে ডুবে থাকে। তানিথ তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই, দ্রুত কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন উনি। কিছু বলার আগেই তানিথ গদিতে হুইয়ের পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওনার গলা জড়িয়ে ধরলো। ভয়ানকভাবে কাঁপছে ও।

"কী হয়েছে, জান?" হুই পূর্ণ সজাগ হয়ে গিয়েছেন।

"ওহ মহানুভব, একটা স্বপ্ন। খুবই বাজ একটা স্বপ্ন।" আর ঘাড়ের পেছনে আশঙ্কার একটা শীতল সূক্ষ্ম স্পর্শ টের পেলেন হুই। বিগত দুই বছরে উনি এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে তানিথ আসলেই দৈবজ্ঞানের ক্ষমতা

সম্পন্ন। ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট দর্শন পাওয়ার ক্ষমতা আছে ওর, ছোট ছোট ঘটনা থেকে শুরু করে যে কোনো গুরুতর মুহূর্ত নির্ধারণী ব্যাপার পর্যন্ত। ওর করা ভবিষৎবাণীর গতি-প্রকৃতি কি হবে সেটা ব্যাখ্যার ব্যাপারে হয়তো হুই ওর চাইতে দক্ষ, কিন্তু সেটা শুধু ওগুলোর বাস্তবিক রূপের পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে। যেভাবেই হোক, ওর এই ক্ষমতার জন্য একেবারে ভেতর থেকে একটা সম্মানবোধ করেন হুই। তানিথও সেটা জেনেশুনেই বিড়বিড় করে বলল, "দেখলাম, আমি রাতের অন্ধকারে একটা মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, সেখানে শুধু মড়া পোড়ানোর আগুন জ্বলছে।" আর হুই ওকে আরও কাছে চেপে ধরলেন, টের পেলেন শিহরণটা এবার ঘাড় থেকে ওনার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল–রাত, মরা পোড়ানোর আগুন, অশুভ লক্ষণই বটে।

"আমি খুব কাঁদছিলাম, মহানুভব। কেন তা জানি না, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল অনেক বড় কিছু হারিয়ে ফেলেছি। একটা যুদ্ধ হয়েছে। সারা মাঠ পরিত্যক্ত অস্ত্র আর ভাঙা বর্মে ভরে আছে। আমি ষষ্ঠ বাহিনীর শকুন আঁকা পতাকার কাছে গেলাম, ওটা ছিড়ে মাটিতে পড়ে আছে অবহেলায়।" হুই আঁতকে উঠলেন, শকুন আঁকা পতাকা পড়ে গিয়েছে মাটিতে! এটা শুধু বাহিনীর প্রতীক না, ওনার একান্ত ব্যক্তিগত পরিচয়।

"এরপর দেখি দেবী অ্যাসটার্টে আমার সাথে। উনিও কাঁদছেন। ওনার শুভ্র গালে রূপালি অশ্রু বেয়ে পড়ছে। ওনাকে একই সাথে অনিন্দ্য সুন্দর আর দুঃখী দেখাচ্ছিল। আমার সাথে কথা বললেন উনি, দুঃখিত গলায় ভর্ৎসনা করলেন আমাকে। "তোমার উচিত ছিল তার সাথে থাকা, তানিথ। তুমি ওর সাথে থাকলে এরকম কখনোই হতো না।"

কুসংস্কারচ্ছন্ন আতংকের মাঝেও সন্দেহের একটা তীব্র খোঁচা অনুভব করলেন হুই। উনি দুই হাতে তানিথের কাঁধ ধরে সামনে সরিয়ে ওর চেহারার দিকে তাকালেন। ওর চোখজোড়া লাল হয়ে আছে, দুই গাল বেয়ে ঝরছে অশ্রুধারা, কিন্তু তবুও ওনার সন্দেহ গেল না। স্বপ্নটা খুব বেশি সরাসরি ইঙ্গিতপূর্ণ লাগছে, উনি খুব ভালোই জানেন যে তানিথ যদি একবার ঠিক করে ফেলে যে কিছু একটা করবে তাহলে সেটা থেকে ওর মনকে সরানো একেবারেই অসম্ভবের কাছাকাছি।

"তানিথ," গম্ভীর গলায় বললেন উনি। "তুমি নিশ্চয়ই জানো যে দেবতাদের নামে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলাটা কতটা গুরুতর অপরাধ?"

তানিথ বড় করে মাথা ঝাঁকালো। "অবশ্যই, মহানুভব।"

"একজন দৈবদ্রষ্টা হিসেবে তোমার একটা পবিত্র দায়িত্ব আছে," হুই বোঝানোর চেষ্টা করলেন ওকে, তানিথ ওর গাল মুছতে মুছতে ভাবতে লাগল যে কীভাবে হুই ওর এই দর্শনের পবিত্র দায়িত্বটা দেশের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ব্যাপারে ব্যবহার করেছে, তার নিজের ব্যক্তিগত লাভের কথা তো

বাদই রাখা গেল। ওনার নিজের দাওয়াই ওনাকেই খাওয়াতে পেরে ভেতরে ভেতরে যে এক নিষিদ্ধ আনন্দ ও পাচ্ছিল সেটা অস্বীকার করবে না।

"আমি খুব ভালো করেই জানি, মহানুভব।" তানিথের দিকে তাকিয়ে রইলেন হুই, কিন্তু ছলনার কোনো আভাস পেলেন না সেখানে। হুইয়ের গভীর চোখগুলোর কড়া দৃষ্টি আর সহ্য করতে না পেরে, তানিথ আবারও মুখ গুঁজে দিল ওনার ঘাড়ে আর অপেক্ষা করতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ কেউ বলল না কিছু, অবশেষে হার মেনে নিলেন হুই।

"আচ্ছা ঠিক আছে," বিরক্ত গলায় বললেন উনি। "আমার সাথেই রাখবো তোমাকে, যদি দেবী সেটাই চান।" আর তানিথ ওনাকে আরও জোরে চেপে ধরে, ওনার ঘন দাড়ির ভেতর মুখ লুকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসতে লাগল নিঃশব্দে।

পরের পাঁচদিন ধরে হুই বিশাল নদীটার দিকে একটা বিশাল কালো জেলিফিশের মত করে প্রবাহমান ওনার সেনাদলের তত্ত্বাবধান করেই কাটালেন। উনি বারবার পেছনে গিয়ে দেখতে লাগলেন, আবার ছুটে গেলেন সামনে, ওনার ছোট্ট দলটা যেন সারাক্ষণ ঐক্যবদ্ধ আর ওনার নিয়ন্ত্রণে থাকে–নিশ্চিত করলেন সেই ব্যাপারটা, মিতব্যয়ীতা আর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে লাগলেন ওটাকে।

পঞ্চম দিনে উনি সেট-এর কেল্লায় গিয়ে পৌঁছালেন। মাগো নামের সেই বৃদ্ধ অধিনায়ক হুইয়ের সাথে যোগ দিলেন তীরন্দাজ আর পদাতিকের ১,৮০০ লোক নিয়ে, সাথে ১২টা যুদ্ধ-হাতি, ২টা পাহারাদার জাহাজ–যাতে ১০০টা দাঁড়, কেল্লার বিবেচনাযোগ্য সৈন্যদল।

হুই উত্তপ্ত দুপুরবেলা নদী থেকে মাইল বারো দক্ষিণে একটা ছোট পাহাড়ে স্বাগত জানালেন মাগোকে, তারপর বাকি সবার শ্রবণ সীমা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আলাপ করতে লাগলেন ওনার সাথে।

"আপনার অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি, মাননীয়। সবাই বলে, যারা সূর্যের পাখির পতাকা অনুসরণ করে, তাদের জন্য নাকি আছে অসামান্য গৌরব।"

"এখানের সবার জন্যেই যথেষ্ট গৌরবের সংস্থান হবে, সেই নিশ্চয়তা দিতে পারি," হুই গোমড়া মুখে বললেন ওনাকে, তারপর সামনের উন্মুক্ত জঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। "এর ভেতরেই আছে তারা।"

দাসদের দলটা ঘাসখেকো পিপড়ার মোটা একটা সারির মত করে এগোচ্ছে, গাছের উপর দিয়ে ধুলোর ধূসর একটা কুয়াশা তৈরি হয়েছে ওদের চলার আঘাতে।

"দেখে আপনার মনে প্রথম কি চিন্তা আসছে, অধিনায়ক?" হুই শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, মাগো দূরের দলটাকে নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ।

"মাননীয়, এখান থেকে দেখে অন্য যে কোনো সাধারণ সেনাদলের মতই লাগছে," সন্দিহান কণ্ঠে বললেন মাগো।

"ব্যাপারটা আপনার বেখাপ্পা লাগছে না? এটা তো কোনো সেনাদল না, মাগো। এরা হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহী দাসের দল। কিন্তু এদের চলন-বলন সেনাদলের মত।"

বুঝতে পেরে ঘনঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন মাগো। "তাই তো! তাই তো! এরা কড়া নিয়ন্ত্রণে আছে, দেখাই যাচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক, এদের কাছে আপনি এমন কঠিন শৃঙ্খলা আশা করবেন না।"

"ব্যাপার আরও আছে এখানে," হুই বললেন ওনাকে। "একটু পরেই সেটার প্রদর্শনী দেখতে পারবেন, কারণ সামান্য বিনোদনের ব্যবস্থাও করেছি আমি। এদেরকে আজ খাওয়ার পাতে প্রচুর মরিচ খাওয়াবো বলে ঠিক করেছি! কিছুক্ষণ পরেই ওদের রসদপত্রে হানা দেব, তখন বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে কী বুঝিয়েছি।"

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন ওনারা, শত্রুদলকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখলেন ওনাদের দিকে।

তারপরেই হুই জিজ্ঞেস করলেন, "নদীর কী অবস্থা, মাগো?"

"মহানুভব, পানি খুবই কম।"

"খাঁড়িটা পার হওয়া সম্ভব?" জানতে চাইলেন হুই। "কতো গভীর সেটা?"

"পায়ে হেঁটে পার হওয়া সম্ভব। সবচেয়ে গভীর জায়গাতেও গলা সমান পানি, তবে স্রোত বেশি। পথ নির্দেশক রশিগুলো কেটে দিয়েছি আমি।"

হুই মাথা ঝাঁকালেন। "ওরা সেট-এর কাছের খাঁড়ির দিকে আগাচ্ছে। পাহাড়ের ঢাল এলাকার লুলুলি গিরিপথটা যখন বেছে নিল তখন থেকেই নিশ্চিত ছিলাম আমি।" হুই এক মুহূর্ত চুপ থাকলেন। "ওখানেই আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দেব," কঠিন গলায় বললেন উনি, মাগো আড়চোখে তাকালো একবার ওনার দিকে। ৩০,০০০ হাজার সৈন্যের বিপরীতে মাত্র ৩,০০০ সৈন্যের বাহিনীর সেনাপতির পক্ষে 'ধ্বংস' শব্দটা একটু আজগুবিই লাগছে।

"হুজুর!" হুইয়ের একজন কর্মকর্তা চিৎকার করে ডাকলো। "আক্রমণ শুরু হয়েছে!" আর হুই দ্রুত ছুটে গেলেন ওদের কাছে, ভালো করে দেখার জন্য।

"আহ!" সন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন উনি। "বাকমোর একেবারে সঠিক সময়টা বাছাই করেছে।"

সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা, চোরাগোপ্তা হামলার জায়গাটা থেকে বাকামোর ভারি অস্ত্রে সজ্জিত ৫০০ পদাতিক সৈন্য নিয়ে সারিটার দুই পাশ

থেকে আক্রমণ করল। হুইয়ের প্রিয় শিষ্য, কৃষ্ণাঙ্গ বর্শাবাজদের সুরক্ষা প্রাচীরের মাঝে একটা দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করেছে। ওর কুঠারবাজরা কুঠার চালিয়ে দ্রুত পৌঁছে গেল রসদপত্রের গাড়িগুলোর কাছে, গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরা লাফ দিয়ে নেমে জান নিয়ে পালালো। মহিলা কুলিরা মাথা থেকে শস্যের ঝুড়ি ফেলে আর্তচিৎকার করতে করতে পিছু নিল তাদের।

দক্ষ হাতে আক্রমণকারীরা জোয়াল বাঁধা অবস্থাতেই গাড়ির বলদগুলোর গলা কেটে দিল, শস্যের ঝুড়িগুলোকে গাদা করল এক জায়গায়। মাটির পাত্রে করে আনা চাপা আগুনে বাতাস দিয়ে জ্যান্ত করে হলো আবার আর কয়েক মিনিটের মাঝে দাসদের লুট করে আনা শস্যভাণ্ডারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন।

"দেখুন!" আচমকা আক্রমণে দাসদের প্রতিক্রিয়া কিরকম হচ্ছে সেদিকে ইঙ্গিত করলেন হুই। মাথা আর লেজ থেকে বর্শাবাজরা দুই সারি করে এখন সামনে আর পেছনে দিকে এগোচ্ছে, প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনার সুপ্রাচীন পদ্ধতি এটা। পুরো ব্যাপারটায় প্রশিক্ষিত কোনো সেনাদলের নিপুণতা নেই যদিও। মন্থর আর অনেকটাই অনিচ্ছার নড়া-চড়া, সঠিক সংগঠনের কাছে নিতান্তই হাস্যকর লাগবে, কিন্তু ব্যাপারটা চোখে পড়ার মত।

"দারুণ!" মাগো অবাক হলেন। "নিশ্চিত কোনো সৈনিক নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদেরকে, বা অন্তত এমন কেউ যে কিনা বিভিন্ন সামরিক কাহিনি সম্পর্কে পড়েছে। আপনাদের সৈনিকদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে এখন।"

"বাকমোর ভালোই জানে যে ওকে কী করতে হবে," হুই আশ্বস্ত করলেন ওনাকে, বলতে বলতেই কুঠারবাজরা খুব দ্রুত সবার ঢালগুলো একসাথে করে একটা কচ্ছপের মত সংগঠন তৈরি করল, এভাবে থেকেই শত্রুপক্ষের আগুয়ান বর্শাবাজদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এল অকুস্থল থেকে, মাত্র এক মিনিটের জন্য ওরা আটকা পড়ল না ব্যূহের ভেতরে। ওদের পেছনে রসদের গাড়িগুলো পুড়তে লাগল, গাছের মাথার উপর দিয়ে কালো মোটা ধোঁয়া উড়তে শুরু করেছে সেখান থেকে।

"দারুণ! দারুণ!" হুই সন্তুষ্টি আর খুশিতে হেসে দিলেন। উরুতে চাপড় দিচ্ছেন। "চমৎকার ভাবে কাজ শেষ হলো! এখন দেখা যাক দাসদের সেনাপতি যেরকম দক্ষ রণকৌশলী, খাজাঞ্চিখানাও সেভাবে সামলাতে পারে কিনা! আজ রাতে শত্রু শিবিরে সবার পেটে ছুচো দৌড়াবে।" হুই মাগোর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন একদিকে। "এক পাত্র ওয়াইন খাওয়া যাক," প্রস্তাব দিলেন উনি। "দেখে দেখে অপেক্ষা করাটাও কুঠার চালানোর মত আমাকে পিপাসার্ত করে দেয়।"

মাগো হাসলেন। "ওয়াইনের কথাই যখন বললেন, মাননীয়। আমার কাছেও কয়েক জগ ওয়াইন আছে, আমি নিশ্চিত সেটা আপনার অভিজ্ঞ রসনাপ্রেমী জিহ্বায় মন্দ ঠেকবে না মোটেও। আজ রাতে আমার সাথে খাবার খান?"

"আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো সেটার জন্য," হুই আশ্বস্ত করলেন ওনাকে।



ওয়াইনটা খাওয়া গেল মোটামুটি, খাওয়া শেষে হুই আর তানিথ সমবেতভাবে অতিথিদের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। হুইয়ের রচনায় গানটা ছিল আদি রসাত্মক বর্ণনায় ভরপুর, বাআল আর অ্যাসটার্টের দ্বৈত প্রেম উপাখ্যান। তানিথ দেবীর অংশটা গাইলো মিষ্টি আর নিটোল গলায়, ইঙ্গিতময় আর দ্ব্যর্থবোধক জায়গাগুলোতে চোখ নামিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে পরিবেশন করল, তা দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা আর ওয়াইনের পেয়ালা দিয়ে সামনের কাঠের টেবিলে বাড়ি দিতে লাগল উল্লাসে। আরও একটা গানের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করে, হুই নিজের লুটটা সরিয়ে রাখলেন একপাশে। তারপর কাজের কথায় চলে এলেন উনি। দরজায় কড়া নাড়তে থাকা লড়াইয়ের ব্যাপারে আলাপ শুরু করলেন, মাগো আর ওনার কর্মকর্তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যেন শত্রুপক্ষকে হালকাভাবে না দেখে।

"আমি এই ভুলটা করার জন্য প্রায় চরম মূল্য দিতে যাচ্ছিলাম আরেকটু হলে," ওদেরকে বললেন হুই। "আমার খুব ইচ্ছে করছিল ওদের শক্তির ঠিক মাঝে একটু খোঁচা দিয়ে দেখার জন্য, দেখলাম যে জায়গাটা একেবারে মাত্রই পেষা খামিরের মত দুর্বল। দ্রুত আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার কথা মাথায় এল আমার, একটা মাত্র আঘাতেই বিজয় ছিনিয়ে আনার সম্ভাবনা দেখতে পেলাম। ওদের ঠিক মাঝখানের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলতে পারলে, ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারবো পুরো দলটাকেই।" বলে হুই বিরতি দিয়ে হাত দিয়ে সূর্যের প্রতীক তৈরি করলেন। "সকল প্রশংসা বাআলের, সোজা এগিয়ে পূর্ণ বেগে সম্মুখ দিকে আক্রমণ করার আদেশটা দেওয়ার ঠিক এক মুহূর্ত আগে দেবতারা আমাকে একটা ইঙ্গিত পাঠিয়ে সতর্ক করে দেন।" শ্রোতার দল যার যার সুবিধা মত ধর্মীয় নানান ভঙ্গি করল, এদের মাঝে কয়কজন হুইয়ের মত সূর্যের প্রতীকও বানালো, হুই বলে চললেন, "আমি শত্রুদলের দুই পাশে তাকালাম, যেটা স্বাভাবিকভাবেই আমার দলের সাথে মিলে মিশে গিয়েছিল, আমি খেয়াল করলাম যে কি কঠিনভাবেই না তারা প্রতিরোধ করছে। মনে হচ্ছিল যে শত্রুদলের সবচে

সেরা আর শক্ত লোকগুলোকে ওখানে নিয়োজিত করা হয়েছে, তখন হঠাৎ করেই আমার কানাই-এর কথা মনে পড়ল। হানিবাল কীভাবে রোমান দূতের দলকে জালে আটকে ফেলেছিলেন, সেটা খেয়াল হলো আমার।" হুই থেমে গেলেন আচমকাই, পুরো ব্যাপারটা উদঘাটন করে ফেলতে পারার একটা অভিব্যক্তি দেখা গেল তার চেহারায়।

"কানাই! হানিবাল!" পরিষ্কারভাবে ওনার মনে পড়ল মাটির ছকের উপরে সাজানো কানাই-এর সৈন্যদলের কথা। যুদ্ধটার বর্ণনারত নিজের কণ্ঠ নিজেই যেন শুনতে পেলেন হুই আরেকটা মনযোগী কালো চেহারাও মনে পড়ল সাথে। "টিমন!" বিড়বিড় করে উঠলেন উনি। "টিমনই! ও না হয়ে যায় না!"



টিমনকে ঘিরেই শুয়ে আছে ওর বাহিনী, কালো মানুষের বিশাল একটা গাদা, ক্ষুধার্ত আর ভীত সবাই, রাতের অন্ধকারে অস্থির হয়ে আছে। বিশাল নদীটার দক্ষিণ উপকূলে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডগুলো ফুটন্ত ফুলের বাগানের মত হয়ে আছে, রাতের আকাশ ভরে আছে কমলা আভায়। আগুন শুধু উষ্ণতাই জোগাচ্ছে, খাবার দাবার নেই কোনো। আজ দুই দিন হতে চললো অভুক্ত ওরা, রসদের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার পরে খাবার পাওয়া যায়নি আর মোটেও।

টিমন নিঃশব্দে ওদের ভেতরে হেঁটে বেড়িয়ে দেখতে লাগল কীভাবে ওরা আগুনের পাশে গাদাগাদি করে আছে। ক্ষুধার কারণে ঠান্ডা লাগছে আরও বেশি, ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে বা গোঙাচ্ছে, পুরো শিবির জুড়ে তাই শুধু গুনগুন শোনা যাচ্ছে, যেন বুনো মৌমাছির চাকের গুঞ্জন ধ্বনি।

টিমন ঘৃণা করে এদেরকে। এরা সবাই দাস, দুর্বল জাত। পঞ্চাশ জনে একজন মাত্র মরদ, একশো জনে একজন যোদ্ধা। ওর এখন হাতে দরকার ছিল একটা তীক্ষ্ণধারের বর্শা, সেখানে ও পেয়েছে পচা গাছের ডাল। শত্রুপক্ষ যেখানে বিদ্যুৎ বেগে ধাবমান, তার প্রতিক্রিয়ায় ওরা সবাই ধীর আর মন্থর। বিরোধী পক্ষের চৌকশ একজন সৈন্যের বিরুদ্ধে এদের পঞ্চাশজনও কিছুই না। টিমন নিজের গোত্রের লোকের দেখা পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে আছে, ও যা শিখেছে তাদেরকেও সেটা সেখানোর জন্য অস্থির, ওর নিজের প্রেরণা, ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ও চলে, সেটা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে উদগ্রীব।

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ও চঞ্চল কালো পানির দিকে তাকিয়ে রইলো। পানির উপরে তারার আলোর ঝিকিমিকি প্রতিফলিত হচ্ছে, খাঁড়ির অগভীর জায়গায় ঘূর্ণি দিয়ে স্রোত তৈরি করছে পানি, শান্ত পানির মাঝে একটা বিশৃঙ্খলা, দেখে লাগছে যেন কোনো দানব সাঁতরে গিয়েছে এখান দিয়ে।

তিনশো পেস দূরে, নদীর মাঝামঝির কাছে, আছে একটা ক্ষুদ্র চর। নদীতে পানি বাড়লে ঢেকে যায় ওটা, এমনি সময়ে ভেসে আসা কাঠের টুকরো আর স্রোতে নুয়ে পড়া প্যাপিরাসের দঙ্গল দিয়ে ঢাকা থাকে চরটা। ওটাই হবে খাঁড়ি পার হওয়ার প্রথম ধাপ। ওখানেই পোঁতা হবে গাছের বাকল পাকিয়ে বানানো রশি, ওর লোকেরা সেই রশিই পাকাচ্ছে এখন। ভোর নাগাদ শেষ হবে রশি পোঁতার কাজ, চেষ্টা করবে এক দিনের মাঝেই পুরো দলবল নিয়ে পার হয়ে যাওয়ার জন্য। ও খুব ভালোই জানে যে তা করতে গিয়ে ক্ষতির পরিমাণ কতটা মারাত্মক হতে পারে। ওর দলের সবাই ক্ষুধা, আঘাত আর অবসাদে দুর্বল হয়ে আছে। আর বাকলের রশি আসলে খুব বেশি নির্ভরযোগ্য না। স্রোত খুব দ্রুত আর ভয়ানক, শত্রুপক্ষও একই রকম দ্রুত আর নির্মম।

টিমন ভাটির দিকে এগিয়ে গেল, ওর প্রহরীদের মাঝ দিয়ে এগোচ্ছে, নীরবে আলাপ করল ওদের সাথে, থেমে থেমে বাকলের রশির বিশাল কুণ্ডলীটা পরীক্ষা করে দেখলো, পাকিয়ে নদীর ধারে ফেলে রাখা হয়েছে সেটাকে, সব শেষে ও নিজের শিবিরের পরিসীমায় ফিরে এল।

ভাটির দিকেই সেট-এর কেল্লা, ১,০০০ পেস দূরে। রোমানদের এক মাইল, হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় এল ওর। মশাল জ্বলছে ওটার দেওয়ালে আর টিমন দেখতে পেল আলোর নিচে সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত আছে প্রহরীরা।

নদীর মাঝেই, একটা গভীর শান্ত দীঘিতে নদী পাহারা দেওয়ার জাহাজগুলো নোঙ্গর করে রাখা হয়েছে। দাঁড় তুলে, পাল গুটিয়ে রাখায় ওগুলো দেখতে বিশাল কুমিরের মত লাগছে এখন, টিমন অস্বস্তি ভরে তাকিয়ে রইলো ওগুলোর দিকে। ও জীবনে কখনো কোনো যুদ্ধ জাহাজকে চোখের সামনে যুদ্ধ করতে দেখেনি, তাই জানে না যে ওগুলো থেকে আসলে কিরকম আক্রমণ হতে পারে। হুই বেন আমন যখন ওকে রোমান আর গ্রিক আর কার্থেজিনিয়ানদের মাঝের বিশাল নৌ যুদ্ধের কথা বলতেন, তখন ও খুব কমই মনোযোগ দিতো। এখন আফসোস হচ্ছে। আশা করছে যে এই অদ্ভুত দর্শন বাহনগুলো ওরা পার হওয়ার সময় কী ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে কিছু না কিছু অনুমান করতে পারবে।

নদীর ওপার থেকে খুবই মৃদু কথোপকথনের আওয়াজ ভেসে এল ওর কানে, যদিও ও বুঝলো না একটা শব্দও, কিন্তু তবুও পিউনিক ভাষার পরিচিত উচ্চারণ ধরতে পেরেই ওর ভেতরে ঘৃণার আগুনটা উসকে গেল আরও। ও ওদের কথা শুনতে লাগল আর মনে হতে লাগল ওর পেটের গভীর অন্ধকার থেকে বুঝি উঠে আসছে এই ঘৃণা। ওর ইচ্ছা হলো এই সৃষ্টিছাড়া সাদা চামড়ার লোকগুলোকে ওদের সকল উৎকর্ষতা আর শক্তি আর আজব সব দেবতা আর দানবীয় নিষ্ঠুরতাসহ প্রতিটা চিহ্ন আর স্মৃতিকে সমূলে উপড়ে ফেলে দিতে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দূরের দুর্গটার দিকে তাকিয়ে, রাতের আঁধারে ওদের ফিসফিসানি শুনতে পেয়ে টিমনের মনে পড়ল ওর নিজের প্রিয়তমার দেহটা এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে কীভাবে হেচড়ে আর লাফিয়ে যাচ্ছিল, মনে পড়ল হুলয়ার প্রাঙ্গণে দাসদের আর্তচিৎকার, মনে পড়ল দাসদের গায়ের গন্ধ, চাবুকের হিসহিসানি আর কামড়, ওর গায়ের শেকলগুলোর ঝনঝনানি, পাথরের চামড়া ঝলসানো উত্তাপ, দাস-সর্দারদের কণ্ঠ–এরকম আরও হাজারখানের স্মৃতি যা ওর মস্তিষ্কের ভেতরে চিরতরে খোদাই হয়ে জ্বলজ্বল করছে। হাতের শেকল বাঁধা জায়গাটায় পড়া শক্ত কড়ায় হাত বুলালো ও, তারপর তাকিয়ে রইলো ওর শত্রুর দিকে, ওর আত্মার গভীরতম জায়গা থেকে আরও বেশি ঘৃণা বুদবুদ হয়ে ফুটে উঠতে লাগল, একটা জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত উত্তপ্ত লাল লাভার মতই ওর অভিপ্রায়কে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো তা।

টিমনের ইচ্ছা হতে লাগল ওর বাহিনীকে ঘুরিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উপর। ইচ্ছে করতে লাগল ওদেরকে ধ্বংস করে দিতে, ওদের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত শেষ করে দিতে।

অবাক হয়ে খেয়াল করল যে ও কাঁপছে, ঘৃণার জোরে ওর সমস্ত শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই ও সামলে নিল নিজেকে। এই রাতের ঠান্ডা বাতাসেও ওর চেহারা আর বুক বেয়ে ঘাম নেমে এল, ঘৃণার কারণে ঝরা ঘামের উৎকট গন্ধ এসে লাগল ওর নাকে।

"এবার হয়তো হলো না," মনে মনে ভাবলো টিমন। "তবে ফিরে আসবো আমি।"

অন্ধকারে ওর পাশে উপস্থিত হলো কেউ, ও ঘুরে গেল সেদিকে।

"যামা?" ডাক দিল ও, ওর সহকারী নরম গলায় জবাব দিল।

"ভোর হয়ে এসেছে।"

"হ্যাঁ," মাথা ঝাঁকালো টিমন। "কাজে নামার সময় হয়ে গিয়েছে।"



প্রেমপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তানিথ হুইয়েরদাড়ি আচড়ে দিতে লাগল, তারপর ওটাকে থুতনির নিচে প্যাঁচ মেরে এমনভাবে সরিয়ে দিল যাতে দাড়ি হুইয়ের বুকের বর্মে আটকেও যাবে না, আবার কোনো শত্রুও মরিয়া হয়ে ওগুলো খামচে ধরতে পারবে না।

কাজ করতে করতে ফিসফিস করে ও আদুরে গলায় কথা বলতে লাগল, একটা বাচ্চা না হওয়া মায়ের ভালোবাসার কথা, এমনভাবে কথা বলছিল যে

হুই-ই ওর বাচ্চা। হুই চুপ করে বসে রইলেন ওনার গদিতে, তানিথের দক্ষ আর আলতো হাতের আদরে, ওর নরম কথা আর প্রেমময় সুরের কণ্ঠে আরাম পাচ্ছেন খুব। আজকের দিনে যা হতে যাচ্ছে তার সাথে এটা অতিমাত্রায় সাংঘর্ষিক, তানিথ যখন গদি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ওনার ভারি বুকের বর্মটা আনতে গেল তখন উনি বুকের ভেতর তীক্ষ্ণ একটা হারানোর বেদনা অনুভব করতে লাগলেন।

ওনাকে অস্ত্রে সজ্জিত হতে সাহায্য করল তানিথ, হাঁটু মুড়ে বসে পায়ের বর্ম পরিয়ে দিল, তারপর ওনার আলখাল্লার ভাঁজগুলো সমান করে দিল হাত দিয়ে টেনে, যদিও মুখে হাসি লেগেই থাকলো, কিন্তু হুই ওর কণ্ঠের ভয়ের রেশটা ঠিকই টের পেলেন।

বেখাপ্পাভাবে চুমু খেলেন হুই ওকে, জড়িয়ে ধরতেই বুকের বর্ম চেপে বসল ওর স্তনের উপর। তানিথ প্রতিবাদের মৃদু চেষ্টা করল, সামান্য পিছিয়ে গেল, কিন্তু তারপরেই আত্মসমর্পণ করল হুইয়ের বন্ধনে, ব্যথাকে উপেক্ষা করে নিজেকে চেপে ধরলো হুইয়ের সাথে।

"ওহ হুই," ফিসফিসিয়ে বলল ও, "আমার ভালোবাসা, আমার প্রিয়তম।"

ঝোলানো নলখাগড়ার পাটিটা একদিকে সরিয়ে ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো বৃদ্ধ যাজিকা আইনা। আর কিছু চোখে না পড়লেও, ও দেখতে পেল যে ওনারা দুজন একজন আরেকজনের সাথে লেপটে আছে। আইনা ওর ঝাপসা বুড়ো চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইলো সেদিকে, তারপর ওর হাঁ হয়ে থাকা মুখটা একটা দাঁতহীন হাসিতে রূপ নিল আর ও চুপচাপ পিছিয়ে গিয়ে পাটিটা আগের জায়গায় ঠেলে দিল আবার।

অবশেষে তানিথ ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তারপর সামনের দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল যেখানে হুইয়ের গদির পাশে শকুন কুঠারটা ঠেকনা দিয়ে রাখা, ওটাকে তুলে নিয়ে ফলা ঢেকে রাখা নরম চামড়ার খাপটার মুখ আটকে দিল ও। ওটা নিয়ে, হুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে ফিরে এসে, ফলাটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমু খেলো তাতে।

"ওনাকে ব্যর্থ হতে দিয়ো না!" কুঠারটার কাছে ফিসফিস করে কথাটা বলে সেটাকে হুইয়ের হাতে তুলে দিল তাবিথ।

ভোরের আলো ফোটার আগের অন্ধকারে কেল্লার দেওয়ালের আড়ালে একদল কর্মকর্তা অধীর আগ্রহে উজানের দিকে তাকিয়ে আছে, যেদিকে দাস বাহিনী শিবির করেছে। এদের প্রত্যেকেই অস্ত্রে সজ্জিত আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকালের নাস্তা সারছে। উল্লসিত কণ্ঠে হুই আর তানিথকে অভিবাদন জানালো তারা। আর তানিথ চুপচাপ ওদের সারা দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুনতে আর দেখতে লাগল। ও বহু কষ্টেও ভেবে পেল না যে কীভাবে এরা

ছোট বাচ্চাদের দুষ্টুমি করার আগ্রহ নিয়ে একেবারে নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে এভাবে আলোচনা করছে।

তানিথের নিজেকে এই রহস্যময় পারস্পরিক পুরুষালী আস্থার বাইরের একজন বলে মনে হতে লাগল, তবে ও সবচে চমকে গেল হুইয়ের ভেতর যে পরিবর্তনটা এল সেটা দেখে। ওর বিনয়ী কবি, শান্ত বিদ্বান আর লাজুক প্রেমিক লোকটাও ঠিক বাকিদের মতই গনগনে হয়ে গেলেন। ওনার হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে কথা বলা, গালে ছোপ ছোপ রঙের আভাস আর বাকমোরের লাফ দেওয়ার ভঙ্গি দেখে ওনার উচ্চকিত খিলখিল হাসির মাঝে ও চরম উত্তেজনার সকল লক্ষণ দেখতে পেল।

"আজ হচ্ছে সেই দিন। যথেষ্ট অপেক্ষা হয়েছে।" ঘোষণা দিলেন হুই, তাকিয়ে আছেন উজান বরাবর ভোরের আবছা আঁধারের দিকে। নদীর উপর ভারি কুয়াশা জমে আছে, প্রায় ১০,০০০ অগ্নিকুণ্ড ধোঁয়া আড়াল করে রেখেছে সামনের মাঠ। উনি অস্থির পায়চারি করতে লাগলেন। "কুয়াশার উপর অভিশাপ পড়ুক! দেখতেই পাচ্ছি না যে ওরা কি খাঁড়ির ওপর দিয়ে ওদের রশিগুলো বেঁধে ফেলেছে কিনা।"

"আমি কি একটা জাহাজ পাঠিয়ে দেখে আসতে বলবো নাকি?" জিজ্ঞেস করলেন মাগো।

"না," হুই হাত নেড়ে ওনার পরামর্শকে উড়িয়ে দিলেন। "একটু পরে এমনিতেই জানা যাবে, আমি এখনই জাহাজগুলোর দিকে ওদের মনোযোগ কাড়তে চাচ্ছি না।" হুই খাবার সাজিয়ে রাখা দেওয়ালের বর্ধিতাংশের দিকে এগিয়ে গেলেন। মধু মিশ্রিত করে এক পাত্র গরম ওয়াইন ঢেলে নিলেন উনি, তারপর বাকিদের উদ্যেশ্যে তুলে ধরলেন সেটা। "তোমাদের তরবারির ধার বেড়ে যাক।"

লালচে আর ধোঁয়াটে দিগন্তের উপরে সূর্যটা উঠে আসতেই, হুই বাআলের উদ্দেশ্যে প্রশংসা সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন, তারপর নগ্ন মস্তকে দাঁড়িয়ে দেবতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই ব্যাপারে যে উনি আজকের দিনে একটা লড়াই করতে মনস্থির করেছেন। কঠিন কিন্তু সশ্রদ্ধ শব্দাবলী ব্যবহার করে উনি তুলে ধরলেন যে, যদিও যে বাহিনী ওনার অধীনে আছে তারা সেরাদের সেরা, তবুও ওনাদের বিপক্ষের বাজিই বেশি, আজকের দিনে জয়লাভ করতে হলে ওনার অবশ্যই সহায়তা লাগবে। উনি দেবতাদের সাহায্যের জন্য নির্ভর করে আছেন। সব শেষে সূর্যের প্রতীক তৈরি করে, ঝট করে ঘুরে তাকালেন ওনার লোকদের দিকে।

"বেশ, তোমরা তোমাদের জায়গা আর দায়িত্ব ভালো মতই জানো।" সবাই চলে যেতেই হুই বাকামোরকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন। "যাজিকার সাথে থাকার জন্য একজন লোক রেখেছো?"

বাকমোর একজন ফ্যাকাসে চামড়ার বৃদ্ধ পদাতিক সৈন্যকে ইশারা করল, সামান্য দুরেই দাঁড়িয়ে ছিল সে, সামনে এগিয়ে এল লোকটা।

"কী করতে হবে জানো তো?" জানতে চাইলেন হুই, সৈন্যটা মাথা ঝাঁকালো।

"আমি সারা দিন যাজিকার সাথেই থাকবো।"

"একবারের জন্যেও ওকে দৃষ্টির আড়াল করবে না," লোকটাকে সাবধান করে দিলেন হুই।

"যদি শত্রুপক্ষ জিতে যায়, এমন পরিস্থিতি হয় যে ওনার আটক হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে আমি–"

"হুম," হুই রাগত কণ্ঠে বললেন। "যদি প্রয়োজন হয়–আর আঘাতটা যেন খুব দ্রুত আর কার্যকর হয়।"

হুই তানিথের দিকে তাকাতে পারলেন না; ঘুরেই, দ্রুত নেমে গেলেন নিচে। একটা ছোট নৌকা অপেক্ষা করছিল ওখানে, দুটোর মাঝের বড় জাহাজটায় ওনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

হুই জাহাজের খুপরিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্য এখন পুরোপুরি উঠে গিয়েছে, কুয়াশাও গায়েব। জাহাজটায় একটামাত্র নোঙর ফেলে রাখা হয়েছে শুধু, ঢেউয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ওটা এখন। মাল্লারা বসে পড়েছে যার যার বসার জায়গায়, ওদের ঢাল আর অস্ত্র পায়ের কাছে ফেলে রাখা, দাঁড়গুলো নেড়েচেড়ে প্রস্তুত করে নিচ্ছে।

দাসবাহিনী নদী পার হওয়ার দিকে পূর্ণ মনযোগী এখন। নদীর দক্ষিণ উপকূল থেকে মাঝের ওই চর পর্যন্ত বিশটা রশি বাঁধা হয়ে গিয়েছে, এখন ওরা ওখান থেকে উত্তর পাড়ে রশি টানছে।

পুরো খাঁড়িটা গিজগিজ করছে সংগ্রামরত মানুষের ভিড়ে। বাকলের রশিগুলো শক্ত হাতে ধরে পানি পেরিয়ে ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে চরের দিকে। শুধু তাদের মাথা দেখা যাচ্ছে, কালো কালো বিন্দুর লম্বা একটা সারি যেন, সারির পাশ দিয়ে পানিতে ঘূর্ণি উঠছে আর ফেনাচ্ছে। এর মাঝেই পনেরো থেকে বিশ হাজার দাস নেমে পড়েছে পানিতে, সংখ্যাটা একটু একটু করে বাড়ছেই, কারণ দক্ষিণ পাড়ের লোকজন সারি বেঁধে একে একে পাড় থেকে নেমে এসে রশি ধরে ধরে এগোনো শুরু করেছে।

হুই যেভাবে অনুমান করেছিলেন ঠিক সেভাবেই ঘটতে লাগল সব। দক্ষিণ পাড়ের দলটা লোকসংখ্যায় কমতে কমতে একসময় বাকমোরের অধৈর্য সৈন্যগুলোর মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত একটা সংখ্যায় নেমে দাঁড়াবে। আক্রমণের আদেশ পেতে দেরি হওয়ায়, বাকমোর কেমন মোচড়া-মুচড়ি করছে সেটা চিন্তা করতেই হুইয়ের ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। ওকে আর অপেক্ষায় রাখবেন না বলেই সিদ্ধান্ত নিলেন হুই। কারণ দেখতে পেলেন যে

দাসদের প্রথম দলটা সবুজ পানি থেকে মাথা তুলে হাচড়ে পাচড়ে কৃতজ্ঞচিত্তে চরটায় উঠে এল, ভিজে থাকার কারণে সকালের রোদে চিকচিক করে উঠলো ওদের কালো চামড়া।

এতো আগেই কৃতজ্ঞতাবোধ করাটা অকালপক্বতাই হয়ে যাচ্ছে, মনে মনে ভাবলেন হুই। ওদের নিরাপদ আশ্রয়ের মাঝে এখনও রয়ে গিয়েছে নদীর উত্তর দিকের প্রবাহটা। আবার সার বেঁধে চরটা থেকে নেমে যাওয়া আরম্ভ করল দাসগুলো, ওদের পেছনে বাকলের রশিগুলো ভাটির দিকে টানটান হয়ে রইলো ধরে রাখা মানুষের শরীরের ওজনে আর চরটা গিজগিজ করতে লাগল নগ্ন কালো কালো নরমাংসে। দুর্দান্ত দৃশ্য একটা, এত বিপুল সংখ্যক জনগন একসাথে নদী পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিশাল একটা অংশ তখনও আটকা পড়ে আছে দক্ষিণ পাড়ে।

যদি এদের সর্দার টিমন হয়ে থাকে, তাহলে অন্তত এইটুক বুদ্ধি থাকবে যে ওর সেরা লোকগুলোকেই পেছনের দিকটা পাহারা দেওয়ার জন্য রাখবে। নদী পার হওয়ার জন্য অপেক্ষমান লোকগুলোর দিকে গলা বাড়িয়ে তাকালেন হুই, এটা ভালোই বোঝা গেল যে এরা ইতিমধ্যেই চলে যাওয়া লোকগুলোর তুলনায় অনেক ধীরস্থির আর উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত। বাকমোরের ছোট্ট দলটাকে এদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার আগে এধরনের লোকের সংখ্যা যাতে ওখানে আরও কমে সেটার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

হুই আবার মনোযোগ দিলেন খাঁড়ির দিকে, চর থেকে আবার মাথার সারি একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে দূরের পাড়ের দিকে। হুই স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে ওনাকে একটা কঠিন সিদ্ধান্তই নিতে হবে। উনি যদি আক্রমণ করতে বেশি দেরি করে ফেলেন, তাহলে অনেক বেশি ফেরারি দাস পালিয়ে যাবে উত্তরের ঘন জঙ্গলের ভেতরে, চিরতরে দূরে চলে যাবে ওনার বাহিনীর আয়ত্ব থেকে। আবার, যদি ওরা উত্তর পাড়ে পৌঁছার আগেই আক্রমণ করে বসেন তাহলে তার মানে হচ্ছে, বাকমোরকে তখন অনেক বেশি সংখ্যক শক্রুর মোকাবেলা করতে হবে। খুবই নাজুক একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে, হুই খুব ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতে লাগলেন ব্যাপারটা। যুদ্ধের পরে রাজাকে কী জবাবদিহি করবেন সেই চিন্তাটা হঠাৎ করে মাথায় আসতেই ওনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল।

"ওদের একজনকেও পালাতে দেইনি, মহামান্য।" আর এর জবাব কী হবে সেটাও উনি স্পষ্টই যেন শুনতে পেলেন। "এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই আমার সূর্যের পাখি।"

পাশে দাঁড়ানো জাহাজের অধিনায়কের দিকে ফিরলেন হুই।

"পতাকা তুলে দাও!" ঠান্ডা গলায় বললেন উনি। আর সাথে সাথেই আদেশটা চিৎকার করে জানিয়ে দেওয়া হলো সামনের ডেকে। যুদ্ধের সোনালি পতাকাটা উঠে গেল মাস্তুলের মাথায়।

জাহাজের দাঁড় বাওয়ার জায়গাটা থেকে ভেসে এল একটা কর্কশ উল্লাস ধ্বনি। হুই দেখলেন ওনার জাহাজের পেছনেই নোঙর করে থাকা অন্য জাহাজটাতেও যুদ্ধের সংকেত প্রচার হয়ে গেল।

একটা যুদ্ধ-কুঠার দিয়ে কুপিয়ে নোঙ্গরের দড়ি কেটে দিল একজন নাবিক আর দাঁড়ের বিশাল ডানা ঝাপটে সামনে বাড়লো জাহাজ দুটো। দাঁড়গুলো ঝপাশ করে পানিতে পড়ে একটা পাক দিয়ে উঠে এল আবার, ভিজে গিয়ে রোদে স্বর্ণালি আর রূপালি আভায় চকচক করে উঠছে। স্রোত ঠেলে জাহাজের সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা পায়ের নিচে অনুভব করতে পারলেন হুই, এতটাই দ্রুত যে ধাক্কায় তাল হারিয়ে পড়তে গিয়ে সামলাতে হলো তাকে। এক সারিতে এগোতে লাগল জাহাজ দুটো, বিশাল ডানাগুলো ঝাপটাচ্ছে, উজানের দিকে মাঝখানে এমনভাবে দূরত্ব রেখে এগোচ্ছে যে, মাঝে চরটাকে রেখে সহজেই নদীর প্রবাহ দুটোয় ঢুকে যেতে পারবে ওগুলো।

"ওদের সারির ঠিক মাঝ বরাবর চালাও," জাহাজের অধিনায়ককে আদেশ দিলেন হুই, চিৎকার করে হালীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হলো আদেশটা।

লোক দিয়ে ভরা রশিগুলোর দিকে এগিয়ে চললো জাহাজ দুটো, রশিগুলোয় কালো রত্নের মত সেঁটে আছে সংগ্রামরত মানুষগুলোর মাথা। পানির স্রোতের শব্দ, দাঁড় ওঠা নামার ক্যাচকোঁচ আর ছপ ছপ ছাড়িয়ে হুই শুনতে পেলেন ক্রমবর্ধমান আতংকিত মানুষের চিৎকার, যারা ইতোমধ্যেই ওদের মাথার উপর ধেয়ে আসা জাহাজের গলুইটা দেখতে পেয়েছে।

হুই জাহাজের সামনের বেরিয়ে থাকা অংশে এগিয়ে গিয়ে নিচের দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন চলা থামিয়ে জাহাজের দিকে ফিরে তাকিয়েছে সবাই, কালো চেহারায় পটভূমিতে ওদের চোখগুলো ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে। মনের ভেতরে দলা পাকিয়ে উঠতে চাওয়া করুণাটাকে জোর করে চাপা দিলেন উনি, কারণ এরা মানুষের কাতারেই পড়ে না। এর হচ্ছে শত্রু।

জাহাজের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে থাকা তীরন্দাজের দল এর মধ্যেই ওদের দিকে নিজেদের ধনুক খালি করা শুরু করেছে। হুই দেখলেন একটা তীর সোজা এসে একজনের চেহারায় গেঁথে গেল আর লোকটা দুই হাত তুলে ধাক্কা সামলানোর চেষ্টা করতেই স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

জনবহুল রশিটা ছিন্ন করে বেরিয়ে গেল জাহাজটা, তবে গতি সামান্য কমে কাত হয়ে গেল একদিকে, কারণ মানুষগুলোর সম্মিলিত ওজন রুখে দিচ্ছে জাহাজের সম্মুখ গতিকে, কিন্তু তারপরেই সেই প্রতিরোধ ছিন্ন হয়ে গিয়ে লোহার পাত লাগানো দাঁড়গুলোর নিচে ছিটকে পড়ল লোকগুলোর দেহ। সারি ধরা লোকগুলোকে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল আরও গভীর পানিতে, ঠেলে নিয়ে গেল কেল্লার দেওয়ালের কাছে, যেখানে হুইয়ের

তীরন্দাজের দল অপেক্ষায় ছিল ওদেরকে ঝড়ে পড়া ফল তোলার মত সহজ শিকারে পরিণত করার জন্য।

অগভীর পানি ধরে এগোতে লাগল জাহাজগুলো, খাঁড়ির পাথুরে মেঝেতে ঘষা খেতে লাগল ওগুলোর তলা। খাঁড়ি পার হতেই আবার চলে এল তারপরের গভীর পানিতে, হুই দৌড়ে জাহাজের পেছন দিকে গিয়ে ফিরে তাকালেন। নদীর এক কূল থেকে অন্য কূল পর্যন্ত ভরে আছে আর্তচিৎকাররত ডুবন্ত মানুষে। কয়েকজন মাথার উপর ঝুলতে থাকা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরেছে, কেউ ধরে থাকার চেষ্টা করছে পানির উপর মাথা তুলে থাকা পিচ্ছিল পাথরের আগা, কেউবা আকড়ে ধরার চেষ্টা করছে পানিতে ভাসমান কাঠ আর প্যাপিরাসের আঁটি। চরটা পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছে ভেজা আর কাঁপতে থাকা মানুষের আবরণে, এর মাঝেও বাকিরা চরটার উপর একটা পা অন্তত রাখার জায়গা বের করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, অল্প পানিতে খাবি খাচ্ছে সবাই।

সংখ্যায় এরা এত বেশি যে, এদেরকে দেখে মানুষ না বরং পোকা-মাকড়ের বাসা পরিবর্তনের কথা মনে হলো হুইয়ের। এরা যেন পিঁপড়া, হাজার হাজার পিঁপড়া। এই চিন্তাটাকেই মাথায় রেখে, উনি নিজেকে শক্ত করলেন পরবর্তী আদেশটা দেওয়ার জন্য।

জাহাজের অধিনায়ক উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে ওনার দিকে, জাহাজের পাশে ঝুলিয়ে রাখা ডোঙ্গাগুলোতে বসে থাকা নাবিকদের দিকেও চোখ গেল ওনার। ওরাও তাকিয়ে আছে জাহাজের খুপরির দিকে, অপেক্ষা করছে আদেশের।

"ঠিক আছে, অধিনায়ক," বললেন হুই, মনের মধ্যে আওড়াচ্ছেন যে এরা হচ্ছে পিঁপড়া, মানুষ না। জাহাজের অধিনায়ক ওনার আদেশ চিৎকার করে জানিয়ে দিতেই, সাথে সাথে স্রোতের আড়াআড়ি ঘুরে গেল জাহাজ। অন্য জাহাজটাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করল আর দুটো জাহাজেরই পাশ থেকে ছিটকে বের হলো ওপেটের গোপন অস্ত্র, 'বাআলের আগুন'।

নদীর উপরিভাগে ছিটিয়ে দিতেই, নিপুণভাবে ছড়িয়ে গেল সেটা, ভাসমান তরলটার উপর সূর্যের আলো পড়ে রঙধনুর রঙে বিভক্ত হয়ে যেতে লাগল, ওটার গন্ধ তৈলাক্ত আর জ্বালা ধরানো।

তারপর জাদুমন্ত্রের মত জ্বলে উঠলো তরলটা, নদীর পুরো উপরিভাগ পরিণত হলো একটা জ্বলন্ত কমলা শিখার আস্তরণে। আগুনের উপর থেকে ভকভক করে উদগীরণ হতে লাগল কালো ধোঁয়া, ওটার উত্তাপ এতটাই তীব্র ছিল যে হুই টের পেলেন ওনার দাড়ি কুচকে যাচ্ছে, সাথে সাথে পিছিয়ে গেলেন উনি।

"বাআল রক্ষা করো," আগুনের ভয়াবহতা চোখে পড়তেই ফিসফিসিয়ে বললেন হুই। মহান দেবতা বাআলের নামেই নাম দেওয়া এটার, প্রকাণ্ড

ভঙ্গিতে ওটা ভাটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিশাল নদীর এই কূল থেকে ওই কূল, আকাশ ঢেকে দিতে লাগল কালো মেঘে। মানুষে ভরা চরটার দিকে ভেসে গেল আগুনটা। আর ওটা চরটা পেরিয়ে যেতেই দেখা গেল জায়গাটা ভরে গিয়েছে কয়লা হয়ে যাওয়া মানবদেহের ধূমায়িত স্তূপে, ভেসে আসা কাঠ আর প্যাপিরাস জ্বলছে চিতার আগুনের মত।

আগুনের দেওয়াল ছুটে যেতে লাগল ভাঁটির দিকে, কেল্লার দেওয়াল ছাড়িয়ে গেল সেটা, যাওয়ার পথে জ্বালিয়ে দিতে লাগল দুই পাড়ের গাছগাছালি, পুরো নদীকে জীবনের সকল চিহ্ন মুক্ত করে ছাড়লো আগুনটা। মাত্র দশ মিনিটের ব্যবধানে ২০,০০০ প্রাণ ধরাধাম ত্যাগ করল আর তাদের পোড়া শরীর ভেসে যেতে লাগল সাগর বা নদীর বালিময় তীরে কিংবা আটকে রইলো কোনো ঘূর্ণাবর্তে গিয়ে।



ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পর, টিমন চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রইলো ধ্বংসযজ্ঞের দিকে। মাত্রই যে ভয়ানক ধ্বংসাত্মক তান্ডবলীলা ও প্রত্যক্ষ করেছে সেটাকে বিশ্বাসই করতে পারছে না, ও বিশ্বাসই করতে পারছে না যে ওর বাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি এত দ্রুত উধাও হয়ে গিয়েছে। ওর মূল বাহিনীর খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে আর।

তবে এখনও যারা আছে, তারা ওর সেরা লোকগুলোই, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, ও ভালোই জানে যে এরা ওদের প্রতিপক্ষের তুলনায় কিছুই না। ওকে এখন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সৈন্য সাজাতে হবে, আক্রমণ যে আসবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ও, তবুও ও কয়েকটা সেকেন্ড নষ্ট করল আগ্রহভরে নদীর উত্তর পাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে, যেখানে আছে ওর নিজের দেশ। সেটা থেকে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সম্ভবত চিরদিনের জন্য।

জাহাজগুলো এখন আছে তীর থেকে একশো পেস মত দূরে, সম্মুখভাগ ওর দিকে তাক করা। দেখতে দুটো বিশাল সরীসৃপ দানবের মতই অশুভ দেখাচ্ছে, একবার ওগুলোর সক্ষমতা অবলোকন করার পর, সেদিকে তাকালেই পিঠে ভয়ের শীতল একটা পরশ অনুভব করতে লাগল টিমন।

ওর পেছনেই আক্রমণ আর প্রতি আক্রমণের গর্জন শোনা গেল, সাথে ভেসে এল ঢাল আর অস্ত্রের ঝনঝনানি। টিমন ঘুরে গেল সাথে সাথে। ওর ভয়কে সত্যি করে দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমনটা ভেবেছিল, ঠিক সেরকম নিপুণতা আর সময় মেনেই হলো আক্রমণটা। শুরু হলো ঠিক

পেছন দিক থেকে, যখন ওর লোকরা সদ্যই সামনের লোকদের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে ভয়ে জড়সড় হয়ে আছে।

টিমন টের পেল ওর রাগ ফুঁসে উঠছে, পাড় ছেড়ে উপরের দিকে উঠে গেল ও, ভেতরের ঘৃণা ভাবটাও চড়ে গেল এর সাথে। রাগ আর ঘৃণা, এই দুটো শক্তির উপরেই ওর পুরো অস্তিত্ব নির্ভর করে আছে। রাগ হচ্ছে, কারণ ওকে এরকম পলকা অস্ত্র নিয়েই এমন একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে বলে। ও যখন সংঘর্ষে যোগ দিল তখন মনে মনে আবার একটা শপথ করল–শপথটা ও এর আগে শতবার করেছে। *আমার নিজের জাতির লোক দিয়ে এমন একটা বাহিনী তৈরি করবো যারা এই সাদা চামড়ার শয়তানগুলোর সমকক্ষ হবে।*

টিমন ওর নিজের লোকেরই ঠেলা ধাক্কা সামলে সংগ্রাম করে পেছন থেকে সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করতে লাগল। আক্রমনটা ওদেরকে ধীরে ধীরে ঠেলতে ঠেলতে নদীর কূলে এসে আটকে দিয়েছে, ওখানে ওরা এমন ঘন হয়ে জমে আছে যে, না পারছে প্রতি আক্রমণ করতে না পারছে অস্ত্র ফেলে দিতে।

এই ঢেউয়ে ভরা, প্রমত্ত কালো শরীরের সাগরটার ভেতর দিয়ে নিজের পথ খুঁজে নিতে গিয়ে কেমন একটা দুঃস্বপ্নের মত অনুভূতি হতে লাগল ওর। মরিয়া হয়ে টিমন চিৎকার করে আদেশ দিতে লাগল, চেষ্টা করতে লাগল সবাইকে জোর করে সামনের দিকে ঠেলে পাঠানোর বা নদীর ধার দিয়ে বাইরের দিকে সরিয়ে নেওয়ার, কিন্তু রণ হুঙ্কারের মাঝে হারিয়ে গেল ওর কণ্ঠ আর কালো মানুষের এই চাপাচাপির মাঝে ওর অমানুষিক শক্তিও তুচ্ছ লাগতে লাগল।

নিজের বাহিনীর মাথার উপর দিয়ে ও শত্রুপক্ষের শিরস্ত্রাণ আর জয়পতাকা উড়তে দেখতে পেল। তরবারি আর কুঠার একটা শান্ত কিন্তু ছন্দবদ্ধ ভঙ্গিতে উঠছে আর নামছে, শত্রুদের সামনে ওর লোকেরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে, উল্টো ঘুরে চেষ্টা করছে নিজেদের সঙ্গীদের স্তূপ হয়ে থাকা লাশের ভেতর দিয়ে পথ করে পালিয়ে যাওয়ার। একটু একটু করে চাপ বাড়ছে, পেছনের লোকদেরও দম ফুরিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, ফলে তারা বাধ্য হচ্ছে নদীর দিকে পিছিয়ে যেতে।

সামনের পদাতিকদের মাথার উপর দিয়ে তীরন্দাজ আর বর্শাবাজরা এবার টিমনের বাহিনীর মধ্যখানে শুরু করল ওদের অস্ত্রের বৃষ্টি বর্ষণ, জায়গাটা এতটাই ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে ছিল যে, যারা মারা গেল তারাও মাটিতে পড়ল না, পার্শ্ববর্তী সংগ্রামরত দেহগুলোর সাথেই আটকে রইলো।

জাহাজগুলোও চুপিচুপি এগিয়ে আসতে লাগল পাড়ের দিকে, ওগুলোর উপরের খুপরি থেকে তীরন্দাজরা টিমনের বাহিনীর সামনের দিকে তীর

মারতে শুরু করল এবার। মরিয়া মানুষের ছোটাছুটিতে পিষ্ট হতে লাগল নদীর পাড়, জ্যান্ত আর মৃত সবাই ছিটকে পড়তে লাগল খরস্রোতা পানিতে।

দ্রুতই পানির রঙ সবুজ থেকে বাদামিতে পরিণত হলো, তারপরেই সেখানে তাজা রক্ত মিশে হয়ে গেল টকটকে লাল।

"এ তো রক্তের নদী, মহানুভব," জাহাজের অধিনায়ক আলাপ করার ভঙ্গিমায় বলল। "আমি কবিদের নানান গান-এ শুনেছি এর কথা, কিন্তু এই প্রথম দেখতে পেলাম এরকম কিছু।"

হুই কোনো জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন শুধু। যুদ্ধটা একটা স্থিরাবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে। বাকমোরের দলের সাথে মাগোর বাহিনীও যোগ দিয়েছে এখন, কিন্তু তবুও ওরা শত্রু দলকে আর এক গজও পিছু হটাতে সমর্থ হচ্ছিল না। একটু পরেই চাপ কমে যাবে, কারণ এর মধ্যেই কুঠারবাজরা ক্লান্ত হতে শুরু করেছে। আর সেটা যখন হবে তখন দাস বাহিনী বাইরের দিকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে, ঠিক ছেড়ে দেওয়া ধনুকের ছিলার মত। আর হয়তো মাত্র এক আউন্স চাপের দরকার দাস বাহিনীকে নদীর পানিতে ঠেলে ফেলতে, কিন্তু সেই চাপটা পরের কয়েক মিনিটের ভেতরেই দিতে হবে।

হুই অধৈর্য হয়ে বিড়বিড় করলেন, "করছো কি বাকমোর, রক্ত দেখে অন্ধ হয়ে গেলে নাকি? যুদ্ধের নেশা কি তোমার কর্তব্য ভুলিয়ে দিয়েছে? এই তো সময় তোমার, সেটা তো বয়েই যাচ্ছে!" আর হুই কাঠের পাটাতনে উদ্বিগ্ন পায়চারি শুরু করলেন। এখন কী করা উচিত সেটা ওনার কাছে পরিষ্কার, কিন্তু উনি অবাক হচ্ছেন আর কেউ সেটা বুঝতে পারছে না দেখে।

"এখনই বাকমোর, এখনই!" অনুনয় করলেন উনি, তারপরেই স্বস্তিতে দম ফেললেন একটা।

"এক মুহূর্তও আগে না!"

বাকমোর ওর যুদ্ধ-হাতিগুলো দিয়ে এতক্ষণ একসাথে জড়ো হয়ে কোনোমতে টিকে থাকা টিমনের দলটার শেষ অংশটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিৎকার করতে করতে ছুটে এল ওগুলো, জ্যান্ত মানুষের ভেতর দিয়ে ছুটে গেল বিশাল জানোয়ারগুলো, পায়ের নিচে পিষে ফেলতে লাগল, কাউকে শুঁড় দিয়ে আকড়ে ধরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল। প্রায় ১০,০০০ আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে শুরু হয়ে গেল সমবেত অসহায় আর্তনাদ, টিমনের বাহিনী ছুটে গেল পানির দিকে।

"এখন!" চিৎকার করে উঠলেন হুই, জাহাজগুলো ছুটে গেল নদীর পাড়ের দিকে। দুটো জাহাজই একসাথে উঠে গেল পাড়ে, ওগুলো থেকে লাফিয়ে নামলো ৪০০ জন কুঠারবাজ, হুই বেন-আমনের নেতৃত্বে।

হুইয়ের লোকেরা চেষ্টা করল ওনার সাথেই থাকতে। কারণ ষষ্ঠ বাহিনীর জন্য যুদ্ধে সবচেয়ে সম্মানের জায়গাটা হচ্ছে প্রধান পুরোহিতের পাশেই

থাকা। কিন্তু শকুন কুঠারটা এত দ্রুত সামনে ধাবিত হতে লাগল যে খুব দক্ষ না হলে তার সাথে তাল রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

"জয় বাআল!" বলে চিৎকার করতে করতে ওরা রক্ত মাংসের ফসলগুলো কাটতে লাগল আর পায়ের নিচের মাটি রূপ নিল লাল কাদায়, নদীর রঙ হয়ে গেল আরও উজ্জ্বল।

একটা জটলার মাঝে টিমনকে দেখতে পেলেন হুই। চমকে গিয়ে ওনার হাতটা থমকে গেল একটা সেকেন্ড, একটা বর্শা ধেয়ে এল ওনার দিকে, ওনার পাঁজর ছুঁয়ে গেল সেটা। পেছনমুখী এক কোপে উনি পেড়ে ফেললেন বর্শাবাজকে, তারপর কুঠার চালাতে চালাতে টিমনকে ঘিরে থাকা লোকের ভেতর দিকে রাস্তা করে এগোতে লাগলেন। কাজটা করতে সময় লেগে যাচ্ছিল খুব আর টিমন ওনার সামনেই নদীর পাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

"টিমন!" মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন হুই, ওই ভয়ানক ধোঁয়াটে হলুদ চোখজোড়া ওনার দিকে ফিরে সোজা চোখে দিকে তাকিয়ে থাকলো। এটা হচ্ছে ফাঁদে পড়া চিতাবাঘের চোখ, নিষ্ঠুর আর নির্মম।

"এদিকে এসো!" ডাক দিলেন হুই। "আমার সাথে লড়াই করো!"

জবাবে টিমন যতটা সম্ভব পেছনে হেলে হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিল ওনার দিকে। মাথা নিচু করে ফেললেন হুই আর বর্শার আগা ওনার শিরস্ত্রাণের ডগা ছুঁয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার গলায় গিয়ে গাঁথলো। লোকটা চিৎকার করে উঠে পড়ে গেল মাটিতে।

টিমন ঘুরে গিয়ে, মাত্র তিনটা লম্বা কদম ফেলেই পৌঁছে গেল নদীর কূলে। দেরি না করে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল লাল পানিতে, তারপর হুইয়ের শেখানো সাঁতারের পদ্ধতিতে মাথার উপর দিয়ে হাত ঘুরিয়ে পানিতে ধাক্কা মেরে মেরে এগিয়ে যেতে লাগল সামনে।

হুইও নদীর কিনারে পৌঁছে দ্রুত হাতে নিজের শিরস্ত্রাণ আর বুকের বর্ম খুলে ফেললেন, পায়ের বর্মের চামড়ার ফিতে টান দিয়ে ছিড়ে পায়ের চপ্পল ছুঁড়ে দিলেন একদিকে।

কোমরে কুঠার বাঁধার কোমরবন্ধনীটা ছাড়া সব খুলে ফেলে নগ্ন হয়ে হুই তাকালেন নদীর দিকে। টিমন ওনার তীরন্দাজদের আওতার বাইরে চলে গিয়েছে, হুই কাপড় খুলতে খুলতে চরের দিকে প্রায় অর্ধেক এগিয়ে গিয়েছে ও।

হুই নিজেকে সোজা করে, ঝাঁপ দিলেন নদীতে, ওনার পেট গিয়ে আঘাত করল পানিতে। তারপরেই সাঁতার কাটা শুরু করলেন, ওনার ওই পেশীবহুল বাহু দিয়ে রক্তাক্ত পানি পেরিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন সামনে। পায়ের আঘাতে লাল পানির উপরিভাগ আবার ফেনায়িত সাদা হয়ে যেতে লাগল।

চরে উঠে অস্ত্র খুঁজে পেল টিমন। কয়লা হওয়া দেহগুলোর বর্শা চরজুড়ে ছড়িয়ে আছে।

হুই পানিতে ঠেই পেয়ে যেই কূলের দিকে এগোতে গেলেন, টিমন ওগুলোর প্রথমটা ছুঁড়ে দিল ওনার দিকে। হুই ওনার কুঠার দিয়ে বাড়ি মেরে সরিয়ে দিলেন ওটাকে, বিশাল প্রজাপতির মত দেখতে ফলাটায় বর্শার মাথাটা এসে বাড়ি খেলো, বাতাসের ভেতর এমনভাবে বর্শাটা গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল, যেন ওটা একটা পতঙ্গ।

আবার আরেকটা ছুঁড়ে দিল টিমন, আবার–কিন্তু ততোক্ষণে হুই ওই পাথুরে, লাশ দিয়ে ভরা মাটি পেরিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করেছেন আর প্রতিটা ছুঁড়ে দেওয়া বর্শাই কুঠারের ফলায় আটকে গিয়ে পাক খেতে খেতে ওনার কোনো ক্ষতি না করেই আছড়ে পড়তে লাগল মাটিতে।

মরিয়া হয়ে টিমন ঝুঁকে পড়ে নদীর পাড় থেকে একটা গোল দেখতে পাথর তুলে নিল, মানুষের মাথার সমান বড় সেটা। ও দুই হাত দিয়ে ওটাকে মাথার উপর তুলে ধরে, এক পা এগিয়ে ছুঁড়ে দিল সামনে। সরতে পারার আগেই, পাথরটা এসে আঘাত করল হুইয়ের কাঁধে আর পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেলেন উনি, কুঠারটা হাত থেকে ছুটে, ছিটকে গেল একদিকে।

টিমন ওনার দিকে ছুটে গেল, রাগ আর ঘৃণায় কোনো হুঁশ নেই ওর। হুই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মাটিতে, একটা ছুঁড়ে দেওয়া বর্শার মতই উনিও ধেয়ে গেলেন সামনে।

হুইয়ের মাথার চাঁদি গিয়ে আঘাত করল টিমনের পাঁজরের খাঁচার ঠিক নিচে, হুক করে একটা আর্তনাদ করে ওর ফুসফুসের সব বাতাস বেরিয়ে গেল গলা দিয়ে। টিমন ভাজ হয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল নিচে, দুই হাত দিয়ে চেপে ধরেছে বুক।

হুই ওর উপরে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর গদা চেপে ধরার ভঙ্গিতে দুই হাতের মুঠি এক করে ধরে, হাতের মুঠির হাড়ের হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলেন টিমনের কানের ঠিক নিচে, টিমন জ্ঞান হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পাথরের উপর।

"আমি তোমাকে হত্যা করতে পারবো না, টিমন," ধূসর কুয়াশার ভেতর থেকে যেন হুইয়ের গলার স্বর ভেসে এল টিমনের কাছে, যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছেন উনি। "যদিও মৃত্যুই প্রাপ্য তোমার কারণ তুমি যা করেছো তা এর আগে কেউই কখনো করেনি। আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছো তুমি। আমার আর আমার রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছো–মৃত্যুই প্রাপ্য তোমার।"

হুইয়ের চেহারাটা নজরে এল এখন ওর, টিমন টের পেল ও পিঠে ভর দিয়ে দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে শুয়ে আছে। নাড়ার চেষ্টা করতেই বুঝলো

বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। চামড়ার ফিতে ওর আঙুলের সাথে পেঁচিয়ে বেঁধে মাটির গভীরে পুতে রাখা হয়েছে, ওকে নড়তে দিচ্ছে না সেটা। মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে বুঝতে পারলো যে চরের উত্তর প্রান্তে এখন আছে ওরা, দক্ষিণ পাড়ের সবার চোখের আড়ালে আর হুইয়ের সাথে একাকী।

ওর পাশের পাথরগুলোর উপরেই, ভেসে আসা কাঠ দিয়ে একটা ছোট অগ্নিকুণ্ডলী জ্বলানো হয়েছে। বাআলের আগুনের কারণে, তখনও জ্বলতে থাকা কয়লা থেকে জ্বালিয়েছেন সেটা হুই, আগুনের ভেতরে একটা চওড়া বর্শার মাথা উত্তপ্ত করা হচ্ছে, হাতল ভেঙে ছোট করে রাখা হয়েছে ওটার।

"হাতে সময় বেশি নেই। কিছুক্ষণ পরেই আমার লোকেরা আমাকে খুঁজতে চলে আসবে। আর তখন আর কিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না," হুই যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। "আমি আমার দেবতাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাই আমি তোমাকে তোমার প্রাপ্য শাস্তিটা দিতে পারছি না। কিন্তু তবুও আমার রাজা আর আমার জনগণের প্রতি কর্তব্য থেকেই যায়। তোমাকে আর কখনো আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সুযোগ দিতে পারি না আমি।

"রোমানরা এই সমস্যার একটা সমাধান বের করেছে, যদিও আমি রোমের সমস্ত কিছুকে ঘেন্না করি, এই মুহূর্তে ওদের পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

হুই উঠে দাঁড়িয়ে টিমনের উপর ঝুঁকে গেলেন।

"তোমার ক্ষেত্রে আমার অনুমান ভুল ছিল। কারো পক্ষে একটা বন্য চিতাবাঘকে পোষ মানানো সম্ভব না।" হুই শকুন কুঠারটাকে ওনার ডান হাতে তুলে ধরলেন। "তুমি কখনোই টিমন হওনি, সবসময়েই মানাতাসসিই ছিলে। আমার আর তোমার গায়ের রঙের যে পার্থক্য, তোমার আর আমার মাঝে মানুষ হিসেবেও সেই পার্থক্য। আমাদের মাঝে কখনোই কোনো সম্পর্ক ছিল না, ছিল একটা ভ্রান্তি, যদিও আমাদের মুখ থেকে একই ভাষা বের হয়, কিন্তু আমাদের কান সেটা ভিন্নভাবে শোনে।

"তোমার নিয়তি ছিল আমার প্রিয় যা কিছু আছে, আমার লোকজন যা কিছু গড়ে তুলেছে আর লালন করেছে তার সবকিছু ধ্বংস করা। আর আমার নিয়তি হচ্ছে সেগুলোকে রক্ষা করা, আমার নিজের জীবন আর রক্তের বিনিময়ে হলেও।" হুই থামলেন একটু, কথাগুলো বলার সময় ওনার বুকের ভেতর সত্যিকার আবেগ উথলে উঠতে লাগল। "আমি তোমাকে মারতে পারবো না, কিন্তু আমাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন আর কোনোদিন তুমি অস্ত্র হাতে নিতে না পারো।"

শকুন কুঠারটা নেচে উঠলো, টিমন একবার মাত্র চিৎকার করে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে গোঙাতে শুরু করল। ওর বিচ্ছিন্ন ডান হাতটা এমনভাবে

মোচড়াতে আর কাঁপতে লাগল যেন চরের দগ্ধ মাটির উপর কোনো মুমূর্ষু জানোয়ার তড়পাচ্ছে।

হুই তপ্ত বর্শার মাথাটা আগুন থেকে তুলে এনে হাতের কাটা জায়গাটায় চেপে ধরে রক্তনালীগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন, জায়গাটা হিসহিস করে উঠে কটু গন্ধযুক্ত ধোঁয়া বের হতে লাগল। তারপর টিমনকে বেঁধে রাখা দড়িগুলো কেটে দিলেন উনি।

"যাও," বললেন হুই। "নদীর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আমার লোকেরা এখুনি চরটা খুঁজতে চলে আসবে।"

টিমন হাচড়ে পাচড়ে নদীর ধারে নিয়ে গেল নিজেকে, তারপর পানির ধারে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে তাকালো হুইয়ের দিকে। ওরা বিশাল কালো দেহটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে, ওর চোখজোড়ার অবস্থাও শোচনীয়।

ধীরে ধীরে পানির ভেতরে নেমে গেল ও, দগদগে কাটা ক্ষতটা অন্য হাত দিয়ে বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়ি করে ধরে রেখেছে। স্রোত টেনে নিয়ে গেল ওকে, মাথাটা ছোট হতে হতে চওড়া নদীর মাঝে একটা ফুটকিতে রূপান্তরিত হলো একসময়। তারপর কেল্লার নিচের বাঁক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। হুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত দেখলেন, তারপর ঝুঁকে পড়ে কাটা হাতটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে আগুনে ফেলে, শুকনো লাকড়ি দিয়ে ঢেকে দিলেন উপরে।



নদীর পাড় ধরেই, মাটি খুঁড়ে মড়া পোড়ানোর চিতা সাজালো বাকমোর, তারপর ও আর হুই মিলে কাঠের শয্যার উপর সারি ধরে শুয়ে থাকা মৃত যোদ্ধাদেরকে মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেল শেষবারের মত তাদেরকে বিদায় জানাতে। হুই মাগোর লাশের কাছে এসে থেমে দাঁড়িয়ে তাকালেন সেদিকে। মৃত্যুর মাধ্যমেই কেল্লার অধিনায়ক সেই সম্মান পেলেন যা উনি সারাজীবন আকাঙ্ক্ষা করেছেন।

"গৌরবের স্বাদ কেমন মিষ্টি লাগছে, মাগো?" নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন হুই, ওনার মনে হলো মাগো যেন চিরনিদ্রার মাঝেই হাসলেন।

বাআলের স্তুতি পাঠ করে নিজের হাতে চিতাগুলোয় আগুন জ্বেলে দিলেন হুই।

সেট-এর দুর্গে যখন ফিরলেন, তখন ওনাকে স্বাগত জানাতে তানিথকে দেওয়ালে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল না। ওকে ওর নিজের ঘরেই পেলেন হুই। বসে বসে কাঁদছে ও, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, চোখের নিচে ফুটে আছে গাঢ় নীল কালি।

"আপনার জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, মহানুভব। আমার হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভেতরে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি এক ফোঁটা কাঁদিনি। পুরোটা সময় সাহস দেখিয়েছি। পুরো আতংকের সময়টা পার করেছি শক্ত থেকে। কিন্তু যখন ওরা বলল আপনি নিরাপদেই আছেন, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। খুব বোকা আমি, তাই না?"

ওকে জড়িয়ে ধরে হুই জিজ্ঞেস করলেন, "কবিদের কাব্যগাথার মত লেগেছে ব্যাপারটা? গৌরবের আর বীরসুলভ ছিল লড়াইটা?"

"ব্যাপারটা ছিল ভয়াবহ," ফিসফিস করে বলল তানিথ। "আমার দুঃস্বপ্নগুলোর চাইতেও ভয়ানক। খুবই কুৎসিত ছিল ব্যাপারটা, মহানুভব, এত কুৎসিত যে সৌন্দর্যের ব্যাপারেই আমাকে অসহ্য করে তুলেছে।" তারপরেই চুপ করে গেল ও, পুরো ব্যাপারটাই আবার মনে পড়ছে ওর। "আপনারা কবিরা কখনোই রক্ত, আহতের আর্তনাদ আর–আর অন্য ব্যাপারগুলোর কথা কখনো বলেন না।"

"না," সায় দিলেন হুই। "সেটা আমরা করি না কখনো।"

রাতের বেলা হুই ঘুম ভেঙে দেখতে পেলেন যে তানিথ গদিতে ওনার পাশেই বসে আছে। ঘরের বাতি কমিয়ে রাখা আর ওর চেহারার মাঝে চোখ দুটোকে মনে হচ্ছে কালো কোনো দীঘি।

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন হুই। কয়েক সেকেন্ড পরে গিয়ে কথা ফুটলো তানিথের মুখে।

"মাননীয়, আপনি এত নরম, এত দয়ালু। কিন্তু আজকে যা ঘটলো তা করলেন কীভাবে?"

হুই জবাব দিতে গিয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ।

"এটা ছিল আমার দায়িত্ব," অবশেষে ব্যাখ্যা করলেন উনি।

"যারা একটু নিম্ন শ্রেণীর তাদেরকে হত্যা করা আপনার দায়িত্ব?" সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করল তানিথ।

"বিদ্রোহী দাসদেরকে মেরে ফেলাটাই আইন।"

"আইন ভুল তাহলে," গরম কণ্ঠে ঘোষণা দিল তানিথ।

"না," মাথা নাড়তে লাগলেন হুই। "আইন কখনো ভুল না।"

"হ্যাঁ, ভুল!" তানিথ আবারও প্রায় কেঁদেই ফেলল। "ভুল!"

"অরাজকতার হাত থেকে বাঁচার জন্য শুধু আইনই হলো একমাত্র অস্ত্র, তানিথ। যদি আইন আর দেবতাদেরকে মেনে চলো তাহলে কোনোদিন তোমাকে কিছুকে ভয় পেতে হবে না।"

পরদিন সকালে লানন হাইকানাস এসে পৌঁছালেন সেট-এ। যুদ্ধ সাজে সজ্জিত পুরো দুই বাহিনী সৈন্য আর পঞ্চাশটা যুদ্ধ-হাতি নিয়ে এলেন সাথে।

"মাফ করবেন, আমি বোধহয় বেশি লোভী হয়ে গিয়েছি হুজুর," কেল্লার ফটকে রাজাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন হুই। "আপনার জন্য একটাকেও

বাকি রাখিনি আমি।" লানন হো হো করে হেসে উঠে জড়িয়ে ধরলেন হুইকে। তারপর একটা হাত হুইয়ের কাঁধে রেখেই ওনার বাকি লোকদের দিকে ফিরলেন।

"তোমাদের মাঝে কে যেন বলেছিলে যে বেন-আমন যুদ্ধ করবে না?"

সেদিন রাতে মাতাল হওয়ার আগে, হুই রক্তের নদীর যুদ্ধটাকে স্মরণীয় করে রাখতে যে গীতিকাব্যটা রচনা করেছিলেন সেটা গেয়ে শোনালেন, ওনার গাওয়ার ভঙ্গিমায় ফোঁপাতে লাগলেন লানন। গান শেষে উনি নিজের লোকদের দিকে ফিরে চিৎকার করে বললেন:

"তিরিশ হাজারের বিপরীতে তিন হাজার–আমাদের জন্য লজ্জার ব্যাপার যে আমরা সেদিন হুই বেন-আমনের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারিনি।"

লানন উঠে দাঁড়ালেন। "আমি তোমাদের সামনে ওপেটের সকল বাহিনীর প্রধান সেনাপতির নাম ঘোষণা করছি। সে হলো হুই বেন-আমন, দেবতাদের কুঠারবাহক।"

রাজা আর পুরোহিত দুজনেই সেদিন পাড় মাতাল হয়ে গেলেন।



গন্ডোয়েনি, ভেন্ডির ২০০ সামন্ত রাজার একজন, ওনার জমিদারি কাল গর্গের দুর্গম এলাকাটা পর্যন্ত বিস্তৃত, জায়গাটা সমাজচ্যুত সন্ত্রাসীদের জায়গা। গন্ডোয়েনি লোকটা মোটা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যেহেতু উনি বিচক্ষণ লোক, তাই পাহাড়ের মাঝের একটা জায়গায় যেখানে এই সন্ত্রাসীদের আনাগোনা ছিল, সেখানে নিয়মিত লবণ আর মাংসের তোহফা রেখে আসতেন। বিচক্ষণ হওয়ার কারণেই যেসব একাকী লোক পাহাড়ের দিকে যাত্রা করতো বা ফিরে আসতো তাদেরকে খাবার আর আশ্রয় দিতেন; তারা ওনার গ্রাম ছেড়ে গেলে, এখানে থাকার স্মৃতিটাও চলে যেত তাদের সাথেই।

ঠিক এভাবেই একজন লম্বা, গাট্টাগোট্টা, অচেনা লোক এক রাতে হাজির হলো ওনার আঙ্গিনায়। লোকটাকে রান্নাঘরে বসিয়ে, খাবার আর তাড়ি খেতে দিলেন উনি। লোকটার নিরাসক্ত খুনে দৃষ্টি আর গনগনে হলুদ চোখের আড়ালে ক্ষমতা আরেকটা উদ্দেশ্যের আভাস টের পেলেন গন্ডোয়েনি। কেন যেন লোকটার প্রতি অস্বাভাবিক স্নেহ অনুভব করতে লাগলেন উনি, সচরাচরের তুলনায় অনেক বেশি আলাপ করলেন তার সাথে। যদিও লোকটা ভেন্ডি ভাষায় কথা বলছে, কিন্তু পথিককে দেখে মনে হলো না যে সে এখানকার আদিবাসীদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আর ব্যাপার স্যাপার সম্পর্কে

কিছু জানে। এমনকি আগের রাজা মানাতাসসিকে সাদা শয়তানগুলো নদীর ওপাড়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে সর্বগোত্রীয় রাজা কে হয়েছে সেটাও জানে না।

"মানাতাসসির ছয় ভাইয়ের মধ্যে, পাঁচজনই মরে গিয়েছে। ওদের মেঝ ভাই খানি-র বানানো বিশেষ একটা তাড়ি খাওয়ার পরে রহস্যজনকভাবে মারা যায় তারা। শুধু খানিই বেঁচে ছিল সেদিনের খাওয়াদাওয়ার পরে।" বলতে বলতে গন্ডোয়েনি মুখ টিপে হেসে ইঙ্গিতময়ভাবে অচেনা লোকটার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

"সে-ই এখন আমাদের রাজা, মহান কালো ষাঁড়, রাজস্ব সংগ্রহকারী, স্বর্গের বজ্রপাত, ভেন্ডির হোঁৎকা রক্তচোষা যার আছে পাঁচশো বৌ আর পঞ্চাশটা ছেলে।" গন্ডোয়েনি ওয়াক করে এক দলা থুথু ফেললেন আগুনে, তারপর তাড়ির পেয়ালা থেকে এক ঢোক খেয়ে এগিয়ে দিল অচেনা লোকটার দিকে। লোকটা পেয়ালাটা নেওয়ার সময় গন্ডোয়েনি খেয়াল করলেন যে তার ডান হাত নেই, তবে, কাটা অংশটা দিয়েই পাত্রটা চেপে ধরলো সে।

"মানাতাসসির পরিষদের লোকজনের কী হয়েছে, ওর যুদ্ধের সেনাপতি, ওর গোত্রীয় ভাইদের?" জিজ্ঞেস করল অপরিচিত। "তারা কোথায় এখন?"

"বেশিরভাগই শকুনের ভোজে গিয়েছে।" বলতে বলতে গন্ডোয়েনি তর্জনী দিয়ে গলা বরাবর একটা টান দেওয়ার ইশারা করলেন।

"বেশিরভাগই?"

"কয়েকজন খানির কাছে গিয়ে তার নিমক খাওয়া শুরু করেছে–বাকিরা ভেগেছে।" গন্ডোয়েনি পাহাড়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন, চাঁদ ওঠা আকাশের পটভূমিতে কোনো সুপ্রাচীন হাঙরের কালো দাঁতের মত দেখাচ্ছে ওগুলো এখন। "কয়েকজন আমার প্রতিবেশী। সন্ত্রাস করে বেড়ায়, কাউকেই খাজনা দেয় না, পাহাড়ে অপেক্ষা করে আছে কীজন্য তা ওরা নিজেরাও জানে না।"

"ওরা কারা?"

"জিঙ্গালা।"

"জিঙ্গালা মানে কামার ছিল যে?" আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলো অপরিচিত, গন্ডোয়েনির অভিব্যক্তি পাল্টে গেল সাথে সাথে। চোখ বড় বড় করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন উনি।

"প্রয়োজনের চাইতে বেশি-ই জানেন দেখি আপনি," নরম গলায় বললন গন্ডোয়েনি। "আমাদের এখন ঘুমাতে যাওয়াই ভালো হবে।" উনি উঠে দাঁড়িয়ে একটা কুঁড়ের দিকে দেখিয়ে দিলেন। "ওখানে ঘুমানোর জন্য একটা মাদুর পাতা আছে। একটা কচি মেয়েকে পাঠাচ্ছি আপনার সেবা করার জন্য।"

মেয়েটার বাধ্য শরীরে অপরিচিত লোকটার কামনা যেন ব্যথা আর কষ্টের এক উন্মত্ত ঝড় বইয়ে দিল, গন্ডোয়েনি মেয়েটাকে ব্যথা আর ভয়ে কাঁদতে শুনতে পেলেন। অস্থির আর বিচলিত হয়ে, শুয়ে শুয়ে জেগেই রইলেন উনি, কিন্তু যখন ভোরে অপরিচিতের কুঁড়েতে গেলেন, দেখলেন মেয়েটা কুঁকড়ে-মুকড়ে বিধ্বস্ত হয়ে শুয়ে আছে কিন্তু লোকটা আর নেই।



একটা গভীর খাত আলাদা করে রেখেছে পর্বতগুলোকে, এতই গভীর যে সূর্যের আলো পৌঁছায় না ঠিকমতো, অন্ধকার রাস্তাটা আগাছায় ভরা, প্রচণ্ড পিচ্ছিল। খাতের শেষ মাথায়, পাহাড়ের গা থেকে রূপালি একটা ধারা ঝরে পড়ছে নিচে, বাতাসের ধাক্কায় সেটা থেকে পানি ছলকে এসে মিহি শীতল কুয়াশা তৈরি করছে ওখানে। মানাতাসসি উপরে ওঠা শুরু করতেই ওর চেহারায় এসে লাগতে লাগল সেই ভেজা বাতাস।

বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা সমতল জায়গায় থামলো ও, ঠান্ডায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা করে উঠলো ডান হাতের কাটা অংশটা। ব্যথাটাকে উপেক্ষা করে চেতনার গভীরে ঠেলে দিল ওটাকে, তারপর ফিরে তাকালো খাতটার গভীর অন্ধকার পেটের দিকে।

ওর থেকে অনেক উঁচুতে, পাহাড়ের উপরে, দুপুরের আকাশের ফ্যাঁকাসে নীলের বিপরীতে একটা মানুষের খর্বকায় অবয়ব দেখা যাচ্ছে। অবয়বটা দাঁড়িয়ে আছে একদম স্থির হয়ে, স্থিরাবস্থাটাই কেমন অশুভ মনে হচ্ছে।

সাথে আনা একটা ছোট ঠান্ডা ভুট্টার পিঠা আর ঝর্ণা থেকে পরিষ্কার শীতল পানি খেয়ে নিয়ে আবার ওঠা শুরু করল মানাতাসসি। আগের অবয়বের পাশে আরও কয়েকটা অবয়ব দেখা গেল এখন। আড়াল ছেড়ে, নীরবে আর আচমকাই উদয় হয়েছে এরা। ঢালের গায়ে অথবা সহজে দাঁড়ানো যায় এমন কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে সবাই দেখতে লাগল ওকে।

ওদের মাঝে একজন দাঁড়িয়ে ছিল একটা বিশাল পাথরের চাঁই-এর উপর, পুরো চল্লিশ ফুট উঁচু পাথরটা দাঁড়িয়ে আছে পুরো খাতটাই জুড়েই। লোকটা লম্বা, পেশল দেহ আর ভারি অস্ত্রে সজ্জিত। মানাতাসসি চিনতে পারলো তাকে, ওর পুরনো সেনাবাহিনীর একটা দলের অধিনায়ক ছিল সে।

মানাতাসসি চাঁইটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে আলখাল্লাটাকে ফেলে দিল কাঁধের উপরে, কিন্তু চেহারা বেরিয়ে আসার পরেও লোকটা চিনতে পারলো না ওকে। এই ক্ষত বিক্ষত চেহারা–ব্যথা আর ঘৃণা যেটা থেকে লাবণ্য কেড়ে

নিয়েছে, চাবুক আর মুগুর যেটাকে নতুন একটা রূপ দিয়েছে–সেটার আড়ালে ওর রাজাকে চিনতে পারলো না।

"আমি কি এতটাই বদলে গিয়েছি?" মন খারাপ করে ভাবলো মানাতাসসি। "আমাকে কি কেউই চিনতে পারবে না আর কখনো?"

ও আর লোকটা দুজন দুজনের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো দীর্ঘ কয়েকটা সেকেন্ড, তারপর মানাতাসসিই কথা বলল প্রথম।

"আমি জিঙ্গালাকে খুঁজছি, কামার।"

মানাতাসসি জানে যে, জিঙ্গালা এখন সন্ত্রাসীদের দলে যোগ দিলেও, ওর মত বিখ্যাত একজন কামারের নিশ্চয়ই এখনও অনেক খদ্দের থাকবে। তাই কাজ নিয়ে আসলে, একাকী আর নিরস্ত্র অবস্থায় ওকে তার কাছে যেতে দেওয়া হবে নিশ্চয়ই।

পাথরের চাঁই-এর উপরে দাঁড়ানো প্রহরী নিজের মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে, থুতনি বাঁকিয়ে ইশারা করল খাত বেয়ে উঠে যেতে। তার নির্দেশ অনুসরণ করে উপরে উঠে গেল মানাতাসসি।

ঝর্ণার পাশের কালো পাথরের পাহাড়টার গাঁ বেয়ে উঠে গিয়েছে সরু ধাপ, মানাতাসসি চূড়ায় উঠেই দেখে যে অস্ত্রধারী লোকজনকে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ওর অপেক্ষায়। সামনে দৃশ্যমান একমাত্র পথটা ধরে ও লম্বা পায়ে এগোনো শুরু করতেই, বাকিরাও ওর দুই পাশে ছড়িয়ে পেছন পেছন এগোতে লাগল, রাস্তাটা চলে গিয়েছে পর্বতের চূড়ার ঘন বনের মাঝ দিয়ে।

চিমনির ধোঁয়া পথ দেখাতে লাগল মানাতাসসিকে, অবশেষে ও পাথরের তৈরি একটা প্রাকৃতিক আম্ফিথিয়েটার-এ এসে উপস্থিত হলো। গামলার মত জায়গাটা আড়াআড়িতে প্রায় একশো পেস মত হবে, এখানেই জিঙ্গালা নিপুণ হাতে লোহা দিয়ে কাজ করে।

একটা চুল্লীর ধারে কাজ করছিল বৃদ্ধ কারিগর, আকরিক ঠেসে ঢোকাচ্ছিল ওটার পেটের ভেতরে, আকরিকের প্রতিটা দলা নিজের হাতে খুব সতর্কতার সাথে বাছাই করা। ওর নবিসরা সম্ভ্রমের সাথে জড়ো হয়ে আছে চারপাশে, আকরিকের উপর চুনাপাথর আর কয়লার আস্তরণ দেওয়ার জন্য।

কাজ শেষে সোজা হয়ে, ব্যথা করতে থাকা পিঠের পেশীগুলোয় হাত বুলাতে বুলাতে জিঙ্গালা খেয়াল করল যে, একজন লম্বা অপরিচিত লোক আরও কয়েকজন সমেত গামলার ভেতর প্রবেশ করল। লোকটার হাঁটার ভঙ্গিতে চেনা চেনা কিছু একটা আছে, বিশেষ করে কাঁধ ছড়িয়ে রাখার ভঙ্গিমা, মাথার সামান্য ঝুঁকে থাকা–জিঙ্গালা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো সেদিকে। ওর দুই হাত ঝুলে পড়ল দুই পাশে, অনিশ্চিতভাবে মাথা দোলাতে লাগল ও, কারণ লোকটার বৈশিষ্ট্যগুলো খুব গভীরে থাকা কিছু স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে আবার। অচেনা লোকটা সামনে থেমে দাঁড়িয়ে সোজা

জিঙ্গালার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো–ওই চোখজোড়া–হলুদ, ভয়ানক আর প্রভাব বিস্তারকারী চোখ। দ্রুত অচেনা লোকটার পায়ের দিকে তাকালো ও, দেখতে পেল আঙুলগুলোর মাঝের গভীর ফাঁকটা। চিৎকার করে বিলাপ করে উঠে মাটিতে চেহারা ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে গেল জিঙ্গালা। তারপর মানাতাসসির একটা বিকলাঙ্গ পা তুলে নিয়ে ঠেকালো নিজের ধূসর হয়ে আসা চাঁদির উপর।

"আদেশ করুন," কেঁদে কেঁদেই বলল ও। "আদেশ করুন, মানাতাসসি, মহান কৃষ্ণ জানোয়ার, স্বর্গের বজ্রপাত।"

নামটা শোনা মাত্রই, বাকিরাও এমনভাবে মাথা নুইয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল যেন বিদ্যুৎ আঘাত করে শুইয়ে দিয়েছে ওদেরকে।

"আদেশ করুন," সবাই সমবেতভাবে বলল। "আদেশ করুন, হাজার গাভীর একমাত্র কালো ষাঁড়।"

মানাতাসসি ওর সন্ত্রাসী দলটার দিকে তাকালো, সবাই ওকে ঘিরে উপুড় হয়ে আছে, তারপর নরম কিন্তু এমন একটা কণ্ঠে কথা বলা শুরু করল যে ওদের প্রত্যেকের অন্তরে গিয়ে বিঁধে গেল কথাগুলো।

"আমি তোমাদেরকে একটা আদেশই দেব, সেটা হচ্ছে–শর্তহীন আনুগত্য!"



চুল্লিটা দেখতে গর্ভবতী মহিলার পেটের মত, কাদা দিয়ে বানানো আকরিক ঢোকানোর চেরাটাও দেখতে ছড়ানো উরুর মাঝের যোনীপথের মত লাগে।

গনগনে আকরিককে আরও বেশি নরম করতে, ছাগলের শিং-এর তৈরি হাঁপরের মুখনলটাকে চেরার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে জিঙ্গালা। ইচ্ছাকৃতভাবেই মুখনলটার আকৃতি একটা শিশ্নের মত করে বানানো হয়েছে, পুরো কাজটা করা হচ্ছে কঠোর নিয়ম কানুন মেনে ধাপে ধাপে, জন্মের সময় যে ভজন গাওয়া হয়, নবিসরা সবাই মিলে সেটা গাইতে লাগল, জিঙ্গালা ঠিক একজন দাই-এর মতই একটা চামড়ার জোব্বা পরে ঘেমে নেয়ে পরিশ্রম করতে লাগল, ক্রমাগত ফুঁ দিয়ে চললো চামড়ার হাঁপরগুলোতে।

অবশেষে যখন কাদামাটির তৈরি ছিপিটা খোলা হলো আর গলিত ধাতুটা ফুটন্ত ধারা হিসেবে বেরিয়ে এসে বালির তৈরি ছাঁচের ভেতর পড়ল, তখন দর্শকদের ভেতর থেকে ভেসে এল স্বস্তি আর অভিনন্দনের গুঞ্জরণ।

একটা আয়রনস্টোনের নেহাই আর একজোড়া বিশেষ হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জিঙ্গালা তৈরি করল সিংহের থাবাটা। এতে আছে পাঁচটা বিশাল

লোহার নখর আর নিরেট ধাতুর হাতা। তারপর সেটাকে রেতি দিয়ে ঘষে, পালিশ করে চকচকে করে নিল। সবশেষে আবার ওটাকে উত্তপ্ত করে, তাতে মিশিয়ে দিল চিতাবাঘের রক্ত আর জলহস্তীর চবি।

একজন দক্ষ চামড়ার কারিগর কাঁচা হাতির চামড়া দিয়ে মানাতাসসির ডান হাতের কাটা জায়গাটার মাপমতো একটা খোল তৈরি করে দিল। লোহার থাবাটা নিখুঁতভাবে খোলটার সাথে লাগিয়ে মানাতাসসির কাটা হাতে পরিয়ে দিতেই সেটা পরিণত হলো রক্তমাংসের হাতের চাইতেও শক্তিশালী, একটা ভয়ালদর্শন কৃত্রিম হাতে।

লোহার থাবাটা যখন ভেন্ডির সর্বগোত্রীয় রাজা আর মানাতাসসির সৎ ভাই খানি-র খুলির উপরের অংশ উড়িয়ে দিল, তখন সে একটা মেয়ের সাথে সঙ্গমরত অবস্থায় ছিল। তার নিচের মেয়েটা এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেল।



বুথেলজির রাজা সোন্ডালার প্রজা সংখ্যা অনেক, গবাদি পশুও আছে কয়েক পদের, কিন্তু চারণ ভূমি যেটা আছে সেটা খুবই ছোট, পানযোগ্য পানিও এত কম যে খরার মৌসুমে তার জনগন আর পশুগুলোর জন্য পর্যাপ্ত পানির সংস্থান সম্ভব হয় না।

লোকটা খাটো কিন্তু গাট্টাগোট্টা, চঞ্চল চোখ নড়ছে সারাক্ষণ, মুখে হাসি লেগেই আছে। বিশাল নদীর ধারের সকল গোত্রের মাঝে ওনার গোত্রটাই অতি সম্প্রতি উত্তর দিক থেকে এসেছে, ফলে একই সাথে একদিকে শক্তিশালী ভেন্ডি উপজাতি আর অন্যদিকে সাদা আলখাল্লাঅলা, লম্বা দাড়ির, বাদামি চামড়ার ড্রাভদের হাতে নিষ্পেষিত হয়ে চলছেন। সেই কারণেই একদম মরিয়া হয়ে ছিলেন উনি, দুই কান খাড়া করে ছিলেন এই অত্যাচার থেকে মুক্তির যে কোনো প্রকার প্রস্তাব শোনার জন্য।

মশালের আলোয় বসে কুঁড়ের অপর প্রান্তে বসা একহারা চেহারার দেবতাতুল্য অবয়বটার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে, চোখ পিট পিট করে তাকাতে লাগলেন উনি–এই রাজাটার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত, পা পাখির নখরের মত আর হাতে লোহার থাবা।

"আপনার বারোটা বাহিনী আছে, প্রতিটায় আছে দুই হাজার করে সৈন্য," মানাতাসসি বলল ওনাকে। "আপনার পাঁচ প্রজন্মের কুমারী আছে, প্রতিটায় পাঁচ হাজার করে। এছাড়াও আছে, সাম্প্রতিক হিসাব মতে, এক লক্ষ সাতাশ হাজার গরু, গাভী, ষাঁড়, মহিষ আর বাছুর।"

সোন্ডালা হেসে অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলেন, ভেন্ডি রাজার বুদ্ধিমত্তার প্রখরতায় মুগ্ধ।

"এই বিশাল জনসংখ্যার জন্য খাবার, ঘাস আর পানি পাবেন কোথায়?" জিজ্ঞেস করল মানাতাসসি, সোন্ডালা হেসে শুনতে লাগলেন মন দিয়ে।

"আমি আপনাকে গরু চরানোর জায়গা দেব, থাকার জন্য জমি। এমন জায়গা দেব যেটা ফল ফসল আর তাজা ঘাসে ভরা, এমন বিশাল আয়তন তার যেখানে আপনার লোকজন দশ প্রজন্ম ধরে হাঁটলেও সীমা খুঁজে পাবে না।"

"বিনিময়ে আমার কাছে কী চান?" অবশেষে অস্ফুটে বলতে পারলেন সোন্ডালা, এখনও হাসছেন আর চোখের পাতা ফেলার পরিমাণও বেড়েছে।

"আমি আপনার সৈন্যবাহিনীকে আমার কর্তৃত্বে চাই। আপনার বর্শা চাই আমার হাতে, আপনার ঢালকে চাই...আমার পাশে কুচকাওয়াজরত অবস্থায়।"

"যদি আমি মানতে না চাই?" সোন্ডালা জিজ্ঞেস করলেন।

"তাহলে মেরে ফেলা হবে আপনাকে," বলল মানাতাসসি। "তারপর আপনার সেনা বাহিনী আর মহিলাদের পাঁচ প্রজন্মকেও দখল করে নেব, সেই সাথে আপনার এক লক্ষ সাতাশ হাজার গবাদি পশুও–শুধু দশটা বাদে, ওগুলোকে আপনার আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আপনার কবরের উপরে বলি দেওয়া হবে।" মানাতাসসিও হেসে দিল তখন, ওই তোবড়ানো মুখটায় দাঁতগুলো এমন বিকট হয়ে দেখা গেল যে সোন্ডালার নিজের হাসি জমে গেল জায়গায়।

"আমি আপনার একান্ত অনুগত," ধরা গলায় বললেন উনি। তারপর মানাতাসসির সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন। "আদেশ করুন।"

"আদেশ শুধু একটাই," নরম গলায় বলল মানাতাসসি। "আর সেই আদেশটা হলো–শর্তহীন আনুগত্য!"



প্রথম বছর ভিঙ্গো, সাতাসসা আর বে গোত্রের সাথে চুক্তি করতে সমর্থ হলো মানাতাসসি। ঝোটা উপজাতির সাথে একটা মাত্র লড়াইতেই জিতে গেল ও, সেখানে এমন বৈপ্লবিক আর নির্মম কৌশল অনুসরণ করল যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র বিশ মিনিটের মাঝে ঝোটা রাজা আর তার স্ত্রী, পরিষদবর্গ আর রাজপুত্রদেরকে বন্দী করে ফেলা হলো। চিরচারিত রীতি অনুযায়ী বন্দী

পুরুষদেরকে হত্যা করে, মহিলা আর গবাদি পশুকে বাজেয়াপ্ত করার পরিবর্তে, মানাতাসসি শুধুমাত্র রাজপরিবারকে ফাঁসি দিল, তারপর বিধ্বস্ত সেনাদলকে একসাথে জড়ো করে ওর আনুগত্যের শপথ নেওয়ালো। সেনাদলটা তখনও ছিল অক্ষত, নিজ নিজ অধিনায়কের অধীনে। এতগুলো লোকের প্রবল গর্জনে এমন বজ্রধ্বনি উৎপন্ন হলো যে, গাছের পাতা কেঁপে উঠলো আর মনে হলো পাহাড়গুলো পর্যন্ত তাদের ভিত্তির উপর ঝাঁকি দিয়ে উঠলো।

দ্বিতীয় বছর, বর্ষাকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর, মানাতাসসি পশ্চিম দিকে অভিযাত্রা পরিচালনা করল, একেবারে বিরান উপকূল পর্যন্ত যেখানে শীতল সবুজ স্রোতধারা অসীম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। চারটা প্রবল যুদ্ধ লড়ে চারজন রাজাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলালো–অন্য দুজনের সাথে করল শান্তিচুক্তি, নিজের বাহিনীতে প্রায় লাখখানেক সৈন্য যোগ হলো আরও।

যারা মহান কৃষ্ণ জানোয়ারের ঘনিষ্ট, তারা ভালোই জানে যে সে খুব কমই ঘুমায়। দেখে মনে হয় যে, তার ভেতরে যেন কোনো একটা চালিকা শক্তি আছে, যা তাকে সব ধরনের বিশ্রাম বা বিনোদন পেতে বাঁধা দেয়। সে খাবার খায় কিন্তু কোনো স্বাদ আস্বাদন করে বলে মনে হয় না, সেটাও এমন অবহেলায়–যেভাবে লোকজন কোনো নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডে লাকড়ি নিক্ষেপ করে নিভু নিভু হয়েও সেটা জ্বলতে থাকার জন্য। মন খুলে কখনও হাসে না সে, শুধু তার সন্তুষ্টি মত কোনো কাজ সম্পাদিত হলে মুচকি হসি দেখা যায়। মেয়েদেরকে ব্যবহার করে দ্রুত আর নিষ্ঠুরভাবে, কাজ শেষে তাদেরকে কম্পন আর ক্রন্দনরত অবস্থায় ফেলে চলে যায়, কোনো পুরুষের সাথেই কোনো বন্ধুত্ব নেই তার।

শুধু একবারমাত্র তার অধীনস্তরা তাকে মানবিক আবেগ প্রকাশ করতে দেখেছিল। ওরা তখন ছিল জমিনের পশ্চিম দিকের শেষ সীমানায়, সাগরতীরের উঁচু উঁচু বালিয়াড়িগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে। মানাতাসসি ওদের থেকে আলাদাই দাঁড়িয়ে ছিল, রাজকীয় পরিধান হিসেবে চিতাবাঘের চামড়া পরে ছিল ও, মাথায় ছিল নীল হেরন পাখির পালকের তৈরি শিরস্ত্রাণ, সাগর থেকে আসা শীতল বাতাসে কাঁপছিল সেটা।

আচমকাই একজন সামরিক অধিনায়ক চিৎকার দিয়ে অবাক হওয়ার শব্দ করে সবুজ পানির দিকে আঙুল তুলে দেখতে লাগল। সাগরের রূপালি ঢেউয়ের তরঙ্গ আর কুয়াশার ভেতর থেকে একটা ভূতুড়ে জাহাজের মত করে তুমুল বেগে ছুটে বেরিয়ে এল ওপেটের একটা জাহাজ। বাণিজ্য বাতাসে[৮০] ফুলে ফেঁপে উঠেছে ওটার একটামাত্র বর্গাকার পাল, দাঁড়ের সারি ছন্দবদ্ধভাবে উঠছে আর নামছে। জাহাজটা নীরবে গতি তুলে ছুটে যাচ্ছে উত্তর দিকে, কাদিজ-এ দীর্ঘ বাণিজ্য সম্পাদন করবে সেটা।

---

[৮০]উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বিষুবরেখার দিকে ধাবমান বাতাস

আবারও একজন অধিনায়ক চিৎকার করে উঠলো, এবার ওদের সবাই ফিরে তাকালো রাজার দিকে। চেহারা জ্বলজ্বল করছে তার আর কপাল থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে ঘাম, চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়ে এমনভাবে দাঁতে দাঁত ঘষছে যে মনে হলো পাথরে পাথর বাড়ি খাচ্ছে বুঝি। জাহাজটাকে পার হতে দেখে উন্মাদের মত জ্বলে উঠলো ওর চোখজোড়া, প্রচণ্ড ঘৃণায় রি রি করে ওর সমগ্র শরীর একই সাথে কেঁপে কেঁপে ঝাঁকি দিয়ে উঠতে লাগল।

অধিনায়ক দৌড়ে গেল রাজাকে সামলাতে, সে ভেবেছিল ও বোধহয় আচমকা জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। কাছে গিয়ে রাজার বাহু স্পর্শ করল সে।

"জনাব," কেবল বলা শুরু করল অধিনায়ক, সাথে সাথে মানাতাসসি প্রচণ্ড উন্মত্ত হয়ে লোহার থাবা দিয়ে আঘাত করে বসল ওকে, লোকটার চেহারার অর্ধেক উড়ে গেল থাবায়।

"ওই যে," চিৎকার করে উঠলো ও, থাবা দিয়ে অপসৃয়মান জাহাজটাকে দেখাচ্ছে। "ওই হচ্ছে তোদের শত্রু। চিনে রাখ ভালো করে।"



প্রতিটা দিন নিয়ে আসতো তার নিজস্ব উত্তেজনা, গোপন আনন্দ আর কর্মযজ্ঞ–আর আনতো আনন্দ। হুই আর তানিথ পরস্পরের প্রেমে পড়েছেন পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে–সেটা মনেই হয় না, কি দ্রুত বেগেই না ফুরিয়েছে সময়টা। কিন্তু আসলেই এতদিন কেটে গিয়েছে, আরও একবার কাছিয়ে এসেছে ফলবতী বসুন্ধরার উৎসবের সময়।

গতবার হুইকে পটানোর কথা মনে করে জোরে জোরে হেসে দিল তানিথ, মনে মনে ঠিক করে ফেলল, সামনের উৎসবের দিনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবে। পাশেই বিড়বিড় করে একটা প্রশ্ন করল আইনা, ঘোমটার গভীর থেকে বিভ্রান্ত অবস্থায় তানিথের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

"হাসছো কেন, বাছা?"

"হাসছি কারণ আমি খুব খুশি, বুড়ি মা।"

"ওহ, জোয়ান হয়ে খুব খুশি। বুড়ি হতে কেমন লাগে সেটা তুমি এখনও জানো না।" আইনা ওর ঘ্যান ঘ্যান করা শুরু করল, তানিথ ওকে বন্দর এলাকার হট্টগোলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ছোট ছোট সরাইখানা আর রাস্তার দুষ্টু মেয়েদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে, পাথর কেটে বানানো জেটিতে নামার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

নৌকার মাঝের ছোট্ট কুঁড়েটা থেকে, তালি মারা জেলের কাপড় আর মাথায় রুমাল বাঁধা অবস্থায় বেরিয়ে এলেন হুই, তবে তার আগেই নৌকায় উঠে গেল তানিথ।

"দেরি করে এসেছো তুমি।"

"এতো অধৈর্যের জন্য আপনাকে আমার শাস্তি দেওয়া উচিত। শুধু একটু নিরাপদ জায়গায় যেয়ে নেই," সতর্ক করল তানিথ।

"সেটার অপেক্ষাতেই আছি," চওড়া হাসি হেসে, বৃদ্ধা আইনাকে গলুই দিয়ে উঠতে সাহায্য করলেন হুই, তানিথ সামনে দৌড়ে গেল নৌকা বেঁধে রাখার দড়িগুলো তুলে ফেলতে।

হুই নৌকার সামনের দিকে হাল ধরে বসে রইলেন, তানিথ বসে রইলো ওনাকে স্পর্শ না করে যতটা সম্ভব ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় ততোটা কাছে। নিজের আলখাল্লা খুলে ফেলেছে ও, এখন পরনে শুধু পাড়ে নকশা করা হালকা সুতির জামা, কোমরে একটা খাঁটি স্বর্ণের বন্ধনী লাগানো, হুইয়ের পক্ষ থেকে ওর নামকরণের দিনের উপহার।

তানিথের কালো চুল মাথার পেছন দিকে ঢেউ খেলিয়ে কালো ধোঁয়ার মত উড়ছে, লাল হয়ে আছে চেহারা। হুই আড়চোখে দেখতে লাগলেন ওকে, প্রতিবারই তানিথও ওনার দিকে তাকিয়ে কোনো কারণ ছাড়াই হাসতে লাগল।

ঢেউ এসে হালকা বাড়ি খাচ্ছিল নৌকার খোলে, তবে যতই ওনারা দ্বীপগুলোর কাছাকাছি সরে আসতে লাগলেন, বাতাসের ধাক্কায় সামনের ঢেউগুলো থেকে পানির ফোঁটা উড়ে এসে পড়তে লাগল ওনাদের চেহারায়, রোদের উষ্ণতার পরেও দেখে গেল পানি বেশ ঠান্ডা। হুই নিপুণ হাতে নলখাগড়ার দঙ্গলের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য হয়ে থাকা একটা প্রণালী দিয়ে চালিয়ে, একটা নীরব আর পাখির নীড়ে ভরা উপহ্রদে নিয়ে এলেন নৌকা, জায়গাটার উপরিভাগ ঢেকে আছে শাপলা ফুলের গাঢ় সবুজ পাতা দিয়ে আর ফাঁকে ফাঁকে ছেয়ে আছে নীল আর সোনালি ফুলে। শান্ত পানিতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে হাঁস, পানির নিচে মাথা ঢুকিয়ে শামুক খাচ্ছে আবার মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে কতগুলো।

এখানে বাতাসের আওতার বাইরে ওনারা। হুই পাটাতন থেকে একটা লম্বা লগি নিয়ে আবার সামনে ফিরে এসে, ওটা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নৌকাকে নিয়ে এলেন ঝকঝকে সাদা বালিতে ভরা একটা সৈকতে। হাঁটু সমান পানি থাকতে ঝাঁপ দিয়ে নেমে সৈকতে টেনে তুলে নিয়ে এলেন নৌকাটাকে।

সৈকতের মসৃণ কালো পাথরের চাঁইগুলোর ফাঁকে, পালের একটা অংশ দিয়ে সূর্য থেকে বাঁচার মত একটা আশ্রয় তৈরি করলেন হুই। তারপর আইনাকে ধরে এনে ওটার নিচে বসিয়ে দিলেন আরাম করে।

"এক পাত্র ওয়াইন খান, বুড়ি মা," অনুরোধের সুরে বললেন হুই।

"আপনার অনেক দয়া, হুজুর।"

ওনারা ওকে ওখানেই রেখে গেলেন, ছায়ার ভেতরে চুপচাপ নাক ডাকতে লাগল সে। আর হুই এবং তানিথ হাতে হাত ধরে, উপসাগরের বাঁকের পেছন দিয়ে সৈকতের সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। আইভরি পাম গাছগুলোর নিচের শক্ত পরিষ্কার বালির উপরে একটা আলখাল্লা বিছিয়ে দিলেন হুই। তারপর ঝটপট নিজেদের কাপড় ছেড়ে একসাথে শুয়ে রইলেন দুজনে, গল্প করলেন, খুনসুটি করলেন আর আদর করলেন।

শেষে হ্রদের পরিষ্কার উষ্ণ পানিতে গোসল করলেন একসাথে, অগভীর পানিতে শুয়ে রইলেন ওনারা, হালকা ঢেউ এসে আলসে ভঙ্গিতে আছড়ে পড়তে লাগল শরীরের উপরে, এক ঝাঁক আঙুলের সমান লম্বা রূপালি মাছে এসে ঠোকরাতে লাগল ওনাদের নগ্ন চামড়ায়। ওগুলোর দাঁতহীন কামড়ের সুড়সুড়িতে, হেসে উঠে পা ছুঁড়তে লাগল তানিথ।

গোসল সেরে ওনারা রোদে শুয়ে শুকিয়ে নিলেন নিজেদের, একটু পর তানিথ উঠে দাঁড়ালো আর হুই তাকালেন ওর দিকে। ভেজা চুলগুলো কালো কালো মোটা গোছা হয়ে ওর পিঠ আর স্তনের উপর ঝুলছে। কাঁধের উপর দিয়ে আভা ছড়াচ্ছে রোদ, তখনও পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছে ওর চোখের পাতা থেকে। হুইয়ের কড়া নজরের সামনে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো তানিথ, তারপর নিজের স্তন মুঠো করে ধরলো, এক হাতে একটা।

"আপনি কি আমার ভেতরে কোনো পরিবর্তন খেয়াল করেছেন, মহানুভব?" দুষ্টুমির স্বরে জিজ্ঞেস করল ও, হুই হেসে নিজের মাথা নাড়লেন।

"ভালো করে দেখুন," আহ্বান করল তানিথ, হুইয়ের মনে হলো যে ওর স্তনজোড়া আরও ভরাট আর চোখা হয়েছে, এটাও খেয়াল করলেন যে ওগুলোর শুভ্র চামড়ার নিচে ফুটে আছে নীলচে শিরা।

"হ্যাঁ?" জিজ্ঞেস করল তানিথ, সারা শরীরে হাত বুলিয়ে পেটে এসে আদর করতে লাগল।

"আর এখানে?" আবার জিজ্ঞেস করল ও। "এখানে অন্যরকম লাগছে না?" আর ও দম নিয়ে পেটটা ফুলিয়ে ফেলল হাসতে হাসতে।

"তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছো," হুই বকুনির দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, উনিও হাসছেন ওর সাথে। "খুব বেশি খাচ্ছো মনে হয়।"

তানিথ মাথা নাড়লো। "এখানে যেটা আছে, হুজুর, সেটা আমার মুখ দিয়ে যে ঢোকেনি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।"

হাসিটা এবার হুইয়ের গলার পেছন দিকেই শুকিয়ে গেল, উনি বেকুবের মত তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।



অন্ধকারে শুয়ে আছেন হুই–এখনও হতভম্ব আর কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ব্যাপারটা ভাবতেই অসম্ভব লাগছে যে এত অবহেলায় উনি যে বীজ ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, সেটা থেকে শেকড় গজিয়ে গিয়েছে; অ্যাসটার্টের যাজিকাকে কি এই ধরনের পরিস্থিতি নিরোধের গোপন কলকৌশল সম্পর্কে শেখানো হয়নি? এটা এমন এক ঘটনা যা ভূমিকম্প বা ঝড় বা যুদ্ধে পরাজয়ের সমতুল্য। এ ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে, একেবারে গোঁড়াতেই।

হুইয়ের মনে হালকাভাবে বন্দরের সামনে থাকা কুৎসিত বুড়িগুলোর কথা মাথায় এল, যাদের কাজই হচ্ছে এই ধরনের ভুল হলে তা সামাল দেওয়া। কিন্তু সাথে সাথেই উনি চিন্তাটা বাদ করে দিলেন।

"না," জোরে বলে উঠলেন উনি, তারপরই তানিথের নিঃশ্বাসের শব্দ খেয়াল করলেন, আশা করছেন ওর ঘুম ভেঙে যায়নি। নিজের পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজানো শুরু করলেন হুই; সম্ভবত এরকম চরম কর্মপন্থা না নিলেও হবে, উনি রাজ্যের কোনো দূরবর্তী এলাকায় নতুন আরেকটা আশ্রম উদ্বোধনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন, সেখানে, উৎসুক দৃষ্টি আর বাচাল জিহ্বা থেকে দূরে কোথাও, বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে তানিথ। একজন পালক মা খুঁজে বের করাটা খুব বেশি কষ্টকর কিছু হবে না, ওনার বিশ্বস্ত কাউকে পাওয়া যাবে। ওনার বাহিনীর দক্ষ অনেকেই আছে, যোদ্ধাহত, এখন হুইয়ের বাগানবাড়িতে সাধারণ জীবন যাপন করে। বাচ্চাসহ স্ত্রীঅলা মানুষ সব, যাদের স্তন বিশাল আর অতিরিক্ত একজন ছোট্ট বান্দাকে খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ট ভরাট।

সেখানে থাকলে, সুযোগ পেলেই উনি নিজের ছেলের সাথে দেখা করে আসতে পারবেন। উনি এখনই কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছেন সেটা–ছেলের সাথে হাসি ঠাট্টা আর আনন্দ, রোদের মধ্যে ছোট্ট ভুঁড়িটা সামলে ওনার ছেলের দৌড়াদৌড়ি আর হাসাহাসি।

খুবই সন্তর্পণে হুই চাদরের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, আলতোভাবে তানিথের নগ্ন পেটের উপর হাতটা রেখে হাতড়াতে লাগলেন।

"এখনই আপনি কিছু টের পাবেন না," ফিসফিসিয়ে বলল তানিথ, তারপর পাশ ফিরে জড়িয়ে ধরলো ওনাকে। দাড়িতে মুখ গুঁজে বলল, "যাজিকা আমাকে যা যা শিখিয়েছিলেন সেসব পালন করিনি আমি। খুব বাজে কাজ করেছি, তাই না? আপনি কি আমার উপর রেগে গিয়েছেন, মহানুভব?"

“না,” বললেন হুই। “আমি তোমার উপর খুবই খুশি।”

“আমি জানতাম আপনি সেটাই হবেন,” তানিথ সন্তুষ্ট হয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। তারপর ওনাকে চার হাত-পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘুম ঘুম গলায় বলল, “মানে, একবার যখন আপনি ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবেন তখন।”

দরজায় করাঘাত আর চিৎকারে জেগে উঠলেন দুজনেই আর হুই গদি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পুরোপুরি সজাগ হওয়ার আগেই শকুন কুঠারটার জন্য হাতড়াতে লাগলেন। প্রাথমিক চমক কেটে যাওয়ার পরে, ঘরের দাসরা প্রত্যুত্তরে সমান জোরে চিৎকার করে পরিচয় জানতে চাইলে আবারও সমান তেজে জবাব দেওয়া হলো যে মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গানিয়া এরা হচ্ছে রাজকীয় প্রহরীদের একটা দল, হুই কুঠারটা নামিয়ে রেখে আরেকটা কুপি জ্বাললেন।

“মাননীয়,” শোয়ার ঘরের দরজায় একজন দেহরক্ষী দাস টোকা দিল।

“কী হয়েছে?”

“রাজার রক্ষীরা এসেছে। গ্রাই-লায়ন ঘুমাতে পারছেন না। আপনাকে লুট নিয়ে ওনার কাছে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।”

হুই গদির ধারে বসে নরম স্বরে কিন্তু অর্থপূর্ণ গালি দিলেন কয়েকটা, দাড়ি আর চুলের ভেতর আঙুল চালাচ্ছেন, চোখ কচলে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টাও চালালেন।

“আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন, হুজুর?”

“শুনেছি,” ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন হুই।

“গ্রাই-লায়ন বলে পাঠিয়েছেন কোনো কথা না শুনতে, আপনি কাপড় পরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, আপনাকে সাথে করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে।”

হুই উঠে দাঁড়িয়ে জামার জন্য হাত বাড়াতে গিয়েও থমকে গেলেন, তানিথ ওনার দিকে চেয়ে আছে দেখে। কুপির আলোয় ওর চোখজোড়াকে বিশাল মনে হচ্ছিল, মেঘের মত আলুথালু হয়ে থাকা চুলে ওকে দেখতে লাগছে একেবারে একটা বাচ্চার মত। উনি বিছানার চাদরটা তুলে ওর পাশে ঢুকে পড়লেন।

“রাজাকে বলো যে আমার আঙুল ব্যথা, গলা ভেঙে গিয়েছে। লুটের তার-ও ছিড়ে গিয়েছে–আর আমি মাতাল,” চিৎকার করে বললেন উনি, তারপর দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন তানিথকে।



শেখ হাসান রূপার পাত্রে হাত ধুয়ে, রেশমের চৌকোনা একটা কাপড়ে হাত মুছলো।

“সে তার শক্তিমত্তা প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদেরকে চমকে দিতে চায়,” বিড়বিড় করে বলল ওর ছোট ভাই ওমর। হাসান এক ঝলক তাকালো তার

দিকে। ওর ভাইটা একটা আস্ত ফুলবাবু। দাড়ি ধুয়ে, সুগন্ধি দিয়ে একেবারে চকচকে হওয়ার আগ পর্যন্ত আঁচড়েছে, আলখাল্লাটা সবচে উন্নত রেশমের আর পায়ের চপ্পল আর গায়ের জামায় রেশম আর স্বর্ণের সুতার ভারি কাজ করা। আঙুলে পরে আছে পিজিয়ন'স ব্লাড চুনির আঙটি, পাথরটা মানুষের বুড়ো আঙুলের উপরের কড়ার সমান বড়। ভাং-এর নল টানার কারণে ঢুলু ঢুলু চোখ করে শুয়ে আছে ও একটা গদিতে। একটা ফুলবাবু হয়তো-একজন পায়ুকামী এটা নিশ্চিত, কিন্তু সে যা-ই হোক ওর মনটা পরিষ্কার আর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে হাসান ওর উপর ভালোই ভরসা করে।

ওরা সবাই একসাথে প্রাচীন ফিগ গাছটার নিচে বসল, গাছটার ডালপালা অনেক বিস্তৃত আর ওটার ছায়াও গাঢ় আর অন্ধকার। যে জাহাজে করে ওরা দেখা করতে এসেছে সেটা ওদের নিচেই দ্বীপের সাদা বালিতে তুলে রাখা। ওদের দৃষ্টির সীমার ভেতরে বিশাল নদীটার উত্তর পাড়ের খাল আর বালিয়াড়ি আর শান্ত দীঘি দেখা যাচ্ছে।

বালিময় সৈকতে সমুদ্র গাভীর দল শুয়ে আছে, অগভীর পানিতে অর্ধেক ডুবে আছে কয়েকটা। বিশাল ধূসর অবয়ব, ঠিক যেন নদীর পাড়ের পাথরের চাঁই-যেগুলোর উপরে সাদা বক আনমনে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

উত্তর পাড়ে এক চিলতে ঘন সবুজ বন জন্মেছে নদীর পাড় বরাবর, কিন্তু পেছনের বিরা বাদামি পাহাড় পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে তা। ওখান থেকে বাকি জমিনকে দেখলে মনে হয় অভিশপ্ত আর নিরানন্দ। পাহাড়গুলো সব বিবর্ণ আর ঊষর, সবগুলোর চূড়া ভোঁতা। মাটিতে এখানে সেখানে কিছু শুকনো ঘাস আছে, মৃত গাছগুলো শুকিয়ে পাতাহীন ডালপালাসমেত দাঁড়িয়ে আছে কোনোমতে, খরার কবলে পড়ে মারা গিয়েছে অনেক আগেই।

যাই হোক, োখরা ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দৃশ্যপট বদলে গেল। পাহাড়ের উ‌ারে একটা অন্ধকার ছায়া ছড়িয়ে পড়ল-যেন ঝড়ের মেঘ আড়াল করে দিয়েছে সূর্যকে।

"হ্যাঁ," বলল ওমর। "এই প্রদর্শনী আমাদের কানকে তার কথা শোনার জন্য খুলে দেওয়ার জন্য।"

হাসান থু দিয়ে বেশ খানিকটা উজ্জ্বল লাল একটা তরল ফেলল মাটিতে, তারপর রেশমি রুমাল দিয়ে দাড়ি মুছে, দেখতে লাগল যে বিরান পাহাড়গুলো আবার কীভাবে জীবন ফিরে পাচ্ছে, অন্ধকার ছায়া ছড়িয়ে পড়ছে আরও। ও এর আগে কখনোই মানুষের এত বিপুল সমাবেশ দেখেনি। দল আর উপদলগুলো সুশৃঙ্খল সারি ধরে ধরে এগিয়ে এসে পুরো পাহাড়কে ছেয়ে ফেলল। হাসান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল তবে চেহারায় বোঝা গেল না সেটা, চেহারা নিরাসক্ত। শুধুমাত্র লম্বা বাদামি নখগুলো তরবারির রত্ন বসানো হাতলের

উপর উসখুস করতে থাকায় ওর অশান্ত অবস্থা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এরকম কিছু ও স্বপ্নেও ভাবেনি। এখানে এসেছিল নদীর ওপারের রহস্যময় আর খুবই কম জানা দেশটার নতুন কৃষ্ণাঙ্গ সম্রাটের সাথে বাণিজ্য আর রাজ্যের পারস্পরিক সীমানা নিয়ে কথাবার্তা বলতে। বদলে এখন পৃথিবীর অন্যতম বড় সেনা সমাবেশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। হাসান অবাক হয়ে ভাবলো অ্যালেক্সান্ডারও কি এত বিশাল কোনো সেনাদলের পরিচালনা করতেন?

ওমর ওর ভাং-এর নল-এ টান দিল, ধোঁয়াটা বুকের মাঝে কিছুক্ষণ আটকে রেখে, নাসারন্ধ্র দিয়ে চিকন করে বের করে দিল সেটাকে।

"সে শুধু আমাদেরকে অভিভূত করেতে চায়," আবার বলল ও, প্রত্যুত্তরে বেশ কড়া গলায় জবাব দিল হাসানের।

"যদি সেটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে সফল। আমি অভিভূত।"

তখনও আকাশের সীমানা থেকে চওড়া কিন্তু সুশৃঙ্খল সারি ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে এগিয়ে আসছে সেনাদল। সামনে এগিয়ে এসে এমন একটা গঠনে থেমে দাঁড়াচ্ছে যেন সবার মাথা একই সাথে কাজ করেছে, ঠিক যেমন মাছের ঝাঁক বা পরিযায়ী পাখির দল অজানা আদেশের প্রতি সাড়া দেয়। এখানেও, মনে হচ্ছিল না যে আলাদা আলাদা লোকের সমাবেশ বরং একটা মাত্র সত্তা যেন পুরো বাহিনীটা। ছড়িয়ে পড়ছে–কিন্তু দক্ষ হাতে সমন্বয় করা হচ্ছে তা। হাসান দৃশ্যটা দেখে এই খোলা উপত্যকায় দুপুরের সূর্যের নিচেও কেঁপে উঠলো।

উত্তর পাড়ে সকল নড়া-চড়া থেমে গেল, একটা গুরুভার নীরবতা যেন নেমে এল কালো যোদ্ধাদের ঘন সন্নিবেশের উপরে। একটু আগের সৈন্যদের আগমনের চাইতে এই নীরবতা আরও বেশি ভয়ানক লাগতে লাগল। একটা প্রত্যাশিত নিস্তব্ধতা ভরে দিল পুরো উপত্যকাকে, টানটান উত্তেজনা তৈরি হলো চারপাশে যেটা অসহনীয় হয়ে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ পরেই, তখন হাসান গালাগাল দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে।

"আমি এই বর্বরদের খেয়াল খুশিতে মত দিচ্ছি না। এটা তো স্পষ্ট বেইজ্জতি। সে যদি কথা বলতে চায়, তো আমাদের কাছে আসতে হবে।" কিন্তু ও পুরোপুরি উঠে না দাঁড়িয়েই আবার গদির উপর বসে পড়ল ধপ করে, তারপর আর কিছু না বলে উসখুস করতে লাগল। ওর ভাই কথা বলল এরপর।

"মনে হচ্ছে," ওমর বলল, "আমরা যে দুনিয়া চিনতাম সেটা বদলে গিয়েছে, ভাইজান। গতকালকেও যা সত্যি ছিল, সেটা এখন আর সত্য নেই।"

"তোমার পরামর্শ কী?"

"নতুন সত্যকে খুঁজে বের করা, সেগুলোকে পরখ করে দেখা। এখনও সম্ভাবনা আছে যে এই সব কিছু থেকে আমরা আমাদের সুবিধা মতই কিছু পাবো হয়তো।"

ওদের উল্টোপাশের পাহাড়ে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা গেল, লোকগুলোর মাঝে একটা নড়া-চড়া, নলখাগড়ার মাঝ দিয়ে সিংহ চলে গেলে যেরকম নড়ে সেরকম। শেখরা চোখ বড় বড় করে দেখার চেষ্টা করল, ওদের প্রহরীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগল যে কী ঘটছে, কিন্তু যে কোনো উত্তরই হারিয়ে যেতে লাগল শব্দের সমুদ্রে। হাজার হাজার পা একসাথে মাটিতে পদাঘাত করায় পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠলো যেন, ঢালের উপর বর্শা দিয়ে বাড়ি দিতে থাকায় বাতাসেও সৃষ্টি হলো কম্পন, জনবহুল পাহাড়গুলো থেকে সমগ্র কালো মানুষগুলোর গলা থেকে একটা মাত্র ধ্বনিতে রাজকীয় সালাম পেশ করা হলো একজন রাজার প্রতি।

পুরো উপত্যকা জুড়ে বয়ে গেল শব্দের ঝড়টা, তারপর দক্ষিণের পাহাড় আর আকাশের বুকে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল। আবারও নেমে এল শুধু স্থিরতা আর নীরবতা, একটু পরে দেখা গেল একটা বিশাল যুদ্ধের ডিঙ্গি একপাশে প্রায় পঞ্চাশজন মাল্লাসমেত বালিময় সৈকত থেকে ছেড়ে সবুজ পানি কেটে দ্বীপটার দিকে এগিয়ে আসছে।

একজন লোক সাদা সৈকতে নেমে এল, তারপর একাকী এগিয়ে এল পাড়ের দিকে, যেখানে ফিগ গাছের নিচে অপেক্ষা করছিল শেখরা। কোনো প্রহরী ছাড়াই এগিয়ে আসাটা ওদেরকে তাচ্ছিল্য করার একটা নমুনা, লোকটার শক্তিমত্তা আর অগম্যতার বহিঃপ্রকাশ।

লোকটার পরনে চিতা বাঘের চামড়ার একটা আলখাল্লা আর পায়ে চপ্পল–আর কোনো অলংকার বা অস্ত্র নেই সাথে। কাছে আসতেই দেখা গেল লোকটা শেখদের চাইতেও লম্বা, এই বিশাল বপুর আয়তনের কাছে ওরা আরও বেশি গুটিয়ে গেল বলে মনে হলো।

ওদের দিকে শিকারি পাখির মত ভয়ানক হলুদ চোখ করে চাইলো লোকটা, মনে হলো ওদের অন্তরাত্মা ধরে টান দিল চোখজোড়া।

"আমি মানাতাসসি," নরম, গভীর কিন্তু গমগমে গলায় বলল ও। "মহান কৃষ্ণ জানোয়ার।" শেখরা এতক্ষণ যা দেখেছে তাতে লোকটাকে নিজেদের ভাষায় সাবলীল কথা বলতে দেখে অবাক হলো না আর।

"আমি হাসান, সোফালার শেখ, মনোমাতাপার রাজপুত্র আর শান সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি।"

"আপনারা হলুদ ধাতুটা খুব পছন্দ করেন," মানাতাসসি অভিযোগের সুরে বলল কথাটা, হাসান দিশেহারা হয়ে পড়ল। ওমরের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগল ও।

"হ্যাঁ," ওমর বলল। "আমরা ওটাকে ভালোবাসি।"

"আমি আপনাদেরকে ওই জিনিস দিয়ে ভরে দেব," বলল মানাতাসসি।

বিনা কারণেই ঠোঁট চাটলো ওমর, লোভের একটা অবচেতন প্রকাশ, তারপর হেসে দিল।

"আপনার কাছে দামী জিনিসটা প্রচুর আছে নাকি?" জিজ্ঞেস করল হাসান। এভাবে সরাসরি ব্যবসার কথায় চলে যাওয়াটা ওর রুচির সাথে যায় না। কিন্তু এই লোকটা একটা বর্বর, কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা বুঝবে না ও। তবে স্বর্ণের ব্যাপার-স্যাপারে কিছুটা অভব্যতা সহ্য করা যায়, বিশেষ করে এই অদ্ভুত সাজের কালো জানোয়ার যে পরিমাণের কথা ইঙ্গিতে বলছে। "সেটা কোত্থেকে আসবে?"

"ওপেটের গ্রাই-লায়ন আর চার সাম্রাজ্যের সম্রাট লানন হাইকানাসের ভাঁড়ার থেকে," বলল মানাতাসসি, হাসানের ভ্রূ কুঁচকে গেল সাথে সাথে।

"আপনার কথা বুঝলাম না।"

"তাহলে আপনি একটা গর্দভ," মানাতাসসি বলল। মুহূর্তের মাঝে নিজের বাদামি চামড়ার নিচে ফ্যাকশে গোলাপি হয়ে গেল হাসান। একটা সমুচিত জবাব উঠে এল ঠোঁটে, কিন্তু টের পেল ভাইয়ের সাবধানী আঙুলগুলো চেপে ধরেছে ওর কবজি।

"খুলে বলেন দেখি," বলল ওমর। "আপনি কি ওপেটের সাথে যুদ্ধ করতে চান নাকি?"

"আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দেব–ওদের জনগণকে ধ্বংস করে দেব, ওদের শহর আর ওদের দেবতাদেরকেও। আমি ওদের একটা নিশানা পর্যন্ত রাখবো না, একটা কিছু জ্যান্ত রাখবো না।" কাঁপতে শুরু করল বিশাল নিগ্রোটা, বেগুনি ঠোঁটে জমা হলো সাদা থুথু, ওর ক্ষত বিক্ষত চেহারায় দেখা গেল চিকন ঘামের আভাস।

ওমর মৃদু হাসলো। "আমরা সেট নামের একটা জায়গায় একটা যুদ্ধের খবর শুনেছি।"

চিৎকার করে উঠলো মানাতাসসি, আহত জানোয়ারের হুঙ্কারের মত শোনালো তা। এক লাফে শেখদের সামনে চলে এল ও, আলখাল্লার নিচ থেকে লোহার থাবাটা বের করে এনে বাগিয়ে ধরলো ওমরের চেহারার সামনে। ওমর পেছনের দিকে সরে গিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরে রইলো।

"আমার সাথে ঠাট্টা করবি না, শালার বাদামি ব্যাটা, আমার সাথে ফাজলামো না, নইলো তোর কলিজা ছিড়ে ফেলবো।"

ভয়ের চোটে গুঙ্গিয়ে উঠলো ওমর, দাড়ি বেয়ে নেমে এল ঘামের ধারা।

"থামেন," হাসান দ্রুত বাঁধা দিল ওদেরকে। "আমার ভাই কথাটা বলেছে শুধু এটা মনে করিয়ে দিতে যে ওপেটের সেনাদলকে হারানো মোটেও সহজ কোনো কাজ না।"

মানাতাসসি হাঁ করে দম নিতে লাগল, তখনও রাগে কাঁপছে। তারপর দ্বীপের কিনারে গিয়ে স্থির তাকিয়ে রইলো পানির দিকে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে সামনে, বাতাসের জন্য হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। তবে, আস্তে আস্তে নিজেকে শান্ত করে আবার ফিরে এল ওদের কাছে।

"ওদেরকে দেখেছেন?" পাহাড়গুলোকে আড়াল করে থাকা সেনাদলটার দিকে দেখালো মানাতসসসি।

"সংখ্যায় অনেক–কিন্তু সেটা কি যথেষ্ট হবে?" জিজ্ঞেস করল হাসান। "এক পরাক্রমশালী শত্রুর মুখোমুখি হবেন আপনি।"

"দেখাচ্ছি আপনাদেরকে," বলে লোহার থাবাটা উপরে তুললো মানাতাসসি। সাথে সাথে ডিঙ্গিটা থেকে একজন সমর অধিনায়ক দৌড়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল ওর সামনে।

মানাতাসসি ভেন্ডি ভাষায় কিছু একটা বলে নদীর দিকে ইঙ্গিত করল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অধিনায়ক, কালো চেহারায় আনন্দের অভিব্যক্তি ঝিলিক দিচ্ছে। সেলাম ঠুকে, পাড় ধরে দৌড়ে ফিরে গেল সে, তারপর ডিঙ্গির সামনের দিকে লাফিয়ে উঠে বসে দ্রুত আবার ফিরে গেল উত্তর তীরে।

শেখরা বিভ্রান্ত কৌতূহলে দেখতে পেল যে অপর তীরের জড়ো হওয়া যোদ্ধাদের মাঝে নতুন এক ধরনের নড়া-চড়া শুরু হলো। দুটো চওড়া সারি করে সামনে এগিয়ে এসে, নেমে যেতে লাগল পানিতে, হাসান মৃদু বিস্ময়ে বলে উঠলো, "এদের কাছে তো কোনো অস্ত্র নেই।"

"সবাই ন্যাংটো," যোগ করল ওমর। অগভীর পানিতে কালো সারিটা নেমে আসতেই ওর আতঙ্ক কমে গিয়ে এখন বরং যৌন সুড়সুড়িতে রূপ নিল। বালুময় তীরটায় প্রথমে ষাঁড়ের মাথার শিং-এর মত অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত হলো ওরা, তারপর নেমে যেতে লাগল বুক পানিতে। যদিও এগোতে সমস্যা হতে লাগল, তবুও পুরো ব্যাপারটা যখন শেষ হলো তখন ওখানকার বুড়ো মদ্দা জলহস্তীটা তার কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙে জেগে দেখে যে তাকে পুরো ঘিরে ফেলা হয়েছে।

জলহস্তীটা নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুয়োরের মত কুতকুতে গোলাপি চোখ দিয়ে তাকাতে লাগল চারপাশে। ওটার ধূসর চামড়ার নিচে জমা হয়ে আছে পাঁচ টন নির্জলা মাংস, পেটের কাছটায় গোলাপি রঙের প্রলেপ। পা গুলো ছোট, পুরু আর শক্তিশালী, ডাক ছাড়ার জন্য যখন চোয়াল হাঁ করল তখন বিশাল হলুদ গজদন্তগুলো দেখা যেতে লাগল, যেটা দিয়ে একটা যুদ্ধের ডিঙ্গি এক কামড়ে অর্ধেক করে দিতে পারবে।

শুরুতে বহু কষ্টে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে লাগল জলহস্তীটা, নরম সাদা বালির সৈকতে গভীর ছাপ পড়তে লাগল তাতে, তারপর ধেয়ে গেল কালো কালো শরীরের দেওয়ালটার দিকে, যেটা ওকে নদীর গভীর অংশে যেতে বাঁধা

দিচ্ছে। অগভীর পানিতে প্রবেশ করল ওটা, যাওয়ার পথে পানির মাঝে সাদা সাদা ফেনা উৎপন্ন হতে লাগল, সামনের কালো লোকগুলোর দেওয়াল আরও বেশি ঘন সন্নিবিষ্ট আর আঁটসাঁট হয়ে, নিজেদেরকে শক্ত করে দাঁড়ালো জলহস্তীর আঘাত প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে।

মদ্দাটা পূর্ণ একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের দিকে, ঝড়ে পড়া খড়োকুটোর মত একেক দিকে উড়ে গেল মানব শরীরগুলো। জলহস্তীটার চোয়াল খটাখট করে ধেয়ে গেল ওদের দিকে, এমন বিক্রমে ওটা সামনে এগিয়ে গেল যে, মনে হলো এরকম ধ্বংসাত্মক শক্তির সামনে কিছুই আসলে টিকবে না–জন্তুটা ওদেরকে ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে এসে নিরাপদেই পৌঁছে যাবে গভীর পানিতে। কিন্তু তবুও লোকগুলো পিছু হটলো না, ওটার চারপাশে জড়ো হয়েই রইলো, পাশ থেকে শুরু করে পেছন পর্যন্ত, ওটার ধাওয়ার বেগ কমতে লাগল একটু একটু করে। যদিও ওটার গর্জনের জোর বেড়ে গেল আগের চাইতে আর দ্বীপের দর্শকরা স্পষ্ট দেখতে পেল কীভাবে ওটা বিশাল দাঁতগুলো দিয়ে মানব মাংস কেটে কেটে নামাচ্ছে।

মানাতাসসি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, সামান্য ঝুঁকে আছে সামনে, কাটা ভ্রূ কুঁচকে আছে, চোখজোড়া হলুদ আর উৎসুক।

নদীর পানিতে ফেনার পরিমাণ বাড়তে লাগল, তবে মদ্দাটার তর্জনের সুর বদলে গেল যেন, আতংকের ছোঁয়া লেগেছে সেখানে, ঝাঁক ধরে থাকা উলঙ্গ দেহগুলোর আড়ালে চোখে পড়ছে না ওটাকে আর। ব্যাপারটা ঠিক যেন একদল পিঁপড়া একটা কাঁকড়া বিছেকে আক্রমণ করার মত, নিজের আয়তনের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র জীবের দল শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে পরাহত করে দিচ্ছে জলহস্তীটকে। ভেজা শরীরগুলোর উপর সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে। মদ্দাটার সম্মুখ গতি থমকে গেল। পুরো জিনিসটা এখন রূপান্তরিত হয়েছে সংগ্রামরত মানব শরীরের একটা গোলকে। জায়গাটার চারপাশের পানি রক্তে ঘন বাদামি রঙে রূপ নিয়েছে, একটা ষাঁড়ের গায়ের বিষ দেওয়া কালো পোকার মত ঝরে ঝরে পড়তে লাগল জানোয়ারটার গায়ের সাথে সেটে থাকা আহত দেহগুলো। দুর্বল স্রোতে ভাসতে লাগল আহতরা, বাকিরা ঝাঁক বেঁধে প্রবল আগ্রহে সামনে বাড়লো ওদের জায়গা নিতে।

তারপর, অলৌকিকভাবে ওই জানোয়ার আর মানুষের সংগ্রামরত গাট্টিটা দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল; পেছনে পড়ে রইলো মৃত লাশের ছিন্ন দেহাবশেষ, অগভীর পানি দিয়ে ধীরে ধীরে আসতে লাগল ওরা।

দ্বীপে পৌঁছে পানি থেকে উঠে এল ওরা–১,০০০, নাহ ২,০০০ হবে হয়তো, অবসন্ন কিন্তু তখনও লড়াইরত জলহস্তীটাকে কাঁধের উপর তুলে ধরে নদী থেকে পাড় ধরে বয়ে নিয়ে আসছে। ক্রুদ্ধ হয়ে এপাশে ওপাশে কামড়

বসাচ্ছে মদ্দাটা, চোয়ালের আওতার ভেতরে থাকা প্রত্যেকেরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল তাতে। মদ্দার মাথা আর মুখের ভেতরটা উজ্জ্বল লাল হয়ে গিয়েছে ওর শিকারের রক্ত জমে।

মৃত আর ভয়ানকভাবে আহত লোকের লম্বা একটা সারি পেছনে ফেলে রেখে এসে, ওরা মদ্দাটাকে মানাতাসসি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে নিয়ে এল। আগের সেই সমর অধিনায়ক টলতে টলতে ছুটে এল সামনের দিকে। ওই ভয়ানক চোয়ালের একটা কামড়েই কনুই-এর কাছ থেকে একটা হাত কাটা পড়েছে তার, সেখান থেকে রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে আছে সে।

রাজাকে একটা বর্শা তুলে দিল সে। সামনে এগিয়ে গেল মানাতাসসি, ওর লোকেরা আতংকিত জানোয়ারটাকে চেপে ধরে রাখলো, ও গলা বরাবর ঢুকিয়ে দিল বর্শাটা, প্রথম আঘাতেই কেটে গেল গলার প্রধান শিরাটা। পিচকারির মত করে কালো রক্ত ছিটকে বের করে দিয়ে মারা গেল মদ্দাটা আর ওটার মৃত্যু আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে।

পেছনে সরে দাঁড়িয়ে নির্বিকার তাকিয়ে রইলো মানাতাসসি, ওর লোকেরা আহতদেরকে দয়াবশত দ্রুত এক ঘা বসিয়ে যন্ত্রণার অবসান করে দিতে লাগল। আর যখন সেই অধিনায়ক ওর সামনে হাঁটু ভেঙে বসে, নিজের ভয়ানকভাবে ছিন্ন কাটা হাতটাকে বুকের সাথে চেপে ধরে অনুরোধ করল রাজার হাতে জীবনাবসানের সম্মান পেতে, তখন ওর চোখে গর্বের একটা আভা উজ্জ্বল হয়ে আবার মিলিয়ে গেল। অধিনায়কের অনুরোধ রাখলো ও, লোহার থাবার একটামাত্র আঘাতে গুঁড়িয়ে দিল লোকটার খুলি, তারপর আবার ফিরে এল আগের জায়গায়, শেখদের চোখের বিহ্বলতা দেখে নীরস একটা হাসি ফুটলো ওর মুখে।

"এই হলো আমার জবাব," বলল ও, কিছুক্ষণ পর হাসান জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কাছে কী চান আপনি?"

"দুটো জিনিস," মানাতাসসি জবাব দিল। "আমার বাহিনী পার হওয়ার জন্য আপনার এলাকা দিয়ে একটা যাত্রাপথ। ওপেটের সাথে আপনাদের যে পারস্পরিক সুরক্ষার চুক্তি আছে সেটাকে অগ্রাহ্য করতে হবে–আর আমার লোহার অস্ত্র প্রয়োজন। আমার কামারদেরকে এতগুলো লোকের জন্য অস্ত্র বানাতে আরও দশ বছর লাগবে। আপনাদের কাছে থেকে অস্ত্র লাগবে আমার।"

"বদলে আপনি আমাদেরকে ওপেটের স্বর্ণ আর মধ্য সাম্রাজ্যের খনিগুলো দিয়ে দেবেন?"

"না!" মানাতাসসি খ্যাক করে বলে উঠলো। "আপনারা সব স্বর্ণ নিতে পারবেন। আমার ওসবের কোনো দরকার নেই। ওটা একটা অভিশপ্ত ধাতু, নরম আর ফালতু। আপনারা পুরো ওপেটই নিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু," বলে

একটু থামলো ও, "মধ্য সাম্রাজ্যের স্বর্ণের খনিগুলোতে আর কখনো কাজ হবে না। আর কখনো কোনো মানুষ বিনা কারণে মাটির ভেতর নামবে না।"

হাসান প্রতিবাদ করতে গেল। মধ্য সাম্রাজ্যের স্বর্ণ ছাড়া এই ঝামেলায় জড়ানোটাই বৃথা হয়ে যাবে। কল্পনার চোখে, স্বর্ণ ভরা সাম্রাজ্যটার সাথে বাণিজ্য পথের চুক্তি বাতিলের প্রস্তাবে শান সম্রাটের রাগান্বিত চেহারা দেখতে পেল ও। ওমরের আঙুল মৃদুভাবে সতর্ক করল ওকে, ওগুলোর কটাক্ষময় স্পর্শই পরিষ্কারভাবে বলে দিল সব।

"এসব নিয়ে তর্ক করার জন্য, পরেও সময় পাওয়া যাবে।" আর হাসান কিছু বলতে গিয়েও বলল না, বরং প্রতিবাদটা গিলে নিয়ে যতটা সম্ভব চওড়া হাসি হাসলো মানাতসসির দিকে চেয়ে।

"আপনি আপনার অস্ত্র পেয়ে যাবেন। আমি দেখবো সেটা।"

"কখন?" জানতে চাইলেন মানাতাসসি।

"শীঘ্রই," কথা দিল হাসান, "পূর্ব সাগরের ওপারের দেশ থেকে আমার জাহাজগুলো ফিরে আসলেই।"



বিগত কয়েক বছরে লানন বেশ বুড়িয়ে গিয়েছেন, ভাবলেন হুই। কিন্তু পরিবর্তনটা তৃপ্তিকর, রাজ্য শাসনের দুশ্চিন্তায় কপালের যে ভাজগুলো পড়েছে সেটা তার চেহারার বৈশিষ্ট্য থেকে কমনীয়তা দূর করে দিয়ে সেখানে সম্ভ্রমের একটা ভাব এনে দিয়েছে। মুখের চারপাশেও একই রকম প্রগলভতা, একটা জেদী বাচ্চার মত মুখভঙ্গি, কিন্তু কাউকে সেটা বুঝতে হলো খুব কাছ থেকে খেয়াল করতে হবে।

অবশ্য ওনার শরীর এখনও যুবকের মত, শক্ত-সমর্থ। নৌকার সামনের দিকে, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উনি এখন, বর্শা ছোঁড়ার ভঙ্গিমায়, তেল চকচকে চামড়ার নিচে স্পষ্ট ফুটে আছে ওনার পিঠ আর কাঁধের প্রতিটা পেশী। রোদে পুড়ে শরীরে গাঢ় মধুর মত স্বর্ণালি আভা সৃষ্টি হয়েছে, সারা দেহে শুধুমাত্র নিতম্বটাই ধবধবে সাদা, কারণ জায়গাটা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। এক অনবদ্য সৃষ্টি উনি, দেবতাসহ প্রত্যেকের অনুগ্রহপ্রাপ্ত, নিজের দেহের সাথে ওনার দেহের তুলনা করতেই ভেতরে ভেতরে চরম হতাশা অনুভব করলেন হুই।

হুইয়ের মনের ভেতর কবিতার লাইন বাঁধা শুরু হয়ে গেল, লাননের প্রতি একটা গান, ওনার সৌন্দর্যের প্রতি একটা আখ্যান। নৌকাটাকে চুপচাপ আর

নিপুণ হাতে হ্রদের স্থির পানির উপর দিয়ে বেয়ে নিয়ে যেতে যেতে ওনার মনের ভেতর শব্দগুলো জমা হতে শুরু করল, ঠিক বাতাসে ভাসমান পাতার মত, তারপর সেগুলো একে একে জায়গামতো বসে পড়ে, জন্ম নিল নতুন একটা কাব্য।

নৌকার অগ্রভাগ থেকে, পেছনে না ফিরেই, ওনার মুক্ত হাত দিয়ে সংকেত দিলেন লানন, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন আগের ভঙ্গিমায়, দৃষ্টি সোজা পানিতে নিবদ্ধ আর হুই দক্ষ হাতে দাঁড়ের একটা মাত্র আঘাতে ঘুরিয়ে ফেললেন ডোঙাটা। আচমকাই লাননের শরীর ওনার ভেতর এতক্ষণ ধরে জমতে থাকা শক্তিটাকে তরল পদার্থের বিস্ফোরণের মত করে অবমুক্ত করল, লম্বা বর্শাটা পানির ভেতর ছুঁড়ে দিতেই পাক খুলে গেল টানটান হয়ে থাকা পেশীগুলোর। পানি ফুঁসে উঠে ঘূর্ণি সৃষ্টি হলো, খোলের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা দড়ি ছুটে গেল নৌকার পাশ দিয়ে, হিসহিস করে ঢুকে যেতে লাগল পানির ভেতরে।

"হা!" চেঁচিয়ে উঠলেন লানন। "এক্কেবারে জায়গামতো! হাত লাগাও, হুই!" আর দুজনে মিলে দড়িটা টেনে ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওনারা, উত্তেজনায় দাঁত বের করে হাসছেন দুজনেই, তবে দড়িটা ধরে রাখতে গিয়ে আঙুলে ঘষা খেয়ে ব্যথা করে ওঠায় গালাগাল পাড়া শুরু করলেন। দুজনে মিলে মাছটার প্রবল গতিকে কমিয়ে আনলেন আস্তে আস্তে। তবে মাছটা গভীর পানির দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই ডোঙাটাও ওটার টানে ধীরে ধীরে হ্রদের গভীরের দিকে সরে যেতে লাগল।

"বাআলের পবিত্র নামের কসম, আটকাও ওটাকে, হুই," হাফাতে হাফাতে বললেন লানন। "একবার যদি আমাদেরকে ঘোল খাইয়ে গভীরে চলে যেতে পারে, তাহলে আর ব্যাটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না নিশ্চিত।" এবার দুজনের সম্মিলিত ওজন প্রয়োগ করলেন ওনারা রশির উপরে। হুইয়ের কাঁধ আর বাহুর পেশীগুলো ফুলে উঠে মোটা হয়ে গেল অজগরের শরীরের মত, উল্টো দিকে ঘুরে যেতে বাধ্য হলো মাছটা।

ওনারা মাছটাকে পানির উপরের দিকে তুলে আনলেন আর ওটা ডোঙ্গার নিচে বৃত্ত তৈরি করে গোত্তা খেয়ে খেয়ে আলোড়ন তুলতে লাগল পানিতে। যখন ওটার বিশাল গোঁফঅলা মাথাটা পানির উপরে উঠে এল, লানন চিৎকার করে উঠলেন, "ধরে রাখো ওটাকে!" আর হুই নিজের কবজিতে রশিটা পেঁচিয়ে নিয়ে পুরো শরীরের ওজন দিয়ে ধরে রইলেন সেটা, মাছের টানে একদিকে বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে গেল ডোঙাটা আর লানন মাছ মারার গদাটা তুলে নিয়ে চকচক করতে থাকা কালো মাথাটা লক্ষ্য করে নিশানা তাক করলেন।

মাছটা মৃত্যু যন্ত্রণায় মোচড়ানো শুরু করতেই পানিতে প্রবল আলোড়ন উঠে গেল, ওনাদের মাথার উপর দিয়ে ছিটকে উঠতে লাগল পানি, দুজনেই ভেসে গেলেন একেবারে।

“ভালোমতো লাগান!” চিৎকার করলেন হুই। “শেষ করে দেন!” আর পানির তোড়ে অর্ধেক অন্ধ অবস্থাতেই, লানন মাছটার প্রকাণ্ড শুণ্ড বরাবর পিটিয়েই চললেন। কিছু বাড়ি তো একেবারে এলপাথাড়ি পড়ল, ডোঙার পাশে গিয়ে লাগল সেগুলো, তক্তার চলটা উঠে গেল তাতে।

“আরে নৌকায় না, বোকা। মাছের গায়ে মারেন!” চেঁচিয়ে বললেন হুই। অবশেষে মারা গেল মাছটা, ঝুলতে লাগল নৌকার পাশের পানিতে।

হাসতে হাসতে, হাফাতে হাফাতে আর গাল পাড়তে পাড়তে, ওনারা মাছটার ফুলকার ভেতর মোটা একটা দড়ি ঢুকিয়ে, নৌকার পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে টেনে তুলে আনলেন। ওটার শরীর চটচটে আর কালো, পেটটা উজ্জ্বল রূপালি, চোখ ঠেলে বের হয়ে আছে। হাঁ হয়ে থাকা মুখের উপরে গোফটা তখনও মোচড় দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে, ডোঙার পাটাতন পুরোটা ভরে গেল মাছটা দিয়ে, হুইয়ের তুলনায় দ্বিগুণ লম্বা আর শরীর এত মোটা যে উনি দুই হাত দিয়েও বেড় পাবেন না জড়িয়ে ধরতে গেলে।

“পুরো দানব একটা,” হাফাতে হাফাতে বললেন হুই। “জীবনেও এত বড় মাছ দেখিনি।”

“তুমি আমাকে বোকা বলে ডেকেছো,” লানন বললেন।

“আরে নাহ, জাঁহাপনা, আমি তো আমার নিজের কথা বলছিলাম,” দাঁত বের করে হাসলেন হুই, তারপর ওয়াইনের জগের মুখ খুলে ওনাদের জন্য ওয়াইন ঢেলে নিলেন।

লানন পেয়ালাটা হুইয়ের দিকে তুলে ধরে, কিনারের উপর দিয়ে ওনার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

“উড়ে যাও, আমার সূর্যের পাখি।”

“গর্জে উঠুন, গ্রাই-লায়ন।” আর দুজনে একই সাথে পেয়ালাটা খালি করে বাচ্চাদের মত করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

“অনেক দিন পর, হুই,” লানন বললেন ওনাকে। “আমাদের আরও ঘন ঘন করা উচিত এটা। এত দ্রুত বয়স বেড়ে গেল আমাদের, দায়িত্ব আর কর্তব্য আমাদেরকে আটকে রাখে সারাক্ষন আর নিজেদের কর্মযজ্ঞের জালে জড়িয়ে থাকি নিজেরাই।” লাননের চোখের উপর দিয়ে যেন একটা ছায়া পেরিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি। “গত কয়েকদিন ধরে খুব ভালো লাগছে আমার, বহু বছর পরে সত্যিকার আনন্দ পাচ্ছি।” উনি প্রায় লজ্জিত দৃষ্টিতে হুইয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। “তুমিই আমার জন্য সব, বন্ধু।”

হঠাৎই উনি হাত বাড়িয়ে বেখাপ্পাভাবে হুইয়ের পিঠ চাপড়ে দিলেন। “তুমি না থাকলে আমি কী করবো তা নিজেও জানি না। আমাকে কখনও ছেড়ে যেয়ো না, হুই।”

হুইয়ের গালে রঙ ধরলো, বিব্রত হয়ে কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না উনি, এটা লাননের এমন একটা রূপ যেটার সাথে উনি নিতান্তই অপরিচিত। "আরে নাহ, জাঁহাপনা," ধরা গলায় বললেন উনি, "সবসময় আপনার সাথে থাকবো আমি।" আর লাননও ওনার হাত নামিয়ে হাসতে লাগলেন, হুইয়ের মত উনিও বিব্রত।

"হায় বাআল, আমরা একেবারে মেয়েদের মত আবেগী হয়ে গিয়েছি দেখো–এটা কি বুড়ো বয়সের ভীমরতি বলে মনে হয়, হুই?" নৌকার পাশ দিয়ে ওয়াইনের পেয়ালাটা ধুতে ধুতে বললেন উনি, বিশাল রগড় করে কাজটা করলেন, হুইয়ের চোখ এড়িয়ে। "হ্রদে এখনও মাছ আছে, দিনেরও এক দুই ঘণ্টা বাকি, সময়টা কাজে লাগানো যাক।"

সন্ধ্যার পরে ওনারা ওনাদের পুরনো কুঁড়েটার কাছে ফিরে এলেন, সৈকতের আইভরি পাম গাছগুলোর নিচে পরিত্যক্ত আর অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে সেটা বহুদিন ধরে। লগি ঠেলে ডোঙাটাকে দ্বীপের মাথার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন হুই, তারপর দুজন মিলে নলখাগড়ায় ভর্তি পাড়টা পরিষ্কার করতেই দেখতে পেলেন সামনে নোঙ্গর করে ভেসে আছে একটা জাহাজ। বার্কা পরিবারের রাজকীয় পতাকা উড়ছে ওটার মাস্তুলে, বাতি জ্বলছে এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত। কালো পানির উপর নাচছে আগুনের প্রতিফলন, মানুষের গলার আওয়াজও স্পষ্ট ভেসে আসতে লাগল ওনাদের কানে।

হুই ডোঙাটা থামিয়ে লগির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নীরবে দুজনেই তাকিয়ে রইলেন লম্বা জাহাজটার দিকে। লাননই কথা বললেন শেষমেশ।

"দুনিয়া আমাদেরকে খুঁজে বের করে ফেলেছে, হুই।" ওনার কণ্ঠ অবসন্ন আর হাল ছেড়ে দেওয়ার মত। "আমার পক্ষ থেকে ডাক দাও ওদেরকে।"



জাহাজের সামনের কক্ষটার ছাদ থেকে শেকল দিয়ে ঝুলতে থাকা বাতির আলোয় সবার চেহারা কেমন একটা অপার্থিব আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে, গাল আর নাক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু চোখ ঢাকা থাকছে ছায়ার আড়ালে। টেবিলের চারপাশে জড়ো হওয়া প্রত্যেকের চেহারায় গোমড়া ভাব, উত্তর থেকে আসা সংবাদবাহকের কথা শুনছে মন দিয়ে। যদিও খবর নিয়ে আসা ছেলেটা কমবয়স্ক, সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছে বছরও পেরোয়নি, তবুও

তার আচার আচরণ বেশ অভিজাত আর ভণিতা না করে সরাসরি দিয়ে দিল খবরটা।

গত কয়েক সপ্তাহে, উত্তর সীমান্তে ছাড়া ছাড়া যে গোলযোগ ঘটছে সেগুলোর বর্ণনা দিল ও, ছোটখাট ঘটনা–বেশ দূর থেকে অনেক মানুষের সমাবেশকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা, বিশাল কোনো শিবির থেকে আসা আগুন আর ধোঁয়ার আভাস–এরকম। গুপ্তচররা অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ডের খবর এনে দিয়েছে, ঈগলের নখর আর সিংহের থাবাঅলা নতুন এক দেবতার নাকি উদ্ভব হয়েছে, যে কিনা সকল আদিবাসীকে পানি আর ঘাসের জমিনে নিয়ে যাচ্ছে। অনুসন্ধানীরা বিশাল নদীর পশ্চিম উপকূলের কাছে অনেকগুলো ড্রাভ জাহাজকে ছেড়ে যেতে দেখেছে, একটা অস্বাভাবিক আসা যাওয়া, গোপন অনেক দেখা সাক্ষাতের খবরও পাওয়া গিয়েছে, তবে সেগুলো কাদের ভেতর তা কেউ জানে না।

একটা অস্থিরতা, একটা প্রবল গুঞ্জরণে নড়ে চড়ে উঠলো সবাই। দুশ্চিন্তা আর চাপা উত্তেজনার স্বরে গোপন শলা পরামর্শ চলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। ঝড়ো মেঘ জমে, বজ্রপাতের আভাস পাওয়ার সময়ের মত লাগতে লাগল পরিবেশটা। কিছু যে ঘটছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। সকল সংকেত নির্দেশ করছে এক অজানা ব্যাপারের দিকে।

লানন চুপচাপ শুনলেন সব। ভ্রূ কুঁচকে আছেন সামান্য, হাত মুঠি করে ধরে তার উপর থুতনি চেপে বসে আছেন, চোখ অন্ধকারে।

"আমার অধিনায়ক ভয় পাচ্ছেন যে আপনি এই সব কিছুকে হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন আর গুজব ভেবে কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। উনি অবশ্য কথাটা আপনাকে বলতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি না বলে পারলাম না।"

"না," লানন হাত নেড়ে সংবাদটাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নেওয়ার জন্য ছেলেটার আর্জিকে উড়িয়ে দিলেন। "বুড়ো মার্মনকে আমি ভালোই চিনি। কেঁচোকে সাপ ভেবে ভুল করবে না উনি।"

"আরও আছে," বলতে বলতে ছেলেটা টেবিলের উপর একটা চামড়ার ব্যাগ নামিয়ে রাখলো। বেঁধে রাখার ফিতেটা খুলে ভেতর থেকে বের করে আনল বেশ কয়েকটা ধাতুর তৈরি হাতিয়ার।

"নদীর পাহারদার বাহিনী আদিবাসীদের একটা দলকে রাতের আঁধারে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করার সময় পাকড়াও করে। ওদের কাছে ছিল এসব, ওদের সবার কাছে।"

লানন একটা ভারি বর্শার মাথা তুলে নিয়ে কৌতূহলী চোখে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন সব। অস্ত্রটার আকৃতি আর কারিগরি একেবারে স্পষ্ট, হুইয়ের দিকে তাকালেন উনি।

"কী মনে হয়?" জিজ্ঞেস করলেন লানন, হুইয়ের জবাবে ওনার ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হলো।

"ড্রাভ। কোনো সন্দেহ নেই।"

"ওই বর্বরগুলো পেল কোথায়?"

"মৃত ড্রাভদের কাছে থেকে পেয়েছে হয়তো, বা চুরি করেছে।"

"হয়তো," মাথা ঝাঁকালেন লানন। আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে তরুণ ছেলেটার দিকে তাকালেন উনি, "খুব ভালো কাজ দেখিয়েছো।" বলতেই ছেলেটার চেহারা খুশিতে ভরে গেল। লানন পাশে দাঁড়ানো হাব্বাকুক লালের দিকে ফিরলেন। "আমাদেরকে এক রাতের ভেতরে ওপেটে নিয়ে যেতে পারবেন নাকি?" জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন নৌ অধিনায়ক।

কিছুক্ষণের মাঝেই জাহাজটা সর্বোচ্চ গতিতে সামনে এগোনো শুরু করল। লানন আর হুই সামনের রেইলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওনাদের দ্বীপটাকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখতে পেলেন, চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি করছে ওটার উপরিভাগ।

"আবার কবে এখানে আসা হবে সেটাই ভাবছি, হুই," মৃদু স্বরে বললেন লানন, হুইও ওনার পাশে অস্থিরভাবে নড়ে চড়ে উঠলেও কিছু বললেন না মুখে। "আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা ফেলে চলে যাচ্ছি। খুব দামী কিছু যা আর কখনোই খুঁজে পাবো না," বলে চললেন লানন। "তোমারও কি একই রকম লাগছে?"

"হয়তো এটা আমাদের যৌবন, লানন। হয়তো বিগত কয়েকটা দিন ছিল এর সমাপ্তি।" দুজন চুপ করে রইলেন এরপর, দাঁড়ের তালে জাহাজের দুলুনির সাথে নিজেরাও দুলছেন। দ্বীপটা চোখের আড়াল হওয়ার পরে লানন আবার কথা বললেন।

"আমি তোমাকেই সীমান্তে পাঠাবো, হুই। আমার চোখ আর কান হতে হবে তোমাকে, পুরনো বন্ধু।"



"খুব বেশি দিনের জন্য না, প্রিয়তমা," মাফ চাইলেন হুই, যদিও তানিথ বলেনি কিছুই, পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শান্তভাবে এক ছড়া বেগুনি আঙুর খাচ্ছে। "আমি যে গিয়েছি সেটা টের পাওয়ার আগেই ফিরে চলে আসবো আবার।"

তানিথ এমনভাবে মুখ কুচকে ফেলল যেন একটা আঙুর খুব টক, হুই চিন্তিত মুখে ওর মুখভঙ্গি পড়ার চেষ্টা চালালেন। সেটা সৌম্য আর সুন্দর আর ঠিক দেবীর মতই নির্বিকার।

হুই তানিথের সকল মেজাজ সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল, ওর প্রতিটা মুখভঙ্গি বা মাথার হেলানোই বলে দেয় সব। ওনার মুগ্ধ চোখের সামনেই ও একটা বাচ্চা মেয়ে থেকে পূর্ণ মহিলায় রূপান্তরিত হয়েছে, যেন কুঁড়ি থেকে ফোঁটা ফুল। আর উনি ওকে ধৈর্য আর ভালোবাসার সাধনা দিয়েই বলা যায় নিরীক্ষা করেছেন, কিন্তু এই একটা মেজাজ বাকি রয়ে গিয়েছে যেটা ওনাকে এখনও বিহ্বল করে দেয়।

তানিথ ওর লম্বা সরু বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা গোলাপি জিহ্বার ডগা দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে, প্রবল আগ্রহে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো, আলোর ভেতর ঘুরিয়ে দেখত লাগল উল্টে পাল্টে।

"এই অভিযানে আমি বাদে ভরসা করে পাঠানোর মত আর কেউ নেই রাজার কাছে। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"তা তো জানি-ই," বিড়বিড় করে বলল তানিথ, তখনও হাত দেখেই চলেছে। "ঠিক যেরকম মাছ ধরার জন্যেও ওনার সাথে যাওয়ার মত আর কেউই ছিল না।"

"কী যে বলো, তানিথ," হুই যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। "লানন আর আমি সেই বাচ্চা কালের বন্ধু। আগে আমরা মাঝে মাঝেই ওই দ্বীপে যেতাম। সেই সময়টাকে মনে করার জন্যে আবার গিয়েছিলাম এবার।"

"আর এখানে আমি আপনার বাচ্চাকে পেটে নিয়ে একা একা দিন কাটিয়েছি।"

"মাত্র পাঁচটা দিন," মনে করিয়ে দিলেন হুই।

"মাত্র পাঁচটা দিন," ভেংচি কেটে বলল তানিথ আর বলতে বলতে গাল লাল হয়ে গেল ওর, এর মানে হচ্ছে ওর মেজাজ বরফ থেকে আগুন হচ্ছে এখন। "দেবীর প্রতি আমার ভালোবাসার কসম, আমি আপনাকে একটুও বুঝি না! আপনি নাকি আমার প্রেমে হাবুডুবু খান আবার লানন হাইকানাস আঙুল বাঁকিয়ে ডাক দিলেই দৌড়ে যান ওনার কাছে, একটা কুকুরের বাচ্চার মত জিভ বের করে চিত হয়ে শুয়ে গড়াগড়ি খেতে থাকেন যাতে উনি আপনার পেট চুলকে দেন!"

"তানিথ!" হুই হাসতে শুরু করলেন। "আমি নিশ্চিত তুমি হিংসায় জ্বলে মরছো।"

"হিংসা, তাই না!" চিৎকার করে উঠলো তানিথ। একটানে তুলে নিল ফল রাখার পাত্রটা। তারপর "দেখাচ্ছি তোকে হিংসা!" বলে ছুঁড়ে দিল বাটিটা। ওটা বাতাসে থাকা অবস্থাতেই ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য নতুন কিছু খুঁজতে লাগল আবার।

বুড়ি আইনা বাগানের শেষ মাথায় রোদ পোহাতে পোহাতে ঢুলছিল, আচমকা এই ঝড়ের আওয়াজে চমকে উঠে হুইয়ের সাথে পলায়নে যোগ দিল

সে-ও। একটা দেওয়ালের আড়ালে এসে নিরাপদ আশ্রয় পেল ওরা, তারপর ওখান থেকে হুই সতর্কতার সাথে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে আগের জায়গায় কেউ নেই আর, তবে ঘরের ভেতরের কোথাও থেকে তানিথের ফোঁপানোর আওয়াজ পাওয়া যেতে লাগল।

"কোথায় ও?" কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আইনা।

"ঘরের ভেতর," জবাব দিলেন হুই, দাড়ি থেকে ফলের টুকরো ঝেড়ে ফেলে, জামা থেকে ওয়াইনের দাগ মুছে ফেললেন উনি।

"কী করছে?"

"কাঁদছে," বললেন হুই।

"ওর কাছে যান," আদেশ দিল আইনা।

"আবার যদি আক্রমণ করে বসে?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন হুই।

"পাছায় চাপড় দেবেন," শিখিয়ে দিল আইনা। "তারপর চুমু খাবেন।" বলে দাঁতহীন মুখেই প্রকট ইঙ্গিতময় হাসি দিল একটা।

"আমাকে মাফ করে দিন, মহানুভব," ফিসফিস করে বলল তানিথ, ওর উষ্ণ অশ্রু ভিজিয়ে দিতে লাগল হুইয়ের কাঁধ। "কীসব বাচ্চাদের মত করেছি আমি, কিন্তু আপনার থেকে এক মুহূর্ত দূরে থাকলেই মনে হয় যেন আমার ভেতরের একটা অংশই মরে যায়।"

হুই জড়িয়ে ধরে রইলেন ওকে, চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছেন, ওর ভালোবাসার জোরে মনে হলো ওনার বুকটা ভরে ফুলে ফুলে যাচ্ছে। ওর গলার স্বর শুনে উনি প্রায় কেঁদেই দিলেন।

"এবার তো আর আমার পক্ষে আপনার সাথে যাওয়া সম্ভব হবে না, তাই না?" শেষ একটা আবেদন করল ও। "দয়া করেন, মহানুভব, দয়া করেন, আমার ভালোবাসা।"

হুইয়ের জবাব অনুতপ্ত গলায় হলেও বেশ কড়া শোনালো। "আমি যাবো খুবই দ্রুত আর কীভাবে যাবো তার কোনো ঠিক নেই, তাছাড়া তোমার এখন তিন মাস চলছে।"

অবশেষে মেনে নিল তানিথ। গদিতে সোজা হয়ে বসে, চোখটা মুছে, ঠোঁট বাঁকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসার চেষ্টা করে বলল, "বাচ্চার জন্য কী কী ব্যবস্থা করেছেন সেটা কি আরেকবার বলবেন না?"

হুইয়ের পাশে বসল তানিথ, সারা শরীর নরম আর উষ্ণ হয়ে আছে। ওর সামান্য ঠেলে বের হওয়া পেট আর ভরাট হতে থাকা স্তনের ফ্যাকাসে চামড়া চকচক করছে কুপির আলোয়। চোখ বড় বড় করে ও হুইয়ের কথা শুনতে লাগল। হুই বিস্তারিত বলে গেলেন, তানিথ কখনো মাথা ঝাঁকালো, হাসলো আবার কখনো অবাক হলো—জেং-এর পাহাড়ি এলাকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশে, ওনার বাগানবাড়িতেই এক পালক মা ঠিক করেছেন হুই। উনি ওকে বললেন

কীভাবে ওনার বাচ্চা সুস্বাস্থ্যের অধিকারি আর শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠবে, কীভাবে ওনারা ওটাকে দেখতে ওখানে বেড়াতে যাবেন।

"ওটা?" তানিথ চোখ পাকিয়ে জানতে চাইলো। "কখনো *ওটা* বলবেন না, মহানুভব–ও!"

"ও!" সম্বোধন ঠিক করে নিলেন হুই, দুজনেই হেসে উঠলেন একসাথে। কিন্তু তানিথের হাসির নিচে দুঃখবোধ রয়েই গেল তখনও। ব্যাপারটা এরকম হওয়ার কথা না। ও এরকম ভাবতেও পারে না, এই সমাধানের মাঝে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না, কোনো বাচ্চার হাসির আওয়াজ পায় না বা ছোট্ট দেহটার উষ্ণতা নিজের দেহে অনুভব করতে পারে না।

হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য ওর সামনে সময়ের মানসপর্দাটা খুলে গেল, আর, প্রায়ই যেমনটা হয়, ভবিষ্যৎ দেখতে পেল ও, দেখলো কালো কালো আকৃতি, মানুষ আর এমন সব জিনিস যা ওকে ভয় পাইয়ে দিল।

ও হুইকে জড়িয়ে ধরে ওনার কণ্ঠ শুনতে লাগল। ওকে আরাম আর শক্তি দিল তা, অবশেষে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনার লুটটা এনে দিলে আমাকে একটা গান শোনাবেন?"

আবারও উনি তানিথকে নিয়ে লেখা কবিতাটা গেয়ে শোনালেন, কিন্তু এখন ওটায় নতুন নতুন কথা যোগ হয়েছে। প্রতিবার যখন উনি গানটা গান, ওটায় নতুন নতুন স্তবক যুক্ত হতে থাকে।



মার্মন হচ্ছেন উত্তরের সমর অধিনায়ক, উত্তর সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক আর উত্তর সীমানা পাহারাদানকারী সকল সেনাদল আর কেল্লার সেনাধ্যক্ষ।

হুইয়ের পুরনো বন্ধু উনি, বয়সের পার্থক্য তিরিশ হলেও, জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ঘনিষ্টতা এনে দিয়েছে ওনাদের। মার্মন একজন অত্যুৎসাহী সামরিক ইতিহাসবিদ, হুই ওনাকে রোমের সাথে তৃতীয় যুদ্ধের ইতিহাসের খসড়া পাণ্ডুলিপি লেখার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। লম্বা, তালপাতার সেপাই লোকটা, মাথায় ঝাকড়া রূপালি চুল, যেটা নিয়ে তার গর্বের সীমা নেই। উনি নিয়মিত সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে আঁচড়ে রাখেন। গায়ের ত্বক মেয়েদের মতই মসৃণ আর ওনার বেরিয়ে থাকা খুলির হাড়ের উপর টান টান করে বসানো। তবে কাঁপুনি রোগের কারণে গায়ের রঙ হলুদাভ হয়ে গিয়েছে, সাথে চোখের সাদা অংশও এখন হলুদ।

পুরো সাম্রাজ্যের অন্যতম অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ উনি, টানা দুই দিন ধরে হুই সীমান্তের সামগ্রিক অবস্থাটা নিয়ে আলাপ করলেন ওনার সাথে। মাটির ছকের উপর বসানো মানচিত্রের উপর হুমড়ি খেয়ে বসে মার্মন একটা একটা করে জায়গা দেখাতে লাগলেন হুইকে যাতে উনি বুঝতে পারেন যে ধাঁধার কোন টুকরোটা কোথায় বসবে। মার্মনের হাড্ডিসার হাতটা ঘুরে ঘুরে প্রতিটা ঘুঁটিকেই স্পর্শ করল, যেখানে গণ্ডগোল বা ঝামেলা সেই এলাকা দাগ টেনে চিহ্নিত করে দিলেন, সেসব শুনে শুনে সম্পূরক প্রশ্ন করতে লাগলেন হুই।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার পরে দুজন একসাথে রাতের খাবার খেলেন, দুর্গের প্রাচীরের উপর বসে, সন্ধ্যার বাতাস খাওয়ার লোভে। একজন দাসী মেয়ে ওনাদের হাতে পায়ে সুগন্ধি তেলে মর্দন করে দিল যাতে মশা না ধরে আর মার্মন নিজের হাতে হুইয়ের ওয়াইনের পেয়ালা ভরে দিলেন। তবে নিজে খেলেন না। কাঁপুনি রোগে একজন মানুষের যকৃৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার জন্য ওয়াইন তখন বিষ-এর সমতুল্য।

হুই মনে মনে বাআলকে ধন্যবাদ জানালেন ওনাকে এই রোগের ধ্বংসলীলা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য। উষ্ণ, নিম্নভূমিতে ভরা জলা এলাকা আর নদীর পাশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি। খেতে খেতে হুইয়ের মনে রোগটা নিয়েই ভাবনা চলতে লাগল: কেন রোগটা কাউকে মেরেই ফেলে, কাউকে পঙ্গু করে দেয় আবার কাউকে ধরে-ই না? কেন শুধু নিম্নভূমিতেই আক্রমণ করে, ঠান্ডা উচ্চভূমিতে কোনো কারবার নেই? এটা নিয়ে পরে বিস্তারিত ভাবতে হবে, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাতে হবে।

খাওয়া শেষে মার্মন কথা বলা শুরু করতেই, হুই এলোমেলো ভাবনা থেকে মনকে সরিয়ে, আবার মূল সমস্যায় নিবদ্ধ করলেন।

"আমি শেষমেশ একটা সুষ্ঠু গুপ্তচর দল গড়ে তুলতে পেরেছি, যেটার উপর ভরসা করা যায়," জানালেন মার্মন। "আদিবাসী গোত্রগুলোর ভেতরেই এখন আমার লোক আছে, যারা নিয়মিত খবরাখবর দেয়।"

"ওদের কারো সাথে দেখা করতে পারলে ভালো হতো," আগ বাড়িয়ে বললেন হুই।

"আমার মনে হয় সেটা না করা ভালো হবে, মহানুভব," বলা শুরু করলেন মার্মন, কিন্তু হুইয়ের মুখভঙ্গি চোখে পড়ায় সুর বদলে ফেললেন, "ওদের একজনের আগামী কয়েক দিনের মাঝে খবর নিয়ে আসার কথা আছে। এ হচ্ছে আমার সবচে বিশ্বস্ত সংবাদদাতা। লোকটার নাম স্টর্চ, জাতে ভোল্ডি, আগে দাস ছিল। ওকে দিয়েই আমি নদীর ওপারে গুপ্তচর নিয়োগ দিচ্ছি।"

"আমি কথা বলবো ওর সাথে," বললেন হুই, তারপরই গুরুগম্ভীর কথোপকথন পাল্টে গেল হালকা আলাপে, মার্মন ওনার পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে হুইয়ের পরামর্শ চাইলেন। পুরনো বন্ধুর মত আড্ডা দিতে লাগলেন ওনারা, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এল আর দাসরা এসে মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেল ওনাদের জন্য। অবশেষে মার্মন বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "মহানুভব, এখানকার সবাই আমার কাছে একটা আর্জি রেখেছে। ওদের কারো কারো আপনার গান শোনার সৌভাগ্য হয়নি, যারা শুনেছে তারাও অধীর হয়ে আছে আবার শোনার জন্য। ওরা একেবারে নাছোড়বান্দা, মহানুভব, তবে আশা করছি ওদের আবদারটা আপনি রাখবেন।"

"আমার ঘর থেকে লুটটা আনতে পাঠিয়ে দিন কাউকে," হুই হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন, একজন তরুণ কর্মকর্তা লুটটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল।

"আমরা ওটা এনেই রেখেছি, মাননীয়।"

হুই সৈন্যদের নিয়ে লেখা গান দিয়ে শুরু করলেন, তারপর গাইলেন মদ্যপান আর কুচকাওয়াজের গান, অশ্লীল গান আর সব শেষে গৌরবের গান। সবার খুব পছন্দ হলো। কর্মকর্তারা চুপে চুপে দেওয়ালের উপরে হুইয়ের চারপাশে জড়ো হলো, নিচের উঠোনে জড়ো হলো সাধারণ জওয়ানেরা, সবার চেহারা উপরের দিকে, সমবেত অংশগুলোতে গলা ফাটিয়ে গাইলো সবাই।

অনেক রাতের দিকে, একজন খানসামা ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে মার্মনের সাথে কথা বলল নীরবে। উনি মাথা নেড়ে লোকটাকে বিদায় করে দিয়ে হুইয়ের কাছে ফিসফিস করে বললেন, "মহানুভব, যে লোকটার কথা বলেছিলাম, সে এসেছে।"

হুই লুটটা নামিয়ে রাখলেন একপাশে। "কোথায় সে?"

"আমার ঘরে।"

"চলুন যাই ওর কাছে," বললেন হুই।

স্টর্চ লম্বা একজন মানুষ, সরু গাছের মত শারীরিক গঠন–যেটা ভেন্ডিদের ভেতর প্রায়ই দেখা যায়, তবে ওর কাঁধের মসৃণ মখমলের মত কালো চামড়ায় চাবুকের আঘাতে বিক্ষত হয়ে পুরু ক্ষতের দাগ বসে আছে।

হুইয়ের দৃষ্টি টের পেয়ে আলখাল্লাটা টেনেটুনে কুৎসিত ক্ষতটা ঢেকে দিল লোকটা, হুইয়ের মনে হলো ওর চোখে যেন অবাধ্যতার একটা ঝলক দেখতে পেলেন, যদিও চেহারা শান্ত আর নির্বিকার।

"ও পিউনিক বলতে পারে না," মার্মন ব্যাখ্যা করলেন। "কিন্তু আমি জানি যে আপনি এদের ভাষা জানেন।"

মাথা ঝাঁকালেন হুই, গুপ্তচর লোকটা একটা মুহূর্ত ওনার দিকে তাকিয়ে মার্মনের দিকে ফিরে কথা বলতে শুরু করল। ওর গলার স্বর শান্ত, কোনো রাগ বা অভিযোগ নেই।

"আমাদের মাঝে কথা হয়েছিল যে আর কেউ আমার চেহারা দেখবে না," বলল সে।

"এটা আলাদা ব্যাপার," মার্মন দ্রুত ব্যাখ্যা করলেন। "ইনি কোনো সাধারণ লোক না, ওপেটের সর্বোচ্চ পুরোহিত আর রাজার সকল সেনাদলের প্রধান।" বলে থামলেন মার্মন। "ইনি হচ্ছেন হুই বেন-আমন।"

গুপ্তচর মাথা ঝাঁকালো, এখনও ওর চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি দেখা গেল না, এমনকি হুই যখন ভেন্ডিতে কথা বলে উঠলেন, তখনও না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কথা বললেন ওনারা, কথা শেষে হুই মার্মনের দিকে ফিরলেন, পিউনিক-এ কথা বলছেন।

"এ যা বলছে তার সাথে তো আপনার কথা মিলছে না," হুই বিরক্ত হয়ে, ভ্রূ কুচকে টেবিলের উপর হাতের গিঁট দিয়ে বাড়ি দিতে লাগলেন। "এ তো সিংহের থাবাঅলা দেবতার ব্যাপারে কিছুই শোনেনি, বা দ্রাভদের অস্ত্রে সজ্জিত প্রশিক্ষিত যোদ্ধার কথাও জানে না।"

"না," মার্মন সায় দিলেন। "নদীর এই ধারটা শান্ত। আমাদের খবর এসেছে আরও গভীর পূর্ব থেকে।"

"ওখানেও গুপ্তচর আছে আপনার?" জিজ্ঞেস করলেন হুই।

"কয়েকজন," মাথা ঝাঁকালেন মার্মন, হুই কিছুক্ষণ ভাবলেন কিছু একটা নিয়ে।

"আমি পূর্ব দিকেই আগাবো তাহলে," হুই মনস্থির করে ফেললেন। "ভোরেই রওনা দেব।"

"পাহারাদার জাহাজ এসে পৌঁছাবে পাঁচদিন পরে।"

"জাহাজ থেকে কিছুই দেখে যাবে না। হেঁটে যাবো আমি।"

"আমি তাহলে সূর্যোদয়ের আগেই আপনার সাথে যাওয়ার জন্য একটা দল তৈরি রাখবো," প্রস্তাব দিলেন মার্মন।

"না," নাকচ করে দিলেন হুই। "আমি দ্রুত যেতে চাই, একা গেলে কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনাও কম হবে অনেক।" আবার উনি স্টর্চের দিকে তাকালেন। "এ পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, যদি আসলেই নির্ভরযোগ্য হয় আপনার কথা মত।"

মার্মন হুইয়ের আদেশটা গুপ্তচরকে জানিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি যেতে পারো এখন। খেয়ে বিশ্রাম নাও, সূর্য ওঠার আগে তৈরি হয়ে নিয়ো।"

লোকটা চলে গেলে হুই স্টর্চের গমনপথের দিকে লম্বা একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, "এরকম একজনকে কত করে দেন?"

"খুব কম," জানালেন মার্মন। "লবণ, পুঁতি, কিছু তামার অলংকার।"

"ভাবছি যে, কাজটা ও কেন করে," হালকা চালে বললেন হুই। "কেন আমাদের হয়ে কাজ করছে যখন ওর গায়ের চাবুকের দাগ এখনও শুকায়নি।"

"আমি আর মানুষের কর্মকাণ্ডে অবাক হই না," বললেন মার্মন। "জীবনে মানুষের এত অদ্ভুত ব্যবহার দেখেছি যে কারো মতলব সম্পর্কে প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছি এখন।"

"আমি কখনও সেটা করা থামাইনি," বিড়বিড় করে বললেন হুই, এখনও তাকিয়ে আছেন গুপ্তচরের যাত্রাপথে, নিজের গোত্রের সাথে লোকটার বেঈমানির বাপারটায় অস্বস্তি বোধ করছেন, ব্যাপারটা ওনার নিজের আত্মসম্মানবোধের ভিত্তিকে খুব কঠোরভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়েছে।



পরের চারদিন গুপ্তচর সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য বের করার ব্যাপারে হুইয়ের প্রচেষ্টা বিফলই হলো বলা চলে। স্টর্চ খুবই চুপচাপ একজন মানুষ, শুধুমাত্র যখন সরাসরি কোনো প্রশ্ন করা হয় তখনই কথা বলে, তারপর উত্তরও দেয় এমন পরিমিত শব্দে যে অনেকসময় তা যথার্থ হয় না। ও কখনোই হুইয়ের দিকে সরাসরি তাকায় না; চোখ সবসময় তাক করা থাকে ওনার চেহারার পাশের দিকে আর দৃষ্টি থাকে ওনাকে ছাড়িয়ে পেছনে।

সঙ্গী হিসেবে লোকটা খুবই বিরক্তিকর, যদিও সে তাদের যাত্রাপথের জমিনের প্রতিটা ভাজ বা নদীর প্রতিটা বাঁক সম্পর্কে নিখুঁতভাবে জানে।

দক্ষিণ পাড়ের দুটো দুর্গে গেলেন ওনারা, ওখানে ঘাঁটি করে থাকা লোকদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য পেলেন অনেক। দুই জায়গায় ওনারা এমন আলামত পেলেন যেখানে রহস্যময় কোনো কাজে প্রচুর মানুষ একসাথে নদী পার হয়ে গিয়েছে, এর বাইরেও অনেক চিহ্ন ছিল সেগুলো গোপন কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত দেয় আর তা হুইয়ের অস্থিরতাকে আসমানে তুলে দিল।

ওনার বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছিল এই কারণে যে এই লক্ষণগুলো ছিল স্টর্চের বারবার বলা নদীর ওপারের শান্ত আর স্থিতিশীল পরিস্থিতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

দ্রুততার সাথে আর নীরবে এগোতে লাগলেন ওনারা, ঠিক যেন বনের ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ঘুরতে থাকা একজোড়া প্রেতাত্মা। ঠান্ডা সন্ধ্যা আর রাতেই মূলত এগোলেন বেশি আর দুপুরের ভাপ ওঠা গরমে বিশ্রাম নিলেন। খেতেন খুব কম, সাথে করে নিয়ে আসা ভুট্টার পিঠা দিয়েই কাজ চালিয়ে নিলেন, শিকার করার বিলাসিতায় সময় নষ্ট করলেন না।

চতুর্থ দিনে ওনারা একটা ছোট্ট গ্রানাইটের ঢিবির চূড়ায় এসে পৌঁছলেন, ওখান থেকে সামনে ছড়িয়ে থাকা উপত্যকাটার বিশাল এলাকা জরিপ করা

সম্ভব, একপাশের পাহাড়ার ঢাল থেকে অন্য পাশের পাহাড়ের ঢাল পর্যন্ত বিস্তৃত–জায়গাটা এমন বিশাল, শুধু দূরের নীল দিগন্তের ঝাপসা এলাকা বাদে আড়াল নেই কোথাও। উপত্যকার সামনেই বিশাল নদীটা মস্ত একটা বাঁক নিয়েছে দক্ষিণ দিকে, বাঁকটা কয়েক মাইল এগিয়ে একটা চওড়া ফাঁস তৈরি করেছে, যা প্যাঁচ খেয়ে আবার এসে মিশেছে নিজের সাথেই।

ফাঁসটার পরিধি বিশ থেকে পঁচিশ মাইল, কিন্তু গলার কাছে সেটা মাত্র পাঁচ মাইলেরও কম্ আর ওটার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল আরেকটা কেল্লার কঠিন খর্বাকৃতির অবয়ব। ওটা থেকে রান্নার আগুনের ধোঁয়া বের হয়ে স্থির, উষ্ণ বাতাসে নীলচে পালকের মত সৃষ্টি করছে।

হুই নদীর বাঁকটার দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন, ভাবছেন দিনভর খাটুনি খেটে ঘুরে যাবেন, নাকি দেখে ফেলার ঝুঁকি সত্ত্বেও ফাঁসের গলা বরাবর চট করে পার হয়ে যাবেন।

"স্টর্চ," ডাকলেন উনি, "নদী কি পার হওয়া সম্ভব? এখানে কি আদিবাসী লোকজন আছে নাকি?"

গুপ্তচর হুইয়ের উৎসুক দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল, যাতে কোনো অভিব্যক্তি দেখা না যায়। হুইয়ের পাশের গ্রানাইটের পাথরটায় মাথা নিচু করে একেবারে স্থির হয়ে বসে রইলো সে–আর তাতে হুই ভাবলেন যে ও বোধহয় প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি।

"আমরা যদি বাঁকটা আড়াআড়ি পার হই তাহলে রাস্তা কম হবে। সেটা কি নিরাপদ হবে?" আবার জিজ্ঞেস করলেন উনি, স্টর্চ জবাব দিল, "আমি গিয়ে দেখছি। আপনি এখানে দাঁড়ান।"

সন্ধ্যার এক ঘণ্টা আগে ফিরে এসে, হুইকে নদীর পাড়ে নিয়ে গেল স্টর্চ। নলখাগড়ার ফাঁকে একটা সরু গাছের খোলের তৈরি ডোঙা বেঁধে রেখেছে সে ওখানে। ডোঙার কাঠ পচে পোকা ধরে গিয়েছে, পচা মাছের গন্ধ আসছে তা থেকে। হুইয়ের সন্দেহ ঘনীভূত হলো আরও।

"কোথায় পেয়েছো এটা?"

"ভাটির দিকে একটা জেলে পরিবার আছে।"

"কয়জন?"

"চারজন," জবাব দিল স্টর্চ।

"ভেন্ডি?"

"না, সোফালার লোক।"

"যোদ্ধা?"

"জেলে। বুড়ো লোক সব, চুল পাকা।"

"আমার ব্যাপারে বলেছো ওদেরকে?"

"না।"

হুই ইতস্তত করতে লাগলেন, স্টর্চের চোখের শূন্য দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে, সেখানে বিশ্বাসঘাতকতার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা সেটা খুঁজে দেখলেন প্রথমে।

"না," বললেন হুই; "এভাবে যাবো না। ঘুরপথেই যাবো।" ব্যাপারটা ছিল একটা পরীক্ষা। স্টর্চের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন উনি, আশা করেছিলেন যে ও তর্ক করবে, হুইকে ডোঙায় পার করার জন্যেই চাপাচাপি করবে বা পটানোর চেষ্টা করবে।

"আপনি যা বলেন," মাথা ঝাঁকালো স্টর্চ, ডোঙাটা আবার নলখাগড়া দিয়ে ঢেকে দিতে শুরু করল।

"না থাক," রাজি হয়ে গেলেন হুই, "পার করেই নিয়ে যাও।"

স্টর্চ স্রোতকে কাজে লাগিয়ে ছোট্ট পলকা নৌকাটাকে এগিয়ে নিতে লাগল। সামনেই দেখা গেল ভোতকা মাছগুলো পাগলের মত পানি ছেড়ে আকাশে ওড়ার প্রচেষ্টায় লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে, পদ্ম পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছুটে বেড়াচ্ছে সাদা আর বাদামি রঙে মেশানো জ্যাকানাস পাখি আর ওনাদেরকে দেখে লম্বা কাঠের তক্তার মত দেখতে কুমিরের অশুভ অবয়বগুলো পাড় বেয়ে নেমে এগিয়ে গেল গভীর পানির দিকে।

একটা কর্দমাক্ত সৈকতে এসে নামলেন ওনারা, এখানে যে জানোয়ারগুলো পানি খেতে আসে সেগুলোর পায়ের পাড়ায় পিষ্ট হয়ে আছে পুরো এলাকা, স্টর্চ সেখানেই লুকিয়ে রাখলো ডোঙাটা। তারপর হুইকে পাড়ের উপরে নিয়ে গেল, সেখান দেখা গেল জলার ভেতর জন্মানো বিষাক্ত ঘাসে ভরা উজ্জ্বল একটা সমতলভূমি। কোমর সমান লম্বা গভীর ঘন সন্নিবিষ্ট ঘাসের দঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন দুজনে, পা টিপে টিপে এগোতে হলো, কারণ নিচের মাটি ভেজা আর পিচ্ছিল।

তৃণভূমির ঠিক মাঝে আচমকা থেমে দাঁড়ালো স্টর্চ, তারপর হুইকেও ইশারা করল না নড়ার জন্য। কিছু শোনার চেষ্টা করছে, এমন ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল ওর মাথা। ওনারা অনড় দাঁড়িয়ে রইলেন দীর্ঘ সময়, শেষমেশ হুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থাকার ইশারা করে নিজে সামনে এগিয়ে গেল স্টর্চ।

হুই থেকে একশো পেস সামনে আবার দাঁড়িয়ে গেল স্টর্চ, কিন্তু এবার ও ঘুরে আবার ফিরে তাকালো হুইয়ের দিকে।

প্রথমবারের মত ওর চেহারায় অভিব্যক্তি দেখা গেল, একটা বুনো উল্লাস–বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত।

ডান হাত তুলে হুইয়ের দিকে ইশারা করল ও, প্রচণ্ড ঘৃণার একটা ভঙ্গি, ভেন্ডিতে চিৎকার করে বলল, "এই তো সে! ধরো ওকে!"

তৃণভূমির ঘাস সরসর করে এমনভাবে সরে গেল যেন ওটার ভেতর দিয়ে জোরে বাতাস বয়ে গিয়েছে, একের পর এক ভেন্ডি যোদ্ধারা উঠে দাঁড়াতে

লাগল নিজেদের লুকানো জায়গা থেকে। তারপর নিজেদের ঢাল একটার সাথে আরেকটা লাগিয়ে, সারি ধরে সবাই মিলে হুইয়ের চারপাশে চমৎকার একটা বৃত্ত তৈরি করে ফেলল ঝটপট। মুহূর্তেই ওরা ঘিরে ফেলল ওনাকে পুরোপুরি, ওদের শিরস্ত্রাণের পাখির পালক একটা ভীতিকর ঢেউ তুলে উড়তে লাগল হুইয়ের চারপাশে।

গলা চেপে দমবন্ধ করে দেওয়া একটা হাতের মুঠির মত, একটু একটু করে যোদ্ধারা চেপে আসতে লাগল ওনার দিকে। মরিয়া হয়ে উনি ওদের দিকে তাকাতে লাগলেন, পালানোর জন্য ফাঁক খুঁজছেন একটা। কিন্তু সেরকম কিছুই না পেয়ে, অগত্যা শকুন কুঠারের ফলা থেকে চামড়ার খাপটা খুলে ফেলে ধেয়ে গেলেন আগুয়ান দলটার দিকে, দেখে মনে হলো যেন প্রকাণ্ড একটা কালো ষাঁড়ের গলা বরাবর ঝাঁপ দিচ্ছে একটা টেরিয়ার কুকুর।

"জয় বাআল!" সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন হুই। তারপর সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লেন যোদ্ধাদের নিরেট দেওয়ালের দিকে।



"এখানকার বাতাস খুবই বাজে," অভিযোগ করলেন লানন, নাক টানছেন উনি। "মাটির উপরের সাথে বাতাস চলাচলের রাস্তা তৈরি করা কি কোনোভাবেই সম্ভব না?"

"জাঁহাপনা!" রিব-আড্ডি নিজের আতংক লুকাতে পারলেন না। "তার মানে কী হবে চিন্তা করেন। এখানে মিস্ত্রি পাঠালে..." বলে উনি হাত দিয়ে এত দীর্ঘ একটা ইশারা করলেন যে পুরো কোষাগারকে নির্দেশ করল সেটা। "ভাবতে পারেন ওরা এখান থেকে গিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কত শত গল্প বলবে যা চার সাম্রাজ্যের প্রতিটা ডাকাতের লোভকে উসকে দেবে?"

এই কারণেই রাজকীয় কোষাগারের অবস্থান আর ভেতরে কী আছে সে সম্পর্কে খুবই কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। পুরো সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুরক্ষিত গোপন তথ্য এটা-রাজা, সর্বোচ্চ পুরোহিত আর যাজিকা, রিব-আড্ডি আর অধীনস্ত চারজন কর্মকর্তা জানে শুধু।

"কাজ শেষ করার সাথে সাথেই ওদেরকে দেবতাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো," লানন যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

রিব-আড্ডি অবাক হয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। ওনার মাথায় সমস্যাটার এরকম সুদূরপ্রসারী সমাধান জীবনেও আসতো না। দাড়ি চুলকে এক মুহূর্ত গভীরভাবে ভাবার পরে পরবর্তী অভিযোগটা খুঁজে পেলেন উনি।

"বাতাস যাওয়ার রাস্তা করলে চোর আর ইঁদুর ঢুকবে, বাতাস ঢুকে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যাবে সব। সবকিছুই নষ্ট হয়ে যাবে তাতে।"

"ওহ, বাদ দেন।" লানন বিষয়টা বাতিল করে দিলেন, খুব ভালোই জানেন যে রিব-আড্ডি প্রস্তাবটার বিরুদ্ধাচরণ শুধুমাত্র এটা একটা পরিবর্তন এজন্য করেননি। বিগত দুইশো বছর ধরে যেটা ভালো চলছে, পরবর্তী দুইশো বছরেও সেটা ভালোই চলবে।

লাননের সামনেই মধ্য সাম্রাজ্য থেকে আসা স্বর্ণের আঙুলের শেষ চালানটা, আগে থেকেই কোষাগারের কুলুঙ্গির ভেতরে স্তূপ করে রাখা বাটগুলোর উপর সাবধানে জমা করা হলো। রিব-আড্ডি নিখুঁতভাবে পরিমাণটা নিজের লিপিতে টুকে নেওয়ার পর, পাশে স্বাক্ষর দিয়ে অনুমোদন দিয়ে দিলেন লানন।

চারজন বিশ্বাসভাজন কর্মকর্তা সার বেঁধে সম্পদে ভর্তি বিশাল কক্ষটা থেকে বেরিয়ে গেল। সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলে, রিব-আড্ডি লোহার দরজাটা আটকে দিয়ে, কাদার ফলকে গ্রাই-লায়নের মোহরের ছাপ মেরে দিলেন। সবশেষে উনি আর লাননও সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে, সূর্যের ছবি আঁকা দরজাটা পেরিয়ে প্রবেশ করলেন রাজ্যের সংগ্রহশালায়। লানন লাগিয়ে দিলেন দরজাটা, বিশাল কপাট দুটো কট করে ঘুরে আবার আগের জায়গায় এসে বসে গেল।

দরজাটা লাগিয়ে, কপাটের উপরের দেবতার ছবির সামনে সূর্যের প্রতীক তৈরি করলেন লানন, তারপর রিব-আড্ডিকে পাশে নিয়ে বরাবরের মতই সম্পদের উপরে বক্তৃতা দিতে দিতে, এগিয়ে যেতে লাগলেন সংগ্রহশালার ভেতর দিয়ে। এখানের তাকগুলোয় পুরো সাম্রাজ্যের নথিপত্র সংগৃহীত আছে, খুব বেশি জায়গা খালি নেই। দ্রুতই এই খুপরিগুলোর সম্প্রসারণের কাজে হাত দিতে হবে তাকে, বর্তমান কাঠামো নষ্ট বা ধ্বংস না করেই কীভাবে এগুলোকে আরও বড় করা যায় সেটা নিয়ে ভাবতে হবে।

মূল ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলেন ওনারা, ওখানের ভারি চামড়ার পর্দাটা সরাতেই চোখে পড়ল প্রহরীদের কক্ষ, ষষ্ঠ বাহিনীর সেনা কর্মকর্তারা প্রহরা দেয় এখানে। দিন রাত সবসময় দুজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকে, জরুরি প্রয়োজনে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছে হুই বেন-আমনের বাহিনীর বাছাই করা একশো জন সৈন্য। ষষ্ঠ বাহিনীটা আসলে তৈরি করা-ই হয়েছিল রাজ্যের মন্দির আর কোষাগারগুলো প্রহরার জন্য আর এটা এখনও ওদের দায়িত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অ্যাসটার্টের মন্দিরের গোলকধাঁধার মাঝে, রিব-আড্ডি সেলাম ঠুকে লাননের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তার চারজন অধস্তনকে সাথে নিয়ে। পেছনমুখী হেঁটে বের হলেন সবাই, করিডোরের বাঁকে অদৃশ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত কুর্নিশ অবস্থায় মাথা নোয়ানোই থাকলো সবার।

চারজন যাজিকার তত্ত্বাবধানে, সব খুলে নগ্ন হয়ে গেলেন লানন, তারপর বরাবরের মতই রাজকীয় সৌষ্ঠব নিয়ে অ্যাসটার্টের দীঘিতে শাস্ত্রীয় গোসলটা সেরে নিলেন, সব শেষে তারা ওনাকে একজন পুজারির পোশাক পরিয়ে দিল, লানন বাকিদের চোখের আড়ালে একজন নবিসের পায়জমার ভেতর তার চঞ্চল হাতটা ঘুরিয়ে আনলেন একবার। নবিসের অভিব্যক্তি পাল্টালো না, কিন্তু দূরে সরে যাওয়ার আগে সে আগ্রহভরে লাননের আঙুলে জোর করে চাপ দিল একটা। লানন লম্বা পা ফেলে দৈবদ্রষ্টার দর্শন কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন, যাওয়ার পথে মোচে তা দেওয়ার ছল করে শুকে নিলেন আঙুলে লেগে থাকা মেয়েটার গায়ের ঘ্রাণ।

তাওয়ায় সেঁকতে থাকা ভুট্টার পিঠার মতই উত্তপ্ত কামুক এরা সবাই–এই দেবতার দুহিতাগুলো, নিজেদের কামনা মেটানোর জন্য এদেরকে হয় সমকামী হতে হয় নাহলে নির্ভর করতে হয় কোনো ঢিলা চরিত্রের যাজক বা মন্দিরের প্রহরীর উপর। এদের কতজন যে ফলবতী বসুন্ধরা উৎসবের অবাধ যৌনাচারের সুযোগ নেবে সেকথা ভেবে হাসি ফুটলো লাননের মুখে। উনিও প্রায়ই ভারি আলখাল্লা পরা আর ছদ্মবেশ নেওয়া যাজিকাদেরকে অশুচিকরণের মত মহাপাপ করেছেন। উৎসবটা কাছিয়ে এসেছে, মাত্র দুই সপ্তাহ পরেই শুরু হবে, বরাবরের মতই উনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন সেটার জন্য। তারপরেই ভেবে খারাপ লাগল যে হুই সম্ভবত উত্তর থেকে সময়মতো ফিরে এসে উৎসবে যোগ দিতে পারবেন না। ওনার নিজের আনন্দ ফিকে হয়ে যাবে তাতে। লাননের মেজাজ এখন সবসময়েই চড়ে থাকে আর এখনও মাত্র কয়েক ডজন পেস পেরিয়ে এসেই মনের ফুর্তির ভাবটা উবে গেলে ওনার, দর্শন কক্ষে ঢুকলেন যখন, তখন চেহারা ভয়ানক গোমড়া হয়ে আছে।

আসনে বসা দৈবদ্রষ্টার দিকে তাকালেন লানন, হাতির দাঁতের তৈরি একটা মূর্তির মত বসে আছে সে, হাত কোলের উপর ভাজ করে রাখা আর তার চেহারায় এমনভাবে প্রসাধনী মাখা যেন মনে হচ্ছে মুখোশ পরা–কপালে মেখেছে অ্যান্টিমনির গুঁড়ো, চোখের পাতা মনে হচ্ছে ধাতব নীল আর ফ্যাকাশে চেহারার মাঝে ঠোঁটজোড়া যেন লাল রঙের উজ্জ্বল একটা পোচ। মেজাজ খিচড়ে যাওয়ার একটা কারণ খুঁজে পেলেন উনি।

তাচ্ছিল্যের সাথে একটা সম্মানসূচক ভঙ্গি করলেন উনি, মনে পড়ল যে এই ডাইনী প্রায়ই ওনাকে উদ্দেশ্য পূরণে বাঁধা দিয়েছে বা পরিকল্পনায় গোলমাল করে দিয়েছে। এসব ভবিষ্যৎকথনের ব্যাপার স্যাপার উনি খুবই অপছন্দ করেন, কিন্তু তবুও এগুলো এক অদ্ভুত মাদকতাময় আকর্ষণ করে ওনাকে। উনি ঠিকই বোঝেন যে এর বেশিরভাগ অনুমানই আবর্জনা, সম্ভবত রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় কোনো অভিভাবকের শিক্ষা, কিন্তু তবুও অনেক বিচক্ষণ মন্তব্য আর চমৎকার পরামর্শ থাকে এর ভেতরে। আর মাঝে মাঝে

তো এই ডাইনীর মুখে থেকে একেবারে খাঁটি সোনার টুকরো বের হয়ে আসে। নিয়মিত দর্শনের সময় লানন ওনার কান খাড়া করে থাকতেন দৈবদ্রষ্টার কণ্ঠের ওঠানামা খেয়াল করার জন্য। রিব-আড্ডির মতই, এই ডাইনীও ভবিষৎবাণী বলার সময় যখন কিছু দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলে বা সন্দেহ নিয়ে বলে তখন তার কণ্ঠ বদলে যায়। লানন এসবের প্রতি খুবই সংবেদনশীল, বিশেষ করে একটা খুবই বিরল স্বরের প্রতি–একটা একঘেয়ে, খুবই নিচু স্বর–যেটা ডাইনীটা ব্যবহার করে শুধুমাত্র অলৌকিক উপায়ে পাওয়া দেবতা প্রদত্ত ভবিষ্যতের কোনো আসল কথন বলতে।

দুই পা দুদিকে শক্ত করে আর দুই হাত মুঠো করে নিতম্বের উপরে রেখে দৈবদ্রষ্টার সামনে দাঁড়ালেন উনি। রাজকীয় একটা আগ্রাসী ভঙ্গি এটা, মেজাজ খারাপ থাকার কারণে আরও প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে, বিরক্ত স্বরে উনি প্রশ্ন করা শুরু করলেন।

গ্রাই-লায়নের সাথের এসব বৈঠক পছন্দ করে না তানিথ। উনি ওকে ভয় পাইয়ে দেন। ব্যাপারটা ওর কাছে মনে হয় কোনো দুর্দান্ত সুন্দর কিন্তু বর্বর পশুর সাথে একই খাঁচায় আটকে থাকার মত, বিশেষ করে যেখানে ওটার মতিগতি অস্থির আর মেজাজ অনিশ্চিত। ওনার চোখের ফ্যাকাসে নিষ্ঠুর নীল রঙ যেন কোনো শিকারির চোখের খুনে উন্মাদনা, ওনার সব বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে কুঁদে বানানো, কিন্তু একই সাথে চরম নিষ্ঠুরতার শীতল প্রতিমূর্তি।

এর আগে পর্দার পেছনে হুইয়ের উপস্থিতির কারণে তাও একটা ভরসা পাওয়া যেত যে উনি ওকে উদ্ধার করবেন, কিন্তু আজকের সকালে ও একেবারেই একা–আর অসুস্থ।

গত রাতটা ছিল গরম আর বাতাসহীন, ওর গর্ভের বাচ্চাটাকে মনে হচ্ছিল পাথরের টুকরো। ঘুম থেকে উঠেই বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে ওর, ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা, সারা রাত ঘামতে থাকায় চামড়া স্যাঁতস্যাঁত করছে। আইনা ওর জন্য যে সকালের নাস্তা বানিয়েছিল সেটা জোর করে গলাধঃকরণ করেছিল কোনোমতে, কিন্তু সাথে সাথেই গাঁ গুলিয়ে ওঠায় বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে সব।

অম্ল-তিক্ত পিত্তের স্বাদ এখনও লেগে রয়েছে ওর গলার পেছনে, আলখাল্লার নিচে ঘামে ভেসে যাচ্ছে সব, শরীর বেয়ে পেটের উপর দিয়ে নামার সময় সুড়সুড়ি লাগছে। মনে হচ্ছে যেন দম আটকে আসছে, মরিয়া হয়ে বাতাস খুঁজে মরছে ওর ফুসফুস, রাজা যখন ঘেউ ঘেউ করে প্রশ্নগুলো করতে লাগলেন তখন শরীর নিস্তেজ আর দুর্বল লাগছিল ওর।

কোনো প্রস্তুতি ছিল না, ফলে উত্তরগুলো ছিল কোনো দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়াই দেওয়া ফাঁকা বুলি, মনোযোগ রাখতেও কষ্ট হতে লাগল ওর, হুই ওকে কী শিখিয়েছিলেন ঠিকমতো মনে পড়ছিল না তা।

রাজা আস্তে আস্তে অস্থির হয়ে পড়তে লাগলেন, সামনে পেছনে পায়চারি শুরু করলেন উনি। তানিথ টের পেল ওর প্রসাধনীর নিচে ঘাম ভাঙতে শুরু করেছে। চামড়ায় চুলকানি শুরু হলো, ফুলে গিয়েছে যেন, লোমকূপগুলো রঙের প্রলেপে বদ্ধ হয়ে আছে আর সেগুলো তুলে ফেলার জন্যে অস্থির লাগছে ওর। আচমকাই ও মানসচক্ষে দেখতে পেল শ্যাওলা ভরা পাথরের গাঁ থেকে ঠান্ডা পানি ঝরে পড়ছে, সেই সবুজ পানিতে নগ্ন হয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে ও, ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে, চুল পানির উপর ভেসে ভেসে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে, ঠিক জলজ গাছের লতার মত।

"বল ডাইনী! বল, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। খুবই সামান্য একটা প্রশ্ন। উত্তর দে!"

ওর সামনে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাজা, এক পা আসনের সিঁড়িতে, কাঁধগুলো পেছনে হেলানো আর নিতম্ব সামনে ঠেলে একটা পুরুষালী উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, ওনার সুন্দর মুখটাতে টিটকারির আভাস আর কণ্ঠে বিদ্রুপ।

তানিথ প্রশ্নটা শুনতেই পায়নি, কিছু বলার জন্য শব্দ হাতড়াত লাগল, আবারও এক দফা গাঁ গুলিয়ে উঠলো ওর। টের পেল উপরের ঠোঁটের রঙের আস্তরণের নিচ দিয়ে ঘাম ফেটে বের হচ্ছে, বমি ভাবটা পরিবর্তিত হয়ে গেল মাথা ঝিমঝিমানিতে।

লাননের চেহারাটা অস্পষ্ট হয়ে এল, অন্ধকার ঘিরে ধরলো তানিথকে। দৃষ্টি সরু হয়ে এল ওর, যেন অন্ধকার আর দীর্ঘ একটা পথের দিকে তাকিয়ে আছে, যেটার শেষ মাথায় লাননের চেহারা একটা জ্বলন্ত তারার মত জ্বলজ্বল করছে। ওর কানের ভেতর শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল, জঙ্গলের গাছের ভেতর ঝড়ের বাতাস বয়ে গেলে যেরকম শব্দ হয় সেরকম। তারপরেই বাতাসের শব্দ মরে গিয়ে নেমে এল নিস্তব্ধতা, তার ভেতর থেকে কথা বলে উঠলো কেউ একজন। কণ্ঠটা চাপা আর খুবই নিচু, নিস্তরঙ্গ আর একঘেয়ে, যেন কোনো বধির মহিলা বা ভাং-এর ধোঁয়া টানা মাতাল কারো গলার স্বর। সামান্য অবাক হয়ে তানিথ টের পেল যে স্বরটা ওর নিজের গলা থেকেই বের হচ্ছে, কথাগুলো চমকে দিল ওকে।

"লানন হাইকানাস, ওপেটের শেষ গ্রাই-লায়ন, ভবিষ্যৎ আর জানতে চাইবেন না। আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার আর মৃত্যু দিয়ে ভরা।"

নিজের বিহ্বলতা লাননের চেহারাতেও দেখতে পেল তানিথ, ওনার চেহারার রঙ সরে গেল, ঠোঁটজোড়া এত জোরে চেপে ধরলেন যে দেখে মনে হলো ফ্যাকাসে মর্মর রঙের একটা রেখা শুধু।

"লানন হাইকানাস, সময়ের কয়েদি, নিজের খাঁচার গরাদের পেছনে পায়চারি করছেন আপনি। আপনার জন্য অপেক্ষা করছে শুধু অন্ধকার।"

লানন নিজের মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলেন, চেষ্টা করছেন কথাগুলোকে অস্বীকার করার। গোসলের কারণে তখনও ভিজে থাকা ওনার স্বর্নালি চুলের গোছা কাঁধের উপর ঝাঁকি খেতে লাগল, উনি দুই হাত তুলে সূর্যের প্রতীক তৈরি

করলেন, চেষ্টা করছেন বিষাক্ত কথাগুলোকে মন থেকে সরিয়ে দিতে যা ওনার আত্মাকে ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মত এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে।

"লানন হাইকানাস, আপনার দেবতারা পালাচ্ছে, তারা উড়ে যাচ্ছে আসমানে, আপনাকে রেখে যাচ্ছে অন্ধকারে।"

লানন আসন থেকে দূরে সরে গেলেন, দুই হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন চেহারা, কিন্তু কথাগুলো নির্মমভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিতে লাগল তাকে।

"লানন হাইকানাস, যে কিনা ভবিষ্যৎ জানতে চাচ্ছেন, জেনে রাখেন যে সেটা আপনার জন্য এমনভাবে অপেক্ষা করছে যেভাবে সিংহ বেখেয়াল পথিকের জন্য অপেক্ষা করে।"

লানন চিৎকার করে উঠলেন, ওনার আতংক বিস্ফোরিত হলো ক্রোধে।

"শয়তান!" চিৎকার করে উঠলেন উনি, ছুটে গেলেন দৈবদ্রষ্টার দিকে, লাফিয়ে পার হয়ে এলেন আসনের ধাপগুলো। "জাদুকর!" চিৎকার করতে করতে উনি সপাটে চড় বসাতে লাগলেন তানিথের গালে, একেক চড়ে একেকবার একেকদিকে হেলে যেতে লাগল ওর মাথা। মাথার ঘোমটা সরে গেল একপাশে আর খোপা খুলে এলিয়ে পড়ল কালো চুল। গালে প্রচণ্ড শব্দে পড়তে লাগল চড়, কিন্তু তানিথ কোনো শব্দ করল না। ওর নীরবতা লাননের ক্রোধকে আরও উন্মত্ত করে দিল।

উনি ওর আলখাল্লার সামনের দিকটা ধরে আসন থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসলেন।

"ভেল্কিবাজ!" আবারও চেঁচিয়ে উঠে তানিথকে ধাপগুলোর উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেললেন লানন। তানিথ দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ে গড়িয়ে গেল একদিকে, চেষ্টা করল আবার উঠে দাঁড়াতে, কিন্তু লাননের প্রথম লাথিটা গিয়ে লাগল ওর পেটে আর ও ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল আবার, শরীরের মাঝের জায়গাটা চেপে ধরে গোঙাতে লাগল আর লাননের চপ্পল পরা পা মুহুর্মুহু পড়তে লাগল ওর উপর।

লানন ওকে লাথি মেরে পুরো কক্ষে ঘোরাতে ঘোরাতে ক্ষিপ্ত চিৎকার করতে লাগলেন; লাথি মারার ফাঁকে ফাঁকে মরিয়া হয়ে খুঁজতে লাগলেন একটা অস্ত্র, যা দিয়ে এই মহিলা আর তার বলা কথাগুলোকে চিরতরে শেষ করে দেবেন।

তারপর আচমকাই পুরো কক্ষ ভরে গেল যাজিকা দিয়ে, লানন হাফাতে হাফাতে পিছিয়ে গেলেন, ফ্যাকাসে চোখে উন্মাদের দৃষ্টি ফুটে আছে।

"জাঁহাপনা!" প্রধান যাজিকা এগিয়ে এলেন সামনে, ডাক শুনে লাননের পাগলামি স্তিমিত হলো, কিন্তু তখনও শিউরে উঠতে লাগলেন আর ওনার ঠোঁটজোড়া কাঁপতে লাগল সাদা হয়ে।

লানন ঘুরে লম্বা পা ফেলে বের হয়ে গেলেন কক্ষ থেকে, তানিথ বিধ্বস্ত মেঝের উপর শুয়ে চাপা স্বরে কান্না আটকানোর চেষ্টা করতে লাগল।



অ্যাসটার্টের ধর্মীয় মন্ত্রণা পরিষদ প্রধান যাজিকার কক্ষে সভায় বসল, যখন উনি গ্রাই-লায়নের দাবী পড়ে শোনালেন, তখন বাকিরা চুপচাপ শুনলো শুধু, মনে মনে চিন্তা করছে ব্যাপারটা নিয়ে। এই পরিষদের সদস্য হলেন সর্বোচ্চ যাজিকা আর দুজন উপদেষ্টা–এরা দুজনেই বয়স্ক যাজিকা যারা প্রধান যাজিকার সরাসরি উত্তরসূরি হবেন।

"কীভাবে আমরা আমাদের একজন বোনকে গ্রাই-লায়নের দুনিয়াবি লালসা পূরণের জন্য পাঠাতে পারি? সবাই কী বলবে তখন?" যাজিকা আলমা জিজ্ঞেস করলেন। আকারে উনি বেশ ছোটখাট আর সারা চেহারায় এত ভাঁজ পড়া যে কৌতূহলী বানরের মত লাগে দেখতে। "বাচ্চাটা কি এমন অপরাধ করেছে? যদি যে কোনো ভুল করেও থাকে তাহলে সেটার বিচার আর শাস্তি প্রদান আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে, সেটা যদি হয় রাজাকে আস্পর্ধা করে, তবুও।"

"আমাদের পক্ষে কি এত বড় আস্পর্ধা দেখানো আসলেই সম্ভব?" বললেন যাজিকা হাকা; এর গায়ের রঙ গাঢ় আর গায়ে বসন্তের দাগ, মাথায় লম্বা কালো চুল, এক দুইটা চুলে পাক ধরেছে অবশ্য, চেহারা চোয়াল বেশ কঠিন আর গলার স্বর ছেলেদের মত গম্ভীর। এনার বয়স এখনও চল্লিশ হয়নি, সর্বোচ্চ যাজিকার চাইতে যে বেশিদিন বাঁচবেন সেটা নিশ্চিত। কয়েকদিন আগ পর্যন্তও সবাই নিশ্চিত ছিল যে উনি অবশ্যই ভগিনী সংঘের প্রধান হয়েই ছাড়বেন–পদটার জন্য উনি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে আছেন। কিন্তু যখন থেকে ওপেটে একজন দৈবদ্রষ্টার উদয় হয়েছে, তখন থেকে সেই সম্ভাবনা কিছুটা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে অবশ্য। ইতিহাস বলে যে সকল দৈবদ্রষ্টাই একসময় না একসময় সর্বচ্চ যাজিকা হয়, অন্য সবার যতই সম্ভাবনা থাকুক না কেন। তার উপর, এই মেয়েটার প্রতি আবার সর্বোচ্চ পুরোহিতের অসংশয়িত সমর্থন আছে, ধর্মীয় পরিষদের প্রধানের শূন্য পদ পূরণের জন্য এটাকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। তানিথ, হাকার এক শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরেও, যাজিকা হাকার মনের ভেতর আরও অন্তরঙ্গ একটা দুরভিসন্ধি কাজ করছে।

এখন-ও যখন মনে পড়ল যে কীভাবে তানিথের জন্য তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে গিয়েছে, সাথে সাথে গালে রাগের আভাস দেখা দিল। যদিও মেয়েটার প্রতি চরম আকর্ষণ অনুভব করেন উনি। তানিথের স্বপ্ন দেখে

ঘুম ভেঙ্গে যায় রাতে, মাঝে মাঝে যখন অন্ধকারে কোনো কচি নবিসের সাথে সময় কাটান, তখন মনে মনে কল্পনা করেন যে ও হচ্ছে তানিথ।

"রাজার চাহিদাকে উপেক্ষা করার মত শক্তি সামর্থ্য কি আমাদের আছে?" প্রশ্নটা নিয়ে বাকিদেরকে ভাবতে দিয়ে তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন উনি। সবাই জানে যে ওপেটে কি রকম একটা উদ্দাম আর অবাধ্য শক্তির শাসন চলে, এটাও খুব ভালো করেই জানা যে, সে সম্ভ্রান্ত বা যাজক, বন্ধু বা শত্রু, যে-ই হোক, কখনোই রাজার চাহিদা পূরণের পথের কাঁটা হয়ে টিকতে পারবে না।

কেউ কোনো কথা বললেন না, যাজিকা আলমা পেট চেপে ধরে খক খক করে ভয়ানক শব্দে কাশতে আরম্ভ করলেন হঠাৎ, কাশির দমক বাড়তে বাড়তে একসময় রক্তে ভরা এক দলা শ্লেষ্মা উগরে দিয়ে তবেই থামলেন। একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিলেন উনি, চেহারা কুচকে গিয়েছে কষ্টে আর চোখজোড়া নিস্প্রভ আর ক্লান্ত দেখাতে লাগল।

"আর বেশি দিন বাকি নেই তোমার, বুড়ি," মনে মনে ভাবলেন যাজিকা হাকা। তবে মনের ভেতরের অট্টহাসিকে চেহারার উদ্বিগ্নতা দিয়ে ঢেকে রাখলেন নিখুঁতভাবে।

আবার চুপ হয়ে গেলেন তারা, তারপর প্রধান যাজিকা মিনমিনে গলায় কথা বলে উঠলেন। "যদি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে মেয়েটা কোনো অপরাধ করেছে, কোনো পাপে জড়িয়েছে, তাহলে না একটা ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।"

যাজিকা হাকার আর বেশি কিছুর দরকার ছিল না, ঝটপট উনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলেন। "মেয়েটাকে ডেকে আনান," পরামর্শ দিলেন উনি। "আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখি।"

আইনা তানিথকে ধরে কক্ষে প্রবেশ করতে সাহায্য করল, দুজনেই লেংচে লেংচে হাঁটছে আর কুঁজো হয়ে আছে, একজন বয়সের কারণে আরেকজনের কারণ ব্যথা। দুজন দুজনকে ধরে হাঁটছে, বুড়ি যাজিকা বিড়বিড় করে সাহস যোগাচ্ছে আহত মেয়েটাকে, কিন্তু পরিষদের সামনে আসতেই তার চেহারা রাগে বিকৃত হয়ে গেল, খনখনে গলায় চিৎকার করে উঠলো সে।

"বেচারি আহত। আপনাদের কি কোনো মায়া-দয়া নেই? ওকে এভাবে ডেকে পাঠালেন কেন?"

"চুপ, বুড়ি ডাইনী," যাজিকা হাকার কণ্ঠে কোনো আবেগ নেই। সে তাকিয়ে আছে তানিথের দিকে। তানিথের চেহারা ফুলে আছে, বেগুনি হয়ে ফুটে আছে ক্ষতচিহ্নগুলো। একটা চোখ বন্ধ, পাতাটা ফুলে নীল হয়ে আছে সেটার, কেটে গিয়ে দগদগে হয়ে আছে ঠোঁট।

"বসতে দেন ওকে," দাবী করল আইনা। "ও খুব দুর্বল, অসুস্থ।"

"পরিষদের সামনে কারো বসার অনুমতি নেই," বললেন যাজিকা হাকা।

"দেবীর দোহাই।"

"এখানে এসে ধর্মদ্রোহিতা করতে যাস না, বুড়ি কাক।"

"আমি কোনো ধর্মদ্রোহিতা করছি না, সাধারণ দয়ার কথা বলছি।"

"বেশি কথা বলিস তুই," যাজিকা হাকা সতর্ক করল ওকে। "ভাগ! মেয়েটা একা থাক এখানে।"

দেখে মনে হলো আইনা তবুও তর্ক করেই যাবে, কিন্তু যাজিকা হাকা উঠে দাঁড়ালেন, চেহারা অগ্নিশর্মা হয়ে আছে আর গলার স্বর রাগের চোটে কর্কশ হয়ে গিয়েছে আরও।

"ভাগ বলছি!" আবার বললেন উনি। আইনা রাগে গরগর আর বিড়বিড় করতে করতে এলোমেলো পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, তানিথ পরিষদের সামনে দুর্বলভাবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। যাজিকা হাকা আবার নিজের আসনে বসে তানিথের দিকে তাকালেন। এবার উনি সময় নিয়ে কাজ করবেন, যদি লাগে তো সারা দিনই পড়ে আছে, তাছাড়া ওনার বেশ মজা লাগছে নিজের কাছে।

তানিথ শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো, কারণ ব্যথার দমকে আর প্লাবনে একটু পর পর ওর চেতনা যাচ্ছে আর আসছে। ওর পা আর তলপেটের সীসার মত ভারি ভাবটাই সোজা করে রেখেছে ওকে, কিন্তু ওনাদের প্রশ্নবাণের খুব কমই বোধগম্য হলো ওর কাছে। যাজিকা হাকা ওকে এক এক করে প্রশ্ন করে এটা প্রমাণ করতে চাচ্ছিলেন যে ও যা বলেছে তাতেই রাজা ক্ষেপে গিয়েছেন। উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার চেষ্টা করছিলেন যে কীভাবে তানিথ ওনাকে রাগিয়ে দিয়ে এখন পুরো ভগিনী সংঘকেই বিপদে ফেলে দিয়েছে। বারবার ঘুরে ফিরে একটা প্রশ্নই করতে লাগলেন উনি, "ওনাকে কী বলেছিলে তুমি?"

"আমার মনে নেই। মনে করতে পারছি না," অস্ফুটে বলল তানিথ।

"তুমি আমাদেরকে এটা বিশ্বাস করতে বলো যে, এমন ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনল যে কথাগুলো তা তুমি এত সহজেই ভুলে গিয়েছো। আরে বলো, মা, কী বলেছিলে?"

"ওগুলো আমার কথা ছিল না।"

"কার ছিল?" যাজিকা হাকা মনোযোগ দেওয়ার ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে এলেন, ওনার পুরো চেহারা বসন্তের গুঁটির বাদামি ফুটকিতে ভরা আর কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল হয়ে আছে ধূসর চুল। "তোমার কথা যদি না হয়, তাহলে ওগুলো কার কথা? দেবীর?"

"জানি না," বলে শ্বাস নিল তানিথ, তারপর দম আটকে ফেলল, কারণ মনে হলো প্রচণ্ড ব্যথার একটা দমক ওর তলপেটের ভেতর কিছু একটা সেঁধিয়ে দিয়েছে।

“তুমি কি দেবীর কণ্ঠে কথা বলেছিলে?” যাজিকা হাকা তার কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইলেন, শিকারি পাখির মত খনখনে আর নিষ্ঠুর সেই স্বর। যেন বাজপাখি ছো মারছে একটা চড়ুইকে।

“ওহ দয়া করেন!” অস্ফুটে বলল তানিথ, ধীরে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল, দুই হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে আছে। “দয়া করেন, খুব কষ্ট হচ্ছে। ওহ খুব ব্যথা হচ্ছে!”

যে তিনজন যাজিকা ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন তারা সবাই দেখতে পেলেন যে তানিথের পরনের ঘাগরাটা ছিটকে আসা তরলের প্রবাহে ভেসে গেল, তারপর গাঢ় লাল রঙে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে লাগল ওর পায়ের ফাঁকের টালি পাথরগুলোর উপরে। ধীরে ধীরে ভাজ হয়ে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তানিথ, কাত হয়ে হাঁটু বুকের কাছে এনে শুয়ে রইলো আর গোঙাতে লাগল নরম স্বরে।

যাজিকা হাকা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওর উপর ঝুঁকে বসলেন, তারপর তানিথের ঘাগরা উপরে তুলে উগ্র সমকামী আগ্রহে উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে দুই হাঁটু ধরে ঝট করে সরিয়ে দিলেন দুই দিকে।

হাকা আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তখন তার মুখে হাসি, উল্লসিত ভঙ্গিতে তাকালে বাকি দুজনের দিকে। “এই নিন আপনার পাপ, মাননীয়া। এই হলো আপনার অপরাধের প্রমাণ।” পায়ের কাছে জবুথবু হয়ে থাকা দেহটাকে দেখালেন উনি। “অশুচিকরণ!” তীক্ষ্ণ গলায় রায় দিলেন উনি। “অশুচিকরণ! সরাসরি দেবীর বিরদ্ধাচরণ।”



“আমি কিছুই বলবো না,” ভদ্রভাবেই বলল তানিথ। চেহারার কালসিটে দাগ মলিন হয়ে এসেছে আর ফোলাও কমেছে কিছুটা, তবে এখনও এক চোখের নিচে গাঢ় রঙের কালির প্রলেপ আর ওর ঠোঁট বিক্ষত আর দগদগে হয়ে আছে। প্রায় দশ দিন হচ্ছে বিছানাতেই পড়ে আছে ও, এখনো বেশ দুর্বল। “আমার এত প্রিয় একটা জিনিসকে মুখের কথায় কলংকিত করবো না আমি। আমি তার নাম বলবো না।”

“মা, তুমি নিশ্চয়ই জানো যে এটা একটা মহাপাপ। তোমার জীবন নির্ভর করছে এর উপর।” সর্বোচ্চ যাজিকা বললেন।

“আপনারা আমার ভেতর থেকে জীবনটা নিয়েই নিয়েছেন। আর কি বাকি আছে। বাকিটুকুও নিয়ে নিন।” তানিথ সরাসরি যাজিকা হাকার দিকে

তাকালো, সেখান থেকে লানন হাইকানাসের দিকে–যিনি দাঁড়িয়ে আছেন কক্ষের গরাদহীন জানালার কাছে। "আপনার ইচ্ছাই হচ্ছে আমাকে খুন করা। আমি যা-ই বলি না কেন তাতে কোনো হেরফের হবে না। কোনো সমস্যা নেই, আমি আমার বাচ্চার বাবার নাম আমার সাথেই নিয়ে যাবো। এটাকে ওনার বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ আমি আপনাকে দিচ্ছি না।"

"তুমি বেকুবের মত খামাখা জেদ করছো," যাজিকা হাকা বললেন। "আমরা একসময় না একসময় খুঁজে বের করবোই।"

"সেটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?" জিজ্ঞেস করল তানিথ। "এখানে একমাত্র জরুরি বিষয় হচ্ছে, আপনার আর আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাঝে বাঁধা হয়ে আছি একমাত্র আমি।" তানিথ সরাসরি যাজিকা হাকার দিকে চাইলো, যাজিকার দাগে ভরা গালে গোলাপি আভা জমতে দেখেই বুঝলো যে কথাটা জায়গামতোই লেগেছে। তানিথ হেসে লাননের দিকে ফিরলো। "আর আপনার কাছে জরুরি হচ্ছে আমি যে ভবিষৎবাণীটা করেছি সেটাকে ধ্বংস করে দেওয়া। আপনি চাচ্ছেন দেবতারা যাতে আপনার উপর থেকে তাদের রায় তুলে নেন। কোনো লাভ নেই, লানন হাইকানাস। নিয়তির কল নড়তে শুরু করেছে, শিকারে বেরিয়ে পড়েছে ভাগ্যের কুকুরদল।"

"যথেষ্ট হয়েছে," ক্ষেপে গেলেন লানন, লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসলেন কক্ষের মাঝে। "নষ্ট করার মত সময় নেই আমার হাতে। আর এসব বিরক্তিকর কথা শোনার ধৈর্যও নেই।" বলে উনি যাজিকা হাকার দিকে তাকালেন। "বুড়ি যাজিকাটাকে নিয়ে আসেন, এই ডাইনীর সাথী।"

আইনা এসে রাজার সামনে চোখ পিটপিট করতে করতে হতবুদ্ধি অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলো, রাজা-ও রাগ বা কোনো আবেগ ছাড়াই তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। "আপনার দায়িত্ব আছে অনেক। সেসব ভুলে যাবেন না। সেই ষাঁড়ের নাম বলেন যে দেবীর বকনা বাছুরের উপর সওয়ার হয়েছিল?"

চিৎকার করে অভিযোগ অস্বীকার করল আইনা, বারবার অনুনয় করে নিজের অজ্ঞতার কথা জানাতে লাগল। বহু কষ্টে হাঁটু ভেঙে লাননের সামনে বসল ও, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওনার জামার পাড় চুম্বন করতে লাগল, আতঙ্কে কশ বেয়ে লালা পড়া শুরু হয়েছে। লানন বিরক্ত হয়ে এক পা দিয়ে লাথি দিয়ে থেকে ফেলে দিলেন ওকে তারপর তাকালেন যাজিকা হাকার দিকে।

"আপনার সম্পর্কে যদি ভুল অনুমান করে না থাকি, তাহলে আপনাকে দিয়ে ছেলেদের কাজও সম্ভব। আপনার কি সেই সাহস আছে?" জিজ্ঞেস করলেন উনি, যাজিকা হাকা মাথা ঝাঁকালেন, ঠোঁট চাটছেন, নিষ্ঠুর আগ্রহে জ্বলে উঠেছে চোখ।

"প্রথমে এর দুই হাত ভেঙে দিন," আদেশ করলেন লানন। "ডাইনীটার সামনেই করেন, যাতে ও স্পষ্ট দেখতে পায়।"

যাজিকা হাকা আইনাকে নিজের পায়ের কাছে টেনে আনলেন, নিজের রেশমী কালো চুল গজানো শক্তিশালী বাদামি হাত দিয়ে অনায়াসে চেপে ধরে আছেন। আতংকে মোচড়াতে আর কোঁ কোঁ করতে লাগল আইনা, যাজিকা হাকা ঘুরে সামনে এসে মাটিতে চেপে ধরলেন ওকে, তারপর কনুই বরাবর একটা হাত বাঁকিয়ে পেছনের দিকে নিয়ে আসতে শুরু করলেন। চিকন হাতটার সাদা চামড়ার মাঝে নীল শিরা ফুটে আছে।

"থামেন!" চেঁচিয়ে উঠলো তানিথ। "ছেড়ে দিন ওকে!"

"ছেড়ে দাও," আদেশ করলেন লানন।

তানিথ বুড়ি যাজিকার কাছে ছুটে গিয়ে তার কপাল আর গালে আলতো করে চুমু খেলো। আইনা ফোঁপাচ্ছে।

"আমাকে মাফ করে দাও, মা। আমি খুব দুঃখিত। আমি ওদেরকে বলেই দিতাম। মাফ করে দাও।"

"আস্তে বুড়ি মা, আস্তে।" তানিথ তাকে ধরে দরজার দিকে নিয়ে গিয়ে সস্নেহে কক্ষ থেকে বাইরে বের করে দিল। তারপর আবার ফিরে গেল রাজার কাছে।

"আমি আপনাকে তার নাম বলবো–তবে শুধু আপনাকে।"

"বের হও সবাই," আদেশ দিলেন লানন, ধর্মীয় পরিষদ উঠে দাঁড়িয়ে সার বেঁধে বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর হুইয়ের নাম বলল তানিথ, গর্বের সাথে বেপরোয়া ভঙ্গিতে, লানন এমনভাবে চমকে উঠলেন যেন ওনাকে শারীরিকভাবে আঘাত করা হয়েছে।

"তোমাদের সম্পর্ক কতদিনের?" অবশেষে জিজ্ঞেস করলেন উনি।

"পাঁচ বছরের," জবাব দিল ও।

"আচ্ছা," বললেন উনি, অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন এতে। "দেখা যাচ্ছে তার ভালোবাসা দুজনে ভাগ করে নিতাম আমরা।"

"আরে নাহ, জাঁহাপনা," মাথা নাড়লো তানিথ। "পুরোটাই ছিল আমার একার।"

"ব্যাপারটা যে অতীত হয়ে যাবে, সেভাবে কথা বলে বেশ জ্ঞানের পরিচয় দিলে," তানিথকে বললেন লানন। তারপর ঘুরে জানালার ধারে গিয়ে তাকিয়ে রইলেন হ্রদের দিকে। আমার আর হুইয়ের মাঝে কিছুই আসতে পারবে না, ভাবলেন উনি, আমার ওকে দরকার। ওকে-ই দরকার।

"কী করবেন এখন, জাঁহাপনা? বিষ? নাকি গুপ্তহত্যা? কীভাবে অ্যাসটার্টের যাজিকাকে খুন করবেন? ভুলে গিয়েছেন নাকি যে আমি দেবীর অধীনে?"

"না," বললেন লানন। "ভুলিনি আমি, আমি তোমাকে ওনার কাছেই পাঠিয়ে দেব, ফলবতী বসুন্ধরা উৎসবের দশম দিনে। ওপেটের দূত হিসেবে দেবতাদের কাছে যাবে তুমি।"

"হুই এটা করতে দেবেন না," আতংকে গলা শুকিয়ে গিয়েছে তানিথের।

"হুই এখন উত্তরে–অ্যাসটার্টের দীঘি থেকে অনেক দূরে এখন।"

"উনি আপনাকে এর জন্য আজীবন ঘেন্না করবেন। তাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবেন আপনি," তানিথ সতর্ক করল তাকে, কিন্তু লানন মাথা নাড়লেন।

"সে জীবনেও জানবে না যে আমিই দিয়েছি এই আদেশ। সে কখনোই জানবে না যে তুমি তার সাথে বেঈমানি করে আমাকে তার নাম বলে দিয়েছো।" তারপর হাসলেন উনি, একটা শীতল কিন্তু ঝকঝকে হাসি। "নাহ, তুমিই তাকে হারাবে, আমি আবার ফিরে পাবো। দেখো, আমার দরকার তাকে, আমার চাহিদা তোমার চাহিদার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।"



প্রথমে ওনাকে মাটির ওপরেই ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো–অজ্ঞান অবস্থাতেও, আবার জ্ঞান ফিরলেও যখন হাঁটার জন্য খুবই দুর্বল ছিলেন তখনও, তাই উনি ঠিক জানেন না যে কতক্ষণের জন্য আর কোনদিকে যাচ্ছেন ওনারা।

এমনকি পরে যখন ওনাকে জোর করে হাঁটানো হতে লাগল, তখন হাত বেঁধে, চোখে পট্টি মেরে দিল ওরা। ফলে হুই টের পেলেন শুধুমাত্র ওনার চারপাশের আদিবাসীদের দেহের ধাক্কা আর যে পচা চর্বি দিয়ে ওরা চামড়া মালিশ করে সেটার সাথে ঘামের মিশ্রিত গন্ধ। উনি কোনো কথা বললে জবাব দিল না কেউ, কঠিন হাত ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিতে লাগল শুধু, থেমে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেই বর্শার ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে আবার হাঁটানো হতে লাগল।

ভয়ানকভাবে পেটানো হয়েছে ওনাকে, সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে, খুলিতে দগদগে ঘা আর আলু গজিয়ে আছে এখনও, তবে সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন আর গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়ে থাকলেও কোনো মারাত্মক জখম হয়নি, গভীর কোনো ক্ষত বা হাড় ভাঙেনি। ব্যাপারটা এমন যেন ওনাকে মেরে ফেলতে পারে বা অঙ্গহানিকর জখম হতে পারে এমন আঘাত ওরা খুব সতর্কতার সাথে এড়িয়ে গিয়েছে, অথচ উনি ওদের সহযোদ্ধাদের লাশ ফেলে সারি বেঁধে স্তূপ করেছিলেন নিজের চারপাশে, ওনাকে পরাভূত করার আগে শকুন কুঠারটা ভালোই বখরা আদায় করেছে।

প্রথম রাতে যখন তাঁবু ফেলা হলো, তখন হুই পালানোর চিন্তা মাথায় রেখে সম্ভাব্য কোথায় আছেন সেটা বের করার চেষ্টা চালান, কিন্তু চারপাশে দেখার জন্য চোখের পট্টিটা সরানোর চেষ্টা করতেই প্রকাণ্ড একটা চড় নিবৃত্ত

করে দিল তাকে। ওনাকে এক হাতা সিদ্ধ শস্য আর খুব বাজে স্বাদের এক ফালি মাংস খাইয়ে দিল ওরা, মাংসটা কটূ গন্ধযুক্ত আর পোকায় ভরা। হুই সেটাকেই ক্ষুধার্ত মুখে খেয়ে নিলেন।

পরদিন ভোরের আগেই রওনা দিলেন ওনারা। খানিক বাদে হুই নিজের গালে রোদের তেজ অনুভব করতে পারলেন, চোখের পট্টির ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করল, উনি নীরবে বাআলের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সেরে নিয়ে, দেবতাকে বললেন ওনাকে সাহায্য করতে।

দিনের শেষ দিকে উনি টের পেলেন যে পায়ের নিচের মাটি সমান হয়ে এসেছে–যেন ওনারা একটা খোলা প্রান্তর দিয়ে ভ্রমণ করছেন। গোবর, ধোঁয়া আর মানুষের গন্ধ আসতে লাগল নাকে। আটককারিদের নগ্ন পায়ের দমাদম ছন্দ আর তাদের যুদ্ধের পোশাকের খসখসানির মাঝেও, হুই বিপুল মানুষের নড়া-চড়া আর কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলেন। এর সাথেই শোনা যেতে লাগল প্রচুর গবাদি পশুর হাম্বা রব, শব্দ আর নড়া-চড়ায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বাতাস, একটা চাপা গুঞ্জরণ বিপুল জনগণের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিল ওনাকে।

অবশেষে ওরা থামলো। গরম রোদের মাঝে দুশ্চিন্তা আর তৃষ্ণা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হুই, কাঁচা চামড়ার রশি কেটে বসছে ওনার কবজিতে আর ক্ষত আর আচড়গুলো ব্যথা করতে শুরু করেছে। নীরবে ধীরে ধীরে পেরিয়ে যেতে লাগল অপেক্ষার সময়।

অবশেষে চিৎকার করে ডেকে উঠলো কেউ, হুই চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন প্রায়। ভেন্ডি ভাষায় কণ্ঠটা জিজ্ঞেস করল, "সিংহের থাবাযুক্তকে কে খোঁজে? পাখির পাওয়ালাকে কে খোঁজে?"

হুই চুপ করে রইলেন, কীভাবে কি করবেন সে ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু ওনাকে অবাক করে দিয়ে একটা শীতল লোহার ফলা কেটে দিল হাতের বাঁধনগুলো। আঙুলগুলো চটকাতে লাগলেন উনি, রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক হতেই ঝি ঝি করে উঠলো সেগুলো। তারপর হাত তুললেন চোখের পট্টি খোলার জন্য, আঘাত খাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত, কিন্তু কেউ কিছু করল না আর উনি কাপড়টা খুলে উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

ওনার চোখে আলো সয়ে এল দ্রুত, সামনে যা দেখলেন তাতে মনে হলো যে হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এসেছে। হুই দাঁড়িয়ে আছেন একটা চওড়া তৃণভূমির ঠিক মাঝে, একটা সামান্য অবতল গামলার মত জমিন, যার কিনার বরাবর আছে নিচু পাহাড়।

হুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই একশো পেস মত চওড়া এক চিলতে গোল খোলা জায়গা বাদে, পুরো জমিন কালো হয়ে আছে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে

থাকা যোদ্ধা দিয়ে। হুই সম্ভ্রমের চোখে এই বিশাল জনসমাবেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন, সংখ্যায় কত হতে পারে উনি সেটা মাথায়ও আনতে পারলেন না। বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে এত মানুষকে জমিন ধারণ করতে পারছে, পুরো ব্যাপারটাই অবাস্তব, সম্পূর্ণ দুঃস্বপ্নের মত–আর অবাস্তবতার পরিমাণ আসমানে উঠে যাচ্ছে এই কালো বিশাল দলটার ভীতিকর স্থবিরতা দেখে। নিথর দাঁড়িয়ে আছে সব–শুধু তাদের শিরস্ত্রাণের পালকগুলো দুপুরের উষ্ণ বাতাসের ধীর প্রবাহে কাঁপছে।

উত্তাপ আর এত বিপুল মানুষের উপস্থিতিতে ওনার মনে হলো দম আটকে মরেই যাবেন, চারপাশে মরিয়া হয়ে তাকাতে লাগলেন পালানোর কোনো রাস্তা পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখতে। স্টর্চ দাঁড়িয়ে আছে পাশেই, শকুন কুঠারটা ওর কাঁধে ঝোলানো। লোকটার বেঈমানিতে হুই নিজের ভেতর খুব দুর্বল রাগের আভাস টের পেলেন, কিন্তু কেন যেন এই তাজা অভিজ্ঞতার বিরাটত্বের কাছে সেটাকে নিতান্তই তুচ্ছ মনে হলো।

স্টর্চ অবশ্য ওনার দিকে তাকাচ্ছে না, ওর দৃষ্টি একদল ভেন্ডি সমরাধিনায়কদের দলের দিকে, যারা ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে একটা ছোট মাটির ঢিবি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢিবিটা খালি, কিন্তু বাকিদের সবার মনোযোগ ওদিকে আকর্ষিত, ঠিক যেন অতিথি আগমনের পূর্বের খালি মঞ্চের মত।

আবার কণ্ঠটা ডাক দিল। "কে মহান কালো জানোয়ারকে খুঁজছে, যে সিংহকে শিকার করে?"

জবাবে উত্তপ্ত নীরবতা আর নিস্তব্ধতাই বজায় রইলো, কিন্তু আচমকা পুরো জনতা নড়েচড়ে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা, কারণ একজন লোক উঠে দাঁড়িয়েছে ঢিবিতে।

মাথার হেরন পালকের লম্বা মুকুট আর যে ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটার উচ্চতা লোকটাকে একেবারে দেবতাদের রূপ এনে দিয়েছে। চিতাবাঘের চামড়ার তৈরি আলখাল্লাটা তাকে ছাড়িয়ে মাটিতে গিয়ে পড়েছে, কোনো বিবর্ণ ঘাসের তৃণভূমির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লম্বা গাছের মতই স্থির দাঁড়িয়ে রইলো সে আর তাকে দেওয়া রাজকীয় সালাম আকাশ আর জমিনের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল।

স্টর্চ শকুন কুঠারটা ঢিবির কাছে নিয়ে গিয়ে রাজার পায়ের কাছে সাবধানে নামিয়ে রেখে পিছিয়ে এসে দাঁড়ালো, রাজা ফাঁকা প্রান্তরটা ছাড়িয়ে হুইয়ের দিকে চাইলেন।

হুই উঠে দাঁড়ালেন, চেষ্টা করছেন গায়ের ব্যথাটাকে উপেক্ষা করতে, ঢিবিটার দিকে এগোনোর সময় প্রাণপণ চেষ্টা করলেন না লেংচানোর জন্য, তারপর মানাতাসসির দিকে চাইলেন।

"আমার বোঝা উচিত ছিল," পিউনিকে বললেন উনি।

"আপনার উচিত ছিল আমাকে মেরে ফেলা," বলল মানাতাসসি, তারপর আলখাল্লার ভাজের ভেতর থেকে লোহার থাবাটা বের করে আনল। "বদলে আমি এখন আরও শক্তিশালী হয়েছি।"

"ব্যাপারটা বুঝবে না তুমি," হুই বললেন। "তোমার জীবন নেওয়ার অধিকার আর আমার ছিল না। আমি একটা শপথ করেছিলাম।"

"একজন মানুষ পাওয়া গেল যে জীবন দিয়ে হলেও নিজের কথা রাখে," বলল মানাতাসসি, ওর কণ্ঠে উপহাসের ছোঁয়া খোঁজার বৃথা চেষ্টা করলেন হুই।

"বেঁচে থাকার এটাই একমাত্র উপায়।" হুইয়ের খুব অবসন্ন লাগতে লাগল; হাল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করবেন বলে ঠিক করলেন উনি। আসলেই এখন এসব নিয়ে তর্ক করার জোর নেই।

মানাতাসসি থাবাটা দিয়ে একটা ইশারা করল, জড়ো হয়ে থাকা ওর বিশাল বাহিনীকে ইঙ্গিত করছে।

"দেখেছেন কেমন একটা বাহিনী বানিয়েছি আমি?"

"হ্যাঁ," মাথা ঝাঁকালেন হুই।

"আমার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারবে?" জিজ্ঞেস করল মানাতাসসি।

"অনেকেই চেষ্টা করবে," বললেন হুই।

"আপনিও আছেন তাদের মাঝে?"

হুই হাসলেন। "আমার মনে হয় না যে আমি সেই সুযোগ পাবো।"

ছেড়া কাপড় পরে থাকা কুঁজো বামনটার দিকে তাকালো মানাতাসসি, তার দাড়ি ধুলোয় ধূসরিত, চেহারা আর বাহুতে ক্ষত, সারা গায়ে ধুলা আর মারের চিহ্ন, কিন্তু নিজের ভাগ্য আলোচনা করতে গিয়ে একটুও বিচলিত হচ্ছেন না।

"এখানকার কেউ আমাদের কথা বুঝছে না," মানাতাসসি বলল হুইকে। "নির্ভয়ে কথা বলতে পারেন।"

হুই মাথা ঝাঁকালেন, বিভ্রান্ত, তবে হাওয়া বদল হওয়ায় বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন।

"আমি আপনাকে বাঁচতে দেব, হুই বেন-আমন। আমার দলে যোগ দিন, ওপেটের গ্রাই-লায়নকে যে ভালোবাসা আর কর্ম দিয়েছেন সেটা আমাকেও দিন, তাহলে বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাঁচতে পারবেন।"

"আমাকে বেছে নেওয়ার কারণ?" জিজ্ঞেস করলেন হুই।

"আমি অপেক্ষা করে ছিলাম আপনার জন্য। আমি জানতাম যে আপনি আসবেন। আমার গুপ্তচররা আপনার জন্য নজর রাখতো, কিন্তু এটা ভাগ্যই বলতে হবে যে এত সহজে আপনি আমার হাতে এসে পড়লেন।"

"আমি কেন?" আবার জিজ্ঞেস করলেন উনি।

"আমার আপনাকে দরকার," মানাতাসসি সহজভাবে বলে দিল। "আমার আপনার জ্ঞান দরকার, আপনার বুঝশক্তি আর আপনার মানবতার দরকার।"

"হাত কাটার ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারবে?" জিজ্ঞেস করলেন হুই।

"আমার জীবনটাই নিয়ে নিতে পারতেন," জবাব দিল মানাতাসসি।

"হুলয়ার চাবুকের আঘাত আর খনির কষ্টের কথা মাফ করে দেবে?"

"সেসব আমি কখনো ক্ষমা করবো না," দাঁত খিচিয়ে বলল মানাতাসসি, চেহারা কুঁচকে গেল ওর আর চোখ ধোয়াটে হলুদ হয়ে জ্বলতে লাগল। "তবে আপনি তো আর সেসবের কিছু করেননি।"

"সেট-এর গণহত্যা মাফ করে দেবে তুমি?" হুই নাছোড়বান্দার মত বলেই চললেন।

"আপনি একজন সৈনিক, এর বাইরে আপনার কী-ইবা করার ছিল।"

মানাতাসসি এখনও কাঁপছে, হুই জানেন যে মৃত্যু থেকে হয়তো এক চুল দূরে দাঁড়িয়ে আছেন উনি, কিন্তু এই লোকটার শক্তিমত্তা যাচাই করার লোভ সামলাতে পারলেন না–সেই সাথে দুর্বলতাও।

"আমাকে কী করতে হবে তাহলে?" জিজ্ঞেস করলেন হুই।

"আমার সাথে যুদ্ধে যাবেন," বলল মানাতাসসি।

"কার বিরুদ্ধে?"

"ওপেট আর তার দানবীয় নিষ্ঠুরতা এবং ভয়ানক দেবতাদের বিরুদ্ধে," মানাতাসসি প্ররোচিত করার চেষ্টা করল ওনাকে। "আপনি পাশে থাকলে, এই বাহিনী সাথে নিয়ে আমি পুরো দুনিয়া জয় করতে পারবো।"

"সেটা করতে পারবো না আমি," মাথা নাড়লেন হুই।

"কেন না? বলেন কেন। আস্ত শয়তান এরা, এদেরকে ধ্বংস করতেই হবে।"

"কারণ ওটা আমার," বললেন হুই। "আমার দেশ, আমার জনগন, আমার দেবতা–তাই তারা আমার কাছে অশুভ হতে পারে না।"

"আমি ভাবতাম আপনি যুক্তিবাদী লোক," মানাতাসসি নাক সিটকালো।

"যুক্তি মানুষকে কিছুদূর পর্যন্ত টেনে নিতে পারে, তারপর তাকে নিজের হৃদয়কেই অনুসরণ করতে হয়," বললেন হুই।

"আপনি তাহলে আমার প্রস্তাবে না করছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি জানেন যে এর মাধ্যমে আপনি মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

মানাতাসসি নিজের হাত তুললো, লোহার থাবা রোদের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে, হুই জানেন যে হাতটা নেমে আসলেই মারা যাবেন উনি। পুরো ব্যাপারটা যেভাবে সামলেছেন সেভাবে শান্তভাবেই নিজেকে শক্ত করলেন মৃত্যুকে বরণ করতে।

কিন্তু মানাতাসসি মুখ ঘুরিয়ে ফেলল। তারপর এক মুহূর্ত থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, পুরু ক্ষতচিহ্নের নিচে ফুলে উঠলো ওর ঘাড়।

"আপনি আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন," বলল মানাতাসসি। "আমিও ছেড়ে দেব আপনাকে।"

হুই স্বস্তির সাথে দুর্বলও বোধ করতে লাগলেন। মরতে চাননি উনি, অবশেষে তানিথ আর বাচ্চাটা সম্পর্কে নিজেকে ভাবতে দিলেন। নিজের সন্তানের মুখ দেখতে পারবেন কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

"ওপেটে ফিরে যান। আপনার রাজার কাছে ফিরে যান। ওনাকে বলবেন যে মানাতাসসি, বিশাল কালো জানোয়ার, উত্তর থেকে বাহিনী নিয়ে আসছে তাকে ধ্বংস করতে।"

"শত্রুকে সতর্ক করে দেবে?" হুই জিজ্ঞেস করলেন। "তোমাকে এই শিখিয়েছি আমি?"

মানাতাসসি হাসলো। "সতর্কবার্তায় তার খুব বেশি উপকার হবে না। এখানে যা দেখলেন সেটার কথা বলবেন তাকে। এই বাহিনীর কথা বলবেন–তাতেই তার মেরুদণ্ড ঠান্ডা হয়ে যাবে। বলবেন যে আমি আসছি তার জন্য, মানুষ তো দূরে থাক এই জমিনে ওপেটের কোন নিশানাও আস্ত রাখবো না। বলবেন যে আমি আসছি, আসছি খুবই শিগগিরি।"

মানাতাসসি শকুন কুঠারটা তুলে নিয়ে হুইয়ের হাতে ধরিয়ে দিল।

"যান!" বলল ও। "আমাদের মাঝের সব হিসাব চুকে গেল। আমার উপর আর আপনার কোনো পাওনা নেই, আপনার উপরেও আমার নেই কোনো। আবার যখন আমাদের দেখা হবে, আমি খুন করবো আপনাকে।"

দুজন দুজনের দিকে স্থির তাকিয়ে রইলেন ওনারা, এত কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে চাইলেই স্পর্শ করা যায়, কিন্তু দুজনের মাঝে যে দূরত্ব সেটা সমুদ্রের ব্যাপ্তি বা জমিনের বিশালতার চাইতেও বেশি।

হুই ঘুরে দাঁড়িয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে যোদ্ধাদের মাঝ দিয়ে ওনার জন্য তৈরি হওয়া পথটা ধরে এগিয়ে গেলেন, কেউ তাকে বাঁধা দিতে এল না।



"বুড়ি মা, আপনি খামাখা নিজেকে এত কষ্ট দেবেন না," তানিথ ফিসফিস করে বলল। "এসব আপনার দোষে হয়নি।"

"আমি ওদেরকে বলে দিতাম," আইনা হড়বড় করে বলল। "আমি জানি। আমি ওদেরকে বলেই দিতাম। ওই যাজিকা হাকা, ওনাকে খুব ভয় করে আমার।"

"আপনি তো আর বলেননি," তানিথ সান্ত্বনা দিল ওকে। "আপনি আমাদের ব্যাপারটা ভালোই গোপন রেখেছিলেন–এমনকি আমরাও জানতাম না যে আপনি টের পেয়ে গিয়েছেন সব।"

আইনা তানিথের বিছানার পাশে খাবারে বাটিটা নামিয়ে রেখে কী চিন্তা করে হাসতে লাগল। "কতো খুশি ছিলেন আপনারা, আপনারা দুজন। আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেও কি যে ভালো লাগতো আমার। উনি খুবই ভালো মানুষ, শুধু ওনার কুঁজো পিঠটাই একটু কেমন লাগে, তাছাড়া কত অমায়িক আর দয়ালু।"

তানিথ গদির অপর পাড়ে সরে গিয়ে আইনাকে বসার জায়গা করে দিল। "আমার পাশে বসেন একটু, বুড়ি মা, আমার এখানে খুব একা লাগে, তাই অপেক্ষা করতে কষ্ট হয় আরও বেশি।"

আইনা ভীত চোখে গরাদ লাগানো দরজাঅলা সরু কক্ষটায় চোখ বুলালো একবার।

"ওরা চায় না যে আমি খুব বেশিক্ষণ থাকি।"

"একটু," তানিথ অনুনয় করল। "আর তো বেশি সময় নেই।" আইনা মাথা ঝাঁকিয়ে ওর ঘাগরা তুললো বসার জন্য, ওর হাঁটুসন্ধি মটমট করে উঠলো গদির উপরে ওঠার সময়। তানিথ ঝুঁকে এসে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, "আপনি দূত পাঠিয়েছেন, কাউকে পেয়েছেন যাওয়ার মত?"

"বেন-আমনের বাহিনী থেকে দুজন জোয়ান সৈন্যকে পাঠিয়েছি। ওরা মহানুভবকে দেবতা জ্ঞানে মান্য করে। ওদেরকে বলেছি যে আপনার জীবন সংকটাপন্ন, মহানুভবকে জানাতে বলেছি যেন অবশ্যই সর্বোচ্চ দ্রুততার সাথে ফিরে আসেন।"

"ওরা কি ওনাকে খুঁজে পাবে?"

"ওনার যাওয়ার মত একশোটা রাস্তা আছে, দেশটাও তো বিশাল। আমি আপনাকে মিথ্যা প্রবোধ দেব না, মা। সম্ভাবনা আসলে খুব কম।"

"জানি আমি," বলল তানিথ। "আর যদি ওরা ওনাকে খুঁজে পায়ও, উনি কি সময় মত ফিরতে পারবেন? আর যদি ফিরতে পারেনও, উনি কি আদৌ পারবেন গ্রাই-লায়নকে আটকাতে?"

"উনি যদি সময় মত আসতে পারেন, তাহলে আপনার আর কোনো চিন্তা নেই। আমি ওনাকে চিনি।"

"ওনার জন্য অপেক্ষা করবেন, আইনা। আসা মাত্র গোপনে ওনার কাছে গিয়ে জানাবেন যে রাজা আমাদের সম্পর্কে জানেন। অবশ্যই ওনাকে ব্যাপারটা জানাবেন, কারণ উনি নিজেও বিপদে আছেন।"

"আমি বলবো ওনাকে," কথা দিল আইনা।

"ওহ, আমি সব দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করছি উনি যেন নিরাপদে ওপেটে ফিরে আসেন। আমি মরতে চাই না, বুড়ি মা। জীবন থেকে আমার

এখনও পাওয়ার মত অনেক কিছুই আছে, কিন্তু দিন ফুরিয়ে আসছে এখন। আজকে এরমধ্যেই উৎসবের ষষ্ঠ দিন। আর চারদিনের মাঝে যদি হুই না ফেরেন তাহলে আমার আর বেঁচে থাকা হবে না।"

"ধৈর্য ধরেন মা," কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল আইনা, তারপর তানিথের পিঠে একটা হাত রেখে আদর করে দিয়ে জড়িয়ে ধরলো ওকে। "সাহস রাখেন," আর্দ্র কণ্ঠে বলল ও, "সাহস রাখেন মা।"

"কাজটা সহজ না," তানিথ বলল আইনাকে, "কিন্তু আমি চেষ্টা করবো।" তারপর আইনার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সোজা হয়ে বসল। "আপনি যান এখন, বুড়ি মা–নইলে হাকা আবার মারবে আপনাকে।"



বিশাল নদীটার দক্ষিণে, জানাতের দুর্গের দেওয়ালে একজন প্রহরী ডান হাতে হালকাভাবে একটা বর্শা ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, বর্শার মাথাটাও সেদিকেই তাক করা। এক আজব দর্শন বুনো অবয়বের দিকে তাকিয়ে আছে সে। লোকটার চুল নোংরা আর ধুলোয় ভরা, গায়ে কোনো বর্ম নেই, গায়ের জামা ছিড়ে ঝুলছে, চেহারা ক্ষত বিক্ষত আর ফুলে আছে বেঢপভাবে। দেখে মনে হচ্ছে লোকটা আহত, কারণ একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেদনার্তভাবে ভাজ হয়ে আছে সে, কাঁধের বিশাল যুদ্ধ-কুঠারটার ওজনের চাপে পিষ্ট হয়ে আছে যেন।

"নাম কি আপনার? কী চান এখানে?" প্রহরী জানতে চাইলো, পথিক মুখ তুলে চাইলো ওর দিকে।

"আমি বেন-আমন, বাআলের সর্বোচ্চ পুরোহিত আর ওপেটের যোদ্ধা। রাজার প্রয়োজনেই এসেছি আমি।"

প্রহরী কিছু একটা বলতে গিয়েও সাথে সাথে বর্শাটা সরিয়ে ঠেস দিয়ে রাখলো। বুঝতে পেরেছে যে কত বড় বোকামি করতে যাচ্ছিল। ওই কুঁজো পিঠ আর কুঠারটা সারা রাজ্য জুড়েই বিখ্যাত, ওর উচিত ছিল সাথে সাথেই চিনতে পারা, নিজেকে গালাগাল পাড়তে পাড়তে নিচের উঠোনে নেমে এল ও, চিৎকার করে কর্তব্যরত কর্মকর্তাকে ডাকছে, ওদের বিশেষ অতিথির ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছে তাকে।

দরজাটা ফাঁক হওয়ার সাথে সাথে পাশ দিয়ে চট করে ঢুকে পড়লেন হুই, তারপর সামরিক কেতাদুরস্ত সালামের বিপরীতে ধমক মেরে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে এইসব ছাইপাঁশ।"

প্রহরীদের হাবিলদার সেনাদলের এই সমাদৃত আনুষ্ঠানিকতাটাকে এভাবে চাঁছাছোলাভাবে বাতিল করে দেওয়ায় অবাক হলো খুব, বহু কষ্টে মুখের হাসিটাকে নিবৃত করল সে। এরকম চেহারা আর ভিক্ষুকের দশা মিলিয়ে এই কাহিনি ফুলে ফেঁপে এই ছোট্ট মানুষটা সম্পর্কে কিংবদন্তীর পাতায় এর মধ্যেই যত কিছু লেখা হয়েছে তার ওজন আরও বাড়াবে।

ঝটপট সমাবেশিত প্রহরীর দলকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময়, হুই হাবিলদারকে একপাশে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেনাধ্যক্ষ কোথায়? এখনও আছেন এখানে?"

"হ্যাঁ, হুজুর–মহানুভব। উনি নিজের ঘরেই আছেন।"

"বাআলকে ধন্যবাদ!" হুই স্বস্তির সাথে আটকে থাকা শ্বাস ছাড়লেন।

দুটো ভূট্টার পিঠার মাঝে একটা মোটা করে কাটা মাংসের টুকরো বসিয়ে এক কামড়ে মুখে ঢুকিয়ে নিলেন হুই, তারপর এক পেয়ালা লাল ওয়াইন খেয়ে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেন সেটা, খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আর মুখে খাবার-নিয়েও কথা বলতে বলতে একের পর এক নির্দেশ জারি করতে লাগলেন।

মার্মনের লিপিকার ঝড়ের বেগে লিখতে লাগল সব, হুইয়ের কথার সাথে তাল রাখতে হিমিশিম খাচ্ছে সে। মার্মন নিজের আসনে বসে আছেন এক কোণে, রূপালি চুলে ভরা মাথাটা গ্রীষ্মের ঝড়ো মেঘের মত চমকাচ্ছে আর ওনার সুন্দর মুখটা উদ্বিগ্নতা আর দুশ্চিন্তায় ভরে আছে।

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না ওনার, তবে উনি খুব ভালোই জানেন যে হুই বেন-আমনের কথাকে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। ভালোই বুঝতে পারছেন যে আসলে দোষ ওনারই বেশি, কারণ সীমান্তের কাছেই এত কম সময়ে বেড়ে ওঠা এত বড় একটা হুমকিকে ওনারই ধরতে পারা উচিত ছিল। হয়তো পুরনো ইতিহাস নিয়ে কাজের স্বপ্নের পেছনে খুব বেশি সময় দিয়ে ফেলছিলেন, হয়তো এখন বৃদ্ধ আর দুর্বল হয়ে পড়েছেন–কিন্তু টের পাননি সেটা। হুই বেন-আমন আর ওপেটের গ্রাই-লায়নের পক্ষ থেকে কি শাস্তি পাবেন সেটা নিয়েই ভাবছেন এখন। ওনাদের কেউই ব্যর্থতাকে বরদাশত করার মানুষ নন।

হুই নির্দেশ দিতে লাগলেন আর উনি চুপচাপ শুনতে লাগলেন সব, প্রতিটা কেল্লা আর প্রতিটা দলকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটা এলোমেলো বাহিনীকে সচল করা হচ্ছে আবার, দূতরা বার্তাবাহী লিপি নিয়ে পুরো সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়বে আর পুরো সাম্রাজ্যই সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে যাবে এবার। মার্মন হুইয়ের সাহস সম্পর্কে ভেবে অবাক হচ্ছেন, কারণ একেবারে একা একাই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছেন উনি,

সিদ্ধান্তটার জন্য ওনাকে রাজা আর তার পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। পুরো রাজ্যের শ্রম আর বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে যে ক্ষয় ক্ষতি হবে সেটার জন্য তাকেই দোষারোপ করা হবে। এটা এমন একটা সিদ্ধান্ত যার উপর ওনার নিজের জীবন নির্ভর করছে, একই সাথে ওপেটের।

হুইকে নির্দেশগুলোয় স্বাক্ষর করতে দেখে মার্মনের মনে সন্দেহ জাগলো যে ওনার নিজের কৃতকর্মের ব্যাপারে উনি কৈফিয়ত দিতে পারবেন কিনা। উনি জানেন যে পরবর্তী নির্দেশের জন্য ওনাকে ওপেটে পাঠানো হবে, সম্ভবত বাঁচার যে সম্ভাবনাটুকু ছিল সেটাও বিপন্ন হয়ে যাবে তাতে। কারণ, হুই যেটুকু বলেছেন ওনাকে, তাতে এটা স্পষ্ট যে পুরো ব্যাপারটাই এখন ওপেটের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওনারা সংখ্যাগত দিক দিয়ে এত বিশাল একটা শত্রুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন যে সাফল্য পেতে হলে দেবতাদের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই আর।

কাজ শেষ করলেন হুই। শেষ লিপিটায় স্বাক্ষর করার পরেই ওনার উদ্যম স্তিমিত হয়ে এল। ঠিক তখন মার্মন ধরতে পারলেন যে লোকটা আসলে খুবই ক্লান্ত। উনি সামান্য খোড়াচ্ছেন, পুরো শরীর অসুস্থ দেখাচ্ছে আর মনে হলো যে দুশ্চিন্তার চাপে আকারে আরও খানিকটা ছোট হয়ে গিয়েছেন।

মার্মন নিজের আসন থেকে লাফিয়ে নেমে এসে হুইকে ধরতে গেলেন। কিন্তু হুই হাত নেড়ে ওনার হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন।

"আমাকে ওপেট যেতে হবে," বললেন হুই, পাড় মাতালের মত কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার, নিজেকে টেবিলের এক কোণে ঠেস দিয়ে স্থির করার চেষ্টা চালালেন। "আজকে কত তারিখ, মার্মন? আমি দিন তারিখের হিসাব ভুলে গিয়েছি।"

"আজকে উৎসবের সপ্তম দিন, মাননীয়।"

"উৎসব?" হুই বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওনার দিকে।

"ফলবতী বসুন্ধরা," মার্মন মনে করিয়ে দিলেন ওনাকে।

"আহ!" হুই মাথা ঝাঁকালেন। "এতো দিন পার হয়ে গিয়েছে সেটা অবশ্য ভাবিনি। আমাকে ওপেটে নিয়ে যাওয়ার মত একটা যুদ্ধ হাতি হবে নাকি আপনার কাছে?"

"নাহ, মহানুভব," অনুতাপের কণ্ঠ ওনাকে বললেন মার্মন। "এখানে কোনো হাতিই নেই।"

"তাহলে পদব্রজেই যেতে হবে আমাকে," হতাশ হয়ে বললেন হুই।

"আপনাকে আগে বিশ্রাম নিতে হবে।"

"হ্যাঁ," সায় দিলেন হুই। "বিশ্রাম আগে।" এবার উনি মার্মনকে ধরে ওনার শোয়ার জায়গায় নিয়ে যেতে দিলেন। গদির উপর ধপ করে শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে ওপেট যেতে কত দিন লাগতে পারে, মার্মন?"

"যদি দ্রুত যেতে পারেন, ছয় দিন। যদি উড়ে যান তো পাঁচ।"

"উড়েই যাবো আমি," বললেন হুই। "সন্ধ্যায় ডেকে দেবেন আমাকে," বলেই ঘুমিয়ে গেলেন উনি।

ঘুমন্ত অবয়বটার দিকে তাকিয়ে, মার্মন অতি পরিচিত স্নেহের একটা আবেগ নিজের ভেতর অনুভব করতে পারলেন। এই ছোট্ট যোদ্ধা লোকটার মহান হৃদয়ের জন্য নিজের ভেতরে মুগ্ধতা অনুভব করলেন উনি, হুইয়ের উদ্যম আর কর্মশক্তির জন্য ঈর্ষা অনুভব করলেন, যেটা সবসময়ই হুইকে নিজের সমসাময়িকদের চাইতে অনেক এগিয়ে রেখেছে, মার্মন খুব খুশি হলেন এরকম সংকটের সময়ে হুই বেন-আমন ওনাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে।

ঠিক তখন ওপেট থেকে আসা দূতের কথা মাথায় এল ওনার, বেন-আমনের বাহিনীর কম বয়স্ক একজন জওয়ান আগের দিন এই কেল্লা হয়ে গিয়েছে, সর্বোচ্চ পুরোহিতের জন্য একটা খুবই জরুরি একটা বার্তা নিয়ে এসেছিল সে। নিজের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে একটু তর্ক করে শেষে সিদ্ধান্ত নিলেন যেহুইয়ের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। সন্ধ্যায় জেগে উঠলে জানাবেন ওনাকে।

সন্ধ্যায় ঘুম থেকে উঠলেন হুই। হালকা কিছু খেয়ে গায়ে তেল মালিশ করে নিলেন। মিনিট বিশেক পরেই পনেরোজন সৈন্যকে সাথে করে কেল্লার দরজা পেরিয়ে সন্ধ্যার শীতল বাতাসে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন উনি, যেই তারা দক্ষিণের অন্ধকার আর নীরব জঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে গেলেন তখনই মার্মনের আবার মনে পড়ল তরুণ জওয়ানের দেওয়া বার্তাটা।

একবার ভাবলের একজনকে পাঠাবেন খবরটা দিতে, কিন্তু উনি ভালোই জানতেন যে এতটা এগিয়ে যাওয়ার পরে কারো পক্ষেই আর পুরোহিতকে ধরতে পারা সম্ভব হবে না। হুইয়ের লম্বা পায়ের দ্রুত গতিও কিংবদন্তীর একটা অংশ।

মার্মন ঠান্ডা মাথায় ভাবতে লাগলেন। "খুব তাড়াতাড়িই ওপেটে পৌঁছে যাবেন হুই।" দুর্গের দেওয়ালের উপর পায়চারি করতে করতে একেবারে শেষ মাথায় পৌঁছে গেলেন উনি। পুরো অন্ধকার নেমে আসার আগ পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, তাকিয়ে আছেন গোলযোগপূর্ণ উত্তরের দিকে আর ভাবছেন যে কত দ্রুত ধেয়ে আসবে আক্রমণ।



ফলবতী বসুন্ধরা উৎসবের নবম দিন সকাল বেলা ধর্মীয় পরিষদ তানিথের কক্ষে প্রবেশ করল। প্রধান যাজিকা নিয়ে এলেন ওদেরকে, দুর্বল আর অনিশ্চিত চেহারা তার, অপরাধবোধে চোখ তুলেও তাকাতে পারছেন না।

"তোমার জন্য খুশির খবর আছে, মা," তানিথকে বললেন উনি, তানিথ দ্রুত চট করে নিজের গদিতে উঠে বসল–বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করা শুরু করেছে। হয়তো গ্রাই-লায়ন ওনার মনের ইচ্ছা পরিবর্তন করেছেন।

"ওহ, মাননীয়া!" ফিসফিস করে বলল ও, চোখের কোণে স্বস্তির জল জমা হতে শুরু করেছে। এখনও গর্ভপাতের ধকলে দুর্বল আর কাঁপছে ও, যখন তখন কারণে অকারণে কান্না আসে ওর।

প্রধান যাজিকা বকবক করেই চলছেন, তানিথের দিকে তাকাচ্ছেনই না, ওর চোখে তাকানোর সাহস নেই, তানিথ বিভ্রান্ত হয়ে গেল তাতে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উদাহরণ আর দেবতাদের আইন সম্পর্কিত বক্তৃতার কোনো মানে খুঁজে পেল না ও, শেষে যাজিকা হাকার চেহারার দিকে তাকাতেই দেখলো কীভাবে তার অশুভ চেহারাটা উল্লসিত আর লালসায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে আর চোখজোড়া কতটা নিষ্ঠুরতায় জ্বলজ্বল করছে।

তখনই আচমকা বুঝতে পারলো যে এটা কোনো শাস্তি কমানোর খবর না।

"আর তাই নিজের বিজ্ঞ বিবেচনায় রাজা তোমাকে পছন্দ করেছেন, তোমাকে দেবীর কাছে ওপেটের দূত হয়ে যাওয়ার মহান গৌরবের অধিকারি হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন।"

ওনারা ওকে মুক্ত করতে আসেননি এখানে, ওর ভাগ্য অবরুদ্ধ করতে এসেছেন। যাজিকা হাকা হাসছেন।

"তোমাকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে মা। রাজা তোমাকে অনন্ত জীবন দান করছেন। তুমি দেবীর পাশে গৌরবের সাথে বাস করবে, আজীবন তার হয়ে," প্রধান যাজিকা বললেন, যাজিকারাও সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠলো, "অ্যাসটার্টের জয় হোক, বাআলের জয় হোক।"

প্রধান যাজিকা বলে চললেন, "তোমার নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। আমি আইনাকে পাঠাবো তোমাকে সাহায্য করার জন্য। ও দূতদের ব্যবস্থাপনা ভালোই জানে, কারণ এর আগেও বাছাইকৃত অনেকের পরিচারক ছিল সে। প্রার্থনা করতে ভুলো না যেন, মা। প্রার্থনা করো যেন দেবী তোমাকে উপযুক্ত হিসেবে গ্রহণ করেন।"

তানিথ তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে, চেহারা ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। ও মরতে চায় না। ওর চিৎকার করে বলে উঠতে ইচ্ছে হলো, "ছেড়ে দিন আমাকে। আমি এখনও অনেক ছোট। আমি শুধু আরেকটু আনন্দ চাই, শুধু মরার আগে আর একটুখানি ভালোবাসা চাই।"

ধর্মীয় পরিষদ বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে, তানিথকে একা রেখে। এতক্ষণে চোখ জুড়ে প্লাবন নামলো ওর, ডুকরে কেঁদে উঠলো ও।

"হুই, কোথায় আপনি! আমার কাছে আসেন!"



হুই বহু কষ্টে অবসন্ন ঘুমের আঠালো অন্ধকার জলাভূমি থেকে টেনে তুললেন নিজেকে, দুঃস্বপ্নটা তখনও ওনার চোখের সামনে ভাসছে যেন। কোথায় আছেন সেটা বুঝতে অনেক সময় লেগে গেল ওনার আর এতক্ষণ যা দেখেছেন সেটা যে বাস্তব না, দুঃস্বপ্ন ছিল, তা বুঝতে সময় লাগল আরও কিছুক্ষণ।

একটা বুনো ফিগ গাছের ছায়ার শুয়ে ছিলেন হুই, ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের অবস্থান দেখে নিয়ে বুঝতে পারলেন যে মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। ওনার পাজোড়া এখনও ভার হয়ে আছে, শরীর অবশ আর দুই দিনের যাত্রার ধকলে সম্পূর্ণ দুর্বল।

ওনার কমপক্ষে আরও তিন থেকে চার ঘণ্টার জন্য ঘুমানো দরকার, কিন্তু দুঃস্বপ্নটা মাথা থেকে তাড়াতে পারলেন না। অস্থির হয়ে আছেন।

কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন উনি, কাজটা করতে যে পরিমাণ কষ্ট হলো তাতে অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু তখুনি আবার মনে পড়ল যে গত দুই দিনে উনি প্রায় দুইশো রোমান মাইল দৌড়ে এসেছেন। সাথের অবশিষ্টদের দিকে তাকালেন উনি–তিনজন আছে আর–সবার চেহারা বন্য হয়ে আছে, পরিশ্রমের কারণে পুরোপুরি বিধ্বস্ত, যেভাবে পড়ে আছে তাতে মনে হচ্ছে ঘুমুচ্ছে না বরং মারা পড়েছে। রাস্তার ধারেই ছিটকে পড়েছে বাকি বারোজন, হুই যে বজ্র গতিতে এগিয়েছেন, সেটার সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়েছে তারা।

হুই নিজেকে পায়ের উপর টেনে দাঁড় করালেন। ঘুমাতে পারছেন না উনি, বিশ্রাম নিতে পারছেন না, ভয় ওনার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে, ওনার রাজা আর ওনার দেশের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছে এখন।

পা টেনে টেনে উনি ছোট্ট একটা পানির প্রবাহের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন চিনির মত সাদা বালির ভেতরে। পরিষ্কার পানি দিয়ে চেহারা আর শরীরে ঝাপটা দিলেন, জামা আর দাড়ি দুটোই ভিজে গেল তাতে, তারপর আবার পাড় বেয়ে উঠে এসে ওনার ঘুমন্ত লোকগুলোর দিকে তাকালেন। ওদের জন্য মায়া হলো ওনার অনেক, তবে সেই মায়াও ওদেরকে ডেকে তোলা থেকে নিবৃত করতে পারলো না, "উঠে পড়ো! উঠে দাঁড়াও! ওপেটে যাবো আমরা।"

এদের মাঝে একজন জাগতে পারলো না, যদিও হুই ওর পাঁজরে লাথি মারলেন আর গালেও চপেটাঘাত করলেন কয়েকটা। ওনারা ওকে শুইয়ে রেখেই বিদায় নিলেন, ঘুমের মাঝে গোঙাচ্ছে লোকটা।

বাকি দুজন নিজেদেরকে টেনে তুললো, কাতরাচ্ছে, ব্যথায় ভরা শক্ত পা দুটো টেনে টেনে এগোনো লাগছে, ক্লান্তির বিবর্ণ অভিব্যক্তি চোখে মুখে।

হুই প্রথম আধা মাইল হেঁটেই গেলেন, ব্যথা করতে থাকা পেশীতে ঢিল দেওয়ার জন্য, সাথের ওরা পেছনে টলতে টলতে এগোতে লাগল।

তারপরেই উনি আঙুলে ভর দিয়ে চলতে শুরু করলেন, শকুন কুঠারটা এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে নিয়ে শুরু করলেন দৌড়, লম্বা পায়ে ভর করে লাফানোর ভঙ্গিতে ছুট দিলেন, তারপর একটা এলান্ড ষাঁড়ের মতই পেরিয়ে আসতে লাগলেন জমিন।

একজন সৈনিক চিৎকার করে উঠলো, কারণ ওর পা আর কাজ করছে না আর, ধুলোর ভেতর গড়াতে গড়াতে পড়ে গেল সে। ও আর পারবে না, ওখানেই শুয়ে শুয়ে ব্যথা চাপার চেষ্টায় গোঙাতে লাগল তার অবশ আর ছেড়া পেশীর বেদনায়।

অন্যজন চলতে লাগল হুইয়ের পেছনে, পায়ের পেশি ঢিল হয়ে এসে রক্ত সঞ্চালন শুরু হওয়ায় তার পদক্ষেপও জোরদার হতে লাগল।

সূর্য মাথার উপর নিয়ে দৌড়াতে লাগলেন দুজন, দুপরের নির্মম রোদকে উপেক্ষা করে, বিকেলেও থামলো না দৌড়।

সামনেই, দিগন্তের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেঘের একটা পুঞ্জ। ওপেটের হ্রদের উপরে বারো মাসই ঝুলতে দেখা যায় সেটাকে। আশার একটা বাতিঘর হয়ে দেখা দিল মেঘের দলটা, হুই তার চেহারা ওটার দিকে ফিরিয়ে দৌড়াতে লাগলেন, সহজাত প্রবৃত্তিই সেদিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল ওনাকে আর প্রবল ইচ্ছাশক্তি সোজা রাখলো অবসন্ন শরীরটা, সেটার জোরেই সকল শারীরিক শক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও উনি ঠিকই দৌড়ে চলতে পারলেন।

দিনের শেষ সূর্য কিরণে ওপেটের দেওয়াল আর মিনারগুলো উষ্ণ গোলাপি আভায় উজ্জ্বল হয়ে গেল আর হ্রদের পানির উপরিভাগে আলো প্রতিফলিত হয়ে বিচ্ছুরিত হতে লাগল গনগনে স্বর্ণালি রঙে, সেটার দিকে সরাসরি তাকালে ব্যথা করে ওঠে চোখ।

হুই চলাচলের রাস্তাটায় পৌঁছে দৌড়ের গতি আরও বাড়ালেন, ওখানকার ধুলো মাখা পথিকদেরকে ছাড়িয়ে চলে এলেন দ্রুত, সবাই ওনাকে দেখে রাস্তার ধারে সরে গেল, ডাক দিতে লাগল চিনতে পেরে।

“আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন, মহানুভব।”

“বাআলের আশীর্বাদ পড়ুক আপনার উপর, মাননীয়।”

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যে রাস্তাটা হ্রদের পাড় আর শহরের দিকে চলে গিয়েছে, সেটার অর্ধেক নামার পর, যে সৈন্যটা হুইয়ের সাথে আসছিল সে

স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, "মাফ করবেন, মহানুভব, আমি আর যেতে পারছি না।" বলেই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, তারপর একদিকে কাত হয়ে রাস্তার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল; বিস্ফোরিত হৃৎপিণ্ডের ব্যথায় কুঁচকে গেল সৈন্যটার চেহারা, মাটিতে প্রথমে মুখটা পড়ল ওর আর একটুও না নড়ে পড়ে রইলো ওভাবেই, মাটি স্পর্শ করার আগেই মারা গিয়েছে সে।

হুই বেন-আমন একাই দৌড়াতে লাগলেন। ওপেটের সদর দরজার প্রহরীরা অনেক দূর থেকেই দেখতে পেল ওনাকে, দরজা খুলে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল ওনাকে স্বাগত জানানোর জন্য।



মৃদু ঝাঁকিতে ঘুম ভাংলো তানিথের। ওর গদির পাশেই একটা কুপি জ্বলছে, আইনা ঝুঁকে আছে ওর উপর। তানিথ দেখলো যে বুড়ো চেহারাটা বেকেচুরে একটা দাঁতহীন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। সুপ্রাচীন ভাজপড়া বানরের মত চোখজোড়া পিটপিট করছে।

"মা, জেগে আছেন আপনি?"

"কী হয়েছে, আইনা?" তানিথ দ্রুত উঠে বসল, আইনাকে হাসতে দেখে ওর ভেতরের আশার মিটমিটে স্ফুলিঙ্গ অগ্নিকুণ্ডের আগুনের মত লকলকে হয়ে বেড়ে গিয়েছে।

"উনি এসেছেন!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আইনা বলল তানিথকে।

"হুই?"

"হ্যাঁ, মহানুভব এসেছেন।"

"আপনি দেখেছেন?" জানতে চাইলো তানিথ।

"রাস্তায় ওনার নাম ধরে ডাকতে শুনেছি, পুরো শহর গমগম করছে। সবাই বলছে উনি নাকি মাত্র তিনদিনে জানাতের কেল্লা থেকে এখানে দৌড়ে এসেছেন, ওনার সাথে রওনা দেওয়া পনেরোজন সৈন্য মারা পড়েছে পথেই। উনি ওদের হৃৎপিণ্ডকে ফাটিয়ে দিয়ে রাস্তার ধারেই ফেলে রেখে চলে এসেছেন।"

"ওহ, আইনা," তানিথ বৃদ্ধ যাজিকাকে জড়িয়ে ধরলো, স্তন পর্যন্ত চেপে ধরলো একেবারে। "এতো তাড়াহুড়া করে এসেছেন মানে হচ্ছে নিশ্চয়ই উনি জানতে পেরেছেন সব।"

"হ্যাঁ, মা। নিশ্চয়ই জানেন উনি। নয়তো এত তাড়াহুড়ার কী আছে? একজন জওয়ান নিশ্চিত আমার বার্তা নিয়ে পৌঁছেছে ওনার কাছে। উনি সবই

জানতে পেরেছেন।" খলবল করে কথা বলে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আইনা নিজের প্রত্যয় ব্যক্ত করল। "উনি জানেন!"

"কোথায় এখন উনি?" তানিথও উত্তেজিত হয়ে হাসতে শুরু করেছে। "কোথায় আছেন জানেন নাকি?"

"রাজার কাছে। উনি সোজা প্রাসাদে চলে গিয়েছেন।"

"ওহ সকল দেবী আর দেবতাদেরকে ধন্যবাদ," স্বস্তির শ্বাস ফেলল তানিথ। "উনি গ্রাই-লায়নের উপর নিজের প্রভাব খাটাতে গিয়েছেন। উনি কি পারবেন, আইনা? রাজা কি ওনার মত বদলাবেন?"

"অবশ্যই, মা। আপনার এখনও সন্দেহ হচ্ছে? যদি হুই বেন-আমন একবার মনস্থির করে ফেলেন, তাহলে উনি স্বয়ং বাআলের মতও বদলে দিতে পারবেন।"

"ওহ, আমার যে কি খুশি লাগছে, বুড়ি মা।" আইনাকে জড়িয়ে ধরেই থাকলো তানিথ, দুজন দুজনকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। অবশেষে তানিথ ছাড়িয়ে নিল নিজেকে।

"ওনার কাছে যান, আইনা। প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করবেন ওনার জন্য। সব খুলে বলার পর উনি কি বলে সেটা এসে বলবেন আমাকে।"

আইনা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই তানিথ ডাকলো ওকে আবার, "বলবেন আমি ভালোবাসি ওনাকে। বলবেন, ওনাকে আমি আমার জীবনের চাইতেও ভালোবাসি–সব দেবতার চাইতেও।"

"হুশ," বলল আইনা। "আস্তে, মা। কেউ শুনে ফেলবে আপনার কথা।"

একাকী তানিথ ওর গদিতে শুয়ে হাসতে লাগল আনমনে।

"তাতে কিছু যায় আসে না," ফিসফিসিয়ে বলল ও। "হুই এসে গিয়েছেন, কিছুই লাগবে না।"



লানন ক্রমবর্ধমান ত্রাস নিয়ে হুইয়ের কথা শুনতে লাগলেন। রাতে যখন কোনো খবর না দিয়েই অপ্রত্যাশিতভাবে হুই এসে উপস্থিত হলেন তখন ভেবেছিলেন যে হুই কোনোভাবে আগামীকালের অনুষ্ঠানের কথা জেনে ফেলেছেন। লানন প্রথমে ভেবেছিলেন দেখা-ই করবেন না, কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কী করা যায় ভাবছেন, কিন্তু ততোক্ষণে হুই চমকিত আর প্রতিবাদরত প্রহরীদের বাঁধা অতিক্রম করে লাননের শোয়ার ঘরে ঢুকেই পড়লেন।

লানন ওনার সবচে কম বয়স্ক স্ত্রীর পাশ থেকে নগ্ন অবস্থায় উঠে বসলেন, রেগে মেগে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু হুইয়ের অবস্থার দিকে তাকিয়ে তা ঠোঁটের এগোতেই আটকে গেল।

"মাফ করবেন, জাঁহাপনা। আম খুবই গুরুতর খবর নিয়ে এসেছি।"

লানন তাকিয়ে রইলেন হুই-এই দিকে: নোংরা আর ধুলোয় ভরে আছে জামা, চুল আর দাড়ি আলুথালু, চেহারা থেকে মাংস ক্ষয়ে গিয়ে হাড্ডিসার লাগছে দেখতে, কোটরের গভীরে ঢুকে গিয়েছে ক্ষত বিক্ষত চোখজোড়া।

"কী হয়েছে, হুই?" লানন দ্রুত পুরোহিতের কাছে এগিয়ে গিয়ে আন্তরিক আলিঙ্গনে শান্ত করলেন ওনাকে।

নয় পরিবারের পরিষদ আর ওপেটের সকল সম্ভ্রান্ত পরিবার–সবাই রাতের জরুরি সভায় জড়ো হয়ে সন্ত্রস্ত্র নীরবতায় শুনতে লাগলেন হুই বেন-আমনের আনা সংবাদ। ভাঙ্গা গলায় পুরোটা সবিস্তারে বলার পর হুই ক্লান্তিকরভাবে ধপ করে নিজের আসনে বসে পড়তেই শুরু হলো একে অন্যকে দোষারোপ, অপরের ভুল খুঁজে বের করা, নিজের ঢোল পেটানো আর সন্দেহের গুঞ্জরণ।

"আমরা তো জানতাম যে সেট-এই মারা গিয়েছে সে।"

হুই বললেন, "আপনারা জানতেন যে আমি সেট-এর তিরিশ হাজার দাসকে হত্যা করেছি, নাম ধরে ধরে কিছু বলা হয়নি।"

"আমাদের অগোচরে এত বড় একটা বাহিনী কীভাবে জড়ো হওয়া সম্ভব? দোষটা কার এখানে?"

হুই জবাব দিলেন, "আমাদের সীমানার অনেক বাইরে করা হয়েছে এসব। দোষারোপ করার মত নেই কেউ।"

"খনিগুলোর কী হবে–আমাদেরকে অবশ্যই ওগুলোকে রক্ষা করতে হবে।"

হুই কাষ্ঠ হাসি হাসলেন। "আমাদেরও সেরকমই ইচ্ছে।"

"সীমানায় মাত্র একটা বাহিনী মোতায়েন কেন?"

হুই গোমড়া মুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন, "কারণ আপনারা আরও বেশি সৈন্য মোতায়েনের জন্য তহবিল প্রদান করতে সম্মত হননি।"

ওরা সবাই হুইকে পেয়ে বসল তারপর, তাদের কথার আঘাত ওনার অবসন্নতার কুয়াশা ভেদ করে এসে বিঁধতে লাগল।

"আপনি কীভাবে নিরাপদে শত্রুদের ভেতর দিয়ে পেরিয়ে এলেন?"

"টিমন কি আপনার শিষ্য ছিল না একসময়?"

"আপনিতো ওকে ভালোই চেনেন, আপনিই ওকে সব শিখিয়েছেন, তাই না?" আর হুই লাননের দিকে তাকালেন।

"যথেষ্ট হয়েছে!" লাননের গলার স্বর হট্টগোল ছাপিয়েও শোনা গেল। "মাননীয় পুরোহিত জাতিকে যুদ্ধের আহ্বান করেছেন। লিপির নমুনা

দেখিয়েছেন উনি আমাকে, এখন সেগুলোকে অনুমোদন দিয়ে স্বাক্ষর করবো আমি।"

"আমাদের কি একটু অপেক্ষা করা উচিত না?" বললেন ফিলো, বরাবরের মতই, "তাড়াহুড়া হয়ে যাচ্ছে না?"

"কীসের অপেক্ষা করতে চাচ্ছেন?" জানতে চাইলেন হুই। "বর্শার ফলা দিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করে বিচিগুলো কেটে ফেলার পর যুদ্ধে যাবেন?"

ভোরের কিছু আগে যুদ্ধের আদেশে স্বাক্ষর করলেন লানন, নয় পরিবারের পরিষদের সভা শেষ করলেন এই কথা বলে:

"আমরা আবার দুপুরে দেখা করবো, ফলবতী বসুন্ধরার শেষ আনুষ্ঠানিকতা সারার পর। নিজেদের অস্ত্রপাতি গোছগাছ করে নেবেন আর বিদায় নিয়ে নেবেন পরিবারের কাছ থেকে।"

সবাই চলে গেলে নরম গলায় হুইকে বললেন, "এখানেই ঘুমাও। এখন আর কিছু করার মত নেই তোমার।"

কিন্তু দেখা গেল কথাটা বলতে দেরি করে ফেলেছেন উনি। হুই ঘুমিয়ে পড়েছেন এরমধ্যে, টেবিলেই হাতের উপর মাথা দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। লানন ওনাকে আসন থেকে তুলে, ঘুমন্ত একটা বাচ্চার মত করে অতিথিদের একটা কক্ষে নিয়ে গেলেন।

তারপর দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলেন একজন প্রহরী ।

"কেউ যেন মাননীয়ের ঘুম না ভাঙ্গায়," আদেশ দিলেন উনি। "কেউ না! মনে থাকে যেন।"

ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বলিদান সংঘটিত হবে, লানন ভালোই জানেন, হুই যে মরণ ঘুম ঘুমাচ্ছেন সেটা কয়েক দিনও চলতে পারে। ওনাকে রেখে চলে গেলেন উনি, তারপর গোসল করে, প্রস্তুত হতে লাগলেন শোভাযাত্রার জন্য।



আলখাল্লার ঘোমটা মাথার উপর তুলে দিল আইনা, ওর চেহারা ঢেকে গেল তাতে। বৃদ্ধ হাড্ডিসার হাতগুলো ঢুকিয়ে নিল পোশাকটার চওড়া হাতায়, তারপর সামনে ঝুঁকে নিভিয়ে দিল বাতিটা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো ও, কি করা লাগবে সেটা নিয়ে ভাবলো আরেকবার। প্রধান পুরোহিতের প্রাসাদ ত্যাগ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব না আর। আইনার প্রাসাদের রান্নাঘরে যাওয়ার সুযোগ আছে। ওখানের মূল

বাবুর্চি ওর ছোট বোনের নাতি, মাঝে মাঝেই মন্দিরের খাবারের রুচি বদলাতে ওখানে খেতে যায় ও। প্রাসাদের সব দাস চেনে ওকে। ওদের কারো কাছ থেকে সহজেই জেনে নেওয়া যাবে যে ওই এলোমেলোভাবে সাজানো কাদার দেওয়ালের ভবনগুলোর কোনটায় সর্বোচ্চ পুরোহিত আছেন, তার কাছে গিয়ে সব খুলে বলাটা তো আরও সহজ ব্যাপার।

নীরবে ও নিজের কক্ষের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। গলির শেষ মাথায় একটামাত্র মশাল নিজের বন্ধনীতে নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে, কিন্তু ওতে যে আলো বের হচ্ছে তাতে ছায়ার পরিমাণই বেশি, সে কারণেই গলিটার ছায়াময় কোণে ওর জন্য অপেক্ষারত অবয়বটাকে দেখতে পেল না আইনা, টের পেল যখন ওটা ধেয়ে এল ওর দিকে।

"এখনও ঘুম আসেনি, বুড়ি?" একটা গম্ভীর, প্রায় পুরুষালি কণ্ঠ ডাক দিল নরম গলায়, একটা শক্ত হাত আকড়ে ধরলো আইনার কবজি।

"আপনি কি এত রাতে দেখা করতে যাচ্ছেন কারো সাথে? হুই বেন-আমন ওপেটে ফিরেছেন এই খবর পেয়েছেন বুঝি?"

"না," কুই কুই করে বলল আইনা। "কসম।" বলতে বলতে দুর্বলভাবে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। মুক্ত হাতটা দিয়ে যাজিকা হাকা বুড়ি যাজিকার ঘোমটা টেনে নামিয়ে সোজা তার চোখের দিকে তাকালেন।

"বেন-আমনের কাছে যাচ্ছিলি তুই, তাই না?"

"না। কসম।" যাজিকা হাকার অভিব্যাক্তিতে জিঘাংসা দেখতে পেল আইনা, জীবন বাঁচাতে চেঁচানো আরম্ভ করল ও। কিন্তু সেটাও এত মৃদু জোরহীন আওয়াজে যে মনে হলো বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ, সেটাও আচমকা থেমে গেল যাজিকা হাকার শক্তিশালী হাতের চপেটাঘাত ওর মুখে পড়ার পর।

একটা ভীত চেহারা উঁকি দিল উল্টো পাশের একটা দরজা থেকে, খেঁকিয়ে উঠলেন যাজিকা হাকা, "বিছানায় ফিরে যাও।" কম বয়স্ক নবিসটা সাথে সাথে পালন করল আদেশ।

যাজিকা হাকা আইনার দুর্বল দেহটাকে জোর করে ধরে আবার পর্দার ভেতর নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেললেন বিছানায়। তারপর হাত দিয়ে চেপে ধরলেন আইনার নাক আর মুখ, অন্য হাতটা আইনার বুকে চেপে ধরে শুইয়ে রাখলেন ওকে।

সবটা দিয়ে ছোটার চেষ্টা করতে লাগল আইনা, দেওয়ালের উপর দমাদম বাড়ি দিতে লাগল ওর গোড়ালি আর হাত দিয়ে বারবার হাকার চেহারায় চড় আর খামচি দিতে লাগল। তবে খুব দ্রুতই শেষ হয়ে গেল প্রতিরোধ আর ও জোর হারিয়ে পড়ে রইলো নিথর হয়ে। আইনা চুপ হয়ে যাওয়ার পরেও দীর্ঘ সময় ওর নাক আর মুখ চেপে ধরে রইলেন যাজিকা হাকা, সব শেষে ওর হাড়

জিরজিরে বুকে হাত দিয়ে, ঝুলে পড়া স্তনের ভেতর দিয়ে হৃৎস্পন্দন অনুভব পাওয়া যায় কিনা পরখ করে দেখে নিলেন তা।

না পেয়ে সন্তুষ্টিতে মাথা ঝাঁকালেন উনি, তারপর ছড়িয়ে থাকা হাত-পা সোজা করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। ঘরের একমাত্র জানালার গরাদ দিয়ে ভোরের প্রথম আলো এসে পড়ল আইনার চেহারায়। হাঁ হয়ে খুলে আছে ওর মুখ, চোখ বেরিয়ে আছে কোটর ছেড়ে আর রেশমী রুপালি চুল ভাসছে কপালের উপর।



উৎসবের চূড়ান্ত রীতিটা যাতে যথাযথ নিয়ম মেনে সমাপ্ত হয় সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক থাকলেন লানন। এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে উনি বিশাল একটা জাতীয় সংকটের মুখোমুখি, ওপেট তার ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী আর নিষ্ঠুর শত্রুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। দৈবদ্রষ্টা তার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, উনি আর ওনার রাজ্য কোনোভাবে দেবতাদের ক্রোধে পতিত হয়েছে হয়তো।

লানন জানেন যে কোনো জাতির ভাগ্য শুধুমাত্র মানুষের কর্মের উপরে নির্ভর করে না, যুদ্ধ শুধু তরবারি দিয়ে হয় না, এর বাইরেও অনেক শক্তি কাজ করে। মাঝে মাঝে প্রবলভাবে, কখনো দুর্বলভাবে, কিন্তু সেটাই নির্ধারণ করে দুনিয়াবি ব্যাপার স্যাপারের ফলাফল। উনি এটাও জানেন, যে কোনো ক্রুদ্ধ দেবতাকেই শান্ত করে আবার নতুন করে তাঁর অনুগ্রহও লাভ করা সম্ভব।

সর্বোচ্চ যাজিকা যখন অ্যাসটার্টের দীঘির পাড়ে প্রশ্নোত্তর পর্বটা পরিচালনা করছিলেন, তখন লানন বিশেষভাবে খেয়াল রাখলেন যেন ওনার উত্তরগুলো পুরোপুরি সঠিক হয়, দেবীর প্রতি আর্জি পেশ করার সময় কণ্ঠে আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি না থাকে।

যাজিকারা লাননের চারপাশে জড়ো হয়ে হালকা হাতে তার বেগুনি রঙ্গা রেশমি জোব্বাটা খুলে ফেলতে সাহায্য করল। দীঘির দিকে এগোতেই শীতল বাতাসের প্রবাহ এসে ধাক্কা দিল ওনার নগ্ন শরীরে, সেটাকে উপেক্ষা করে পাথরের ধাপগুলো বেয়ে নেমে, পরিস্কার সবুজ পানিতে ডুব দিলেন উনি।

পানির উপরিভাগের ঠিক নিচে ওনার শুভ্র রঙের দেহটা দেখা যেতে লাগল, ওনার লম্বা স্বর্ণালি কেশরাজি আর দাড়ি ঝলমল করছে পানির ভেতর। আর পাশে বসে যাজিকারা শাঁখের খোলে করে পানি নিয়ে ওনার মাথায় ঢালতে লাগল।

ওনারা সবাই দীঘি থেকে উঠে দাঁড়াতেই লানন উপলব্ধি করলেন ভেতরে ভেতরে আধ্যাত্মিক একটা বিশোধন হয়ে গেল যেন ওনার, পবিত্র পানিটা যেন

সকল উদ্বেগকে ধুয়ে মুছে দিয়ে সামনে আগুয়ান বিপদের জন্য অস্ত্র সজ্জিত করে দিয়েছে ওনাকে। গভীর ধর্মবিশ্বাস সম্পন্ন কোনো মানুষ উনি না, কিন্তু এই মুহূর্তে নিজেকে খুব নীতিবান একজন মানুষ বলে মনে হতে লাগল। দেবীর জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ একজন দূত বাছাই করতে পেরেছেন বলে নিজের কাছেই খুব ভালো অনুভব করতে লাগলেন উনি।

নিজের ব্যক্তিগত আর তুচ্ছ উদ্দেশ্য এখন আর ধর্তব্যে নেই ওনার। দূত হিসেবে উনি পাঠাচ্ছেন একজন রক্তমাংসের যাজিকাকে, দেবতাদের আশীর্বাদপ্রাপ্ত একজন দৈবদ্রষ্টাকে, যে কিনা যোগ্যতা আর মর্যাদায় অনেক বড় একজন ব্যক্তি। নিশ্চিতভাবে দেবী ওকে গ্রহণযোগ্য মনে করবেন, নিশ্চিতভাবে অ্যাসটার্টে এখন আবার ওপেটের সন্তানদের দিকে মুখ তুলে তাকাবেন, এই বিপদ আর পরীক্ষার দিনে এই শহর আর জাতির উপর ওনার অনুগ্রহের ডানা বিস্তৃত করবেন।

যাজিকারা লাননের গা মুছিয়ে দিল, চমৎকার আকৃতি নিয়ে ফুটে আছে ওনার হাত, পা আর ঘাড়ের প্রতিটা শক্ত আর সুঠাম পেশী । দুজন যাজিকা সামনে এগিয়ে এসে একটা সাদা রেশমি জোব্বা গলিয়ে দিল ওনার মাথার উপর দিয়ে, সাদা হলো আনন্দ আর ফূর্তির রঙ। প্রধান যাজিকা ওনার গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন, লাল রঙের লিলি, গুহার স্থির বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ওগুলোর মিষ্টি সুবাস।

এখন হলো দেবীর প্রতি স্তব সঙ্গীত গাওয়ার সময়, তারপরেই দেওয়া হবে বলি। একটা মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল আর তারপরেই পুরো গুহা জুড়ে ধ্বনিত হলো একটা কণ্ঠ।

কণ্ঠটা চমকে দিল লাননকে, মাথা ঘুরিয়ে গায়ককে খুঁজতে লাগলেন উনি। কণ্ঠটা চিনতে ওনার একটুও ভুল হয়নি, ওটার মিষ্টি ঝলমলে সুর, গভীরতা আর তেজ লাননের হাতের লোমগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পুরো মন্দির জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, দেখে মনে হলো যেন দীঘির নিস্তরঙ্গ উপরিভাগে আলোড়ন উঠে যাচ্ছে।

লানন হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন হুইয়ের দিকে। দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভ্রান্ত আর কর্মকর্তাদের সারি থেকে সামনে এগিয়ে এলেন হুই, গাইতে গাইতেই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন লাননের দিকে। দুই হাত ছড়িয়ে সূর্যের প্রতীক তৈরি করে রেখেছেন উনি, মুখটা বড় করে খোলা, ভেতরে দেখা যাচ্ছে শক্তিশালী সাদা দাঁতের সারি আর তার গলা থেকে উৎসরিত হচ্ছে নির্মম সুন্দর কণ্ঠের সঙ্গীত। প্রশংসা সঙ্গীত শেষ করে হুই রাজার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাকিয়ে আছেন ওনার দিকে। হুইয়ের চেহারায় এখনও ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, কালো চোখজোড়ার নিচে তখনো কালসিটে নীলচে দাগ, চেহারা ফ্যাকাসে আর অবসন্ন, কিন্তু তবুও লাননের দিকে তাকিয়ে এক অনুগত অনুরাগের অভিব্যক্তিতে হাসতে লাগলেন উনি।

"হুই!" লানন আতংকিত গলায় অস্ফুটে বলে উঠলেন। "তুমি এখানে কেন? আমি তোমাকে বিশ্রাম নিতে রেখে এসেছিলাম, বলে এসেছিলাম কেউ যেন তোমাকে বিরক্ত না করে।"

"এখন আমার আপনার সাথে থাকার সময়।"

"তোমার আসা ঠিক হয়নি," প্রতিবাদ করলেন লানন। ওনার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে, উনি কখনোই চাননি যে হুই ওই ডাইনীর মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন, বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই হুইকে এই ঘটনার মাধ্যমে কোনো কষ্ট দেওয়ার। মরিয়া হয়ে লানন ভাবলেন আনুষ্ঠানিকতাটা থামিয়ে দিয়ে বলিকে সরিয়ে দেবেন, হুইকে আদেশ দেবেন মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতে।

লানন টের পেলেন যে পুরো সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা হয়তো পরবর্তী কয়েক মুহূর্তের মাঝে নির্ধারিত হয়ে যাবে। উনি কি বলিদান থামিয়ে দেবেন? দেবীকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেওয়ার সাহস করবেন? হুইয়ের প্রতি ওনার কর্তব্যের চাইতে কি ওপেটের প্রতি কর্তব্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ না? এর মাঝেই কি অনেক বেশি দেরি হয়ে যায়নি? উনি কি অনেক আগেই এই পথে নিজেকে আটকে ফেলেননি? এখন কি দেবতা আর দানবরা ওনাকে ভেংচাচ্ছে না? উনি কি ওনার আত্মার বিরান প্রান্তরে তাদের নারকীয় হাসির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে শুনতে পাচ্ছেন না?

হতভম্ব আর মর্মাহত চোখে হুইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন লানন। সামনের দিকে এক কদম এগোলেন উনি, একটা হাত সবিনয় অনুরোধের ভঙ্গিতে বের করে রেখেছেন যেন দয়া আর সহানুভূতি প্রার্থনা করছেন।

"আমার তোমাকে খুব দরকার," ফ্যাসফেসে গলায় বললেন উনি, হুই না বুঝেই ধরে ফেললেন হাতটা, ভেবেছেন এটা হয়তো বন্ধুত্বের হাত; গর্বিত ভঙ্গিতে উনি ওনার রাজা আর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর দেবীর উদেশ্যে বলিদানের সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন।

ওনার কণ্ঠ ঈগলের ডানার মত ওঠা-নামা করতে লাগল, গুহার ছাদের বলিদানের পাটাতন পর্যন্ত উঠে যেতে লাগল তা। মন্দিরের ভেতরের সবগুলো চোখ উঠে গেল উপরের দিকে আর একটা টানটান উত্তেজনার রাশ ভেতরের পূজারিদের দলটাকে চেপে ধরলো যেন।



তানিথ বিশ্বাসই করতে পারছে না যে ওর সাথে ব্যাপারটা ঘটেই যাচ্ছে। ভোরবেলা যখন ওরা ওর কক্ষে এল তখন ভেবেছিল হুই বুঝি এসেছেন ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে। ও গদি থেকে লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়েছিল ওনার সাথে দেখা করতে।

কিন্তু দেখা গেল হুই না, যাজিকা হাকা। ওরা ওকে ধরে মন্দির থেকে গোপন সিঁড়ি বেয়ে ওপেটের উপরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল। অ্যাসটার্টের দীঘি বরাবর হাঁ করে থাকা ফাঁকা জায়গাটা বরাবর বসানো বলিদানের পাটাতনের পাশে একটা খড়ের ছাউনি দেওয়া পাথরের ঘর আছে, তানিথকে ওখানে নিয়ে প্রথমে একটা ভারি নকশাকাটা বলিদানের আলখাল্লা পরিয়ে দিল সবাই মিলে, ফুল গুঁজে সাজিয়ে দিল চুল।

তারপর ওরা ওকে ভারি স্বর্ণের শেকল, হাতকড়া আর পায়ের বালা দিয়ে বেঁধে ফেলল, একসময় তানিথের মনে হলো ওগুলোর চাপে ও সোজা হয়েই বসতে পারবে না। ও জানে যে এই গয়নাগুলো বলিদানের উদ্দেশ্যে বানানো হলেও আরেকটা লক্ষ্য হচ্ছে যাতে এগুলোর ওজন বলিকে দীঘির সবুজ গভীরতায় খুব দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। এটা হলো সেই দীঘি যার কোনো তল নেই, এই দীঘি দেবীর কোলে পৌঁছে দেবে ওকে।

শান্তভাবে আর নিশ্চুপে ছোট খাওয়ার টেবিলটায় বসিয়ে দেওয়া হলো ওকে, ওর ভগিনীরা পাশে দাঁড়িয়ে জোর করে ভালো ভালো খাবার আর ওয়াইন তুলে দিতে লাগল। এটা হচ্ছে চিরবিদায়ের ভোজ, এমন একজনের জন্য ভোজ যে অসীমে যাত্রা করতে যাচ্ছে। তানিথ খেলো না কিছুই, শুধু ওয়াইনে চুমুক দিল একটা, আশা করছিল এটা হয়তো ওর শীতল অনুভূতিগুলোকে চাঙা করবে একটু।

"হুই," মনে মনে ভাবলো ও। "কোথায় আপনি, প্রিয়তম?"

অবশেষে একজন যাজিকা দরজার কাছে এসে ওদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। মোট পনেরো জন ছিল ওরা, সবাই শক্তিশালী কম বয়স্ক মেয়ে, কোনো জবরদস্তিকে প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনের চাইতে বেশি।

তানিথের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো ওরা, এখনও ওদেরকে ভীতিকর লাগছে না কিন্তু সবার চেহারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। নির্বিকার চোখে ওরা তাকিয়ে রইলো তানিথের দিকে, চেহারায় মায়া বা অনুতাপের কোনো চিহ্ন নেই।

"চলো," ওদের মাঝের একজন ডাক দিতেই উঠে দাঁড়ালো তানিথ। ওরা ওকে দরজা দিয়ে বের করে রোদে নিয়ে এল, সামনেই ও দেখতে পেল মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা হাঁ করা অন্ধকার গর্তটার উপরে বেরিয়ে থাকা পাথর কেটে বানানো পাতাটনটা।

বলিদানের পাটাতনে যাওয়ার রাস্তাটায় হলুদ মিমোসা ফুল বিছিয়ে রাখা হয়েছে, এই ফুলটা দেবীর কাছে পবিত্র। এটার ঘ্রাণ হালকা, কিন্তু উষ্ণ স্থির বাতাসে প্রাণ ভুলিয়ে দেয়, ভারি স্বর্ণের শেকলের ওজন আর নিজের দুঃখের ভারসহ এগোতে যেতেই তানিথের খালি পায়ের নিচে পিষ্ট হতে লাগল ফুলের কুঁড়িগুলো।

আচমকা থেমে দাঁড়ালো ও, সামনের গর্তটা থেকে যে কণ্ঠটা ভেসে আসছে সেটা শুনতে পেয়ে জায়গায় জমে গেল যেন, দূর থেকে আসার কারণে অনেক মৃদু লাগছে কণ্ঠটা আর গুহার দেওয়ালের লেগে অদ্ভুত প্রতিধ্বনিও

শোনা যাচ্ছে; কিন্তু তনুও কণ্ঠটা এমন শুদ্ধ আর সুন্দর যে ও সেটাকে না চিনে পারলো না।

"হুই!" অস্ফুটে বলে উঠলো ও। "মহানুভব!" কিন্তু ওর মনের উচ্ছ্বাস মিলিয়ে যেতে সময় লাগল না, কারণ হুই বেন-আমনের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে বলিদানের সঙ্গীত।

তার মানে হুই-ই ওকে দেবীর কাছে পাঠাচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে নরক আর পরম শূন্যতার একটা দৃশ্য নিজের মানসচক্ষে দেখতে পেল ও। নিজেকে একটা বিকট ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করল, কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা, শুধু বুঝলো যে হুইও ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। উনিও এখন ওর বিরুদ্ধে। ওকে দেবীর কাছে নৈবেদ্য দিচ্ছেন উনিই।

এখন আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই। পাটাতনে ওঠার শেষ কয়েকটা ধাপ যাওয়া খুব সহজ মনে হলো ওর কাছে।

পাটাতনের ধারে থেমে দাঁড়িয়ে দুই হাত প্রসারিত করে সূর্যের প্রতীক তৈরি করল তানিথ, তারপর নিচের গুহার অন্ধকারের দিকে তাকালো একবার, দীঘির পানি উপর থেকে কালো আর স্থির দেখাচ্ছে, তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন রাজা আর পুরোহিত।

ওনারা তাকিয়ে আছেন উপরে ওর দিকে, কিন্তু এত দূর থেকে ওনাদের মুখভঙ্গি পড়ার উপায় নেই। ও শুধু টের পেল যে হুইয়ের গলা তখনও জোর গলায় বলিদানের সঙ্গীত গেয়ে চলেছে, উৎসর্গ করছে ওকে দেবীর কাছে।

ঘৃণা আর রাগ এসে সরিয়ে দিল ওর ভেতরের হতাশাকে, কিন্তু ও চাচ্ছিল না এই আবেগগুলোকে নিয়ে মারা যেতে। ওগুলোকে থামাতে দ্রুত ফাঁকা জায়গাটার দিকে ঝুঁকে পড়ল ও, গাঢ় সবুজ দীঘিটার উপর, যেই ও ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়তে শুরু করল, সাথে সাথে হুইয়ের কণ্ঠও থেমে গেল আচমকা, শব্দের মাঝেই আটকে গিয়েছে ওনার কথা।

ধীরে ধীরে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে হেলে পড়ল তানিথ, তারপরেই নিজেকে বাতাসে ভাসমান অবস্থায় আবিষ্কার করল ও। শরীরে আটকানো স্বর্ণের ওজনের কারণে সবেগে ছুটে গেল ও দীঘির দিকে। পাকস্থলী ওর ভেতরে সেঁধিয়ে যেতেই হুইয়ের কণ্ঠ শুনতে পেল ও আবার, প্রচণ্ড অসহায় একটা আর্তনাদ করে উনি ওর নাম ধরে ডেকে উঠলেন।

"তানিথ!"

তানিথ দীঘির উপরিভাগে এত জোরে আছড়ে পড়ল যে তাতেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল ওর, ভারি গহনাপত্র এত দ্রুত ওকে স্বচ্ছ পানির নিচে টেনে নিয়ে গেল যে হুই শুধু গভীর জলে সোনালি রঙের একটা ঝলকানি দেখতে পেলেন, যেন একটা বিশাল মাছ ঘাই মারছে শিকার ধরে খাওয়ার জন্য।



মানাতাসসি ওপেট বর্ষ ৫৪৩-এর শীতকালে বিশাল নদীটা পেরিয়ে এল। ঠান্ডা আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে উপত্যকার ভেতর দিয়ে পার করে নিয়ে এল ওর বাহিনীকে, ওসব জায়গায় পানি নেমে গিয়েছিল মাটির সর্বনিম্ন স্তরে। আলাদা আকৃতির তিনটা দল নিয়ে পার হয়ে এল ওরা। সবচেয়ে ছোটটা ছিল মোটামুটি ৭০,০০০ যোদ্ধার–এই দলটা নদীটা পার হলো পশ্চিম দিক থেকে আর ওদিকের সবগুলো কেল্লাকে গুঁড়িয়ে দিল অনায়াসে। তারপর সেখান থেকে দ্রুত বেগে এগিয়ে গেল ওপেটের হ্রদের পশ্চিম উপকূল অভিমুখে। ওখানে হ্রদ থেকে একটা সরু খাল বেরিয়ে এসেছে, ওপেটের জাহাজগুলোর সমুদ্রে যাওয়ার পথ হিসেবে কাজ করে খালটা। এটাকে ওরা বলে 'জীবন নদী'–ওপেটের হৃৎপিণ্ডকে জীবন সরবরাহকারী ধমনী।

মানাতাসসির ইম্পিরা কেটে দিল ধমনীটাকে, ওখানে খাল খননের কাজে নিয়োজিত দাসদেরকে মুক্ত করে দিয়ে কেল্লার সৈনিক আর দাস–সর্দারদেরকে হত্যা করল নির্মমভাবে। হাব্বাকুক লালের বহরের বেশিরভাগ জাহাজ সৈকতে তুলে রাখা হয়েছিল, খোলগুলো পরিষ্কার করার জন্য কারিন করা। ওগুলোকে ওখানেই পুড়িয়ে ফেলা হলো আর নাবিকদেরকে জ্যান্ত ছুঁড়ে দেওয়া হলো সেই আগুনে।

সবশেষে মানাতাসসির সমরাধিনায়করা বন্ধ করে দিল খালটা। সৈন্যরা আর হাজার হাজার মুক্ত দাসরা জীবন নদীর পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছোট গ্রানাইটের পাহাড় কেটে নদীর সবচেয়ে সরু জায়গায় ভরাট করে দিল, ডোঙার চাইতে চওড়া কোনো নৌযান চলাচল অসম্ভব হয়ে গেল তাতে। এখানে যে শ্রম দেওয়া হলো তার সাথে শুধু শেপো-র বিশাল পিরামিড তৈরির শ্রমের তুলনা চলে, এতে করে বাকি দুনিয়া থেকে ওপেট শহর আর তার লোকজন আলাদা হয়ে গেল পাকাপাকীভাবে।

একই সময় আর একটু বড় দ্বিতীয় দলটা পার হলো পূর্ব দিক দিয়ে, কোনো বাঁধা ছাড়াই ড্রাভদের এলাকা পেরিয়ে এসে, কালো ঝড়ের মত করে হামলে পড়ল জেং-এর পর্বতের বাগানগুলোতে।

তৃতীয় আর সবচেয়ে বড় দলটা, প্রায় তিন লাখেরও বেশি সৈন্য নিয়ে, সেট-এ নদীতে ঢেউ তুলে এগিয়ে গেল। মানাতাসসি নিজে নেতৃত্ব দিল এই দলটাকে, পার হওয়ার জন্য এই জায়গাটা বেছে নিল একটা ইঙ্গিত হিসেবেই।

মার্মন ওনার ৬,০০০ সৈন্যের বাহিনীটা নিয়ে ওকে বাঁধা দিতে ছুটে গিয়ে, ছোট্ট আর রক্তক্ষয়ী একটা যুদ্ধে পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে পেরেছিলেন মার্মন, কিন্তু জানাতের কেল্লার পোড়া ধ্বংসাবশেষের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজের অস্ত্র দিয়ে আত্মহুতি দেন উনি।

মানাতাসসি এবার ওপেটের দিকে মন ফিরিয়ে, রওনা হলো সেদিকে। ওর বাহিনীর আয়তন ছিল তিন মাইল চওড়া আর বিশ মাইল দীর্ঘ, এত বিশাল একদল জনতা যে, আয়তনের কারণেই অগ্রগতি বেশ ধীর হয়ে গেল।

যাওয়ার পথে যা পড়ল সব উজাড় করে এগিয়ে চললো মানাতাসসি। কাউকে বন্দী করল না–পুরুষ, মহিলা বা শিশু–কাউকেই না। কোনো লুটপাটও করল না–কাপড়, বই বা চামড়ার যা কিছু আছে আগুন ধরিয়ে দিল সবকিছুতে, আসবাব আর তৈজসপত্র যা পেল তার সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল পুরো জাতির চিতার মত করে জ্বলতে থাকা আগুনে। বাড়ি-ঘরও জ্বালিয়ে দিল সব, তারপর সেগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তপ্ত পাথরের খন্ডগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল আশপাশে।

ওর ভেতরের ঘৃণা, এই ধ্বংসলীলায় মজা পেয়ে আরও লকলক করে বেড়ে উঠলো–ঠিক ওর ধরানো আগুনের শিখার মতই, যতই ওতে ভার চাপানো হলো ওটাও আরও বেশি বেশি করে জ্বলতে লাগল।

ওপেটের মোট সামরিক শক্তি ছিল নয়টা বাহিনী। এর মাঝে একটা উত্তরে মার্মনের সাথেই শেষ হয়ে গিয়েছে, আরও দুটো কচু কাটা হয়েছে জেং-এর বাগানগুলোয়, যারা বেঁচে গেল তারা অবরুদ্ধ অবস্থায় আটকে রইলো পাহাড়ের চূড়ার মন্দির আর দুর্গগুলোয়।

বাকি ছয়টা বাহিনী নিয়ে লানন হাইকানাস ওপেটে থেকে রওনা হলেন মানাতাসসির মোকাবেলা করতে। ওপেটের ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে মুখোমুখি হলো দুটো বাহিনী। প্রথম লড়াইতে লাননই জয়লাভ করলেন, দুই মাইল জায়গা পুনরুদ্ধার হলো এতে, এক দিনের অবকাশও পেলেন–কিন্তু এতে মূল্য দিতে হলো প্রায় ৪,০০০ আহত আর নিহত সৈন্য দিয়ে।

প্রধান পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে ষষ্ঠ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে বাকমোর। যুদ্ধক্ষেত্রের পাশেই বসানো লাননের তাঁবুতে এসে ঢুকলো ও, চিতার আগুনের আলোয় আকাশ তখনও জ্বলন্ত উনুনের মত হয়ে আছে, পোড়া মাংসের কটু গন্ধে যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকদের ভেতর ক্ষুধার লেশমাত্র নেই আর।

"শত্রুদের প্রায় আটচল্লিশ হাজার সৈন্য মারা পড়েছে," খুশি খুশি কণ্ঠে জানালো বাকমোর, লানন টের পেলেন যে আসলেই উনি তরুণ নেই আর। কত দ্রুতই না বয়স বেড়ে গেল। "আমাদের একজনের বদলে ওদের বারো জন করে গিয়েছে," বাকমোর বলে চললো।

লানন ওর দিকে তাকালেন, নিজের গদিতে বসে আছেন উনি, একজন সেবক ওনার ছোট খাটো কাটা ছেড়ার পরিচর্যা করছে। শুকনো ঘাম আর রক্ত

বাকমোরের দাড়ি আর চুলকে জট পাকিয়ে দিয়েছে, সুদর্শন চেহারায় নতুন ভাজ পড়েছে অনেকগুলো।

"আবার কবে লড়াই করতে পারবে?" লানন জিজ্ঞেস করলেন, শুনে বাকমোরের চোখের উপরের ছায়া গাঢ় হলো আরও।

"আজ কষ্ট হয়েছে অনেক," বলল ও। বেন-আমনের বাহিনীটা লড়াই-এর ভয়ংকর সময়টায় একেবারে কেন্দ্রভাগ শক্ত হাতে সামলেছে, বিশেষ করে ঠিক যখন মনে হচ্ছিল যে কালো শরীর আর তাক করে রাখা বর্শার চাপে হয়তো ওনাদেরকে পিছুই হটতে হবে।

"কতো তাড়াতাড়ি পারবে?" লানন আবার জিজ্ঞেস করলেন।

"অন্তত চার বা পাঁচ দিনে," বাকমোর বলল ওনাকে। "আমার লোকদের অবস্থা খুব খারাপ।"

"এর অনেক আগেই আবার লড়তে হবে," লানন জানিয়ে দিলেন ওকে।

পরদিন আবার যুদ্ধ হলো, বাকিগুলোর মত ভয়ংকর আর চড়া মূল্য দিতে হলো এবারও। লানন বিপুলভাবে জয়লাভ করলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র ধরে রাখতে পারলেন না, প্রায় হাজারখানেক যুদ্ধাহতকে হায়েনা আর শেয়ালের শিকার হতে ফেলে রেখে পাহাড়ের আবডালে ফিরে যেতে হলো প্রতিরক্ষামূলক কারণে।

পাঁচদিন পর আবার লড়াই করলেন ওনারা, পরবর্তী সতেরো দিনে আরও পাঁচবার। ততোদিনে ওনারা যেখানে শিবির স্থাপন করলেন সেটা ওপেট থেকে প্রায় বিশ রোমান মাইল দূরে আর লাননের ছয়টা দুর্দান্ত বাহিনী কমে এসে দাঁড়িয়েছে তিনটায়।

আটটা ভয়ানক লড়াইতে জিতে বা শত্রুদলের প্রায় ২০০,০০০ সৈন্যকে বধ করার পরেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। জেং-এর পতনের পরে, হাতে গোনা গুটিকয়েক সৈন্যই বেঁচে ফিরতে পারলো ওটার দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিতে। শহরগুলো উজাড় হয়ে গিয়েছে, পুড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে মাটির সাথে। বাগানগুলোও কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে মধ্য সাম্রাজ্যের খনিগুলো, দাসগুলোকে মুক্ত করে মানাতাসসির বাহিনীতে যুক্ত করে, খনির ভেতরটা পাথর এবং মাটি চাপা দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে আবার।

জীবন নদীর খালগুলো পাথর ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, হাব্বাকুক লালের জাহাজগুলোতে করে যে পালাবেন সেই উপায়ও নেই। এখন পূর্ব পশ্চিম দুই দিক থেকেই নতুন নতুন বাহিনী এসে যোগ দিচ্ছে মানাতাসসির ওপেট অভিমুখী যাত্রায়।

লানন মানাতাসসির বাহিনীর এই বিপুল অংশকে কতল করার পরেও, মনে হতে লাগল যেন সংখ্যা বা মনোবল কোনো দিক থেকেই ওদের কোনো

ঘাটতিই হচ্ছে না। প্রতিবার যখনই লানন নিজের পতাকা গেঁড়ে মানাতাসসির অগ্রগতি রুখে দাঁড়িয়েছেন, তখনই নব উদ্যমে নতুন নতুন দল সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের হাজার হাজারকে হয়তো হত্যা করেছেন, কিন্তু ওরাও ওনার বাহিনীর ভালো একটা অংশকে আহত করে রেখে গিয়েছে আর এত ঘন ঘন লড়াই করতে হওয়ায় ওনার বাহিনীর সবাই আরও বেশি অবসন্ন আর গভীরভাবে হতাশায় নিপতিত হয়ে পড়েছে যা তাদের যুদ্ধ করার উদ্যমকে কমিয়ে দিয়েছে প্রায় পুরোটাই।

একাত্তরতম দিনে পুরো একটা বাহিনী–মানে ৬,০০০ সৈন্য–রাতের বেলা তাদের কর্মকর্তাদেরকে ছুরি মেরে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পালিয়ে গেল রাতের আঁধারে। তারপর ওপেটের আশপাশের গ্রামগুলো থেকে তাদের পরিবার পরিজনকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল দক্ষিণে।

বাকমোর ওদেরকে কিছুদূর ধাওয়া করে শখানেককে বন্দী করে নিয়ে ফিরে এল আবার লাননের বিচারের মুখোমুখি করতে। এদের সবাই ছিল ইয়ুয়ি-রক্ত মিশ্রিত সৈন্য, মুক্ত দাসদের চাইতে এক শ্রেণী উপরে, রাজার পক্ষে লড়াই করার সম্মানপ্রাপ্ত সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক। কিন্তু দেখা গেল সেই সম্মানটাকে ওরা খুব বেশি পাত্তা দিচ্ছে না। বাঁচার আর কোনো উপায় নেই সেটা বুঝতে পারার পরে সাহসও বেড়ে গেল অনেক বেশি, ওদের সর্দার রাজাকে বলল,"যদি আমাদেরকে লড়াই করার মত একটা কারণ দিতেন, একটা কুকুরের চাইতে বেশি মর্যাদা দিতেন, তাহলে হয়তো আমরা আপনার সাথেই থাকতাম।"

লানন লোকটার ঔদ্ধত্যের শাস্তি স্বরূপ ফুটন্ত পানিতে ফেলে দিয়ে হত্যা করলেন, বাকি থাকা দুই বাহিনীকে নিয়ে ফিরে চললেন শহরের দিকে।

শহরের দেওয়ালের ঠিক বাইরে, হ্রদের ধারে তাঁবু ফেললেন ওনারা। রাতের বেলা লানন উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখুন মানাতাসসির বাহিনীর জ্বালানো আগুনের শিখাগুলো পাহাড়ের উপরে হলুদ নামাকুয়া ফুলের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে আসছে মানাতাসসি।

শিবিরের বাইরে রাজাকে খুঁজে পেল বাকমোর, শত্রুর অবস্থান অবলোকন করছেন। ও সাগ্রহে এগিয়ে গেল রাজার দিকে, বহু দিনের ভেতরে আজকেই দেওয়ার মত একটা সুখবর পাওয়া গিয়েছে।

"জাঁহাপনা, হুই বেন-আমনের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।" শুনেই লাননের উদ্যম গেল বেড়ে।

"কোথায় সে? বেঁচে আছে তো? ফিরে এসেছে?" জানতে চাইলেন লানন। ছোট্ট পুরোহিতের অভাবটা যে কত ভয়াবহ ছিল, সেটা এখন টের পেলেন উনি। ফলবতী বসুন্ধরার অনুষ্ঠানের মাঝে সেই যে হুই অ্যাসটার্টের গুহা থেকে চিৎকার করে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন, এরপর আর ওনাকে দেখা যায়নি।

যদিও লানন ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করেছেন, হুইয়ের কোনো খোঁজ এনে দিতে পারলে ১০০ স্বর্ণের আঙুল পুরস্কার দেবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু হুই গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন পুরোপুরি।

"ও ফিরে এসেছে?" এই দীর্ঘ রাতগুলোর মাঝে কতবার যে লানন হুইয়ের সঙ্গ, তার পরামর্শ, তার সান্ত্বনার জন্যে আকুল হয়ে ছিলেন, তার হিসাব নেই।

লড়াই-এর মাঝে কতবার যে উনি কান পেতে থেকেছেন হুইয়ের কণ্ঠে "জয় বাআল!" হুঙ্কার শোনার আশায়, তার বিশাল কুঠারটার হিসহিসানি শোনার অপেক্ষায়।

কতোবার যে উনি আশা করেছেন পুরোহিতকে সাথে নিয়ে লড়াইয়ের মাঝে একটা জোরদার কেন্দ্রভাগ গড়ে তুলতে পারবেন বা শত্রুপক্ষের আগুয়ান পার্শ্বদেশকে রুখে দেবেন।

"কোথায় ও?" জানতে চাইলেন লানন।

"এক জেলে দেখেছে ওনাকে। হ্রদের সেই দ্বীপটায় নাকি আছেন," বলল বাকমোর।



শোকে আচ্ছন্ন হয়ে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। কতদিন কেটেছে তার হিসাবও রাখছেন না হুই। একটার পর একটা কেটে যাচ্ছে কীভাবে তা-ও জানা নেই। বেশিরভাগ সময়ই উনি লিপি লেখার কাজে কাটাচ্ছেন। পাঁচটা স্বর্ণের লিপির সবগুলোই সাথে নিয়ে এসেছেন, যখন কুঁড়ের ভেতর থাকেন না, তখন ঘুমানোর পাটির নিচে বালিতে পুতে রাখেন সেগুলো।

মূলত তানিথকে নিয়ে বিস্তারিত লিখছেন উনি–ওর প্রতি ওনার ভালোবাসা আর ওর মৃত্যু নিয়ে। শুরুতে উনি সারা রাত কাজ করতেন তারপর সারা দিনও, কিন্তু একসময় কুপির শেষ তেলের ফোঁটাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন থেকে উনি রাতের বেলায় সৈকত দিয়ে ঘুরে ঘুরে নিচু ঢেউয়ের বালির উপর আছড়ে পড়ার ফিসফিসানি আর গর্জন শুনে বেড়ান, হ্রদ ধরে এগিয়ে আসা বাতাসে ফার্নের পাতা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনতে কান পেতে থাকেন।

স্বাদু পানির ঝিনুক আর অগভীর পানিতে ধরা সামান্য কিছু মাছ খেয়ে আছেন উনি, ফলে শরীর শুকিয়ে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে; চুল আর দাড়ি না আঁচড়াতে আঁচড়াতে জট পাকিয়ে গিয়েছে।

চোখের দিকে তাকালে ওনার শোক বোঝা যায়, বন্যতা আর বিভীষিকায় ভরে আছে ওগুলো। অর্ধ উন্মাদ হয়ে আছেন আর নিজের কি অবস্থা হচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। এভাবে অসহায় অনেকগুলো দিন কেটে যাওয়ার পর, ক্রোধ আর অসন্তুষ্টি দানা বাঁধতে শুরু করল ওনার ভেতরে। রক্তের গন্ধে পাগল খুনে হাঙরের মত নানান বিপজ্জনক কুচিন্তা উদয় হতে লাগল মনের গভীর থেকে।

একদিন রান্না করতে বসে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আগুনের উপর ঝুঁকে পড়ে ওনার নিজের দেশ আর দেবতাদের সম্পর্কে নানান কথা উদয় হতে থাকলো তার মনে। মনে হাতে লাগল যে এদের দুই পক্ষই প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আর লোভী। একটা দেশ পুরোপুরি শুধু সম্পদ সংগ্রহ ছাড়া বোঝে না কিছু, মানুষের কি দুর্দশা হচ্ছে সেটার কোনো খবরই রাখে না। আর দেবতারাও সবগুলো অসার, যারা বলি ছাড়া বোঝে না কিছুই–দুই পক্ষই লোভী আর সর্বগ্রাসী।

হুই রান্না শেষে এগিয়ে গেলেন হ্রদের পাড়ের দিকে। পা ছড়িয়ে বালির উপর বসতেই পানি উঠে এসে ভিজিয়ে দিল গোড়ালি পর্যন্ত। কুচিন্তাগুলো তখনও ঘুরছে মাথার ভেতরে, তার সাথে মিলে মিশে যাচ্ছে তানিথের যত স্মৃতি।

এরা কেমন দেবতা যে তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দাস-এর প্রিয়তমাকেই বলি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে! ওরা আর কী কী চাইতে পারে তার কাছ থেকে, সেটা ভাবতে লাগলেন উনি। ওনার প্রিয় যা কিছু ছিল তার সবটাই দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করেছেন, তবুও ওরা এখনও চেয়েই যাচ্ছে।

ওরা এতটাই নিষ্ঠুর যে লাননকে সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করে ওনার ভালোবাসাকে ওনার থেকে চিরতরে আলাদা করে দিল। এখন শুধু মনে হচ্ছে উনি লাননকে তানিথের ব্যাপারে সব বলে রাখলেই পারতেন। লানন যদি ওনাদের ভালোবাসার কথা জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই তানিথকে রক্ষা করতেন, এ ব্যাপারে হুই পুরো নিশ্চিত। শুরুতে উনি লাননকে প্রচণ্ড ঘেন্না করা শুরু করেছিলেন, কারণ লাননই তানিথকে বলি হিসেবে বাছাই করেছিলেন। কিন্তু পরে যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখার পর বুঝলেন যে লানন সরল বিশ্বাসেই করেছেন সব। হুই আর তানিথের সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুই জানা ছিল না ওনার। উনি শুধু জানতেন যে জাতি আছে ঘোরতর বিপদে আরেকটা মূল্যবান বার্তাবাহকের প্রয়োজন ছিল খুব। স্বাভাবিকভাবেই তানিথই ছিল প্রধান পছন্দ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও হুই দেখলেন যে এটাই আসলে যুক্তিযুক্ত, এটাও জানেন যে লাননের জায়গায় উনি থাকলেও একই কাজ করতেন।

এখন আর লাননের প্রতি কোনো বিরাগ নেই ওনার, কিন্তু আচমকাই রাগ গিয়ে পড়ল যারা লাননকে এই কাজটা করতে বাধ্য করেছে তাদের উপর–দেবতাদের উপর–ওই দয়ামায়াহীন দেবতাদের উপর।

ভাবতে ভাবতে কেটে গেল রাত, হ্রদের ওপাড় থেকে চকচকে স্বর্ণালি রঙের সমস্ত জাঁকজমক নিয়ে উদিত হলেন মহান বাআল, পানির অন্য পাশে হুই দেখতে পেলেন গোলাপি পাহাড় চূড়া আর ওপেটের মিনারগুলো দিগন্তের কাছে জ্বলজ্বল করছে।

আজীবনের অভ্যাসবশত হুই উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত মেলে সূর্যের প্রতীক তৈরি করে বাআলের প্রশংসা সঙ্গীত গাওয়ার জন্য মুখটা খুললেন।

কিন্তু আচমকাই প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে আরম্ভ করলেন উনি। টের পেলেন যে ওনার আত্মার ভেতর থেকে রাগটা উঠে এসে দমকে দমকে বেড়েই চলেছে–ওনার ঘৃণার আগুনকে দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সেটা, আগুনটা হচ্ছে ওনার বিশ্বাসের মৃত্যুর চিতার আগুন।

"গোল্লায় যা!" চিৎকার করে বললেন উনি। "আর কী চাস আমার কাছ থেকে, শালার মানুষখেকো? আর কতকাল আমাকে খেলার পুতুল বানিয়ে রাখবি?"

হাত মুঠো করে ধরে উদীয়মান সূর্যের দিকে ঘুষির মত করে ছুড়তে লাগলেন হুই, কুঁচকে আছে চেহারা আর এলোমেলো হয়ে থাকা দাঁড়ির জঙ্গল বেয়ে অঝরে ঝরছে অশ্রু। হ্রদের পানির ভেতর নেমে গেলেন উনি।

"আর কতকাল তোর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার বলি হতে হবে আমাকে, শালা খুনি কোথাকার! আর কতজন নিষ্পাপ মানুষের রক্ত খেষে তোর অসুরিক পিপাসা মিটবে?"

ভেজা বালিতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন উনি, পানি এসে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল ওনার।

"তোকে ত্যাগ করলাম আমি!" চিৎকার করে বললেন হুই। "তুই আর তোর রক্তহীন সাথীকেও। আমার আর তোদেরকে কোনো দরকার নেই–ঘেন্না করি আমি তোদেরকে। শুনে রাখ–আমি ঘেন্না করি তোদেরকে।"

তারপর চুপচাপ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন ওখানেই, মৃদু ঢেউ ভাসিয়ে দিতে লাগল ওনাকে। আরও কিছুক্ষণ ওভাবেই বসে থেকে, শেষে দুই হাতের আঁজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে আবার ফিরে গেলেন সৈকতের উপরে নিজের কুঁড়েতে। নিজের ভেতরে মুক্তির এক চরম স্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন হুই–একটা কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে যে শান্তিটা আসে মনের ভেতরে সেটা। উনি আর পুরোহিত নেই এখন।

এক টুকরো সেদ্ধ মাছের টুকরো আর এক বাটি হ্রদের পানি খেয়ে নাস্তা সেরে, লিপি নিয়ে কাজ করা শুরু করলেন প্রতিদিনের মত।

আবার উনি তানিথকে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন, ওর গলার প্রতিটা স্বর মনে করার চেষ্টা করলেন, প্রতিটা হাসি আর ভ্রূর কুঞ্চন, হাসার সময় মাথা কাত করে থাকার ভঙ্গিমা–এমন ভাবে লিখতে লাগলেন যেন শব্দের

মাধ্যমে ওকে অমরত্ব দান করতে চাচ্ছেন উনি, যেন অক্ষয় স্বর্ণের পাতের উপর কেটে কেটে ওকে পরবর্তী ১,০০০ বছরের জন্য শব্দের মাঝে জীবন দান করতে পারবেন।

দীর্ঘ সময় কাজ করার পর, লিপি থেকে মুখ তুলে ওনার কমে আসা দৃষ্টি শক্তি দিয়ে তাকিয়ে দেখুন যে, দিন প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছে, সৈকতের হলুদ বালির উপর বাঘের ছাপের মত সৃষ্টি করেছে পাম গাছের লম্বা ছায়া। আবার লিপির উপর ঝুঁকে পড়ে কাজ শুরু করলেন উনি।

পদশব্দের আওয়াজ পাওয়া গেল কুঁড়ের বাইরে বালিতে, একটা অন্ধকার অবয়ব দরজায় দাঁড়িয়ে আলোকে আটকে দিল।

আবার মাথা তুললেন হুই, লানন হাইকানাস দাঁড়িয়ে আছেন তার দরজায়।

"তোমাকে আমার খুব দরকার," বললেন উনি।

হুই জবাব দিলেন না। লিপির উপর কুঁজো হয়ে থেকে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

"এই দ্বীপে বসেই তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে আমাকে ছেড়ে যাবে না কখনো," লানন নরম গলায় বলেই চললেন। "মনে আছে তা?"

হুই তাকিয়ে রইলেন ওনার দিকে। দেখতে পেলেন লাননের দেহ-ভর্তি কাটাকুটি আর সেলাইয়ের গভীর ক্ষত, চোখ কোটরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিকট হয়ে আছে চেহারা। লাননের চামড়ার ধূসর হয়ে আসা ভাবটাও চোখে পড়ল ওনার, কপালের কাছের এক গোছা চুল আর দাড়িতে বুড়ো লোকের মত পাক ধরেছে।

ক্ষতগুলো অর্ধেক ভালো হয়েছে, লিনেনের কাপড়ের বাঁধনের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে রক্ত বের হচ্ছে তখনও। ওনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এমন একজন মানুষ যে তার শক্তি আর সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে, যার গলায় লেগে আছে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ।

"হ্যাঁ," বললেন হুই। "মনে আছে।" বলে উনি উঠে দাঁড়িয়ে লাননের দিকে এগিয়ে গেলেন।



পরদিন ভোরে ওপেট ফিরলেন ওনারা। সারা রাত হুইয়ের কুঁড়ের পাশের আগুনের পাশে বসে বসে আলাপচারিতা করেছেন দুজন।

লানন হুইকে নিজের অভিযাত্রার বিবরণ আর দেশের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত শোনালেন। প্রতিটা লড়াই সম্পর্কে জানালেন, শত্রুপক্ষের প্রয়োগিত প্রতিটা কৌশল সম্পর্কে বললেন।

"যুদ্ধ-হাতিগুলোর উপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলাম আমি, সেটা করাটাই ভুল হয়েছে। একেবারে প্রথম মোকাবেলাতেই আমি ওগুলোকে হারিয়েছি। মৌমাছির হুল থেকে নেওয়া বিষমাখা বর্শা ব্যবহার করেছিল ওগুলোকে মারতে। পরে একজন বন্দীর কাছ থেকে শুনলাম যে কীভাবে ওরা ধোঁয়া দিয়ে শত শত মৌচাক খালি করে, তারপর কতটা কষ্ট করে ওদের হুলের গোঁড়া থেকে বিষের থলেটাকে টেনে বের করেছে। ওগুলোর আঘাতের ক্ষতের জ্বালায় আমার হাতিগুলো পাগল হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সৈন্যদেরকেই আক্রমণ করে বসে, শেষে গজাল মেরে থামাতে হয়েছে ওগুলোকে।

"অভ্যাস করে করে লাফ দিয়ে হাতির পিঠে উঠে যাওয়া শিখেছে ওরা। কয়েকজন ধরে ছুঁড়ে দেয় একজনকে, পেশাদার দড়াবাজিকরের মত সে বাতাসে ভেসে উড়ে গিয়ে মাহুতকে খুন করে, তারপর জানোয়ারগুলোর ঘাড়ের পেছনে ছোরা ঢুকিয়ে দেয়।"

"এটার জন্য আমিই দায়ী," বললেন হুই। "হানিবালের হাতিগুলোর বিরুদ্ধে রোমানদের ব্যবহৃত এই কৌশলগুলোর ব্যাপারে আমিই বলেছিলাম মানাতাসসিকে। আমার শেখানো কিছুর একটা শব্দও ভুলে যায়নি ও।"

লানন হুইকে একের পর এক লড়াই-এর কথা বলে গেলেন, যেগুলোতে জয় লাভ করেছেন কিন্তু ওপেট ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়েছে শুধু, কালো বাহিনীর সামনে ওনাদের ধীর পশ্চাদপসরণ, ওনার বাহিনীর মাঝে পর্বতসম হতাশার সৃষ্টি, দলত্যাগ আর বিদ্রোহের কথা, সৈকতেই নৌবহরের সিংহভাগ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আর খালগুলো বন্ধ করে দেওয়ার কথা।

"আর কতগুলো জাহাজ আছে?"

"নয়টা," জবাব দিলেন লানন, "সাথে নানান পদের জেলে নৌকা আছে কিছু।"

"আমাদের সবাইকে হ্রদ পার করে দক্ষিণ উপকূলে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে?"

"নাহ," মাথা নাড়লেন লানন। "ধারে কাছেও না।"

রাতভর আলাপ চালিয়ে গেলেন ওনারা, সূর্যের প্রথম কিরণের আভাস ফোটার আগের অন্ধকার প্রহরে লানন প্রশ্নটা করলেন যেটা সারা রাত ওনার ঠোঁটে নিশপিশ করেছে। উনি জানতেন যে হুই-ও প্রশ্নটার অপেক্ষায় আছে।

"আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে কেন, হুই?" নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন লানন। হুইকে যদি বিশ্বাস করাতে হয় যে লানন হুইয়ের সাথে ওই মায়াবিনীর সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুই জানেন না, যদি ওনাকে বিশ্বাস করাতে হয় যে তানিথকে বলি হিসাবে বাছাইয়ের ব্যাপারটা নিতান্ত কাকতাল, তাহলে লাননকে অবশ্যই ব্যাপারটা না জানার ভান করতে হবে।

প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে তাকালেন হুই, আগুনের আভায় ওনার চেহারার নিচের দিকটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। চোখজোড়া দেখতে অন্ধকার গর্তের মত লাগতে লাগল তাতে।

“আপনি জানেন না?” জিজ্ঞেস করলেন হুই, উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছেন লাননের দিকে।

“আমি শুধু দেখলাম যে তুমি ওই মায়াবিনীর নাম ধরে চিৎকার দিলে, তারপর থেকেই সম্পূর্ণ গায়েব।”

হুই আগুনের আলোয় লাননের অভিব্যক্তি পড়ার চেষ্টা করলেন, অপরাধবোধের চিহ্ন বা ছলনার আভাস খুঁজছেন। কিন্তু পেলেন না কিছু। লাননের চেহারা ক্লান্ত আর নির্বিকার হয়ে আছে, তবে ফ্যাকাসে নীল চোখগুলো সোজা ওনার দিকে তাকানো আর তাতে কোনো পলক পড়ছে না।

“আমাকে বলো হুই,” জোর করলেন লানন। “আমি এতদিনেও ব্যাপারটা মাথা থেকে সরাতে পারিনি। কী এমন হলো যে মন্দির থেকে এভাবে বেরিয়ে গেলে?”

“তানিথ। আমি ভালোবাসতাম ওকে,” বললেন হুই, লাননের অভিব্যক্তি পাল্টে গেল। হুইয়ের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়েই রইলেন উনি, আতংকিত আর স্তব্ধ দৃষ্টিতে।

“ওহ, বন্ধু আমার, এ কী করেছি আমি! আমি জানতাম না, হুই, আমি সত্যিই জানতাম না।”

আবার দৃষ্টি নামিয়ে আগুনের দিকে তাকালেন হুই, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

“জানি আমি,” বললেন উনি।

“আমার জন্য বাআলের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করো, হুই,” ফিসফিস করে বললেন লানন, তারপর একদিকে হেলে পড়ে হুইয়ের কাঁধ জড়িয়ে ধরলেন, “কারণ আমি তোমাকে দুঃখ দেওয়ার কারণ হয়েছি।”

“না, লানন,” জবাব দিলেন হুই। “আমি আর কখনোই প্রার্থনা করবো না। আমি আমার ভালবাসাকে হারিয়েছি আর আমার দেবতাদের পরিত্যাগ করেছি। আমার এখন আর কিছুই নেই।”

“আমি আছি এখনও তোমার, পুরনো দোস্ত,” বললেন লানন, হুই ওনার দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

“তা ঠিক,” সায় দিলেন উনি। “আমার এখনও আপনি আছেন।”

স্বর্ণের লিপি আর শকুন কুঠারটা নিয়ে সৈকত ধরে এগিয়ে গেলেন ওনারা, যেখানে বাকমোর আর জেলের নৌকার দলবল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল, ভোরবেলাতেই ওপেট ফিরে এলেন তারা।



সৈন্য শিবিরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়, রাজা এবং পুরোহিতকে একসাথে দেখে উল্লাস করে উঠলো সবাই, হুই টের পেলেন অশ্রু জমে তার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে।

"এটা আমার প্রাপ্য না," অস্ফুটে বললেন উনি। "আমি এদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। আমার উচিত ছিল এদের সাথে থাকা।"

যদিও এই দুটো বাহিনী আগের মূল নয়টার থেকে যাওয়া ভগ্নাংশগুলো মিলিয়ে তৈরি করা, কিন্তু হুইয়ের দেখে মনে হলো এগুলো বেন-আমন বাহিনীর ভিত্তির উপর তৈরি করা হয়েছে। সবখানেই পরিচিত মুখ, ওনার দিকে চেয়ে অনুরক্ত হাসি হাসছে। উনি থেমে দাঁড়িয়ে কথা বললেন ওদের সাথে, চেষ্টা করলেন গলার স্বর যতটা সম্ভব প্রফুল্ল রাখার, প্রায় সবার বর্মেই টোল পড়া, গা ভর্তি অর্ধেক ভালো হওয়া বা তখনও পুঁজ ঝরতে থাকা কোনোমতে বেঁধে রাখা ক্ষত।

খেয়াল করলেন কতটা অবসন্ন হয়ে আছে সবাই, আত্মার সাথে সাথে দেহও প্রচণ্ড ক্লান্ত। জেগে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে হাসিগুলো আর উল্লাস ধ্বনিটাও যেন গলা দিয়ে জোর করে বের হচ্ছে–কিন্তু তবুও এরা সদা প্রস্তুত আর এখনও ভেতরের তেজ ফুরিয়ে যায়নি। এরা ভাগ্যবান যে শিবির ফেলা বাহিনীকে সচরাচর যেসব জ্বর আক্রমণ করে সেসবের কোনোটায় ধরে আরও দুর্বল করে দেয়নি ওদেরকে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলেন হুই–নিয়মিত শরীর চর্চা করলে, পানির উৎস নষ্ট করে দেওয়ার মত দীর্ঘ সময় একটা জায়গায় না থাকলে বা পায়খানার জায়গাটা পচতে না দিলে, মাঝে মাঝে দেখা যায় যে জ্বরটা হচ্ছে না।

প্রায় ২৬,০০০ লোক হ্রদের ধারে তাঁবু ফেলে আছে, এদের প্রত্যেকেই প্রবল বিক্রম প্রদর্শন করে চলেছে বিগত বেশ কিছুদিন ধরে। ওদের মাঝ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হুই টের পেলেন আত্মবিশ্বাস আর প্রত্যাশার ছোট্ট ছোট্ট শিখা ওনার পেটের ভেতর উত্তাপ ছড়াতে শুরু করেছে। সম্ভবত এখনও এই বাহিনীটাকে দিয়ে কিছু একটা করা সম্ভব।

লানন আর হুই দুপুরের খাবার খেলেন তাদের সেনা কর্মকর্তাদের সাথে। ওপেটের খাদ্য ভাণ্ডারের কাছাকাছি থাকায় শস্য বা মাংস বা ওয়াইনের কোনো অভাব হলো না, সবাই পেট পুরে খেয়ে হাসি ঠাট্টা করতে লাগল একজন আরেকজনের সাথে, লাননের আদেশে দ্বিগুন ওয়াইন ভাগে পেল সৈন্যরা। বিকেল বেলা লানন তাঁবুতে মহিলাদেরকে আসার অনুমতি দিলেন। এই সুবিধাটা সাধারণত দেওয়া হয় কোনো বিশাল বিজয়ের পরে, লড়াইয়ের আগে না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। মহিলারা ঝাঁক বেঁধে হাজারে হাজারে ছুটে এল শহরের বাইরে, এদের অনেকেই একদিনের জন্য শয্যাসঙ্গিনী হবে–একের অধিক পুরুষের সাথে।

"উপভোগ করতে দাও ওদের," কণ্ঠে সামান্য অনুতাপ নিয়ে মন্তব্য করলেন লানন। কর্মকর্তারা মেয়েদেরকে শিবিরের ভেতরে নিয়ে আসার পর ওরাই সৈনিকদেরকে বেছে নিল। "দেবতারা ভালোই জানেন যে, এদের

অনেকেই হয়তো শেষবারের মত এসব করার সুযোগ পাবে।" তারপরই তার গলা কঠোর হয়ে গেল। "তবে সন্ধ্যার পরে যেন কোনো মেয়েই এখানে না থাকে।"

এই গণমিলনের মাঝে একটা মরিয়া ভাব আছে, যেন দুনিয়া থেকে জীবনের শেষ চিহ্ন মুছে যাওয়ার আগে টিকে থাকার শেষ একটা চেষ্টা চালাচ্ছে সবাই। যেন ভালোবাসার গতি বেশি হলে তাদেরকে আগামীকালের গণহত্যা থেকে ছাড় দেওয়া হবে।

লানন সৈন্যদেরকে এই উন্মত্ততার মাঝে ফেলে, পরিস্থিতি যাচাই করতে নিজের সঙ্গীসাথীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন শিবিরের বাইরে, সামরিক বাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপের জোরদার কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে ছুটে গেলেন ওনারা। সবাইকে একটা উচ্চভূমির সামনের কিনারে নিয়ে এলেন লানন, পাহাড়ের গাঁ থেকে বেরিয়ে হ্রদের উপরে ঝুলে আছে জায়গাটা, ওখান থেকে প্রতি দিকেই বিশ মাইলের মত দেখা যায়। দীর্ঘ সময় কাটালেন ওনারা ওখানে, মানাতাসসির বাহিনীর পাহাড়ের গিরিখাতগুলো থেকে বেরিয়ে এসে হ্রদের উপকূল অভিমুখী ঢালু পাড় বেয়ে নেমে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করলেন বসে বসে। ওনারা চুপেচুপেই দেখে যেতে লাগলেন সব, কারণ এই দৃশ্যটা চরম দুঃসাহসী মানুষের আত্মাও শীতল করে দেবে।

পুরো ব্যাপারটা দেখে মনে হচ্ছিল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর সাপ পাক খুলছে বুঝি। সৈন্যরা চওড়া সারি করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, যেন এই মানুষের সমাবেশের শেষ নেই কোনো; একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির মতই ছড়িয়ে পড়ে গুচ্ছবদ্ধ হচ্ছে আবার। সাগরের ঢেউয়ের মতই অদম্য আর অনড় লাগতে লাগল এদের চলনকে বা গ্রীষ্মের আকাশে কালো মেঘের দলের মত, এর মুখোমুখি হয়ে ওনারা সবাই স্তব্ধ হয়ে চুপ করে রইলেন।

মানাতাসসি তার অগ্রবর্তী বাহিনী নিয়ে হ্রদের উপকূলে ফেলা নিজের শিবিরে প্রবেশ করল–লাননের শিবির থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে সেটা। ওর বাহিনীর পেছনের ভাগ তখনও পাহাড়ের ওপাশ থেকে এসে পৌঁছায়নি, কিন্তু মাঝের সমতল জায়গাটা এর মাঝেই ওর লোকজনে গিজগিজ করছে। এই সংখ্যার কোনো শেষ নেই, গণনা করা অসম্ভব, কারণ ওনারা জানেনেই না যে এই সারি শেষ হবে কোথায়।

লানন আর হুই সন্ধ্যার সময় নেমে এলেন উচ্চভূমি থেকে। অ্যাসটার্টের তারাটা ওপেটের উপরের বেগুনি আকাশে আলোর উজ্জ্বল বিন্দু হয়ে ফুটে আছে। হুই জোর করে সেদিকে তাকানো থেকে বিরত থাকলেন।

ওখান থেকে বন্দরের দিকে গেলেন ওনারা আর হাব্বাকুক লালের বেঁচে যাওয়া জাহাজগুলোয় মহিলা আর বাচ্চাদের ওঠানো পর্যবেক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। রাতের বেলা আর পরের দিন যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারিত হওয়ার

আগ পর্যন্ত ডাঙ্গা থেকে দূরে থাকবে এরা। যদি ফলাফল ওপেটের বিরুদ্ধে যায়–হুইয়ের ধারণা সেটাই হবে–তাহলে জাহাজগুলো এদেরকে হ্রদ পার করে নিয়ে দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করবে, যাতে করে মানাতাসসির চাইতে এগিয়ে থাকতে পারে সেই প্রচেষ্টায়। আর পুরুষদের মাঝে যারা বেঁচে থাকবে তারাও একই কাজ করার চেষ্টা করবে যতটা পারে।

জাহাজে সবাইকে তোলার মত জায়গা ছিল না, তাই রাজকীয় আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা গেল আগে, তারপর যাজিকারা আর ব্যবসায়ী পরিবারের মহিলারা। কিন্তু একটা পর্যায়ে একদল ইয়ুয়ি আর নিচু জাতের মহিলারা বন্দরের ভেতরে ছুটে এসে নৌকায় চড়ে বসার চেষ্টা করলে একটা কুৎসিত আর গোলযোগময় মুহূর্তের উদ্ভব হলো। হাব্বাকুক লালের নাবিকেরা গদা মেরে ওদেরকে শুইয়ে দিয়ে টেনে নিয়ে গেল ওখান থেকে। চিৎকার করতে করতে মুখের সামনে হাত তুলে বর্শা আর লাঠির আঘাত সামলানোর চেষ্টা করে গেল মেয়েগুলো, তা দেখে হুইয়ের খুব মায়া হলো ওদের জন্য। ঝামেলার মাঝে দেখা গেল একটা কম বয়স্ক ইয়ুয়ি মেয়ে হতবুদ্ধি অবস্থায় জেটির উপর নিস্তেজ হয়ে বসে আছে, মাথা ঝুঁকে আছে কোলের বাচ্চাটার উপর আর ওর লম্বা কালো চুলের গোছা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এসে গাঢ় একটা ছায়া তৈরি করছে জেটির পাথরের উপরে।

হাব্বাকুক লালের অগ্রবর্তী জাহাজ থেকে লানন তার স্ত্রী আর বাচ্চাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। একেকজন স্ত্রী এসে ওনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে লাগল সামান্য সময়ের জন্য কিন্তু উনি মাথাও নোয়ালেন না বা তেমন একটা খেয়ালও করলেন না। বাচ্চারাও তাদের মাদের অনুসরণ করল, লানন ওদের দিকেও এক নজর তাকালেন না।

যমজ দুজন বড় হয়ে এখন বিবাহযোগ্য কন্যায় পরিণত হয়েছে। মাথা ভরা সোনালি চুলের বেণীতে সুন্দর আর প্রাণবন্ত লাগে দেখতে। ওরা এগিয়ে এসে শেষবারের মত হুইকে চুমু খেলো, বিদায় নিতে গিয়ে আর্দ্র হয়ে এল হুইয়ের গলা। বেশি ছোট বাচ্চারা পরিস্থিতি কতটা গুরুতর সেটা বুঝছিল না, ওরা সবাই ক্লান্ত আর বিরক্ত হয়ে পড়েছে, নিজেদের মাঝে হট্টগোল করছে নয়তো আয়ার কোলে তারস্বরে কান্না করছে।

লানন আর হুইকে আবার নৌকায় করে কালো পানি পেরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ডাঙায়, মশালের আগুনের প্রতিফলন নাচানাচি করছে পানিতে। জেটির উপর জড়ো হওয়া লোকজন চুপ হয়ে আছে, নিতান্ত অনিচ্ছায় সরে গিয়ে যাওয়ার জায়গা করে দিল তাদেরকে। হুই টের পেলেন যে একটা গোলযোগ বাঁধানোর উপক্রম করছে এরা সবাই। প্রহরীরা ওনাদের গা ঘেঁষে সরে এল কাছাকাছি আর ওনারা দ্রুত শহরের রাস্তা ধরে শিবিরের দিকে ছুটলেন।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, সেগুলোকে ঘিরে বসে পানোৎসবে মেতেছে মাতালের দল, যেন ওপেটের নিম্নশ্রেণীর জনগন আগামীকালের

ভয়াবহতার আগে সর্বশেষ কয়েক ঘণ্টা উপভোগ করে নিচ্ছে। আজকের পানোৎসব অন্য সময়ের নানান ধর্মীয় উৎসবের চাইতেও বেশি উন্মত্ত আর ব্যাপক আকারে চলছে। পুরুষ আর নারী একসাথে উলঙ্গ হয়ে আগুনের শিখার পাশে নাচানাচি করছে, মাতাল হয়ে নিজেদের করা বমির পাশের গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে কেউ, আবার বেহায়ার মত সবার সামনেই সঙ্গম করছে অনেকেই।

হুই দেখলেন একজন মহিলা মাতাল অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে, তার জামা ছেঁড়া আর রেড ওয়াইনের দাগ লেগে আছে তাতে, মলিন কাঁধ থেকে ন্যাকড়ার মত ঝুলছে সেটা, মেদবহুল আর গোলাকার একটা স্তন বেরিয়ে আছে ছেড়া দিয়ে, তামাটে রঙের স্তনের বোঁটা দেখা যাচ্ছে। সে হোঁচট খেয়ে একটা আগুনের উপর পড়ে গেল, তার চুল কমলা রঙের শিখায় বিস্ফোরিত হয়ে উঠলো সাথে সাথে।

অন্ধকার গলি আর ছায়ার ভেতর দিয়ে ছুটে এল আরও অনেক অবয়ব, কাঁধে ভারি বোঝার কারণে ঝুঁকে আছে সামনে, হুই আগেই জানতেন যে লুটেরারা কাজে লেগে পড়েছে, ধনীদের খালি বাসায় লুটপাট শুরু হয়ে গিয়েছে। দাসরা এখনও ওনার বাসা পাহারা দিচ্ছে নিশ্চিত, কিন্তু তারপরও স্বর্ণের লিপিগুলোর কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠলো ওনার।

"জাঁহাপনা, আমাকে একটা ঘণ্টা সময় দিন," হ্রদের পাশে ওনার বাসায় যাওয়ার গলির মোড়টার কাছে পৌঁছাতেই বললেন হুই।

"কেন, হুই?" লানন বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলেন। "এখনও অনেক কাজ বাকি, আমাদেরকে বিশ্রামও নিতে হবে। এখন কোন কাজে সময় নষ্ট করবে?"

"বাসার সবার কাছ থেকে বিদায় নেব। আমার দাসদেরকে মুক্ত করতে হবে আর আমার দামী জিনিসগুলোকে লুকিয়ে রাখতে হবে, বিশেষ করে লিপিগুলো–স্বর্ণের লিপিগুলো।"

"যা ইচ্ছা করো," মেজাজ খারাপ করেই জবাব দিলেন লানন। "তবে সময় নষ্ট কোরো না। যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে আসবে।"

বৃদ্ধ দাসরা হুইয়ের ওদেরকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারটা মানতে চাইলো না।

"এটাই আমাদের বাড়ি," তারা অনুনয় করল। "আমাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না।" আর হুই এর কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। উনি ওদেরকে রান্নাঘরে গাদাগাদি অবস্থায় রেখে বেরিয়ে এলেন, সবাই ভীত আর হতবুদ্ধি হয়ে আছে।

সাহায্যের জন্য একটা কম বয়স্ক দাসকে নিলেন সাথে, দুজনেই ওগুলোর বিশাল ওজনের নিচে কুঁজো হয়ে গিয়েছেন, হুই সেগুলো নিয়ে বাআলের

মন্দির পার হয়ে পাহাড়ের ফোঁকরটা গলে অ্যাসটার্টের গুহায় চলে এলেন। দীঘির পাশে দাঁড়িয়ে ওটার গভীরে একবার তাকালেন হুই।

"আমার জন্য অপেক্ষা করো, প্রিয়তমা," বললেন উনি। "আমারও আসতে খুব বেশি দেরি নেই। তোমার পাশেই আমার জন্য জায়গা রেখো।"

দৈবদ্রষ্টার দর্শন কক্ষটা পেরিয়ে এসে পেছনের কুঠুরিতে মন্দিরের প্রহরীদেরকে খুঁজে পেলেন হুই। ওরা সবাই খুশি হয়ে স্বাগত জানালো তাকে।

"আমরা শুনেছিলাম আপনি মারা পড়েছেন, মাননীয়।"

"আমরা কি এখনও এখানেই পাহারা দিয়ে যাবো, মহানুভব?"

"আমাদেরকে এই মন্দির থেকে ছাড়িয়ে নিন, মহানুভব। আপনার হয়ে লড়াই করার সুযোগ দিন।"

ওরা সবাই লিপিগুলোকে মাটির পাত্রের ভেতর রেখে মুখে মোহর মেরে স্বর্ণের তার দিয়ে আটকে দিতে সাহায্য করল। তারপর সেগুলোকে সংগ্রহশালার ভেতরে নিয়ে পাথরের তাকের পেছনের দিকে রেখে, সামনে বড় বড় পাত্র দিয়ে আড়াল করে দিল।

নিজের বাহিনীর চারজন কর্মকর্তা আর একশোজন সৈন্যকে নিয়ে শহর পেরিয়ে সেনা শিবিরে ফিরে এলেন হুই, মন্দির অরক্ষিত অবস্থাতেই পড়ে রইলো, লানন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বাগত জানালেন তাকে।

"আমি তো ভেবেছিলাম আর আসবে না তুমি, হুই। ভেবেছিলাম নিয়তি আমাদেরকে আবারও আলাদা করে দিল।"

"আমি আপনাকে ওয়াদা করেছিলাম, জাঁহাপনা," হুই আশ্বস্ত করলেন ওনাকে। "আপনার জন্য কী এনেছি দেখুন।" বলে ওনাকে তাঁবু থেকে মন্দিরের প্রহরীদেরকে দেখাতে নিয়ে গেলেন। ওপেটের একশোজন সেরা সৈনিক, ইয়ুয়িদের পুরো একটা দলের চাইতেও বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। লানন হেসে দিলেন।

"হুই! আমার সত্যিকার কাজের কাজী!" তারপর উনি সৈন্যদের দিকে ফিরে তাকালেন। এরা সবাই তরতাজা, সবার বর্ম চকচক করছে, ওদের মাঝে হিংস্র নেকড়েসুলভ একটা বৈশিষ্ট্য আছে যেটা হচ্ছে ওদের সাথে লাননের বাহিনীর যুদ্ধক্লান্ত বাকি সৈন্যদের মূল পার্থক্য।

লানন দলটার কর্মকর্তাদের সাথে কথা বললেন। "আপনারা থাকবেন আমার রক্ষী হিসেবে। লড়াই শুরু হলে আমার সাথে থাকবেন, আমার আর হুই বেন-আমনের আশপাশেই।" তারপর ওদেরকে পাঠিয়ে দিলেন খেয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

বিশাল চামড়ার তাঁবুটার ভেতরে বসে লানন আর হুই লড়াইয়ের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। কোন সংগঠন ধরে সৈন্য পাঠাবেন ঠিক করলেন, প্রতিটা সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা ভেবে নানা উদ্ভাবনী চিন্তা করে নিলেন, লিপিকাররা টুকে নিতে লাগল আদেশগুলো।

কর্মকর্তা আর সহকারীরা বারবার আদেশের জন্য এসে বা শত্রুপক্ষের গতিপ্রকৃতির খবর দিয়ে ওনাদেরকে বিঘ্ন ঘটাতে লাগল।

রিব-আড্ডি ওনার কথা শোনার আর্জি নিয়ে প্রবেশ করলেন তাঁবুতে, হাতে হাত কচলাচ্ছেন, কাঁপা হাতে দাড়ি ধরে টানতে টানতে ওনার হিসাব রক্ষকের সরু গলায় ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলেন উনি।

"রাজ কোষাগার, জাঁহাপনা। ওটাকে কি কোনো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া উচিত না?"

"কোন জায়গাটা নিরাপদ বলেন দেখি সেটা," খ্যাঁক করে উঠলেন লানন, একটা কাদার ছকের উপর সৈন্য সমাবেশের পরিকল্পনা করছিলেন উনি আর হুই। "বাইরের কেউই ওখানের সূর্য দরজাটার কথা জানে না। সম্পদ যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, আমরা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কেউই খুঁজে পাবে না ওগুলো।"

"রক্ষীদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে," রিব-আড্ডি হাল ছাড়লেন না। "কাজটা ঠিক–"

"আমার কথা শোনেন, বুড়ো। ওখানে যে সম্পদ আছে তা সরাতে কমপক্ষে এক হাজার লোকের দশ দিন লাগবে। আমার এখন সময় বা লোক কোনটাই অপচয়ের সুযোগ নেই। যান তো, আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দিন।"

রিব-আড্ডি চলে গেলেন, খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে। এখানে স্বর্ণ আর সম্পদের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কি থাকতে পারে?

মাঝরাতের আগে লানন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওনার ঘন সোনালি চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাতে লাগলেন, এখন অবশ্য সেখানে রূপালি আভাস। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি, দেখতে অসুস্থ্য আর অবসন্ন লাগছে।

"আপাতত এইটুকুই করতে পারি আমরা, হুই। বাকিটা দেবতাদের হাতে।" উনি হুইয়ের কাঁধে একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁবুর ঝাপটার কাছে নিয়ে গেলেন। "এক পেয়ালা ওয়াইন খাবো, হ্রদের ধারে বুক ভরে শ্বাস নেব–ঘুমাবো তারপর।"

তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন ওনারা, পান করলেন একসাথে আর হ্রদের দিকে থেকে ভেসে এল শীতল বাতাস, স্বর্ণের পতাকাদণ্ডের উপরের রেশমি পতাকাগুলো পতপত করে উড়তে লাগল তাতে।

তাঁবুর পাশেই একটা বাদামি অবয়ব কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, অন্ধকারে হুই ভেবেছিলেন একটা বিশাল কুকুর বোধহয়। কিন্তু ওনাদের কথা শুনে সেটা গাঁ ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল অবয়বটা আসলে ছোট্ট বুশম্যান শিকার-সর্দার ঝাই, আগের মতই বিশ্বস্ত, তার মালিকের তাঁবুর প্রবেশপথের সামনে শুয়ে আছে। আড়মোড়া ভেঙে ঘুম তাড়ালো সে, তারপর

লানন আর হুইকে একসাথে দেখতে পেয়ে দাঁত বের করে হাসি দিয়ে এগিয়ে এসে লাননের পাশে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"আমি ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম," লানন বললেন। "কিন্তু ও বুঝছেই না। যাবে না।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন লানন। "এরও মারা যাওয়ার কোনো প্রয়োজন দেখছি না আমি, কিন্তু ওকে জোর করে খেদাই কীভাবে?"

"ওকে কোনো কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দিন," হুই পরামর্শ দিলেন আর লানন আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে।

"কী কাজে পাঠাবো?"

"দক্ষিণ উপকূলে গ্রাই-লায়ন-এর কোনো নিশানা পাওয়া যায় কিনা সেই খোঁজ করতে পাঠিয়ে দিন।"

"হ্যাঁ, এটা বিশ্বাস করবে ও," সায় দিলেন লানন। "ওকে বলো, হুই।"

ওর নিজের ভাষায় হুই ছোট্ট হলুদ লোকটাকে বুঝিয়ে দিলেন যে রাজা চাচ্ছেন আরও একবার গ্রাই-লায়ন শিকার করতে। ঝাইয়ের কুতকুতে হলুদ চোখ কুঁচকে গেল আরও, খুশিতে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকাতে লাগল ও, যে লোকটাকে দেবতা জ্ঞান করে তার সেবায় কিছু করতে পারার সুযোগ পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত।

"এখনই বেরিয়ে পড়ো," হুই বললেন ওকে। "ব্যাপারটা খুবই জরুরি।"

লাননের পা জড়িয়ে ধরলো ঝাই, মাথাটা দুই দিকে দোলাচ্ছে, তারপর ওর ঘুমানোর মাদুরটা গুছিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল শিবিরের ছায়ার ভেতর। ও চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ দুজন কোনো কথা বললেন না। অবশেষে লানন বললেন, "দৈববাণীর কথা মনে আছে, হুই?"

হুই মাথা ঝাঁকালেন, তানিথের কণ্ঠেই ওনার মনে পড়ল কথাটা।

"আমার পরে ওপেটে রাজত্ব করবে কে?"

"গ্রাই-লায়নকে বধ করবে যে।"

এরপরে যে ভবিষৎবাণীটা ছিল সেটাও মনে পড়ল তার।

"আমার কোন জিনিসটাকে ভয় পাওয়া উচিত?"

"কৃষ্ণবর্ণকে।"

হুই ঘুরে উত্তর দিকে তাকালেন যেখানে বিশাল কালো জানোয়ারটা গুড়ি মেরে বসে আছে, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। লাননের চিন্তাধারাও একই দিকে চলতে লাগল।

"হ্যাঁ, হুই," বিড়বিড় করে বললেন উনি। "কৃষ্ণবর্ণ!" তারপর উনি একটানে ওনার ওয়াইনের পেয়ালাটা খালি করে পাহারার আগুনের উপর ছুঁড়ে দিলেন। স্ফুলিঙ্গের একটা ঝর্ণা যেন উড়ে গেল উপরের দিকে।

"একজন বন্ধুর হাতে," বললেন উনি, শেষ অংশটুকু মনে পড়ল ওনার। "দেখা যাক," বললেন উনি। "দেখা যাক।" তারপর উনি হুইয়ের দিকে তাকিয়ে ওনার চেহারাটা খেয়াল করলেন।

"আমাকে মাফ করো বন্ধু। আমি আসলে তোমার দুঃখের আগুনে আরও ঘি ঢালতে চাইনি। আমার তোমাকে ওই মেয়েটার কথা মনে করিয়ে দেওয়া মোটেও উচিত হয়নি।"

হুইও ওনার ওয়াইনে শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা আগুনের উপর ফেলে দিলেন। ওনাকে তানিথের কথা আলাদাভেব মনে করিয়ে দেওয়ার কিছুই নেই, ও সর্বদাই ওনার চিন্তায় থাকে।

"চলুন বিশ্রাম নেই," বললেন হুই, যদিও শোকে কাতর হয়ে আছে চেহারা।

চেঁচামেচি আর শিঙ্গার আওয়াজে ঘুম ভাংলো হুইয়ের, উঠেই প্রথম চিন্তা মাথায় এল যে সম্ভবত শিবিরে রাতের বেলাতেই আক্রমণ হয়েছে। ঝটপট বর্ম পরে শকুন কুঠারটা তুলে নিয়ে টলতে টলতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন উনি, তখনও বুকের অংশের ফিতে বাধতে গলদঘর্ম হচ্ছেন।

রাতের আকাশ এমন একটা আলোয় আলোকিত হয়ে আছে যা দেখে ভোরের আলো বলে ভ্রম হয়, তবে আলোটা আকাশ থেকে আসছে না, আসছে উল্টো দিক থেকে–হ্রদের উপর থেকে, ওপেটের দেওয়াল আর মিনারগুলো আলোকিত হয়ে আছে তাতে।

লানন এসে দাঁড়ালেন হুইয়ের পাশে, তখন আধো ঘুমে আছেন, বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরতে পরতে গালাগাল করছেন সমানে।

"কী ব্যাপার, হুই?" জানতে চাইলেন উনি।

"জানি না," সায় দিলেন হুই, ওনাদের সামনেই অদ্ভুত আলোটা ধীরে ধীরে আরও উজ্জ্বল হতে লাগল, একসময় দুজন দুজনকে একদম স্পষ্ট দেখতে পেতে লাগলেন সেই আলোয়।

"বন্দর!" বললেন হুই, অবশেষে বুঝতে পেরেছেন উনি। "নৌ বহর। মহিলারা।"

"দয়ালু বাআল," দম আটকে বললেন লানন। "চলো!" বলে ওনারা দুজনেই দৌড়ে গেলেন সেদিকে।

মানাতাসসি সৈকতের জাহাজগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার আগেই ওগুলো থেকে 'বাআলের আগুনের' নলগুলো খুলে নিয়েছিল। তারপর সামান্য পরীক্ষণের মাধ্যমেই শিখে নিয়েছে যে কীভাবে কাজ করে সেটা। খুবই সহজ একটা প্রক্রিয়া, মূলত নির্ভর করে স্রোত আর বাতাসের দিকের উপর। নলগুলোকে ডাঙা দিয়েই বয়ে নিয়ে এসে আটককৃত একজোড়া মাছ ধরার নৌকার সামনের দিকে লাগিয়ে নিয়েছে ও, নৌকাগুলোর দাস কর্মীরা ছিল দক্ষ নাবিক, মানাতাসসির সাথে যোগ দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল ওরা।

ডাঙার উপরের বাতাস ওর উদ্দেশ্য সফল করার জন্য একেবারে মানানসই হয়ে দেখা দিল, নৌকাগুলোকে নীরবে ওপেটের বন্দরের মুখের

কাছে নিয়ে এল ওরা। মানাতাসসি নিজেও এসেছে একটা নৌকায় আর এখন দাঁড়িয়ে আছে নৌকার পেছনের দিকে, পরনে চিতাবাঘের চামড়ার আলখাল্লা, হিংস্র আর ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পিচকারি থেকে জিনিসটা কীভাবে বাতাসের ঝাপটায় দুলতে থাকা পানির উপরে গিয়ে পড়ে সাথে সাথেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে।

বাতাসে বাহিত হয়ে আগুনের শিখা একটা নিরেট দেওয়ালের মত করে ধেয়ে গেল বন্দরের উপর, জলপ্রপাতের মত শব্দ হতে লাগল তা থেকে আর আকাশ আলোকিত হয়ে গেল নকল ভোরের আলোয়।

হুই জেটিতে লাননের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। লম্বা, হলুদ আগুনের শিখা দিয়ে ঘিরে আছে বন্দরের পুরো জায়গাটা, ক্ষুধার্তভাবে গর্জন করছে, কালো ধোঁয়ার মেঘ তারোকজ্জ্বল আকাশকে ঢেকে দিয়ে পুরো শহর জুড়ে কুৎসিত দুর্গন্ধের ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছে।

হাব্বকুক লালের জাহাজগুলো আগুনের সমুদ্রের মাঝে দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজের উপরিভাগ ওপেটের সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা আর বাচ্চা দিয়ে ভরা, অগ্নিশিখার মৃদু গর্জনের উপর দিয়ে ভেসে আসছে তাদের সমবেত আর্তচিৎকার।

উপকূলের দর্শকদের পক্ষে তাদের পলায়নের কোনো ব্যবস্থা করার সুযোগ ছিল না, দুই পক্ষই অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলো উভয়ের দিকে আর বন্দরের গলিগুলো থেকে নিম্নশ্রেণীর যাদেরকে জাহাজে উঠতে বাঁধা দেওয়া হয়েছিল তারা টিটকারি মূলক শব্দ করে খল খল করে হাসতে লাগল।

প্রথমে জাহাজের কাঠের খোল আর নোঙ্গরের দড়িতে ধরলো আগুন, তারপর দৌড়ে উঠে যেতে লাগল উপরে–লোকে ভরপুর জাহাজের পাটাতনের দিকে।

একটা পোড়া লাকড়ির উপরের পিঁপড়ার মত, দিগ্বিদিক ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কি শুরু করল জাহাজের সবাই, ধীরে ধীরে আগুনের চক্রটা ঘিরে ধরলো তাদেরকে আর সবার গায়ে আগুনের আঁচ লাগতে লাগল।

একটা জাহাজ ভাসতে ভাসতে উপকূলের দিকে আসতে শুরু করল। নোঙরের দড়ি পুড়ে ছিঁড়ে গিয়েছে ওটার, বাতাসের ধাক্কায় মুখ ঘুরে গিয়ে হালকা দুলছে, মাস্তুল আর পালের দড়াদড়ি রূপায়িত হয়ে আছে হলুদ আগুনের শিখায়। জাহাজের পেছনের দিকের উঁচু থাকার জায়গাটায়, একসাথে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে হেলাঙ্কা আর ইমিলচি–লানন হাইকানাসের যমজ কন্যাদ্বয়, ওদের সোনালি চুল আগুনের আলোয় চকচক করছে।

জাহাজটা নদীর ধারের পাথরের দেওয়াল স্পর্শ করার আগেই, আগুনের শিখা ঘিরে ধরলো জায়গাটাকে আর মেয়ে দুটো নাই হয়ে গেল।

মানাতাসসি জুলজুল চোখে দেখতে লাগল সবকিছু, আগুনের শিখা ওই হিংস্র চোখজোড়ায় ঝিলিক দিয়ে উঠছে। আগুন নিভে গিয়ে যখন জাহাজের শুধু পুড়ে ছাই হওয়া খোলটা ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল তখন ও নিজের লোহার হাতটা আদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে উপরে তুললো। মাছ ধরার নৌকা দুটো মাথা ঘুরিয়ে ফিরে যেতে লাগল আবার, বাতাসের কারণে দুটোই খুব কাছাকাছিই থাকছে, যাচ্ছে উত্তরের দিকে–যেখানে ভোরের আলোয় মানাতাসসির বাহিনী একটা ঘুম ভাঙা দানবের মতই নড়া-চড়া করছে।

]



শেষ লড়াইটা এরকম মেজাজেই হওয়া উচিত, দুঃখবোধ আর রাগের চমৎকার একটা মিশ্রণ, লাননের পাশে পাশে সৈন্যদলের সারির ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথাটা ভাবলেন হুই।

সূর্য উঠে গিয়েছে, সমতলের ফ্যাঁকাসেবাদামি ঘাসের উপরে লম্বা লম্বা ছায়া ফেলছে রোদ। ওনাদের বামে ছড়িয়ে আছে হ্রদের ঝকঝকে নীল রূপ, সকালের হাওয়ার তোড়ে জায়গায় জায়গায় জমে আছে সাদা ফেনা। জল মুরগিগুলো পানির কাছাকাছি ইংরেজি ভি অক্ষরের মত করে উড়ে যাচ্ছে, মেঘহীন নীল আকাশের পটভূমিতে ধবধবে সাদা লাগছে সেগুলোকে। ওনাদের বাম দিকে উঠে গিয়েছে পাহাড়ের বন্ধুর এবড়ো-খেবড়ো পথ, গোলাপি আর লালচে আভা সেখানে, চূড়ায় গাঢ় সবুজ বনভূমি।

হুই, হ্রদ আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, এগুলো এখন ওনার দৃষ্টিতে শুধু সেনাদলের পার্শ্বভাগকে অবস্থান নেওয়ানোর জায়গা।

সামনেই, দেওয়ালের সামনের জায়গাটা উন্মুক্ত, নিচু ঝোপঝাড় আর সামান্য কয়েকটা বিশাল ছায়াদায়ী গাছ আছে সেখানে। জায়গাটা এমন খোলামেলা যে ওনাদেরকে ভড়কে দেওয়ার মত কিছু এখান দিয়ে উদয় হওয়া সম্ভব না। খুবই নিচু কিছু ঢিবির মত আছে অবশ্য, একটা শান্ত সাগরের ঢেউয়ের মত দেখতে লাগে ওগুলো।

ওনাদের পেছনে শহরের নিম্ন অঞ্চলের দালান কোঠা আর রাস্তা–ছোট ছোট কাদার দেওয়াল আর সমতল ছাদের একটা গোলক ধাঁধা সেটা, তার পেছন দিকে উঠে গিয়েছে মন্দিরের প্রকাণ্ড পাথরের দেওয়াল, সবকিছুর উপরে দেখা যাচ্ছে সূর্য মিনারের চূড়াগুলো।

জায়গাটা আসলেই শেষ লড়াইটা লড়ার জন্য খুবই ভালো–সরু সম্মুখভাগ সাথে শক্ত পার্শ্বদেশ আর পিছু হটতে চাইলেও আছে খোলা জায়গা।

লানন সৈন্য সারির মাঝ দিয়ে হেঁটে গেলেন। ওনার প্রতি পদক্ষেপে একটা চাঞ্চল্য আর উদ্দেশ্য ফুটে উঠতে লাগল কিন্তু অবসন্ন আর শোকে কাতর চোখের দিকে তাকালে সেটা আবার ভ্রান্তি বলে মনে হচ্ছে; এটা এমন একজন লোকের চেহারা যে তার পুরো পরিবারকে আগুনে পুড়ে মারা যেতে দেখেছে কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারেনি। হুই হাঁটছেন ওনার এক কদম পেছনেই, বিশাল পাজোড়া দিয়ে কাঁকড়ার ভঙ্গিতে এগোচ্ছেন, যা এদের সবার কাছেই অতি পরিচিত। শকুন কুঠারটা কাঁধে, ওনার বাঁকা পিঠের আদলে তৈরি–নিখুঁতভাবে পালিশ করা বর্মটা সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে। ওনার পেছনে এগোচ্ছে বাকমোর আর কয়েকজন কর্মকর্তা।

সৈন্যদলকে যুদ্ধের সজ্জায় সংগঠিত করে রাখা হয়েছে, হুই ওদের অবস্থানে কোনো ভুল বের করতে পারলেন না। হালকা অস্ত্রধারীদেরকে দিয়ে একটা আড়াল তৈরি করা হয়েছে, প্রত্যেকে এক গুচ্ছ বর্শা আর সাথে অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে প্রস্তুত। তাদের পেছনেই আছে ভারি অস্ত্রধারীরা, বিশালদেহী লোক এরা, যুদ্ধ কুঠার আর লম্বা লম্বা বর্শা তাদের সাথে, সারা শরীরে ভারি বর্ম, এই লোকগুলো হলো বাহিনীর মেরুদণ্ড। প্রবল চাপের মুখোমুখি হলে, হালকা অস্ত্রধারীরা এদের পেছনে আশ্রয় নিতে পারে, শত্রুদল তখন এদের কঠিন বর্মের উপর শক্তি ক্ষয় করতে থাকে।

সবার পেছনে আছে তীরন্দাজের দল। বড় বড় পাথরের চাঁই-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে তারা, সেখান থেকে সামনের অস্ত্রধারী সৈন্যদের মাথার উপর দিয়ে সহজেই তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারবে।

ওদের পেছনে আছে অস্ত্র বহনকারী লোকরা–নতুন নতুন বর্শা আর তীর হাতে প্রস্তুত, সাথে আছে ঠান্ডা মাংস আর ভুট্টার পিঠা, পানি আর ওয়াইনের জগ, অতিরিক্ত শিরস্ত্রাণ, তরবারি আর কুঠার, আরও জিনিসপত্র যেগুলো যুদ্ধের সময় খরচ হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়।

প্রথমে লানন সৈন্যদলের মাঝে চুপচাপই হেঁটে বেড়ালেন। সৈন্যরা সবাই আরামে দাঁড়িয়ে, অস্ত্রের উপর ভর দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। অনেকেরই মাথার শিরস্ত্রাণ খোলা, অনেকেই শেষ বারের মত মুখ ভরে খাবার চিবোচ্ছে, তবে সবারই চেহারা শান্ত নির্বিকার–যেন ওরা বহুবার যমদূতের সাথে হাঁটাহাঁটি করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তার সবগুলো চ্যালা চামুণ্ডার চেহারা চেনে, এমনকি তার নিঃশ্বাসের ঘ্রাণ সম্পর্কেও জানে। এদের অনেকের গায়েই যমদূতের নখরের সাম্প্রতিক আঁচড়ের দাগ বিদ্যমান, কিন্তু চেহারায় ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, চোখেও নেই তার কোনো ছায়া।

ওদের স্থির দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হুইয়ের নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হতে লাগল, গর্বে বুকটা ভরে গেল যখন ওদের একজন ওনার দিকে তাকিয়ে, হেসে বলে উঠলো, "আপনার কথা অনেক মনে পড়তো, মহানুভব।"

"আবার ফিরতে পেরে ভালো লাগছে অনেক," হুই বললেন ওকে, যারা ওনার কথাটা শুনলো তাদের মাঝে কথাটায় সম্মতি দিয়ে শোরগোল উঠে গেল। হুই এগিয়ে গেলেন, ওনার পেছন পেছন উদ্দীপনার ঢেউ উঠলো একটা।

হালকা হাসি ঠাট্টা শুরু হলো, লানন আর তার কর্মকর্তারাও যোগ দিলেন তাতে।

"আমাদের জন্যেও শত্রুদের দুই একজনকে রাখবেন, সূর্যের পাখি," একজন সাদা চুলের বুড়ো সেনাপতি চিৎকার করে বলে উঠলেন।

"আমার মনে হয় আমাদের সবার জন্যেই যথেষ্ট আছে," হুই ওনার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলেন।

"শত্রু অনেক বেশি নাকি?" আরেকটা কণ্ঠ ডেকে উঠলো।

"যথেষ্ট না," এবার জবাব দিলেন লানন। "কারণ যারা আমাদের বিরোধিতা করছে তাদের কারো নাম বেন-আমন না।"

তুমুল আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠলো সবাই, সেটা ছড়িয়ে গেল পাহাড়ের সারি ধরে হ্রদ পর্যন্ত। ওনারা এরপর পাহাড়ের সারির মাঝের একটা উচ্চভূমির দিকে এগোনো শুরু করতেই নতুন নতুন শব্দ আর চিৎকার শোনা যেতে লাগল, ওখান থেকে তারা পুরো মাঠের সবদিকে নজর রাখতে পারবেন।

সবার মাথার উপরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে পতাকাদণ্ডগুলো, ঝকঝকে সোনালি আর রংচঙে রেশমি পতাকায় সুশোভিত হয়ে, তাদের পেছনেই আছে মন্দিরের প্রহরী একশো সৈন্য। হুই অনেক চিন্তা ভাবনা করে সাজানো দলগুলোর দিকে তাকালেন, ওদের শিরস্ত্রাণ আর অস্ত্রের উপর ঝলসাচ্ছে রোদ, ওনার মনে হলো যে শেষ লড়াইটা লড়ার জন্য এরাই সবচেয়ে ভালো সৈন্য, মারা যাওয়ার জন্য এরাই সবচেয়ে ভালো সঙ্গী।

উনি শিরস্ত্রাণটা আলগা করে মাথা থেকে খুলে ফেললেন, তারপর হাত বাঁকা করে ধরে রইলেন সেটা।

"ওয়াইন দাও দেখি!" ডাক দিলেন উনি, রসদবাহী ছেলেগুলো পাই পাই করে ছুটে এল ওয়াইনের জগ আর পেয়ালা হাতে। এগুলো হচ্ছে হুইয়ের নিজস্ব সংগ্রহের মাঝের সেরাটা, ঘন আর রক্তের মতই লাল–যে জিনিসটা একটু পরেই এই প্রান্তরকে রঞ্জিত করে ফেলবে।

হুই পেয়ালাটা তুলে ধরে ওনার কর্মকর্তাদেরকে সম্মান দেখালেন, তারপর ঘুরে তাকালেন লাননের দিকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন দুজন দুজনের দিকে।

"উড়ে যাও, আমার সূর্যের পাখি," নরম গলায় বললেন লানন।

"গর্জে ওঠেন, ওপেটের সিংহ," হুই জবাব দিলেন, ওনারা পেয়ালা খালি করে আছাড় মেরে সেটাকে ভেঙে ফেলে শেষবারের মত একসাথে হেসে

উঠলেন। ওনাদের আশপাশের সবাই শুনলো সেই হাসির শব্দ, সেখান থেকে সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দিকে তাকালো তারা।

উজ্জ্বল আর উষ্ণ সকালটার মাঝামাঝি সময়ে উপস্থিত হলো মানাতাসসি। ওর সম্মুখ বাহিনী হ্রদের উপকূল থেকে শুরু করে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পুরো সমতল ছেয়ে ফেলল। প্রায় ৫০০,০০০ কণ্ঠে গর্জন করতে করতে এগিয়ে এল ও, সেই সাথে নগ্ন পায়ের ছন্দবদ্ধ পদশব্দ আর রণ হুংকার বজ্রপাতের আওয়াজের মত করে ছড়িয়ে পড়ল পুরো আকাশ জুড়ে। সুসংগঠিত সারি করে এগিয়ে এল ওরা, প্রতি সারির মাঝে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যাতে প্রত্যেকে অস্ত্র চালনার সুযোগ পায়, তবে পেছনের সারি সামনের সারির উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে এগোচ্ছে, সারির মাঝের যে কোনো ফাঁক পূরণ করে ফেলার জন্য সদা তৎপর, একটা কঠোর নিরবিচ্ছিন্ন সম্মুখভাগ দেখানোর জন্য উদগ্রীব।

সারির পর অগণিত সারি সাথে করে এগিয়ে এল মানাতাসসি, ওদের আগমন যেন শেষই হচ্ছে না, ক্রমেই ওদের চিৎকার আরও গভীর এবং প্রলয়ঙ্কর লাগতে লাগল।

ওরা এগিয়ে এল ঝড়ো মেঘের ছায়ার মত করে, জমিনের উপর প্রকাণ্ড আকারে আর ধীর গতিতে, রাতের মত অন্ধকার হয়ে আর মাঠের ঘাসের মত অগণিত সংখ্যায়, ওদের চিৎকার আরও বেশি অশুভ আর কর্কশ হয়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে।

হুই আবার তার শিরস্ত্রাণ পরে, শক্ত করে বেঁধে নিলেন ফিতে। তারপর শকুন কুঠারটা থেকে চামড়ার খপটা খুলে নিয়ে মানাতাসসির অগ্রযাত্রা দেখতে লাগলেন, ল ক্ষ লক্ষ চলমান পায়ের উপর ভর করে এগিয়ে আসছে ও, যেন একটা প্র ংগং কালো জানোয়ার যার পিঠের উপর পালকের তৈরি অসংখ্য শিরস্ত্রাণ বসি য়ে দেওয়া হয়েছে, বর্শার ডগাগুলো দেখে মনে হচ্ছে কালোর ভেতরে ফুটে আছে অসংখ্য পোকার চোখ।

উনি ওন র সমগ্র জীবনে পূর্ণ শক্তিসহ মানাতাসসির এই দৃশ্যের মত কিছু অবলোকন করেননি। জীবনের শেষ লড়াইটার জন্য এটাই উপযুক্ত প্রতিপক্ষ, মনে মনে ভাবলেন উনি, কারণ এরকম কারো কাছে পরাজিত হওয়ার মাঝে কোনো অগৌরব নেই।

মানাতাসসি ইচ্ছে করে হুইয়ের বসানো চিহ্নগুলো পেরিয়ে এল, মাঝখানে কতটা জায়গা ফাঁকা থাকছে সেটা মাপার জন্য বসিয়েছিলেন উনি ওগুলো; ২০০ পেস, ১৫০ পেস–লক্ষ লক্ষ আগুয়ান পায়ের ধাক্কায় ধুলো উঠে আগুন-সোনালি রঙের মেঘের মত করে ভাসতে ভাসতে ওদেরকে ঢেকে দিল। আর ওই চলমান মেঘের আড়াল থেকে ওদের বের হওয়া দেখে মনে হতে লাগল এদের বুঝি শেষ নেই কোনো।

হুই টের পেলেন ওনার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, টানটান শরীরের মাঝে প্রবল বেগে ছুটতে শুরু করা রক্তপ্রবাহও অনুভব করতে পারলেন। শকুন কুঠারটা উপরে তুলে ধরলেন উনি, তারপর ডান আর বামে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে দুই পাশের তীরন্দাজদের অধিনায়ক স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সংকেতটা।

একশো পঞ্চাশ পেসও পেরিয়ে কালো স্রোতটা ধেয়ে এল ওনার দিকে, ওদের কোরাসের সুরও বদলে গেল এবার, আস্তে আস্তে বাড়ছে, রক্তের ভেতরে ঢুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে তা, প্রবল উলুধ্বনিটা হুইয়ের শোনা যে কোনো রক্ত হিম করা শব্দের চাইতেও বেশি শীতল। টের পেলেন যে ওনার হাত আর ঘাড়ের পেছনের চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, পাকস্থলি মনে হলো মোচড় দিয়ে শরীরের বাইরে বের হয়ে চলে গেল।

ওরা এগিয়ে এল ঐকতানে, কাঁপাতে কাঁপাতে, পা ফেলতে ফেলতে, ঢালের উপর বর্ম দিয়ে বাড়ি দিতে দিতে, শিরস্ত্রাণ একবার উঠছে আবার নামছে, হুই ওনার কুঠার মাথের উপরে তুলে রেখেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

একশো পেস পার হওয়ার পর হুই ওনার কুঠার নামিয়ে আনলেন, সাথে সাথে বাতাস ভরে গেল হালকা শিষের মত শব্দে, সন্ধ্যার সময় বুনো হাঁসের পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ যেরকম হয় অনেকটা সেরকম।

তীরগুলো আকাশপানে ছুটে গিয়ে বাঁকা হয়ে পঙ্গপালের ঝাঁকের মত আকাশ অন্ধকার করে গিয়ে পড়ল ওদের উপর, আর্তনাদ ভেসে এল কালো অবয়বগুলোর মাঝ থেকে, তবে সেটা আহত জানোয়ারের আর্তনাদ, কিন্তু দেখা গেল ওরা আগের গতিতেই বর্শাধারীদের দিকে এগিয়ে আসছে, যেন গায়ে আচড়টাও লাগেনি এমনভাবে ওদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল কারণ সামনের ফাঁকা স্থানটা সাথে সাথে পূরণ হয়ে যাচ্ছিল আর যে পড়ে যাচ্ছে সে উপর দিয়ে ধাবমান এই বিপুল মানুষের নিচে আড়াল হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে।

হুইয়ের হালকা অস্ত্রধারীরা নিমেষেই উড়ে গেল এই প্রকাণ্ড অগ্রযাত্রার সামনে, ওদের পেছনের ভারি অস্ত্রধারীদের পেছনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো, মানাতাসি প্রবল চাপ সৃষ্টি করল হুইয়ের সামনের দলের উপর।

দেখে মনে হচ্ছিল যে কোনো কিছুই আটকাতে পারবে না এই যাত্রা, ওদের চাপটা ছিল প্রচণ্ড জোরালো, বিশাল জায়গা জুড়ে, একযোগে আর প্রবল শক্তি দিয়ে। নিশ্চিত উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণধারীদেরকে ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে যাবেই এটা।

তারপর অবিশ্বাস্যভাবে দেখা গেল কালো ঢেউটা আর সামনে এগোতে পারছে না, নদীর পানিতে কাঠের টুকরো জড়ো হওয়ার মত নিজের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। যে দলগুলো পেছন থেকে চাপ সৃষ্টি করছে সেগুলোর

চাপে সামনের দলের লড়াই করার জায়গা কমে যেতে লাগল, ফলে এখন ঝামেলায় পড়ে গেল ওরাই, ধাক্কায় না চাইতেও হুইয়ের সম্মুখ দলের বর্শা দিয়ে তৈরি করা প্রতিরক্ষা ব্যূহ-এর চোখা মাথার এসে পড়তে লাগল।

আচমকাই আবার পিছু হটতে লাগল সবাই, একটা ঢালু সৈকত থেকে যেভাবে স্রোত নেমে যায় ঠিক সেভাবে।

সাথে সাথে বর্শাধারীরা ভারি অস্ত্রধারীদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চাতপসরণকারীদেরকে ধাওয়া করতে লাগল, ওদের অধিনায়কদের চিৎকার স্পষ্টভাবে ভেসে আসতে লাগল হুইয়ের কানে, ওরা সবাই ডেকে ডেকে সৈন্যদের সারি ঠিকঠাক করছে।

"এখানে কাছিয়ে আসো?"

"বর্শাধারীরা এদিকে!"

"ফাঁকাটা পূরণ করো!"

"এদিকে আসো! এদিকে!"

মানাতাসসি পিছিয়ে গিয়ে সংগঠিত হলো আবার, তারপর একটা ফুঁসে ওঠা ঢেউ-এর মত ধেয়ে গেল সামনে, কিন্তু আটকে গিয়ে প্রবল বেগে চাপ সৃষ্টি করত লাগল, একগজ মত জায়গা দখল করে আবার পিছিয়ে গেল, আবার সংগঠিত হয়ে, আবার সামনের দিকে এগোনোর ভরবেগ অর্জন করার পর আরও একবার হুইয়ের সম্মুখভাগে আছড়ে পড়ল।

দুপুরের দিকে লানন আর হুই তাদের দেখার জায়গাটা থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হলেন, কারণ তখন তাদের পায়ের কাছে এসে পড়েছে লড়াই। পতাকা দণ্ডগুলো পিছিয়ে আনা হয়েছে।

দুপুরের এক ঘণ্টা পরে, হুই তার সঞ্চয়ে থাকা সর্বশেষ দলটাকে সামনে বাড়ার আদেশ দিলেন, শুধুমাত্র মন্দিরের প্রহরীরাই ওনার হাতে থেকে গেল তখন, যুদ্ধের পতাকার আশপাশে জড়ো হয়ে আছে তারা। এখনও ওই কালো ঢেউ ওনাদের উপরে এক ভয়ানক অপরিবর্তিত ছন্দে আক্রমণ করেই যাচ্ছে, ঠিক সমুদ্রের উপরিভাগ ফেঁপে ওঠার মত করে।

হুই খুব আস্তে আস্তে মানাতাসসিকে জায়গা ছাড়তে লাগলেন, প্রতিবার একটু করে পিছিয়ে আসছেন শুধু তার সারিটাকে আবার পুনর্গঠিত করার জন্য। এখন পর্যন্ত ওটা সুন্দরমতোই পুরোটা ছড়িয়ে আছে, প্রতিবার মনে হচ্ছিল এবারই বুঝি কালো ঢেউটা ছিন্ন করে ফেলবে ওটাকে, কিন্তু এখন পর্যন্ত টিকে আছে সেটা।

তারপর তারা পৌঁছে গেলেন নিচের শহরে, শহরের গলি ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন, যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণের আর কোনো উপায়ই রইলো না হুইয়ের কাছে। শুধু একটা সরু গলি দেখতে পেতে লাগলেন যেখানে সৈনিকেরা জট পাকিয়ে কালো যোদ্ধাদের একটা অবিচল আক্রমণকে আটকে রেখেছে।

দিনে প্রথমবারের মত হুই যুদ্ধে নামতে বাধ্য হলেন। বুনো দৃষ্টির একটা ছোট্ট দল ওনার সামনের সারিটা ছিন্ন করে এগিয়ে এল; ঘাম আর রক্তে চকচক হয়ে আছে ওরা, চেহারায় সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া, দেখতে অসুরিক আর অবাস্তব মনে হচ্ছে।

হুই চট করে কল্লা নামিয়ে দিলেন সবগুলোর, মন্দিরের প্রহরীদের একটা দলকে আদেশ দিলেন ওরা যে ফাঁকটা তৈরি করেছে সেখানে জায়গা নিতে।

তখনই উনি বুঝলেন যে যুদ্ধ ওনার আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছে। উনি আর লানন, ওনাদেরকে ঘিরে থাকা একদল যুদ্ধরত সৈনিকের মাঝে বন্দী হয়ে রইলেন, শুধু ওনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে এরকম যারা আছে তাদেরকেই নির্দেশ দিতে পারছেন এখন।

মাঠের দূরের প্রান্ত থেকে বিজয়ের একটা বুনো উল্লাস ভেসে এল, লানন হুইয়ের কাঁধ চেপে ধরে ওনার কানে কানে চিৎকার করে বললেন, "আমার মনে হয়ে ওরা ভেতরে ঢুকে পড়েছে।" হুই মাথা ঝাঁকালেন।

পরিকল্পিত লড়াই শেষ এখন। হুই জানেন যে ওনার সারির মাঝে সৃষ্টি হওয়া ফোঁকরগুলো দিয়ে শত্রুপক্ষ প্রবেশ করা শুরু করেছে। এখন সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। অলৌকিক কিছু আর ঘটলো না এবার–শেষ লড়াইটা হেরেই যাচ্ছেন ওনারা।

"মন্দিরের ভেতরে চলে যাবে নাকি?" লানন চিৎকার করলেন আবার আর হুইও মাথা ঝাঁকালেন। ওপেটের সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব আর নেই, এখন সেটা শুধু কয়েকশো মরিয়া লোক যারা কাঁধে কাঁধ বা পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে তাদের শেষ লড়াইটা লড়ে যাচ্ছে, এমন একটা লড়াই যেটায় আত্মসমর্পণের কোনো সুযোগই নেই, যেটা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে মৃত্যু।

মন্দিরের প্রহরীদেরকে চারপাশে জড়ো করলেন ওনারা, তারপর রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন, যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটছেন, সবাই কাছাকাছি আর হাতে হাত ধরা, শত্রুদের দিকে তাক করে রেখেছে ঢালের একটা নিবিড় বেষ্টনী।

মানাতাসসির বাহিনী এখন ঠিক পেছনেই, ওনাদের আর মন্দিরের মাঝে। নিচের শহরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা, আগুনের শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। যেসব রাস্তা ধরে হুই হেঁটে বেড়াতেন সেসবে এখন গিজগিজ করছে আতংকিত শহরবাসী আর হিংস্র রক্তে রঞ্জিত যোদ্ধার দলে। এদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে, ঢাল দিয়ে কচ্ছপের সংগঠন তৈরি করলেন ওনারা, পেছনের কালো লোকগুলোর আক্রমণ বা উপরের দিকে ছড়াতে থাকা তৈলাক্ত কালো ধোঁয়ার দুর্গন্ধ দুটো থেকেই সেটা বাঁচাতে লাগল তাদেরকে।

মন্দিরের মূল ফটকটা খোলা আর কোনো প্রহরী নেই সেখানে। রক্ষীরা পালিয়েছে, চত্বরটা খালি আর চুপচাপ। হুই দশজন লোক নিয়ে সিঁড়িতে

দাঁড়ালেন আর লানন ফটকটা লাগিয়ে দিলেন আবার, একেবারে শেষে মুহূর্তে হুই তার দশজন লোকসমেত দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেলেন ভেতরে।

রক্তাক্ত অস্ত্র হাতে বিশ্রাম করতে লাগলেন তারা, শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললেন, ঝেড়ে ফেললেন চোখের উপর জমে থাকা ঘাম।

"পূর্ব দিকের দরজা?" হুই লাননকে জিজ্ঞেস করলেন। "ওটার কী অবস্থা? ওটা আটকাতে লোক পাঠিয়েছেন?"

লানন আতংকিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ওনার দিকে, তার নীরবতাই বরং চিৎকার করে হুইয়ের কানে উত্তরটা জানিয়ে দিল।

"এই তোমরা!" হুই হাত নাড়িয়ে একদল লোককে নির্দেশ করলেন। "আমার সাথে আসো।" কিন্তু ততোক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের চত্বরের ভেতরেই ছোট দরজাটা দিয়ে স্রোতের মত ঢুকতে শুরু করেছে কালো যোদ্ধারা।

"কচ্ছপ!" চিৎকার করে বললেন হুই। "অ্যাসটার্টের গুহায় চলো।" ওনারা কচ্ছপের মত করে সংগঠিত হলেন আবারও, তারপর ধাতুর আঁশঅলা একটা আর্মাডিলোর মত করে চত্বরের ভেতরে এগোতে লাগলেন আর কালো যোদ্ধারা ছেকে ধরলো তাদেরকে, তবে খোলসটা ভেদ করতে পারলো না। জ্বলন্ত শহর থেকে ধোঁয়া উড়ে এসে জমতে লাগল, দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল ওনাদের, চোখ জ্বলতে শুরু করল।

আচমকাই হুইয়ের পাশের লোকটা আর্তনাদ করে উঠে নিজের উরু চেপে ধরলো। আঙুলের ফাঁকে চলকে উঠলো রক্ত আর হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে। ওনারা যে জায়গাটা দিয়ে আগাচ্ছিলেন সেটা কচ্ছপের মাথার আক্রমণে মারা যাওয়া যোদ্ধাদের লাশে ভরে যাচ্ছিল। ওগুলো ডিঙিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলেন ওনারা। এদের মাঝে কয়েক ডজন মারা যাওয়ার ভান করে পড়ে ছিল সেখানে, তারা আচমকা জ্যান্ত হয়ে উঠলো আবার, দ্রুত গড়ান দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে ওদের উপরে মানুষগুলোর নিচ দিয়ে তরবারি চালাতে লাগল।

হুই চিৎকার করে সাবধান করলেন, কিন্তু জলে গেল সেটা। শত্রুরা কচ্ছপের শরীরের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, এখন পায়ের উপর উঠে দাঁড়াচ্ছে, চারপাশে ধাক্কা মেরে মেরে সমান তালে তরবারি চালিয়ে যেতে লাগল তারা, ফলে হুইয়ের লোকরা বাধ্য হলো ঘুরে নিজেদেরকে রক্ষা করতে, এতে বাইরের যোদ্ধাদের দিকে ওদের পিঠ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

কচ্ছপটা এবার পরিণত হলো আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন জনতায়, কালো মানুষের ঝাঁক তাদের উপরঝাঁপিয়ে পড়ল চাক ভাঙা মৌমাছির মত।

"আমার সাথে!" হুই লানন, বাকমোর আর আরও কয়েকজনকে একত্র করলেন, তারা গাঁ ঘেঁষে ঘেঁষে থেকে এদের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়ে গেলেন গুহার ফোঁকরটার দিকে। শহর থেকে আসা ঘন আর তেল চিটচিটে

ধোঁয়াটা পেয়ে বসল ওনাদেরকে, দৌড়াতে দৌড়াতে দম বন্ধ হয়ে কাশতে আরম্ভ করলেন সবাই। হুই কুঠার চালাতে লাগলেন, কালো শরীরগুলোর মাঝ দিয়ে একটা পথ তৈরি করে নিয়ে ওনাদের পাঁচজন পৌঁছে গেলেন গুহার প্রবেশমুখে, কিন্তু বাকমোরের পাঁজর ভেদ করে একটা আঘাত লাগল। ও সেটার উপর একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে চেষ্টা করতে লাগল জীবনদায়ী রক্ত বেরিয়ে যাওয়া আটকাতে। হুই কুঠার হাত বদল করে বাকমোরকে সাহায্য করলেন সিঁড়ি বেয়ে উঠে ফোকরের মুখে পৌঁছাতে। ওর রক্তে হুইয়ের একপাশ ভিজে উষ্ণ আর চটচটে হয়ে গেল। একেবারে উপরে পৌঁছাতেই হুমড়ি খেয়ে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল বাকমোর।

"সব শেষ, মহানুভব," কোনোমতে বলল ও; হুই ওকে কোলে তুলে বের হওয়ার জায়গার কাছে নিয়ে গুহার দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

"বাকমোর," হাফাতে হাফাতে ডাকলেন উনি, তারপর ওর মাথাটা পেছনে ঠেলে চেহারার দিকে তাকালেন। বাকমোরের চোখও তাকিয়ে আছে ওনার দিকে কিন্তু সেখানে দৃষ্টি নেই–চকচক করছে মৃত চোখজোড়া। হুই সুদর্শন মাথাটাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"ওই তো ওরা আসছে," চিৎকার করে বললেন লানন, হুই কুঠারটা তুলে ধরে লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন লাননের পাশে, এদিকে দিয়ে আগুয়ান কালো শরীরের প্রথম স্রোতটাকে মোকাবেলা করার জন্য। ওনারা চারজন–লানন, হুই আর আরও দুজন সৈন্য–যথেষ্ট সময় ধরে প্রবেশপথটা আগলে রাখলেন আর ওটা মৃত যোদ্ধাদের শরীর দিয়েই বন্ধ হয়ে গেল।

এরপর এল তীরন্দাজরা আর তীরের প্রথম ঝাঁকটা ভাসিয়ে দিল প্রবেশপথটা। ওগুলোর একটা গিয়ে বিঁধলো দুজন সৈনিকের একজনের গলায়, মুখ ভর্তি কালো রক্তের দমক নিয়ে পড়ে গেল সে।

"এখানে কোন আড়াল নেই," চিৎকার করলেন হুই। "মন্দিরের ভেতরে চলুন।" তারা আবার দৌড়ে গেলেন পথটা ধরে, পরের ঝাঁকটা শিস কেটে ছুটে গেল ওনাদের মাঝ দিয়ে। একটা এসে আঘাত করল হুইয়ের শিরস্ত্রাণে, কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে পাশের দেওয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো, একটা খুঁজে নিল সর্বশেষ সৈনিকটার বুকের বর্মের মাঝের একটা ফাঁক, তার মেরুদণ্ডের হাড়ের ভেতরে গিয়ে ঢুকে গেল সেটা। পা ভেঙে পড়ে গেল সে। মরিয়া হয়ে আঙুলে হেচড়ে হুইয়ের পেছনে এগোনোর চেষ্টা করল, শুধুমাত্র হাতের শক্তিতে অবশ শরীরটা টেনে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

"দয়া করেন, মহানুভব," চিৎকার করে বলল সে, অণ্ডকোষ কেটে ফেলার ছুরির ভয়ে আছে সে, জ্যান্ত অবস্থায় নাড়িভুঁড়ি বের করে আনার কথা মনে পড়ছে তার। "আমাকে ওদের জন্য ফেলে যাবেন না, মহানুভব।"

হুই দৌড় থামিয়ে চিৎকার করে বললেন, "আপনি যান, লানন। আমি আসছি।" তারপর আবার ফিরে গেলেন পেছনে, সৈনিকটা ওনাকে আসতে দেখলো।

"বাআলের আশীর্বাদ পড়ুক আপনার উপর, মহানুভব," আর্তনাদ করে উঠলো ও, তারপর নিজের শিরস্ত্রাণ খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে দিল সামনের দিকে যাতে ঘাড়টা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

"শান্তি পাও!" হুই বললেন সৈন্যটাকে, কুঠারের এক আঘাতে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিলেন, তারপর সাথে সাথেই ঘুরে আবার শুরু করলেন দৌড়। একটা তীর এসে ওনার চোখের নিচে চেহারায় লাগল, কান পর্যন্ত চিরে গেল চামড়া, হাড়েও লেগেছে আচড়, মাংসল চামড়ায় সেটা আটকে থেকে ঝুলতে লাগল।

হুই সেটাকে টান দিয়ে ছিড়ে ফেলে লাননের পেছনে দৌড়ে গেলেন।

দুজন মিলে অ্যাসটার্টের গুহা পার হয়ে এলেন ওনারা, বদ্ধ দেওয়ালে তাদের পদশব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; নিথর সবুজ দীঘিটার কিনার পেরিয়ে, মন্দিরের দরজার কাছে পৌছাতেই তীরের পরবর্তী ঝাঁকটা এসে শিস বাজিয়ে চলে গেল তাদের আশপাশ দিয়ে। লানন সামান্য পা হড়কালেন তবে তারপরেই ওনারা ঢুকে পড়লেন মন্দিরের ভেতরে।

"এখানে আটকে রাখতে পারবো ওদেরকে?" লানন দম সামলাতে সামলাতে বললেন।

"না," হুই সামনে ঝুঁকে পড়ে দম নিতে লাগলেন। "সংগ্রহহশালায় যেতে হবে!" তারপর উনি লাননের দিকে তাকালেন। "কী হয়েছে জাঁহাপনা?"

"আমিও আঘাত পেয়েছি, হুই।" ওনার বাম বগলের কাছে বর্মের সন্ধির কাছে বেরিয়ে আছে তীরটা। ওটা ঢোকার কোণটা এমন যে দেখেই হুইয়ের সারা শরীরে হতাশার একটা শীতল অনুভূতিতে ছেয়ে গেল। তীরের মাথা নিশ্চিত হৃৎপিণ্ডের খুব কাছে চলে গিয়েছে। আঘাতটা পুরো প্রাণঘাতী, কোনো মানুষের পক্ষেই এই প্রকৃতির আঘাত সামলে ওঠা সম্ভব না।

"কী অবস্থা বলো?" লানন জানতে চাইলেন। "ব্যথা নেই কোনো, হুই। বেশি খারাপ মনে হয় না।"

"আপনি ভাগ্যবান," হুই বললেন, তারপর মট করে তীরের কাঠিটা ভেঙে ফেললেন, ক্ষতটা থেকে ছোট্ট একটা অংশ বেরিয়েই রইলো অবশ্য।

"চলুন," বললেন উনি, লাননের বাহুতে আলতো করে হাত রেখে মন্দিরের ভেতর দিয়ে সংগ্রহশালার দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন।

"সূর্য দরজা?" লানন জিজ্ঞেস করলেন।

"একেবারে শেষ মুহূর্তে," বললেন হুই। "যখন আর কোনো উপায় থাকবে না।" আর উনি লাননকে ধরে একটা পাথরের কুলুঙ্গিতে নিয়ে গেলেন।

"তোমার চেহারা।" লানন মশালের আবছায়া আলোতে হুইয়ের চেহারার বিশাল হাঁ হওয়া ক্ষতটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

"সন্দেহ নেই যে আগের চাইতে সুন্দর হয়ে গিয়েছে," ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন হুই আর নিজের জামা থেকে এক ফালি কাপড় ছিঁড়ে লাননের বাম হাতটাকে কোনোমতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন।

"এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন?" জিজ্ঞেস করলেন উনি আর লানন নিজের আঙুল নেড়ে চেড়ে মুঠ করে খুলে আর বন্ধ করে দেখে নিলেন।

"যাক," হুই মাথা ঝাঁকিয়ে ঢালের হাতলটা লাননের বাম হাতে ধরিয়ে দিলেন। হাত বাঁধা কাপড়ের ফালিটা ওটার ওজন বহন করতে সাহায্য করবে।

হুই মাথা একদিকে বাঁকিয়ে অ্যাসটার্টের মন্দিরের ভেতরের টিপে টিপে এগোনো পদশব্দগুলো, ফিসফাস গলার আওয়াজ আর অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন।"ওরা আসছে," বললেন উনি। "রাস্তাটা খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগবে না।"

বলতে বলতেই ওদের প্রথমজন প্রহরীর কক্ষ থেকে ঢোকার জায়গাটা দিয়ে প্রবেশ করে সংগ্রহশালার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলো। দেওয়ালের বন্ধনীতে আটকানো ধোঁয়ায় ভরা মশালের মিটমিটে আলোয় লোকটার আকার প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। লোকটা বিশাল আর কালো, তেল আর রঙ মেখে চকচক করছে গা, ওর গায়ের গন্ধও পেতে লাগলেন হুই–একটা উষ্ণ কস্তুরির ঘ্রাণ, যেমনটা পাওয়া যায় শিকারি বিড়ালের গায়ে।

হুই কুলুঙ্গিটা থেকে বেরিয়ে আলোয় এসে দাঁড়ালেন, তারপর ভেন্ডিতে চিৎকার করে আহ্বান করলেন তাকে। যোদ্ধাটা পথটা ধরে দুদ্দাড় পায়ে দৌড়ে এল হুইয়ের দিকে, তাদের ঢালে ঢালে সংঘর্ষ হতেই প্রচণ্ড ধাতব শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা মন্দির জুড়ে।

হুই টের পেলেন বর্শার ফলা ওনার শরীরের পাশে চেপে বসছে, কিন্তু শকুন কুঠারেরে ডগার চোখা মাথাটা আরও গভীরে কামড় বসিয়েছে প্রতিপক্ষের গায়ে, হাড় স্পর্শ করে ফেলেছে আর যোদ্ধাটা সব ছেড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

লানন খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসে হুইয়ের বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন; তারপর তখনও মোচড়াতে আর কাঁপতে থাকা লাশটা পেরিয়ে এসে, পথটা ধরে পাশাপাশি এগিয়ে গেলেন ধেয়ে আসতে থাকা কালো শরীরের স্রোতের মোকাবেলা করতে।



মানাতাসসি দাঁড়িয়ে আছে অ্যাসটার্টের মন্দিরের ভেতরে। মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু তখনও প্রচুর মশাল জ্বলছে আর সব জায়গা গিজগিজ করছে যোদ্ধায়, এত বেশি যে মানাতাসসি আদেশ দিয়েছে ভবনটার ভেতরের দেওয়ালটা ভেঙে ফেলতে যাতে সবাই সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে।

ওই অন্ধকার, অশুভ দেখতে পাথরের মুখ যা এর মাঝেই ওর অসংখ্য লোককে গিলে খেয়েছে, ওখানেই ওপেটের দুজন যুদ্ধরত শয়তান তখনও আটকে আছে, ওনাদেরকে ওখান থেকে বের করার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে ওর। এখনও ওর লোকজন মৃত আর মারাত্মক আহতদেরকে প্রবেশপথের কাছ থেকে টেনে সরিয়ে আনছে। এদের একজনকে দেখা গেল ডান হাতের কনুই-এর কাছ থেকে নেই। ও কাটা হাতটা ধরে আছে, কিন্তু কোনো শব্দ করছে না, মশালের আলোয় তার চোখগুলো বড়বড় আর ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছে।

মানাতাসসি খুব ভালোই জানে যে কোন অস্ত্রটা এই ক্ষতটা করেছে, ওর রাগ আর ঘৃণার আগুন আরও বেশি বেশি গনগন করে উঠলো তাতে, যে কুসংস্কারচ্ছন্ন ভয়টা ওকে চেপে ধরছিল সেটার সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

যখন দাস হিসেবে এখানে ছিল তখন ওপেটের দেবতাদের বিপুল শক্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল ও, তাদের অপরিমেয় শক্তি আর নিষ্ঠুরতার কথাও জানে। ও ভয় পায় তাদেরকে, খুব ভালো মতই জানে যে এখন দাঁড়িয়ে আছে ওই ভয়ানক দেবতাদের শক্তি কেন্দ্রে, তাদের পবিত্র স্থানে।

ওর মনে পড়ল অ্যাসটার্টের মন্দিরের পেছনে, মাটির নিচের একটা জায়গার কথা শুনেছিল ও, একটা মরণ বাণ দিয়ে নাকি সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে জায়গাটাকে।

বোঝাই যাচ্ছে যে ওই দুজন এই জন্যেই এখানে আশ্রয় নিয়েছে, এই অন্ধকার গর্তে।

ওর রাগ পড়ে গেল, ধর্মীয় সম্ভ্রমের কারণে শীতল হয়ে গেল মেজাজ। ও জানে যে শ্বেতাঙ্গ দেবতারা দেখছে ওকে। সবকিছুকে এখনই শেষ করে দিতে ইচ্ছে হলো ওর, এই জায়াগাটাকে ধ্বংস করে দিয়ে চলে যাবে এখান থেকে–কিন্তু দুজন দুর্ভাগা কিন্তু একগুঁয়ে লোক কলা দেখাচ্ছে এখনও।

"আগুন লাগাও!" বলল ও। "বুনো কুত্তার মত ধোঁয়া দিয়ে গর্ত থেকে বের করে আনো ওনাদেরকে।"

ওরা সুড়ঙ্গে ঢোকার মুখে আগুন জ্বাললো, তরতাজা ডালপালা ঠেসে দিল তাতে–ঘন গন্ধযুক্ত ধোঁয়ায় ভরে গেল মন্দির আর সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখ থেকে সরে গেল ওরা, ধোঁয়ায় দম আটকে কাশছে সবাই। তবে অস্ত্র তুলে ধরে প্রস্তুত হয়ে থাকলো, কারণ ভালোমতোই জানে যে কোনো মানুষের পক্ষে এর ভেতরে থাকা সম্ভব না। এবার ওনারা বেরিয়ে আসবেনই নিশ্চিত–কিন্তু ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও ধোঁয়ার ভেতরে কোনো নড়া-চড়া দেখে গেল না।

আগুন জ্বলতে জ্বলতে পোড়া কয়লা বাদে রইলো না আর কিছু, ধোঁয়াও কেটে গেল একসময়, মানাতাসসি আদেশ দিল দীঘি থেকে পানি এনে ছিটিয়ে দিতে। কাজ সেরে আবার ওরা তাকিয়ে রইলো অন্ধকার রাস্তাটার দিকে। ওখান থেকে তখনও ধোঁয়ার চিকন ধারা বেরিয়ে আসছে।

সংগ্রহশালার মেঝে তখনও ছেয়ে আছে মরা লাশে, কিন্তু জীবনের কোনো চিহ্ন নেই সেখানে।

মানাতাসসি বহু কষ্টে নিজের ধর্মীয় ভীতিকে দমিয়ে আচমকা ওর একজন যোদ্ধার হাত থেকে মশাল ছিনিয়ে নিল। তারপর সেটা মাথার উপরে তুলে ধরে, গরম জ্বলন্ত কাঠের টুকরো গুলো পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলো সংগ্রহশালার ভেতরে।

লাশের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে যেতে লাগল ও, পুরো মেঝে রক্ত জমে আঠালো আর চটচটে হয়ে আছে, ওর নগ্ন পায়ে আটকে যেতে লাগল তা। মশাল থেকে হলুদাভ আলো বেরিয়ে প্রতিটা পাথরের কুলুঙ্গির ভেতর পড়ছে, সেগুলোর সবগুলো তাক ভরা। মানাতাসসি জানে যে এই মাটির তৈরি পাত্রগুলোয় কি আছে। ও নিজেও মাঝে মাঝেই হুইকে লিপি লেখায় সাহায্য করতো।

ও এখন হুইয়ের নিশানা খুঁজতে লাগল, কিন্তু কোথাও নেই কিছুই। শুধু কালো শরীর আর শূন্য কুলুঙ্গি।

খুঁজতে খুঁজতে পথটার শেষ মাথায় পৌঁছানোর পর, মশালের আলোয় খোদাই করা প্রতিকৃতিটা ফুটে উঠলো। সূর্য দেবতার প্রতীকটা চিনতে পারলো মানাতাসসি, এই ঐশ্বরিক উপস্থিতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে ওর সাহস মিইয়ে গেল সাথে সাথে।

প্রতিকৃতির নিচে মেঝেতে কিছু একটা নজরে এল ওর, মশালের আলোয় চকচক করছে।

দেখে মুখ হাঁ হয়ে গেল ওর। এটা হলো সেই শকুন কুঠার, দেবতার প্রতিকৃতির সামনে নৈবেদ্যের মত করে পড়ে আছে তা–কিন্তু জায়গাটা পুরো খালি।

ওনারা ওনাদের দেবতার কাছে চলে গিয়েছেন। ওকে ধোঁকা দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বঞ্চিত করে ঠেলে নিয়ে এসেছেন এই ভয়ানক অশুভ জায়গায়, একেবারে সরাসরি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির মুখোমুখি মোকাবেলায়।

পিছিয়ে যেতে লাগল মানাতাসসি, সূর্যের প্রতিকৃতিটা আবার অন্ধকার হয়ে যেতেই ঘুরে দিল দৌড়, ফিরে গেল অ্যাসটার্টের মন্দিরের গুহায়। সেখান থেকে আবার সুড়ঙ্গের মুখের দিকে ফিরে তাকালো ও।

"মুক্ত দাসদের ভেতরে রাজমিস্ত্রি যারা তাদেরকে ধরে আনো। ঢোকার মুখটা বন্ধ করে দিতে বলো। জায়গাটা অশুভ। বন্ধ করে দাও।"

ওরা সবাই দৌড়ে গেল আদেশ পালন করতে, মানাতাসসির সাহস–ওর ক্রোধ আর ওর ঘৃণা–আবার ফিরে এল ওর ভেতরে।

"এই অশুভকে ধ্বংস করে দেব আমি। আমি এই জায়গাকে অভিশাপ দিচ্ছি, এই পাহাড়কে অভিশাপ দিচ্ছি। এই অভিশাপ আজীবন বলবত থাকবে।" চিৎকার করে বলতে থাকলো ও। "জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও সব। ধ্বংস করে দাও। এই অশুভ জিনিসকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে আর মানুষের মন থেকে মুছে দিতে হবে, আজীবনের জন্য।"

রাজমিস্ত্রিরা নিপুন হাতে রাজাদের সমাধিক্ষেত্রে ঢোকার রাস্তার মুখটা বন্ধ করে দিল। ওপেটের লোকজন তাদেরকে যা শিখিয়েছিল সেটার সমস্ত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কাজটা করল ওরা, তাদের কাজ শেষ হলে দেখা গেল প্রবেশপথটা ওখানে কখনো ছিল বলেই মনে হচ্ছে না।

তারপর মানাতাসসি পুরো শহরটা ধ্বংস করে দিল। প্রতিটা জীবিত জিনিসকে হত্যা করে নিক্ষেপ করল আগুনে, নিচের শহরে বহুদিন ধরে জ্বলতে থাকলো আগুনটা। তারপর ও দেওয়াল আর মিনারগুলোর দিকে নজর দিল। ও নিজের লোহার থাবা দিয়ে ইশারা করল, ওর লোকরা সেগুলোকে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই এর আকারে টুকরো টুকরো করে ফেলল। দেওয়াল, সূর্য মিনার এমনকি অ্যাসটার্টের সুন্দর মন্দিরটাও বাদ গেল না। ওগুলোকে একেবারে ভিত্তি পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেওয়া হলো। সুসজ্জিত পাকা রাস্তাগুলো উপড়ে ফেলল ওরা। বন্দরের পাথরের জেটিগুলো গুঁড়িয়ে দিল। লক্ষ লক্ষ পিপড়ার মত কাজ করে করে ওরা শহরটাকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিল যে তার কোনো চিহ্নও রইলো না আর। দেওয়ালের টুকরোগুলো গুহায় বয়ে নিয়ে এসে অতল সবুজ দীঘিটায় ফেলে দিল। পুরো শহরটাকেই তুলে এনে দেবীকে দিয়ে দিল ওরা, কিন্তু দীঘিটা এত বেশি গভীর যে–বা দেবী এত অপরিসীম লোভী যে–কোনো প্রকার চিহ্ন না রেখেই গিলে নিল তার পুরোটাই আর দীঘির সবুজ পরিষ্কার পানির উচ্চতা একটা আঙুলও বাড়লো না।

যখন মানাতাসসি ওপেট থেকে ফিরতি যাত্রা করল, পূর্ব সাম্রাজ্যের ধ্বংস সম্পন্ন করতে, তখন পেছনে শুধু ঝুরঝুরে ছাই বাদে আর কিছুই রেখে গেল না। বাতাসের মলিন ধুলোর মত ভেসে যেতে লাগল তা।

মানাতাসসি ওর সেনাবাহিনীকে চার সাম্রাজ্য জুড়ে জালের মত করে ছড়িয়ে দিল, সাথে আদেশ দিয়ে দিল ওপেটের লোকদের বানানো সকল শহর, খনি আর বাগানের নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তবে ততোদিনে ওর ঘৃণার আগুন স্তিমিত হয়ে গিয়েছে অনেকটাই, সকল গাছ পুড়িয়ে ফেলার পরের দাবানলের মত ধিকিধিকি জ্বলছিল শুধু। ঘৃণা চলে যেতেই নিজেকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল ওর, কেমন অন্তঃসারশূন্য আর নিস্তেজ, ওর বিশাল ক্ষত বিক্ষত দেহটা যেন একটা খোলস মাত্র, এমনকি ধোঁয়াটে হলুদ চোখগুলোও নিস্প্রভ আর নিরাসক্ত হয়ে গেল।

জিম্বাও তে চলে গেল মানাতাসসি, মধ্য সাম্রাজ্যের বিশাল দেওয়ালঅলা শহর সেটা। ওপেটের সকল লোক মরে গিয়েছে ততোদিনে। ওর দেহটার মতই শহরটাও তখন আত্মাহীন, খালি আর বিরান।

একদিন একটা পশমের কাপড় পরে পাহারার আগুনের পাশে ঘুমিয়ে ছিল মানাতাসসি, সকালে দেখা গেল ওর দেহটা শক্ত আর ঠান্ডা হয়ে আছে।

দেওয়ালের বাইরে সমাহিত করা হলো ওকে, তারপর শুরু হলো ঝগড়া আর হানাহানি, কারণ মানাতাসসি ওর পরবর্তী কাউকে নির্ধারণ করে যায়নি। প্রতিটা সমরাধিনায়ক নিজেকে ওর উত্তরাধিকারী দাবী করতে লাগল, একশোর উপরে উপদলে বিভক্ত হয়ে গেল মানাতাসসির সেনাবাহিনী।

সময়ের সাথে মানাতাসসি আর ওপেট শহর মানুষের স্মৃতির পাতা থেকে মুছে গেল চিরতরে।



বুশম্যান ঝাই যখন বুড়ো হয়ে গেল, টের পেল যে মারা যাবে কিছুদিন পরেই, তখন ও আবার ফিরে এল ওপেটে।

হ্রদটা গায়েব হয়ে গিয়েছে ততোদিনে, ওটার সৈকত সরে গিয়েছে লাল পাহাড়গুলো থেকে বিশ মাইল মত দূরে আর পানি তখন নোনা, অগভীর আর পোকামাকড়ে ভরা।

যেখানে বাআলের মন্দির ছিল তার উপর দিয়ে এগিয়ে গেল ঝাই, কিন্তু চিনতেও পারলো না, লাল পাথরের গায়ের ফোঁকরটা দেখতে পেয়ে অ্যাসটার্টের গুহায় যাওয়ার রাস্তাটা চিনতে পারলো শুধু।

দীঘিটার পাশে তাঁবু গাড়লো ও, তারপর একটা ছোট্ট আগুন জ্বেলে ওটার ধারে বসে বৃদ্ধ লোকের স্বভাববশত নিজের সাথেই নিজে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল। ওর মনের ভেতর স্মৃতির মিছিল ছুটতে ছুটতে একসময় সেগুলো বড়সড় আর জাঁকালো হয়ে ধরা দিল, ওর ইচ্ছা হলো সেগুলোকে ধরে রেখে সংরক্ষণের জন্য।

নিজের কোমরবন্ধনীটা তুলে নিয়ে গুহার একদম পেছনের দেওয়ালের কাছে চলে গেল ঝাই। শিং দিয়ে বানানো রঙের ডিব্বা ঝোলানো আছে ওর কোমরবন্ধনীতে, কাঠের গোঁজ মেরে আটকে রাখা হয়েছে সবগুলো।

দেওয়ালের সবচেয়ে মসৃণ জায়গাটায় কয়লা দিয়ে একটা অবয়বের রূপরেখা তৈরি করল ও। খুব ধীরে আর সাবধানে কাজ করতে লাগল, প্রচণ্ড মমতা দিয়ে।

তারপর ও রঙগুলো মিশিয়ে নিয়ে শুরু করল সাদা মুখের গর্বিত দেবতার মত অবয়বটা আঁকতে, তারপর আঁকলো লালচে সোনালি দাড়ি আর উরু থেকে বের হয়ে থাকা উদ্ধত রাজকীয় শিশ্ন, এক মনে কাজ করতে লাগল ও আর মনে হতে লাগল যেন পাথরের গভীর থেকে ভূতুড়ে আওয়াজ ভেসে আসছে, রাজাদের সমাধিক্ষেত্রের ভেতর থেকে।

"হুই, আমার ঠান্ডা লাগছে। ধরো আমাকে, বন্ধু। দৈবদ্রষ্টা যে ভবিষৎবাণী করেছিল, সেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দাও আমার দিকে।"

"আমি পারবো না, লানন। আমি পারবো না করতে।"

"ব্যথায় প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছি আমি, হুই। আমাকে যদি ভালোবাসো, তাহলে কাজটা করো।"

"আমি ভালোবাসি আপনাকে।"

"উড়ে যাও, আমার সূর্যের পাখি।"

বৃদ্ধ লোকটা কাজ করে গেল, বাতাস ফিসফিস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেতে লাগল পাহাড় জুড়ে। এটা হলো সেই দীর্ঘশ্বাস যেটা কেউ একই সাথে তার ভালোবাসা আর দেশকে হারিয়ে ফেললে তখন ফেলে, যখন কেউ দেবতাদেরকে অস্বীকার করে আর তার বন্ধুর কষ্ট লাঘব করতে চরম কাজ করতেও পিছপা হয় না। এভাবে কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারে বন্ধুর রক্তে তখনও রঞ্জিত হয়ে থাকা তরবারিটা তুলে নিয়ে হাতলটা শক্ত করে পাথরের মেঝের একটা খাজে আটকে দিয়ে ডগাটা নিজের পাঁজরের নিচ বরাবর তাক করে ওটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে।

***

দৈনিক র‍্যান্ড মেইল

২৭ মে

মাল্টি-মিলিয়নিয়ার বিনিয়োগকারি লোরেন স্টারভেসান্ট রহস্যময় রোগে মারা গিয়েছেন

বতসোয়ানা, শনিবার। ক্লেইন শুর, স্যানডাউন, জোহানেসবার্গ নিবাসী সুপরিচিত কোটিপতি বিনিয়োগকারী এবং খেলোয়াড়, মিস্টার লোরেন স্টারভেসান্ট এখানে গতকাল রোগাক্রান্ত হয়ে স্বল্প সময়ের মাঝে মারা গিয়েছেন।

মিস্টার স্টারভেসান্ট সম্প্রতি বতসোয়ানায় আবিষ্কৃত প্রাচীন কার্থেজিনিয়ান শহরের জায়গাটা ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। এই খননকার্যের প্রধান ডক্টর বেঞ্জামিন কাজিনও একই রোগের আক্রান্ত হয়েছেন, যেটাকে সংক্রামক রোগ হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে।

ডক্টর কাজিনকে জোহানেসবার্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে হাসপাতালের একজন মুখপাত্র জানান যে ওনার অবস্থা খুবই গুরুতর।

দ্য ফাইন্যান্সিয়াল গেজেট

২৮ মে

স্টপ প্রেস

অ্যাংলো-স্টারভেসান্টের ৯৭ পয়েন্ট দরপতন, পুঁজি বাজারে আতংক

হলার্ড স্টার, সোমবার। অ্যাংলো-স্টারভেসান্টের চেয়ারম্যান মিস্টার লোরেন স্টারভেসান্টের মৃত্যুর খবরে, জোহানেসবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে আজকে স্টারভেসান্ট গ্রুপ অভ কোম্পানির স্থিরকৃত দরের ভয়াবহ পতন হয়েছে।

দ্য স্টার

৩ জুন

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন

জোহানেসবার্গ, শুক্রবার। প্রায় দশদিন অজ্ঞান থাকার পর, আজকে ডক্টর বেঞ্জামিন কাজিন জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, হাসপাতালের মুখপাত্র তেমনটাই জানিয়েছেন।

ডক্টর কাজিন হচ্ছেন ইনস্টিটিউট অভ অ্যানথ্রোপলজি অ্যান্ড আফ্রিকান প্রি হিস্টোরির পরিচালক, প্রাচীন কার্থেজিনিয়ান শহর ওপেট-এর আবিষ্কারক। উনি সম্প্রতি নিজের আবিষ্কারের জায়গাতেই গবেষণা-কর্ম চালানোর সময় খুব বিরল একটা ছত্রাকঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

আজ ডক্টর কাজিনের সহকারী ডক্টর স্যালি বেনাটর ওনাকে দেখতে গিয়েছিলেন, উনি পরে জানান যে ডক্টর কাজিন এখন আগের চাইতে অনেক ভালো কিন্তু এখনও মিস্টার স্টারভেসান্টের মৃত্যুতে ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন।

দ্য স্টার
৬ সেপ্টেম্বর
বিয়ে করলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ

কেপ টাউন, শুক্রবার। ওপেট সিটির আবিষ্কারক, ডক্টর বেঞ্জামিন কাজিন তার দীর্ঘদিনের সহকারী, ডক্টর স্যালি বেনাটর-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আজ একটা ছোটখাট আয়োজনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় আনুষ্ঠানিকতা। নববধূ জানান যে ওনারা নাকি প্রাচীন শহর ওপেটে কাজের মাধ্যমেই মধু চন্দ্রিমা সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

দ্য টাইমস
২০ এপ্রিল
প্রত্নতত্ত্ববিদকে সম্মান প্রদান

লন্ডন, শনিবার। আজ রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে পর্ষদের একটা অনন্য সাধারণ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ডক্টর বেঞ্জামিন কাজিনকে সোসাইটির সবচেয়ে আরাধ্য 'ফাউন্ডার'স অ্যান্ড প্যাট্রন'স মেডেল'-এ ভূষিত করা হয়।

সভার পরে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান হয়েছে যেখানে বিখ্যাত চিত্রকর পিয়েত্রো আন্নিগনির আঁকা ডক্টর কাজিনের একটা প্রতিকৃতি সোসাইটির দেওয়াল স্থাপন করা হয়।

ডক্টর কাজিনের সাথে ছিলেন তার স্ত্রী, ডক্টর স্যালি কাজিন, পূর্বের স্যালি বেনাটর, যিনি নিজেও প্রত্নতাত্ত্বিক পাড়ার বেশ সুপরিচিত মুখ। এই দম্পতি আফ্রিকায় ফেরার আগে এখন দুই সপ্তাহ ব্রিটেন এবং ইউরোপে ছুটি কাটাবেন।



অসীম পিয়াসের জন্ম ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১ সালে গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায়, তবে বেড়ে ওঠা গাজীপুরে। SSC পাশ করেন আনসার ভি.ডি.পি হাই স্কুল থেকে আর HSC নটরডেম কলেজ থেকে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে MBBS ডিগ্রি অর্জন করেন।

fb.com/oseem.peeas

প্রচ্ছদ : সজল চৌধুরী

